শিবনাথ রচনাসংগ্রহ

[প্রথম খণ্ড]

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

প্রধান সম্পাদক

শ্রীগোপাল হালদার

সম্পাদক

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

সাক্ষরতা প্রকাশন / পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

প্রথম প্রকাশ
৩রা নভেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক
শ্রীকেশব আডু
সাক্ষরতা প্রকাশন
বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর
দীন মহম্মদ
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ
শ্রীশংকর দাশগুপ্ত

'শিবনাথ রচনাসংগ্রহ'-এর ভূমিকা লিখেছেন সম্পাদক শ্রীবারিদবরণ ঘোষ।

সূচীপত্র



শিবনাথ শাস্ত্রী

জন্ম : ৩১ জানুয়ারী, ১৮৪৭

মৃত্যু : ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯

ভূমিকা

• স্বসম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে রচনা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, '.... এক্ষণে অবসর মত "ভারতীর" জন্য মাঝে মাঝে কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব। বঙ্গ সাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না—কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।' চিঠিটি শিলাইদহ (কুমারখালি) থেকে ৮ই শ্রাবণ ১৩০৫ সালে লেখা। বস্তুতঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন আর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তৎকালীন ইতিবৃত্ত যেমন একই জীবনবৃত্তের এপিঠ-ওপিঠ, তাঁর সাহিত্য-সাধনা ও ধর্ম-সাধনা তেমনি পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু যেখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা কিছু পরিমাণে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পেরেছে, সেখানেই তিনি একজন সমৃদ্ধিবান সাহিত্যিক হিসাবে পরিগণিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

সাহিত্যিক হিসাবে আচার্য শিবনাথের নাম কেউ আজ স্মরণে রেখেছেন কিনা সন্দেহ। শিবনাথ শাস্ত্রী একজন ধর্মনেতা —এই পরিচয়ই কি তাঁকে বিস্মৃতির অন্তরালে ঠেলে দিয়েছে? কিন্তু একজন 'শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবিরূপেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে ও বাঙালী সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়' (বিপিনচন্দ্র পাল)। উপন্যাস, কবিতা, স্মৃতিকথা ব্যতীত ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে শিবনাথ অসংখ্য প্রবন্ধাদি রচনা করে গেছেন ; সেসব লেখাতেও সাহিত্যের সত্যকারের গুণ কিছুমাত্র অনুপস্থিত নয়। অকৃত্রিমতা ও প্রাঞ্জলতায় তা উৎকৃষ্ট সাহিত্য।

শিবনাথের এই সাহিত্যিক পরিচয়টিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠককুলের সামনে ধরে তোলার জন্য সাক্ষরতা প্রকাশন 'শিবনাথ রচনাসংগ্রহ' প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট লেখা তাতে সংকলিত হবে। দুই খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই রচনা-সঙ্কলনের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। শিবনাথের জীবনী সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর 'আত্মচরিত' থেকে তার কিছু পরিচয় পাঠক পান—বাঙলা সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবেও তা অমূল্য। শিবনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনী কন্যা হেমলতাদেবী রচিত 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত' ('শিবনাথ-জীবনী' নামেও পরিচিত) তা দুষ্প্রাপ্য হলেও অবশ্য পাঠ্য। রচনাসংগ্রহের পাঠকের কাছে শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনের সুদীর্ঘ পরিচয় দান অসম্ভব। শিবনাথের 'আত্মচরিতে' পাঠক তাঁর জীবনী-পরিচয় পাবেন। তার পরিপূরক হিসাবে আমরা এখানে আর কিছু তথ্য সংযোজন করতে পারি।

জীবনী-সার (১৮৪৭-১৯১৯)ঃ শিবনাথের পিতৃভূমি চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত মজিলপুরগ্রাম। জন্মস্থান—মাতুলালয় চাঙড়িপোতা। জন্মতারিখ—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১-এ জানুয়ারী (বাঙলা ১২৫০ সালের উনিশে মাঘ রবিবার)। পিতা 'বিদ্যাসাগর' উপাধি-প্রাপ্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য : মাতুল 'সোমপ্রকাশ'-খ্যাত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এই নব

শিশুর আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে মাতুল দ্বারকানাথ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'এ ছেলের যে কপাল দেখছি, বেঁচে থাকলে বড়লোক হবে।' হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭) দেশে যে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ১৮৪৭-এ তার উন্মেষকাল সন্নিকট—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের তাতে একটা অংশ ছিল; শিবনাথ স্বয়ং সেই নবজাগরণের প্রতিক্রিয়া তাঁর দেহ-মনে অনুভব করেছেন, এবং তাতে অংশগ্রহণ করেও আপন কালকে, তৎকালীন বঙ্গ-সমাজকে, এবং আপন চরিত-রচনায় আপন কীর্তিকে তিনি আশ্চর্য নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার করার দুর্লভ সামর্থ্য অর্জন করেছিলেন। একারণে তাঁর জীবন-সাধনা একই সঙ্গে ইতিহাসের বিষয়, আবার ইতিহাস-সৃষ্টিতেও তা সমর্থ হয়েছিল। তাঁর পারিবারিক প্রভাব ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য এই আশ্চর্য্য জীবন-রচনায় যুগপৎ সহায়তা করেছিল।

শিবনাথেরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণশ্রেণীর পণ্ডিতবংশ। পূর্বাপর তাঁদের বৃত্তি ছিল যজন-যাজন ও সংস্কৃতচর্চা। শিবনাথও ছিলেন সংস্কৃতে এম.এ. এবং 'শাস্ত্রী'। শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় বিদ্যালঙ্কার ১০৩ বছর বেঁচেছিলেন, তাঁর মৃত্যুকালে শিবনাথের বয়স ছিল বারো। সেই ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধের অদ্ভুত স্মৃতিচিত্র শিবনাথ রক্ষা করে গিয়েছেন। পিতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য এবং পিতামহী লক্ষ্মীদেবী শিবনাথের জন্মের চোদ্দ বছর আগে গতায়ু হন। এই প্রপিতামহ রামজয় ও পিতার যে চিত্র আমরা পাই তাতে বুঝতে পারি—পাণ্ডিত্যে, তেজস্বিতায়, হৃদয়বত্তায় শিবনাথ কী উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন।

মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্নও ছিলেন সংস্কৃতে দিক্‌পাল পণ্ডিত। সে যুগের প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদনা কার্যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে সাহায্য করতেন।

জন্মের পর থেকে শিবনাথ মাতামহীর প্রত্যক্ষ স্নেহে লালিত হয়েছিলেন। উত্তর-জীবনে এঁর কথা বলতে বলতে শিবনাথের চক্ষু সজল হয়ে উঠত। শিবনাথ-পত্নী প্রসন্নময়ী-দেবী সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বলতেন, 'এ জীবনে অনেক মানুষ দেখিলাম, আমার দিদি-শাশুড়ির মত অত বড় প্রাণ আর কারো দেখি নাই।' শিবনাথের নারী-জাতি-প্রীতির উৎসমুখ ছিলেন এই উদারচেতা দানশীলা রমণীটি।

মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সেদিনের 'সোমপ্রকাশের' সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক, আপন কর্মে ও ব্যক্তিত্বে সর্বসম্মানিত পুরুষ। শিবনাথের জীবনের অধিকাংশ গুণাবলী এই মাতুল-চরিত্রেরই প্রতিফলন বলাও অন্যায় নয়। শিবনাথের লেখাতেই আমরা তারও চমৎকার চিত্র লাভ করি। বুঝি মাতুলের নির্ভীকতা ও পরিশ্রমশীলতা সঞ্চারিত হয়েছিল ভাগিনেয়ের মধ্যেও। সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে একদিন শিবনাথ বিদ্যালয়-পরিদর্শক উড্রোসাহেবের ঘরে চটিপায়ে প্রবেশ করেন। রেগে সাহেব বললেন, 'চটি খুলে এসো।' শিবনাথ এই আদেশের যুক্তিযুক্ততা খুঁজে পেলেন না। তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ঘটনাটি শুনে দ্বারকানাথ বলে পাঠালেন, 'তুমি আমার ভাগিনার মত কাজ করিয়াছ।' ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ করায় হরানন্দ যখন পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলেন, মাতুল দ্বারকানাথ সস্নেহে ভাগিনেয়কে তখনো আশ্রয় দেন।

পিতা ও মাতুলের মতো শিবনাথ লাভ করেছিলেন এক অসামান্যা রমণীকে জননীরূপে। জননী গোলকমণিদেবী ছিলেন প্রবল আত্মমর্যাদাসম্পন্না নারী। স্নেহপরায়ণা, কর্তব্যপরায়ণা ও সুশাসনেও তিনি ছিলেন অকুণ্ঠা। স্বভাবতঃ রক্ষণ-

শীল এই রমণী পুত্রের ধর্মান্তরগ্রহণে নিরতিশয় ব্যথিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু পরিত্যক্ত সন্তানের প্রতি তাঁর মমতার অবধি ছিল না। বুকের কাছে এই ছেলেকে নিয়েই সযত্নে শোনাতেন রামায়ণ-কথা। সুরুচি, শিক্ষা ও আত্মমর্যাদার প্রথম পাঠ শিবনাথ পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছেই।

• শিক্ষাজীবন ঃ [গ্রাম (১৮২২—২৬)] 'বর্ধমেনে' পণ্ডিতের পাঠশালা অপেক্ষা শিবনাথ পাঠ্যক্রমের বাইরে মায়ের কাছে বসে শেখেন রামায়ণ-মহাভারত। ন'বছর বয়সে মজিলপুরের আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি আসেন কলকাতায়। পশুপাখির সঙ্গে জন্ম নিয়েছে তার মমতার সম্পর্ক, অসাধারণ মেধার সঙ্গে তিনি হয়েছেন হাস্যরঙ্গের স্বাভাবিক অধিকারী।

কলকাতায় (১৮৫৬-৭২) ঃ শিবনাথ ভর্তি হলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজে। মাতুল দ্বারকানাথ সে সময় 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ করছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হরানন্দ এবং দ্বারকানাথ—উভয়ের সুহৃৎ। বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাভূষণ তাঁর চোখের সামনে থেকে চরিত্র-গঠনের আদর্শ সঞ্চারিত করছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন শিবনাথের চোখে 'আদর্শ পুরুষ'। তাঁর সংস্পর্শে এসেই শিবনাথের মন পুরানো সংস্কারের জঞ্জাল-মুক্ত হতে পেরেছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিধবাবিবাহের আন্দোলনে মেতে উঠলেন। 'Men I Have Seen' গ্রন্থে শিবনাথ লিখেছেন, বিদ্যাসাগরের 'repeated visits (to our residence) made our lodging a hot bed of widow-remarriage agitation, and what I swallowed at home, I disgorged at the college and this gave rise to heated discussions amongst my class-mates.'

সংস্কৃত কলেজে পাঠকালেই শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন; কেশবচন্দ্রের সহিতও পরিচিত হন। আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তের বছর বয়সে তার প্রথম বিবাহ হলো। বধূ দশ বছরের প্রসন্নময়ী। কোন কারণে পিতা হরানন্দ প্রসন্নময়ীর বাপের বাড়ীর উপর অপ্রসন্ন হন। দুর্দান্ত ক্রোধে তিনি শিবনাথকে বাধ্য করলেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে—এই বধূ বিরাজমোহিনী। শিবনাথ তখনো এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেননি। শিবনাথের 'আত্মচরিত' থেকে আমরা জানি—এ বিবাহ কী বিষম যন্ত্রণায় তাঁকে পীড়িত করে, আর তারই ফলে কেমন করে ধর্মবোধের চেতনা ক্রমশঃ আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় শিবনাথ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে পেলেন 'সেকেণ্ড গ্রেড্ স্কলারশিপ', কলেজে হলেন প্রথম।

দু'বছর বাদে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দিলেন এফ.এ. (এফ.এ) পরীক্ষা। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি বিধবা-বিবাহের মত সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়ে উঠেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমে শিবনাথ এ পরীক্ষা দেন। একমাত্র নিজের মেধা ও প্রতিভার বলেই তিনি এ পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ও আরও অনেকগুলি বৃত্তি লাভ করেন। সেইসব বৃত্তির পরিমাণ মাসিক মোট ৫৯ (উনষাট) টাকা। কিন্তু এই আশাতীত সাফল্যে শিবনাথ পেলেন ধর্মজীবনে ও সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মজীবনে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ। বলা যায়—শিবনাথের ছাত্রজীবনের সাফল্যের থেকে দৃষ্টি চলে গেল সমগ্র

জীবনের বিকাশের দিকে—বিশেষ করে ধর্মজীবনে সমাজ-সংস্কারে অক্লান্ত প্রয়াসে তখন থেকেই তিনি অগ্রবর্তী হয়ে গেলেন।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে বি.এ. পাশ করলেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ, পিতাকর্তৃক বর্জন ইত্যাদি সংগ্রামের ঝড় পূর্বেই তাঁর জীবনের উপর ভেঙে পড়েছে। ফলে বি.এ. পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন (১৮৭১) দ্বিতীয় বিভাগে। কেশবচন্দ্রের কর্মে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এর মধ্যেই। তথাপি ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে শিবনাথ প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করলেন সংস্কৃত বিষয়ে। 'শাস্ত্রী' উপাধি পেলেন। পাশ করেই কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন। আরম্ভ হলো শিবনাথের কর্মজীবন।

কর্মজীবন, ধর্মজীবন ঃ শিবনাথের কর্মজীবন প্রধানতঃ ধর্মজীবন,—ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ, ব্রাহ্মসমাজসংগঠন ও স্বদেশসেবায় আত্মদান ; সেইসঙ্গে শিক্ষা ও সাহিত্য কর্মে আত্মবিকাশের প্রয়াস। এসবের বৃত্তান্তও শিবনাথের লেখা থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি—বিশেষ করে জানি তাঁর ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ তাঁর পিতামাতার সঙ্গে মর্মান্তিক বেদনার সৃষ্টি করেছিল। এই ব্যক্তিগত মমতা-বেদনার যন্ত্রণার মধ্যেই চলেছিল তাঁর ব্রাহ্মধর্মের প্রচার,—ব্রাহ্মসমাজের গঠন ও সংগঠনের নব-নব উদ্যোগ,—এমনকি আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্রের পৃথক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (১৮৬৯) আর তার থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা—এই ইতিহাস শিবনাথেরও জীবনকথার সঙ্গে প্রায় বিজড়িত।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের বাইশে আগস্ট (৬ই ভাদ্র) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। এদিন আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীনাথ দত্ত, ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি বিশজন যুবকের সঙ্গে শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মে প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ত্যাগ করলেন উপবীত। জননী গোলকমণি পুত্রকে ডেকে পাঠালেন মজিলপুরে ; গলায় পুনর্বার পরিয়ে দিলেন যজ্ঞসূত্র। শিবনাথের মনে হলো এ যেন কালসর্পের দংশন। তিনি পত্নী প্রসন্নময়ী ও সদ্যোজাত প্রথমা কন্যা হেমলতাকে নিয়ে ক্রমে সংসারজীবন গড়ে তুললেন কলকতায়।

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে বিদেশী 'Home' ধরনের আশ্রম স্থাপন করে নাম দিলেন 'ভারতাশ্রম'। শিবনাথ সপরিবারে ভারতাশ্রমে বাস করতে লাগলেন। এম.এ. পাশ করার পরই নামমাত্র পারিশ্রমিকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্যেই তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করেন। মুখ্য লক্ষ্য কিন্তু ব্রাহ্মধর্মপ্রচার। তাতেও পটভূমির পরিবর্তন ঘটলো। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো (১৫ই মে, ১৮৭৮)।

শিবনাথ তার অন্যতম প্রচারক শুধু নন, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কার্যতঃ শিবনাথকে আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি সুহৃদের সঙ্গে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' প্রধান নির্মাতা বলাই সমুচিত। দেশে-বিদেশে তার সেই প্রচার-অভিযান ও সমাজ-গঠনের চেষ্টা—সেই সমাজের ইতিহাস তাঁর জীবনকে ছেয়ে আছে ; তারই প্রয়োজনে ছিল তাঁর সমাজসেবা ; আবার ধর্মসাধনাও। সেকারণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁর কাছে উপাসনানুষ্ঠানের সঙ্কীর্ণ মন্দির না হয়ে 'জীবনধর্ম পালনের সমাজ' হয়ে উঠেছিল। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'সাধনাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। শিবনাথ চেয়েছিলেন, 'একদল বিশ্বাসী ও প্রেমিক সাধক চাই যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম সাধন,

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিবেন ও ঘনিষ্ঠ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সমাজের মধ্যে নূতন জীবন আনিবার চেষ্টা করিবেন।' অথচ এ-বিষয়ে সমর্পিত প্রাণ সাধকের সন্ধান তিনি শেষ পর্যন্ত পেলেন না। তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য করিলেন, চোদ্দ বছরের (১৮৭৮-৯২) মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের বহু সভ্য বহু সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু প্রচারকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আট থেকে চার-এ। এবং এই চারজনও 'এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া কার্য করিতে পারিতেছেন না'। নিজেকে এর জন্য বার বার দায়ী করেছেন, এক হিসাবে তাঁর এই প্রধান লক্ষ্য অসম্পূর্ণই থেকে যায়। অবশ্য তাঁর ব্যক্তি জীবনে তা পরম দুঃখের হয়; কিন্তু তাঁর সাধনা ও প্রতিজ্ঞা উজ্জ্বলই থাকে।

ধর্মজীবন ছাড়াও শিবনাথের কর্মজীবন আরও ত্রিধারায় প্রবাহিত—তিনি শিক্ষক, তিনি সমাজসেবক, তিনি স্বদেশ-সাধক।

শিক্ষকতা ঃ স্কুলের ছাত্র থাকতেই শিবনাথ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করতেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি শিক্ষক হন কেশবচন্দ্রের 'ভারতাশ্রমের' মহিলা বিদ্যালয়ে নামমাত্র পারিশ্রমিকে।

শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল হরিনাভি। মাতুল দ্বারকানাথের আহ্বানে তিনি হরিনাভি স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার হয়ে আসেন। 'সোমপ্রকাশ-'সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হরিনাভি থেকে ভবানীপুরে এলেন সাউথ সুবার্বাণ স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে। এখানের অধ্যাপনা দু'বছরের। এ সময়ে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' (পরে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়) স্থাপনার ব্যাপারেও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলের Head Pandit cum-Translator Master পদে যোগ দেন। এখানের কর্মকালও দু'বছরের। ইতিমধ্যে প্রবল ধর্মভাব এবং স্বাধীনতা স্পৃহায় তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে দেন—সে এক অদ্ভুত সংকল্প। স্বাধীনতার ইতিহাসের তা এক মহোজ্জল অধ্যায়—সেই 'অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা' গ্রহণ (নিম্নে উল্লিখিত হচ্ছে)—শিক্ষাব্রতের সাধনা ও শিবনাথ তাকে আরও উজ্জ্বলতর করে তোলেন নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায়। ব্রাহ্ম সুহৃদ্‌দের অর্থানুকূল্যে, শিবনাথের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা-কায সম্পন্ন হলো। পরবর্তী সিটি কলেজের এই ভাবে সূচনা হয়। আনন্দমোহন প্রভৃতির সহায়তায় শিবনাথ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ এপ্রিল 'ছাত্রসমাজ' স্থাপন করলেন—ব্রাহ্ম-ধর্মের অনুকূল মত ও চরিত্রগঠনই তার উদ্দেশ্য। সেখানে শিবনাথের বক্তৃতা ছিল জ্ঞানে ও ঐকান্তিকতায় সকলের আকর্ষণীয়। ইংলণ্ড ভ্রমণের (১৮৮৮) শেষে গ্রাম্য বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হলো ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে। 'বিদ্যালয়' নয় 'শিক্ষালয়' কেন, এ প্রসঙ্গে শিবনাথ লিখেছেন, 'জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা শিক্ষালয় স্থাপন করিব, বিদ্যালয় নাম রাখিব না—আমরা প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, পুঁথিগত বিদ্যালয়, সুতরাং চেয়ার টেবিলের আবশ্যকতা কি? আমাদের বালিকারা মাদুর পাতিয়া পড়িবে, তাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।' বলাবাহুল্য কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে 'এতটা সরল' শিক্ষার আয়োজন সম্ভব হয়নি।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারেও শিবনাথের একটা নিজস্ব মতামত ছিল। তিনি চাইতেন, মেয়েরাও জ্যামিতি, লজিক, মেটাফিজিক্স্ পড়ুন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল নিজস্ব। সকল শ্রেণীর ছাত্রেরা তাঁকে দেখলেই বলতো, 'পণ্ডিতমশাই, তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা করবে।' পড়াতে খেলার আনন্দ তিনি জোগাতেন।

সমাজ-সেবায়ঃ শিবনাথের সমাজ-সেবাও ছিল ত্রিমুখী—এক, যাকে আমরা সাধারণভাবে সোস্যাল সার্ভিস বা সমাজ-সেবা বলি; দুই, বিধবাবিবাহমূলক আন্দোলন; এবং তিন, নিরাশ্রয় এমন কি তথাকথিত পতিতাদের জীবন পুনর্গঠনের জন্য আশ্রয় দান।

দারিদ্র্যজ শিবনাথের পক্ষে বাল্যকালে গ্রামের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখা সম্ভবপর ছিল না। গ্রামোন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগের সুযোগ আসে হরিনাভি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কালে। সেখানে একটি স্বতন্ত্র পৌরসভা, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূত্রপাত ঘটে তাঁরই উদ্যোগে।

ঊনিশ শতকের নবজাগরণের জোয়ারে অনেক অপদোষও ভেসে এসেছিল। এক শ্রেণীর নবাযুবকের মতে মদ্যপান ছিল সভ্যতার প্রাথমিক নিদর্শন। প্রতিটি ক্রিয়ার একটা প্রতিক্রিয়াও ঘটে থাকে—এটা বৈজ্ঞানিক নিয়ম। তাই দেখি হিন্দু কলেজের এই নব্য বঙ্গীয় যুবকদের প্রথম সারির একজন রাজনারায়ণ বসুই প্রথমে এগিয়ে এলেন মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে। 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক প্যারীচরণ সরকারও স্থাপন করেছিলেন একটি সুরাপান নিবারণী সভা'। বাল্যকাল থেকেই শেষোক্ত সভার সঙ্গে শিবনাথের সংযোগ ছিল। মাতুল দ্বারকানাথের চারিত্রিক আদর্শও তাঁকে মদ্যপান-বিরোধী করে তুলেছিল। তাঁর বহু কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে পান-বিরোধী প্রতিবাদ। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র-স্থাপিত 'ভারত সংস্কার সভা'র মদ্যপান নিবারণী শাখার মুখপত্র বিনি পয়সার সাপ্তাহিক 'মদ না গরল?' সম্পাদনার ভার ছিল শিবনাথের উপর। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই আন্দোলনের রূপরেখা মুদ্রিত আছে। এমনকি সুরাপায়ী ইংলণ্ডের বুকে শ্রমজীবীদের সভায় মদ্যপানের বিরুদ্ধে জোরালো গলায় বক্তৃতা করে এসেছিলেন।

কলকাতার প্রথম বিধবাবিবাহের সভায় শিবনাথ উপস্থিত ছিলেন—অবশ্য তখন তাঁর বয়স মাত্র ন'বছর। প্রথম থেকেই ছাত্রজীবনেও শিবনাথ বিধবাবিবাহের বহু আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন। বন্ধুপত্নী মহালক্ষ্মীর কথা, নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের বিধবাবিবাহের কথা এখনও সুবিদিত—তথাপি তাঁর নিজের লেখা থেকেই তা পাঠ করা উচিত। স্ত্রীজাতির প্রতি শিবনাথের এই গভীর প্রেম সর্বাধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে নিরাশ্রয় বালিকাদের স্বগৃহে আশ্রয়দানে। যে পতিতাদের আশ্রয় দিতে অন্যের সঙ্কোচ হতো, শিবনাথের কাছে তাঁরা পেতেন শান্ত নীড়ের সন্ধান। শিবনাথ বলতেন, 'দেখ মানুষকে পাষাণের মত না হইয়া আকাশের মত হইতে হইবে।' নিরাশ্রয়া লক্ষ্মীমণি, থাকমণি, কুসুমকুমারীদের নিয়ে পরিবারের সকলে সুখে বাস করতেন। আশ্রিতা লক্ষ্মীমণি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,'…অল্প কয়েকদিন হইল আমি শিবনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে হরিনাভিতে আসিয়াছি। শিবনাথবাবু এখানকার স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। ইঁহাদের ভালবাসায় আমি সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। শিবনাথবাবুর সততায়

আমি অনেক সময় ভাবি তিনি মানুষ না দেবতা। রাগ নাই, সুখ দুঃখ জ্ঞান নাই, আপন পর ভেদ নাই; আমাকে ঠিক নিজের কন্যার মত ভালবাসেন। হেমের লেখাপড়ার জন্য তাঁর যেমন যত্ন, আমার জন্যও তদ্রূপ যত্ন করেন। কলিকাতায় থাকিতে একদিন কোন এক ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে সপরিবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাইতে তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া যান; এজন্য শিবনাথবাবু কাহাকেও সে বাড়ী যাইতে দেন নাই, এবং নিজেও সে কার্যে যোগ দেন নাই। এরূপ সাধুলোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে আমি আর কোন সুখ চাই না।'

এ ব্যাপারে শিবনাথ-পত্নী প্রসন্নময়ীদেবীর অন্তঃশায়ী স্নেহের কথাও স্মরণীয়।

স্বদেশ চর্যাঃ ভারতে আধুনিক চেতনা যে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে উদ্বুদ্ধ হয়, তার ব্যাপক রূপ শিবনাথ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন—চাইলেন ধর্মে, সমাজে স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেতনারও উদ্বোধন।

হিন্দুমেলার প্রায় অধিবেশনে (১৮৬৮) তরুণ বয়সেই দেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা রচনার জন্য শিবনাথ আহূত হন এবং একশত শ্লোকের এক দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারত সভায় আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিবনাথও ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি ছিলেন এই সভার প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য।

সরকারী চাকুরী ত্যাগের পূর্বে শিবনাথ যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখনীয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বরানগরের একটি উদ্যানের অন্ধকারময় কক্ষে কাঠের আগুন জ্বালালেন। প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণকুমার মিত্র সাক্ষ্য দিয়েছেন ('তত্ত্বকৌমুদী', ১লা অগ্রহায়ণ ১৮৭৮ সংখ্যা)—"শাস্ত্রী মহাশয় বুক চিরিয়া রক্ত দ্বারা এক খণ্ড কাগজে লিখলেন—'একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিব না। সরকারী চাকুরী করিব না।' ··· ব্রহ্মোপাসনান্তর বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।" এই প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম কথা ছিল, 'স্বায়ত্তশাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।' ইতিমধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৫ই মে ১৮৭৮)। বিপিনচন্দ্র সঙ্গত কারণেই লিখেছেন, 'শিবনাথ শাস্ত্রীই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশচর্যার প্রথম দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন।' প্রচারকার্যে শিবনাথ কয়েকবার সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন; বহুস্থানে এ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সে সব ইংরেজি বক্তৃতা আজ কে পুনঃ প্রকাশ করবে? ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। দেশ-বিদেশে কোনোখানেই তিনি এই স্বদেশ-সেবার কর্ম বিস্মৃত হতে পারতেন না।

ক্রমে সারা দেশকে উত্তাল করে এল বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ। ছাত্রেরাও এই আন্দোলনে মেতে উঠলেন। ছাত্র দলন-যজ্ঞ আরম্ভ করল ইংরেজ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদিগকে স্বদেশের জন্য প্রয়োজন হলে এক বছরের জন্য পড়াশুনোর স্থগিত রাখার আহ্বান জানালেন।

বিদেশীবর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞায় দেশে সাড়া পড়ে—শিবনাথ ছিলেন

এই জাতীয়-যজ্ঞের একজন সার্থক হোতা। বিপ্লবী 'যুগান্তরের' প্রথম সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন—'যুগান্তর' পত্রিকার নামটি (প্রথম প্রকাশ ১২ই মার্চ ১৯০৬) তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' (১৮৯৫) উপন্যাস থেকেই নিয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয়জন স্বদেশীকে নির্বাসিত করে ইংরেজ সরকার। এর বিরুদ্ধে আহূত প্রতিবাদ সভায় অনেক শীর্ষস্থানীয় দেশনায়কও রাজভয়ে ভীত হয়ে সভাপতিত্ব করতে সাহসী হননি। শাস্ত্রী মহাশয়ের তখন ৬১ বৎসর বয়স। সাগ্রহে তিনি সভাপতিত্ব করতে এগিয়ে গেলেন এই বয়সেই এবং নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। রাজনৈতিক ইতিহাসে এ-সব কথা লেখার জায়গা কই !

ঈশ্বরানুরক্তির পরেই শিবনাথের অন্তরে স্থান পেয়েছিল দেশপ্রেম। উপাসনার সঙ্গীতেও স্থান পেয়েছে তীব্র দেশপ্রেমমূলক প্রার্থনা।—'তব পদে লই শরণ। আর্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি, অবসন্ন আছে, অচেতন হে।' 'পুষ্পমালা' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বহুদূর নয়' কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে অবশ্য পাঠ্য।

শেষজীবন : শিবনাথের ধর্ম ও কর্মজীবনের একটা রূপরেখা এখানে অঙ্কিত হলো—তাঁর সাহিত্যিক ও অন্যান্য কর্মের কথা দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় যথাসাধ্য উল্লেখ করে শেষে আমরা তাঁর সমগ্র রচনার তাৎপর্য গ্রহণ করতে চাই। এবার তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ের কথা দিয়েই এখন এই জীবনী-সার আমরা সমাপ্ত করছি।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ শিবনাথের জীবনের উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই বছরের প্রথমেই তিনি মনোনীত হয়েছেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি। ৩রা জুন তারিখে প্রথমাপত্নী প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয়। অল্পদিনের মধ্যেই শিবনাথ আক্রান্ত হন কঠিন বহুমূত্ররোগে। শরীর ভেঙ্গে পড়ে। রুগ্ন শরীরেই আমৃত্যু ব্রাহ্মসমাজের সেবা করে গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নিস্তেজ অবসন্ন ভার তাঁর মনকে করত বিচলিত। কতবার দায়ী করতেন আপনাকে। ইতিহাস জানে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যেটুকু উন্নতি তা শিবনাথের প্রাণ-নিঙড়ানো প্রচেষ্টার মহৎ ফল। ভগ্নদেহে ১৯০৪ সালে দ্বিতীয়াপত্নী বিরাজমোহিনীকে নিয়ে দীর্ঘপ্রচার যাত্রায় বের হলেন– রুগ্ন শরীরে শেষ ব্রাহ্মসমাজের সেবা। ক্রমে জীর্ণ শরীর দুর্বলতর হলো। শেষ দৃশ্য হেমলতাদেবীর কথাতেই শোনা যায়— সংক্ষেপে শুধু বলা যায় ঃ

"৩০-এ সেপ্টেম্বর (১৯১৯) প্রাতঃকালে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আজ শিবনাথের জীবনে শেষ সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শহরে বার্তা ছড়াইয়া পড়িল, দলে দলে বন্ধুগণ, ভক্তগণ, শেষ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গৃহে সমবেত হইলেন। বাড়ীতে লোক আর ধরে না।

"সে গৃহে হাহাকার নাই— বিলাপ নাই, চক্ষের জলে সকলের বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল ! শয্যার দিকে সকলে চাহিয়া দেখেন যেন কোন যোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন ! মুখশ্রী শান্ত, সুন্দর, পবিত্র ও নির্মল।"

বারিদবরণ ঘোষ

শিবনাথের গুরুকীর্তন

পিতুঃ পিতামহো বৃদ্ধো ন্যায়লঙ্কারসংজ্ঞিতঃ।
সিদ্ধঃ শাক্তো রামজয়ো মগ্নো ধর্ম্মস্য সাধনে ॥
পিতাচ মে হরানন্দ স্তেজস্বী সত্যবাক দৃঢ়ঃ।
জননী গৃহিনী দক্ষা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী ॥
মাতামহী মম শ্যামা দয়াদ্রা সত্যধর্ম্মিনী।
মাতুলো দ্বারকানাথঃ স্বকর্ত্তব্যে দৃঢ়ব্রতঃ ॥
ঈশ্বরো বিধবাবন্ধুঃ কর্ম্মবীরঃ কৃপানিধিঃ।
প্রেমচন্দ্রঃ কবির্মগ্নঃ কাব্যাস্বাদরসামৃতে ॥
জয়নারায়ণঃ সাধুর্জ্ঞানসিদ্ধো তিমিঙ্গলঃ।
ধর্ম্মাত্মা দ্বারকানাথঃ কৃতধর্ম্মে দৃঢ়ব্রতঃ ॥
প্রসন্নো বিনয়ী বিদ্বান্ ধীমান্ স্বজনবৎসলঃ।
মহেশো ধার্ম্মিকো ধীরো গাম্ভীর্য্যে সাগরোপমঃ ॥
মহেন্দ্রো দৃঢ়নিষ্ঠস্তু সত্যধর্ম্মে সনাতনে।
বাল্যে নেতা ধর্ম্মগুরু রুমেশো জন্মতঃ শুচিঃ ॥
কালীনাথঃ শুদ্ধমতিরধ্যাত্মসাধনে রতঃ।
দেবেন্দ্রো ব্রহ্মবান্ ধীরো ব্রহ্মাস্বাদরসে রতঃ ॥
আদেশানুগতো ভক্ত কেশবো ব্রহ্মসেবকঃ।
কেশবানুচরা ভক্তা যোগ বৈরাগ্য ভূষণাঃ ॥
বিজয়াঘোরগৌরাশ্চ কান্তিচন্দ্রোদয়স্তথা।
প্রকাশো বিনয়ীভূতঃ প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
বৃদ্ধো রামতনুঃ সত্যে সুপ্রতিষ্ঠঃ সুনির্ম্মলঃ।
রাজনারায়ণঃ সাধু ভৃঙ্গো ভক্তি-সুধা-রসে ॥
শিবচন্দ্রো মিতাচার আত্মোন্নতিপরায়ণঃ।
নবীনো বিনয়াধারঃ শান্তঃ পরহিতব্রতঃ ॥
কালীনারায়ণো মগ্নো ভাবধর্ম্মরসামৃতে।
নির্ভীকঃ সত্যসংকল্পে দুর্গামোহন এব চ ॥
আনন্দমোহনো বন্ধু ব্রহ্মাপিতৃতনুঃ সুহৃৎ।
রামকৃষ্ণঃ শক্তিসিদ্ধো মাতৃভাবসমন্বিতঃ ॥
বিশ্বাসী বিনয়ী ভক্তো জর্জ্জশ্চ মূলারাত্মজঃ।
ন্যুমানঃ সত্যসন্ধিৎসুঃ সর্বৈবেকাশ্রয়ো ধিয়া ॥
ঋষির্ভক্ত স্তত্ত্বদর্শী মার্টিনো জ্ঞানদীক্ষিতঃ।
কববংশোদ্ভবা ফ্রান্সেস্ প্রেমিকানন্দ সংপ্লুতা ॥
ধর্ম্মে দৃঢ়মতিঃ সাধ্বী সোফিয়া কলেটাত্মজা।
এতে মে গুরবঃ সর্ব্বে যোষিতঃ পুরুষাশ্চ যে ॥
স্মৃত্বৈতান্ মহতীং শক্তিং লভেহং ধর্ম্মসাধনে ॥

[১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শিবনাথ এই গুরুকীর্তনটি রচনারম্ভ করেন। পরে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে উল্লিখিত পূর্ণরূপ ধারণ করে। প্রতিদিন সকালে উঠে তিনি এই গুরুকীর্তন উচ্চারণ করতেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আশ্রয়দাতা প্রভৃতি এদেশীয় ধর্মবন্ধুগণের সঙ্গে বিদেশী ধর্ম-সাধক-সাধিকারাও এই বন্দনায় স্থান পেয়েছেন। শিবনাথের চরিত্র এই সব বিভিন্ন জনের গুণের সমন্বয়ে গঠিত এবং এ থেকে তাঁর ধর্মবিষয়ে ঔদার্যটুকুও সবিশেষ লক্ষণীয়। একারণে গ্রন্থের প্রথমেই গুরুবন্দনা-সূচক শ্লোকটি উদ্ধৃত হল।—সম্পাদক]

স্বনামা পুরুষ

এদেশে একটা সংস্কৃত প্রবাদ বাক্য চলিত আছে স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ অর্থাৎ স্বনামা পুরুষই ধন্য। সচরাচর লোকে নিজের পরিচয় দিতে হইলে কার সন্তান, কোন্ গ্রামে বাড়ী এই সকল পরিচয় দিয়া থাকে।

দুই জন লোক পথে দেখা হইলে, "মহাশয়ের নাম, পিতার নাম, নিবাস কোথায়" এই সকল প্রশ্নই করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা নিজের কার্যের গুণে জগতে বিখ্যাত হন, তাঁহাদিগকে এরূপ করিয়া নিজের পরিচয় দিতে হয় না। নিজের নাম বলিলেই সকলে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে। এই সকল মানুষকে স্বনামা পুরুষ বলে। এইরূপ স্বনামা পুরুষ সকল দেশেই পাওয়া যায়। এবং এরূপ লোকের সংখ্যা যে দেশে যত অধিক সে দেশ তত উন্নত।

যাহার আত্মোন্নতির ইচ্ছা আছে, মনে প্রতিজ্ঞা আছে, ধর্মপথে মতি আছে, স্বাবলম্বন শক্তি আছে, ঈশ্বর তাহার সহায়। সে ব্যক্তি এ জগতে বড় হইবেই। কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এমন মানুষের জীবনচরিত পড়িতে সুখ হয়। বিশেষ যাঁহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মিয়া বাল্যকালে নানাপ্রকার কষ্টে দুঃখে থাকিয়া কেবল পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধুতার গুণে বড় হইয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ পড়িলে মন উন্নত হয়। আমরা এইরূপ কয়েকজন স্বনামা পুরুষের কথা কিছু বলিব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অর্থাৎ ১২৬ বৎসর পূর্বে তখনকার বর্ধমান জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে, রাজা রামমোহন রায় ভূমিষ্ঠ হন। তিনি অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। রামমোহন রায়ের মাতার নাম তারিণী দেবী ছিল, লোকে তাঁহাকে 'ফুলঠাকুরুণ' বলিয়া ডাকিত। লোকে বলে 'মায়ের গুণে ছেলে ভাল হয়'। কথাটা বড় ঠিক। রামমোহন রায়ের মা ফুলঠাকুরাণী বড় সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি ধর্মে কর্মে নিষ্ঠাবতী ও তেমনি তেজস্বিনী নারী ছিলেন।

রামমোহন রায় যে সময় জন্মিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এখনকার সময়ের* তুলনাই হয় না। তখন না ছিল রেলের গাড়ী, না ছিল ঘোড়ার গাড়ী, না ছিল ভাল পথ ঘাট, না ছিল এখনকার মত এত রকম সুখসুবিধা। শোনা যায় তখন হুগলি হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত যেন মানুষ কত দূরদেশেই যাইতেছে। আজকালকার ছেলেদের মত রামমোহন রায়ের লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা ছিল না। তখনকার লোক ইংরাজী পড়িত না, আরবী ও পারসী পড়িত। কারণ যদিও ইংরাজের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি সরকারী কাজকর্মে তখনও

* এই প্রবন্ধটি আনুমানিক ৭০ বৎসর পূর্বে লিখিত। ১৩০৭।

মুসলমানী আমলের ব্যবস্থা চলিতেছিল। আরবী পারসী জানিলে লোকের বড় বড় চাকরি হইত, তাই লোকে ছেলেদিগকে আরবী পারসীই পড়াইত। রামমোহন রায় যখন খুব ছোট, তখন তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। তখনই তাঁহার আশ্চর্য বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের পিতা খুব ছোটবেলা হইতেই তাঁহাকে আরবী ও পারসী পড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং ৯ বৎসর বয়সে উত্তমরূপে আরবী পারসী শিখিবার জন্য পাটনায় একজন মৌলবীর কাছে পাঠান। পাটনা সহরে তখন ঐ দুই ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান স্থান ছিল। রামমোহন রায়ের বুদ্ধি এমনি প্রখর ছিল যে পাটনায় দুই তিন বৎসরের মধ্যেই উত্তমরূপে আরবী পারসী শিখিয়া ফেলেন। এমন কি এরূপ কথাও প্রচলিত আছে যে তিনি ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এরিস্টটলের গ্রন্থের আরবী অনুবাদ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এরূপ শোনা যায় যে পাটনাতে আরবী ভাষাতে আদি কোরাণ গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বালক রামমোহনের মনে একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরাগ ও নানা দেবদেবীর উপাসনার প্রতি অনাস্থা জন্মে। পাটনা হইতে ১৫।১৬ বৎসরের সময় পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি খানাকুলের বাড়ীতে আসিলেন। তখন তাঁহার পিতা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, রামমোহন মধ্যে মধ্যে ঘর বন্ধ করিয়া একমনে কি লেখেন। তিনি নিজে পারসী ভাষা বেশ জানিতেন। একদিন পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তার বাক্স হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখেন যে পুত্র পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিয়া পারসী ভাষায় এক বই লিখিতেছে। তখন পিতা পুত্রে, তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ আরম্ভ হইল, কারণ রামকান্ত রায় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়কে অনেক বুঝাইলেন, অনেক শাসন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। বালক রামমোহন যে কোথায় গেলেন পিতামাতা বহু বৎসর আর তার উদ্দেশ পাইলেন না। পরে জানিতে পারা গিয়াছিল যে এই সময় তিনি পদব্রজে ভারতের নানা তীর্থে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময় পথ ঘাট ছিল না, পথে দস্যু তস্করের ভয় ছিল, হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল। তাহার মধ্যে একাকী বালক কিরূপে এত দেশ ভ্রমণ করিল? এইরূপ অনুমান করা যায় যে পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি সন্ন্যাসী-ফকিরদের সঙ্গ লইয়া থাকিবেন; সন্ন্যাসী-ফকিরেরা চিরদিন তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, তাহা হইলেও ১৬ বৎসরের বালক রামমোহনের এই দেশভ্রমণ নিতান্তই উপকথার মত বোধ হয়। তিনি যদি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে উপন্যাসের মত সেই গল্প আমরা পাঠ করিতাম।

এই সময়ে তিনি যে কেবল ভারতবর্ষের নানাস্থানে বেড়াইয়াছিলেন তাহা নহে, হিমালয় পার হইয়া তিব্বতদেশও গিয়াছিলেন। একবার ম্যাপ খুলিয়া দেখ, তিব্বত যাওয়াটা কি ব্যাপার। এখনও মানুষ সহজে তিব্বত যাইতে পারে না। অত্যুচ্চ হিমালয় পথে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া কোথায় পথ আছে তাহা সে দেশের লোক ভিন্ন কেহ জানে না। পাহাড়ের মাথায় অনেক হাজার

ক্ষুটের উপর দিয়া যাইতে হয়। শরীরে রক্ত জমিয়া যায়, পা কাটিয়া যায়, প্রাণ সংশয় হয়। ঐসব স্থলে চমরী গরু ভিন্ন বাহন কাজে আসে না, এরূপ কোন পথে বালক রামমোহন তিব্বত গিয়া থাকিবেন। কোন্ পথে গিয়াছিলেন তাহা এখন ঠিক বলিতে পারা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় পরে তিনি 'কৌমুদী' নামে যে বাঙ্গলা খবরের কাগজ বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে নাকি তাঁহার তিব্বতভ্রমণের বিবরণ বাহির হইয়াছিল তাহা এখন পাওয়া যায় না।

যাহা হউক যখন তিনি তিব্বত গিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি অনেক কষ্টে সেখানে গেলেন বটে কিন্তু সেখানে গিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বৌদ্ধধর্মের কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেখানকার লোক বিদেশী বালকের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইল। এরূপ শোনা যায় তিব্বতের মেয়েদের সাহায্যে অনেক কষ্টে প্রাণে বাঁচিয়া সেখান হইতে কোন প্রকারে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই কারণেই নাকি স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার চিরদিন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তিব্বত হইতে ফিরিয়া কাশীতে আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতামাতা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পিতার সাহায্যে কয়েক বৎসর কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামমোহন সংস্কৃতপাঠে মনোনিবেশ করিলেন; এবং হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্র সকল পাঠ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এরূপ শোনা যায়, তিনি রামমোহন রায়কে তাঁহার সম্পত্তির একাংশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় তাহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মা পুত্রের ধর্মমতের জন্য এতদূর বিরক্ত ছিলেন যে জ্ঞাতিগণের প্ররোচনায় তাঁহাকে বিষয়ে বঞ্চিত করিবার জন্য সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়কে অর্থাভাবে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালেক্টরের অধীনে দেওয়ানি করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে দেওয়ান রামমোহন বলিত। রামমোহন রায় নানা স্থানে জজের সেরেস্তাদারির কাজ করিয়া অবশেষে রংপুরে সেরেস্তাদারির কর্মে প্রতিষ্ঠিত হন। এখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের কাল হয়, এবং তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার পরামর্শ করেন। জ্ঞাতিদের হস্ত হইতে বিষয় উদ্ধারের জন্য এবং দেশের হিতসাধনে নিযুক্ত হইবার জন্য ১৮১৩ সালে বিষয়কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া তিনি কলিকাতায় আসেন।

এখানে আসিয়া তিনি নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে হাত দেন। প্রথম, কতিপয় বন্ধুকে লইয়া 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া ধর্মালোচনাতে প্রবৃত্ত হন; এবং উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে থাকেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তৎকালপ্রসিদ্ধ হিন্দুবিধবা-দিগের সহমরণপ্রথা নিবারণের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। তিনি সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রচার করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে ১৮২৯ সালে তদানীন্তন গভর্ণর

জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজবিধির দ্বারা সহমরণ নিবারণ করেন। ১৮১৭ সালে তাঁহার ও তাঁহার বন্ধু ডেভিড হেয়ার সাহেবের চেষ্টাতে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হয়। অপর দিকে তিনি বাঙ্গলা ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিবিধানে মনোযোগী হন। তিনিই ১৮২১ সালে 'কৌমুদী' নামে বাংলা সংবাদপত্র বাহির করিয়া সংবাদপত্র প্রকাশের পথ প্রদর্শন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পারসী ভাষাতেও একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতেন। কয়েকবৎসর পূর্বে কর্মকাজে থাকিবার সময় তিনি 'তুহ্‌তুল মোহ্‌দীন' নামক পারসী ভাষাতে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকা আরবী ভাষাতে লিখিয়াছিলেন। এই সময়েই একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তিনি ইংরাজীতে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা লইয়া ইংরাজ পাদরীদিগের সহিত তাঁহার বিচার উপস্থিত হয়। সেই বিচারকালে তিনি গ্রীক ও হিব্রুভাষা হইতে বচন তুলিয়া বিচার করেন। তিনি বাঙ্গলা, ইংরাজী, পারসী ও আরবী ভাষাতে সুন্দর লিখিতে পারিতেন; এবং হিব্রু গ্রীক বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার মত এত সুপণ্ডিত মানুষ বাঙ্গলাদেশের মধ্যে আর দেখা যায় নাই।

একদিকে যখন এইসকল বিচার চলিতেছিল তখন অপরদিকে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট একটি আইন করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। রামমোহন রায় প্রথমে সেরূপ আইন পাস হইবার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৩৫ সালে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল সার চার্লস মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আইন বিধিবদ্ধ করেন।

কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান কার্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। ১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র কলিকাতায় চিৎপুর রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সেখানে বন্ধুবান্ধব লইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। এইরূপে তিনি আমাদের সর্বপ্রকার উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের ছবি দেখিয়া তিনি বেশ সুন্দর ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বোধ হয় ইহা তাঁহার ঠিক ছবি নয়। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। যেমন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, তেমনি গৌরকান্তি; সুন্দর, উজ্জ্বল মুখশ্রী, প্রশস্ত ললাট, প্রকাণ্ড সুগঠিত মস্তক। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর বীরমূর্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বড় দুর্লভ। যেমন সুন্দর মূর্তি তেমনি আশ্চর্য বল তাঁহার দেহে ছিল। কি মানসিক, কি শারীরিক শক্তিসামর্থ্যে তাঁহার সমকক্ষ আজও কেহ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। তাঁহার আকৃতির মত প্রকৃতিও অতি সুন্দর ছিল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদিগকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। জননীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। রামমোহন রায়ের রমাপ্রসাদ ও রাধাপ্রসাদ নামক দুইটি পুত্র ছিল। তাহাদিগকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি যখন বিলাতে যান, তখন রাধাপ্রসাদ অত্যন্ত কাঁদিতেছিলেন, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিলেন, "পুরুষ বাচ্চা, কাঁদ কেন?" রাজারাম নামে

তাঁহার এক পালিত পুত্র ছিল। তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন এবং অকাতরে সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেন। ইহা ভিন্ন সকল বালকবালিকাকেই রামমোহন রায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাহাদিগকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ও খেলিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ছেলেরা দুলিবে বলিয়া বাগানের একটা গাছে দোলনা টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে ছেলেদের সঙ্গে তিনিও মাঝে মাঝে দুলিতেন। ছেলেদের দোলা শেষ হইলে নিজে দোলনায় বসিয়া বলিতেন, "এবার আমার পালা।" সকলে মহা আনন্দে তাঁহাকে দোল দিত। একদিন তিনি এই ভাবে দোলায় দুলিতেছেন, এমন সময় এক বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি মহাশয়? এ কি করিতেছেন?" রামমোহন রায় বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইব কি না, সমুদ্রে জাহাজ বড় দোলে, তাই আগে থেকে দুলিতে শিখিতেছি, তা না হইলে সমুদ্রপীড়ায় বড় কষ্ট পাইব।"

রামমোহন রায় বালকের মত সরল, অমায়িক এবং দয়ালু লোক ছিলেন। তিনি এদেশবাসীর জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যন্ত বড় মন না হইলে মানুষ অপরের জন্য ধন প্রাণ সকলই বিসর্জন করিতে পারে না।

দেশের গরীব প্রজাদিগের দুঃখে বিশ্বপ্রেমিক রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয় সর্বদাই কাঁদিত। তিনি সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া সুদূর বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতীয় প্রজাদিগের দুঃখবিমোচনের জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছেন। রামমোহন রায় আমাদিগের জন্য যে প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ে ধারণা করা যায় না। যেমন বিশাল হৃদয়, তেমনি আশ্চর্য বুদ্ধি ও মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল। তাঁহার কথা ভাবিলে তাঁহাকে কখনই সেই সময়ের লোক বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা বলিয়া ও যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার গুরুত্ব এখনও এ দেশের লোক বুঝিতে পারে নাই। শিক্ষার এই উজ্জ্বল আলোকময় দিনে দেখ দেখি কোথায় সংস্কৃত, বাঙ্গলা, আরবী, পারসী, উর্দু, ইংরাজী, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু ভাষায় এমন সুপণ্ডিত লোক দেখিতে পাও? তিনি অনর্গল সংস্কৃত, আরবী ও পারসী কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বেদবেদান্ত, উপনিষৎ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র সকল তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন। জানি না সর্বতোভাবে এবং সর্ববিষয়ে এমন আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ইয়ুরোপখণ্ডেই বা কয়জন জন্মিয়াছেন? সে দেশ ধন্য, সে জাতি ধন্য, যথায় রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় সকল বিষয়েই আমাদের নেতা। এ দেশবাসীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত হইয়া, দিল্লীশ্বরের কোন কোন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবেদন করিতে, দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে বিলাতে পাঠান। তিনিই রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দেন। ভারতের দুঃখী প্রজাদিগের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় আন্দোলন করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, তিনি পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন, রামহরি এবং দুই-একজন ভৃত্য লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। জাহাজে তাঁহার জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন স্থানে রন্ধন করিত। তিনি ক্যাবিনে বসিয়া আহার করিতেন। রামমোহন রায় কোনমতেই হিন্দু রীতিনীতি অতিক্রম করিতেন না। তথাপি তখনকার লোকে রামমোহন রায়কে নাস্তিক, পাষণ্ড বলিয়া গালি দিত এবং তাঁহার বিলাতযাত্রার কথা শুনিয়া দেশে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল।

জহুরীই মানিক চেনে! বিলাতের গুণগ্রাহী মহাত্মারা প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহার অসাধারণত্ব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু দুদিনের পরিচিত ব্যক্তিরা তাহার ভিতর এমন কি দেখিয়াছিলেন, যাহার জন্য ৫০ বৎসর ধরিয়া অতি সন্তর্পণে, অতি যত্নে, তাঁহার উপবীত, তাঁহার কেশ ও হস্তাক্ষর অমূল্য সম্পত্তির মত বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন? তাঁহারা রামমোহন রায়ের সেই বীরজনোচিত সুন্দর মূর্তিতে, এমন কি বিশেষত্ব দেখিয়াছিলেন, যে, তাহার মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া রক্ষা করিয়াছিলেন? ভাগ্যে, তিনি এদেশে দেহত্যাগ না করিয়া বীর-প্রসবিনী রত্নখনি ইংলণ্ড ভূমিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নচেৎ আমরা আজ কখনই তাহার উপবীত, কেশ এবং অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত তাঁহার সেই সুগম্ভীর মূর্তি দেখিতে পাইতাম না। আমাদিগেরই জন্য গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর মস্তিষ্কপ্রদাহ রোগে তিনি শয্যাগত হইলেন আর উঠিলেন না। ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ২॥ ঘটিকার সময় সকল শেষ হইল। ঘোর অন্ধকারময় ভারতাকাশের উজ্জ্বল তারকা সেদিন ব্রিস্টল সহরে চিরদিনের মত অস্ত গেল। ইংলণ্ডবাসী বন্ধুগণ কাঁদিলেন, কিন্তু যাহাদিগের জন্য খাটিয়া খাটিয়া তাঁহার সবল সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ পাত হইল, তাহারা একবার 'আহা'ও বলিল না। রামমোহন রায়ের মত এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন আর কে আছে।

রামমোহন রায় মৃত্যুর পূর্বে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন তাহাকে খৃস্টান বা অন্য কোন জাতীয় লোকের সহিত একই স্থানে সমাহিত করা না হয়। সেই জন্য তাঁহার বিলাতের বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্রিস্টল নগরে একটি উদ্যানে সমাহিত করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন ঐ স্থান হইতে তুলিয়া আরনোস ভেল নামক স্থানে তাঁহার দেহাবশেষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উপর নিজ ব্যয়ে এক সুন্দর সমাধিমন্দির নির্মাণ করেন। যাহোক, তাঁহার সমাধিমন্দির যে ইংরেজ বন্ধুদিগের দ্বারা নির্মিত হয় নাই, তাহার জন্য এদেশবাসিগণ চিরদিন দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কৃষ্ণদাস পাল

বাংলাদেশের একজন স্বনামা পুরুষের নাম কৃষ্ণদাস পাল। এই সহরের হ্যারিসন রোডের ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তার কোণে, যে প্রস্তরনির্মিত দণ্ডায়মান মূর্তি আছে, উহা ইঁহারই মূর্তি। ইনি অতি সামান্য অবস্থাতে জন্মিয়া নিজের চেষ্টায় বড়লোক

হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা বলিতেছি। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কলিকাতা সহরে তিলিবংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র পাল।

কলিকাতায় তিলিরা ব্যবসায়ী লোক। গভর্ণমেন্টের চাকুরীর জন্য ইঁহারা লালায়িত নন। ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া ইঁহারা অনেক টাকা উপার্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র পাল মহাশয়ের অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁহাকে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। কৃষ্ণদাস তাঁহার একমাত্র পুত্র। সেই একমাত্র পুত্রকে ভাল করিয়া পড়াইবার তাঁহার সাধ্য ছিল না। এখন ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারী নামে যে ইংরাজী স্কুলটি আছে তখন লোকে ইহাকে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল বলিত। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণদাস সেই স্কুলে ইংরাজী পড়িবার জন্য ভর্তি হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই স্কুলে পড়েন। তারপর হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ নামক এক নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে দুই বৎসর পাঠ করেন।

কলেজে পড়িবার সময় তিনি সমপাঠী বালকদের সঙ্গে জুটিয়া সভা করিতেন ও সেই সভাতে ইংরাজী রচনা লিখিয়া পড়িতেন এবং সর্বদা ইংরাজী বলিতে শিখিতেন। এরূপ শুনা যায় তাঁহার রচনাগুলি এমন সুন্দর ভাষায় লিখিত ও সুযুক্তিপূর্ণ হইত যে সকলে শুনিয়া চমৎকৃত হইত।

বিদ্যালয় ছাড়িয়া কৃষ্ণদাস পিতার কষ্টের লাঘব করিবার জন্য কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলেন; কিন্তু সহজে কোন কাজের যোগাড় হইল না। বৃথা দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। এ সময়েও কৃষ্ণদাস আপনার জ্ঞানোন্নতি করিতে বিরত হইলেন না। কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া ও অন্যান্য প্রকারে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পড়িতে লাগিলেন; এবং কোন কোনও ইংরাজী খবরের কাগজে লিখিতে লাগিলেন। সে সময়ে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এদেশে একজন লোক ছিলেন। ইনি 'হিন্দু পেট্রিয়েট' নামে একখানা ইংরাজী কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস তাহাতে লিখিতে লাগিলেন। ক্রমে লোকে তাঁহার বুদ্ধি-বিদ্যার কথা জানিতে পারিল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামক সভার সহকারী সম্পাদকের পদ পাইলেন। এই কাজ পাইয়া তিনি মনোযোগ-সহকারে সভার কাগজপত্র ও রাজনীতি সম্পর্কীয় গ্রন্থসকল পড়িতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সভাতে যেসকল বড়লোক ছিলেন, তাঁহাদের সহিত সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের মুখে শুনিয়া অনেক কথা শিখিয়া লইলেন। ক্রমে তিনি এমন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক লোক হইয়া উঠিলেন যে সকলেই সকল কাজে তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করা আবশ্যক বোধ করিতেন।

ওদিকে 'হিন্দু পেট্রিয়েট' কাগজের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ঐ কাগজ নানা হাত হইয়া অবশেষে কৃষ্ণদাস পালের হাতে আসিয়া পড়িল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ঐ কাজে ব্রতী করিলেন। কৃষ্ণদাসবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শাধীনে থাকিয়া দক্ষতার সহিত উক্ত কাগজ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এই কাগজে যাহা লেখা হইত, বড়লাট, ছোটলাট তাহা

মনোযোগপূর্বক পড়িতেন; এবং তাঁহারা অনেক বিষয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর পরামর্শ লইতেন। এইরূপে কৃষ্ণদাসবাবু ক্রমে ক্রমে দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন হইয়া উঠিলেন। দেশের কোনও বড় কাজ তাঁহাকে ছাড়িয়া হইত না। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির একজন প্রধান সভ্য ও বড়লাটের মন্ত্রিসভার একজন সভ্য হইলেন।

কিন্তু এইসকল গৌরব তিনি বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই দিবসে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের জন্যই তাঁহার পীড়া হইয়াছিল।

নবীনচন্দ্র রায়

আর একজন স্বনামা পুরুষের বিষয় কিছু বলিতেছি। ইঁহার নাম নবীনচন্দ্র রায়। ইঁহাকে বাংলাদেশের লোক বড় চেনে না। কিন্তু পাঞ্জাবের সকল ভদ্রলোকই ইঁহার নাম জানেন এবং ইঁহাকে স্মরণ করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদান করেন। কারণ ইনি পাঞ্জাবদেশেই জন্মিয়াছিলেন ও সেই দেশেই অধিক দিন ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রামমোহন রায়। প্রায় ৭০ কি ৮০ বৎসর পূর্বে ইঁহার পিতা কর্ম-উপলক্ষে বাংলাদেশ হইতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া মীরাট নামক নগরে বাস করেন। সেখানে অনুমান ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। বাল্যকালেই ইঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। পিতা এমত কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহাতে ইঁহার বিধবা মাতার ও ইঁহার ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। সুতরাং অতি শৈশবকাল হইতেই নবীনচন্দ্রকে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহার জননী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। সন্তানের শিক্ষার দিকে তিনি কিছুই মনোযোগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের মনে শৈশবকাল হইতেই শিক্ষালাভ করিবার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি লোকের বাড়ীতে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইয়া ও অপরাপর উপায়ে কিছু কিছু উপার্জন করিতেন ও তদ্দ্বারা অতিকষ্টে আপনার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। কিন্তু এরূপ করিয়াও অধিক দিন পড়াশোনা চালাইতে পারিলেন না। ১৪ বৎসর বয়সের সময় সামান্যরূপ ইংরাজী শিখিয়া স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইল এবং ১৬ টাকা বেতনের একটি চাকরি করিতে হইল। এই চাকরিটি পাইয়া বিধবা ও অনাথা মাতাকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন ভাবিয়া মনে অতিশয় আনন্দ হইল। যত জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল, ততই বুঝিতে পারিলেন যে, এ জগতে তাঁহাকে একা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে এবং এই দুঃখসংগ্রামে ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার সহায় কেহ নাই। ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রাণপণে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সকল কাজ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে মীরাট নগরে কুসঙ্গের অপ্রতুল ছিল না। চারিদিকের লোকের রীতি-নীতি অতিশয় জঘন্য ছিল। নবীনচন্দ্র সে সকলকে বিষের ন্যায় ত্যাগ করিলেন। তিনি কর্মকাজ করিয়া গৃহে আসিতেন ও আপনার জ্ঞানের উন্নতির জন্য

পাঠে মনোযোগ করিতেন। ওদিকে আপিসে তিনি আপন কর্তব্য কার্য এমন দক্ষতার সহিত ও এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন যে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার উপরিস্থ কর্মচারীরা অতিশয় প্রীত হইলেন। ক্রমেই তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তিনি একটি অধিক বেতনের কার্য পাইয়া সিন্ধুনদীর তীরবর্তী আটক নামক নগরে বদলি হইলেন। তখন দেশে রেলগাড়ী ছিল না, মীরাট হইতে আটকে যাইতে হইলে হয় উটে চড়িয়া না হয় একাগাড়িতে যাইতে হইত এবং যাইতে প্রায় একমাস লাগিত। নবীনচন্দ্র একা করিয়া আটক যাত্রা করিলেন। তিনি বদলি হইবার সময় শুনিয়াছিলেন যে আটকে তাঁহাকে হিসাবপত্রের কাজ অনেক করিতে হইবে। সুতরাং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে একাগাড়িতে যে একমাস থাকিতে হইবে সেই একমাসের মধ্যে অঙ্কবিদ্যাটা ভাল করিয়া শিখিয়া লইবেন। একাগাড়িতে যাইতে কিরূপ ঝাঁকুনি সহ্য করিতে হয়, তাহা যাঁহারা কখনও একায় চড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন। নবীনচন্দ্র অসীম সহিষ্ণুতার সহিত একাগাড়িতে বসিয়া বসিয়া আদ্যোপান্ত গণিতাঙ্ক ও অঙ্কসার বীজগণিত (এলজেব্রা) কষিয়া ফেলিলেন। আটকে যখন পৌঁছিলেন তখন অঙ্কবিদ্যাতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহার উপরিস্থ কর্মচারী বিস্মিত হইয়া গেলেন।

আটকে নবীনচন্দ্রের বেতনবৃদ্ধি হইল। বেতনবৃদ্ধি হইবামাত্র তিনি নিজ জননীর পরিচর্যার উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন এবং সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বেতন দিয়া একজন পণ্ডিত রাখিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাতে একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। কেবল যে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন তাহা নহে যোগী, সন্ন্যাসী, ফকিরদিগকে আদর যত্ন করিয়া বাড়ীতে আনিয়া তাঁহাদের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন। আটক হইতে বদলি হইয়া তিনি লাহোরে যান। এই সময়ে তাঁহার উপরিস্থ কর্মচারী একদিন তাঁহাকে বলেন, "তুমি যদি জমিজরিপের কাজ শিখিয়া লইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে একটা বড় কাজের ভার দেওয়া যায়।" নবীনচন্দ্র কোন কাজকেই অসাধ্য ভাবিতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ জরিপ সম্বন্ধীয় ভাল ভাল গ্রন্থ আনাইয়া পড়িতে লাগিলেন, ও নিজে জরিপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাস্তা, মাঠ জরিপ ও গৃহনির্মাণবিদ্যাতে এমন পারদর্শী হইলেন যে একজন পাকা ইঞ্জিনিয়ারের যে জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞান লাভ করিলেন।

তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই যথাসাধ্য পরোপকার করিবার চেষ্টা করিতেন। লাহোরে আসিয়া নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ পাঞ্জাববাসীদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিবার মানসে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া শিক্ষা-সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। ইহার অধীনে একটি ইংরাজী স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তাহা ভিন্ন এই সভাতে মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বক্তৃতা হইত। তিনি কেবল সভাস্থাপন করিয়া বিরত হইলেন না। এদিকে বঙ্গদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দ্বয়

যে কাজ করিয়াছিলেন সেই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ হিন্দীভাষাতে ভাল ভাল গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। অনেকে ইঁহার প্রণীত গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া মানুষ হইয়াছেন। কেবল শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতি করিয়া নিরস্ত হইলেন না, লোকের ধর্মভাবের উন্নতির জন্যও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। লাহোরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

লাহোর হইতে তিনি আরও অনেক স্থলে বদলি হইয়াছিলেন। যখন যেখানে যাইতেন, সেখানেই আপনার উন্নতি ও অপরের উন্নতির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ৯০০ টাকা বেতনে রাজপুতানা রেলওয়ের পেমাষ্টার হইয়াছিলেন। এই কাজ তখনকার দিনে এদেশের লোকে প্রায় পাইত না। এই কাজ করিবার সময় তিনি কর্ম ছাড়িয়া দিয়া পেন্সন লইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে মধ্য ভারতবর্ষে একটা গ্রাম লইয়া তাহাতে কতকগুলি দরিদ্র লোককে স্থাপন করিয়া নির্জনে বসিবেন ও তাহাদের উন্নতিসাধনে আপনার জীবনের অবশিষ্ট দিন যাপন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। অকালে ১৮৯০ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতানগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সে সমুদয় পাঠ করিয়া ইঁহার বিদ্যার গভীরতা জানিতে পারা যাইতেছে। ইঁহার মত ধার্মিক পুরুষ প্রায় দেখা যায় না। ইনি সর্বদা বলিতেন, জীবনে কোন বিপদে কখনও ভীত হই নাই। ঈশ্বরের উপরে একান্ত অন্তরে সর্বদা নির্ভর করিয়াছি।

রঙ্গনাথ শাস্ত্রী

গরীব ও অসহায় অবস্থা হইতে মানুষ কি করিয়া বড় হয়, তাহা দেখিতে ও শুনিতে ভাল লাগে, দেখিলে মন উন্নত হয়। আজ এরূপ একজন লোকের কথা তোমাদের বলিতে যাইতেছি। ইঁহার নাম রঙ্গনাথ শাস্ত্রী। ইনি মাদ্রাজ প্রদেশের একজন বড়লোক ছিলেন। কি কারণে ইঁহার জীবনচরিত বলিতে যাইতেছি, তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে।

মাদ্রাজ প্রদেশে চিত্তুর নামক সহরের নিকটস্থ কোন গ্রামে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রঙ্গনাথকে অল্প বয়সে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করেন। এমন শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহার মেধা এমন প্রবল ছিল যে, আট বৎসর বয়সেই তিনি এমন সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতভাষাতে কথাবার্তা কহিতে পারিতেন।

দশ বৎসর বয়সের সময় একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে তাঁহার জীবনের সমুদয় গতি বদলিয়া যায়। সে ঘটনাটি এই, তাঁহার পিতা ইংরাজ গভর্ণমেন্টের নিকট কিছু জমি ইজারা লইয়াছিলেন। সময়ে খাজনা দিতে না পারাতে সে সময়কার নিয়ম অনুযায়ী তিনি কারারুদ্ধ হন। যখন রঙ্গনাথের পিতা কারাগারে বাস করিতে

ছিলেন সে সময়ে তাঁহার পিতামহের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হয়। যথাসময়ে ও যথানিয়মে পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে না পারা হিন্দু গৃহস্থের পক্ষে বড় কষ্টের কথা। যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি কারাগারে রহিলেন, এখন উপায় কি? এই বলিয়া রঙ্গনাথের মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। জননীর চক্ষে জল দেখিয়া, বালক রঙ্গনাথের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যেরূপেই পারি পিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই বালক বাড়ী হইতে বাহির হইল। নিজের গ্রাম হইতে চিত্তুর পর্যন্ত হাঁটিয়া জজসাহেবের কুঠিতে গিয়া উপস্থিত। সে সময়ে ঐখানে যিনি জজের কাজ করিতেন তিনি বড় দয়ালু লোক ছিলেন। বালকের কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি বলিলেন, তোমার বাবাকে ছাড়িতে পারি, কিন্তু জামিন চাই, তোমার বাবা যদি ফিরিয়া না আসেন তবে কি হইবে? রঙ্গনাথ বলিলেন, আমি কথা দিতেছি আমার বাবা না আসিলে আমি আসিয়া কয়েদ থাকিব। বালকের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া জজের মনে আশ্চর্য বোধ হইল। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রঙ্গনাথের পিতাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু রঙ্গনাথকে বলিলেন, তুমি কাল প্রাতে আসিয়া আমাকে দেখা দিবে। রঙ্গনাথ পিতাকে লইয়া হাঁটিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মা তাঁহাকে কোলে করিয়া কতই আদর করিলেন।

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রঙ্গনাথের চিত্তুরে যাওয়া চাই। মায়ের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। জননী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু রঙ্গনাথ কোনও বাধা মানিলেন না। কোনও ওজর আপত্তি করিলেন না। তিনি যখন জজসাহেবকে কথা দিয়াছেন তখন যাইতেই হইবে। এই প্রতিজ্ঞায় ভর করিয়া তিনি আবার বাহির হইলেন ও হাঁটিয়া প্রভাত হইতে না হইতে চিত্তুরে জজসাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। জজসাহেব দ্বার খুলিয়া দেখেন, বারান্দাতে বালক রঙ্গনাথ বসিয়া আছে। দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন, তুমি বড় সত্যবাদী ছেলে, আমি ভারী খুসী হইয়াছি, তুমি ইংরাজী লেখাপড়া শেখনা কেন? আমি তোমাকে পড়িবার ব্যয় দিলে তুমি কি ইংরাজী পড়িতে পার? রঙ্গনাথ বলিলেন, পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। ইহাতে জজসাহেব আরও সন্তুষ্ট হইলেন।

রঙ্গনাথের পিতামাতা ইংরাজী পড়িতে অনুমতি দিলে, জজসাহেব নিজে রঙ্গনাথকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রঙ্গনাথের স্বাভাবিক ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল, যে কয়েক মাসের মধ্যে বেশ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেন। তৎপরে জজসাহেব তাঁহাকে মাদ্রাজসহরে পাঠাইয়া দেন। সেখানে রঙ্গনাথ আরও ইংরাজীবিদ্যায় উন্নতি করিলেন এবং সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি পান।

স্কুল হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন চিত্তুরে কর্ম করেন। তৎপরে মাদ্রাজে আসেন। কর্ম করিবার সময় তিনি যে কিছু সময় পাইতেন, তাহা বৃথা নষ্ট করিতেন না। তামিল, তেলেগু, কর্ণাটি, মহারাষ্ট্রি, হিন্দী, পারসী প্রভৃতি ভাষা শিখিছেন।

মাদ্রাজে আসিয়া তিনি আবার হাইকোর্টের ইন্টারপ্রিটারির কাজ পাইলেন। আদালতে আসামী ও সাক্ষীরা নানা ভাষায় কথা কহিলে, তাহা জজদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ইন্টারপ্রিটারের কাজ। সে কাজ তিনি এমন দক্ষতার সহিত করিতেন যে জজেরা তাঁহার প্রতি সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।

এই ভাবে কাজ করিবার সময় তিনি আরবী, লাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইসকল ভাষাতে তিনি কথা কহিতে পারিতেন।

অবশেষে তাঁহার কাজে প্রীত হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ছোট আদালতের জজের কর্ম দিলেন। তাঁহার পূর্বে এ দেশের কোনও লোক সে কাজ পায় নাই। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি অতিশয় প্রবল ছিল। এ কাজ পাইয়া তিনি এমন সুচারুরূপে বিচার করিতে লাগিলেন যে, লোকে অবাক হইয়া গেল। তাঁহার অপক্ষপাত বিচার দেখিয়া সকল শ্রেণীর লোক সন্তুষ্ট হইত।

এ কাজ করিয়াও তিনি যে সময় পাইতেন তাহা জ্ঞানোন্নতিতে দিতেন। তিনি একটি প্রকাণ্ড পুস্তকালয় করিয়াছিলেন, তাহাতে চতুর্দশ ভাষার প্রায় তিনহাজার উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল। এই সমুদায় পুস্তক তিনি পড়িয়াছিলেন ও পুস্তকের পাশে পেনসিলে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে দাগ তখনও ছিল।

অবশেষে ১৮৮০ সালে তিনি পেন্সন লইয়া কর্ম হইতে অবসৃত হন। অবসৃত হইয়া মাদ্রাজের গভর্ণরের মন্ত্রিসভার সভ্য হইয়াছিলেন। তখন গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া দেশের অনেক উপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালের জুলাই মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আমাদের বড় আশ্চর্য বোধ হয় যে সময় তিনি জন্মিয়াছিলেন, ও লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন সে সময়ে লেখাপড়া শিখিবার এত সুযোগ ছিল না, এত স্কুল কলেজ ছিল না, এত ভাল ভাল শিক্ষক ছিলেন না, উৎসহ দিবার লোক ছিল না। তারপর চারিদিকে এত কুসঙ্গ ছিল যে সহরে আসিলে ছেলেরা প্রায় কুসঙ্গে পড়িয়া খারাপ হইয়া যাইত। অথচ রঙ্গনাথ এই সকলের মধ্যে থাকিয়া এত ভাষা শিখিয়াছিলেন ও বড়লোক হইলেন, ইহার কারণ কি?

ইহার ভিতরে চারিটি কথা আছে। প্রথম কথা, বালককাল হইতেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অধর্ম পথে পা দিবেন না। কুসঙ্গীদের কথায় নিজের কাজ হারাইবেন না। দশ বৎসর বয়সের সময় যে সত্যবাদিতা গুণে তিনি জজসাহেবের প্রিয় হইয়াছিলেন, সেই সত্য ব্যবহার চিরদিন রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কথা, তাঁহার মনে আর একটি প্রতিজ্ঞা এই ছিল যে যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, জ্ঞানোন্নতি করিতে আলস্য করিব না। ভাল ভাল বই পড়িতে এত ভালবাসিতেন যে তাহা পাইলে আর কিছু চাহিতেন না। লোকে যেসকল খারাপ আমোদ প্রমোদ লইয়া থাকে, তাহা তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সে সময় ভাল ভাল বই পড়িয়া কাটাইতেন।

তৃতীয় কথা, তিনি সকল কাজ নিয়মে করিতেন। সময়ে খাওয়া, সময়ে শোয়া,

সময়ে ওঠা, সময়ে পড়া, সময়ে কাজ নিয়মমত করিতেন। এজন্য বিষয়-কর্ম করিয়াও পড়াশোনা করিবার জন্য এত সময় পাইতেন। অন্যে ভাবিয়া পাইত না তিনি এত কাজ কিরূপে করিতেন।

সর্বোপরি তিনি একটি কথা বড় বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি বলিতেন, শরীরটি আগে সুস্থ রাখা দরকার। এইজন্য বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া চারটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত ব্যায়াম করিতেন। তৎপরে অশ্বারোহণে কয়েক মাইল বেড়াইয়া আসিতেন। ইহার ফলে তাঁহার শরীর এমন সুস্থ ছিল যে, এত বৎসর রাজকার্য করিয়াও একটি দিনের জন্য কেহ তাঁহাকে শয্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখে নাই। দেহ সুস্থ সবল দৃঢ় ও কর্মক্ষম ছিল। উত্তম আহার করিতে পারিতেন ও অঘোরে ঘুমাইতেন।

যে কেহ পূর্বোক্ত নিয়মগুলি পালন করিবে, সেই তাহার ফল দেখিতে পাইবে।

জেমসেটজী তাতা

ধন উপার্জন করে অনেকে, কিন্তু পরোপকারের জন্য ধন ব্যয় করিতে সকলে পারে না। যাঁহারা পারেন তাঁহারা প্রশংসনীয়—আবার যাঁহারা পৈত্রিক ধনে ধনবান, ধন উপার্জন করিতে যাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তাঁহাদের অনেক সময়ে ধনে মায়া থাকে না, তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে অনেক টাকা দান করিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা শরীরের রক্ত জল করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ধন উপার্জন করিয়াছেন, তাঁহারা যদি মুক্তহস্তে দান করেন তবে তাহা আরও প্রশংসার বিষয়।

আমরা আজ এইরূপ একটি সদাশয় ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। বোম্বাই শহরের জেমসেটজী তাতা নামে একজন পার্সী ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি স্বীয় পরিশ্রমের গুণে সামান্য অবস্থা হইতে বড় হইয়াছিলেন, অনেক লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকে টাকা হইলে আর পরের ভাবনা ভাবে না, মনে করে আমিতো পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাই—কে মরিল, কে থাকিল, সে খবরে আমার কাজ কি? কিন্তু তাতামহাশয় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি সর্বদাই ভাবিতেন, দেশের কোন্ কাজটাতে টাকা লাগাইতে পারি। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারা সর্বদাই বলেন যে তাঁহার কাছে আধ ঘন্টা বসিলেই ঐ কথা ভিন্ন আর কথা থাকিত না। নানা কাজের নানা পরামর্শে তাঁহার মাথাটি পরিপূর্ণ ছিল। আবার তাঁহার যে কিছু পরামর্শ তাহা কাজের পরামর্শ ছিল। অনেক লোক দেখা যায় যাঁহাদের মাথায় নানাপ্রকার পরামর্শ আসে, কিন্তু সেসব আকাশে খড়ি পাতার ন্যায়, কাজে কিছু হইবার মত নহে—সেসব পরামর্শ শুনিতে বেশ ও কাগজে লেখা দেখিতে বেশ, কিন্তু কাজে লাগাইতে গেলেই দেখা যায়, কাজে লাগাইবার মত নহে। তাতামহাশয়ের পরামর্শ সেরূপ ছিল না। তিনি অনেক দিন কেবল এই ভাবিতে ছিলেন কি কাজ করা যায়। অবশেষে একদিন বঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রিয়ারের এক বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া শুনিলেন, আমাদের দেশে কার্যকরী শিল্পবিদ্যার

বিশেষ আবশ্যক। সেই কথাটা তাঁহার মনে লাগিল। তখন ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি একটা মস্ত ব্যাপার ফাঁদিয়া বসিলেন।

তোমরা হয়ত জান আমাদের দেশের অনেক যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. বা বি. এ, উপাধি লইয়া কর্মকাজের জন্য ধাঁ ধাঁ করিয়া বেড়ায়। লোকের দ্বারে উমেদারি করিতে করিতে তাহাদের পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া যায়। কোন্ কাজটা করিবে, কি করিবে, তাহা যেন, খুঁজিয়া পায় না। তারপর হয় মাষ্টারি, নয় ওকালতি, না হয় কেরানীগিরি করিয়া জন্ম কাটায়। অথচ এ দেশে বাণিজ্য, শিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতির দ্বার যে প্রকার খোলা আছে, সে প্রকার অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পেটের অন্নের চিন্তায় ও উপায়ের অভাবে মানুষ সে দিকে যাইতে পারে না। অনেকেই বি. এ., এম. এ. পাশ করিয়াই লেখাপড়া সাঙ্গ করে। আর কোন প্রকার উন্নতি থাকে না। তাতামহাশয় বসিয়া বসিয়া ভাবিলেন, যে যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া যাহাতে আরও উন্নতি করিতে পারে তাহার একটা উপায় করা ভাল। এজন্য তিনি নিজের দশলক্ষ টাকা দিয়া ও অনেক টাকা তুলিয়া একটা নূতন ধরনের কলেজ স্থাপন করিতে চাহিলেন। সেখানে যুবকগণ নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবে ও অর্থসাহায্য পাইয়া সকলপ্রকারের উন্নতিতে মনোনিবেশ করিতে পারিবে। যেই ভাবা অমনি কাজ করা। কিরূপে কার্য আরম্ভ করিলে ভাল হয় তাহা স্থির করিবার জন্য তিনি একজন ভাল লোককে ইয়ুরোপের নানাস্থানে পাঠাইলেন। তিনি তাতামহাশয়ের ব্যয়ে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল স্থানে গিয়া কোথায় কিরূপে কাজ চলিতেছে তাহা দেখিয়া আসিলেন। স্থির হইল যে বিলাত হইতে বহুব্যয়ে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-শিক্ষক আনাইয়া এ দেশীয় যুবকগণকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে তাহারা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের এবং দেশীয় দ্রব্যদ্বারা দেশীয় বস্তু প্রস্তুত করিতে পারেন।

গভীর দুঃখের বিষয় এই, এই মহৎ উদ্দেশ্য কাজে পরিণত হইবার পূর্বেই তাতা-মহাশয় এ লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি কাজে পরিণত করিবার ভার গভর্ণমেন্টের হাতে যায়। তাতার ন্যায় প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী মানুষ পাওয়া কঠিন।

আনন্দমোহন বসু

একবার একজন ভদ্রলোক পাঁচছয় বৎসরের ছেলেকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুই কেবল খেলা করিস, তোর পড়াশুনাতে মন নাই, তুই লেখাপড়া শিখতে পারবি না। ইহাতে ছেলেটীর বড় অপমান বোধ হইল। ছেলেটি বলিল, দেখো আজ থেকে কেমন পড়ি। যে কথা সেই কাজ। তার পরদিন হইতে সে ছেলে লেখা পড়াতে এমনি মন দিল যে, কালে সেই ছেলে বাঙ্গলাদেশে লেখাপড়াতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিল। ইঁহার নাম কি জান? ইঁহার নাম আনন্দমোহন বসু। ইঁহার গুণের কথা সকলে জানেন না, এইজন্য ইঁহার গুণের কথা কিছু বলিতেছি।

আমাদের এই বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি নামে একখানি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে পদ্মলোচন বসু নামে একজন বিষয়ী লোক বাস করিতেন। আনন্দমোহন বসু তাঁহার মধ্যম পুত্র। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা বিষয়কর্ম উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহসহরে বাস করিতেন। বাল্যকালে ইঁনি সেখানে গিয়া পিতার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকালে ইঁহার একজন জেঠাত ভাই ইঁহাকে লেখাপড়ায় অমনোযোগের জন্য তিরস্কার করিয়া পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন এবং শিশু আনন্দমোহন পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। দাদার নিকট তিরস্কার খাইয়া আনন্দমোহন এমনি মনোযোগ দিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন যে, নয় বৎসর বয়সের সময় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়া ইংরাজী স্কুলে পড়িতে গেলেন। ইনি যে শ্রেণীতে যান সেই শ্রেণীতেই সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হন এবং প্রতি বৎসরই ডবল প্রমোশন পান। এমন বুদ্ধি শক্তি কেহ কখনও দেখে নাই। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন, কিন্তু পরীক্ষার পাঁচ মাস পূর্বে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সেজন্য ইঁহাকে প্রায় তিন মাস ঘরে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পড়াশুনা ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই, তথাপি এনট্রান্স পরীক্ষা সমুদায় বাঙ্গালাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পাইয়া আঠার টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু অপরাপর ছেলেরা যেমন স্কুলপাঠ্য বই কয়খানি পড়ে, বাহিরের বই বড় একটা পড়ে না, আনন্দমোহনের স্বভাব সেরূপ ছিল না। শুনিয়াছি ময়মনসিংহে থাকিতে ইতিহাস পড়িবার জন্য তাঁহার এত অনুরাগ ছিল যে সেখানকার জেলা স্কুলের লাইব্রেরীতে যত) ভাল ভাল ইতিহাসের বই ছিল, সমুদয় পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া তাঁহার পড়াশুনার আরও সুবিধা হইল। কলিকাতার অনেক ছেলে কেবল আমোদ-প্রমোদে দিন কাটায়, কুসঙ্গীদের সঙ্গে জুটিয়া কত মন্দ কাজ করিতে শিখে, আনন্দমোহন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি মন্দ কাজের ধারেও যাইতেন না। আপনার লেখাপড়া লইয়া সর্বদা থাকিতেন। তাহার ফল এই হইল যে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি এল. এ. পরীক্ষা দিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম হইলেন। কলিকাতার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পূর্বে এত ছোট ছেলে এত বড় পরীক্ষাতে এত উচ্চ স্থান অধিকার করে নাই। সকল কলেজের ছেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এমন বুদ্ধিমান ছেলে প্রায় দেখা যায় না। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে আনন্দমোহন বি. এ. পরীক্ষা দিলেন, তাহাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম হইলেন। কেবল তাহা নহে অঙ্কে এত নম্বর রাখিলেন যে, দেখিয়া পরীক্ষকসাহেবদের তাক লাগিয়া গেল, সকলের মুখেই সেই কথা শুনা যাইতে লাগিল। তখন তিনি রাস্তা দিয়া যাইলে ছেলেরা পরস্পর বলাবলি করিত ঐ রে ভাই আনন্দমোহন বোস অঙ্কে এত নম্বর পেয়েছে। তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

যখন অঙ্ক বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন, তখন তাঁহার কাগজ দেখিয়া পরীক্ষকেরা অবাক। ডিগ্রী দিবার সময় ভাইস-চ্যান্সেলারসাহেব তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আনন্দমোহন, তুমি অঙ্কে যেরূপ উত্তর দিয়াছ বিলাতের প্রসিদ্ধ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রও তাহা অপেক্ষা ভাল উত্তর দিতে পারিত না। প্রেসিডেন্সী কলেজের সে সময়কার অধ্যক্ষ ম্যাটক্লিশ সাহেব তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি এম. এ. পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাহাকে উক্ত কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অঙ্কের প্রফেসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ২১ বৎসরের বালকের পক্ষে এত বড় একটা কলেজের প্রফেসারি কর্ম পাওয়া ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রফেসারি করিতে করিতে পরবৎসরই তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির পরীক্ষা দিলেন ও সেই সর্বোচ্চ বৃত্তিটি পাইলেন। তাঁহার পরে আরও অনেকে ঐ বৃত্তি পাইয়াছেন। তাঁহারা ঘরে বসিয়া ঐ টাকাগুলি সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দমোহন তাহা করিলেন না, তিনি সেই বৃত্তি পাইয়াই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানকার বড় পরীক্ষা দিতে তাঁহাকে গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষে থাকিতে তাঁহার গ্রীক ও লাটিন জানা ছিল না। কিন্তু তাহাতেও তিনি দমিলেন না। অধ্যবসায়ের গুণে ঐ দুই ভাষা শিখিয়া লইলেন। শিখিয়া ১৮৭৪ সালে সেখানকার 'র‍্যাঙ্গলার' নামক সর্বোচ্চ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। পরীক্ষকগণ বলিয়াছিলেন যে নূতন করিয়া গ্রীক ও লাটিন না শিখিতে হইলে তিনি হয়ত সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

বাল্যকাল হইতে আনন্দমোহন সৎসাহসী। কেম্‌ব্রিজে হার্ডিঞ্জ নামক একটি ছাত্র তাঁহার সহিত একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন। দুইটি দুষ্টবালক এই হার্ডিঞ্জকে নানাপ্রকারে জ্বালাতন করিত, কখন কখন তাহাকে প্রহার পর্যন্ত করিত। একদিন আনন্দমোহন তাহা দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া সেই অত্যাচারী বালক দুইটিকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, সেইদিন হইতে আর কখনও তাহারা হার্ডিঞ্জকে জ্বালাতন করিতে সাহস করিত না। সেই হার্ডিঞ্জ সিভিলিয়ান হইয়া পরে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন ময়মনসিংহে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ, তখন কোন এক সভাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক উপরি উক্ত ঘটনাটি ব্যক্ত করেন।

আনন্দমোহন একদিকে র‍্যাঙ্গলার হইলেন অপরদিকে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক, ইংরাজ ছেলেরা গ্রন্থকীটের ন্যায় কেবল পড়া লইয়া থাকিতে ভালবাসে না, তাহারা খেলাধূলা করিতেও ভালবাসে। তাহারা পড়িবার সময় খুব পড়ে এবং খেলিবার সময় খুব খেলে, ইহাতে তাহাদের শরীর ও মন দুই সুস্থ থাকে। আনন্দমোহন কেম্‌ব্রিজে যে শ্রেণীতে পড়িতেন, সেই শ্রেণীতে বালকেরা দলবদ্ধ হইয়া বন্দুক ছোঁড়া শিখিত। আনন্দমোহন তাহাতেও পিছুপা ছিলেন না। তিনি বন্দুক ছোঁড়া বিষয়ে এমন দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন যে,

দলের ছেলেরা তাঁহাকে 'মার্কসম্যানের' পদ দিয়াছিলেন। বন্দুক ছোঁড়াতে অগ্রগণ্য না হইলে এ পদ কেহ পায় না।

এ ত গেল আনন্দমোহনের লেখাপড়ার পারদর্শিতার প্রশংসা, কিন্তু এ বিষয়ে অদ্বিতীয় হইলেও এ প্রশংসাটা তাঁর সামান্য। তাঁর চরিত্রের প্রশংসাই তাঁর সর্বোচ্চ প্রশংসা। আমাদের সেকালের একটা কথা প্রচলিত আছে। সে কথাটা এই বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্ অর্থাৎ বিদ্যা বিনয় আনিয়া দেয়। আনন্দমোহনকে আমরা তাহাই দেখিয়াছি, এমন বিনীত, এমন শিষ্ট, এমন সাধুচরিত্র ব্যক্তি আমরা ইংরাজীশিক্ষিত লোকের ভিতর অল্পই দেখিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি তিনি সাত বৎসর বয়সের সময় একবার নিজ মাতার সঙ্গে কাশীতে গিয়াছিলেন। যাইবার সময় পথে একজন আত্মীয়ের সহিত তাঁহার কথোপকথন হয়। উক্ত আত্মীয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আমাদের সঙ্গে কাশীতে যাইতেছ তুমি কি বর চাহিবে? তিনি বলিলেন, বর আবার কি চাহিব? বালক আনন্দমোহন বলিলেন, তবে তুমি এত কষ্ট করিয়া যাইতেছ কেন? তখন সেই আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কোন বর চাহিতে যাইতেছ? আনন্দমোহন বলিলেন, হাঁ আমি বিদ্যা ও ভক্তি বর চাহিতে যাইতেছি। বিধাতা বালকের সেই আন্তরিক প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিদ্যা ও ভক্তি দুই তাঁহার চরিত্রে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষে আনন্দমোহন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এত বৎসর পরিশ্রমের পর দেশে আসিয়া লোক কিছুকাল বিশ্রাম সুখ ভোগ করে, কিন্তু আনন্দমোহনের বিশ্রাম নাই। তিনি দেশের জন্য খাটিতে বড় ভালবাসিতেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশে পৌঁছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন' নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। তারপর যে কত ভাল কাজে হাত দিয়াছেন, কত ভাল কাজ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলিতেছি, তিনি তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া রাজনীতির আলোচনার জন্য 'ভারত সভা' নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নামে এক বোর্ডিংস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরে বেথুন কলেজের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বালকদিগের জন্য সিটি কলেজ স্থাপন করিলেন। সেই কলেজকে তিনি সাধারণের সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বহু বৎসর ইহার সভাপতি থাকিয়া ইহার সকল কাজ চালাইয়াছেন। ওদিকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোরূপে মনোনীত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। একবার বড়লাট লর্ড রিপন বাহাদুর এ দেশের শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্য, কয়েক ব্যক্তিকে বিশেষ ভার দেন, তখন তিনি আনন্দমোহনকেও সেই দলে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। তিনি তাহার মধ্যে থাকিয়া সে কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ছোটলাটের সভার সভ্য হইয়া দেশের আইন ভাল করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যাহাতে

দেশে সুরাপান রহিত হয়, লোকের নীতি বিশুদ্ধ হয়, সেজন্যও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অধিক আর কি বলিব, তাঁহার সময়ের অধিকাংশ পরোপকারে ও স্বদেশের উন্নতিসাধনে গিয়াছে। এজন্য তাঁহার নিজের ব্যারিস্টারি কাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যদি তিনি স্বদেশের উন্নতিসাধনে এতটা মনোযোগী না হইতেন, তাহা হইলে হয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার মন ছিল না। এমন কি নিজের পুত্র দুইটিকে রাখিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। অন্য লোক হইলে এত বৎসরের গুরুতর পরিশ্রমের পর বিদেশে গিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিত। একটু বিশ্রামসুখ ভোগ করিত, কিন্তু আনন্দমোহন তাহা পারিলেন না। এদেশে ইংরাজদিগের শাসনকার্যে যেসকল অন্যায় হইতেছে, তাহা সে দেশের লোককে বলিবার জন্য সহরে সহরে ঘুরিয়াছেন। যেখানে গিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া লোকে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে। বিলাতের লোকদিগকে এমন করিয়া আকর্ষণ করা সহজ কথা নহে। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সেখানকার অনেক প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। সভাসমিতিতে লোক জড় করিবার জন্য সভার উদ্যোগকারিগণ আনন্দমোহনের প্রতিকৃতি ছাপিয়া রাস্তায় রাস্তায় বিলি করিয়াছেন। কোন কোন স্থানের লোকেরা সমবেত হইয়া তাঁহাকে পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার জন্যও বদ্ধপরিকর হইয়াছে। দেশের কাজে তিনি এত খাটিয়াছেন যে তাঁহার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

রামতনু লাহিড়ী

তোমরা এখন* দেশে চারিদিকেই ইংরাজী স্কুল দেখিতেছ। হাজার হাজার ছেলে সেখানে গিয়া প্রতিদিন পড়িয়া আসিতেছে, কিন্তু ৮০ বৎসর পূর্বে এরূপ ছিল না। দেশে একটিও ভাল ইংরাজী স্কুল ছিল না বলিলেই হয়। কলিকাতাতে ফিরিঙ্গী সাহেবরা দুই-একজন, দুই-একটি স্কুল করিয়া ছেলেদিগকে একটু ইংরাজী পড়িতে ও বলিতে শিখাইতেন, আর কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর নামক শহরে কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনারী সাহেব ছিলেন, তাঁহারা দুই-একটি স্কুল করিয়া একটু ইংরাজী শিখাইতেন এই মাত্র। তখনকার গভর্ণমেণ্ট এ দেশের লোককে ইংরাজী শিখান আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহারা সংস্কৃত, আরবী ও পারসী প্রভৃতি শিখাইবার চেষ্টা করিতেন এবং সেজন্য সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোক ইংরাজী শিখিবার জন্য পাগল ছিল।

সে সময়ে ডেভিড হেয়ার নামে একজন স্কটলণ্ডদেশীয় লোক কলিকাতাতে ঘড়ির

* এই প্রবন্ধটি আনুমানিক ৬০ বৎসর পূর্বে লিখিত। ১৩০৫।

ব্যবসা করিতেন। এই ঘড়িওয়ালা হেয়ার সাহেবের হৃদয় খুব উদার ছিল। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত মিলিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে এ দেশের লোকদিগকে ইংরাজী শিখাইতে হইবে। প্রধানতঃ হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে ১৮১৮ কি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। উহার উদ্দেশ্য কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করা। তখন হেয়ার সাহেবের নাম দেশে এমনি প্রচার হইল যে, হেয়ার সাহেব পাল্কীতে করিয়া বাহির হইলেই গরীব ছেলেরা "সাহেব আমাদের পড়ার সুবিধা করিয়া দিন", "সাহেব আমাদের পড়ার সুবিধা করিয়া দিন" বলিয়া তাঁহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত। ১৮২৬ কি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি তের-চৌদ্দ বৎসরের ব্রাহ্মণের ছেলে হেয়ার সাহেবের পাল্কী ধরিয়া ছুটিত। সাহেব বালকটির আগ্রহ দেখিয়া মনে করিলেন, দেখা যাক ইহার আগ্রহটা কত? এই ভাবিয়া তাহার কথা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না কিন্তু ঐ বালকটি ছাড়িত না। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিত। এইরূপ প্রায় একমাস কাল পাল্কীর সঙ্গে ছোটার পর, সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার লেখাপড়ার প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, এস তোমাকে আমার স্কুলে বিনা বেতনে ভর্তি করি।" এই বলিয়া স্কুল সোসাইটির স্কুলে তাহাকে ভর্তি করিলেন। এই স্কুলের নাম হেয়ার স্কুল হইয়াছে।

এই বালকটির নাম রামতনু লাহিড়ী। এমন মানুষ আমাদের দেশে কম জন্মিয়াছেন। নদীয়া জেলার প্রধান শহর গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। এই শহরে নদীয়ার রাজারা পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা চিরদিন গুণী লোকদের আদর করিয়া থাকেন, এজন্য কৃষ্ণনগর এককালে অনেক গুণীলোকের বাসভূমি হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের নাম বাঙ্গালাদেশে সর্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিল। বারেন্দ্রশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ পরিবার কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন, তাঁহাদের পদবী লাহিড়ী। লাহিড়ীবংশের অনেকে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে কর্ম করিতেন। এই বিখ্যাত বংশে অনুমান ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামতনু জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্যরূপ লেখাপড়া করিয়া ইনি ইংরাজী শিখিবার জন্য কলিকাতায় স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট আসিয়া বাস করেন। শুনিয়াছি রামতনুবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতামাতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। দেশ হইতে পিতার পত্র আসিলে তিনি অগ্রে সেই পত্র ভক্তিভরে মস্তকে রাখিতেন, তৎপরে খুলিয়া পাঠ করিতেন। আর তিনি নাকি আপনার মাতাকে দেবতার আসনে বসাইয়া, তাম্রকুণ্ডে তাঁহার পদদ্বয় স্থাপিত করিয়া, পুষ্প ও চন্দন দিয়া পূজা করিতেন। শুনা যায় তাঁহার মা ইহাতে এত ভয় পাইতেন যে কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রকে বলিতেন, "কর কি? আমার যে গা কাঁপে, নারায়ণের তাম্রকুণ্ডে আমার পা রেখ না।" পুত্র বলিতেন, "মা, তুমিই আমার নারায়ণ।" এমন বংশে যাঁহার জন্ম, গুরুর প্রতি ও সাধুজনের প্রতি তাঁহার কত ভক্তি হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। গুরু ও সাধুজনের প্রতি বাল্যকাল হইতেই রামতনু লাহিড়ীর অতিশয় ভক্তি দেখা দিয়াছিল।

যখন রামতনুর বয়স সতের বৎসর তখন তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে তখনকার হিন্দু কলেজে আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব তখন সেই শ্রেণীতে পড়াইতেন। ইঁহার মত ছাত্রবৎসল উপযুক্ত শিক্ষক এ দেশে আর দেখা যায় নাই। ডিরোজিও সাহেব 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে জ্ঞান ও নীতি. বিষয়ে অনেক আলোচনা হইত। ছেলেরা উৎসাহের সহিত যোগ দিত। রামতনু-বাবুও এই ডিরোজিও সাহেবের শিষ্য ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় স্কুল হইতে বাহির হইয়া শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম হিন্দুস্কুলে, তৎপরে বর্ধমান, উত্তরপাড়া, রসাপাগলা, বরিশাল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অনেক দেশের স্কুলে তিনি শিক্ষকতা কার্য করিয়াছিলেন। যখন তিনি বর্ধমান স্কুলের হেডমাষ্টার, তখন স্কুলের একখানি ম্যাপ হারাইয়া যায়। রামতনুবাবুর সন্দেহ হইয়াছিল, স্কুলের ভৃত্য ম্যাপখানি চুরি করিয়াছে। কিন্তু রামতনুবাবু ভৃত্যকে কিছু বলেন নাই। অবশেষে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখা গেল এক আলমারির পাশে ম্যাপ-খানি পড়িয়া আছে। তখন অকারণে ভৃত্যর উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া রামতনুবাবুর মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি নির্দোষ, তবু আমি অকারণে তোমাকে সন্দেহ করিয়াছি, আমাকে মাপ কর। ভৃত্য অবাক। রামতনুবাবু এমনি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন বালকদিগের নীতি ও চরিত্রের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যাহাতে তাহারা সত্যবাদী, সাহসী ও পরোপকারী হয় তাহা দেখিতেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরু ডিরোজিও সাহেবের প্রকৃত শিষ্য ছিলেন।

বৃদ্ধাবস্থাতে তিনি পেন্সন লইয়া নানাস্থানে বাস করিতেন। সে অবস্থাতে আমরা অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার যে সাধুতা দেখিয়াছি তাহা আর বর্ণনা করিবার নহে। এমন সত্যবাদী, সাহসী অথচ বিনয়ী লোক দেখি নাই। একটি বালকের মুখে একটি ভাল কথা শুনিলেও তিনি মুগ্ধ হইতেন। আপনার শিক্ষক ডিরোজিও, সহাধ্যায়ী রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতিকে চিরদিন মনে দেবতার মত পূজা করিতেন। ইঁহার কাছে বসিলে নানা সৎবিষয়ের কথা শুনিতে শুনিতে মন উন্নত হইত। উঠিয়া যাইবার সময় মনে হইত, যেরূপ মানুষটি আসিয়াছিলাম, তাহার চেয়ে ভাল লোক হইয়া যাইতেছি। এমন সাধু মানুষ আমাদের জ্ঞানে আমরা আর দেখি নাই। ইঁহার বিষয়ে একজন বাঙ্গালী কবি বলিয়াছেন—

যাঁর সঙ্গে একদিন করিলে যাপন
সাতদিন থাকে ভাল পাপাসক্ত মন।

একথা সত্য। আমরা অনেকে ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি। ইনি ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

ম্যাক্স মুলার

আজ তোমাদিগকে একটি মহাত্মার বিষয় বলিতে যাইতেছি, যিনি বিদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ইঁহার ন্যায় আমাদের প্রাচীন বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত লোক অল্পই দেখা গিয়াছে। অধিক কি, বর্তমান সময়ে এ দেশের লোকের যে স্বদেশের প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে, অনেকে যে স্বদেশের যাহা কিছু ভাল ছিল, তাহার জন্য গৌরব করিতে শিখিয়াছেন, তাহার অনেকটা ইঁহারই চেষ্টার ফল।

ইঁহার নাম ম্যাক্স মুলার। পূর্বপুরুষের নাম যেমন হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেই ভক্তির সহিত উচ্চারণ করে, আত্মীয় স্বজনের নাম যেমন করিতে ভাল লাগে, পরমাত্মীয় বন্ধুর নাম যেমন শুনিতে মিষ্ট বোধ হয়, এই নামটি আমাদের নিকট তেমনি। তিনি এখন জীবিত নাই। বাঁচিয়া থাকিতে তিনি আমাদিগকে যেসকল ভাল কথা শুনাইতে ছিলেন তাহা আর আমরা শুনিব না, কিন্তু এই নামটি আমাদের হৃদয়ের অতি উচ্চস্থানে তোলা রহিল। এদেশের লোক চিরদিন ইঁহাকে ভক্তিভাজন পূর্ব-পুরুষদিগের একজন বলিয়া স্মরণ করিবে।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীদেশে ইঁহার জন্ম হয়। জার্মানীদেশে পণ্ডিতগণের মধ্যে সংস্কৃতবিদ্যার আদর আছে। তাঁহাদের এক একজন সংস্কৃতবিদ্যায় এতদূর পারদর্শী হইয়াছেন যে আমাদের দেশে সেরূপ পণ্ডিত খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

ম্যাক্স মুলারের পিতা উইলিয়ম মুলার একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃতকাব্যের অনুরাগী ছিলেন এবং মনোযোগপূর্বক সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলস্বরূপ একুশ বৎসর বয়সে (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি বাহির হয়।

ইহার পর তিনি জার্মানীর প্রধান নগর বার্লিনে গিয়া সংস্কৃতভাষা ও দর্শনগ্রন্থ আরও শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে বপ্ নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং শেলিং নামে একজন প্রসিদ্ধ দর্শনবিৎ সেখানে বাস করিতেছিলেন। সেসকল মহাপণ্ডিতের চরণে বসিলে মানুষের জ্ঞানে অনুরাগ জন্মে। ম্যাক্স মুলার ইঁহাদের চরণে বসিয়া অনেক শিক্ষা করিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গেল। সংস্কৃতবিদ্যাতে আরও পারদর্শী হইবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল হইল। তখন তিনি বার্লিন ত্যাগ করিয়া ফরাসীনগরের রাজধানী প্যারীনগরে গমন করিলেন। সেখানেও একজন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম ইউপিন বর্নুফ। বর্নুফের সংস্রবে আসিয়া ম্যাক্স মুলারের মনে এক মহাসংকল্পের উদয় হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন আমাদের দেশের প্রাচীনতম ঋগ্বেদ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। কিন্তু তাহা বহু বৎসরের কাজ ও বহুব্যয় সাধ্য। সে ব্যয় দেবে কে? অবশেষে কতিপয় বন্ধু সহায় হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে লিখিয়া তাহাদের ব্যয়ে উক্ত গ্রন্থ

মুদ্রিত করা স্থির করিলেন। এই মহাসংকল্প হৃদয়ে লইয়া ম্যাক্স মূলার ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড নামক প্রসিদ্ধ নগরে আসিয়া বাস করিলেন। অক্সফোর্ডে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, নগরটি তাহার নামেই প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন অক্সফোর্ডে জগদ্বিখ্যাত এক পুস্তকালয় আছে, তাহাকে বডলিয়ান লাইব্রেরী বলে। এই সকল সাহায্য পাইবার আশাতে ম্যাক্স মূলার সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়া ১৮৪৯ হইতে ঋগ্বেদ প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। প্রথম গ্রন্থখানি ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। শেষ গ্রন্থখানি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই ২৪ বৎসর যে এই বেদ প্রকাশের জন্য তাঁহাকে কিরূপ খাটিতে হইয়াছে, তাহা ভাষাতে বর্ণনা হয় না। তাহাতে যে কি পাণ্ডিত্য, কি সদ্বিবেচনা, কি জ্ঞানানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে তাহা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতে হয়। কেবল কি তাহাই? এই সময়ের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও হিন্দুদিগের গুণাবলী বিষয়ে আরও এমন কতকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিলেন, যাহাতে জগতের সভ্য জাতিসকলের চিন্তাতে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইল। আগে সকলে ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীদিগকে অসভ্য ও বর্বর মনে করিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। ম্যাক্স মূলার তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতে শিখাইলেন; তাঁহারা যে কত বড় ছিলেন, তাহা দেখাইয়া দিলেন। অধিক আর কি বলিব, ১৮৪৯ সালে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া অবধি ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি বোধ হয় একদিনের জন্যও বিশ্রাম করেন নাই। বৎসরের পর বৎসর একটি না একটি বড় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা দেখিয়া জগতের লোক চমৎকৃত হইয়াছে। সেসকল গ্রন্থের উল্লেখ করিতে গেলে এই পুস্তকের অনেক পৃষ্ঠা লাগিবে। সুতরাং তাহা আর করিব না।

যেজন্য তিনি আমাদের হৃদয়ের এত প্রিয় হইয়াছেন, তাহা এই, তিনি ভারতবর্ষের লোককে বড় ভালবাসিতেন। ইংরেজরা এ দেশের লোককে গালাগালি দিলে তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। তিনি সেজন্য একখানা পুস্তক লিখিলেন, তাহার নাম 'হোয়াট ইণ্ডিয়া ক্যান টীচ আস্' অর্থাৎ আমরা ভারতবর্ষের নিকট কি শিখিতে পারি? এদেশের কোন যুবাপুরুষ অক্সফোর্ডে গেলে ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। এ দেশের অনেক লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল। অধিক কি, তিনি এ দেশে না আসিয়াও যেন এ দেশে বাস করিতেছিলেন।

ভারতকীর্তি

পরের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের কাজ। জগদীশ্বর যাহাকে যে কিছু শক্তি দিয়াছেন সে যদি তাহা খাটায় ও আলস্যে দিন না কাটায় তবে সে কিছু করিয়া তুলিতে পারে। এ জগতে যত লোক বড় হইয়াছেন, সকলেই নিজের উপর নির্ভর করিয়া ও নিজের শক্তি খাটাইয়া বড় হইয়াছেন। যে ব্যক্তির জ্ঞানলাভে রুচি নাই বা যে শ্রম করিতে কাতর, সে কখনও এ পৃথিবীতে কোনও বড় কাজ করিয়া তুলিতে

পারে না। তুমি যদি হাত-পা গুটাইয়া ঘরে বসিয়া এই বলিয়া দুঃখ কর," আমাকে কেহ দেখিল না, আমাকে কেহ সাহায্য করিল না, আমাকে কেহ পথ ছাড়িয়া দিল না, আমি কাজের সুবিধা পাইলাম না, আমার বিদ্যাশিক্ষা বৃথা গেল, আমার জীবনটা অকর্মণ্য হইয়া রহিল।" তবে তোমাকে চিরদিনই ঐরূপ বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে হইবে। আর তাহা না করিয়া যদি উঠিয়া দাঁড়াও, কোমর বাঁধ, বল, "দেখি একবার আমার সাধ্য কতটা হয়, আমি ঐ ভিড়ের ভিতর ঠেলিয়া অগ্রসর হইবই হইব। আমার দেহমনে যে শক্তি আছে, তাহা কাজে লাগাইবই লাগাইব নতুবা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইব।" তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার দুঃখ করিবার কারণ থাকিবে না; তুমি একটা কিছু করিয়া তুলিতে পারিবে। আমাদের দেশের একজন প্রাচীন কবি বলিয়াছেন, 'উদ্যোগি নং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী', অর্থাৎ লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষের নিকটেই গমন করেন। উদ্যোগী পুরুষের অর্থ যাহার উৎসাহ ও অধ্যবসায় আছে। উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের গুণে কি হয় তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

আমরা এতদিন* এই বলিয়া দুঃখ করিতেছিলাম, যে আমাদের দেশের লোকে লেখাপড়া শিখিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ স্বাধীনভাবে একটা বড় কাজ করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। বিজ্ঞানের কোনও একটা নূতন বিষয় বাহির করিলেন, ইতিহাসের এমন কোনও একটা নূতন কথা বলিলেন, যাহা অপর দেশের লোকেরা আগ্রহের সহিত শুনিল এমন দেখা যাইতেছে না। দেশের শিক্ষিত লোকেরা পরের কথাই পড়িতেছেন, অপরের চিন্তা লইয়াই কাজ করিতেছেন। সুখের বিষয় এতদিনের পর আমাদের সে দুঃখটা দূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা স্বাধীনভাবে নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর নাম সকলের নিকটেই পরিচিত। ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাড়িখালগ্রামনিবাসী পরলোকগত ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র। ভগবানবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিতেন। জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ করিতেন। অতি অল্পবয়সেই ইনি এরূপ বড় কাজ করিয়াছেন যে ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে ইঁহার যশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইনি নিজের বুদ্ধিবলে নিজের চেষ্টাতে তাড়িতের প্রকৃতি ও নিয়ম নির্ণয় করিবার এমন এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া বিলাতের বড় বড় পণ্ডিতেরা অবাক হইয়া গিয়াছেন। বিলাতের বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের একটি মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু তাহাতে উপস্থিত হইয়া সভাতে নিজের আবিষ্কৃত প্রণালীর কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। দেখিয়া উপস্থিত পণ্ডিতদিগের সকলেই একবাক্যে তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

* এই প্রবন্ধটি আনুমানিক ৬০ বৎসর পূর্বে লিখিত। ১৩০৭

আরও সুখের কথা এই যে, কেবল এক জগদীশচন্দ্র বসু নয়, পরমেশ্বরের কৃপাতে এদেশে আরও এরূপ লোক দেখা দিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধে একটি নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া দেশ বিদেশে পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। একি সামান্য আনন্দের কথা!

আরও কয়েকজন ভারতবাসী বিলাতে গিয়া এ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাহাদের বিষয় কিছু কিছু বলা যাইতেছে। তোমরা হয়তো শুনিয়া থাকিবে যে বিলাতে সিবিল সার্বিস নামে প্রতি বৎসর একপ্রকার পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষাতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা এ দেশে ম্যাজিস্ট্রেট, কলেক্টর, কমিশনার প্রভৃতি বড় বড় পদ পাইয়া থাকেন। এই পরীক্ষা বড় কঠিন ও অতি অল্প লোকই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এ দেশ হইতে দুই-একটি ছেলে মধ্যে মধ্যে বিলাতে গিয়া এই পরীক্ষা দিয়া থাকে ও তাহাদের কেহ কেহ উত্তীর্ণ হয়। অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বাঙ্গালী যুবক এই সিবিল সার্বিস পরীক্ষাতে সর্বপ্রথম হইয়াছেন। ৬১ জন শিক্ষিত ইংরাজ যুবক তাঁহার নীচে পড়িয়াছে। বিলাতে গিয়া সেখানকার সুশিক্ষিত যুবকদিগকে পরাস্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কেবল তাহাই নহে, অতুলচন্দ্র এত নম্বর পাইয়াছেন যে, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী যুবক অনেক নীচে পড়িয়াছেন। এই অতুলচন্দ্র শান্তিপুরনিবাসী পরলোকগত রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি দরিদ্রতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়।

তারপর রণজিৎ সিংহজী ক্রিকেটখেলাতে পরিপক্ব। এজন্য ইংরাজগণ তাঁহাকে আপনাদের দলে লইয়াছেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, রণজিৎ সিংহের ন্যায় পাকা খেলোয়াড় নাই। সুতরাং ইংরাজগণ তাঁহাকে আপনাদের কাপ্তেন করিয়াছেন। ঐ দলের একটি বড় খেলায় রণজিৎ সিংহ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরাজেরা খেলাধূলা ভালবাসেন, সুতরাং রণজিৎ সিংহের জয়লাভে তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছেন। ইংরাজেরা খেলাধূলা এত ভালবাসেন যে, রণজিৎ সিংহের কীর্তি জগদীশচন্দ্র বসু ও অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কীর্তিকেও কাণা করিয়া দিয়াছে। বিলাতের সাধারণ লোকে বলিতেছে—"কে বলে ভারতবর্ষের লোক কোনও কার্যের নয়? যে দেশটা আমাদিগকে হারাইবার জন্য রণজিৎ সিংহের মত লোক পাঠাইতে পারে সে দেশের দ্বারা অনেক মহৎ কাজ হইতে পারে।" অতএব রণজিৎ সিংহজীও আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস নামে একজন বাঙ্গালী যুবক, আমেরিকার ব্রেজিল দেশে সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া লেফ্‌টেনান্টের পদ পাইয়াছেন ও আশ্চর্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন কোকিল ডাকিলে আমরা বলি বসন্ত আসিতেছে, তেমনি এই সকল চিহ্ন দেখিয়া বলিতেছি এ দেশের জন্যে এক নূতন দিন আসিতেছে।

ছোটদের গল্প

লক্ষ্মীনারাণ

লক্ষ্মীনারাণ এক বামনের ছেলে। দেহটি কুস্তির পালোয়ানের মত, কিন্তু মাথাটি যেন একটি ছোট হুঁকার খোল। কাজেই লক্ষ্মীনারাণের বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম। কিন্তু তার মা সেকথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'আমার লক্ষ্মীর পেটে-পেটে বুদ্ধি আছে, বয়স হলে ফুটবে।' কবে যে লক্ষ্মীর বয়স হবে তাহা তো বুঝিতে পারা যায় না; দেখিতে দেখিতে বিশ-বাইশ বৎসর হইয়া গেল, তবুও লক্ষ্মীর বয়স হইল না; সে সংসারের কোনো কাজেই আসিল না। কাজের মধ্যে গরুর খড় কাটে ও প্রাতে গরুগুলিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া নাড়িয়া বাঁধে। বলিতে কি লক্ষ্মীনারাণ ঐ গরুগুলিকেই অনেকটা আপনার মত দেখিতে পায়; এবং ঐ গরুগুলির সঙ্গেই তার যা বনে। নতুবা পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় সে পাড়ায় বাহির হইতে পারে না। বাহির হইলেই যেমন কাকের পিছে ফিঙ্গে লাগে, তেমনি ছোঁড়ারা তার পিছে লাগে; এবং বিধিমতে তাহাকে জ্বালাতন করে। পিছন দিক দিয়া আসিয়া তাহার কাছা খুলিয়া দেয়, তার হুঁকার খোলের মত মাথাটিতে ঠোকর মারে, তার দুই বাঁধে হাত দিয়া লাফাইয়া ঘোড়া-চড়ার মত তার পিঠে চড়িয়া বসে। কারণ লক্ষ্মীনারাণকে ক্ষেপাইতে সকলে ভালবাসে; সে ক্ষেপিলে খোনা নাকে, যেসব গালাগালি দেয় ও তার আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ দাঁড়ায় তা দেখিলে হাসিয়া পেটের নাড়িতে ব্যথা হয়।

লক্ষ্মীনারাণ বোকা বলিয়া তার পিতা তাকে একেবারেই আমলে আনেন না। তাকে বাদ দিয়া সংসারের কাজ করেন; কোনো কাজের ভার তার উপর দেন না। এজন্য পতি-পত্নীতে বড় বিবাদ হয়। লক্ষ্মীর মা বলেন, 'একআধটু সংসারের ভার না দিলে ছেলেটা মানুষ হবে কি করে? তোমরা ওকে চেন না, ও আমার মনে করলে দশ টাকা আনতে পারে।'

লক্ষ্মীর পিতা বলেন, হাঁা যা নয় তাই, ওকে আবার কাজের ভার দেব? ওটা কি মানুষ?'

লক্ষ্মী যখন এই সকল কথা শোনে, তখন মায়ের বাক্যে সায় দিয়া মনে-মনে ভাবে, আমি কি না করতে পারি। লক্ষ্মী কিন্তু সংসারের একটা কাজ করে, গরু দুহিয়া থাকে।

একবার বাড়ীতে একটা কাজ উপস্থিত। দশ জন লোক খাবে। সকাল-সকাল প্রথম বাজারে যাইতে পারিলে ভাল জিনিস পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন কাহাকে বাজারে পাঠান। তিনি নিজে নানা কাজে পড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। লক্ষ্মীর মা বার-বার বলিতেছে, 'একটু বেলা হলে না হয় তুমি যেও, এখন না হয় লক্ষ্মীকে পাঠাও না কেন?'

কর্তা মহাশয় দুই-চারিবার বলিলেন, 'হাঁা লক্ষ্মী যাবে, ও গিয়ে করবে কি?' কিন্তু শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, 'লকে, লকে এদিকে আয়;

এই একটা টাকা নিয়ে বাজারে যা : আট আনার মাছ কিনে কারু হাতে পাঠিয়ে দিস ; তারপর প্রথম হাটে ভাল তরি-তরকারি যা পাবি কিনে আনিস।'

আজ লক্ষ্মীনারাণকে দেখে কে? টাকাটি টাঁাকে গুঁজিয়া, দুই হাত দুলাইয়া গরবে-গরবে পা ফেলিয়া বাজারের দিকে চলিল। পথে যদি বালকেরা ডাকে, 'কিরে লকে কোথায় যাচ্ছিস?' উত্তরই দেয় না, ফিরেও তাকায় না, যদি কেহ ভদ্রভাবে বলে, 'কি ভাই লক্ষ্মীনারায়ণ কোথায় যাচ্ছ?' তবে উত্তর দেয়, 'বাঁজারে যাঁচ্ছি, মাঁছ কিনতেঁ।' ঘটনাক্রমে লক্ষ্মীনারাণ যেই বাজারে উপস্থিত অমনি এক মেছুনি এক চুপড়ি কৈ মাছ আনিয়া নামাইল। খুব বড়-বড় কৈ দেখিয়া লক্ষ্মীর জিভে জল আসিল। একথা না বলিলেও সকলের বোঝা উচিত যে লক্ষ্মীনারাণ আর কিছু না পারুক, খাইতে বেশ পারিত এবং দেখিয়াছে মা তাহাকে বড়-বড় কৈ মাছের ঝোল করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসেন। সুতরাং কৈ দেখিয়াই লক্ষ্মীর মনে হইল কৈ মাছ কিনিতে হবে। লক্ষ্মী জেলের মেয়েকে বলিল, 'আঁট আঁনার কৈ দাঁও', এই বলিয়া টাকাটি তাহাকে দিল। মেছুনি যাহা দিল তাহা লইয়াই লক্ষ্মী চলিয়া যায়, আট আনা যে ফিরিয়া লইতে হইবে সেদিকে খেয়াল নাই! জেলের মেয়ে নিজের গরজে ডাকিয়া ভাঙানি পয়সা ফিরাইয়া দিল। তখন লক্ষ্মী বলিল, 'তাঁই তো তরি-তঁরকারি কিনিতে হঁবে।' এখন মাছগুলি বাড়ীতে পাঠাইতে হইবে। কাকে দিয়ে পাঠাবে? লক্ষ্মী চেষ্টা করিলে বাজারের চেনা চাষালোক ঢের পাইত যাহাদের কাহাকেও দুইটা পয়সা দিলে বাড়িতে পৌঁছাইয়া আসিতে পারিত। লক্ষ্মী যখন কোনো কর্তব্য নির্ধারণ করিতে বসিত, তখন যদি কোনো একটি বিষয় স্মরণ হইত, তাহা হইলেই অনেক সময় বিপদ ঘটিত। তখনি একটা নূতন আজগুবি বুদ্ধি যোগাইত, এবং সে তৎক্ষণাৎ কাজে তাহা না করিয়া থাকিতে পারিত না। তার এই উদ্ভাবনী শক্তিতে সময়ে-সময়ে মুশকিল বাঁধাইত। তাহার প্রমাণ এখনি পাইবে। সে দেখিল মাছগুলি জীয়ন্ত আছে। অমনি স্মরণ হইল যে উজুইয়ের কৈ কানে হাঁটিয়া জল হইতে ডাঙায় উঠে। সেই কথা স্মরণ হইয়া হঠাৎ এক নূতন বুদ্ধি তাহার মনে যোগাইল। তাদের বাড়ি হইতে বাজার পর্যন্ত একটি খালের মত ছিল। সে ভাবিল মাছগুলি খালে দিলে তো আমাদের ঘাটে উঠিতে পারে। অমনি সে খালের জলে মাছগুলি ছাড়িয়া দিয়া বলিল 'সোঁজা আঁমাদের ঘাটে গিঁয়ে উঠবি।'

মাছ তো পাঠানো হইল। তারপর লক্ষ্মী বাজারে প্রবেশ করিল। যেই প্রবেশ করা অমনি দেখিল, এক কুম্ভকার এক বাজরা কলিকা নামাইতেছে। স্মরণ হইল যে গৃহে ক্রিয়াকর্ম হইলে হুঁকা প্রভৃতি কেনা হয়। পিতা তরি-তরকারী কিনিতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারাণের শাস্ত্রে কলিকাগুলিও তরি-তরকারির মধ্যে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ আট আনা দিয়া এক বোঝা কলিকা কিনিয়া লোকের মাথায় দিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। আজ সে পিতাকে পরাস্ত করিবে। দেখাইবে সে কেমন কাজের ছেলে, তাই আবেগে চলিয়াছে। পথে যদি কেহ ডাকে বা দাঁড়াইতে বলে, দাঁড়ায় না, বলে, 'আঁমি বাঁজার কঁরে যাঁচ্ছি, ধঁরে বাঁজ আছে।'

বাড়িতে পৌঁছিয়া তার কি দশা হইল, সকলেই বুঝিতে পার। ঘরের কাজকর্ম কোথায় রহিল। পতি-পত্নীতে ঘোর বিবাদ বাঁধিয়া গেল।

ইহার পরে লক্ষ্মীনারাণের পিতা আর তাকে কোনো কাজকর্মের ভার দিতেন না। আবার বহুদিন কাটিয়া গেল, আবার একবার গৃহে কাজকর্ম উপস্থিত। অনেকগুলি লোক খাওয়ানো হইবে। তৎপূর্বদিন গোয়ালাকে আট আনা বায়না পাঠাইয়া আধ মণ দই পাঠাইবার জন্য বলিতে হইবে। পিতা ভাবিলেন এত বাজার করা নয়, কেবল গোয়ালার বাড়িতে গিয়া আট আনা পয়সা দিয়া আসা বৈ তো নয়, তা কি আর লক্ষ্মীনারাণ পারিবে না? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি লক্ষ্মীনারাণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'লকে! এদিকে আয় তো। এই আট আনার পয়সা অমুক গোয়ালাকে দিয়ে বলে আয় কাল প্রাতে আধ মণ দই দিতে হবে।'

আবার লক্ষ্মীনারাণের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আট আনা পয়সা পকেটে গুঁজিয়া বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে রাজাদের একটা হাতি আসিতেছে। হাতি দেখিয়া লক্ষ্মীনারাণের হাতি চড়িতে বড় সাধ হইল। মাহুতকে বলিল, 'মাঁহুত হাতি চঁড়াবি?'

মাহুত দেখিল বোকা বামনের ছেলে, জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দিবে?'

লক্ষ্মীনারাণ বলিল, আঁট আঁনা দিঁব।' মাহুত ভাবিল বেশ তো উপরি লাভ জুটিল। সে তৎক্ষণাৎ হাতি বসাইয়া লক্ষ্মীনারাণকে উপরে তুলিয়া লইল। হাতি যখন চলিতে আরম্ভ করিল তখন যদি লক্ষ্মীনারাণের ভাব কেহ দেখিত তখন নিশ্চয় হাসিয়া পাগল হইত। রাজপুত্রই বা কোথায়? এমনই গৌরবে বসিয়াছে। পথে বালকদের কোলাহল, 'ওরে ভাই! লকে হাতির উপর চলেছে। ওরে লকে! হাতির উপর কি করে চড়লি?' লক্ষ্মীনারাণ কাহারও কথা শুনিতেছে না, কোনো দিকে দেখিতেছে না। কেবল আপনাকে রাজপুত্র ভাবিতেছে। তার ছোট মাথাটি একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে।

মাহুত কিয়দ্দূর গিয়া লক্ষ্মীনারাণকে নামাইয়া দিল। তখন দৈ-এর বায়নার কথা লক্ষ্মীনারাণের মনে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি তার উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্য, একটু ভাবিয়াই এমন একটা কৌশল বাহির করিল, যাহা শুনিলে, তোমরা তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে অনেকবার দেখিয়াছিল যে মা দুধে তেঁতুল দিয়া ঘরে দৈ পাতেন। সেই কথাটা স্মরণ করিয়া মনে-মনে একটি উপায় স্থির করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পর ভাঁড়ার হইতে তেঁতুল লইয়া গোয়ালে প্রবেশ করিয়া সমুদয় গরুকে তেঁতুল খাওয়াইয়া দিল।

রাত্রে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে লকে, গোয়ালার বায়না দিয়েচিস তো?' লক্ষ্মী উত্তর দিল, 'হঁবে হঁবে, উঁয় পাঁও কেন? ঠিক সময়ে পেলেই তো হঁল।' পরদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ জমিতে লাগিলেন। বাজার হইতে সন্দেশ প্রভৃতি আসিল, দৈ আর আসে না। পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। 'ওরে লকে! দই কৈ? বায়না দিয়েছিস তো?' শেষে লক্ষ্মীনারাণ বিরক্ত হইয়া

জননীকে বলিল, 'আঁ তোঁমরা জালাতন কঁরে তুললে। ভাঁড়টা দাঁও তোঁ দৈঁ দুয়ে আনি।' শুনিয়াই তো জননী অবাক। বলিল, 'দৈ দুয়ে আনবি কিরে ?' লক্ষ্মী উত্তরে বলিল, 'ওঁগো কাঁল রাত্রে সঁব গঁরুকে তেঁতুল খাঁইয়ে রেখেছি।'

বুঝিতেই পার ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল। গৃহকর্তা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। দাঁতে দাঁত ঘষিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীনারাণকে ও তাহার মাতাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'ওরে হতভাগা, ওরে লক্ষ্মীছাড়া, আট আনা পয়সা যে দিলাম তার কি করলি ?'

এত গালাগালিতে লক্ষ্মীনারাণের বড়ই ক্রোধের উদয় হইয়াছে। সে এক-একবার হাতি চড়িবার বিষয় স্মরণ করিতেছে অমনি রাজপুত্রের ভাবটা মনে আসিয়া পড়িতেছে। শেষে সে আর গালাগালি সহ্য করিতে না পারিয়া গম্ভীরভাবে গৃহের বাহির হইয়া পিতাকে বলিল, 'যাঁ কঁরেছি তাঁ তোঁমার জঁন্মেও কঁরো নি।'

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি, করেছিস কি ?'

উত্তরে লক্ষ্মী বলিল, 'তোঁমার চোঁদ্দ গঁণ্ডা পুরুষেও তাঁ কঁরে নি।'

পিতা তবু বলিলেন, 'ওরে হতভাগা! কি করেছিস বল না ?' লক্ষ্মী বলিল, 'যাঁও যাঁও মুখ খাঁরাপ কঁরো না বঁলছি, রাজপুত্রে যাঁ কঁরে তাঁ কঁরেছি।'

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রাজপুত্রের কাজটা করলি ?'

উত্তরে লক্ষ্মীনারাণ বলিল, 'আমি হাতি চঁড়েছি।' এই বলিয়া রাজপুত্রের মত গরবে-গরবে পা ফেলিয়া ঘরের ভিতর গেল।

রাগের সাজা

রাগ করিয়া দুই-এক বেলা মা-বাপের ভাত বাঁচাইয়া দেয় নাই, এমন ছেলে অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদের নিকট রাগের বড় আদর, কথায়-কথায় রাগ। কথায়-কথায় রাগ, ছুতায়-নাতায় রাগ। তোমাদিগকে যে বালকটির কথা বলিতেছি, তাহার নাম বিপিন। বিপিন সর্বদাই রাগের উপর থাকে। এমন সৃষ্টিছাড়া রাগ কখনো দেখি নাই। সৃষ্টিছাড়া কেন বলিলাম শুনিবে ? বিপিনের গা গরম সত্ত্বেও যদি কেহ ভালবাসার সহিত বলিল, 'তোমার গাটি কিছু গরম।'

বিপিন অমনি রাগিয়া বলিল, 'থাক আমার গা গরম। তোমাকে আমার গায়ের ধারে আসিতে কে বলিল ? সরিয়া যাও।' নিরীহ বালকটি অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

বিপিন লিখিতে বসিয়াছে, দোয়াতে কালি কিছু কম, কলমে বেশি উঠিতেছে না, বিপিন রাগ করিয়া দোয়াতের উপর ঠক-ঠক করিয়া দু'চারিটি ঘা দিয়া কলম বেচারির মুখ ছেঁচিয়া দিল। পড়িবার সময় বইয়ের পাতা সহজে উল্টাইতে পারিল না। এমন জোরে টান দিল, যে দুর্বল পুস্তক সে দর্প সহিতে পারিল না, ছিঁড়িয়া গেল।

একদিনকার একটি ঘটনার কথা বলিতেছি। বিপিন সেদিন তরকারি মনের মত হয় নাই বলিয়া ভাতের উপর রাগিল। বিপিন রাগিলে অন্ধ হয়, চোখ

দুটি যেন জবাফুলের মত লাল হয়। মুখের উপর লাল বর্ণ শিরাগুলি খাঁড়া হইয়া উঠে, শরীর কাঁপিতে থাকে, ঘন নিঃশ্বাস বয়, তখন আর বিপিনকে চেনা যায় না। সে কিম্ভূতকিমাকার ভাব ধারণ করে। বোধ হয় সে সময় বিপিনের মুখের সামনে একখানা আয়না ধরিলে সে মূর্তি দেখিয়া বিপিন নিজেই ভয় পায়। রাগের সময় তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। কি করিবে, কাহার উপর রাগিবে তাহার ঠিকানা করিতে পারে না। বিপিন ভাত রাখিয়া উঠিল, তাহার মা কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিছুতেই রাগ পড়িল না। তাহার খুড়ো তাহাকে কোলে করিয়া ভাতের ধারে বসাইলেন, কত খোশামোদ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'বাবা, তরকারি খারাপ হইয়াছে, তুমি তরকারি খাইও না, দুধ দিয়া খাও, দুধের উপর রাগ কেন? তোমার মা একলা মানুষ, অত রাগ করিলে কি চলে?'

কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালিয়া লাভ কি? মরুভূমিতে জল দাঁড়াবে কেন? এত সাধ্য-সাধনাতেও কোনো ফল হইল না। সে রাগ কিছুতেই পড়িল না। তখন খুড়া মহাশয় কিছু গরম হইয়া বলিলেন, 'বিপিন নিজে চেয়ে না খেলে তাকে যেন আজ ডেকে ভাত দেওয়া না হয়।'

বিপিন রাগের ভরে গোঁ-গোঁ করিতে করিতে ঘর কাঁপাইয়া বাহিরে গেল। পথে-পথে বাগানে বাগানে এ-গাছতলায় ও-গাছতলায় সমস্ত দিন কাটাইল। রোদের রাগের সঙ্গে-সঙ্গে বিপিনের রাগও পড়িয়া আসিল। ক্ষুধায় শরীর আনচান করিতে লাগিল। কি করে? আজ তাহাকে কেহ ডাকে না, বড়ই দায় হইল। বিপিন মনে করিতে লাগিল কাকের মুখে সম্বাদটি পাইলে সোনামুখে ভাত কয়েকটি খাইতাম। ক্ষুধার ঘোরে বিপিন চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লগিল, সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। পূর্বেও বিপিনের শরীর একবার কাঁপিয়াছে, এ কিন্তু সে কাঁপা নয়। বিপিন এখন আর তাড়াতাড়ি হাঁটিতে পারে না, হাঁটুতে-হাঁটুতে লাগে, আর সে লাফ-ঝাঁপ নাই। এখন বিপিন বেশ বুঝিল:

ভাতের বড় জ্বালা,
দুই হাঁটু ঠক-ঠক করে
কানে লাগে তালা।

সন্ধ্যা হইল, বিপিন আস্তে আস্তে ঘরের কাছে গিয়ে গলা খাঁকরাইতে লাগিল, যদি কেহ একবার ডাকে। বিপিনের সাড়া পাইয়া খুড়ামহাশয় ঘরে থাকিয়া টিটকারি দিয়া বলিলেন, 'চল, আমরা আহার করি, বিপিন এখনো তো এল না। তার ভাত তরকারি ঢাকা থাকুক, কাল খাবে। না খেয়ে যাবে কোথায়? কয়দিন না খেয়ে থাকে তাই দেখি।'

বিপিনের রাগও হয়, পেটের দায়ে কিছু বলিতেও পারে না, কাজেই নীরবে সব সহ্য করিল এবং একটা কিছু তাড়াইবার ছল করিয়া, দূর-দূর করিয়া নিজের আগমন-পরিচয় জানাইল। এখন আর বিপিন বাড়ি হইতে দূরে নহে, ঘরের কানাচে। সকলেই ঘরে বসিয়া বিপিনের দূর-দূর শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন

মাস্তা ডাকিয়া তাহাকে খাইতে বলিলেন। বিপিন তরকারি মনের মত হয় নাই বলিয়া উঠিয়া গিয়াছিল। এখন সেই তরকারি ও কড়কড়ে ভাত ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া খাইতে লাগিল।

কেমন সাজা!

দুই

আর এক রাগী ব্রাহ্মণের রাগের সাজার কথা শুন। ব্রাহ্মণ বড় দরিদ্র, শীতে বড় কষ্ট পান। একখানা ছেঁড়া লুই কত বৎসর হইল কে দিয়াছিল, ছিঁড়িয়া ঝিরঝির করিতেছে, তাই গায়ে দিয়া কোনোরূপে শীত নিবারণ করেন। একবার শীতকালে কলেরা হইল, শহরের একজন হঠাৎ-বাবু ব্রাহ্মণদিগকে কম্বল বিতরণ করিবেন। রাগী ব্রাহ্মণ শুনিবামাত্র বাবুর দরজাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক ঠেলাঠেলি ও অনেক রাগারাগির পর বাড়িতে প্রবেশ করিলেন ও একখানি সুন্দর লাল কম্বল পাইলেন। কম্বলখানি পাইয়াই ছেঁড়া লুইখানি ফেলিয়া দিলেন। বাড়িতে গিয়া লুইখানি ত্যাগ করেন, সে দেরি আর সহিল না। যাহা হউক নূতন কম্বলখানি গায়ে দিয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কুটুমবাড়ি চলিলেন। মনের কথা এই সকলকে কম্বলখানি দেখাইয়া যাইবেন। কিন্তু তোমরা সকলেই জান, নূতন কোর-দেওয়া কাপড় বা কম্বল পরিতে গেলে খড়মড় করে, বাগ মানে না, ভাল করিয়া পরা যায় না। ব্রাহ্মণ বড় মুশকিলে পড়িলেন। যতবার কম্বলখানি বাড়াইয়া গায়ে দেন, ততবারই খড়মড় করিয়া খসিয়া পড়ে, ব্রাহ্মণ আবার গুটাইয়া গায়ে দেন। আবার খড়মড় করিয়া খসিয়া পড়ে। এইরূপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণের রাগ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে এক পুকুরের ধার দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় কম্বলখানি খড়মড় করিয়া একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল। সেবারে ব্রাহ্মণ আর রাগ সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কম্বলখানি কুড়াইয়া তাল পাকাইয়া, 'দূর হোক, আপদ যাক' বলিয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া রাগটা পড়িয়া গেল। আবার কম্বলখানি লইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন, কম্বলখানি ডুবিয়া গিয়াছে।

কেমন সাজা!

তিন

আর এক রাগী লোকের সাজার কথা শুন। একদিন গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পর বাতাস উঠিয়াছে। সেই সময় সেই রাগী মানুষটি একটি প্রদীপ লইয়া এক ঘর হইতে আর-এক ঘরে যাইতেছেন। প্রদীপটি লইয়া যেই উঠানে পা বাড়াইয়াছেন অমনি প্রদীপটি ফুস করিয়া নিবিয়া গেল। তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া আবার প্রদীপটি জ্বালিলেন। জ্বালিয়া হাত দিয়া প্রদীপটি আবরণ করিয়া চলিলেন। এবারেও উঠানে পা দিবামাত্র ফুস করিয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল। সেবারে মনে

একটু রাগ হইল। আবার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রদীপটি জ্বালিলেন ও বামহস্তে কাপড়ের একটি পরদা করিয়া প্রদীপটি আবরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। কিন্তু এবারেও বাতাস আসিয়া প্রদীপটি নিবাইয়া দিল। তখন ভদ্রলোকটি ভয়ানক রাগিয়া গেলেন। ঘরের মধ্যে গিয়া প্রদীপটি একবার জ্বালেন, আবার ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দেন। বলেন, 'নেব, নেব, হতভাগা প্রদীপ, যত পারিস নেব।'

এইরূপে সাতবার কি আটবার জ্বালিয়া নিবাইয়াও তাঁর মনঃপূত হইল না। অবশেষে প্রদীপটি মাটিতে রাখিয়া জুতা মারিয়া গুঁড়াইয়া দিলেন। যখন রাগ পড়িল তখন দেখিলেন উহাতে আর কাজ চলিবে না। তখন সেই রাত্রে আবার প্রদীপ কিনিবার জন্য বাজারে যাইতে হইল।

কেমন সাজা! তোমরা বল দেখি, কার সাজাটি সর্বাপেক্ষা বেশি?

আমেরিকার গল্প

আমেরিকা দেশের একটি গল্প বলিতেছি। সে দেশে রকিপর্বত নামে একটা পর্বত আছে। একবার শীতকালে সেই পাহাড়ের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া একজন লোক যাইতেছিলেন। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, চারিদেকে বরফ পড়িতেছে, পথ-ঘাট যেন তুলায় ঢাকা হইয়া গিয়াছে। চারিদিক সাদা চক্‌চক্ করিতেছে। এমন সময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেই ভদ্রলোকটি অশ্বারোহণে একলা যাইতেছেন। অনেক ক্রোশের মধ্যে জনপ্রাণীর সহিত দেখা হইল না। সে-স্থান এমনি নির্জন ও এমনি আকাট জঙ্গল। শেষে দেখিলেন, একজন লোক গাড়িতে মাল লইয়া আসিতেছে। সে ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, 'মহাশয়, সাবধানে যাইবেন, পথে একটি ক্ষেপা কুকুর আছে, আমার ঘোড়ার পায়ে কামড়াইয়াছে।' ঐ কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি সাবধানে চলিলেন। ক্রমে একটি জঙ্গলে আসিয়া দেখেন, একটি কুকুর দৌড়িয়া আসিল ও তাঁহার দিকে ফিরিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তুহিনরাশির উপর পদচিহ্ন দেখিয়া ভদ্রলোক বুঝিতে পারিলেন যে, কুকুরটি চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে। দেখিয়া তিনি ভাবিলেন কুকুরটি বুঝি সত্য-সত্যই ক্ষেপা হইবে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া ক্ষেপা বোধ হইল না। এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে সে-ব্যক্তি যেমন অগ্রসর হইয়া যাইবেন, অমনি কুকুরটি তাঁহার ঘোড়ার পায়ে কামড়াইতে লাগিল, কোনো মতেই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিবে না। তখন ভদ্রলোকটি ভাবিলেন, এ ত ক্ষেপা নয়, যখন দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন আনন্দ প্রকাশ করিল, যখন চলিতে লাগিলাম তখনই কামড়াইল। তবে বুঝি এ আমাকে থামিতে বলিতেছে। এই ভাবিয়া তিনি ঘোড়া থামাইলেন। অমনি কুকুর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন তিনি ঘোড়া হইতে নামিলেন। নামিবামাত্র কুকুর আনন্দধ্বনি করিয়া এক বনের দিকে দৌড়িয়া গেল। কিছুদূর যায়, আবার দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ দিকে চায়। পথিক ভাবিলেন, আমাকে বুঝি সঙ্গে যাইতে বলিতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বনের ভিতর গেলেন, গিয়া দেখেন, কিছু খাবার জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে ও কাছে একটা আগুন

নির্বাণপ্রায় মৃদু-মৃদু জ্বলিতেছে এবং কিয়ৎদূরে বনের আড়ালে একজন মানুষ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন, পথিক রাত্রে পথ হারাইয়া এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে, কুকুরটি তাহারই। সেই ব্যক্তিই শীতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য আগুন জ্বালাইয়াছিল, শেষে ক্ষুধায় ও শীতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রলোকটি আগুন ভাল করিয়া জ্বালিয়া এই ব্যক্তিকে উত্তমরূপে সেঁকিলেন ও অতি কষ্টে তাহার চেতনা করিলেন। শেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার শক্তি আসিলে তাহাকে নিজ ঘোড়ার উপর তুলিয়া ধীরে-ধীরে একটি গ্রামে লইয়া গেলেন। কুকুরটি সঙ্গে-সঙ্গে চলিল, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সেই গ্রামে একজন কৃষকের বাড়ীতে রাখিয়া তাহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া পথিক চলিয়া গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যাইবার সময় কুকুরটির গায়ে হাত বুলাইয়া বিদায় লইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কুকুর কোনো ভাবই প্রকাশ করিল না। যেন বলিল, আর তোমাকে আমার কাজ নাই।

পশুদের বুদ্ধি

সময়ে সময়ে এক-একটি জানোয়ার আশ্চর্য বুদ্ধির কাজ করে। তোমরা হাতি, ঘোড়া ও কুকুরের আশ্চর্য বুদ্ধির অনেক-অনেক গল্প শুনিয়া থাকিবে। একবার আফ্রিকা-বাসী একজন ইংরাজ ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য স্বদেশে যাইবার মানস করিয়া তাঁহার এক বন্ধুর স্ত্রীর কাছে নিজের হাতিটা লইয়া গেলেন। তোমরা বোধ হয় জান না যে, হাতির মাহুতরা অনেক সময় হাতির খাইবার দানা চুরি করিয়া বেচে। এমন কি তারা এমনি করিয়া হাতিকে শিখায় যে হাতি নিজে আহার করিবার সময় মাহুতের জন্য দানা চুরি করিয়া রাখে। যাহা হউক, সাহেব চলিয়া যাইবার পর কিছুদিন পরে তাঁহার বন্ধু যেন দেখিলেন যে হাতিটা রোগা হইয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইল, নিশ্চয় মাহুত দানা চুরি করে। একদিন হাতিকে দানা খাওয়াইবার সময় মেম সেখানে আসিলেন ও হাতি রোগা হইয়া যাইতেছে বলিয়া মাহুতকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাহুত বলিতে লাগিল, 'না, মেম, আমি কি উহার দানা চুরি করিতে পারি, ও আমার বেটি হয়—' এই বলিয়া হাতিকে আদর করিতে গেল। হাতি শুঁড় দিয়া ফস্ করিয়া তার গায়ের কম্বলখানা কাড়িয়া লইল, অমনি মেম দেখিতে পাইলেন যে, মাহুতের বগলে চুরি-করা দানার পুঁটলি রহিয়াছে। বল দেখি, হাতিটা কেমন সেয়ানা! কেমন চোর ধরিয়া দিল!

কুকুরের আশ্চর্য বুদ্ধির অনেক গল্প শোনা গিয়াছে। একটা বিলাতী কুকুরের গায়ে অনেক লোম ছিল। সেই লোমে পিশুপোকার মত অনেক পোকা হইয়াছিল। সেই পোকা যখন কামড়াইত, কুকুরটি অস্থির হইয়া উঠিত ও মাটিতে গড়াগড়ি দিত। এই পোকাগুলি জলকে বড় ভয় করে, গায়ে জল লাগিলেই সরিয়া যায়। কুকুর তাহা জানিত। একদিন লোকে দেখিল, কুকুর খানিকটা তুলা মুখে করিয়া নদীর দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। ঐ নদীর ধারে গিয়া জলে নামিতে লাগিল ; জলে

নামিতে-নামিতে শরীর যখন ডুবিয়া গেল, তখন পিস্‌পোকাগুলি তার শরীর হইতে মুখের তুলাতে গিয়া উঠিল। তখন কুকুর সেই তুলা স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া তীরে উঠিয়া পড়িল। দেখ দেখি কেমন বুদ্ধি!

হরিণের বুদ্ধির কথা শুনিবে? এক জায়গায় একপ্রকার কাঁটালতায় কুলের মতো ফল হইত। কিন্তু লতার খুব উঁচু দিকে ফল ধরায় হরিণেরা তাহা ধরিতে পারিত না। সেজন্য তাহারা লতার নিচে গিয়া লাফ দিত। লাফ দিতে-দিতে কাঁটালতায় শিং জড়াইয়া গেলে তাহারা নাড়া দিত। এই প্রকারে অনেক ফল মাটিতে পড়িলে হরিণেরা একটি-একটি করিয়া খাইত।

আর একটা গল্প শুন। একজন ইংরাজ একটি নূতন টাট্টু ঘোড়া কিনিয়া কামারের দোকানে লইয়া গিয়া তাহার পায়ে নাল বাঁধাইয়া দেন। কামারের দোকান সেই ইংরাজের বাড়ী হইতে অনেক দূরে। একদিন কামার দেখিল, ঘোড়াটি তাহার দোকানের নিকট উপস্থিত। সঙ্গে লোকজন কেহ নাই। সে প্রথমে মনে করিল যে ঘোড়াটা বোধহয় আস্তাবল হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, এই জন্য দুই-তিন বার ঢিল ছুঁড়িয়া ঘোড়াটাকে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু ঘোড়াটা আবার তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন সে আবার ঘোড়ার পায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল, একটা পায়ে নাল নাই। তখনই নাল লাগাইয়া দিল। ঘোড়াটা কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া যখন বুঝিল যে কামারের নাল বাঁধানো হইয়া গিয়াছে, তখন সে দুই-তিনবার যে পায়ে নূতন নাল বাঁধানো হইল তাহা মাটিতে ঠুকিয়া দেখিল নাল ঠিক লাগিয়াছে কিনা। তাহার পর আনন্দসূচক চেঁহে চেঁহে শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

একবার এক ঘোটকীর একটি ছানা হয়। ঘোটকীর একটি চোখ কানা। সুতরাং যে চোখটি কানা সেই দিকে যখন ছানাটি রাখিত তখন দেখিতে না পাইয়া, তাহার গায়ে প্রায়ই পা দিয়া ফেলিত। ইহাতে ছানাটি মরিয়া যায়। ইহার পর যখন আবার ছানা হয়, তখন ঘোটকী আগে চারিদিকে চাহিয়া কোথায় ছানাটি আছে না দেখিয়া একটি পাও নড়িত না।

সচরাচর লোকে মনে করে গাধা বড় বোকা, কিন্তু তা নয়। গাধার বুদ্ধির কথা শোন। একটি ঘোড়া এক ঘেরা জায়গায় থাকিত, তাহার দরজাটি ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই বন্ধ থাকিত। কিন্তু ঘোড়াটিকে রোজ বাহিরে দেখা যাইত। প্রথমে কেহই ইহার কারণ স্থির করিতে পারে নাই। পরে দেখা গেল যে, ঘোড়াটা প্রথমে ভিতরের হুড়কা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলে এবং চেঁহে চেঁহে শব্দ করিতে থাকে। আর বাহিরের উঠানে একটি গাধা চরিত, সে ঘোড়ার ডাক শুনিয়াই নিজের নাক দিয়া বাইরের ছিটকানি খুলিয়া দেয়। এইরূপে দুই বন্ধুতে একত্রে চরিতে থাকে।

জানোয়ারের গল্প

তোমরা বোধহয় জান, বাঘ বড় ভীরু জন্তু। এই ত এত বড় বিক্রমশালী জানোয়ার, যার ডাক শুনিলে গা কাঁপে, লাল চক্ষু দেখিলে ভয় হয়; যে মনে করিলে

একটা মানুষকে মুখে করিয়া লইয়া পলাইতে পারে, তার কিন্তু ভয় এত বেশি যে, হঠাৎ নূতন রকম কিছু একটা দেখিলেই ভয়ে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তোমরা অবশ্য আলিপুরের পশুশালায় অনেকবার গিয়াছ, সেখানে বাঘের ঘরে দুইটা ঘর দেখিয়াছ, একটি ছোট একটি বড়। বড় ঘরটাতে বাঘ সকাল-বিকাল ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ঘরটাতে বাঘ দুপুর বেলা বিশ্রাম করে। বাঘের বিশ্রাম দরকার না? যখন বাঘ ছোট ঘরে বিশ্রাম করে, তখন মেথরেরা বড় ঘর পরিষ্কার করিয়া দেয়। এ জন্য বাঘ যদি ছোট ঘরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিতে না চায়, তবে তাড়া দিয়া ঢুকাইতে হয়। কখনও-কখনও এই কাজে মহা মুশকিল উপস্থিত হয়। এক-একটি নূতন বেয়াড়া ধরনের বাঘ আসে যারা সভ্যজগতের নিয়ম কিছুই জানে না, আলিপুর পশুশালার মতো ভদ্রস্থানে কিরূপে থাকিতে হয় কিছুই বোঝে না, ভদ্রসমাজে থাকিতে গেলে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত তা অনুভব করিতেই পারে না।

এই বাঘেরা বড় অসভ্য। মেয়েরা সম্মুখে আসিলে হাঁউ করিয়া উঠে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দেখিলে জিভ শানায়। ঘরের বেশি কাছে লোক দাঁড়াইলে চিৎকার করিয়া রেলিঙের গায়ে থাবা মারে। বুঝিতেই পার যে কিরূপ অসভ্য। তাহার উপর আবার বড় অপরিষ্কার থাকে, মনে করে, আমাদের ঘরে মেথর কেন আসিবে? কোনো মতেই ঘর ছাড়িয়া ছোট ঘরে আসিতে চায় না, বাগানের চাকরেরা বলে, "যা বেটা, ঘরে যা", কিছুতেই যায় না। তারা হাততালি দেয়, ঢিল ঢেলা মারে, তবু যায় না। শেষে একটি লোহার শিক আনে, তা দিয়ে মারে, বাঘ গর্জন করে, শিকটাকে কামড়ায়, তবু ছোট ঘরে ঢোকে না। শেষে তারা তুবড়ি বাজী আনে, তুবড়িতে আগুন দিয়া তার মুখটি যেই রেলের ভিতর ধরে, আর ফুরফুর করিয়া আগুনের ফিনকিগুলো ঘরের ভিতর যাইতে থাকে, অমনি বাঘ-ভায়া চোখে কানে দেখিতে পান না। ভয়ে দেয়াল বাহিয়া উঠিবেন, কি উড়িয়া পালাইবেন, কি রেল দিয়া গলিয়া বাহির হইবেন, তা বুদ্ধিতে আসে না, শেষে বিড়ালটির মতো ছোট ঘরটিতে ঢুকিয়া যান। অত বিক্রম এক তুবড়ির ভয়ে উড়িয়া যায়। বাঘ আগুনকে বড় ভয় করে।

আমরা একবার বাঘের ভয়ের একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব দিকে এক মহাবন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে সুন্দরবন বলে। লোকে বলে এ সকল স্থানে এক সময় মানুষের বাস ছিল, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্বে মগদের ও পর্তুগিজদের উপদ্রবে লোকে উঠিয়া পলাইয়াছে। তারপর দেশটা জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বার-বার ঝড়ে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিয়া এই সকল স্থানের মানুষ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা পলাইয়াছে। যে কারণেই হউক, সুন্দরবন বহু কাল হইতে জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইংরাজের রাজ্য হওয়ার পর হইতে জঙ্গল আবাদ করিয়া লোকে আবার ঐ সকল স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে-ক্রমে সেখানে অনেক গ্রাম-নগর হইয়াছে।

তখন সুন্দরবনের মধ্যবর্তী গ্রামসকলে এই নিয়ম ছিল যে, এক-এক বংশের লোক এক-এক পাড়াতে বাস করিত। তাদের সমুদয় বাস্তুবাড়ী ঘিরিয়া বাহিরে একটি প্রাচীর দেওয়া হইত; সদর দরজা একটি থাকিত। খিড়কীর দ্বার ভিন্ন-ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন-ভিন্ন হইত। শীতকালে বেলা চারটা বাজিতে না বাজিতে সদর দরজা ও খিড়কীর দরজা বন্ধ করিতে হইত। কারণ শীতকালেই বাঘের ভয়টা বেশি হইত। একবার এইরূপে একটা গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে কেমন করিয়া একটি বাঘ ঢুকিয়াছিল। বাঘ ঢুকিয়া দুই পরিবারের দুই বাড়ীর মধ্যে স্থানের গলিতে আস্তাকুঁড়ের কাছে বসিয়া আছে, কেহ দেখিতে পায় নাই। একজন বেলাবেলি আহার করিয়া আঁচাইতে যাইতেছেন, তিনি দেখিলেন সম্মুখে বাঘ। বুঝিতেই পার ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইল। আঁচানো তো মাথায় রহিল, তিনি বাঘ-বাঘ করিয়া চিৎকার করিয়া সকৃড়ি হাতেই ঘরে গিয়া দরজা দিলেন। পাশের বাড়ীতে উঠানে সে বাড়ীর একজন লোক বেড়াইতেছিলেন, তিনি এই গোলমাল শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'দিনের বেলায় বাড়ীর ভিতরে বাঘ ঢোকে এ ত বড় মন্দ কথা নয়, দেখি কি রকম বাঘ?' এই বলিয়া সেই গলির মধ্যে যেমন উঁকি মারিলেন, অমনি বাঘের সহিত চোখাচোখি, বাঘ তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন সেই লোকটি চিৎকার করিয়া তাঁর পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাবা, সত্যি বাঘ বাঘ আমাকে নিলে।' তার বাবা বলিলেন, 'খবর্দার, যেমন আছিস তেমনি থাক, পিছন ফিরিস না।' এ কথাটার অর্থ কি তা বুঝিতে পারিলে? আমাদের দেশের লোকের সংস্কার আছে, বাঘ চোখাচোখি করিয়া থাকিলে ধরে না, পিছন না ফিরিলে ধরিতে পারে না। এটা সত্য কি না জানি না, গল্পটা যেমন শুনিয়াছি তাই বলিতেছি। যা হোক, সে মানুষটি পিছন ফিরিলেন না। এদিকে এ বাড়ীর লোক যে যেমন অবস্থায় ছিল, যে হাতের কাছে যা কিছু পাইল, তাহা লইয়াই মার-মার করিয়া দৌড়িয়া গেল।

কেহ দ্বার দিতেছিল, দ্বারের তাড়াটা লইয়াই ছুটিল, কেহ ঝাঁট দিতেছিল, সে ঝাঁটাগাছটা লইয়া দৌড়িল, এইরূপ। কিন্তু তাহাতে বাঘ ভয় পায় নাই। ঐ যে লোকটি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী তখন রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি আপনার পতির বিপদ দেখিয়া একখানি জ্বলন্ত কাঠ উনান হইতে বাহির করিয়া লইয়া বাঘের দিকে ছুটিলেন। বলিলেন, 'রসো, বাঘের মুখ আমি পোড়াব।' তিনি তখন জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আসিলেন, কাঠখানি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে— তখন সেই জ্বলন্ত আগুন দেখিয়া বাঘ-ভায়ার বড় ভয় হইল। তিনি লেজ তুলিয়া দৌড় দিলেন। লোক মার-মার করিয়া পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটিল। বাঘ আগুনকে এমনি ভয় করে। যাহাদিগকে কোনো কারণে সুন্দরবনের মধ্যে রাত্রে থাকিতে হয়, তাহারা চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া থাকে তাহা হইলে আর বাঘ আসিতে পারে না।

ভয়ে দুর্দান্ত বাঘকে কেমন কাবু করে, তার একটি গল্প বলিতেছি শুন।

কলিকাতার পূর্বদিকে টাকী নামে একটি নগর আছে, বোধহয় অনেকে জান। তখন ঐ টাকীশহরে খ্রীষ্টান মিশনারী সাহেবদের একটি আড্ডা ছিল। তাঁহারা মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে গিয়া সেখানে ধর্মপ্রচার করিতেন; এবং কেহ-কেহ সেখানে সর্বদা থাকিতেন। একবার আশ্বিন-কার্তিক মাসে ঐ নগরের নিকট বাঘের ভয় হইল। রোজ বাঘের উপদ্রবের একটা না একটা সংবাদ পাওয়া যায়। আজ অমুকের বাছুর লইয়া গেল, পরদিন অমুকের ভেড়া মারিল, তার পরদিন একজন চাষাকে লইয়া গেল। এইরূপ জনরবে নগরের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসকলের লোক অস্থির হইয়া উঠিল। শিকারিগণ বন্দুক হাতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাঘ কোথায় থাকে, কেহ বলিতে পারে না। বাঘ সমস্ত দিন কোনো জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে, রাত্রি হইলেই বাহির হয়। এইরূপে কিছুদিন যাইতেছে, এমন সময় কয়েকদিন ঝড় ও বৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিয়া ভয়ানক বন্যা আসিল। মিশনারি সাহেবদের বাঙ্গলো ঘরখানা একটু উঁচু জায়গার উপরে ছিল। বন্যা আসিলে চারিদিকের গ্রামের লোকেরা আসিয়া সেই বাঙ্গলো ঘরে আশ্রয় লইল। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, বাহিরে ভয়ানক ঝড়, বন্দুকের গুলির মতো বৃষ্টিধারা গায়ে লাগিতেছে। মিনিটে-মিনিটে বন্যার জল বাড়িয়া যাইতেছে। এমন সময় দেখা গেল একটা বাঘ সাঁতার দিয়া সেই উঁচু ভূমি ও বাঙ্গলো ঘরের দিকে আসিতেছে। আশ্চর্য এই—এই বাঘ সাঁতার দিয়া ঐ জমিতে উঠিয়া পোষা বিড়ালটির মতো সেই মানুষের ভিড়ের ভিতর দিয়া ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বাঘ দেখিয়া ঘরের ভিতরের মানুষেরা হাঁউমাউ-খাঁউ করিতে লাগিল। বাঘ সেদিকে ফিরিয়া চাহিল না। কানও দিল না। সোজা এক কোণে গিয়া বিড়ালটির মতো শয়ন করিল। ইংরাজ মিশনারিরা খবর পাইয়া বন্দুক লইয়া আসিয়া তার কানে বন্দুক লাগাইয়া গুলি করিয়া মারিলেন। দেখ, ভয়ে বাঘ কেমন আপনার প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন যে সার্কাস খেলার ক্যাম্পে লোকে বাঘ লইয়া খেলা করে, বাঘের কান মলিয়া দেয়, লেজ ধরিয়া টানে, তবু কামড়ায় না, তার অনেকটা ভয়ে। কামড়াইতে গেলেই মারিবে, এই ভয়ে সাহস করে না।

অদ্ভুত ঘটনা

ইয়ুরোপের সুইজারল্যাণ্ডদেশে আলপস্ নামে এক পর্বত আছে, তোমরা ভূগোলে তাহার বিবরণ নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। দেশ-বিদেশ হইতে অনেক লোক, অনেক সময়ে ঐ আলপস্ পর্বতে উঠিবার জন্য আসে। একবার তিনজন পথিক ঐ আলপস্ পর্বতে উঠিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। একটু উঠিতে না উঠিতে তাঁহারা দেখিলেন যে তুহিন জমিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা তাহাতেও থামিলেন না। অতি কষ্টে পাহাড়ের পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে লাগিলেন। এক-একবার পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। বোধ হইল পাহাড়ের নীচে পাথরের উপরে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবেন। আবার সামলাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিতে

লাগিলেন। এইরূপ করিয়া ক্রমে পাহাড়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে-স্থানটি বেশ সমতলক্ষেত্রের ন্যায়। তাহার উপর দাঁড়াইলে চারিদিকের অনেক দূর পর্যন্ত জমি দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আকাশের অবস্থা ফিরিয়া গেল। এই সকল পর্বতের শৃঙ্গে এইরূপ হঠাৎ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আকাশের পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, যেন কিছু দূরে শূন্যের উপর তিনজন লোক দণ্ডায়মান আছে। দেখিয়া তাঁহাদের মনে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইল। কিন্তু পরক্ষণে একটু মনোযোগ করিয়া দেখাতে বুঝিতে পারিলেন, ঐ তিনজন মানুষ আর কিছুই নহে—আকাশের বায়ুমণ্ডলে তাঁহাদের ছায়া মাত্র। যেমন তোমরা লণ্ঠনের মধ্যে বাতি রাখিয়া পড়িবার সময় অনেক সময় দেখিয়া থাকিবে, যেন মধ্যে এক বাতি, চারিদিকে আরও চারিটি বাতি জ্বলিতেছে, এও সেই প্রকার।

ঈগলের সহিত যুদ্ধ

বহু বৎসর পূর্বে আমেরিকাদেশে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল; তাহার বিবরণ তোমাদিগকে বলিতেছি।

একটি ছয়-সাত বছরের বালিকা পথ দিয়া যাইতে-যাইতে দেখিতে পাইল, পথের পাশে একটি পুকুরের জলে অনেক ছোট-ছোট মাছ উলট-পালট খাইয়া খেলা করিতেছে। মাছের খেলা দেখিতে দেখিতে তার বড়ই ভাল লাগিল। তাই সে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। এমনি নিমগ্ন হইয়া দেখিতেছে যে তাহাকে যে যাইতে হইবে, তাহা যেন তাহার আর মনে নাই। এমন সময়ে সে হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে পাখীর ডানার মতো ঝটপট শব্দ শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্র চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, এক প্রকাণ্ড ঈগল ছোঁ দিয়া তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

তোমরা একথা সকলেই জান যে, ঈগল পাখীর দেহ প্রকাণ্ড ও ইহারা অতিশয় বলবান। আমাদের পুরাণে গরুড়ের বর্ণনা আছে, ইহারা যেন সেই গরুড়ের জাতি।

ইহাদের ঠোঁট ও পায়ের নখ এমনি ধারালো যে, ছুরি-কাঁচি তাহার কাছে লাগে না। যাকে মারে তাকে যেন একেবারে গাঁথিয়া ফেলে। ঈগল পাখী পাহাড়ে বা বড় বড় গাছের মাথায় এমন জায়গায় বাসা বাঁধে যে সেখানে মানুষ যাইতে পারে না। ইহারা মাঝে-মাঝে ছোঁ মারিয়া ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি ছোট-ছোট জন্তু এবং কখনও-কখনও মানুষের শিশুও লইয়া যায়। লইয়া গিয়া পাহাড়ের উপর বাসায় বসিয়া নিজেরা খায় ও শাবকদিগকে খাওয়ায়। সেদিন বোধহয় ঐ ছোট মেয়েটিকে ছোঁ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহা হউক, মেয়েটি ঈগলকে দেখিয়াই ভয়ে চিৎকার করিয়া দৌড়িয়া পালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঈগলের ছোঁ হইতে পালানো বড় সহজ নয়। ঈগল তাহাকে তাড়া করিল এবং নখ ও ঠোঁটের আঘাতে তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। বালিকাটি

নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং হাত দিয়া ঈগলকে তাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া উনিশ বৎসরের আর একটি বালিকা দৌড়িয়া সেখানে আসিল। সে তখন কিছু দূরে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। দূর হইতে দেখিতে পাইল যে একটি ছোট বালিকাকে ঈগল ধরিয়াছে। অমনি সে দৌড়িয়া আসিয়া বালিকাটিকে আপনার কোলের মধ্যে লইল ও নিজে দুই হাতে ঈগলকে তাড়াইতে লাগিল।

ঈগল যখন দেখিল তাহার মুখের আহার কাড়িয়া লইল তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই বড় বালিকাটিকে আক্রমণ করিল। ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। ঈগল এক-একবার ঘাড়ের লোম ফুলাইয়া হাঁ করিয়া তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহার গালে মাথায় ও স্কন্ধে নখ ফুটাইয়া তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করে, আর সে হাত দিয়া ঈগলকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। এই সংগ্রামে বালিকার মুখে হাতে ও স্কন্ধে দরদরধারে রক্ত গড়াইতে লাগিল ও পৃষ্ঠের বস্ত্র খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। সে আর পারে না। অবশেষে ঈগলের নখের আঘাতে তাহার মাথার টুপি খুলিয়া গেল, অমনি বালিকার মনে পড়িল যে তাহার চুলে কাঁটা আছে। সেই কাঁটা লইয়া সে ঈগলকে শাস্তি দিবার জন্য দাঁড়াইল। সেবারে ঈগল যেমন আসিল, অমনি বামহস্ত দিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া মাথার খুলিতে সজোরে সেই কাঁটা বিঁধিয়া দিল। তখন ঈগল কাবু হইয়া পড়িল, অল্পক্ষণ পরেই মরিয়া গেল। বালিকাটিও অচৈতন্য হইয়া পড়িল। লোকে আসিয়া দেখে ঈগলের মৃতদেহের উপর বড় বালিকাটি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে এবং ছোট মেয়েটি নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। পরের প্রাণ রাখার জন্য নিজের প্রাণ দিতে যাওয়া, ইহা কি সামান্য সাধুতার কর্ম!

শাদা মন ও কালো মন

মন কি কখনও শাদা কি কালো হয়? মন না শাদা না কালো, না লম্বা না চওড়া, অথচ আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, অমুক লোকটার মনটা বড় শাদা। যার মনে কোনো কপটতা নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, তার মনটা শাদা মন হইতে পারে; তবে কালো মন কেন হইবে না? একটি শাদা আর একটি কালো মনের গল্প বলি।

কলিকাতার এক বাড়ীতে দুইটি পরিবার একত্র বাস করিতেন। একজনেরা ঘোষ আর একজনেরা মিত্র। ঘোষেদের দুইটি মেয়ে, একটি ছেলে: বিমলা, চপলা ও যতীন। মিত্রদের এক মেয়ে ও দুই ছেলে: সরলা, সুরেশ ও যোগেশ। ঘোষেদের ছেলেমেয়েগুলি শ্যামবর্ণ, বরং বড় মেয়েটিকে কালো বলা যায়, কিন্তু মিত্রদের সন্তানগুলি ফুটফুটে গৌরবর্ণ। ঘোষেদের কর্তা প্রকাশবাবু কিছু অধিক বেতনের কর্ম করেন, পৈত্রিক সম্পত্তিও কিছু আছে, সুতরাং তাঁহার টাকাকড়ির বড় অনটন নাই। মিত্র পরিবারকে কিছু টানাটানি করিয়া সংসার চালাইতে হয়।

এইরূপে দুই পরিবার একত্রে বাস করেন। এক বাড়ী কিন্তু খাওয়া-দাওয়া স্বতন্ত্র। বড় মেয়ে দুইটির বয়স প্রায় একই এবং তাহারা দুজনে স্কুলেই পড়ে।

একবার প্রকাশবাবু পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিবার সময় নিজের সন্তানদের জন্য ঘর সাজাবার মতো নানারকম শ্বেতপাথরের জিনিস এনেছিলেন। কেবল নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য জিনিস আনা ভাল দেখায় না, এজন্য বন্ধুর ছেলেমেয়েদের জন্যও কিছু কিছু জিনিস এনেছিলেন। সন্ধ্যার পর বন্ধুর ছেলেমেয়েদিগকে ডাকিয়া তিনি জিনিসগুলি উপহার দিলেন। বিমলা দেখিল যে, সে জিনিসগুলি তাদের মত উৎকৃষ্ট নয়; সেজন্য তার মনে একটু সঙ্কোচ হইতে লাগিল, কিন্তু তখন কিছু বলিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে পিতৃদত্ত কতকগুলি ভাল ভাল জিনিস আঁচলে লুকাইয়া সরলার ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, সরলা একখানা বড় আয়নাতে আপনার মুখ দেখিতেছে। দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'সরলা, ভাই, আমি তোমার আলমারি সাজাতে এসেছি। বাবা যে জিনিসগুলি দিয়েছেন দাও দেখি, তাছাড়া আমিও কতকগুলি জিনিস এনেছি; তুমি তো জান, ভাই, আমার অনেক আছে, আমার আর দরকার নাই, গোটাকত জিনিস বড় ভাল বোধ হল, তাই তোমাকে দিতে এসেছি। আমি নিজে তোমার আলমারি সাজিয়ে দিব।' সরলা বিরক্ত ভাবে নাক শিঁকের উপর তুলিয়া বলিল, 'না ভাই, আমার ভাল জিনিসে কাজ নাই, আমরা গরীব মানুষ, আমাদের যা আছে তাই ভাল, তুমি যা এনেছ তা ত নেবই না, বরং তোমার বাবা যা দিয়েছেন তাও নিয়ে যাও।' এই বলিয়া তাড়াতাড়ি জিনিসগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল।

বিমলা—ছি ভাই, তা কি করতে আছে, বাবা কি মনে করবেন, মেসোমশাই ও মাসীমা শুনিলে রাগ করিবেন। কেন সরলা, তুমি এমন কর, আমরা তোমাকে ভালবাসি।

এই বলিয়া সরলার গলা জড়াইতে গেল। সরলা অমনি হাতখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'নেও, নেও, তোমার আদর রেখে দেও।'

বিমলা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে নিজে যে জিনিসগুলি আনিয়াছিল সেগুলি লইয়া বিষণ্ণমুখে চলিয়া গেল। তাহার পিতা সরলাকে যে জিনিসগুলি দিয়াছিলেন, তাহা মাটিতে পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে সরলার এক জেঠতুতো ভাই বেড়াইতে আসিল, সরলা তার সঙ্গে গল্প করিতে এমনি মত্ত হইল যে, পড়াশোনা কোথায় রহিল তার ঠিকানা নাই। এমন কি তাহার ছোট ভাইয়ের পীড়া, মা তাহাকে ঔষধ খাওয়াতে বলিয়াছিলেন তাহাও মনে নাই। সেদিন তাঁদের ঝি আসে নাই, তার মাকে বাসন মাজিতে, কুটনা, বাটনা করিতে ও ঘরের সকল কাজ করিতে হইতেছে। তিনি কাজ করিতে করিতে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সরলা, ঔষধটা খাওয়ালি?' সে গল্প করিতে করিতে বিরক্তভাবে বলিল, 'আমি পারব না, তুমি এসে খাওয়াও।' তার মা ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়া তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। মায়েঝিয়ে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

সেদিন সরলা স্কুলে পাঠ বলিতে পারিল না। শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, 'তোমাকে সমুদয় সময় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।' সরলা বলিল, 'আমার ছোট-ভাইয়ের ব্যারাম, তাতে আমাদের ঝি আসে নাই। ঘরের কাজ করতে হয়েছে, পড়া করিতে পারি নাই।' শিক্ষয়িত্রী তাকে বেশ চিনিতেন, তার মনে হইল ভাইয়ের পীড়ার কথা ছল মাত্র। তিনি বলিলেন, 'তা আমি শুনব না, তোমাকে দাঁড়াতে হবে।' তখন সরলা বলিল, 'ও ক্লাস থেকে বিমলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন আমার ভাইয়ের ব্যারাম সত্যি কিনা।' শিক্ষয়িত্রী বিমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিমলা আসিয়া বলিল, 'ওর ভাইয়ের ব্যারাম বটে, সে সমস্ত রাত্রি চিৎকার করেছে, তার উপর আবার ওদের ঝি আসে নাই, ওদের সময়ে খাওয়া-দাওয়া ভার হয়েছে।' শুনিয়া শিক্ষয়িত্রী সরলাকে সে যাত্রা নিষ্কৃতি দিলেন।

ক্রমে স্কুলের প্রাইজের সময় উপস্থিত। সরলার কিরূপ প্রাইজ পাইবার কথা তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছ। তাহার পরীক্ষা এমনি খারাপ হইয়া গেল যে ক্লাসে উঠিতে পারে কি না সন্দেহ। বিমলা কিন্তু প্রথম প্রাইজ পাইল। সরলা সেদিন স্কুলে গেল না, পিতামাতার কাছে গালি খাইয়া মুখটি বিরক্ত করিয়া সমস্ত দিন কাটাইল। ভয়ানক খেঁকি, যে কথা কহিতে যায়, তাহাকে যেন খাইতে আসে। বিমলা বৈকালে প্রাইজ বইগুলি লইয়া ঘরে আসিল। অপরাপর বইয়ের সঙ্গে সুন্দর ছবিযুক্ত একখানি গল্পের বই ছিল। বাড়ীর লোকের দেখা হইয়া গেলে সে দৌড়িয়া সেই সকল বই লইয়া সরলার কাছে গেল। 'দেখ ভাই, আমি কেমন বই পেয়েছি। এ বই আমরা দুজনে পড়িব। বাবা বলেছেন এ বেশ বই, আমরা পড়লে বুঝতে পারি।' বলিয়া গল্পের বইখানি খুলিয়া সরলাকে ছবি দেখাইতে গেল। সরলা বামহস্তে বই ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তোমার বই তোমার থাক্, অমন ঢের বই দেখেছি।' বিমলা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বইখানি বন্ধ করিল ও বিষণ্ণমুখে চলিয়া গেল।

পরদিন সরলা বিমলাকে বলিল, 'কালকে মনটা ভাল ছিল না, তাই তোমার বইটা ফিরাইয়া দিয়াছি, দেও দেখি আজ বইখানা একবার দেখি।'

বিমলা সরলার প্রসন্ন ভাব দেখিয়া যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইল। অমনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, বইগুলি আনিয়া দিল। বইগুলি দেখা সরলার অভিপ্রায় নয়, সে সেই ভাল ছবির বইখানি লইয়া, তাহার মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট একখানি ছবি সমেত কতকগুলি পাতা ছিঁড়িয়া লইল। বইখানি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গেল। সেই দিন বিমলার ছোট বোন ঐ বই-এর পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে পাতা নাই দেখিয়া বলিল, 'ও দিদি, যাঃ বইখানার কয়টা পাতা নাই।' বিমলার যেন মনে হইতে লাগিল, সেখানে ঐ পাতা কয়টা ও একখানা ছবি ছিল, কিন্তু সাহস করিয়া আপনার স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কেহ যে হিংসা করিয়া বইয়ের পাতা ছিঁড়িতে পারে এ কথা তাহার মনেই যোগাইল না। সে ভাবিল, তবে বুঝি আমার দেখিবার ভুল হইয়াছে। সে বলিল, 'তবে আর কি হবে, এক-একখানা বই ওরূপ হয়ে যায়।' বইটির ক্ষতি হইল বিমলা আর সে কথা মনে রাখিল না। সেদিন রাত্রে সে প্রসন্নমনে ঈশ্বরকে

স্মরণ করিয়া ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া সুখের শয্যায় শয়ন করিল। কিন্তু হিংসায় ও নিজ পাপের চিন্তায় সরলার ঘুম নাই। যতই বিমলার কথা ভাবে তার মনটা যেন গরগর করে। তার আর কি ক্ষতি করিবে এই চিন্তায় তার ঘুম হয় না। সরলার মনে কোন ভাল চিন্তা নাই। এমন মনে কি ঈশ্বরচিন্তা আসে? সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া শয়ন করিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে সরলার মা পীড়িত হইলেন। সে সময়ে তিনি প্রায় একমাস কাল শয্যাতে পড়িয়াছিলেন। সে সময় সরলারা কয় ভাইবোন বিমলাদের ঘরে খাইত। বিমলা সরলার ছোট ভাইটিকে নাওয়াইয়া নিজে সঙ্গে করিয়া খাইত। স্কুল হইতে আসিয়াই মাসীমার কাছে গিয়া বসিত, বাতাস করিত, মাথা টিপিয়া দিত, মাসীমার ঘর গুছাইত। আর সরলাসুন্দরী স্কুল হইতে আসিয়া নিজের অঙ্গরাগে নিযুক্ত হইতেন। মুখে সাবান ঘষিতে, চুল বাঁধিতে ও আয়নায় মুখ দেখিতে সমুদয় সময় কাটিয়া যাইত। তাহার মা বিমলাকে বলিতেন, 'ভাগ্যে তুমি ছিলে তাই আমি একটু জল পাচ্ছি। আমার মেয়েটির দ্বারা কোনো কাজ হয় না।'

ইতিমধ্যে বিমলার আর একটি ভাই হইল। সে যখন আট মাসের ছেলে তখন একদিন বারাণ্ডায় হামা দিয়া বেড়াইতেছে ও আপনার মনে খেলা করিতেছে। সরলা বারাণ্ডার এক ধারে আপন মনে দাঁড়াইয়া আছে। সে দেখিতে পাইল, বিমলাদের খোকার হাতে একটি পয়সা রহিয়াছে এবং সে সেই পয়সাটা মধ্যে-মধ্যে মুখে দিবার চেষ্টা করিতেছে। মনে করিলেই সে ছেলের হাত হইতে পয়সাটি কাড়িয়া লইতে পারিত, অন্ততঃ চাকরাণী ডাকিয়া বলিতে পারিত, 'ওরে ঝি! খোকার হাত থেকে পয়সাটা নে, এখনি গালে দিবে।' কিন্তু তাহার কিছুই করিল না। খোকা পয়সাটি গালে দিল। অল্পক্ষণ পরেই পয়সাটি গলায় বাধিয়া একেবারে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ছেলে যায় আর কি। বাড়ীতে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বিমলার মা রন্ধনশালাতে ছিলেন। দৌড়িয়া আসিয়া ছেলের ঘাড় নীচু করিয়া গলায় আঙুল দিয়া অতিকষ্টে পয়সাটি বাহির করিলেন। সরলা আর সে দেশে নাই। ছেলেটি খাবি খাইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া সে চলিয়া গিয়াছে ও নিজের ঘরে গিয়া বড় আয়নাতে মুখ দেখিতেছে। বিপদ কাটিয়া গেলে যখন সকলে জানিল যে সরলা সেখানে ছিল, তখন সরলার পিতামাতা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুই ওখানে ছিলি অথচ পয়সাটি কেড়ে নিলি না?' সরলা বলিল, 'ওদের ছেলে দেখা আমার কাজ না কি? যাদের ছেলে তারা দেখে না কেন?'

একবার স্কুলে সেলাইয়ের পরীক্ষা উপস্থিত। মেয়েরা একমাস ধরিয়া ঘরে নানা-প্রকার সেলাই করিতেছে। সরলা এক কৌশল খেলিয়াছে। সে গোপনে তাহার এক মাসীর বাড়ী হইতে ভাল-ভাল সেলাই চাহিয়া আনিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। মাঝে-মাঝে লোক দেখানো এক-একবার একটু সেলাই নিয়ে বসে। ওদিকে বিমলা রাত্রি-দিন পরিশ্রম করিয়া একখানি সুন্দর আসন প্রস্তুত করিল। সরলা নড়ে চড়ে আর দেখিয়া আসে বিমলার আসন কতদূর হইল। দেখিয়াই বুঝিতে পারিল সে আসন

দেখাইলে বিমলা খুব প্রশংসা পাইবে। সেটা তার প্রাণে সহিল না। সেলাই দেখাইবার পূর্বদিন রাত্রে সরলা চুপি চুপি একখানি কাচি লইয়া বিমলার বাক্স হইতে সেলাই বাহির করিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল। পরদিন প্রাতে বিমলা সেলাই বাহির করিতে গিয়া দেখে তাহার সুন্দর আসনখানি খণ্ড-খণ্ড হইয়া আছে। দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পিতামাতাকে দেখাইল। সকলেই বলিল ইঁদুরে কাটিয়াছে।' সে বলিল—ইঁদুর তো আমার বাক্সে কখনও কিছু কাটে না আর আজও আর কিছু কাটে নাই। যাহা হউক, কেহ যে হিংসা করিয়া এরূপ কাটিয়া রাখিতে পারে তাহা তাহার মনেই যোগাইল না। সে সরলার কাছে সেই কাটা সেলাই লইয়া বলিল, 'দেখ ভাই, ইঁদুর আমার সেলাইয়ের কি দুর্দশা করিয়াছে।' সরলা একেবারে যেন গাছ থেকে পড়ে গেল। 'ওমা তাইত! আহা এত সুন্দর আসনখানির এই দুর্দশা! তা কি করবে ভাই, অবোধ জানোয়ারের উপর তো কারও হাত নাই।'

যাহা হউক, বিমলা কাটা আসনখানি লইয়া স্কুলে গেল। শিক্ষয়িত্রী দেখিয়া অনেক দুঃখ করিলেন, এবং আসনখানি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সরলা যখন বাক্স হইতে আসন সেলাই বাহির করিল, তখন শিক্ষয়িত্রীর তাক্ লাগিয়া গেল। সে যে এমন সেলাই করিতে পারে, তাঁহার সে বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার মনে হইল অপর কাহারও সেলাই আনিয়াছে। তিনি সরলাকে বলিলেন, 'তুমি যে এমন সেলাই করিয়াছ তাহা আমার বিশ্বাস হইতেছে না। আচ্ছা তোমাকে চারি ঘণ্টা সময় দেওয়া যাচ্ছে, তুমি ঐ নমুনা হইতে এইরূপ সেলাইয়ের কতকটা কর।' এই বলিয়া সরলাকে একটি ঘরে বসাইয়া দিলেন। বিমলা তাহার শাস্তি দেখিয়া বারবার বলিতে লাগিল, 'আমি কিন্তু সরলাকে বাড়ীতে সেলাই করতে দেখিয়াছি।' শিক্ষয়িত্রী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সরলাকে কাজ দিয়া রাখিলেন। সরলা সমস্ত দিনে কিছু করিতে পারিল না। শেষে পীড়াপীড়ি করিতে আসল কথাটা বাহির হইয়া পড়িল। স্কুলশুদ্ধ লোক জানিল যে সরলা অন্যের সেলাই আনিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে গিয়াছে ও বিমলার সেলাই কাটিয়া দিয়াছে। এই কথাটা বাহির হওয়াতে সরলার ঘরের বাহির হাওয়া কঠিন হইল। পিতামাতা আর কোনো মতেই তাহাকে স্কুলে পাঠাইতে পারেন না। সে আর বিমলাদের ঘরের দিকে যায় না। বিমলা বন্ধুত্ব করিতে আসিলে অপমান করে। কাজেই তাহার পিতামাতাকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে হইল।

হাসির কথা

তাঁতীদের একজন চাঁইমশায় আছেন, তাঁর বড় বুদ্ধি। তাঁর এত বুদ্ধি যে পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় এজন্য নাকে কাণে তুলা দিয়া দিনে দুপুরে তার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার ভিতরে আবার মশারি খাটাইয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকেন। লোক যদি কোন বিপদে পড়ে, বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তবে ঐ দ্বারের নিকট হইতেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ঘরের ভিতরে ঢুকিবার হুকুম কাহারও নাই।

একবার একটা শূকর যাইতেছে। দুইজন তাঁতী দাঁড়াইয়া আছে তাহারা আগে কখনও শূকর দেখে নাই। শূকরটা দেখিয়া একজন অপরকে বলিল, 'এট কি ভাই ?' অপর জন বলিল, 'ওটা বোধহয় গরীবের ঘরের হাতি, না খেতে পেয়ে শুঁড় ছোট হয়ে ও প্রকার হয়ে গেছে।' অপর ব্যক্তি বলিল, 'না ভাই, আমার বোধহয় ওটা বড় মানুষের বাড়ীর ছুঁচো, খেয়ে দেয়ে ও প্রকার হয়েছে।' এই কথা লইয়া দুজনের খুব বিবাদ হইল। একজন বলে, 'ওটা গরীবের বাড়ীর হাতি।' অপরে বলে, 'ওটা বড়মানুষের বাড়ীর ছুঁচো।' শেষে তারা মারামারি করিয়া চাঁইমশাইয়ের কাছে বিচারের জন্য উপস্থিত হইল। চাঁইমশাই ঘরের ভিতর হইতে বলিলেন, 'ঘরে ঢুকিস্ নে, দ্বার হইতেই বল্।' তারা চিৎকার করিয়া বলিল, 'কি একটা যাকে আমি বলি গরীবের বাড়ীর হাতি, অমুক বলে বড় মানুষের বাড়ীর ছুঁচো। ওটা কি তা কিরূপে জানব ?' শুনিয়া চাঁইমশাই বলিলেন, 'ধরে ফেলে দিগে যা। যদি ডোবে তবে লোহা আর যদি ভাসে তবে তুলো।' বল দেখি এ কেমন বিচার ?

বাল্যরচনা

আলাপুরের মেলা

ছোটলাট নিজ পাট, বড় দিল জম্‌কে ।
কিবা হাট কিবা ঠাট, দেখে লোক, চম্‌কে ॥
ফটকের ঠমকের কেবা কত বাখানে ।
ঘরামির হুনুরির, থলি ঝাড়া এখানে ॥
ফোয়ারার কি বাহার কত লোক ছুটেছে ।
চল চল সরোজলে পদ্মফুল ফুটেছে ॥
রাজ হংসোপরে পরি শিঙা করে করিয়া ।
এক নরে খেলা করে লৌহ তার ধরিয়া
এক নর শূন্যোপর উঠে তার ফুৎকারে ।
পরক্ষণে, সেই জনে, ফ্যালে লয়ে পাথারে ॥
পশু পাখী, কত দেখি, করিতেছে কি রঙ্গ ।
ছোট বড়, হয়ে জড়, হাঁদ ভেড়া তুরঙ্গ ॥
লক্কা গোলা, ঝোঁট নোলা, কত পায়রা নাচিছে ।
ঘুরে ঘুরে, ঘরে ফিরে, রুণু ঝুনু বাজিছে ॥
চাঁটগার কুকুড়ার কি বাহার আ মরি ।
নাচিতেছে, মাতিতেছে সারি সারি ময়ূরী ॥
রাজহাঁস, পাতিহাঁস, পেরু টিয়া কাকাতো ।
খরগোষ, বুনো মোষ, ছাগ বৃষ বা কত ॥
বঙ্গেশ্বরী অঙ্গোপরি ধরেন যে ভূষণে ।
কত তার, উপহার দিয়াছেন যতনে ॥
ফল ফুল, শাক মূল, অতিশয় কোমল ।
ধনে চাল, তিল ডাল ইক্ষু আদি সকল ।
মিসরের, মার্কিনের তূলা বীজ জড়িত ।
দিল দেখা, গুটি পোকা, গুটি সূতা সহিত ॥
মুঙেরের, তুরগের বামনিয়া গঠনে ।
মেমেদের খুসি ঢের ধরে না কো বদনে ॥
মগেদের শিক্ষাকার্য বঙ্গে টেক্কা দিতেছে ।
বুদ্ধে ঢেঁকি, নাহি ঢেঁকি, বেড়ে কল করেছে ॥
বাষ্প বলে, কত কল চলে রঙ্গ করিয়া ।
চাষা ভূসে সকলেই দেখে দৃষ্টি ভরিয়া ॥
নব কল, নব হল, দেখা সার হইবে ।
কৃষি বল সাধ্য বল, কেটা তাহা করিবে ? ॥
জমিদার, অত্যাচার, প্রকাশ না করিয়া ।
কটা কল, কটা হল, যদি দেন কিনিয়া ॥

তবে হয়, শুভোদয়, চাষা লোকে শিখিবে।
পেট্রিয়ট পত্রপাঠে পটাপট লিখিবে॥
বীডনের, শাসনের, তবে শিঙা বাজিবে।
এই মেলা, ছেলে খেলা, কেহ নাহি বলিবে॥

মিস্ কার্পেণ্টার

"এস এস বিদেশিনি।"

১

এস এস বিদেশিনি। বহুদিন তরে
রয়েছি আমরা তব আশা পথ চেয়ে,
কি বলিব!! মনোগত জানাব কি বলে
আনন্দে অধীর বঙ্গ আজি দেখা পেয়ে।

২

তরিয়া অপার সিন্ধু ছাড়িয়া ভবন
সুখের জনমভূমি করে পরিহার,
এ বিদেশে একাকিনী কিসের কারণ?
কিবা আছে দয়াবতি! হৃদয়ে তোমার?

৩

"অভাগিনী বঙ্গবালা অজ্ঞান আঁধারে
কারাগারে নিরুপায় জীবন হারায়!!"
শুনে কি স্নেহের ভরে সাগরের পারে
আসিয়াছ বঙ্গসখি। উদ্ধারিতে তায়?

৪

ভগিনীর দুঃখ শুনে কাঁদিছে হৃদয়?
এসেছ মুছিতে তার নয়নের জল?
ঠেলেছ চরণে সুখ ফেলিয়াছ ভয়
এসেছ সকল ফেলে হইয়া পাগল?

৫

বলনা তোমারে সুখ কিব উপহার
দিবে আজ গুণবতি। বঙ্গবাসি জন?
ভক্তিগুণে প্রীতি পুষ্প গাঁথিয়াছি হার
বিমল হৃদয়ে কর হৃদয়ে ধারণ।

৬

ভাই বন্ধু হতে তুমি লইয়া বিদায়
আসিয়াছ আমাদের হিতের কারণ ;
আপন হৃদয়ে বঙ্গ রাখিবে তোমায়
"দিদি" বলে ডাকিবেক বঙ্গবালাগণ।[১]

জষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত

কে জানে কোথায় ছিলে, বঙ্গে আসি দেখা দিলে,
বেড়াইলে যেন দীন হীন।
সামান্য জনের মত সামান্য কাজেতে রত
হলো গত কত তব দিন।
হেরেছে স্বপনে কবে এ হেন উন্নতি হবে
শেষে হবে হেন সুখোদয় ?
ভাব নাই গুণধাম একদিন তব নাম
উজ্জ্বলিবে ভারত হৃদয়।
মরণ সময় হলে ভেবেছিলে যাবে চলে
ধরাতলে না থাকিবে নাম।
না জানিবে কোন জন, না করিবে অন্বেষণ
না শুধাবে কিবা নাম ধাম।
ঈশ্বর বাড়ান যারে কে তারে রোধিতে পারে
তুল্য তার বিপদ সম্পদ।
করুক যে ইচ্ছা যার নিশ্চিত উন্নতি তার
সাধ্য কার রোধে তার পদ ?
রজনী বিগত হলে তপন উদয়াচলে
ধীরে ধীরে করিলে গমন ;
ঘন কুজ্ঝটিকা জালে আবরিয়া সেইকালে
রাখে মাত্র নবীন কিরণ।
কিন্তু সেই দিবাকর হয় যবে অগ্রসর
খর কর ধারণ করিয়া।
সে সময়ে সাধ্য কার রোধ করে গতি তার
সেই শোভা রাখে আবরিয়া ?

১। কবিতাটির শেষে শিবনাথ লিখেছেন : যদি কোন মহাশয় এই কয় পংক্তি ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়া কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে পরম উপকৃত হইব।

গগনের সিংহাসনে বসিয়া প্রহৃষ্ট মনে
নিজ রাজ্য করয়ে বিস্তার।
নদ নদী ধরাধর পশুপক্ষী নারী নর
সবে পদে করে নমস্কার।

তুমিও সেরূপ ছিলে আপনার পদ নিলে
নিজ বলে করি আরোহণ।
প্রকাশিয়ে দিক দশ প্রসারিলে নিজ যশ
গুণে বশ হল সর্বজন।

উচ্চপদে কিছুকাল না থাকিতে পোড়া কাল
তোমা ধনে হরণ করিল;
ভব ব্রত করি সায় তুমি ত ত্যজিলে কায়
নাম মাত্র এখানে রহিল।

বল শুনি গুণধাম কে মনে তোমার নাম
ভোলে আজি বঙ্গবাসী নরে?
সমাদরে সর্বজন করিয়াছে সংস্থাপন
তব মূর্তি প্রত্যেক অন্তরে।

আঁধারের আলো ছিলে শূন্য করে পলাইলে
পরিহরি গেলে ধন জন;
তুমি ত বিদায় লয়ে গেলে ভব পার হয়ে
শোকে দেখ সকলে মগন।
অপরে কি জানে বল; দিবানিশি নেত্রজল
বহিতেছে কেবল তাহার।
একবার যেই জন সুমধুর সম্ভাষণ
গুণরাশি! শুনেছে তোমার।
কিরূপে তোমার তরে বঙ্গবাসী খেদ করে
বর্ণে তাহা বর্ণিব কি করে।
দেখ আসি কতজন করিতেছে আয়োজন
তব কীর্তি রাখিবার তরে।
বল শুনি গুণাধার! কৃতজ্ঞতা উপহার
কিবা আর দিবে বঙ্গজন?
তব মৃত্যু সমাচার শ্রবণে প্রবেশে যার
ঝরে তার বিপদে নয়ন।
বসেছিলে উচ্চাসনে, দিনেকের তরে মনে,
হয় নাই গর্বের সঞ্চার।

সমান ভাবেতে রয়ে, কাঙালি বাঙালি লয়ে,
চিরদিন গেল হে তোমার।
নিরাশ্রয় অশরণ, আসিত যতেক জন,
তব পাশে হইতে সফল।
ছাড়িয়া সুখের ভূমি, নয়ন মুদিলে তুমি,
কত লোক হারালো সম্বল।
আপনি লভিতে যাহা, দরিদ্র অনাথে তাহা,
অনায়াসে করিতে প্রদান।
কৃপণের ভাব ধরে, যাচকে বিমুখ করে,
কর নাই কভু সমস্থান।
তোমার সদ্‌গুণ যত, লিখিয়া জানাব কত,
বাঙ্গালির হৃদে গাঁথা আছে।
জ্বলে উঠে শোকানল, নয়নে না রহে জল,
গেলে তব ভবনের কাছে।
সতত আলোকময়, ছিল তবে যে আলয়,
পূরিত উৎসব কোলাহলে।
তৃষিত অনাথ দল, ঢালিত সান্ত্বনা জল,
তাপিতের হৃদয় অনলে।
তোমা ধনে হারাইয়া, পথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া,
আজি যেন করিছে রোদন ॥
সে শোভা নাহিক হায়! জনপ্রাণী নাহি যায়
পড়ে আছে অনাথ মতন!
ভাসে যেন নেত্রজলে, পথিকে ডাকিয়া বলে,
"হে পথিক দাঁড়াও দাঁড়াও।
বলিছে বিনয় করে, প্রভুর সম্মান তরে,
একবার সম্ভাষিয়া যাও।"
যতেক অপর লোক, ক্ষণকাল করে শোক,
নিজ কাজে হইবে তৎপর।
কোথা তব সুত দারা, কোথায় রহিল তারা,
কে জুড়াবে তাদের অন্তর!
তুমিও হইলে পার, করে সব অন্ধকার,
সুখ রবি গেল অস্তাচলে।
এত সুখে ছিল যারা, কেমনে বল হে তারা,
প্রবোধিবে মানসে কি বলে?

বিলাপে কি হবে আর, সার মাত্র হাহাকার,
ফিরে আর পাব না তোমারে।
শোভা করে বসেছিলে, অসময়ে মিলাইলে,
হেন ক্ষতি কে পূরিতে পারে?
দোষ ভাগ ছিল যাহা, আ ম কি বলিব তাহা,
দোষে গুণে সকলে জড়িত।
সহৃদয় বঙ্গবাসী, স্মরি তব গুণরাশি,
ভুলিয়াছে হইয়া মোহিত।
তব অপরাধ যাহা সদয় হইয়া তাহা,
জগদীশ করুন মার্জনা।
নিজ কোলে দিয়ে স্থান, করুন বিশ্রাম দান,
এক মনে করি এ প্রার্থনা।

চৈত্রমেলা[১]

১

আহা কি অপূর্ব শোভা আজি এ কাননে।
যেদিকে ফিরিয়া চাই সেদিকে দেখিতে পাই
হাসেছে খেলিছে সবে আনন্দিত মনে।

২

কোলাহলে পরিপূর্ণ সমুদয় স্থল।
জনস্রোত অনিবার বহে, নাহি সংখ্যা তার
পদভরে যেন ভূমি করে টলমল।

৩

আজ কি অভাগা বঙ্গ মেলিল নয়ন রে
মেলিল নয়ন?
ছাড়রে নিদ্রার ঘোর রজনী হইল ভোর
উঠে দেখ পূর্বাচলে উদিত তপন।

১। নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে যে চৈত্রমেলা (পরে হিন্দুমেলা) স্থাপিত হয়, তার প্রথম অধিবেশনে শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য) এবং এ সভায় একটি স্বদেশপ্রেমাত্মক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অদ্যাবধি কোন সমালোচক কবিতাটির উদ্ধার করেননি। কিন্তু ৮০টি শ্লোক প্রকাশিত হওয়ার পর আর প্রকাশিত হয়নি। কবিতাটি সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক যা লিখেছেন ভূমিকা হিসাবে, তা উদ্ধৃত করছি: "গত চৈত্রসংক্রান্তির মেলাতে যে পদ্যপ্রবন্ধটী পঠিত হয়, তাঁহাই প্রকারান্তরিত করিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করা যাইতেছে। রাজা বৈদ্যনাথের চিৎপুরের উদ্যানে সামাজিক উন্নতি সাধন উদ্দেশে এই উৎসবটী সম্পাদিত হয়।"

—'সোমপ্রকাশ', ২৮এ শ্রাবণ ১২৭৪, ৩৯ সংখ্যা।

৪

বঙ্গবাসি! আর কত থাকিবে নিদ্রায় রে
থাকিবে নিদ্রায়?
জাগ জাগ নারী নর উঠ বাঁধ পরিকর
অলসে পড়িয়া আর কেন রে শয্যায়?

৫

জন্মে নাকি বীরপুত্র বঙ্গের উদরে রে
বঙ্গের উদরে?
আমরা কি চিরদিন হয়ে আছি পরাধীন
চিরদিন আছি কিরে নত মুখ করে?

৬

বঙ্গজন! ভ্রাতৃগণ! কর প্রণিধান
পাব না সময় আর, মনসুখে একবার
বঙ্গের মহিমা পূর্ব করি আজ গান।

৭

রাজসূয় করি যবে পাণ্ডবতনয়
এ দেশ জয়ের তরে পাঠাইলা বৃকোদরে
বঙ্গ কি হেন ভীরু ছিল সে সময়?

৮

সমুদ্র ও চন্দ্রসেন ভূপতি দুজন,
রাখিতে দেশের মান, সাহসে সঁপিল প্রাণ
করিল পাণ্ডব সনে ঘোরতর রণ।

৯

বঙ্গের সে শুভদিন আসিবে কি আর রে
আসিবে কি আর?
আর কি সে সুখ পাবে, হীনতা জড়তা যাবে,
জননী বিনত মুখ তুলিবে আবার?

১০

সিংহবাহু নামে এক ছিল নর বর
বিজয় নামেতে তাঁর ছিল পুত্র নাম যাঁর
করিলে নাচিয়া উঠে উল্লাস অন্তর।

১১

অভিমানে পিতৃগৃহ ত্যজিল বিজয়।
রাজ্যসুখ বিসর্জিয়ে, জলযানে আরোহিয়ে
জলনিধি পথে বীর চলিল নির্ভয়।

১২

সাহসে অসম বীর বিক্রমে অটল
রাজধানী পরিহরি, সাহসে নির্ভর করি
ভাসিল জলধি জলে লয়ে দল বল ।

১৩

নবীনা রমণী তার পতিব্রতা সতী
ভোগসুখ অবহেলে, রাজভোগ পদে ঠেলে
কুমারের পিছে পিছে চলিলা যুবতী ।

১৪

বহরে পবন বহ খেলরে সাগর
অরে খেলরে সাগর ।
বীরবালা বীরবর, হইয়াছে অগ্রসর
কখন বিপদ ভয়ে কাঁপে না অন্তর ।

১৫

বহিয়া চলিল তরি করে মার মার
দাপটে নাচিছে জল, দেখিয়া বীরের বল
ভয়ে ভয়ে যেন পথ দেয় পারাবার ।

১৬

এ রূপে দম্পতি যায় আনন্দিত মনে
দিক দশ আবরিয়ে, জলস্থল আচ্ছাদিয়ে
একদিন ঘনঘটা ছাইল গগনে ।

১৭

নীরব নিস্তব্ধ দিক হইল গভীর
সৌদামিনী তড় তড়, ছোটে বজ্র কড়মড়
গগন ফাটিয়া যেন হয় শতচির ।

১৮

দেখিতে দেখিতে উঠে বিষম তুফান,
সিন্ধু মত্ত ভাব ধরি, উথলে গর্জন করি,
নাচিল তরঙ্গমালা উড়িল পরাণ ।

১৯

উঠে আর পড়ে তরি মত্তের মতন
ছিন্ন হলো রজ্জুজাল, ছিঁড়িয়া পড়িল পাল
গেলরে গেলরে সব রাখে কোন জন ।

২০

একে একে যত তরী ডুবিতে লাগিল
চারিদিকে হাহাকার, কেবল রোদন সার
নির্দয় সাগর সব উদরে পূরিল।

২১

কত বীর দিল প্রাণ জলধির জলে।
জানুপাতি বার বার, দেবে করি নমস্কার,
দেখিতে দেখিতে সবে গেল রসাতলে।

২২

এই কি তোমার খেলা গর্বিত সাগর?
কি সুখ ইহাতে পাও, কোথায় লইয়া যাও
এত খাও তবু কিরে পূরে না উদর?

২৩

এই কি নির্দয় সিন্ধু খেলা রে তোমার?
বঙ্গের হৃদয় ধন, ছিল যত বীরগণ,
তা সবে হরিলে আজ করি অন্ধকার।

২৪

এ দিকে তরির পৃষ্ঠে, দাঁড়ায়ে বিজয়,
হাবুডুবু করে তরী, এক পটদণ্ড ধরি[১]
বাহিরে দাণ্ডায় বীর নির্ভয় হৃদয়।

২৫

ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিতেছে সকল শরীর
করিছে অভয়দান, বীরের গর্বিত প্রাণ
মুহূর্তের তরে কভু না হয় অস্থির।

২৬

সামাল সামাল রব মুখেতে কেবল।
কত সামালিবে আর, রুষিয়াছে পারাবার
পদতলে গুঁড়া হয়ে পড়িছে অচল।

২৭

প্রেয়সীর তরে শুধু, হৃদয় কাতর
ভাবে, জল আস্ফালনে, না জানি সে এতক্ষণে
পড়েছে অজ্ঞান হয়ে তরির উপর।

১। পটদণ্ড—মাস্তুল।

২৮

চকিতা হরিণী মত বুঝি এতক্ষণে।
ভাসিয়া নয়নজলে, কোথা প্রাণনাথ বলে
অভাগারে বার বার করিছে স্মরণ।

২৯

অথবা পবন বলে বুঝি রসাতলে
গিয়াছে তাহার তরি, আহা মম প্রাণেশ্বরী,
বুঝিবা মিশালো আজ জলধির জলে।

৩০

এরূপ ভাবিছে তরি ভাসিয়া চলিল।
বিনা কর্ণ কর্ণধার, রোধে তারে সাধ্য কার
দেখিতে দেখিতে গিয়া লঙ্কাতে পড়িল।

৩১

হেথা কামিনীর তরি ঝটিকা পবনে
বেগে, ছিন্নভিন্ন হয়ে, ক্রমে যুবতীরে লয়ে
মহেন্দ্র দ্বীপেতে আসি লাগে কতক্ষণে।

৩২

দ্বীপের উপরে তবে উঠিল কুমার
বীর প্রাণী ছিল যারা, কোথায় গিয়াছে তারা
সে সকলে রত্নাকর করেছে সংহার।

৩৩

তথাপি সাহসে ভর করিয়া বিজয়
লয়ে সৈন্য গুটিকত, গর্বিত রাজার মত
প্রবেশিল রাজপুরে নির্ভয় হৃদয়।

৩৪

বাজিল কঠোর রণ যক্ষোরাজ সনে
যোঝে বীর ঘোরতর, ত্রাহি ত্রাহি নারীনর
লক্ষ লক্ষ যক্ষ গেল শমন সদনে।

৩৫

সমর চত্বরে যেন নাচে যুবরায়
কঠোর অসির ঘায় মস্তক উড়িয়া যায়
রুধিরার্দ্র হয়ে কত ধরাতে লোটায়।

৩৬

মার মার রবে বীর হয় অগ্রসর
প্রচণ্ড আঘাত তার, সহ্য করে সাধ্য কার
"পলারে পলারে" রব উঠে ঘোরতর।

৩৭

সর্পের জিহ্বার মত খেলে তরবার।
রথ রথী গজ হয়, একেবারে চূর্ণ হয়,
গেলরে গেলরে যক্ষ কে করে নিস্তার।

৩৮

ধন্য ধন্য শস্ত্র শিক্ষা ধন্য বীরপণা!!
অস্ত্রে অস্ত্রে ঠকাঠকি, খেলে যেন চকমকি,
ঝিক ঝিক উঠিতেছে অনলের কণা।

৩৯

এরূপে যুঝিছে বীর কালান্তের প্রায়।
পড়িল যক্ষের দল, বীরশূন্য রণস্থল
কল কল শোণিতের নদী বহে যায়।

৪০

পরিশেষে যক্ষপতি করিল শয়ন।
অবশিষ্ট যক্ষ যত, হলো সব পদানত,
কুমারেরে দিল সবে রাজসিংহাসন।

৪১

রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে বীরবর।
প্রখর দোর্দণ্ড তাপে, যক্ষপুরী ভয়ে কাঁপে,
অনল সমান বীর জ্বলে নিরন্তর।

৪২

এরূপেতে কিছুকাল বিগত হইল
সুখের নাহিক পার, রূপেগুণে ভুলে তার
যক্ষরাজ বালা তারে পতিত্বে বরিল।

৪৩

শুনিলে এসব কথা লাগয় বিস্ময়।
মাথা তোল বঙ্গভূমি, সত্য করে বল তুমি,
দিয়াছিলে হেন বীরে উদরে আশ্রয়?

৪৪

হায়রে সে দিন তব ফিরিবে কি আর ?
আর কি আরোহি তরী সাহসে নির্ভর করি
তোমার তনয় যাবে সাগরের পার ?

৪৫

এমনি সাহসী এবে বঙ্গের সন্তান
আবাস কোটর ফেলে, দুদিনের পথে গেলে,
যাই যাই করে যেন কেঁদে উঠে প্রাণ ।

৪৬

বঙ্গের পূর্বের কথা জানে কোন্ জন ?
সেকথা শুধাব কারে কে তারে বলিতে পারে
বিস্মৃতি সলিলে সব হয়েছে মগন ।

৪৭

জন্মেছিল বঙ্গে কত বীর অবতার ।
মাথা তোল বঙ্গভূমি প্রকাশি বল মা তুমি
মাতা বিনা পুত্রগণ কে জানিবে আর ।

৪৮

দেখাতে পারি না মুখ মরি মা লজ্জায়
সকলে দুর্বল বলে ঘৃণা করে পদে দলে
ছি ছি এত অপমান সহা নাহি যায় ।

৪৯

নাহি কোন স্মৃতিস্তম্ভ নাহিক কবর ।
নাহি নাম পরিচয় হইয়া অঙ্গারময়
মাটীতে মিশাল কত শূর বীরবর ।

৫০

কি করিব ? কোথা যাব ? কে দিবে বলিয়া
বল মা কিরূপে তবে, তাদের উদ্ধার হবে
কে তোমার আছে বন্ধু দেহ দেখাইয়া ।

৫১

সাগর বাহিনি ! অয়ি দেবি ! ভাগীরথি !
যুগ যুগান্তর হতে তুমি তো গো এই পথে
চিরদিন একভাবে যাও স্রোতস্বতি ।

৫২

পতিতপাবনী তুমি বলে সর্বজন।
সেকারণে তব তীরে না জানি যে কত বীরে
পুরাকালে বঙ্গবাসী করেছে দাহন।

৫৩

পার যদি পয়স্বিনি! জীয়াও সকলে।
তা না পার এই ক্ষণে নিস্তেজ বঙ্গীয়গণে
ভাসাইয়া লইয়া যাও সাগরের জলে।

৫৪

সাগর সন্তানে তুমি! করেছ উদ্ধার
বঙ্গেরে করুণা করি অমৃত তরঙ্গ ধরি
জীয়াও সে বীরগণে দেখি একবার।

৫৫

তুমি ত গো সিন্ধুপ্রিয়ে দেখেছ সকল।
সগরের রাজ্য যবে ছিল এই দেশে তবে
বল বঙ্গমাতা হলো কিরূপে বিকল?

৫৬

বল শুনি বল শুনি সেই পুরাকালে
ছিল না কি হেন বীর? সদর্পে যে দিত শির
সমর চত্বরে সুখে আলিঙ্গনকালে?

৫৭

বাঙ্গালির পোড়া দেহে ছিল না রুধির?
ছিল না কি তরবার প্রখর আঘাতে যার
ধরাতলে গড়াগড়ি যেত শত শির।

৫৮

ছি ছি এ লজ্জার কথা বলিব কাহায়।
হা অভাগি বঙ্গভূমি! মৃতকল্প আছ তুমি।
নতমুখে কাঁদি শুধু হেরিয়া তোমায়।

৫৯

স্বাধীনতা হারা হয়ে মগধের[১] করে।
শ্রীহীন অনাথ মত কত কাল হলো গত
ডুবিল গৌরব রবি কলঙ্কসাগরে।

১। মগধের=মগেদের (?)—সম্পাদক।

৬০

তারপর পাণ্ডবংশে রাখিল সম্মান।
উঠ মা জননি বলে তুলে নিজ বাহুবলে
অপহৃত মণি তব করিল প্রদান।

৬১

আবার উড়িল কেতু তব করতলে
দূরে গেলো মনোদুখ তুলিলে মলিন মুখ
শোভিল মধুর হাসি বদন মণ্ডলে।

৬২

রাজমাতা হয়ে মাতা রতন আসনে।
বসিলে তুলিয়া শির যশোগান সুগভীর
গাইল ভারতবাসী ভবনে ভবনে।

৬৩

পূজিতে জননী তব চরণ কমলে।
কত শত রাজা আসি বিবিধ রতন রাশি
লহ দেবি লহ বলে দিল পদতলে।

৬৪

তব পার্শ্বচরী ঘোর অটল বাহিনী।
শত শত নৃপতির উন্নত গর্বিত শির
তব পদে নত করি দিল ওজস্বিনী।

৬৫

তোমার গর্বিত কেতু কলিঙ্গ হৃদয়ে
নিখাতিয়া মদভরে বঙ্গদর্প চূর্ণ করে
ফিরে এলো রণমদে উন্মাদিনী হয়ে।

৬৬

এইমাত্র জানি মাতঃ শুনি লোকমুখে
কিরূপে সে বীরবংশ বল মা হইল ধ্বংস।
স্মরিলে তাদের কথা ভাসি মনোদুখে।

৬৭

ক্রমে গেল পাল শশী অস্তাচল শিরে
এদিকে উজ্জ্বল ছবি ধরি বৈদ্যবংশ রবি
দেখা দিল পূর্বাচলে আসি ধীরে ধীরে।

৬৮

দিগন্ত প্রসারি তার ছুটিল কিরণ।
আবার বঙ্গের যশ উজলিল দিক দশ
আবার ভাতিল বঙ্গে রতন আসন।

৬৯

এই বংশে কত বীর জন্মি কতবার,
প্রকাশিয়ে ভুজবল বিনাশিয়ে অরিদল,
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ রাজ্য করিল বিস্তার।

৭০

সে হেন উজ্জ্বল বংশে সেই ভুজবল,
সে হেন উন্নত নাম, সে হেন সুখের ধাম
কালেতে বিলীন হায় হইল সকল।

৭১

কোথা হতে সিন্ধুপার হইয়ে যবন।
রাহুর সমান আসি সুখের শশাঙ্ক গ্রাসি
চাপিল বঙ্গের গলে গর্বিত চরণ।

৭২

কাতরে কাঁদিলা মাতা পড়ি ধরাতলে
আলু থালু কেশ পাশ, ছিন্ন ভিন্ন হলো বাস
কাতরে তিতিল মুখ নয়নের জলে।

৭৩

মাতার এ দশা দেখি অন্ধের সমান,
সুখাসক্ত পুত্রগণ ফেলে তাঁরে সর্বজন
আপন আপন বিলে করিল প্রস্থান।

৭৪

অপমানে নতমুখী মুদিয়া নয়ন,
অনাথা বন্দীর মত জননী কাঁদিলা কত
বধির সে বঙ্গবাসী কে করে শ্রবণ!

৭৫

ধিক্ রে লক্ষ্মণ সেন ধিক্ শতবার।
ধিক্ তব সিংহাসনে, ধিক্ তব মন্ত্রিগণে
ধিক্ ধিক্ নরপতি নামেতে তোমার।

৭৬

ছিল না কি হলাহল তোমার ভবনে
কেন রজ্জু দিয় গলে না ডুবিলে গঙ্গাজলে
কেন তুমি বসেছিলে রাজ সিংহাসনে।

৭৭

থাকিয়া স্বাধীনভাবে গৃহে আপনার
যদি পাত্রমিত্র সনে প্রবেশিতে হুতাশনে,
তাহলে ত এ কলঙ্ক ঘটিত না আর।

৭৮

হা কি লজ্জা! অপমানে সরে না বচন
পলাইলে কি কারণে, ভেবেছিলে কি হে মনে
পলালে উৎকল দেশে এড়াবে শমন?

৭৯

সেই যদি যমপুরে করিলে গমন
তবে ধরি তরবার কেন হয়ে অগ্রসার
না করিলে রণক্ষেত্রে গর্বেতে শয়ন।

৮০

যদি নাহি ছিল তবে সৈন্যের সম্বল;
তবে কেন একেশ্বর করি রণ ঘোরতর
তুচ্ছ নরজন্ম নাহি করিলে সফল?

৮১

লম্বিত পলিত শ্মশ্রু রুধিরাক্ত করে।
সমর রঙ্গেতে প্রাণ দিতে যদি বলিদান
ঘুষিত তোমার যশ আজি ঘরে ঘরে।

৮২

কারানিবাসিনী কোন অভাগী কামিনী
যথা ঘোর অন্ধকারে ভাসে শোক অশ্রুধারে
বাম করে রাখি গণ্ড ভাবে একাকিনী।

৮৩

যবননিগড়বদ্ধ হইয়া তেমন,
বঙ্গমাতা বহুদিন আঁধারে যাপিলা দিন
রোগে জীর্ণ শোকে শীর্ণ মলিন বদন।

৮৪

মাঝে মাঝে এক এক বীর পুত্র তাঁর
করি সৈন্য আহরণ করিয়া জীবনপণ
মাতিল সমরে মাকে করিতে উদ্ধার।

৮৫

কিন্তু অসহায় কেবা কি করিতে পারে?
বল ছিল যতদিন যুঝি সবে হলো ক্ষীণ
সাশ্রুনেত্র হয়ে শেষে হেরিল মাতারে।

৮৬

প্রতাপ আদিত্য রাজা আদিত্য সমান
এরূপ যবন সনে করি রণ প্রাণপণে
নিজ বীরত্বের সাক্ষ্য করিল প্রদান।

৮৭

ধন্য তুমি বীরবর করি নমস্কার
ধন্য তুমি গুণধাম ভুলিব না তব নাম
রাখিব রাখিব গাঁথি হৃদয়ে আমার।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)*

*আর প্রকাশিত হয়নি।—সম্পাদক।

উৎসর্গ পত্র

হে সারদে! আসিবে কি বারেক জননি!
অকৃতি পুত্রের কাছে। কত রত্ন মণি
দিয়াছ মা দয়াময়ি! পূর্ব-কবিগণে,
চাহি না জননি! আমি তোমার সদনে,
চাহি না মা সে সকলে। আশা একবার
গাঁথিব কোমল গুণে কবিতার হার।
নাহি কাব্য ফুল-বন; তোমারে তুষিতে
মধুর মধুর ছন্দ নারিব রচিতে।
গৌড়জন যাতে সুধা পিয়ে নিরন্তর।
হয়ত এ তুচ্ছ মালা, বঙ্গবাসি নর,
ঘৃণাতে চরণে ঠেলে দিবেক ফেলিয়া,
চিরদিন ধরাতলে থাকিবে পড়িয়া।
হে শ্রীশ! তুমিরে ভাই কর পরিধান;
গেঁথেছি যতনে তাই! রাখরে সম্মান।
যাক তারা মধুবনে যাহাদের মন,
কোকিলের মধুধ্বনি করিতে শ্রবণ;
যাক যাক অলিরাজ মধু তামরসে,
যদি তার আস্বাদিতে আশা নবরসে।
অল্পেতে সন্তুষ্ট ভাই! তোমার অন্তর,
তুমি শুন মম সনে, বাড়াও আদর।
নীরস এ তুচ্ছ হার দিনু উপহার,
পর গলে হোক শ্রম সার্থক আমার।

তোমারি—
শ্রীশিঃ—

বিজ্ঞাপন

এতদিনে সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। 'নির্বাসিতের বিলাপে'র জন্মের কথা কিছু বলা উচিত। প্রায় দুই বৎসর গত হইল একজন ভদ্র-সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চিরজীবনের মত নির্বাসিত হন। তাঁহার যাইবার দিন তাঁহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল; সেই উপলক্ষে গুটিকত পংক্তি লিখিয়া 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ করিলাম। আর অধিক লিখিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু 'সোমপ্রকাশ'সম্পাদক মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট অংশ চাহিলেন। তাঁহার মত লোকের সন্তোষ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগত লিখিতে লাগিলাম। চতুর্দিক হইতে অনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু মধ্যে আমার মনের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এ বিষয়ে এক প্রকার উপেক্ষা করিয়াছিলাম। অবশেষে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শে ও অন্য বন্ধুদিগের আগ্রহে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পুস্তকখানি, বিশেষতঃ শেষভাগটী বড় তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছে। জানি না, পাঠকগণ ইহাতে আনন্দের দ্রব্য কিছু পাইবেন কিনা; যাহা হউক ভ্রম প্রমাদাদি দেখিলে অথবা কোনস্থল অসংলগ্ন বোধ হইলে পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া কোন প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ করিবেন, দ্বিতীয়বার পরিশুদ্ধ করিতে পারি। স্বপ্নাংশটী একটী ধারাবাহী রূপক। আশার সাহায্যে বিষাদসাগর ও বিপদের ঝটিকা উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্য কিরূপে মনে মনে কল্পিত সুখ ভোগ করে এবং পরে যুক্তির বলে সে সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে কিরূপে নিজ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

অবশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে মান্যবর শ্রীযুক্তবাবু শিবচন্দ্র চৌধুরি মহাশয় সম্পূর্ণ ব্যয় সাহায্য না করিলে পাঠকগণ আজিও 'নির্বাসিতের বিলাপ' দেখিতে পাইতেন না।

কলিকাতা।
সংস্কৃত কলেজ।
সংবৎ ১৯২৫, ৩০এ অগ্রহায়ণ

শ্রীশিঃ—

নির্বাসিতের বিলাপ

প্রথম কাণ্ড

আন্দামান দ্বীপ। স্থান—সমুদ্রতট। সময়—গোধূলি

একি হে জলধি! আজ করি বিলোকন,
কেন হে ভীষণ ভাব করেছ ধারণ?
এ হেন চপল কেন তোমার হৃদয়
হইল, অপারসিন্ধু! বল এসময়
কেন হে তরঙ্গ ভঙ্গী করি বার বার
করিছ আঘাত কূলে? হায় হে আমার
দুঃখ দেখে রত্নাকর। হয়ে কি দুঃখিত,
তোমার হৃদয় আজ হলো উচ্ছ্বসিত?
নতুবা গম্ভীর তুমি বিদিত ভুবনে,
একি দেখি নীর নিধি! কি ভাবিয়া মনে,
খেলিছ মত্তের মত এহেন সময়?
জান না কি, এ পাপীর চঞ্চল হৃদয়
হইত সুস্থির ভাই। করি দরশন
তোমার গম্ভীর মূর্তি? অভাগার মন
হেরিয়া তোমার ভাব হইত সবল;
সেই তুমি আজ কেন এরূপ চঞ্চল।
তুমি যদি ভুলিলে হে আপনারে ভাই!
বল তবে হতভাগ্য কার কাছে যাই?
আপন পাপের ফল ভোগ করিবারে,
আছি এই জন-শূন্য জলের মাঝারে;
নাহি হেথা সুতজায়া সান্ত্বনা করিতে
এ হেন বিপদকালে; নাহি কেহ দিতে
এক বিন্দু নেত্র-জল আমার রোদনে,
মিশাতে হৃদয়-ব্যথা হৃদয় বেদনে।
যেদিকে ফিরিয়া চাই দেখি শূন্যময়;
উদাসে সতত কাঁদে পাপিষ্ঠ হৃদয়।
চাহি আমি বন পানে দেখি তরুগণ
বিষাদ-কালিমা মাখি মলিন বরণ;
নাহি নড়ে পাতা; পাখী না ডাকে কুলায়ে;
কে যেন রেখেছে শোকে সবারে ডুবায়ে।
চাহি আমি নিশাকালে গগন-মণ্ডলে,
দেখি শশী সুধা-রাশি-বিষাদ কজ্জলে,

মাখা হয়ে, হীন-কান্তি, না হরে নয়ন ;
একান্তে রজনী সনে করিছে রোদন।
চাহি আমি শোক-ভরে এদিকে যখন,
তখনি তটিনীপতি ! করি দরশন,
যেন তুমি এ পাপীর দুঃখেতে রাষিয়া,
কূলে কূলে এ বারতা বেড়াও ঘুষিয়া।
দিবা অবসানকালে, যবে দিনমণি
ধীরে ধীরে তব নীরে ডোবেন আপনি,
যবে বিহগের কুল ত্যেমা পরিহরি
যায় সবে নিজ নীড়ে কলরব করি,
যবে সুখময়ী ধরা কুসুম-দশনে
হাসেন মনের সুখে, বিমল গগনে
খেলায় চাতক যবে প্রেয়সীর সনে,
চরাচর বিশ্ব যবে হয়ে একতান
আনন্দে মাতিয়া করে ঈশ-গুণ-গান,
এই হতভাগা শুধু একাকী তখন
আসে ভাই নীরনিধি ! করিতে রোদন
বসিয়া তোমার কাছে। সে হেন সময়ে
না হয় সুখের লেশ এ পাপ-হৃদয়ে।
ছিলাম পরমসুখে ; কেন পাপী মন
পড়িল লোভের ফাঁদে, হইতে মগন
অপার দুঃখের নীরে ! হায় রে দুর্মতি !
না ভাবিলি সে সময়ে এসব দুর্গতি।
দারা, সুত, ভাই, বন্ধু, প্রিয় পরিবার
না পাইল তোর কাছে তিল অধিকার !
যে ধনের লোভে তুমি হয়ে জ্ঞান-হারা,
ভুলেছিলে অনায়াসে নিজ সুত-দারা,
বলো রে পাপিষ্ঠ মন বলো রে এখন
কোথায় রহেছে পড়ে সেই পোড়া-ধন !
এই যে জীবন মত নির্বাসিত হয়ে,
রহেছে জলধি মাঝে বিষণ্ণ-হৃদয়ে,
এসেছ কি হেথা ধন বলো রে অজ্ঞান।
তোমার দুঃখের বহ্নি করিতে নির্বাণ ?
স্থির হও রত্নাকর ! কর হে শ্রবণ
অভাগা বিনয়ে যাহা করে নিবেদন।
হায় কিছুদিন পরে জীবন আমার
হইবে বিলীন ভাই, সমীপে তোমার।

ওই যে কুটীর দেখ, আমার সমান
গলিত মলিন বেশ, করিবে প্রদান
উহা মম পরিচয় কিছুদিন তরে ;
অবশেষে যাবে কিন্তু ধরার উদরে।
একটী মৃত্তিকা-রাশি থাকিবে ওখানে,
আমার অশ্রুর সাক্ষী, এই আন্দামানে।
তুমি ত প্রবল সিন্ধু! হেথা চিরকাল
থাকিবে সমানভাবে, সমান করাল,
যদ্যপি পথিক কেহ উঠে হে কখন
এই জন-শূন্য তীরে, চিন্তাতে মগন
হইবে নিশ্চিত ভাই, করি দরশন
মোর ভগ্ন-গৃহ-শেষ, ভাবিবে তখন
দাঁড়ায়ে তোমার তীরে কে এখানে ছিল,
কিবা নাম, কোথা ধাম, কবে বা মরিল।
বলো হে তাহাকে তুমি রতন-আধার।
'কিছুদিন ছিল হেথা এক দুরাচার ;
'পড়িয়া লোভের ফাঁদে পাপ-কর্ম করে,
'ছিল হেথা কারাবাসে জীবনের তরে ,
'জানি না তাহার নাম কোথা তার ঘর,
'কেবা পিতা, কেবা মাতা, কেবা তার পর,
'এই মাত্র জানি আমি, দিবা অবসানে
'আসিত সে মৃদুপদে আমার এখানে,
'বসি এই তরুতলে করিত রোদন
'রাখিয়া কপোল করে, ভাসিত বদন।
'যাও হে পথিক! যাও, কেন বার বার
'জিজ্ঞাস দুঃখের কথা সেই অভাগার।
'যাও তুমি নিজ গৃহে ; প্রাণের কামিনী
'আছে তব পথ চেয়ে বসি একাকিনী ;
'যাও তুমি নিজ-গৃহে, ছুঁও না চরণে
'ছুঁও না মৃত্তিকা-রাশি, কি জানি কেমনে
'সঞ্চারিবে পাপ-বিষ তোমার অন্তরে,
'পাপ-অস্থি আছে তার উহার ভিতরে।'
এদিকে দিবস-নাথ মহীরুহ-শিরে
দিয়ে কর, আশীর্বাদ করি ধীরে ধীরে,
আসি তবে বলে যেন লইয়া বিদায়,
ডুবিছেন সিন্ধু-নীরে। স্বর্ণ-কুম্ভ প্রায়,
নীল নীরে ভাসে রবি ; পশ্চিম গগনে
অপূর্ব সিন্দুর আভা শারদীয় ঘনে।

হেরে কান্তি পরিশ্রান্তি না মানে নয়ন,
সৌন্দর্য সাগরে যেন মগ্ন হয় মন ;
নীল জলে পড়ি আভা ইন্দ্রধনু-প্রায় ;
বিচিত্র বাখানে কেবা ! শাখীর শাখায়
মৃদু মৃদু কাঁপাইয়া বহে সমীরণ ;
প্রণমিছে রবিপদে যেন তরুগণ ।
হইল অপূর্ব শোভা কিবা চমৎকার !
ইহাতেও নাহি সুখ এই অভাগার ।
দিনমণি যায় দেখে ব্যাকুলিত মন,
বলিতে লাগিল তবে করি সম্ভাষণ :—
"কেন হে অম্বর-মণি ! লোহিত বরণ
ধরিয়া জলধি-জলে হইলে মগন ?
আমারি কি শোভা তুমি ধরেছ তপন !
এ পাপ রসনা বলো করিবে বর্ণন
কিরূপে এ হেন রূপ ? যতেক বচন
শুনেছি শিখেছি আমি সমস্ত জীবনে,
ফুরাবে সে সব দেব ! এ শোভা কীর্তনে ।
জগতে প্রকৃত সুখী তুমি দিনকর !
তুমি ধন্য পুণ্যবান্ ! বিশ্ব চরাচর—
হাসে দেব ! তুমি যবে খুলি হেম-দ্বার
গগন-প্রাঙ্গণে কর পদের সঞ্চার ।
তব পদার্পণে পাখী ভূধরে, কাননে
গৃহীদের প্রতি গৃহে আনন্দিত মনে
ঘুষিয়া বেড়ায় দেব ! তব আগমন ।
তামসী-তামস ভেদি তোমার কিরণ
পড়িলে গৃহের চূড়ে, নিদ্রায় কাতর
না থাকে কোথাও কেহ ; বিপিন, সাগর,
সবাই জাগিয়া উঠে আনন্দে মাতিয়া ;
মনের আনন্দ তরু প্রকাশে নাচিয়া ।
আবার এই ত তুমি যাও দিনমণি !
চেয়ে দেখ তব শোকে মলিনা ধরণী ;
চাহে না তোমাকে সতী দিতে হে বিদায়,
ধীরে ধীরে আসে যেন তব পায় পায় ।
যেই মাত্র যাবে তুমি জলধির জলে
ঝাঁপিয়া তামস-বাসে বদন-মণ্ডলে,
ঝিঁ ঝিঁ রবে বসি শুধু করিবে রোদন ;
তোমার ধ্যানেতে সতী থাকিবে মগন ।

দাঁড়াও দাঁড়াও রবি ! দাঁড়াও দাঁড়াও,
অভাগার গোটা কত কথা শুনে যাও ।
তুমি ত চলিলে দিক্ করি অন্ধকার,
বল না কি গতি করে গেলে হে আমার ।
এখনি আসিবে দেব ! সে কাল রজনী
বল তবে কার কাছে যাব দিনমণি !
এখনি প্রবল চিন্তা দহিবে হৃদয়,
কার কাছে দাঁড়াইব বল সে সময় ।
ত্রিযামা যামিনী মম যুগের সমান
তোমার অভাবে দেব ! হইবেক জ্ঞান ।
অনিবার শতধারে বরষা বহিবে,
নয়ন উপর দিয়ে নিশি পোহাইবে !
বলো হে কি বলি দেব ! মানসে বোধিব,
কিরূপে এ হেন নিশি বলো হে যাপিব ।
আর যে সহে না জ্বালা যায় যে জীবন ;
কি করিব কোথা যাব বলো না তখন ।
যাও যাও দিননাথ ! কি হবে শুনিয়া
পামরের দুঃখ-কথা ; বিজনে কাঁদিয়া,
যাক্ যাক্ অভাগার এ ছার জীবন ;
সেই পুরুস্কার মম কর্মের মতন ।
কেন আমি নিজ দুঃখে তোমার হৃদয়
করিব কাতর রবি ! কেন এ সময়
ধরিয়া তোমাকে আমি রাখিব এখানে ?
যাও যাও যাও দেব ! যাও নিজ স্থানে ।"
বলিতে বলিতে কথা ক্রমে দিনকর
ডুবিল নীরধি-নীরে ; রহিল সাগর ;
উঠিল পতত্রি-কুল বিমল গগনে
ছাড়িয়া জলধি-তীর ; বুঝি বা তপনে
কাতরে বিদায় দিয়ে, জলনিধি হতে
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে চলে নিজ পথে ।
মিশিয়া অনন্ত সিন্ধু অনন্ত আকাশে
প্রসারি আঁধার কুক্ষি চরাচর গ্রাসে ।
আসিছে রজনী দেখি হৃদয় কাঁপিল,
সম্বোধিয়া গন্ধবহে কহিতে লাগিল ;
মলিন কপোল দিয়া নয়নের জল
বহিল, ভাসিল তার বদন-মণ্ডল ।
"ওহে ভাই সমীরণ ! হইয়া প্রবল,
কেন হে নিরধি-নীর করিছ চপল ?

জানি ভাই সদাগতি ! তোমার যে বল,
কিবা শাখী বজ্র সম, অথবা অচল
অভ্রভেদী, চূড়া যার অশনি প্রহারে
না হয় কাতর কভু, থাকে একাকারে,
হয় যে পীড়িত ভাই ! তোমার মিলনে।
এই যে বিপুল ধরা, যাহার আননে
সুখের মধুর হাসি শোভিছে নিয়ত,
যাহাকে প্রকৃতি দেবী দিয়াছেন কত
শত শত অলঙ্কার, নিকটে তোমার
এ সকল, সমীরণ। বল কোন্ ছার।
আপন প্রতাপ যদি ভাই সদাগতি !
এখন দেখাও তুমি, কোথা বসুমতী
বিশাল, বিচিত্র, কোথা তুঙ্গ গিরিবর,
কোথা এ অপার ধীর গভীর সাগর,
কোথা বা নগরী, যাহা রাজদণ্ড ধরি,
করিছে শাসন সদা মহাদর্প করি
জগতের অর্ধভূমি, কোথা বা কানন
আমার কুটীর মত সতত বিজন
যাহার হৃদয়, ভাই ! তব বাহু-বলে
সাগর শুকায়ে যায়, ধরা ভাসে জলে।
মহাবীর তুমি ভাই ! করি হে স্বীকার ;
সবলে দেখাও বল ; নিকটে আমার—
দীন হীন ক্ষীণ আমি—কি লাভ তোমার
হইবে দেখায়ে বল বলো হে আমারে ?
কেবা করে ক্রম-সজ্জা কীট মারিবারে ?
শুনেছি পুরাণে আমি যবে রঘুবর
তরিয়া অপার ভীম দুস্তর সাগর,
যুঝিলেন লঙ্কাপুরে, করিতে উদ্ধার
আপনি জীবন-ধনে, যবে দুরাচার
দশাস্য-তনয়, রণে ঘোর নাগজালে
বাঁধিল তাঁহাকে, ভাই, তুমি সেই-কালে
মোচিলে বৈদেহী নাথে ; আজি একবার
করিবে কি পামরের এক উপকার ?
স্থির হও নভঃস্বন ! করি হে বিনয়
শুন এ পাপীর কথা ফাটিবে হৃদয়।
তুমি ত সমানভাবে সর্বদেশে যাও,
কত গিরি কত নদী দেখিবারে পাও,

কত দেশ কত রাজ্য কর নিরীক্ষণ,
কারো বা উন্নতি হয়, কারো বা পতন ;
যাও হে আমার গৃহে, বলো সবাকারে,
অসীম অতল ভীম জলধির পারে
আছে রে তোদের ধন ; ঝরিছে নয়ন
দিবস রজনী তার, করিয়ে স্মরণ
তোদের সরল ভাব, তোদের প্রণয় ;
ভুল না রে তাকে ; সে ত ভুলিবার নয় ।
দেখিতে পাইবে তথা অবলা দুজন,
দুখ-পারাবারে সদা রয়েছে মগন ।
বরষা বিরাজে ভাই, তাঁদের নয়নে,
বিষাদে মলিন মুখ শয়নে স্বপনে ।
তার মাঝে দেখিবে হে বৃদ্ধা এক জন,
না পান দেখিতে আর, গিয়াছে নয়ন
অনিবার বারিধারা করি বরিষণ ।
জেন হে মারুত ! তাঁকে দুঃখিনী জননী
এ পামর দুরাত্মার ; দিবস রজনী
নাহিক অপর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে ;
ভাবেন কৃতান্ত বুঝি আপন আলয়ে
হরেছে মাণিক তাঁর ;— অথবা কুমতি
পুত্রে তাঁর ;—সবিনয়ে বলো সদাগতি !
করিয়ে আমার হয়ে মাতৃ সম্বোধন,
বলো হে— "জননি ! আর করো না রোদন,
স্নেহময়ি ! মরে নাই আছে গো জীবনে
তোমার স্নেহের ধন ; জলধি-জীবনে
আছে এক মরু-দেশ, প্রকৃতি সুন্দরী
দূর হতে গিয়াছেন যারে পরিহরি,
সেইখানে রহিয়াছে তোমার তনয় ।
(তোমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত হয়
করিলে যাহার নাম তব পুত্র বলে)
দিবানিশি ভাসিতেছে নয়নের জলে ।
কি হবে কাঁদিলে মাগো ! আর তার তরে ;
বিধির লিখন বলো খণ্ডন কে করে ;
অয়ি মা ! সম্বর শোক করি দরশন,
তার এই হতভাগ্য সুতের বদন ।
কাঁদিয়া আমার কর ধারণ করিয়া,
বলিল সে কথা যত শুন মন দিয়া ঃ—

"কোথা ও মা স্নেহ-ময়ি! কোথায় এখন
আসিয়া পুত্রের দশা কর দরশন।
অপার জলধি-তীরে এ জীবন যায়,
এসে দেখ দয়াময়ি! রহিলে কোথায়
হায় গো পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার
আমা হতে না হইল কোন উপকার!
সহিলে যে কত দুঃখ পামরের তরে,
এ পাপ রসনা তাহা বর্ণিব কি করে।
ধরেছিলে জঠরেতে করিয়া যতন,
করেছিলে দয়াময়ি! পালন যখন,
তখন জননি! কি গো ভেবেছিলে মনে,
পয়োদানে অহি-শিশু পুষিছ ভবনে?
দিনেকের তরে পীড়া হইলে যখন,
নয়নের জলে মাগো! ভাসিত বদন,
তখন জননি! কি গো ভেবেছিলে মনে,
না যাবে সে জলধারা, থাকিবে নয়নে?
আসতাম দিবাশেষে জননি! যখন
ক্রীড়া করি, আধ-স্বরে কার সম্ভাষণ
মা, মা, বলে, যবে তুমি হাসিতে হাসিতে
'বাবা এস' বলি আসি, মুছাইয়া দিতে
সকল গায়ের ধূলি, আনন্দিত মনে
লইয়া অমৃত-কোলে, করিয়া বদনে
ঘন ঘন চুম্ব-দান, বসিয়া যতনে
করাইতে স্তনপান, আর মনে মনে
করিতে গো কত আশা, বলিতে—হৃদয়
স্থির হও কোনদিন চিরদিন নয়।
আর কি পারিবে কেহ সাহস করিয়া,
উপহাস করিবারে কাঙাল বলিয়া,
আর কি আঁধারে দিন করিবে যাপন,
আর কি পরের বাক্যে করিবে রোদন,
আর কি দুখিনী নাম থাকিবে তোমার,
কাঁদিবে মলিন মুখে বিজনে কি আর,
এতদিন সহিয়াছ থাক দিন কয়,
উঠিবে সুখের রবি নাহিক সংশয়,
এতদিনে দুখ তব শেষ করিবারে,
অমূল্য রতন বিধি দিয়াছে তোমারে,
রাজার জননী হবে, ভয় কি তোমার,
দিন কত সহে থাক কাঁদিও না আর;

এখন অন্নের তরে লালায়িত মন,
আপনি দুহাতে দান করিবে তখন,
কাঙ্গাল বলিয়া আজ করে উপহাস,
কালি তারা হইবেক পদানত-দাস,
আজি যারা অহঙ্কারে ফিরিয়া না চায়,
কালি তারা দীন-ভাবে লোটাই যে পায়,
পামর হৃদয়ে ধরি, করিয়া চুম্বন,
মানসে এ হেন আশা করিতে যখন,
তখন জননি ! কি গো ভেবেছিলে মনে
পয়োদানে অহি-শিশু পুষিছ ভবনে ?
হায় মা অন্ধের নড়ি বিধবার ধন,
একমাত্র পুত্র ছিনু, পাঠাতে যখন
বিদ্যালয়ে, নিত্য নব জ্ঞানশিক্ষা করি,
শুনাতাম যবে আসি উঠি ক্রোড়োপরি,
পুষ্পের কলিকাসম মানস আমার
দলে দলে ফুটে শোভা করিত বিস্তার,
দেখিয়া নির্জনে কত আনন্দে কাঁদিতে,
ঠাকুরে খুঁড়িয়া মাথা দীর্ঘায়ু করিতে,
ভাবিতে শিশুর শ্রেষ্ঠ কুলের গৌরব
হবে পুত্র, ঘুচাইবে দুঃখকষ্ট সব,
তখন জননি কিগো ভেবেছিলে মনে
পয়োদানে অহি-শিশু পুষিছ ভবনে ?
আয় মা হৃদয় চিরে এখন দেখাই !
পরাণে ঢেলেছি কালি মাখায়েছি ছাই।
সে শিক্ষা কুশিক্ষা মাগো ! যাতে ধর্মভয়,
না শিখায়, যে শিক্ষাতে তোমার তনয়,
পেয়ে সুবুদ্ধি খ্যাতি মূর্খের অধম,
নর   'ত্তির দাস পশু-সম।
করেছিলে যত আশা পূরিল সকল
মানসের কথা মনে রহিল কেবল !"

অপরে দেখিবে ভাই ! রূপে নিরুপমা,
শোভিতা যৌবন-ফুলে কমলার সমা।
সুশীল প্রকৃতি অতি, বিনীত বদন,
কিবা চারু বিম্বাধর, রুচির দশন,
স্বভাব-সলজ্জ তার নয়ন যুগল
রয়েছে শোভিত করি বদন-কমল,
সরলতা পবিত্রতা মাখা নিরন্তর,
প্রণয়ে উজ্জ্বল সেই আঁখি ইন্দীবর,

প্রসন্ন পবিত্র দৃষ্টি উপরে যাহার,
পড়িবে তখনি শান্ত হৃদয়-বিকার।
সে সুন্দর গণ্ড দুটী বুঝি বা এখন
নাহি আর সেইরূপ আরক্ত-বরণ,
অভাগার ভাবনায় বুঝি এতদিন
হাসি-হাসি মুখ-শশী হয়েছে মলিন।
আহা মরি! প্রিয়াসম কুসুম-কোমলা
না জানি সহিছে জ্বালা কেমনে অবলা।
হৃদয়ের বিকশিত কুসুম আমার,
আছে কিরে এতকাল সহিয়ে এ ভার!
অথবা পাপীর ঘর বুঝি শূন্য করে
জীবন-তোষিণী মম গেছে পরিহরে!
দূর কর অমঙ্গল, দূর কর ভয়,
প্রণয় দেবতা মম রহেছে অক্ষয়।
দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, নাগ, সিদ্ধ, গুহ্যক, অপ্‌সর,
যেবা যেথা আছ, পাপী করে নমস্কার,
পামরে করুণা কর, সুমুখী আমার
যেথা যাবে রক্ষী হয়ে থাকিও সকলে;
প্রেমের প্রতিমা মম যেন জলে স্থলে,
নিরাপদে চিরদিন করে হে যাপন;
স্পর্শিতে না পারে যেন দুরাত্মা শমন।
হায়রে জীবন মত আছি কারাগারে,
চিরদিন ভাসিতেছি নয়ন-আসারে,
তথাপি এ গুরুভার লঘু বোধ হয়,
যখনি হৃদয়ে ভাবি, বুঝি এ সময়
একাকী বিজনে বসি সে বিধু-বদন
স্মরি পামরের কথা করিছে রোদন!
ক্ষম অপরাধ প্রিয়ে! (অথবা কেমনে
প্রিয়া বলে ডাকি আর এ পাপ বদনে)
ক্ষমলো সুন্দরি! মোরে; স্নেহের কারণ
করেছি অনিষ্ট-চিন্তা; জানি প্রাণ-ধন!
জানি তুমি বিধুমুখি! অজর অমর,
অক্ষয় প্রেমের নিধি, স্নেহের আকর!
যাও যাও সমীরণ! তার পরিচয়
কত আর দিব বল, দেখিলে নিশ্চয়
জানিবে সে মুখ-তুলা এ ভারতে নাই;
কেমনে বর্ণিব তাহা ভাবিয়া না পাই।

কিন্তু ভাই সদাগতি! এবে কান্তি তার
মলিন বিলীন প্রায়; নাহি সে প্রকার।
দিনে দিনে স্বর্ণলতা শুকাইয়া যায়,
মলিন শশাঙ্ক-মুখ সলিল-ধারায়।
কে শুনিবে কারে কথা করে নিবেদন;
অন্তরে অন্তরে জ্বলে গুরু-হুতাশন।
দিবস গৃহের কাজে হয় অবসান;
প্রবল ভাবনানল নাহি পায় স্থান
তাহার কোমল হৃদে ভাই সমীরণ!
কিন্তু দিবসের রাজা যান হে যখন
ধীরে অস্ত-গিরিবরে করিতে শয়ন,
যখন তামসী আসি সুকোমল করে,
ধীরে ধীরে জীবগণে নিদ্রান্বিত করে,
যখন তামসরাশি করে আচ্ছাদন
দশদিক্, জল-স্থল, বলোহে তখন
কিরূপে নিবিবে তার মানস-অনল,
নিবাতে অনল বালা নয়নের জল
বরষে হৃদয়ে সদা, নিবিবে কেমনে
আগুন দ্বিগুণ হয় নিশ্বাস-পবনে।
অথবা নিষ্প্রভ হয়ে দিনেশের করে,
থাকে সে অনল বুঝি হীনভাব ধরে,
এখন রজনী এলে পেয়ে অন্ধকার,
অনল প্রবল প্রভা করে যে বিস্তার।
তাহাকে জানিবে ভাই! এই অভাগার
জীবের দ্বিতীয় ভাগ, বিভিন্ন আকার।
বলো তাকে সমীরণ! কুরঙ্গ-নয়নে!
কেন না ভূষণ খুলি; জলধি-জীবনে
রয়েছে হৃদয়নাথ; কর সম্বরণ
শোকাবেগ, বরাননে! করো না রোদন;
তাহার বিরহে তুমি কাতর যেমন
সেরূপ তোমার তরে কাঁদে সেই জন।
বলিল সে করে ধরে যে সব বচন
মন দিয়ে বিধুমুখি! করলো শ্রবণ:—
"অয়ি প্রিয়ে ইন্দুমুখি জীবনের ধন!
পামরের কথা কভু হয় কি স্মরণ?
যখন প্রেয়সি! তুমি ভাব মনে মনে
অভাগা কোথায় আছে, রয়েছে কেমনে

তখন কিরূপ হয় চিন্তার উদয়,
কিরূপ কাঁদিতে থাকে কোমল হৃদয়,
কল্পনা কিরূপ ছবি তখন দেখায়,
মানস হৃদয় ছাড়ি কোথায় পলায়,
এরূপ কি ভাব তবে হৃদয়ের ধন!
যখন অভাগা আসে ছাড়ি পরিজন
ছাড়িয়া জনমভূমি, লইয়া বিদায়
কাঁদিয়া তোমার কাছে—কি বলিব হায়
বলিতে সকল কথা বুক ফেটে যায়,
উথলে শোকের সিন্ধু, পরাণ ভাসায়—
তখন পথের মাঝে পবনের ভরে,
গিয়াছে তরণী তার জলধি-উদরে ;
সে সময়ে কোন নক্র অথবা মকর,
দয়া করে দেখায়েছে তারে যম-ঘর ;
অথবা তাহার তনু ভাসিতে ভাসিতে,
পড়েছিল এসে কোন পুলিন-ভূমিতে,
না ছিল রক্ষক কেহ, বন্ধু কোন জন,
দেখি তারে ধরাশায়ী করিতে রোদন,
শকুনি গৃধিনী আদি কিম্বা শিবাগণ
অনাথ পাইয়া তাকে করেছে ভোজন ;
রয়েছে কঙ্কাল তার বালুকা-উপরে,
পুড়িতেছে চিরদিন তপনের করে ;
কোথা সে মোহন তনু, পীড়াতে যাহার,
বিরসে যাপিত দিন যত পরিবার।
আজি সে অনাথ হয়ে পড়ে সিন্ধুতীরে ;
রয়েছে বালুকা-রাশি চারিদিকে ঘিরে ;
পদে দলে কত জীব করিছে গমন,
জানে না সেখানে পড়ে অভাগার ধন।
এরূপ ভাবনা তব কোমল হৃদয়ে,
হয় কি সুধাংশু-মুখি সে হেন সময়ে ?
কিন্তু হায়! কিবা পুণ্য করেছে পামর!
যার বলে সিন্ধু-জলে ত্যজি কলেবর
সকালে ভবের ব্রত করি উদ্যাপন,
শমন-সদনে সুখে করিবে গমন ?
অনিত্য নরার কায় থাকিবে ধরায়,
ঠেকিতে না হবে আর দহনের দায়।
মরিনি সুন্দরি! আমি ; রয়েছে জীবন
এখনো হৃদয়াগারে ; পাপ হুতাশন

এখনো জ্বলিছে প্রিয়ে! না হয় শীতল;
এখনো এ পোড়া নেত্রে বহে অশ্রুজল;
তোমার সে মুখ শশী প্রেম-তুলি দিয়া,
এখনো হৃদয়-মাঝে রেখেছি আঁকিয়া;
দিবাশেষে কার্য হতে আসি প্রাণ ধন,
অশ্রুজলে ভাসি তাহা করি দরশন।
এখনো মরিনি আমি আছিলো সুন্দরি!
দেখে সেই পূর্ণ-শশী আছি প্রাণ ধরি।"
দেখিবে সেখানে ভাই! সুঠাম, সুন্দর,
খেলিছে বালক এক; যেন নিজ স্মর
ধরি কলেবর, তথা হরষিত মনে,
বিহরে সতত; হায়! বলিব কেমনে
এতেক দুঃখের কথা! সেটী হে আমার
(হায় রে নয়নবারি আসে বার বার!)
সেটী হে আমার ভাই! হৃদয়ের ধন।
মরি মরি! এত শোক, এতেক রোদন,
তাহার কোমল হৃদে নাহি পায় স্থান;
হাসিছে খেলিছে সুখে নিতান্ত অজ্ঞান;
বিদেশে ভাসিছে পিতা নয়নের জলে;
পুড়িছে রজনীদিন মানস অনলে,
স্বপনে জানে না বাছা সুখে নিদ্রা যায়;
অপর বালকসনে খেলিয়া বেড়ায়;
জানে না বিরলে কেন তাহার জননী
ঢালে নয়নের জল দিবস-রজনী;
হাসিতে হাসিতে যবে, ভাই সমীরণ!
আসে তার মাতৃপাশে, হয় ক্ষুণ্ন-মন,
দেখিয়া কপোলে তাঁর নয়নের জল।
নিকটে দাঁড়ায়ে থাকে, বদন কমল
ভাসে, দেখি জননীর বিষণ্ণ বদন।
তারে দেখি শশি-মুখী শোক সম্বরণ
পারে না করিতে আর; ঘোর ভাব ধরে
প্রবল শোকের সিন্ধু উথলে অন্তরে।
'কেন মা কাঁদিস' বলে আধু আধু স্বরে,
সতত জিজ্ঞাসে তারে; বচন না সরে,
ধীরে ধীরে তুলি তাকে আপন হৃদয়ে,
অঞ্চলে মুছায়ে ধূলি, গদ্‌গদ হয়ে,
ধীরে বলে বিধুমুখী—"অভাগীর ধন!
কেন যে সতত বাপ করি রে রোদন

জিজ্ঞাস ভাগ্যকে, কেন জিজ্ঞাস আমারে।"
বোলো বোলো গন্ধবহ! বোলো হে তাহারে,
খেলরে মানস পুরে, খেল এ সময়
যত পার; হেন সুখ থাকিবার নয়।
আসিবে যৌবন, যবে ভাবনা অনল
জ্বলিবে প্রবল ভাবে; কত অমঙ্গল
ঘটিবে নয়নোপরে, যত যাবে দিন
বাল্যের কোমল সুখ হইবেক ক্ষীণ।
আসিবে এমন দিন জেন রে নিশ্চয়,
শুনিয়া পিতার কথা ফাটিবে হৃদয়;
লোকের গঞ্জনা শুনি হবে অপমান;
জীবন বিষণ্ণ হবে মরণ সমান।
দিও না কখন কান সে সব বচনে;
ঈশ্বরে করিয়া ভর সুখী থেকো মনে।
পাপীর সন্তান যদি বলে কোন জন,
বাছা রে! সহিয়া থেকো, করো না রোদন।
অপার জলধি-তীরে, হারায় জীবন
তোমার জনক, তাঁকে করো রে স্মরণ।
বলিতে বলিতে হেন, ক্রমে অন্ধকার
ডুবাইল গিরি, নদী, সকল সংসার;
শুনিতে শুনিতে কথা বীরেন্দ্র সাগর,
ক্রমশঃ নিদ্রায় যেন হইয়া কাতর,
সুনীল উত্তরী মুখে টানিয়া লইল।
মনো দুঃখে যুবা তবে বলিতে লাগিল :—
"ঘুমাও দুর্জয় সিন্ধু! ঘুমাও সাগর!
অকাতরে নিদ্রা তুমি যাও বীরবর!
জন্মেছি কাঁদিতে আমি কাঁদিব বিজনে,
রাখিব মনের কথা মানসে গোপনে!
হায় হে! অভাগা আমি সান্ত্বনার আশে,
প্রতিদিন জলনিধি! আসি তব পাশে,
কিন্তু আজ হতে সিন্ধু! আসিব না আর,
নিদ্রার ব্যাঘাত পাছে হয় হে তোমার।
এত বলি কুটীরেতে করিল গমন,
যুগসম নিশীথিনী করিতে যাপন।

দ্বিতীয় কাণ্ড

স্থান—কুটীর। সময়—সন্ধ্যা

নীরব সংসার। এবে তমোবাস পরি
আইলা রজনী যেন মৃত্যুর কিঙ্করী।
ধীরে ধীরে পদ ক্রম করি নিশি যায়,
নিবিড় তমসাঞ্চল পশ্চাতে লোটায়;
যমের ভগিনী নিশি কালিন্দী-সোদরা,
পদার্পণে ভয়ে ভীত অভিভূত ধরা।
ক্রমে স্তব্ধ চরাচর; কুলায়ে গোপনে
নিরবিল বিহঙ্গম; রাখিয়া যতনে
আপন শাবকগণে পাখার ভিতরে,
পাখাতে ঢাকিয়া মুখ নিদ্রা-ভোগ করে;
আপন আবাস-গৃহে, করিয়া শয়ন,
নয়ন মুদিয়া গাভী করে' রোমন্থন;
জননীর কোলে শিশু অঘোরে ঘুমায়;
আপনি প্রকৃতি-দেবী বিচেতন প্রায়;
সকলেই গাঢ় নিদ্রা করে অনুভব,
সুস্থির স্তিমিত সব, নাহি কোন রব;
কোলাহল কর্ণভেদ নাহি করে আর;
গভীর ধ্যানেতে যেন বসিল সংসার।
চরাচর বিচেতন প্রকৃতির কোলে;
কেবল দাঁড়ায়ে তরু বায়ুভরে দোলে;
খস্ খস্ খস্ শব্দ হয় ঘন ঘন,
বুঝিয়া বিরল পেয়ে এক প্রাণ মন
উর্দ্ধবাহু হয়ে তরু ঈশ-গুণ গায়;
কেবল শ্বাপদ-কুল আহার চেষ্টায়
ভ্রমিছে গহন মাঝে, মহা ভয়ঙ্কর;
সচকিত বনস্থলী কাঁপে থর থর।
অভাগা কেবল আর কুটীর-শয়নে
করিয়া শয়ন, দীন, ভাবে মনে মনে;
কত ভাব মনে আসে কত ভাব যায়,
নয়ন সমীপে বিশ্ব ঘুরিয়া বেড়ায়।
কভু দেখে, যেন আর নাহি কারাগার,
নাহিক দাসত্ব-পাশ পদযুগে আর,
নাহি সেই আন্দামান, নাহি সে সাগর,
এসেছে আবাস-ভূমে, ব্যাকুল অন্তর,

হেরিবারে সুতজায়া প্রিয় পরিজন,
উথলিছে সুখ-সিন্ধু, করি দরশন
আত্মীয় স্বজনগণে, হৃষ্ট চিতে পরে,
সুখের ভবনে যেন পদার্পণ করে।
দেখে যেন—রহেছেন দুঃখিনী জননী,
ভাবনায় শীর্ণকায় দিবস রজনী,
পদধূলি লয়ে যেন করিছে প্রণাম ;
গদ্‌গদ হয়ে যেন বলিতেছে নাম,
শুনিয়া পুত্রের স্বর চমকি তখন,
বলেন নিশ্বাস ছাড়ি—"কে রে, বাছাধন
ঘরে এলি ! আয় বাপ অমূল্য রতন !
আয় বাপ কোলে আয় জুড়াই জীবন !
কোথা ছিলি রে বাপ কত কষ্ট সয়ে
আহা মরি ! এসেছিস্ আধখানা হয়ে।
তোমাকে না দেখি যাদু যে দশা আমার,
কি বলিব একমুখে। দেখ সাক্ষী তার,
কেঁদে কেঁদে দুটি চোক গিয়াছে আমার ;
ভেবে ভেবে হয়ে গেছি অস্থি মাত্র সার ;
পোড়া-কপালীর বাপ বহুপুণ্য ছিল,
অন্তকালে বিধি তোরে মিলাইয়া দিল ;
যা হোক এসেছ বাবা কর রে সংসার,
এখন হইলে হয় মরণ আমার।"
দেখে যেন, বিনোদিনী গল-লগ্না হয়ে,
রাখিয়ে শশাঙ্ক মুখ পতির হৃদয়ে,
ধীরে ধীরে পতিব্রতা করে সম্ভাষণ :—
"বল বল প্রাণনাথ ! ছিলে হে কেমন ?
আজি সুপ্রসন্ন বিধি অভাগী উপরে,
সত্য সত্য প্রিয়তম এসেছ কি ঘরে ?
কিম্বা দেখিতেছি আমি জাগিয়া স্বপন ?
তোমার ফিরিয়া আসা নাহি লয় মন।
অভাগীরে কৃপা-নেত্রে আজি কে দেখিল,
হারা-ধন কোন জন কুড়াইয়া দিল।
বল বল প্রাণেশ্বর আমারে ছাড়িয়া,
বিদেশে থাকিতে তুমি কেমন করিয়া ?
শ্রমভরে ক্লান্ত তুমি হইতে যখন,
বল নাথ কেবা পদ করিত সেবন ?
সে সময়ে অধিনীর কথা মনে হলে
বুঝি বা ভাসিত বুক নয়নের জলে।"

দেখে যেন, একপাশে চিত্রিতের প্রায়
দাঁড়ায়ে পুত্তলি তার : সলিল ধারায়
সতত ভাসিছে তার কমল বদন,
জননী কাঁদিছে দেখি ব্যাকুলিত মন ;
অধরে না সরে কথা, হয়ে চমৎকার,
স্থির তর দৃষ্টিপাত করে বার বার
পিতার বদনে, আহা ! জানে না অজ্ঞান
কেন যে বদনে তার করে চুম্ব-দান,
ভয়েতে পিতার কোলে উঠিতে না চায়,
মাতার অঞ্চলে নিজ বদন লুকায়,
ভাবে এ কে ! কেন কোলে করিছে আমায়
সতত মাতার দিকে মুখ ফিরে চায়।

হায় মানবের সুখ চিরকাল নয় !
অস্ত যায় সুখ-শশী না হতে উদয় !
সৌদামিনী শোভে যথা নব বারি-ধরে :
নিমেষে মিলায়ে যায়, নিমেষেতে ধরে
পুনরায় নিজ শোভা, মনুজ-হৃদয়ে
সেরূপ সুখের গতি। প্রজ্বলিত হয়ে
ক্ষণকাল থাকে সুখ, হইলে নির্বাণ,
চারিদিক অন্ধকার নিশার সমান।
শিশুর কোমল মুখে, হাস্য কি রোদন,
না থাকে নিয়ত যথা, মানব কখন
সেইরূপ পায় সুখ দণ্ড দুই পরে
আবার ভাসিতে থাকে দুঃখের সাগরে !
দেখ, হেথা কুটীরেতে করিয়া শয়ন
অভাগা দেখিছে সুখে জাগিয়া স্বপন ;
সুখেতে হৃদয় তার উঠে উথলিয়া,
বহিছে আনন্দ-জল দুই গণ্ড দিয়া,
আধ বিকশিত তার সহাস্য বদন,
প্রণয়েতে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন ;
এ হেন সময়ে যেন সুগভীর স্বরে,
তাহাকে বলিল কেহ সম্বোধন করে ;—

"হায়রে অবোধ ! কেন বৃথা কষ্ট পাও,
ছি ! ছি ! কেন অকারণ জেগে নিদ্রা যাও !
একি ! জ্ঞান-শূন্য তুমি ! এ নহে তোমার
সুখের ভবন, হায় ! এ যে কারাগার !

দেখরে অবোধ ! চেয়ে, দুরন্ত সাগর
রয়েছে চৌদিকে ঘিরে, মহা ভয়ঙ্কর !
জান না একাকী তুমি রয়েছ পড়িয়া
অনাথ বিজন দেশে, তোমাকে দেখিয়া
আহা বলে দয়া করে নাহি হেন জন,
মনের আগুনে দিতে সান্ত্বনা জীবন ।
এই জনশূন্য তীরে নাহিক কিঙ্কর,
আপনি অভাগা তুমি আপনার চর ।
হলে কি পাগল ছি ছি ! বলরে অজ্ঞান !
কারে তুমি করিতেছ আলিঙ্গন দান ?
কোথা তব প্রণয়িনী ? রয়েছে হৃদয়ে
গলিত মলিন বাস ! কারে কোলে লয়ে
করিতেছ বার বার বদন চুম্বন ?
এ হেন মতির ভ্রম বল কি কারণ ?"
সহসা শুনিয়া যেন এ হেন বচন,
চমকি উঠিল যুবা ; বলে "পোড়ামন !
এ কি বিড়ম্বনা তোর ? বল রে আমারে,
কেন গিয়াছিলি বল সাগরের পারে ?
এই যে প্রবল সিন্ধু অসীম অপার,
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে মনে হলে যার
ভীষণ গভীর ভাব ; নিমেষে কেমনে
হলি পার এ অম্বুধি ? যদি বা ভবনে
গিয়াছিলি পোড়ামন ? তবে কি কারণ
ফিরে এলি পুনরায় হতে জ্বালাতন ?
তোর ত দুরাশা বড় হতভাগ্য মন !
পিঞ্জরের পাখী তুই, কেন আকিঞ্চন
সুস্বাদু বনের ফল করিতে আহার ?
ছি ছি মন ! জ্ঞান-শূন্য কেন এ প্রকার !
এই যে কুটীর দেখ জেন রে নিশ্চয়,
পামরের পাপদেহ পাইবেক লয়
ইহার উদরে কালে । চরণ যুগল
হইবে কাতর যবে, যবে যাবে বল
এ পোড়া শরীর হতে, বলো রে তখন,
কি হবে পাপিষ্ঠ মন ! বল কোন্ জন
পামরে করিবে দয়া ? কে দিবে আহার
তুলিয়া বদনে তোর বল দুরাচার ?
পীড়িত হইব যবে, ফাটিবে তৃষ্ণায়
কণ্ঠ, তালু, বল দেখি কে দেখিবে

পারিবে আপনভাবে ? যত যাবে দিন,
হইব নিতান্ত তত বিবর্ণ মলিন।
হয়ত অভাগা কেহ আমার সমান
আসিবে দেখিতে হেথা, করিবে প্রদান
আমার বদনে বারি করিয়া যতন,
কিন্তু সে আপন কাজ করিবে গমন
কিছু পরে দুরাত্মারে একাকী ফেলিয়া,
অনাথ অভাগা আমি শ্বসিব পড়িয়া,
বদনে বহিবে দুটী সলিলের ধার,
ধীরে কর যোড় করি বলিব— সংসার।
গুটাও মায়ার জাল, দাও রে বিদায়,
চলিলাম আজি আমি ছাড়িয়া তোমায়।
ভাঙ্গ তব ভোজ-বাজি, ছাড় তব খেলা,
ধর রে সরল মূর্তি যাইবার বেলা।
দিয়াছ অনেক জ্বালা যত মনে লয় ;
এখন ডাকিছে কাল, হয়েছে সময় ;
বিলম্ব না সহে আর ডাকে বার বার
আসি তবে, মনে রেখ করি নমস্কার।
বলিতে বলিতে হেন, নয়ন যুগল
আসিবে মুদিত হয়ে ; হৃদয় চপল
ধরিবে সুস্থির ভাব ; পাপিষ্ঠ জীবন
পাইতে পাপের শাস্তি করিবে গমন।
পরদিন সেইজন আসিবে যখন
দেখিতে কেমন আছি, করি দরশন
মুদিত নয়ন-যুগ, ভাবিবে নিদ্রায়
অঘোর রয়েছি বুঝি ; কিন্তু হায় হায়।
সেই নিদ্রা মহানিদ্রা জানিবে যখন
না জানি কিরূপ ভাব হইবে তখন।
হয়ত তখন অশ্রু গলিবে তাহার,
হয়ত নিশ্বাস ছাড়ি বলিবে,—"নিস্তার
পেলিরে অভাগা আজ ; হইল শীতল
মানস অনল তোর পেয়ে শান্তি জল।
বড় পুণ্য তোর ভাই। সক'ল সকাল,
গেলি ভাই পার হয়ে ; এ পোড়া কপাল,
না জানি বা কত জ্বালা ঘটাইবে আর।
আর কতদিনে আমি পাইব নিস্তার।"
বলিয়া এহেন কথা হয়ত গমন
করিবে আপন কাজে ; আমি অশরণ

থাকিব সেখানে পড়ে ; কিম্বা বোধহয়,
দয়া করে শুষ্ক কাষ্ঠ করিয়া সঞ্চয়,
সাজাইয়া চিতা, হায় ! করিবে দহন
পামরের এই তনু, বিষণ্ণ বদনা
জলধির তীরে রব হইয়া অঙ্গার,
কোথা সুত ! কোথা জায়া ! কোথা বা সংসার !"
বলিতে বলিতে কথা কাতর নয়ন
নিদ্রাতে কাতর ভাব করিল ধারণ।
সংসার হইতে মন পরাবৃত্ত হয়ে,
পুন প্রবেশিল যেন আবাস-হৃদয়ে ;
সর্বাঙ্গেতে যেন নিদ্রা-জ্বরের সঞ্চার,
মিলায় চৈতন্য যার চিন্তার বিকার।
রজনীর সখি ! দেবি ! বিশ্রাম-দায়িনি !
অয়ি সুধময়ি নিদ্রে ! এস লো কামিনি
এস এস দয়াময়ি ! আসি একবার,
বন্ধ কর অভাগার নয়নের দ্বার ;
নিবাও নিবাও আসি চিন্তার অনল ;
বিরহ তাপিত মন কর সে শীতল।
অথবা, আসিতে আমি বলি বা কেমনে ?
অভাগার অশ্রুপূর্ণ সুদীন লোচনে,
পাবে না পাবে না স্থান ; যদি বা কখন
অতিকষ্টে হতভাগ্য মুদে দুনয়ন,
স্বপনে বঞ্চিবে তারে, জ্ব'লবে দ্বিগুণ
নিদ্রাভঙ্গে পুনরায় মানস আগুন।
অতএব হেথা হতে যাও লো সুন্দরি !
প্রবল চিন্তার বহ্নি যাও পরিহরি।
শ্রান্ত হয়ে কৃষী-যথা, আপন আলয়ে,
আসিয়া বসিয়ে সুখে পুত্রপৌত্র লয়ে,
বলিতেছে উপকথা হরষিত মনে,
মাতা, পুত্র, কন্যা, পত্নী সবে একাসনে
বসেছে চৌদিকে ঘিরে কভু বা বিস্ময়ে
শুনেছি অপূর্ব কথা পুলকিত হয়ে,
কভু বা হাস্যের ছটা শোভিছে বদনে,
কভু বা দয়াতে বারি আসিছে নয়নে ;
সতত ভাসিছে সুখে তাদের হৃদয় ;
নাহি জানে পাপ তাপ নাহি কোন ভয় ;
প্রকৃতি তাদের দেবি ! রাখিতে সম্মান,
ভাণ্ডার খুলিয়া সুখ করেন প্রদান।

সেইখানে দয়াবতি ! কর লো গমন,
গিয়ে সেই কৃষকেরে কর আলিঙ্গন ।
দিবসের পরিশ্রমে কাতর সে জন,
তোমাকে পাইলে দেবি ! হবে হৃষ্ট-মন ।
অথবা বিজনে যথা কোন মন্ত্রিবর
করেন রাজ্যের চিন্তা বসি একেশ্বর,
ভাবেন কিরূপে হবে প্রজার কুশল,
কোন্ স্থানে শত্রুগণ করে কি কৌশল,
কোন্ দেশ কিরূপেতে হতেছে শাসন,
কোন্ দেশে কাঁদিতেছে অধিবাসীগণ,
যাও যাও ! যাও সেই স্থলে ;
গিয়া তাকে বল দেবি !—"একাকী বিরলে
আর কেন প্রিয়তম ! আছরে বসিয়া ?
এতেক ভাবনা তব পরের লাগিয়া ;
অকাতরে চারিদিক ঘুমায় সকলে,
তাদের কুশল-চিন্তা করিছ বিরলে
একাকী বসিয়া তুমি ; পর উপকার
করিতে বাসনা তব দেখি চমৎকার !
রজনী অধিক হলো সুস্থির সংসার ;
গম গম চারিদিক করে অন্ধকার,
করো না অধিক আর নিশা জাগরণ,
হইবে অসুখ বৎস ! কর রে শয়ন ।"
যাও তথা কৃপাময়ি ! কেন অকারণ
অভাগার কুটীরেতে দাও দরশন ?
সত্য বটে লোকাতীত করুণা তোমার,
কিবা রাজা মহাতেজা ভ্রূভঙ্গে যাহার,
ত্রাহি ত্রাহি করে কাঁপে শত শতজন,
যাহার দোর্দণ্ড তাপে চকিত ভুবন ;
কিবা দীন হতভাগা, দিবস যাহার,
বহে যায় কৃপাশীলে ! ফিরি দ্বার দ্বার
মুষ্টি ভিক্ষা তরে, হলো দিবা অবসান
তরুতল মাত্র যার বিশ্রামের স্থান,
কিবা জরাজীর্ণ, যার জর জর কায়,
শ্রবণ বধির, নেত্র দেখিতে না পায়,
নিশাতে দিবসজ্ঞান, রজনী দিবসে,
শিথিল অঙ্গের সন্ধি বয়োবৃদ্ধি বশে,
কিবা শিশু পশু-সম নিতান্ত অজ্ঞান,
সুখে খেলে মাতৃকোলে হইয়া শয়ান,

আপনার মনে হাসে, কে জানে কারণ,
কষ্টেতে সহায় যার কেবল রোদন,
এ সকলে দয়াশীলে! হইয়া সদয়,
সমান ভাবেতে তুমি দাও গো আশ্রয়।
কিন্তু আজি অভাগার ব্যথিত অন্তরে,
পাবে না পাবে না স্থান যাও পরিহরে।
অথবা, যেও না দেবি! ক্ষণেক দাঁড়াও,
কোনরূপে নেত্র-পট বন্ধ করে দাও।
শ্রম-ভরে পদযুগ হয়েছে কাতর,
বিশ্রাম করুক, আহা! জুড়াক অন্তর।
দেখিতে দেখিতে আঁখি মুদিত হইল ;
চিন্তানিশাচরী তারে ছাড়ি পলাইল।
ঘুমাইল হতভাগ্য জুড়াল ধরণী ;
ক্রমেতে গভীর ভাব ধরিল রজনী ;
ঝম্ ঝম্ চারিধারে করে বসুন্ধরা,
মৌনবতী যেন সতী যোগেতে তৎপরা ;
নিশি যেন ধাত্রীমাতা, সুনীল বসনে
জগতের হাসিমুখ ঢাকিয়া যতনে,
ঝিঁঝিঁ রবে বসি শুধু করিতেছে গান ;
অঘোরে ঘুমায় সব জড়ের সমান।
ভুবন-মোহিনী নিদ্রা, ভূধরে, কান্তারে,
জন-স্থানে, মরুভূমে, সাগরের পারে,
রাজার উন্নত গৃহে, ভিক্ষুর কুটীরে,
মৃদুপদ যথা তথা ভ্রমে ধীরে ধীরে।
একতানে সবে মিলে যেন ঝিঁঝিঁগণ,
মোহিনী নিদ্রার মায়া করিছে ঘোষণ।
বলিছে ডাকিয়া যেন, উঠ উঠ নর।
কেন হলে এ সময় নিদ্রার কিঙ্কর ?
উঠে দেখ কিবা ভাব ধরেছে সংসার,
হায় কেন কর তুমি বৃথা অহঙ্কার।
কোথা হে সম্রাট! কেন হইয়া কাতর,
বিজনে লুঠিছ এবে শয্যার উপর ?
তুমি না প্রবোধ কালে অখিল ভুবন
কাঁপাইতে বীর-দাপে ? বল কি কারণ
হারাইলে সে বীরতা, সেই অহঙ্কার ?
রাজা বীরসিংহ তুমি! একি হে তোমার,
মরি লাজে হাসি পায় দেখি আচরণ ;
বালকের মত আছ করিয়া শয়ন।

এই না দুদণ্ড হলো বসিয়া বিরলে
একাকী ভাবিতেছিলে, করে কি কৌশলে
ধরাকে মানব-রক্তে করাইবে স্নান,
না দেখি কঠোর হিয়া তোমার সমান!
রুধিরের তৃষা তব দেখি চমৎকার,
দয়া ধর্ম পায় লাজ নিকটে তোমার!
তুমি সে রাক্ষস-ভাব ছাড়িয়া এখন,
হইলে ধার্মিক কেন তাপস সুজন?
সন্তরিয়া শত শত সমর-সাগর,
এখন রহিলে কেন নিদ্রাতে কাতর।
উঠ উঠ সময়ের স্রোত বয়ে যায়,
অলসে অবশ কেন পড়িয়া শয্যায়?
বাজাইয়া রণ-বাদ্য আসিছে শমন,
উঠ সাজ, আর কেন করিয়া শয়ন।
একে ত নিস্তব্ধ দিক্ সকল সুধীর;
ঝিঁঝিঁ রবে বসুমতী দ্বিগুণ গভীর।
অভাগা একাকী হেথা মুদিয়া নয়ন,
কুটীরে পড়িয়া সুখে দেখিছে স্বপন।
দেখে যেন, দিয়া কর তার উরঃস্থলে,
কেহ তারে মৃদুভাষে সম্ভাষিয়া বলে;—
"উঠ প্রিয়তম! আর কেন হে এখন,
রহিলে কাতরভাবে করিয়া শয়ন,
তোমার দুঃখের নিশি হলো অবসান,
উঠ উঠ ত্বরা করি কর হে প্রস্থান।
আর কেন কারাগারে একাকী পড়িয়া
বিজনে বিরলে দিন যাইছে বহিয়া?
ভাসিছ দুঃখের নীরে চিরদিন হায়!
শুকাইছে চাঁদ-মুখ সলিল-ধারায়।
বলিতে মনের কথা নাহি কোন জন,
মনে মনে নিরন্তর হও জ্বালাতন!
সহিতে পারি না আর তোমার যাতনা;
আসিয়াছি প্রিয়তম করিতে সান্ত্বনা।
আর কেহ রহিলে হে মুদিয়া নয়ন?
চেয়ে দেখ তব পাশে বসে কোন্ জন।"
চেয়ে দেখে, পাশে এক অপূর্ব ললনা,
ভুবন-মোহিনী রূপে, প্রফুল্লবদনা,
বিম্বাধরে ঘন তাঁর স্মিতের উদয়,
হাসিছে যুগল হাসি মধুরতাময়,

শ্রবণে হীরার দুল, গলে মণিহার,
হরিৎ পট্টের বস্ত্র পরিধান তাঁর,
মরি কি শোভিছে চারু অঞ্চল তাহায়
অঙ্গদে দক্ষিণ বাহু কিবা শোভা পায়,
সীমন্তে মুক্তার সিঁথি করে ঝলমল.
ভ্রূযুগের মাঝে টিপ শোভিছে উজ্জ্বল,
কবরী বেষ্টিত করি মুকুতার হার,
অপরূপ রূপ মরি করিছে বিস্তার,
অঙ্গুলে অঙ্গুরী তাঁর হীরকে জড়িত,
অমৃত জিনিয়া কথা অতি সুললিত।
এ হেন কামিনী যেন কেহ একজন
বসিয়া ডাকিছে তারে করিয়া যতন,
তাঁহার হৃদয়ে যেন দিয়ে পদ্ম-কর,
ধীরে ধীরে ডাকে বামা করিয়া আদর।
সহসা এ হেন দৃশ্য করি দরশন,
উঠিয়া বসিল যেন ছাড়িয়া শয়ন ;
বিস্ময়ে পূরিল মন, কাঁপিল হৃদয়,
অপরূপ দেখে মনে উপজিল ভয় ;
জিজ্ঞাসিতে রসনাতে সরে না বচন,
চকিত, কুণ্ঠিত, ভীত, দোলায়িত মন।
মনে মনে ভাবে যুবা একি চমৎকার।
সহসা কি হেরি আজ, একি অবতার।
অভাগা রয়েছে এই অরণ্য ভিতরে,
সতত বিজনে থাকি, বিজনেতে ঝরে
চিরদিন এই পোড়া নয়নের জল,
আপনি আপন চর, কভু শোকানল
জ্বালাই পাপিষ্ঠ আমি আপনি ভাবিয়া,
নিবাই আপনি পরে অশ্রুজল দিয়া,
কেবল ভাবনামাত্র আমার সঙ্গিণী,
তারি কোলে মাথা রাখি যাপি নিশীথিনী।
আজ দেখি একি খেলা পোড়া বিধাতার,
না জানি রমণী কেবা, কি ভাব ইহার।
কুটীরের দ্বার দেখি রয়েছে সমান,
কেমনে আসিল বালা নাহি হয় জ্ঞান।
দেবী কি মানবী কিবা অপ্সরী কিন্নরী,
না জানি কি জাতি এই নবীনা সুন্দরী।
আহা কি রূপের শোভা। এ হেন বদন
করি নাই এ নয়নে কভু দরশন।

বিশাল নয়নযুগ মরি কি সুন্দর !
থই থই করে যেন সৌন্দর্য-সাগর।
রেখেছে প্রসন্নমুখে লাবণ্য মাখিয়া,
বিম্বাধর কোণে হাসি রয়েছে ডুবিয়া।
কোথা ছিল হেন রত্ন বনের ভিতর,
সহসা করিল আলো অভাগার ঘর !
কাহার রমণী বালা কেন বা হেথায় ;
হায় বিধি একি দায় ঘটালে আমায় !
বসিয়া ভাবিয়া বৃথা কি হইবে আর,
জিজ্ঞাসি, শুনিতে পাব সব সমাচার।
এ হেন ভাবিয়া মনে সাহস ধরিয়া,
অধোমুখে বলে যুবা বিনয় করিয়া ;—
“এ ঘোর গভীর নিশি, স্তব্ধ চরাচর,
গতাসু সমান আছে পশু পক্ষী নর,
কে আপনি, কেন হেথা এ হেন সময় ?
কি করিবে আপনার এই দুরাশয় ?
আপনি কাহার নারী, কাহার নন্দিনী ?
আসিলেন হেনকালে কেন একাকিনী ?
চারিদিকে বনজন্তু করে বিচরণ,
কঠোর চীৎকারে ফাটে মেদিনী গগন,
শুনিয়ে শিহরে তনু, একি চমৎকার,
এহেন সাহস হায় কেন অবলার।
রয়েছি কুটীরে আমি তথাপি হৃদয়
সতত কাঁপিছে ভয়ে ! এ হেন সময়
কিরূপে রমণী হয়ে এলেন এখানে ?
এতদিন হতভাগ্য আছি এই স্থানে,
এই স্থানে প্রায় হলো যৌবন যাপন,
আপনারে করি নাই কভু দরশন।
এই ঘোর আন্দামান মহা ভয়ঙ্কর,
কোথা আপনার বাস ইহার ভিতর ?
এতদিন দেখি নাই ; আজি কি কারণ
অভাগার কুটীরেতে হলো আগমন ?
নিবিড় তামসী দেখি ঘোর অন্ধকার,
নিদ্রাতে মগন সব, সুস্থির সংসার।
কে আনিল আপনারে ? দিল কোন্ জন
আসিতে কবাট খুলি ? সন্দিহান মন
এ পামর নরাধম এই বোধ করে,
বুঝি বা জনম নহে মানব উদরে,

আপনি বুঝি বা কোন ত্রিদিব-সুন্দরী,
যাইতে বিমানপথে, হেথা অবতরি,
আসিলেন ধরণীর শোভা দরশনে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে পড়িল নয়নে
অভাগার এই গৃহ, নিকটে আসিয়া
দেখিতে পাপীর রঙ্গ আছেন বসিয়া।
অথবা আপনি মায়া ভুবন-মোহিনী,
যাহার শাসনে এই ঘোর নিশীথিনী
রাখিয়াছে চরাচর বিচেতন করে,
যাহার কটাক্ষ-ভয়ে ঘুমায় কাতরে
তরু, গুল্ম, নদী, গিরি, ভূধর, খেচর,
যেমন জুজুর ভয়ে কম্পিত অন্তর,
সঙ্কুচিয়া হস্তপদ, ছাড়িয়া রোদন,
জননীর কোলে শিশু মুদে দুনয়ন।
কে আপনি, কোন্ জাতি, কেন বা এখানে
করুন পাপীরে তৃপ্ত পরিচয় দানে।"
না হইতে কথা শেষ সস্মিতবদনা
মৃদুস্বরে ধীরে তারে বলে সুলোচনা;—
"ভয় নাই প্রিয়তম! নহি নিশাচরী,
নহি হে পিশাচী আমি নহি হে কিন্নরী;
কথা শুন, পরে দিব নিজ পরিচয়,
বিপরীত ভাবি মনে করো না সংশয়।
ধরাধামে সদা আমি করি বিচরণ
দীন আতুরের দুঃখ করিতে মোচন।
অথবা আতুর কেন, হইলে চঞ্চল,
সকলের মন আমি করি সুশীতল।
কি রাজা তেজস্বী, কিবা দরিদ্র ভিখারী,
কি তাপস, কিবা যোগী, কিবা বনচারী,
যাহাকে যখন দেখি বিষণ্ণ বদন,
সান্ত্বনা করিয়ে তারে রাখি হে তখন।
চিরকাল আছি আমি নাহি মম ক্ষয়,
সকল প্রদেশে থাকি সকল সময়।
জানকী বিহনে যবে দেব রঘুবর
কাঁদিলেন চিত্রকূটে, হইয়া কাতর,
ফিরিলেন বনে বনে করি অন্বেষণ,
কোথায় জানকী! সার হইল ভ্রমণ।
বৈদেহি! বৈদেহি! করি চাতকের মত
কাঁদিলেন ঊর্দ্ধনেত্রে শুধু অবিরত,

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বসিয়া উপলে,
রাখি শির লক্ষ্মণের গুরু উরুস্থলে,
যখন নিরাশ হয়ে করিয়া রোদন,
বলিলেন দীনস্বরে,—"ভাই রে লক্ষ্মণ !
যাও রে কোশলা-ধামে, যাও রে ফিরিয়া,
অদ্যাবধি রামনাম যাও রে ভুলিয়া,
সুমিত্রা মাতার তুমি অঞ্চলের ধন,
ফিরে তুমি অযোধ্যাতে কর রে গমন,
রামসীতা কোথা বলে জিজ্ঞাসিবে যবে
উঠ না কাঁদিয়া ভাই ! বলো রে তা সবে
তাঁদিগে শার্দুলে ধরি করেছে সংহার,
একাকী এলাম আমি লয়ে সমাচার।"
সেইকালে আমি তথা করিয়া গমন
এই কথা বলিলাম করি সম্ভাষণ ;—
"হে রঘু-সুন্দর ! কেন হইলে অধীর ?
সম্বর সম্বর শোক, কর মনস্থির।
বিক্রমে অটল তুমি ধৈর্যেতে অচল,
ছি ছি ! আজি শোকাবেগে এমন চঞ্চল !
পরিহর শোক, উঠ, কর অন্বেষণ,
নিশ্চিন্ত পাইবে পুন জীবনের ধন।
     শিবিরে আসিয়া যবে বীর ধনঞ্জয়,
দেখিলেন ভ্রাতৃগণে বিষণ্ণ-হৃদয়,
নাহিক আনন্দ-রব, নাহি কোলাহল,
সকলের নেত্র-যুগ করে ছল ছল,
দেখিয়া এ ভাব তাঁর উড়িল জীবন,
বিষম বিপদ গণি শুষ্ক হলো মন,
অবশেষে জিজ্ঞাসিয়া বলিলেন সবে ;—
"এ কি হে সামন্তগণ ! কেন হে নীরবে,
সকলে বিরসে কাল করিছ যাপন ?
কলঙ্ক দিল কি কুলে আজিকার রণ ?"
কিন্তু হায় ! কাঁদি তারা বলিল যখন
অভিমন্যু আজি দেব ! করিল শয়ন,
ভেবে দেখ প্রিয়তম ! তখন তাঁহার
হয়েছিল কিবা দশা ! কি বলিব আর ;
সে সময়ে আমি সেই শিবিরেতে গিয়া,
বলিলাম ধীরে ধীরে পাশে দাঁড়াইয়া ;—
"হে বীর ! ক্ষত্রিয় তুমি দেহে আছে বল,
রয়েছে গাণ্ডীব করে, হয় হে চঞ্চল

অচল যাহার বাণে. তবে কি কারণ
শোকেতে অধীর হয়ে করিছ রোদন ?
উঠ উঠ উঠ, জ্বাল সমর অনল,
আহুতি তাহাতে দাও কৌরবের দল ;
নাশিবে পুত্রের শোক প্রতিশোধ লয়ে
আসিবে শিবিরে পুন জয়যুক্ত হয়ে ।”
আজি একাকিনী হেথা এসেছি এখন
তোমার দুঃখের ভার করিতে হরণ ।
উঠ উঠ আর কেন পড়ি কারাগারে,
সুখের ভবনে লয়ে যাইব তোমারে ;
মিলাইয়া দিব পুন দারাসুতসনে,
সেখানে থাকিবে সুখে আনন্দিত মনে ;
বিদেশে বিফলে গেল নবীন যৌবন,
চল শেষ-দশা সুখে করিবে যাপন ।
অম্বরে অম্বর-মণি, প্রবল অনল,
চারিদিকে জ্বলিতেছে যেন মরু-স্থল ।
অপার বালুকারাশি সাগর সমান,
তৃষ্ণায় হৃদয় ফাটে যায় যায় প্রাণ,
এ হেন সময়ে যদি বিষণ্ণ-বদন
কাতর পথিক, দূরে করে দরশন
খেলিছে মোহন বাপী, বহিছে লহরী,
চরিছে সারস হংসে লয়ে সহচরী,
তীরেতে চৌদিকে ঘিরে তরু শত শত,
ছায়া-দানে সুশীতল করে অবিরত,
দুলিছে পবন-ভরে শত শতদল,
ভ্রমিছে নিয়ত তথা মধুপ চপল,
তখন যেরূপ ভাসে তাহার হৃদয়
অপার আনন্দ-নীরে, সুখ বোধহয়
পূর্বের সকল দুখ, আনন্দে নয়নে
সলিল গলিতে থাকে যেরূপ সঘনে,
সহসা যেরূপ মুখে সরে না বচন,
মৃতদেহে পুন যেন পাইল জীবন,
সেইরূপ তরুণীর অমৃত বচন
প্রবেশিল যুবকের শ্রবণে যেমন,
উথলিল একেবারে সুখের সাগর,
আনন্দ ভরেতে মন হইল মন্থর,
মৃদুভাবে ধীরে ধীরে তুলিয়া বদন
বামার বদনে যুবা ফেলিল নয়ন,

না পড়ে নিমেষ, মুখে বচন না সরে,
ধীরে ধীরে নেত্র-যুগে অশ্রু-ধারা ঝরে,
দেখিয়া আদরে বামা সত্বর হইয়া,
স্মিত-মুখী দিল তার মুখ মুছাইয়া,
বলিতে লাগিল পরে ধরি তার করে :—
"একি প্রিয়তম! কেন, বল কার তরে,
দর দর বারিধারা করিলে মোচন?
কি নূতনভাবে তব উথলিল মন?
মরি! চিরদিন আছ এই কারাগারে,
সময় হাসিয়া যায় হেলিয়া তোমারে;
প্রকৃতি করিয়া ঘৃণা তোমারে কখন,
না দেখান প্রিয়তম! সহাস্য বদন;
নিশা আসে দিন যায়, খেলিছে সংসার,
বিরস সকল হায়! নিকটে তোমার;
অনাথ কুটীরে থাক করিয়া শয়ন,
কেহ নাহি দয়া করি করে দরশন;
আজি উপস্থিত আমি: কর সম্বরণ
মনঃক্ষোভ; অশ্রুধারা করহে মার্জন,
আজি উপস্থিত আমি; নিকটে তোমার,
বিপদ-জলধি হতে করিতে উদ্ধার।
কথা কও, কথা কও; প্রকাশিয়ে বল
সকল মনের ভাব; কেন নেত্র-জল
সহসা ফেলিলে? কেন সরে না বচন?
ভয় নাই ভয় নাই স্থির কর মন,
ত্রিদিবে ভূতলে যদি কভু এক হয়,
মানবে অমরে যদি ভেদ নাহি রয়,
ভূধর যদ্যপি চলে চুম্বিতে সাগরে,
ধরণী দাঁড়ায় যদি গতিরোধ করে,
গ্রহতারা খসে যদি গড়াগড়ি যায়,
তরু যদি পক্ষ ধরি উড়িয়া বেড়ায়,
তথাপি আমার কথা থাকিবে সমান,
তোমাকে বাঞ্ছিত ফল করিব প্রদান।
অতএব উঠ, উঠ, কেন এ সময়
রহিলে বিস্মিত হয়ে? নাহিকসংশয়
মিলাব তোমাকে পুন দারাসুতসনে
বসাব তোমাকে পুন সুখ-সিংহাসনে।"
আনন্দে অধীর হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া,
বলিতে লাগিল যুবা সলিল মুছিয়া;—

"হায় দেবি! একি দেখি বাড়িছে বিস্ময়,
পামরের প্রতি আজ প্রসন্ন হৃদয়।
হায় গো পাপিষ্ঠ আমি; আমার সমান,
নরাধম নাহি আর; কৃপা-বারি দান
না করে কখনো কেহ অমর কি নর;
ধরেছি জীবন আমি হতে নিরন্তর
জ্বালাতন, মনোদুখে কাঁদিতে বিজনে,
রাখিতে মনের কথা মনেতে গোপনে।
জানি আমি চিরদিন সাগরের জলে
থাকিবে পাপিষ্ঠ, দেবি! পাতক-অনলে
পুড়িবে নিয়ত নাহি হবে গো শীতল,
জ্বলিবে সমানভাবে সেই দাবানল।
জানি আমি, যতদিন এই কলেবর
নাহি হবে ধূলি-সার, দুস্তর সাগর
খেলিবে নয়ন আগে হায় যতকাল,
ততদিন অয়ি দেবি! পুড়িবে কপাল।
অবশেষে কিছুদিনে যাব মিলাইয়া,
বিজনে ধরার কাছে বিদায় লইয়া।
বিশ্বাস না হয়; হায়! হবে কি এমন,
দারাসুতসনে পুন হইবে মিলন?
কেন দেবি! অকারণ দুরাশা বাড়াও,
জ্বলেছি পুড়েছি আর কত দুখ দাও!
হবে না সফল যাহা, কেন তার তরে
কাঁদাও পামরে আর প্রবঞ্চনা করে?
অতল অপার সিন্ধু ভ্রূকুটি করিয়া
মত্তভাবে চারিদিকে বেড়া: খেলিয়া,
না করে করুণা বীর আমার রোদনে,
খেলিছে সতত দেখ আপনার মনে;
কেমনে এ সিন্ধু দেবি! বল হবে পার?
(হায় রে পাপিষ্ঠ আমি কি আশা আমার!)
ঋষিবর মূসা যবে দলবল লয়ে
মিসর হইতে যান সুখের আলয়ে,
তবে ভয়ে ভয়ে সিন্ধু দিয়াছিল পথ,
আজি কি পূরাতে দেবি, তব মনোরথ
ধীরত্ব বীরত্ব বীর ভুলি আপনার,
ধরিবে সরল মূর্তি নিকটে তোমার?
যাও গো আপন ধামে, পিতার ভবনে,
অভাগার কুটীরেতে বৃথা কি কারণে?

জানি জানি দয়াময়ি ! যা হবে আমার,
আর কেন সুখ-আশা দাও বার বার ।”
যুবতীর কাছে হেন বলিতে বলিতে
আপন দুখের কথা, লাগিল গলিতে
দরদর অশ্রুধারা, শোকের সাগর
উথলিল একেবারে, হইল মন্থর
বচন বাষ্পের ভরে, হায় রে যেমন
কলহ করিয়া শিশু করিয়া রোদন
আসিলে জননী-পাশে, যদ্যপি তখন
মুছায়ে নয়ন-নীর করিয়া চুম্বন
কোলে লয়ে মাতা তাকে বলেন আদরে,
“কেন রে কাঁদিস্ বাপ ? কে এমন করে
ভাসালে চক্ষের জলে আমার গোপালে !
মরি ! চুপ কর বাপ, শিখাব সকলে
ভাল করে কালি তারে”, তখন যেমন,
সান্ত্বনাতে করে শিশু দ্বিগুণ রোদন,
সেইরূপ রমণীর প্রবোধ বচনে
দ্বিগুণ সলিল-ধারা বহিল নয়নে ।
অসম্ভব ভেবে সব হইল হতাশ,
অধোমুখ হয়ে যুবা ছাড়িল নিঃশ্বাস ।
দেখিয়া সে ভাব তার বিরস বদনে
বলিল যুবতী তবে মধুর বচনে ;—
“এ কি, দেখি হে সুজন ! হইয়া সুধীর,
হইয়া সুধীর কেন এরূপ অস্থির ?
ছি ছি হে ! না জানি কেন এত অবিশ্বাস ?
জানি না কেন বা এত হয়েছ হতাশ ?
এখনো কি অভাগীরে ভাবিছ রাক্ষসী,
এ বিরলে তব পাশে রহিয়াছে বসি,
কেবল লইয়া যেতে লোভ দেখাইয়া
অথবা দেখিতে রঙ্গ বিপদে ফেলিয়া ?
হায় রে বলিব কিবা, না হবে প্রত্যয়
ধন্য বটে দেখি নাই এরূপ সংশয় ।
এ ঘোর তামসী, দেখ সুষুপ্ত ধরণী ;
স্পন্দহীন চরাচর ; মারুত আপনি,
ছাড়িয়া চপলভাব বসেছেন ধ্যানে ;
নড়ে না শাখীর শাখা ; কাঁপে না এখান,
দেখ না দীপের শিখা ; ভয়েতে কেবল,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, নিতান্ত চঞ্চল ।

এ হেন সময়ে হায়, তব শোকানলে,
শান্তি-জল দিতে আমি একাকী বিরলে
এসেছি এ হেন স্থানে নিজপুরী হতে,
তোমারি হৃদয় হতে যদি কোন মতে
তুলিতে শোকের শেল পারি গুণময় !
এরূপ ইচ্ছাতে হয়ে ব্যাকুল-হৃদয়,
এসেছি দেখ না এই ঘোর পারাবারে ।
অথবা এসব বৃথা কি বলি তোমারে,
না হবে প্রত্যয় কিছু বচনে আমার ।
একবার বলিয়াছি বলি আর বার ;
ভূধর যদ্যপি ঘিরে দাঁড়ায় শিখরে,
তটিনী যদি বা ফেরে ছাড়িয়া সাগরে,
যদি বা সিন্ধুর জল নিমেষে শুকায়,
দিবসের মাঝে যদি নিশা হয়ে যায়,
সলিলে যদি বা করে শরীর দাহন,
শরীর ধারণ যদি করে বা পবন ;
তথাপি আমার কথা থাকিবে সমান ।
গ্রহ, তারা, রবি, শশী, জঙ্গম, স্থাবর,
তরু, লতা, নদ, নদী, ভূধর, সাগর,
যেবা যেথা আছে, সাক্ষী থাকুক সকলে,
কি আছে এমন সুখ এই ধরাতলে,
কি আছে এমন পদ, সম্পদ এমন
পারি না যা দিতে আমি করিলে যতন !
বলিলে,—"কেমনে দেবি ! হব সিন্ধু পার ?"
অভাগী উত্তর আর কি দিবে ইহার !
জান না আমাকে তুমি, দিতে পরিচয়
আপনার মুখে, বড় লজ্জা বোধ হয় ।
কে জানে আমার লীলা ! আছে কোন জন
এ তিন ভুবন মাঝে, করিবে বর্ণন
যে জন আমার লীলা, মহিমা আমার,
আমার সকল স্থলে সম অধিকার,
নগরে, শিখরে, তলে, সাগরে গহনে ।
কে হতভাগ্য—যার মুমূর্ষু নয়নে
বিচিত্র বিশ্বের ছবি খেলায় তরল
যায় যায় যায় যার জীবন চপল,
পড়িয়া তরুর তলে একা খাবি খায়
নাচিতে নাচিতে বিশ্ব পশ্চাতে পলায়,

কিবা দেব সুরপতি, যাঁহার শাসনে,
ভয়ে কাঁপে সুর নর ত্রিদিবে ভুবনে,
এ উভয়ে প্রিয়তম। সম অধিকার
সর্বকালে একরূপ জানিবে আমার।
কি ছার জলধি বল নিকটে তাহার,
ত্রিদিব ভূতল হতে এক পদ যার।
মূসা ঋষি যান যবে ছাড়িয়া মিসর,
তাঁরে দিয়াছিল পথ দুরন্ত সাগর।
সত্য বটে এ প্রবাদ বহুদিন আছে,
কিন্তু কেবা চায় পথ সাগরের কাছে?
কেবা চায় জলনিধি করিতে বন্ধন?
এই আমি, একবার হয় যদি মন,
তরঙ্গের বক্ষ দিয়া যাইব চলিয়া,
আশ্চর্য হইয়া সিন্ধু রহিবে চাহিয়া।
কিম্বা দূর কর, মিছা বসিয়া কি করি,
মানবী, রাক্ষসী, কিবা অপ্সরা, কিন্নরী,
যে হই সে হই আমি যাই অন্য স্থানে,
কি হবে অলস-ভাবে বসিয়া এখানে।
বলিতেছি বার বার, ভেবে দেখ মনে,
যাইবে কি পুন সেই সুখের ভবনে,
অথবা ভাসিবে হেথা ঘোর সিন্ধু-জলে
চিরদিন? যাই আমি দেখ যাই চলে;
এখনো করিতে পার যাহা মনে লয়,
যাইব দুদণ্ড পরে থাকিবার নয়।
স্থির-নেত্রে প্রিয়তম! চিত্রিতের প্রায়
কি ভাবিছ? উঠ উঠ, করিব তোমায়
আজি এ জলধি পার। কাঁদুক বিজনে
কারাগার একা পড়ে তোমার বিহনে;
খেলুক একাকী হেথা দুরন্ত সাগর,
ভাঙ্গুক তরঙ্গমালা বেলার উপর,
সুখেতে করুক গ্রাস শত শত তরী,
নাচুক দিবস-নিশি কল কল করি।"
এত বলি নীরবিল কুরঙ্গ নয়না;
দেখে যুবা একদৃষ্টে আছে অন্যমনা।
বহুক্ষণ পরে তবে নিশ্বাস ছাড়িল;
দুনয়নে দুটী বিন্দু ধীরে গড়াইল।
মুছিয়া নয়ন-জল, চাহি একবার
উপরে গগন দিকে, বিনয়ে বামার

মুখদিকে আরবার করি বিলোকন,
বলিতে লাগিল তবে বিনীত বচন ;—
"তবে চল গুণবতি ! চল কৃপাশীলে !
চল যাই বৃথা আর কি হবে ভাবিলে ।"
এত বলি ক্রমে মন করিয়া সুস্থির
যুবতীর সনে যুবা হইল বাহির ।
কল্পনে ! চিনেছ কিরে কুরঙ্গ-নয়না,
এ কে বামা বিনোদিনী সুধাংশু-বদনা ?
ইনি সেই মায়াবিনী, আমার নয়নে
বহিলে সলিল-ধারা, মিষ্ট আলাপনে
বুঝাইয়া যিনি মোর করেন সান্ত্বনা ;
যাঁরে দেখে ভুলে নর অর্ধেক যাতনা ।
চিনেছি তোমারে মোরা চিনেছি কামিনী !
ভুবনমোহিনী তুমি আশা মায়াবিনী ।
ধন্য শক্তি ! ধন্য মায়া ! ধন্য লো তোমার
আধ-হাসি-হাসি মুখ ! আজি অভাগার
তাপিত হৃদয় ভাল নিলে ভুলাইয়া ;
মায়াবিনি ! চমৎকার এসেছ সাজিয়া !
আশ্চর্য তোমার মায়া ! তোমারি কারণে
রণে বনে থাকে নর হরষিত মনে ;
সর্ব-গ্রাসি কাল যবে সব লয় হরি,
বিপদ তামসী যবে ঘোর ভাব ধরি
একবারে দশদিক্ করে আচ্ছাদন,
দারিদ্র্য দুর্দিন যবে, ঘোর দরশন,
শিরোপরে শক্ত বজ্র হানে নিরন্তর,
সমগ্র জগত যবে হয়ে সমস্বর,
বৈরিভাবে প্রতিকূলে সাজিয়া দাঁড়ায়,
সেইকালে মায়াবিনি ! দেখিয়া তোমায়
অকাতরে থাকে নর হৃদয় ধরিয়া ;
তোমারি কথাতে সব থাকে লো ভুলিয়া ।
আবার যতেক ক্লেশ বিপুল ভুবনে,
সুমুখি ! দশাংশ তার তোমারি কারণে ;
একি খেলা ! একি লীলা ! একি চমৎকার
অপূর্ব অচিন্ত্য মায়া ! করি নমস্কার !

তৃতীয় কাণ্ড

স্বপ্ন

স্থান—কুটীর। সময়—তৃতীয় প্রহর রজনী।

তৃতীয় প্রহর নিশি ; মেদিনী গগন,
সব আছে স্থির ভাব করিয়া ধারণ ;
ঘুমায় পর্বত, নদী, ঘুমায় সাগর ;
নড়ে না পল্লব, নিদ্রা যায় তরুবর ;
ঘুমাইছে আন্দামান, থাকিয়া থাকিয়া
শিবার অশিব রবে উঠিয়ে কাঁদিয়া ;
গিরিবরে করি-যূথ রয়েছে নিদ্রায় ;
একমাত্র যূথ-পতি গিরি-চূড়া-প্রায়,
দাঁড়ায়ে বিপুল কর্ণ নাড়িছে সঘনে,
মাঝে মাঝে উড়ে ধূলি নিশ্বাস পবনে ;
প্রজার রক্ষায় যেন জাগে নরপতি।
জনস্থানে— বাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী,
মোহিনী নিদ্রার কোলে আছে সর্বজন ;
কোথা বা মানব কেহ দেখিয়া স্বপন,
হাসে, কাঁদে, কথা কয়, আপনার মনে ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে শিশু, লইয়া বদনে,
সুধা-রস-পূর্ণ স্তন সুখে করে পান ;
নিদ্রিতা জননী তার জানে না অজ্ঞান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে তারে করিছে বারণ,
বার বার স্তন-যুগ করে আকর্ষণ।
কোথা বা রমণী কেহ, এক নিদ্রা পরে,
একাকিনী কাঁদিতেছে গুণ গুণ স্বরে ;
পতি পুত্র ছিল তার, ছিল পরিবার,
নিরদয় মৃত্যু সবে করেছে সংহার,
রেখেছে তাহাকে শুধু কাঁদিতে বিজনে ;
উন্মূলিত হয়ে যবে ঝটিকা-পবনে
তরুবর যায় পড়ি, লতা অসহায়,
ধরাতলে থাকে শুধু পড়িয়া তথায়,
সেরূপ কামিনী একা রয়েছে পড়িয়া ;
জ্বালাইতে মৃত্যু তারে গিয়াছে ফেলিয়া।
আবার কোথা বা কোন ধনীর ভবনে,
আমোদ তরঙ্গোপরি ভাসে সর্বজনে ;

সমীপে নর্ত্তকী নাচে, হাস্য পরিহাসে
সবে মত্ত, বাটী যেন নাচিছে উল্লাসে।
মেষ-গৃহে মেষ-পাল রয়েছে নিদ্রায়,
চতুর শৃগাল, এবে আসিয়া তথায়
মেষ-শিশু চুরি আশে বেড়ায় ঘুরিয়া ;
প্রহরী কুক্কুর শুধু থাকিয়া থাকিয়া,
পত্রের মর্ম্মর রব করিয়া শ্রবণ,
ঊর্দ্ধ্ব-মুখে ঘোর রবে ডাকে অনুক্ষণ।
উপরে গগন-তলে ভ্রমে তারাগণ
একে একে ক্রমে ক্রমে হয় অদর্শন ;
ঢলিয়া পড়েছে একে সপ্তর্ষি-মণ্ডল ;
ভাঙ্গিয়া আসর যেন যায় তারাদল।
ঝিল্লীগণ ক্রমে রব করিছে সংহার,
হয়েছে কাতর যেন শক্তি নাহি আর ;
মিলাইছে ছায়াপথ অম্বরের তলে,
ক্রমে ফেনা যায় যথা জলধির জলে।
এদিকে আশার সনে কম্পিত অন্তরে,
চলেছে অভাগা দেখ। দৃষ্টিপাত করে,
চারিদিকে বার বার ; কভু ফিরে চায়
বুঝি কেহ আসে ভাবি কভু বা দাঁড়ায় ;
কভু বলে একি দেবি। কাঁপে কেন মন ?
চলিতে চরণে কেন বাজিছে চরণ ?
লইয়া পরের ধন তস্কর যেমন,
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় সচকিত মন,
সেরূপ চঞ্চল আজি যুবার হৃদয়,
যাই যাই থাকি থাকি না যায় সংশয়।
সমীপে দাঁড়ায়ে তারে ভুবন-মোহিনী
আপনি মশাল ধরি ; বলেন—যামিনী
গেল যে গেল যে বয়ে, হও হে সত্বর,
এস যদি এস তবে হও অগ্রসর।
মুখশশী আধ-হাসি ; যুগল নয়ন
আধ আকুঞ্চিত হাসি করিতে গোপন।
সাত পাঁচ ভাবি যুবা ধরিয়া অন্তর
বলিতে লাগিল তবে হয়ে ঊর্দ্ধ্ব কর ;—
"থাকরে কুটীর। একা পাপীর ভবন,
অভাগার চিরবন্ধু। যতনের ধন ;
থাক তুমি এই স্থানে ; দাও রে বিদায়,
পোহায়ে দুখের নিশি হতভাগ্য যায় ;

এতকাল ছিনু আমি তোমার আশ্রয়ে,
কেঁদেছি তোমার কাছে কাতর হৃদয়ে,
বলেছি মনের কথা, ভেসেছে বদন
কত যে নয়ন-জলে, কাতর চরণ
শক্তিহীন হয়ে আসি পড়িত যখন,
তখন তোমাকে আমি ডাকি বার বার
বলিতাম—রে কুটীর! এই অভাগার
কবে হবে সেইদিন যবে মিলাইয়া
যাব তোর এই গর্ভে, পশ্চাতে রাখিয়া
এ ভবযন্ত্রণা ঘোর! তুমিও তখন
পড়িয়া এ পাপ অস্থি করো রে গোপন।
কি জানি কালের বশে কোন সাধু নর
দেখে আসি এই অস্থি পাপের আকর।
তুমিও ধরার সনে যেও মিলাইয়া
সাবধান! কোন চিহ্ন যেও না রাখিয়া।
সে দুখের দিন আজি নাহিরে আমার,
তোমার হৃদয়ে পড়ে কাঁদিব না আর;
অস্ত গেলে দিনমণি শ্রমেতে কাতর
হয়ে আর আসিবে না এখানে পামর,
পামরের এই হস্ত করিয়া যতন,
ভাঙ্গিয়া বনের কাঠ, জ্বলন কারণ
করিবে না তব গর্ভে আনিয়া সঞ্চয়,
আর তুমি রে কুটীর! সন্ধ্যার সময়,
পাবে না দেখিতে ওই সাগরের তীরে,
তোমার আশ্রিত জনে; আর ধীরে ধীরে
বেড়াব না এই পথে পাগলের মত;
এই নেত্র-যুগে আর অশ্রু অবিরত
ঝরিবে না মনোদুখে; বাম করতলে
রাখিয়া কপোল, আর জলধির জলে
স্থিরদৃষ্টি হয়ে, আর রব না বসিয়ে;
চলিলাম আজি আমি তোমারে ছাড়িয়ে।
থাকো থাকো আন্দামান! খেলুক সাগর
চিরদিন তব পাশে, হাঙ্গর মকর
দেখ তুমি বসি হেথা; দুখিনীর ধন,
যাই আমি নিবাইতে শোক-হুতাশন।
রাখো তব বনজন্তু মহা ভয়ঙ্কর,
রাখো তব কারাগার, বিপিন, শিখর,

রাখো তব সাগরের উত্তাল তুফান ;
রাখো তবে বিহগের সুললিত গান ;
যাহা কিছু আছে তব রাখো রে সকল,
যাই আমি নিজ ধামে, করিতে শীতল
তাপিত জীবন। ওরে বিহঙ্গম-গণ,
নিদ্রায় বিঘোর সবে রয়েছে এখন,
তোমাদের প্রতিবাসী নিজ গৃহে যায় ;
উঠ সবে, এ সময়ে দিলে না বিদায় ?
উঠরে কপোতি! নিদ্রা কর পরিহার ;
তুই লো বিহঙ্গবধূ! সঙ্গিনী আমার।
জীবনের মত আজি চলিনু ছাড়িয়া
এ সময়ে একবার যাইরে দেখিয়া।
রজনী পোহালে পাখি! আসিবি যখন
ডাকিতে আমার দ্বারে ; কে দিবে তখন
তণ্ডুলের মুষ্টি তোরে ? নিরাশ হইয়া
যাবি ফিরে নিজ নীড়ে ; ভাবিবি বসিয়া
কোথা গেল প্রতিবাসী নাহি কোন জন!
না জানি কাহার কাছে করিবি রোদন।
নাহি তোর সহচর ; অমূল্য জীবন,
নির্দয় মানব তার করেছে হরণ।
থাকিস্ বিজনে তুই আমার মতন,
বসিয়া আপন নীড়ে করিস্ রোদন।
কারা-বাসী বন্ধুগণ! আমার সমান,
অভাগা তোমরা সবে ; হবে অবসান,
কবে যে দুঃখের নিশি তোমাদের ভালে।
খুলিবে দাসত্ব পাশ হায় কতকালে!
ছাড়িয়া কলত্র, সুত, সাধের ভবন,
বিদেশে চলিয়া গেল বিফলে জীবন,
রেখেছে হৃদয়ে পূরে দুরন্ত সাগর ;
নিবিড় কানন যেন লোহার পিঞ্জর!
উঠ উঠ ভ্রাতৃগণ! দাও রে বিদায় ;
তোমাদের সহচর আজি ঘরে যায় ;
আজি পোহাইল মোর দুখ-বিভাবরী,
ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর আজি পলায়ন করি।"
আগে যান আশা দেবী পথ দেখাইয়া
স্মিতমুখী, মৃদুগতি, মশাল ধরিয়া,
পশ্চাতে চলেছে যুবা কম্পিত অন্তর
গুরুভয়ে উরুযুগ কাঁপে থর থর ;

পথ পাশে নিশিচোর * পিঁক পিঁক করে,
দেখিয়া দীপের আলো দূরে যায় সরে।
অদূরে ঝোঁপের পাশে খেলিছে শৃগালী,
তাড়াইয়া যায় যুবা দিয়ে করতালি।
স্থিরভাবে মৃদুপদে যায় দুইজন,
এখনো কাঁপিছে ভয়ে অভাগার মন।
হইল যে শোভা তবে বর্ণনা তাহার
কে করিবে, কে দেখেছে হেন সাধ্য কার ?
ধগ্‌ধগ্‌ দহ দহ জ্বলিছে মশাল
আশার কোমল করে ; ঝলিছে বিশাল
সুবর্ণ অঞ্চল তার ; হরিত বসন
উগারিছে তেজোরাশি নিবায়ে নয়ন ;
হাসিমাখা বিম্বাধর, প্রফুল্ল বদন,
চুম্বিছে কুন্তল আসি সুচারু নয়ন,
ভাসিছে সুস্নিগ্ধ তারা নয়ন-গগনে,
করিছে শিশির বৃষ্টি অমৃত কিরণে।
পশ্চাতে চলেছে যুবা, নিতান্ত মলিন,
চীরমাত্র পরিধান, ভাবনায় ক্ষীণ
স্বভাব-সুন্দর তনু অসিতবরণ
প্রবেশ করেছে যেন বদনে বদন,
সহজ বিস্তৃত চারু নয়ন যুগল,
অপমানে যায় যেন ক্রমে রসাতল ;
কাতর চরণ তার উঠিতে না চায় ;
পদান্তে ফেলিতে পদ জড়াইয়া যায় ;
রুক্ষকেশ, ঘন শ্মশ্রু চিবুক মণ্ডলে,
মলিন উভয় গণ্ড নয়নের জলে,
বিশাল ললাট তার এবে কান্তিহীন,
নিরন্তর, স্বেদ-জলে হয়েছে মলিন।
এইরূপে দুইজনে যায় পায় পায় ;
সাবাসি সাবাসি আশা সাবাসি তোমায়!

অদূরে দেখিল যুবা সাগরের জলে
ভাসিছে তেজের রাশি ; যেন ক্ষিতি-তলে
এক সনে চন্দ্র সূর্য উভয়ে উদয়!
সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতি মধুরতাময়!
বিস্ময়ে চকিত যুবা, ভাবে মনোহর
এ কি দৃশ্য এ বিজনে! প্রমত্ত সাগর

---

* একপ্রকার পক্ষী, রাত্রে মাঠে পথ চলিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিয়াছে একি বেশ! এ কি চমৎকার!
কোথা পেলে সিন্ধু আজ হেন অলঙ্কার!
অবশেষে সম্বোধিয়া বলে—"দয়াশীলে!
বল দেবি! বল শুনি, জলধি-সলিলে
অকালে উদিত কেন নবীন তপন?
আহা কি শীতল কান্তি নয়ন-রঞ্জন!"
ফিরিয়া সুধাংশুমুখী, স্মিত-সুধা-রসে
সিঞ্চিয়ে যুবার মন, বলিলা সরসে;—
"রহ রহ ক্ষণকাল রহ প্রিয়তম!
এখনি জানিবে তত্ত্ব যাইবেক ভ্রম।
ওই যে তেজের রাশি জলধি-জীবনে
জ্বলিছে শীতল-কান্তি,—বলিব কেমনে
আপন সৌভাগ্য-কথা আপন বদনে,—
নহে উহা প্রিয়তম! নবীন তপন,
নহে উহা নীরধির নব আভরণ,
উহা এই অভাগার মণি-ময় তরি,
জ্বলিতেছে দশদিক সুপ্রকাশ করি,
কেবল তোমার দুখ করিতে মোচন,
জুড়াইতে আজি তব তাপিত জীবন।"
এদিকে গভীর নিশি ক্রমে হয় ক্ষীণ;
তারকা হীরক-মালা ক্রমে জ্যোতি-হীন;
মৃদু মৃদু বহে ক্রমে দক্ষিণ বাতাস,
যোগাস্তে, প্রকৃতি যেন ছাড়িয়া নিশ্বাস
বসিলেন স্থির-ভাবে; যত তরুগণ
সঘনে কাঁপায়ে শির, হেলায়ে বদন
মর্ম্মরিয়ে বলে কথা প্রকৃতির কানে;
বলে—মাতঃ! এতক্ষণ ছিলে কার ধ্যানে?
উদের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ-কুহরে
না আসে সতত আর; দূরে বনান্তরে,
ব্যাঘ্রের নিকট রব হইছে বিরল;
কারাগৃহে কারা-বাসী নিদ্রায় বিহ্বল;
অর্দ্ধরাত্র চিন্তাভরে গিয়াছে বহিয়া,
কাতর নয়ন-যুগ সলিল ফেলিয়া,
একে নিদ্রামগ্না নিদ্রা, আসি কারাগারে,
বসেছেন কোলে করি সেই অভাগারে,
দুর্লভ বিশ্রামসুখ করিছে প্রদান,
ক্ষণকাল হৃদয়াগ্নি করিছে নির্বাণ।

চেয়ে দেখ হেথা যুবা আশার বচনে,
আনন্দে অধীর হয়ে ভাবে মনে মনে ;—
এই ত পোহাল মোর দুঃখ-বিভাবরী,
কে আর আমাকে পায়, আরোহিয়ে তরি,
যাই আমি যাই ঘরে, দেখিগে কেমনে
আছেন দুখিনী মাতা, কিভাবে কেমনে
সরলা কামিনী মম, যত বন্ধুজন
কিরূপে যাপিছে কাল। করে না স্মরণ
কখনো কি তারা এই পামরের নাম ?
এ পাপীর ভাগ্যে তারা হয়েছে কি বাম ?
অথবা সকলে তারা মিলিয়া যখন
কহে কথা নানা মত, বুঝি বা তখন
ছাড়িয়া নিশ্বাস কেহ বলে হায় হায় !
মনে হলো আজি কেন কথায় কথায়
সেই অভাগার নাম। না জানি সেখানে
কিরূপে কাটায় কাল, আছে কিনা প্রাণে।
কেহ বলে—আন্দামান স্থান ভয়ঙ্কর,
বিজন অরণ্যময়, জলধি ভিতর,
কে দেখিবে তারে তথা কে করে যতন,
এতদিনে গেছে বুঝি শমন-সদন !
কেহ বলে, নেত্রে বহে অশ্রু অবিরল,
মরি ! তার যুবতীর বদন কমল
হেরি যবে, অভাগিনী নিতান্ত মলিন,
দিনে দিনে ভাবনায় হইতেছে ক্ষীণ।
নবীন যৌবন, কত ভোগের সময়,
বিপদে বহিয়া গেল ; নিবিবার নয়
সে আগুন, জ্বলে যাহা তাহার অন্তরে,
দেখিলে তাহার মুখ পাষাণ বিদরে।
কেহ বলে শিশু তার রুচির-দশন,
আসে যবে খেলাইতে সহাস্য-বদন,
অপর বালক সনে, তাহারা সকলে
আপন পিতার কথা পরস্পরে বলে,
কোন শিশু বলে,—বাবা দেবে গো আমারে
কেমন পুতুল কিনে। ব'লেছি বাবারে
কোন শিশু বলে,—বাবা কিনেছে আমার
কেমন সুন্দর জুতো। আহা অভাগার
অভাগা সন্তান, হায় ! বলে আধস্বরে ;—
কাল গো আমার বাবা আসিবেক ঘরে,

কত কি আমার তরে আনিবে কিনিয়ে ;
বল শুনি ভ্রাতৃগণ সেকথা শুনিয়ে
কাহার পাষাণ মন গলিয়া না যায়,
না কাঁদে এরূপ নর কে আছে ধরায় ?
হায় আমি গিয়া যদি করি রে শ্রবণ
এসব বচন, তবে, না জানি তখন
কি হবে আমার মনে, হরিষ অন্তরে
বলিব সে সবে ডাকি সম্বোধন ক'রে,
চেয়ে দেখ বন্ধুগণ। এই সে পামর
এই সে পামর দেখ তরিয়া সাগর,
উপস্থিত নিজধামে, নয়নের জল
মুছ মুছ ভ্রাতৃগণ। কর আলিঙ্গন
সবে মিলে একেবারে, জুড়াক জীবন।
হয়ত দেখিব গিয়া শয়ন-মন্দিরে
বসিয়া সুধাংশু-মুখী, বহে ধীরে ধীরে
দুটি নেত্র দিয়া তার শোক অশ্রু-জল ;
নাসাগ্রে ঝরিছে বিন্দু, ভিজিছে অঞ্চল ;
বাম কর-তলে রাখি বিষণ্ণ বদন,
চিন্তার সাগরে কান্তা রহেছে মগন।
পাশেতে অবোধ শিশু অঘোরে ঘুমায়,
রয়েছে মাতার কোলে নাহি কোন দায়।
একদৃষ্টে শশিমুখী তাহার বদন
সজল নয়নে শুধু করে নিরীক্ষণ ;
প্রতিক্ষণে যেন নব শোকের উদয়,
না মুছিতে একধারা অন্যধারা বয়।
গৃহ-কর্ম-শেষে প্রিয়া করিতে শয়ন
এসেছে শয়নাগারে, করি দরশন
নিদ্রিত সুতের মুখ, শোক পারাবার
উঠিয়াছে উথলিয়া ; নাহি পারে আর
নিবারিতে সে যাতনা অস্থিরা সুন্দরী ;
কাঁদিছে বিজনে বসি পূর্বকথা স্মরি।
এহেন সময়ে যদি সহসা যাইয়া
খুলি দ্বার একেবারে, আমাকে দেখিয়া
চমকি উঠিবে সতি, মুছি নেত্রজল,
এ কে। একি হলো। বলে হইবে চঞ্চল ;
কাঁপিয়া উঠিবে আহা কোমল হৃদয়,
দুষ্টজন ভাবি মনে বাড়িবেক ভয়।

বল দেখি পাপী মন ! এভাব যখন
দেখিবে স্বচক্ষে তুমি, কি হবে তখন ?
তখন বলিব আমি, শশাঙ্ক বদনে !
ভয় নাই, ভয় নাই, নহি সুলোচনে !
নহি আমি সুধামুখি ! কোন দুষ্ট জন।
হয় নাকি অয়ি প্রিয়ে ! হয় না স্মরণ,
গিয়াছি যে কতদিন তোমারে ফেলিয়া
আছ কি লো শশি-মুখি ! সকল ভুলিয়া ?
পেয়েছি অনেক ক্লেশ যাতনা অপার,
তরেছি অনেক পুণ্যে ঘোর পারাবার ;
দেখিতে ও মুখ-শশী, বহুকাল পরে
আবার সুধাংশু-মুখি ! এসেছি লো ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে যুবা যায় পাছে পাছে ;
ক্রমে আসি উত্তরিল জলধির কাছে।
দেখিল মোহন তরি করে ঝলমল,
দশদিকে ছুটে আভা নিতান্ত উজ্জল ;
কি সুন্দর বাত-পট বিচিত্র-বরণ,
উগারিছে দীপালোকে বিচিত্র কিরণ,
অম্বরে উড়িছে কেতু পবনের ভরে,
হাসিছে দাঁড়ায়ে তরি প্রশান্ত সাগরে,
দেউটীর মালা মরি কিবা চমৎকার,
রাজ-রাণী গলে যেন হীরকের হার !
যেই মাত্র শশি-মুখী যুবকের সনে
আসি উত্তরিল তথা, অমনি সঘনে
বাজে সপ্তস্বরা বীণা তরির ভিতরে ;
অবাক হইয়া যুবা বিস্মিত অন্তরে
আশার গর্বিত মুখ করে দরশন ;
অদ্ভুত এ দৃশ্য মনে করিছে বর্ণন।
হেনকালে চেয়ে দেখ, তরুণী দুজন
উজলি তরির পৃষ্ঠ, সস্মিত-বদন,
দাঁড়াল বাহিরে আসি। আশার হৃদয়ে
না ধরে আনন্দ আর, পুলকিত হয়ে
আরোহিল তরি বামা ধরিয়া আদরে
তাহাদের পদ্মকর। প্রফুল্ল অন্তরে
তুলিল যুবকে সবে। হায় ! অভাগার
কে পারে বর্ণিতে, মন হলো যে প্রকার।
আশা বলে—"প্রিয়তম ! দেখ অবসান
হলো তারাময়ী নিশি ; ওই ভানুমান

উঠিছে সলিল হতে লোহিত বরণ ;
বুঝি বা ধরণী খুলি তমোবগুণ্ঠন,
লইছে দিবস-নাথে আদরে ডাকিয়া !
পোহায়ে সুখের নিশি, শাবকে রাখিয়া
নিভৃত নীড়ের মাঝে, বিহঙ্গমগণ
ওই দেখ, সিন্ধু-তীরে করে আগমন।
আহা কি অপূর্ব শোভা মরি মনোহর !
ছাড়িয়া চপল ভাব সুস্থির সাগর !
উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, যেদিকে নয়ন
ফিরাই, কেবল হেরি সুনীল বরণ !
আজি সুপ্রভাত নিশি ; নবীন তপনে
কর হে প্রণাম কর। ভেবে দেখ মনে
দুই দণ্ড গত হলো, ছিলে কোন্ খানে
কিরূপে চলেছ কোথা ! ওই আন্দামানে
রহিল পরিয়া তব কুটীর বিজন ;
পিঞ্জর ছাড়িয়া শুক করে পলায়ন।
বুঝি বা প্রহরী কেহ তব অন্বেষণে
এ হেন সময়ে আসি তোমার ভবনে,
তোমাকে না হেরি তথা বিস্ময়-সাগরে
মগ্ন হয়ে ভাবে শুধু সভয়-অন্তরে :
কি আশ্চর্য ! জলনিধি অপার দুর্জয়
পরিখা সমান শোভে, যমের আলয়,
শ্বাপদ-সঙ্কুল হেন ভীষণ কানন,
নাহি জানি কোথা আজি গেল এই জন।
বহু অন্বেষণ পরে তব দরশন
না পাইয়া ফিরে ঘরে করিবে গমন,
ঘুষিবে এ কথা গিয়া সবার শ্রবণে,
সবিস্ময়ে নানা কথা কবে নানা জনে।
কেহ বা বলিবে—'হায় না পারিয়া আর
সহিতে সতত হেন জীবনের ভার,
সিন্ধু-জলে আজি তনু করি বিসর্জন,
অভাগা শীতল বুঝি করিল জীবন।'
অপরে বলিবে—'বুঝি বিকট কাননে
প্রবেশিল হতভাগ্য, শ্বাপদ-বদনে,
পাপের আধার দেহ দিতে উপহার,
হৃদয়ের জ্বালা হ'তে পাইতে নিস্তার।'
আহা ! কারাবাসী যারা তোমার সমান,
শুনিবে তোমার কথা করি প্রণিধান,

যবে তারা হেন কথা করিবে শ্রবণ,
ঝরিতে থাকিবে আহা যুগল-নয়ন,
বলিবে নিঃশ্বাস ছাড়ি—'বড় বুদ্ধিমান,
বড় বুদ্ধিমান তুই। করিলি প্রস্থান
কোথায় সবারে ফেলে? পেলিরে উদ্ধার
সাঙ্গ হলো লীলাখেলা পাপের সংসার।'
তারা সবে সে সময়ে করিবে মনন
দেহ ছাড়ি সিন্ধু-জলে ত্যজিতে জীবন।"
এরূপ কহিছে দেবী, এহেন সময়ে,
অতি শুভ্র সুচিকণ ক্ষৌমযুগ লয়ে,
সহচরী সুলোচনা তথা উতরিল;
সস্মিত কটাক্ষে হেরি বলিতে লাগিল;—
(সপ্তস্বরা বীণা যেন বাজিয়া উঠিল!)
ধীরে বলে শশীমুখী—"লও মতিমান।
লও লও ক্ষৌম-যুগ কর পরিধান।
পরিহর হীন বেশ; সোনার শরীর
মলিন মসির মত, নয়নের নীর
থাকে না থাকে না মরি! গলিত বসন
এ হেন সোনার দেহে করি দরশন"।
এত বলি বস্ত্রযুগ করিল প্রদান;
হৃষিত অন্তরে যুবা করি পরিধান,
বসিল আশার পাশে; সুরূপা কিঙ্করী
চামর ঢুলায় কেহ; কোন সহচরী
অগুরু-বাসিত-বারি করে বা সিঞ্চন;
বরষি অমৃত ধারা গায় কোন জন।
এবে সেই কারাবাসী, যাহার চরণ
কঠিন নিগড়-পাশ করিত বহন,
দহিত যাহার হৃদি ভাবনা-অনলে,
বহিত যামিনী যার নয়নের জলে,
এবে সেই কারাবাসী, যেন নরবর
অমূল্য আসনে বসি হরিষ অন্তর,
কহিছে আশার সনে কথা নানা মত,
অন্তরে আনন্দ-সিন্ধু উথলে নিয়ত।
ক্রমে প্রিয় বঙ্গভূমি নয়নে পড়িল,
হৃদয়ে আনন্দ তার কত উপজিল।
কিন্তু দেখ, কাদম্বিনী, গভীর বরণ,
আচ্ছাদি দিগন্ত মুখ, ব্যাপিয়া গগন,
সমুদিল পূর্বদিকে। তরুণ তপন

ওই দেখ! লুকাইল বুঝি বা লজ্জায়,
সচকিত ধরাবাসী ঊর্ধ্বমুখে চায়;
চপল বিজলী ছুটে উজলি গগন;
থর থর কাঁপে শুনিয়া গর্জন ;
ছুটিল অশনি-বাণ গরজি গভীর,
গগন ফাটিয়া যেন হয় শত চির;
ছুটিল অম্বর-পথে করি হুহুঙ্কার,
সামাল সামাল ধরা যায় যে সংসার!
দাঁড়াইল সদাগতি ভয়ে স্তব্ধ হ'য়ে;
প্রকৃতি মলিন কান্তি ধরিল সভয়ে;
দূরে গেল হাসি মুখ! নিস্তব্ধ সংসার,
জলদের পদে যেন করে নমস্কার!
স্থির ভাবে তরুগণ ঊর্ধ্বশির হ'য়ে,
নীরবে দাঁড়াল সবে যেন বা সভয়ে।
জন-স্থানে জনগণ ব্যাকুল-অন্তর
নে রে দে রে, আয় আয় রব ঘোরতর;
মাতার কোলেতে শিশু উঠে শিহরিয়া,
সন্ত্রাসে কাঁদিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া;
চরিতে চরিতে পাখী ফেলিয়া আহার
আসিছে আপন নীড়ে, শিশুগুলি তার
বসিছে ঢাকিয়া আসি পক্ষপুট দিয়া;
কুক্কুর বিড়াল আদি ভ্রমণ ছাড়িয়া
আপন শয়ন স্থানে করিছে গমন;
নিজ বিলে বনজন্তু করে পলায়ন;
মাঠ হতে ধেনুগণ ঊর্ধ্ব-পুচ্ছ করে
ধাইছে আসিয়া গৃহে সভয় অন্তরে;
গৃহস্বামী ঊর্ধ্বমুখে হেরিছে গগন;
বুঝি ঝড়ে যায় গৃহ, চিন্তাতে মগন।
কোথা বা,—অশনি পড়ি তুঙ্গ তরুবর
দাঁড়ায়ে জ্বলিয়া গেল, হতভাগ্য নর
কোথা বা জলের ভয়ে ছিল তরুতলে,
সেখানে অশনি তারে থাক্ থাক্ বলে,
গর্জিয়া সরোষে যেন করিল প্রহার;
নিমেষে জীবন-রত্ন হরিল তাহার;
ধরাতে পড়িল তনু হারায়ে চেতন,
ভিক্ষার ঝুলিটি তার কক্ষেতে তখন
তখনো রয়েছে হায়! ভিক্ষা-যাত্রা তার
যম-পুরী-যাত্রা হলো; কেবা নেত্র-ধার

তার তরে শোক ভরে করে বিসর্জন !
নিতান্ত সে হতভাগ্য নাহি বন্ধুজন।
কোথা বা ধনীর কোন আদরের ধন,
একমাত্র পুত্র, ছিল ত্রিতল উপরে,
রুধিয়া সকল দ্বার, উল্লাস অন্তরে
কতিপয় বন্ধু-সনে, নিভৃত-ভবনে,
মত্ত ছিল পরিহাসে ; কিম্বা প্রিয়া-সনে
কৌতুক তরঙ্গে ভাসি ছিল অন্যমনে ;
সেখানে অশনি করি কঠোর গর্জন,
সে হেন প্রাসাদ-শৃঙ্গ করি বিদারণ,
বিনাশিল যুবতীর হৃদয়ের ধনে,
মূর্ছাগতা হেম-লতা, একা ধরাসনে
রহিল অনাথা পড়ি, প্রাণেশ্বর তার
পলাল ধনীর ঘর করি অন্ধকার।
কোথা বা প্রবাসী কেহ বহুদিন পরে,
উৎসুক অন্তরে আসে আপনার ঘরে,
তৃষিত হৃদয় তার হেরিতে নয়নে
দয়িতার প্রেম-মুখ ; লয়েছে যতনে
বিলাস সামগ্রী কত, মনোজ্ঞ বসন
মহামূল্য নানাবিধ বিচিত্র ভূষণ,
পথ-মাঝে ঘন ছটা হেরি ভয়ঙ্কর,
বিষাদে মলিন মুখ কম্পিত অন্তর,
পার্শ্ববর্তী কোন এক গৃহীর আবাসে,
গিয়াছিল ক্ষণকাল বিশ্রামের আশে।
সেখানে ভীষণ বজ্র করি হুহুঙ্কার
অমূল্য জীবন-রত্ন হরিল তাহার।
এদিকে জলধি-তীরে, মলিন বদনে,
তরি পৃষ্ঠে বসি যুবা সজল নয়নে ;
কভু হেরে উর্ধ্বমুখে গগন মণ্ডল ;
কভু স্থির-নেত্রে হেরে নীরধির জল।
চারিদিকে শোভে সিন্ধু ভীষণ অপার,
কি করিবে কোথা যাবে না দেখে নিস্তার
সুগভীর গরজনে মেদিনী গগন
কাঁপায়ে অশনি-বাণ ছোটে অনুক্ষণ।
চিকিমিকি শিরোপরে বিজুলী (খেলায়),
সুস্থির গভীর সিন্ধু স্তম্ভিতের প্রায়।
বুঝিবা দাঁড়ায়ে বীর বাঁধে পরিকর
সংহারিতে সৃষ্টি-কার্য গর্বিত সাগর।

ভয়েতে অবশ দেহ সরে না বচন,
অবিরল জলে ভাসে যুগল নয়ন।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলে—"এতকাল পরে
আজি বুঝি গেল প্রাণ জলধি-উদরে।
কেন বা আইনু হায়! ছাড়ি কারাগার!
কে দিবে আশ্রয় কোথা পাই বা নিস্তার।
হে বীর তটিনী পতি! হেন বীর সাজ
ধরিলে হে সাধিবারে বল কোন্ কাজ?
এ পাপীর তুচ্ছ জীব হরিবার তরে
এ হেন উদ্যোগ কেন? ক্রম-সজ্জা করে
কখনো কি পশুরাজ ইন্দুর বধিতে?
লও তুমি নিজ-গর্ভে হাসিতে হাসিতে
অভ্রভেদী গিরি কত! কত জনস্থান
পূর্ণ ছিল ধনে জনে, করিয়া প্রদান
তোমার কঠোর করে কালেতে সকল,
তোমার উদরে সিন্ধু! গেছে রসাতল।
হয়ত সময়ে তারা বিপুল ধরায়,
দেশে দেশে দিশি দিশি করেছে বিস্তার
আপন গর্বিত নাম; কিন্তু কোনো জন
বলিতে না পারে এবে, কোথায়, কখন,
ছিল সেই রম্য স্থান, গেল বা কোথায়;
আজি তাহাদের নাম কল্পিতের প্রায়।
যাহার এসব খেলা আঁখির নিমেষে
তারে কি সাজিতে হবে আজি বীর-বেশে
পামরের পাপীপ্রাণ হরিবার তরে!
লবে যদি লও প্রাণ; রণসজ্জা করে
কি হবে দুরন্ত সিন্ধু! বল কতক্ষণ
যুঝিব তোমার সনে রাখিতে জীবন?
রাজ-পুরী মনোহর ছিল এককালে
দাঁড়াতে তোমার তীরে; যার উচ্চ ভালে
'ভুবন বিজয়ী' এই উচ্চতর নাম
লিখেছিল পোড়া বিধি; তুমি তারে বাম
হয়ে ভাই রত্নাকর, তরঙ্গ প্রসারি,
ভাসাইলে সব সুখ: দিগন্ত বিস্তারি
ডুবাইলে যশ তার; তব বাহু-বলে
দেখিতে দেখিতে সব গেল রসাতলে।
রহিল প্রাসাদ-তুঙ্গ, কিন্তু সিংহাসন
গেল ভাসি তব নীরে; হারাল জীবন

রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র, যত প্রজাগণ ;
ভাসায়ে সকল সিন্ধু ! এলে নিজ স্থানে ;
অতুল ঐশ্বর্য হায় ! গেল কোন্ খানে।
জান কি সাগর ! এবে সেই রম্যপুরী
রয়েছে কোথায় পড়ি, কিবা বেশ ধরি ?
এবে সে নগরী, ঝাঁপি অরণ্যে বদন
রহেছে বিজনে, নাহি জানে কোন জন।
এবে সেই রাজবাটী গিয়াছে পড়িয়া,
কত তরু, তদুপরে আছে দাঁড়াইয়া।
মহিষীর বাস-গৃহ, যথা নর-পাল
'প্রেমাভাসে রসোল্লাসে' হরিতেন কাল,
যথা জল-যন্ত্রে বারি আসি অনুক্ষণ
নিদাঘের উগ্র তাপ করিত বারণ,
যথা শত সহচরী ছিল নিরন্তর
যোগাইতে গন্ধমালা, কঠোর সাগর !
আজি সে শয়নাগার রয়েছে পড়িয়া,
হয়ত শ্বাপদ কোন ভগ্ন-দ্বার দিয়া
প্রবেশি, মনের সাধে করিয়া শয়ন,
নিদাঘের খরদিন করিছে যাপন।
আজি যদি কোন জন পায় দেখিবারে
সেই ভগ্ন রাজবাটী, ডাকিয়া তোমারে
বলে—সিন্ধু ! বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি সার
এ হেন নিগ্রহ তুমি করেছ ইহার।
এরূপ বীরত্ব করি আজি রত্নাকর !
কেন ভাই ! তুচ্ছ কার্যে বাঁধ পরিকর ?"
এরূপ বলিছে যুবা, নয়নের জল
দুই গণ্ডে মুক্তা-সম বহে অবিরল।
হেনকালে ঘোর বেগে মুষল ধারায়
আরম্ভিল মহাবর্ষ, পাইয়া সহায়
প্রচণ্ড পবন আসি দরশন দিল ;
একেবারে চরাচর কাঁপিয়া উঠিল !
কোথা যাবে ধরা-বাসী দাঁড়াবে কোথায়,
দেখি দেখি কেবা রাখে এবারে তোমায়
পালা রে পালা রে সবে, রুষেছে পবন,
যায় সৃষ্টি রসাতল ! ভূধর গহন
নদ-নদী চরাচর কে পাবে নিস্তার !
দেখিব দেখিব ওরে কিরূপে সংসার।

থাকে তোর হাসিমুখ! দুর্জয় পবন
আজি বুঝি পদাঘাতে ভাঙ্গে ত্রিভুবন!
টলিল অটল সিন্ধু, সামাল সামাল!
উপস্থিত বুঝি আজি প্রলয়ের কাল!
ছুটিল ভীষণমূর্তি উত্তাল তুফান,
সিংহনাদে বসুমতী যেন কম্পমান!
পড়িছে জলের মৎস্য পর্বত শিখরে:
উত্তুঙ্গ শিখর কাঁপে থর থর ক'রে
প্রসারি করাল বাহু ছুটেছে সাগর;
হুহুঙ্কারে সর্ব তনু কাঁপে থর থর।
যেদিকে নয়ন যায়, মত্ত ভাব ধরি,
তুলার পর্বতসম ছুটেছে লহরী;
রহ রহ বলে যেন চারিদিকে ধায়,
মরে রে অভাগা আজি সিন্ধুগর্ভে যায়!
সে তরঙ্গ মাঝে তরি কত থাকে আর!
ঘোর বেগে হুঁ হুঁ। করি আসি বার বার
প্রবল আঘাতে চূর্ণ করিছে সাগর;
প্রত্যেক আঘাতে জল উঠে নিরন্তর;
টলিল মত্তের মত সে মোহন তরি।
ম্লান-মুখী শশীমুখী, বলে—রে কিঙ্করি!
ধর রজ্জু রাখ রাখ, গেল যে ছিঁড়িয়া
এই যায়, ওই গেল, মরি রে ডুবিয়া!
উহু উহু! মরি মরি! কাঁপিছে শরীর;
শীত বাতে রুদ্ধ হয় বুঝি বা রুধির;
দেখিয়া এ হেন ভাব যুবার জীবন
উড়িল শরীর ছাড়ি: বিষণ্ণ বদন,
না পারে কহিতে কথা; দুনয়নে আর
না পারে দেখিতে কিছু সকল আঁধার;
গর্জিয়া দুর্জয় সিন্ধু আসে যতবার,
ভয়েতে মুদিয়া আঁখি বলে—"কেন আর
আমারে যন্ত্রণা দাও নির্দয় সাগর!
আর কেন অকারণ এত আড়ম্বর
অধিক বিলম্ব কেন, অগাধ উদরে
দাও স্থান, যাই আমি, যাই পরিহরে
পাপের সংসার আমি রাজার মতন
নির্বাণ হউক আজি এ ছার জীবন।
হায় মা রহিলে কোথা! এই রসাতলে
যাই মা! জনম মত সাগরের জলে;

এরূপ কাতর হয়ে ভাবিছে অবলা,
নেত্র জলে ভাসে মুখনিতান্ত উতলা ;
পুত্রগুলি চারিধারে করিছে রোদন,
কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর লাগিয়া পবন,
এ হেন সময়ে দেখ নির্দয় সাগর,
রহ রহ বলে যেন কাঁপায়ে অন্তর,
ফাটায়ে হৃদয় তার, তথা উতরিল ;
গেল রে গেল রে ! ওই ডুবিয়া মরিল !
ওই গেল পুত্রগুলি, ভাসিল রমণী !
বিধি রে ! এ হতে তুমি হানিয়ে অশনি
কেন না করিলে চূর্ণ অভাগীর কায় ;
সেই ত লইবে প্রাণ তবে কেন হায় !
তবে কেন দিলে বল যাতনা এমন !
ওই তার পুত্র দুটি হইল মগন ;
একে একে মিলাইল নয়ন উপরে ;
অভাগী একাকী শুধু, হৃদয়েতে ধরে
অঞ্চলের নিধি তার, কনিষ্ঠ সন্তান,
ভাসিয়া চলিল স্রোতে বাঁচাইতে প্রাণ,
ধরিল গৃহের চাল, সলিল সাগরে
ভাসিয়া আসিল যাহা পবণের ভরে ।
ভাসিয় আসিয়া জলে শত বিষধর
রয়েছে বেষ্টিত তাতে মহা ভয়ঙ্কর !
সম্ভ্রমে উঠিতে গিয়া পুত্ররত্ন তার
হারাইল অভাগিনী ; কে করে উদ্ধার।
ক্রোড় হতে পড়ে বাছা নিমেষ ভিতরে
একেবারে গেল হায় জলধি-উদরে ;
গৃহ-চূড়া হতে হেরি সুতের মরণ,
হাহা রবে অভাগিনী উন্মাদিনী প্রায়,
ঝাঁপ দিল, পুত্র সনে ডুবিল তথায় !
কল্পনে ! চলরে এবে দেখি একবার,
তরিপৃষ্ঠে দীন দৃষ্টি ফেলিছে আবার ;
বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে নয়নের জল,
বিজন তরীতে বসি একাকী কেবল ।
আসিল প্রবল ঝঞ্ঝা গম গম করে
মূর্ছিত হইয়া যুবা তরণী উপরে
ওই দেখ পড়ে গেল ; কে দেখে তাহারে ?
কোথা আশা লুকাইল আজি এ দুস্তারে ।

চতুর্থ কাণ্ড

স্বপ্ন

স্থান—কুটীর। সময়—ঊষা

এদিকে পোহায় দেখ সুখ-বিভাবরী ;
লোহিত-বরণী ঊষা, আসিয়া সুন্দরী,
সখীভাবে দিয়া কর পূর্বাশার গলে,
হাসি হাসি দাঁড়াইল উদয়-অচলে।
হেরে সে যুগল রূপ হিংসায় যামিনী
দ্রুতপদে অস্তাচলে গেল বিনোদিনী।
একেবারে সুখ-রাজ্য করি পরিহার
যাইতে না সরে মন, তাই অন্ধকার
যায় যায় যায় যেন যাইতে না চায়,
নিশার অঞ্চল রূপে পশ্চাতে লোটায়।
শাখী-শাখে নিজ নীড়ে ছিল পাখীগণ,
সেইখানে এ বারতা ঘুষিছে পবন,
একে একে উঠে তারা নিদ্রা পরিহরে।
বন্দী-ভাবে তাম্রচূড় থাকি বনান্তরে
বলিছে পতত্রিগণে ডাকি উচ্চ স্বরে ;—
'উঠরে উঠরে ভাই! নিশি অবসান,
ঘুমান প্রকৃতি মাতা, উঠ করি গান
সকলে জাগাই তাঁরে ; পোহাল রজনী ;
উঠ উঠ, পূর্বাচলে এল দিনমণি।'
সেই রবে দধি-মুখ*নিদ্রা পরিহরে,
আবাস-কুলায় ছাড়ি, তরু শাখাপরে
'জয় জগদীশ' বলে আসিয়া বসিল ;
মধুর মুরলী তার বসি বাজাইল।
সারানিশি বনে বনে ভ্রমি নিরন্তর,
প্রচণ্ড শার্দ্দূল এবে হইয়া কাতর,
মৃদু পদে হেলে দুলে নিজস্থানে যায় ;
শৃগাল শৃগালী এবে স্বস্থানে পলায়।
এখনো মৃগের শিশু মুদিয়া নয়ন,
সঙ্কুচিয়া চারিপদ ফিরায়ে বদন,
অকাতরে নিদ্রা যায় তৃণের শয্যায় ;
রয়েছে মাতার পাশে, নাহি কোন দায়।

*দধি-মুখ—দইএল নামক পাখী

কেবল হরিণী-মারা উঠি এতক্ষণে,
দাঁড়ায়ে চাটিছে জঙ্ঘা আপনার মনে !
কারাগৃহে কারাবাসী রয়েছে নিদ্রায়,
পরিশ্রান্ত কলেবর গতাসুর প্রায় ।
সারানিশি জাগরণে কারারক্ষী নর,
ঢুলু ঢুলু আঁখি পাতা, নিদ্রায় কাতর,
ধীরে ধীরে নিজ স্থানে হয় অগ্রসর ।
উচ্ছলিত হায় তথা তটিনীর জল,
তৃণগুল্ম লতাপাতা ডুবায় সকল ;
সেরূপ আঁধার জলে হইয়া মগন,
ভূধর বিটপি আদি ছিল এতক্ষণ,
ক্রমে জোয়ারের জল হইছে বাহির,
একে একে তারা যেন তুলিতেছে শির !
সুনীল তামস-বাসে ঝাঁপি সর্বকায় ;
এখনো করাল সিন্ধু রয়েছে নিদ্রায় ।
দ্রুতপদে বায়ু সবে যায় জাগাইয়া ;
জল স্থল উঠে যেন নয়ন মুছিয়া ।
জন-স্থানে শিশুগণ উঠি এতক্ষণে
কাঁদিতেছে মা মা রবে ; ভবনে ভবনে
একে একে উঠিতেছে কল কল রব ;
ছাড়িয়া সুখের শয্যা শ্রমজীবি সব
দলে দলে নিজ কাজে হইছে বাহির ;
সারানিশি গাত্র দাহে থাকিয়া অস্থির,
পীড়িত অভাগা এবে তামসী নিশায়
'দূর হও' বলে যেন দিতেছে বিদায় ।
কোন স্থানে মেষ-পাল উঠি এতক্ষণে,
গুণি গুণি মেষদল আনন্দিত মনে,
একে একে গৃহ হতে করিছে বাহির ।
থাকি রত দিবানিশি কাজে প্রহরীর,
কাতর কুকুর এবে, মুদিয়া নয়ন,
মোহিনী নিদ্রার কোলে আছে অচেতন ।
কোথা বা গৃহস্থ কেহ মেলিয়া নয়ন,
গগনে উষার কর করি দরশন,
নিজগৃহে করে গান সুললিত স্বরে
পবন সে গীত লয়ে ফেরে ঘরে ঘরে ।
পালী-গৃহে পারাবত সুখের শয়নে
প্রিয়ার নিকটে বসি, মুদিত নয়নে,

অকাতরে মনোসুখে নিদ্রাভোগে ছিল,
আসিল সুহাসি উষা, আশা প্রকাশিল,
পালী-গৃহ ছাড়ি ক্রমে যায় অন্ধকার,
নিদ্রা-ভঙ্গে মেলি আঁখি, করিয়া বিস্তার
একে একে পক্ষ পদ, আলস্য ভাঙ্গিয়া,
প্রেয়সীর চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুট দিয়া,
বকম বকম রবে প্রণয়ের তরে,
'উঠ প্রিয়ে' বলে যেন জাগায় আদরে!
কোথা বা গো-গৃহে বৎস রয়েছে বন্ধনে,
এখন পোহায় নিশি, ব্যাকুলিত মনে
মা, মা, করে বার বার করিছে চীৎকার
অন্যস্থানে বদ্ধ থাকি জননী তাহার
পারে না আসিতে তথা, চঞ্চল অন্তর
ফেরে ঘোরে হোঁক হোঁক করে নিরন্তর।
কোথা বা বিজন গৃহে, শয্যার উপরে,
অভাগী যুবতী কেহ, রাখি বাম করে
বিষাদে মলিন গণ্ড, রহেছে চিন্তায়;
নয়নের জল তার, প্রবল ধারায়
বিন্দু বিন্দু অবিরত পড়িছে ভূতলে;
মাঝে মাঝে অশ্রু বামা মুছিছে অঞ্চলে।
নবীনা যুবতী বালা রূপের সাগর,
তথাপি তাহার পতি, নিতান্ত পামর,
ফেলে তারে অন্যস্থানে রজনী বঞ্চায়;
তাই বালা নেত্রজলে বদন ভাসায়।
কোন স্থানে মৃত-পুত্রা অভাগী জননী,
হেনকালে তুলিয়াছে রোদনের ধ্বনি;—
'এই যে জাগিল বাপ সকল সংসার,
তুমি কিরে যাদুমণি! জাগিবে না আর?
সবাই আনন্দে বাপ্ উঠিছে জাগিয়া,
কোথা গেলি আর বাপ্ ডাক্ 'মা' বলিয়া।'
এরূপে পোহায়ে যায় দেখ বিভাবরী,
পূর্বাচল-শিরে উষা হাসিছে সুন্দরী।
এদিকে মেলিয়া আঁখি দেখে চমৎকার,
সুপ্রসন্ন দশদিশ, সুস্থির সংসার।
নাহি সে ঝটিকা বেগ, নাহি সে তুফান;
অস্তাচলে চলে রবি দিবা অবসান।
পাশে এক মনোরমা নবীনা কামিনী,
রূপে উজলিয়া তরি আছে বিনোদিনী।

নাহি বেশ নাহি ভূষা, তথাপি বদন,
বিকচ, চপলা, কান্তি করেছে ধারণ।
বিশাল নয়ন-যুগ ঘন ভাসে জলে,
মাঝে মাঝে বাম করে মুছিছে অঞ্চলে ;
একমাত্র বেণী তার বক্রভাব ধরে
স্কন্ধ দিয়া পড়িয়াছে হৃদয় উপরে।
বাম জানু ভূমে পাতি, বিষণ্ণ বদনে
দক্ষিণে চিবুক রাখি, সজল নয়নে,
ধীরে ধীরে করিতেছে তাহারে ব্যজন !
বৃন্ত ছাড়া করি ফুলে রাখিলে যেমন,
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়,
সেরূপ বদন তার নিমীলিত প্রায়,
নয়ন-মোহিনী মূর্তি তথাপি তাহার,
অপরূপ নিজরূপ করিছে বিস্তার !
যুবতীর বামস্কন্ধে করপদ্ম দিয়া,
সুন্দর একটি শিশু আছে দাঁড়াইয়া।
অনুমান বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর,
অরাতি-মোহন তনু, সুঠাম পীবর !
বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে মুখ দিকে তার
এক দৃষ্টে কভু চাহে ; কভু বা আবার
যুবতীর ম্লান মুখ করে নিরীক্ষণ ;
বিষাদ সাগরে যেন রয়েছে মগন ;
কভু বা ফিরায়ে মুখ বামদিকে চায়,
অনেক রমণী আছে দাঁড়ায়ে তথায়।
মোহনিদ্রা হতে যুবা মেলিয়া নয়ন,
যুবতীর মুখে দৃষ্টি ফেলিল যেমন,
অমনি ললনা মুখে অঞ্চল ঝাঁপিয়া,
একেবারে শোক-ভরে উঠিল কাঁদিয়া,
নাভি হতে গুরুশ্বাস উর্ধ্বেতে বহিল ;
শোকেতে হৃদয় তার ফুলিতে লাগিল
শিশুটি অবাক্ হয়ে চাহি একবার
সকলের মুখ পানে, অঞ্চল তাহার
ধীরে ধীরে মৃদু করে করি আকর্ষণ,
অবশেষে স্থির নেত্রে থাকি কতক্ষণ,
'কেন মা কাঁদিস' বলে কাঁদিয়া উঠিল
সহসা এ দৃশ্য হেরে বিস্ময় বাড়িল
উঠিয়া বসিল যুবা হয়ে চমৎকার,
ফলিল সুস্থির দৃষ্টি উপরে বামার।

বিস্ময়ে পাসরি সব চিনিতে নারিল ;
বহুক্ষণ একভাবে চাহিয়া রহিল।
সুধাংশু-বদন ঢাকা সুনীল বসনে,
অভাগা সহসা হায়! চিনিবে কেমনে।
অবশেষে শিশুটির মুখ দিকে চায়,
চিনিতে নারিল ; কিন্তু দেখিয়া তাহায়
অমৃত সাগরে মন হইল মগন ;
শীতল হইল প্রাণ ; জুড়াল নয়ন।
এ হেন সঙ্কটে পড়ে মুখ ফিরাইয়া
অপর বামার দিকে দেখিল চাহিয়া ;
দেখিল সুমুখী আশা, দাঁড়ায়ে ললনা,
একস্থানে একভাবে প্রফুল্ল-বদনা।
চাহিতে মিলিল যেই নয়নে নয়নে,
অমনি মধুর হাসি সে বিধু বদনে,
বিম্বাধরে একবার বিজুলির প্রায়,
তরল খেলায় গেল, দেখিয়া তাহায়
বিশাল নয়ন যুগ হাসিতে লাগিল ;
গণ্ডযুগ মৃদু মৃদু স্ফুরিত হইল।
    আশার এ ভাব দেখে, আবার ফিরিয়া
যুবতীর মুখ দিকে দেখে তাকাইয়া
অঞ্চল না খোলে বামা নামায়ে বদন
অবিরত বিধুমুখী করিছে রোদন।
একমনে বহুক্ষণ অবাক্ হইয়া,
সমুদয় কলেবর দেখে ঠাহরিয়া।
চিনি চিনি করে যুবা কম্পিত হৃদয়,
সেই হবে, নয় বুঝি না যায় সংশয়।
এরূপ সংশয়ে, ভয়ে, দোলায়িত মন,
আশার আদেশে শেষে খুলিল বদন।
অমনি সে আঁখিযুগ দিল দরশন ;
চিনিতে বা বাকি আর থাকে কতক্ষণ।
সেই নীলোৎপল আঁখি দেখে মনোহর,
যাহাতে সে কতদিন করিয়া আদর,
আকর্ণ কজ্জল-রেখা দিত পরাইয়া ;
পরায়ে দেখিত শোভা মোহিত হইয়া।
আর কি সংশয়ে থাকে প্রণয়ীর প্রাণ ?
আর কি করিতে হবে পরিচয় দান ?
আহ্লাদে অবশ হলো, দুটি নেত্র ধার
ধীরে ধীরে দুই গণ্ডে বহিল তাহার ;

রুদ্ধস্বরে বলে তবে—"তুমি কি সুন্দরী !
তুমি কি লো অভাগার হৃদি-রাজেশ্বরী ?
বহুদিন সুধামুখি ! গিয়াছি ফেলিয়া,
আছ কি লো এতকাল সে জ্বালা সহিয়া,
অভাগারে পরিশেষে করিতে সান্ত্বন ?
এই যে এসেছি আমি, উঠ প্রাণধন !
মুছ মুছ নেত্র-ধার, দেখ অভাগার
মুখ দিকে সুলোচনে চাহি একবার ;
রেখ না শশাঙ্ক-মুখ ঢাকিয়া অঞ্চলে ;
সুহাসিনি ! মুছে ফেলি নয়নের জলে,
প্রেম-ভরে পুনঃ প্রিয়ে হাস একবার ;
ভয় কি ! তোমার আমি হলাম আবার ।"
এত বলি দ্রুত পদে ধরি পদ্ম করে
যুবতীরে প্রেমভরে তুলিল অদরে ।
বামবাহু দিয়া মধ্য করিয়া বেষ্টন,
আপন হৃদয়ে যুবা করিল ধারণ ।
রাখিয়া শশাঙ্ক-মুখ পতির হৃদয়ে,
উঠিয়া দাঁড়াল সতী নম্রমুখী হয়ে ;
নয়নের জল তার নাসিকাগ্র দিয়া,
যুবার হৃদয়োপরে পড়িল বহিয়া ।
অঞ্চলে মুছায়ে মুখ প্রণয়ে গলিয়া,
বলিতে লাগিল যুবা অমিয়া জিনিয়া ;—
"আর কেন সোহাগিনি ! কাঁদ এ সময়,
হেন কালে অশ্রুপাত উচিত না হয় ।
পামরের পাপ কথা হও বিস্মরণ,
ভোল প্রিয়ে ! শোক তাপ ; দেখ প্রাণধন !
তরিয়া অপার সিন্ধু দেখিতে তোমায়,
আবার শশাঙ্ক-মুখি ! এলেম হেথায় ।
কাঁদিয়া গিয়াছে দিন বিরসে বিজনে ;
এস প্রিয়ে ! বসো বসো প্রাণ-সিংহাসনে,
আবার রাজত্ব কর রাজ-রাজেশ্বরি !
আমি যে তোমায় ডাকি জান না সুন্দরি !"
অবশেষে ফিরে চাহি আশার বদনে,
বলে—"বলো কৃপাশীলে ! আনিলে কেমনে
এদিগে, এপথে, তুমি ? কোথা সে সাগর ?
মৃদুগতি স্রোতস্বতী দেখি মনোহর !
এই কি আমার দেশ ? চিনা নাহি যায়,
বলো বলো দয়াময়ি ! আনিলে কোথায় ?'

আশা বলে—"চিন্তা নামে এই স্রোতস্বিনী ;
মানস সরস হতে উঠি কল্লোলিনী,
কিছু পথে মিলিয়াছে 'বাসনার' সনে,
উভে মিলি পড়িয়াছে জলধি-জীবনে।
শুনিয়া নূতন নাম হলে চমৎকার
আরো শুন, ইংরাজের নাহি অধিকার
এই মনোহর দেশে ; সবাই স্বাধীন ;
সুখ-ভোগে অধিবাসী যাপে চিরদিন।
কিছু পরে দেখিবে হে পুরী মনোহর,
উহা মম রাজধানী "আমোদনগর" ;
সুখের রাজত্ব হেথা, যে আসে তাহার,
যায় রোগ, যায় শোক, হৃদয়ের ভার।
এখানে উঠিয়া আসি তোমার কামিনী
মহাসুখে বহুদিন আছে একাকিনী ;
চল চল চল যাই সুখের আলয়ে ;
কর সে রাজত্ব তুমি নির্ভয় হৃদয়ে।
অবিশ্বাস করেছিলে আমার বচনে,
কোথায় এসেছ এবে ভেবে দেখ মনে ;
এতক্ষণে সিদ্ধ হলো কামনা আমার ;
এই লও দারা সুত লও হে তোমার।"
সুতকথা শুনিমাত্র শিশুর বদনে
ফিরিয়া চাহিল যুবা, দেখে দুনয়নে,
অপাঙ্গের প্রান্ত দিয়া সলিলের ধার
পড়েছিল, এবে দুটি রেখা মাত্র তার
বিষণ্ণ কপোল পরে রয়েছে পড়িয়া ;
মাতৃপাশে বস্ত্র ধরি আছে দাঁড়াইয়া।
ভয়ে ভয়ে মুখ তুলি এক একবার,
প্রণয়-প্রফুল্ল মুখ দেখিছে তাহার।
অভাগা দেখিয়া তাকে 'এস বাবা' বোলে
পরম আদরে মরি! তুলে নিল কোলে,
দুকপোলে দুটী চুম্ব করিল প্রদান,
আহা মরি! এত দিনে জুড়াইল প্রাণ।
আশা বলে—"আর কেন চল হে নামিয়া ;
সুখেতে বিশ্রাম কর নিজ বাসে গিয়া"
এত বলি তরি হতে নামিল সুন্দরী।
পশ্চাতে চলিল যুবা, বাম করে ধরি
প্রেয়সীর পদ্মকর, দক্ষিণে যতনে ;
চলিল করিয়া কোলে হৃদয়-রতনে।

উঠিয়া দাঁড়াল তীরে সমীপেতে চায়,
কিছুদূরে পুরী এক দেখিবারে পায়।
উন্নত প্রাসাদ শত উঠিছে গগনে ;
উড়িছে সুবর্ণ-কেতু ভবনে ভবনে ;
বিটপি-নিকুঞ্জে পুরী রয়েছে বেষ্টিত।
পথ-পাশে, শাখা বাহু করি প্রসারিত,
সহস্র বকুল তরু, পথিকের শিরে
প্রচুর কুসুম বৃষ্টি করে ধীরে ধীরে।
বিস্ময়ে, সংশয়ে, ভয়ে হইয়া কম্পিত,
মৃদু-পদে চলে যুবা ; এখনো নিশ্চিত
জানে না অভাগা হায়! কে সে বিনোদিনী ;
কোথায় তাহাকে লয়ে চলেছে কামিনী।
কিছু দূরে আসি যুবা দেখে বাম পাশে,
মোহন উদ্যান মাঝে, বিশ্রামের আশে,
নরনারী শত শত রয়েছে বসিয়া।
শত শত বিদ্যাধরী হেম-ঘট নিয়া,
শীতল সলিল সবে করে বিতরণ।
মধুর অমৃত ফল দেয় কোন জন।
কি আশ্চর্য! এত যাত্রী হয়েছে আগত
যুবক যুবতী সংখ্যা তার মাঝে যত,
বয়োবৃদ্ধ-সংখ্যা তার দশ-ভাগ নয়।
দেখিয়া যুবার বড় বাড়িল বিস্ময়।
কোথা বা চাহিয়া দেখে, কোন সুলোচনা,
কুড়ায়ে বকুল ফুল, হয়ে এক মনা
যতনে গাঁথিছে মালা ; কোন বা সুন্দরী
মালা লয়ে স্মিত-মুখে সুধা-বৃষ্টি করি,
নিজ প্রণয়ীর গলে দেয় পরাইয়া।
কোথা বা সুন্দরী কেহ হাসিয়া হাসিয়া,
স্বামীর কোলেতে দেয় কুমার-রতনে,
কোথা বা রমণী কেহ আপনার মনে
তরু-তলে বসি সুতে করে স্তন দান,
'আয় ঘুম আয়' বলি করিতেছে গান।
দেখিতে দেখিতে যুবা যায় পায় পায় ;
কিছু দূরে আসি দেখে রূপের শোভায়
আলো করি দশ দিক্ সহস্র কিন্নরী,
উড়ায়ে বিচিত্র কেতু, মধু বৃষ্টি করি
অভাগার চিন্তাদগ্ধ বিশুষ্ক হৃদয়ে,
গাইতে গাইতে সবে সম্মিলিত হয়ে,

বাহিরিল পুরী হতে। বাহির হইয়া
আসিতে লাগিল তারা সেই পথ দিয়া।
সর্বাগ্রেতে আসে রথ অতি সুসজ্জিত,
সুবর্ণপত্রে আঁটা মুকুতা-খচিত;
তারপরে করিবর প্রকাণ্ড শরীর,
দোলায়ে বিশাল শুণ্ড আসে মহাবীর:
সুবর্ণ জড়িত দন্ত, শ্বেত-কলেবর,
মহামূল্য আস্তরণে মুকুতা ঝালর।
গম্ভীর ভাবেতে তারা আসিতে লাগিল;
ক্রমে ক্রমে পরস্পর আসিয়া মিলিল।
আসি তারা সুমুখীর শ্রীচরণ তলে,
জানু পাতি ভক্তিভাবে নমিল সকলে।
সহচরী-মাঝে এবে ভুবন-মোহিনী
দাঁড়াইলা স্থিরভাবে; সুরূপা সঙ্গিণী
দোলাইয়া বাহুলতা পরম সুন্দর,
দুই পাশে অবিরত ঢুলায় চামর;
অবশিষ্ট যত সখী হয়ে এক তান,
কর যোড়ে দাঁড়াইয়া আরম্ভিল গান।
এদিকে অপূর্ব শোভা পশ্চিম গগনে
প্রাচীন তপন যেন চিন্তাকুল মনে,
মৃদু-পদে যেতে যেতে অস্ত-গিরি-বরে,
একেবারে পড়ে গেল পশ্চিম সাগরে।
শুক্র দেবে কোলে করি আইল গোধূলি;
পাপীর অভাগা শিশু বাড়ায়ে অঙ্গুলি,
পূর্বদিকে পূর্ণশশী দেখাইয়া দিল;
হাসিয়া অভাগা তার বদন চুম্বিল।
অবশেষে শশীমুখী সখী একজন
স্বর্ণ-থালে সুমুখীরে করিল বরণ।
বরিয়া সকলে পুন গলবস্ত্র হয়ে,
নমিল চরণ-তলে পদধূলি লয়ে।
শেষেতে উঠিলা দেবী রথের উপরে;
চারুহাসি সহচরী, সেই করিবরে
উঠাইল অভাগারে দারাসুত সনে;
অঙ্কুশ ধরিয়া নিজ প্রফুল্ল বদনে
বসিল সুমুখী; মরি কি শোভা তাহার,
ঐরাবতে সুররাণী দিলা যেন বার।
এরূপে বেষ্টিতা হয়ে সঙ্গিনীর দলে,
পুরীতে চলিলা দেবী; ঘোর কোলাহলে,

যাত্রী-গণ যুবা বৃদ্ধ সকলে ছুটিল ;
সঙ্গে সঙ্গে জনস্রোত বহিতে লাগিল।
কতক্ষণে রথ আসি দক্ষিণের দ্বারে
উতরিল ; শোভা তার দেখে একেবারে
বিস্ময়ে অভাগা মরি হলো হত-জ্ঞান।
নাহিক প্রহরী তথা, নাহি দ্বারবান,
কেবল সুধাংশু মুখী দুটী সহচরী
দুপাশে মোহন-বেশে বসি অশ্বোপরি।
দক্ষিণ করেতে কেতু ধরিয়া উজ্জ্বল,
পূর্ণ শশধর-করে করে ঝলমল ;
বামকক্ষে সুশাণিত দোলে তরবার ;
চন্দ্রের আলোকে শোভা অপূর্ব তাহার।
স্ফটিক-নির্মিত স্তম্ভ, হীরক খচিত ;
উপরে চাহিয়া দেখে, সুবর্ণ-নির্মিত
সুন্দর ফলকে, লেখা হীরক অক্ষরে,
গাথা এক নিরন্তর ঝলমল করে ;—
"আমোদ-নগর এই আনন্দের ধাম,
যাহা চাবে তাই পাবে পূর্ণ হবে কাম।"
দেখিতে দেখিতে যুবা বিস্মিত অন্তরে,
ক্রমে প্রবেশিল আসি পুরীর ভিতরে।
পুরীতে অদ্ভুত সব করে দরশন ;
পথের উভয় পাশে স্ফটিক ভবন ;
প্রত্যেক ভবনে দেখে জন-কোলাহল,
নৃত্যগীতে চারিদিক করে টলমল ;
যথা তথা উপবন শোভে মনোহর ;
কুসুম-সৌরভে পুরী করে ভর ভর ;
যুবক যুবতী সব, প্রফুল্ল বদন,
কভু হেথা কভু সেথা করিছে গমন।
ঔৎসুক্য দেখিয়া তার, রাখিয়া তাহারে
নিজ বাসে গেলা দেবী ; নামি দুই ধারে
দেখিতে লাগিল যুবা প্রেয়সীর সনে ;
একে একে যায় সব ভবনে ভবনে।
রথী হতে প্রিয়া সনে নামিল যখন,
যুবক দম্পতি এক আসিয়া তখন
উতরিল সেইখানে। দেখে চমৎকার,
সেই যুবা একজন প্রিয় বন্ধু তার ;
বঙ্গ-ভূমে ছিল যবে, তবে সেই জনে

হয়েছিল দেশান্তর ; এতদিন পরে
প্রেয়সীর সনে আসি মিলেছে আদরে ;
কিন্তু সে অদ্ভুত কাণ্ড দেখে চমৎকার,
সদা তার যুবতীর নেত্রে বহে ধার।
বাহিরে কাঁদিছে বালা আনন্দ অন্তরে ;
চলেছে নাথের কর ধরি পদ্ম-করে।
কহিতে কহিতে কথা তাহাদের সনে,
প্রবেশে অভাগা এক স্ফটিক-ভবনে।
দেখে তথা সিংহাসনে বসে একজন ;
পাত্রমিত্র চারিপাশে বসে অগণন ;
শত শত দাস দাসী তাহাকে ঘেরিয়া,
কর যোড়ে চারিধারে আছে দাঁড়াইয়া ;
সুরূপা কিঙ্করী দুটী চামর ঢুলায়,
কিবা সুসজ্জিত বাটী ইন্দ্র-পুরী প্রায়।
কিন্তু কি আশ্চর্য। তার চীর পরিধান,
বিশীর্ণ মলিন তনু, ভিখারী-সমান।
দেখিয়া অভাগা তারে চিনিল তখন ;
বঙ্গদেশে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমি সেই জন,
দিন দিন ভিক্ষা-মুষ্টি সঞ্চয় করিয়া
থাকিত অনেক কষ্টে জীবন ধরিয়া।
দেখিয়া তাহার কাণ্ড হাসিছে সকলে ;
কেহ বা করিয়া ঘৃণা যায় অন্যস্থলে।
কোন গৃহে গিয়া দেখে, এক বিদ্যাধরী
হীরক মুকুট শত লইয়া সুন্দরী,
সুস্বরে ডাকিয়া বলে ;—"কবি যতজন
আছ, সবে এই দিকে কর আগমন।"
মিত্রামিত্র কবি কত গণা নাহি যায়,
সকলেই সেইদিকে মস্তক বাড়ায় ;
কেহ বা পুস্তক খুলি পড়ে উর্ধ্ব-স্বরে ;
আপন ক্ষমতা বুঝে আপন অন্তরে।
নিজ মনে বিনোদিনী মুকুট লইয়া,
একে একে সবাকারে দেয় পরাইয়া।
কিন্তু সে অদ্ভুত তথা দেখে চমৎকার,
সুপ্রসিদ্ধ কবি যত কোন জন তার,
যায় নাই সেই গৃহে ; দেখিল কেবল,
বর্ণ-পটু কবি যত করে কোলাহল।
প্রবেশি দেখিল পরে অপর ভবনে,
খেলিতেছে শিশু এক প্রফুল্ল-বদনে ;

জনক জননী তার কভু বা তাহারে,
কোলে করি লইতেছে রতন আগারে ;
কভু রত্ন-আভরণে করিয়া সজ্জিত
ভাবিতেছে রাজ-পুত্র ; হয়ে হরষিত
কভু তারে বসাইছে বিচার আসনে ;
তাহাদিগে দেখে যুবা হাসে মনে মনে।
বঙ্গদেশে ছিল তারা অতি দীন হীন ;
অন্নের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল নিশিদিন।
সে আনন্দ-ধামে দিন কাটে অনিবার
এইরূপ নানাকাজে ; আনন্দ সবার
হৃদয় প্রফুল্ল দেখে ; বিষাদ সেখানে
নাহি পায় কভু স্থান ; প্রমোদ উদ্যানে
নাচিছে গাইছে সবে ; ঘন কুঞ্জবনে
বসন্তের সখা বসি কুলায়-ভবনে,
সুমধুর কুহু রব করিছে নিয়ত ;
মল্লিকার বাস হরি মারুত সতত
কুঞ্জে কুঞ্জে, গৃহে গৃহে, খেলিয়া বেড়ায় ;
শিরোপরে সুধানিধি প্রবল ধারায়
চারিদিকে সুধা-বৃষ্টি করে নিরন্তর :
যায় শোক, যায় তাপ, জুড়ায় অন্তর।
    দেখিয়া দেখিয়া যুবা বেড়ায় যেমন,
ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ণে রঞ্জিল গগন ;
দশদিক্ একেবারে জ্বলিয়া উঠিল,
সন্ত্রাসে কাঁপিল মন, নয়ন নিবিল ;
অনুপম তেজঃপুঞ্জ কার সাধ্য চায়,
সহস্র অশনি যেন মিলিল তথায়।
অন্তরীক্ষে অগ্নি-মাঝে হইল হুঙ্কার ;
একেবারে কেঁপে উঠে যেন ত্রিসংসার !
সংজ্ঞা-হীন হয়ে পড়ে কত নারী নর !
সে অনল মধ্য হতে সুগভীর স্বরে,
বলিল ডাকিয়া,—"ধিক্ হতভাগ্য নরে,
আশার ছলনে ভুলে ডুবেছে মায়ায় ;
কল্পিত সুখের ভোগে উন্মত্তের প্রায় ;
হা কি লজ্জা! কি আশ্চর্য! কখনো সফল
হবে না যে ইচ্ছা কেন তাহাতে চঞ্চল ?
যেবা যেথা আছে, সুখ তাহাতে নিশ্চয়,
ভক্তি-ভরে করে যদি বিভু পদাশ্রয়।

কথা-শেষে পুনরায় হইল হুঙ্কার ;
আশার স্ফটিক পুরী, একি চমৎকার !
নিমেষে নিমেষে যেন গলিতে লাগিল ;
দ্বিতল ত্রিতল ক্রমে শূন্যে মিলাইল !
তৃতীয় হুঙ্কারে সব হলো অন্ধকার ;
একেবারে চারিদিকে উঠে হাহাকার !
সম্ভ্রমে ভাঙ্গিয়া গেল যুবার স্বপন ;
সম্ভ্রমে ব্যাকুল হয়ে মেলে দু'নয়ন ।
    চেয়ে দেখে, পড়ে আছে কুটীর-শয়নে ;
কোথা দারা কোথা সুত, স্বপনের সনে
সে সকল হইয়াছে এবে অন্তর্ধান ;
এখনো যথার্থ বলি হয় অনুমান ।
কতক্ষণ পরে উঠে বাহিরেতে যায় ;
সেই ঘোর আন্দামান দেখিবারে পায় ।
তরুণ তপন এবে বন-মধ্য দিয়া,
মৃদু মৃদু হাসিতেছে তাহাকে দেখিয়া,
মহা কোলাহলে পাখী ছাড়িয়া কুলায়,
তার কথা গাছে গাছে বলিয়া বেড়ায় ;
এতক্ষণে নিদ্রা হতে উঠেছে সাগর ;
অদূরেতে যত সব কারাবাসী নর,
কহে কথা নানা মত, দক্ষিণ পবন
সুশীতল করি তনু বহে অনুক্ষণ ।
আনন্দে প্রকৃতি যেন হাসে মনো সুখে ;
তার মাঝে শুধু সেই অভাগার মুখে,
রাজ্যের বিষাদ যেন রয়েছে বসিয়া ;
বিরস-বদনে যুবা ভাবে দাঁড়াইয়া ।
বহুক্ষণ ঊর্দ্ধ-নেত্রে নিশ্বাস ছাড়িল ;
মলিন কপোলে অশ্রু গলিতে লাগিল ।
অবশেষে বলে—আর কেন রে নয়ন !
ফেল বৃথা অশ্রুধারা ? হতভাগ্য মন !
ভোল রে পূর্বের কথা ; ভোলো পরিবার ;
সাগরের পারে যেতে চাহিত না আর ;
যাওরে দুরাশা তুমি মানস ছাড়িয়া,
আর কেন হৃদি মাঝে থাক লুকাইয়া !
সুখের স্বপন সব লও রে বিদায় ;
সংসার ! একাকী রাখি যাওরে আমায় !
'এস রে শৃঙ্খল এস পরি রে চরণে !
তোমাকে এনেছি নিজে, তাড়াব কেমনে ?

থাকো থাকো আন্দামান ! লোহার পিঞ্জর
আর আমি বলিব না ; দুর্জয় সাগর !
তোমাকেও শত্রুবোধ করিব না আর ;
দিবা-শেষে মৃদু-পদে নিকটে তোমার,
আসি সিন্ধু ! করিব না বসিয়া রোদন ।
হও রে প্রস্তুত পৃষ্ঠ ! পেও না বেদন
কারারক্ষী বেত্র যবে করিবে প্রহার ;
চির জীবনের দণ্ড সেই রে আমার !
সকল ভোল রে মন ! পাপিষ্ঠ হৃদয়,
আর কেন বিভুপদ কররে আশ্রয় !
নরক যন্ত্রণা হতে পাইবে নিস্তার,
ভক্তি যদি সেই পদে থাকে রে তোমার ।
হৃদয় কলঙ্কী তুই কি হবে উপায়,
তাঁহার করুণা বিনা কে তারে তোমায় ?
যদি হরি কৃপা করি দেন পদে স্থান,
তবে রে অনল-কুণ্ড হইবে নির্বাণ ;
তাই বলি মন-প্রাণ করি সমর্পণ
অদ্যাবধি পদে তাঁর লও রে শরণ ।’

সম্পূর্ণ

প্রাপ্তির বেদনা ঃ সূচনা

ভেব না ভেব না আর

১

ভেব না ভেব না আর
ঘুচাও হৃদয় ভার ;
দুঃখের রজনী বুঝি পোহাইল ভাই রে,
চারিদিক পরিষ্কার দেখিবারে পাইরে !
রয়েছি যাঁহারে ধরে,
তিনি আজ দয়া করে,
শিশু বলে মুখ তুলে বুঝি ভাই চান্‌রে ।
দক্ষিণ দেশের বুঝি হলো পরিত্রাণ রে !

২

শিশু মোরা অসম্বল
নাহি অর্থ নাহি বল ;
দেশের সকল লোক ঘৃণা করি যায় রে !
পড়ে আছি চিরদিন সকলের পায় রে !
কিন্তু তাতে দুঃখ নাই,
আমরা যাঁহাকে চাই,
তাঁর যদি দেখা পাই স্বর্গ কেবা চায় রে ।
কিবা তুচ্ছ ধন মান দাঁড়ায় কোথায় রে ॥

৩

ধ্রুব যদি অসহায়,
হরি ভজে হরি পায়,
আমরা ডাকিলে তাঁর পাব দরশন রে ।
নির্দয় ঈশ্বর তিনি কোনকালে নন রে !
যাদিগে দেখিতে ভাই,
এ ভুবনে লোক নাই ;
তাদের সহায় সেই পিতা দয়াময় রে ।
এই ভেবে ভাই সব বাঁধ না হৃদয় রে ।

৪

ভাসিয়া নয়ন জলে
কোথা দয়াময় বলে
দীন দুঃখী ভাই সবে একবার ডাক রে ।
আর কেন বিষাদেতে ম্লান হয়ে থাক রে

তোমাদের পিতা যিনি,
অক্ষম ত নন তিনি,
দেবদেব বিশ্বপতি তাঁর কৃপা বলে রে।
শুধায় বিপদ সিন্ধু মহা গিরি চলে রে॥

৫

কোনরূপ ভয় পেলে
শিশু যথা খেলা ফেলে,
লুকায় মাতার কোলে, সে পিতার পায় রে!
সেরূপ আশ্রয় নিলে কেবা ধরে তাঁয় রে॥
সে পিতা রাখেন যারে,
তারে কে মারিতে পারে!
বজ্রদেহী হয়ে সে যে নাচিয়া বেড়ায় রে।
তাহার নাচের বাদ্য জগত বাজায় রে॥

৬

শুনিয়া তাহার স্বর,
জাগে দেশ দেশান্তর,
পিতার নামের ভেরী দশদিকে বাজে রে।
ঊর্ধ্বমুখে ধায় লোক ফেলে শত কাজ রে॥
বর্ণিব কি বৃথা আর,
দেখ চক্ষু আছে যার;
অগাধ সাগর পারে হয় আন্দোলন রে।
ব্রহ্মনামে থর থর কাঁপিছে ভুবন রে!

৭

কে তোরা কোথায় ছিলি,
আহা কিবা শুনাইলি!
বলে ওই দেখ ভাই শত শত জন রে।
আমাদিগে দেখিতেছে সজল নয়ন রে!
পাপী তরে নামে তাঁর
পাপীর কর্ণেতে আর,
এ হতে মধুর কথা কি শুনাবি ভাই রে!
এ হতে অমূল্য ধন আর কিছু নাই রে!

৮

কিছু নাই কিছু নাই
সত্য সত্য কিছু নাই
কেহ ত দেখেনি তাঁরে তবু তাঁর তরে রে!
এত লোক ভাই ভাই হাহাকার করে রে।

সহজে ত কেহ তাঁরে
ডাকে না ত এ সংসারে,
তবু দেখ কত লোক পাগলের প্রায় রে
কোথা কোথা ক'রে ক'রে খুঁজিয়া বেড়ায় রে !

৯

আমরা বালককালে
পড়েছি তাঁহার জালে
ছাড়িব কি ছাড়িবার শক্তি আর নাই রে।
বোঝে না অবোধ লোকে ক্রুদ্ধ হয় তাই রে
রাখিলে কি শুনে প্রাণ,
প্রাণের নিজের টান,
টেনে লয় সেই দিকে থাকে সাধ্য কার রে !
গেল বলে তাহাদের ক্ষোভমাত্র সার রে !

১০

আত্মীয় স্বজন যাঁরা
পর হয়ে যান তাঁরা,
জননীর হাহাকারে ঘর ফেটে যায় রে।
পিতার গর্বিত শির ভূমিতে লোটায় রে !
শুনি সব জানি সব
মার সেই হাহারব
দিবানিশি বাজে কানে ; কিন্তু কি যে টান রে !
ব্রহ্মের দিকেতে শুধু ছুটিতেছে প্রাণ রে !

১১

আমাদের ধন যাহা
ছাড়িতে নারিব তাহা
তোদের সর্বস্ব তোরা কর পরিহার রে।
এই কথা বলে লোকে এ কোন বিচার রে।
এ প্রাণ দিয়াছি যাঁরে
ছাড়িতে কি পারি তাঁরে
মরি আর বাঁচি ব্রত করিব সাধন রে !
দু'দিনের খেলা শুধু মানব জীবন রে।

১২

কর্তব্য বুঝিব যাহা
নির্ভয়ে করিব তাহা
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন মান প্রাণ রে।
পিতারে ধরিয়া রব পর্বত সমান রে।

ব্রহ্মনাম গাব সবে,
মেদিনী কম্পিত হবে,
ব্রহ্মনামে টলমল টলিবে সাগর রে,
ব্রহ্মনামে থর থর কাঁপিবে ভূধর রে!

১৩

তাই বলি ভাইগণ!
ব্রহ্মেতে সঁপিয়া মন
সকলের পদতলে দাস হয়ে রও রে!
দেশের লোকেরে ডেকে ব্রহ্মকথা কও রে!
সরল শিশুর মত
বিনয়ে হইয়া নত
নিজের কর্তব্য যাহা অবাধেতে কর রে!
দেখিবে সকল বাধা হইবে অন্তর রে!

ভারতাশ্রমবাসিদিগের প্রতি

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাইরে
বাঁধ ভেঙ্গে আসে ঢেউ, এবার বাঁচবে না কেউ
প্রেম সাগরে লেগেছে তুফান।
ঘন ঘন ঢেউ উঠে, ব্রহ্মাণ্ড বা যায় ফুটে
উত্তরেতে ডাকিতেছে বান।
ওই ডেকে আসে বান, সামাল আমার প্রাণ
ঢেউ খারে নির্ভর অন্তরে;
ও ঢেউ লাগিলে গায়, মহাপাপী স্বর্গে যায়,
দুঃখীদের দুঃখ শোক হরে।
ব্রহ্মনাম হৃদে ধরে ব্রহ্মেতে নির্ভর করে,
ক্ষণকাল এই কিনারায়
সাবধানে বসে থাক্, আগে বান ডেকে যাক্
পরে পাড়ি দিবি পুনরায়।
ওই দেখ সারি গেয়ে, আনন্দে আসিছে ধেয়ে
ছোট বড় কতগুলি তরি:
বোধহয় যাবে পারে, দেখে যেন ভুল না রে
কাছে এলে যাস্ সঙ্গ ধরি।

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে।
সারি গেয়ে উচ্চ স্বরে, মহা কোলাহল করে,
কোথা যাস্ একা আমি যেতে না ডরাই রে!
বসে শুধু ভাবিতেছি তাই রে!

আজ বুঝি প্রসন্ন গোঁসাই রে,
আমি না আসিতে কূলে, যাস্ তোরা পাল তুলে
দাঁড়া ভাই দয়া করে, আমি খুলি যাই রে।
আমার যে সঙ্গী কেহ নাই রে।

কার নাম গাস্ ? কোথা ঘর রে !
বুঝি বা বাণিজ্য করে, আজ বহুদিন পরে
ঘরে যাস্, তাই এত প্রফুল্ল অন্তর রে,
তাই গাস্ হয়ে সমস্বর রে।

আমারো যে ঘর ওই পার রে।
বারেক দাঁড়া রে ভাই, আমি খুলে সঙ্গে যাই
বোধহয় তোরা কেউ হইবি আমার রে !
প্রাণ কেন টানে বার বার রে !

ভাই ভগ্নী যদি কেউ থাক রে।
অধমের গলা শুনে, ভাই বলে লও চিনে
আমাকে লইবে বলে আশা দিয়ে রাখ রে।
দূর হতে ভাই বলে ডাক রে।

ভাই বটে, ওই শুনি কানে রে।
তোরা সব প্রেম ভরে, যেন মিলে পরস্পরে
আমার পিতার নাম গাস্ এক তানে রে।
বড় ভাই বাজিতেছে প্রাণে রে।

ডাক্ ডাক্ ডাক্ বারে বার রে।
সে মধুর নাম লয়ে, পবন মধুর হয়ে
শ্রবণেতে সুধা বৃষ্টি করুক আমার রে।
আছে সুধা কোথা কিবা আর রে।

স্বর্গ বুঝি আসিল ধরায় রে।
পিতার প্রেমের জয়, বুঝি এতদিনে হয়,
ওঠ্ রে ভারতবাসি দেখে যাবি আর রে।
আত্মপর কথা উঠে যায় রে।

অবশেষে ডাকি হে তোমায়

অবশেষে ডাকি হে তোমায়
অগম্য অপার তুমি ঘৃণিত পদার্থ আমি
পড়ে আছি সংসার ধূলায়।
যুগে যুগে শত শত যোগী ঋষি সাধু কত
হাবুডুবু যে ভাব-সাগরে।

অবিশ্বাসী ভক্তিহীন, অধম নিকৃষ্ট দীন
আমি যাই কি সাহস ধরে।
অনন্ত আকাশ পারে চটক কি যেতে পারে ?
পিপীলিকা হবে সিন্ধু পার !
তোমার ইচ্ছার মর্ম বোঝা প্রভু কার কর্ম !
নর-জন্মে হেন ভাগ্য কার !
যুগ-যুগান্ত চলে যায় তব তত্ত্ব কেবা পায়
পরিশ্রান্ত মানব-সন্তান।
পাব পাব আশা করে চলিবে জনম ভরে
এই প্রভু তোমার বিধান।
দেবের দুর্লভ ধন এই শুধু আকিঞ্চন,
ধর্মপথে থাকে যেন মতি ;
তব শুভ ইচ্ছা যাহা মোর প্রাণ করো তাহা,
তাতে দাস পাইবে সদ্গতি !
ঘোর প্রহেলিকা সম তব ইচ্ছা নিরুপম
মানবের অগম্য সে স্থান !
নাহি হেন অহঙ্কার সে ইচ্ছার আবিষ্কার
করি নাথ করিয়া সন্ধান।
ধর্মের তৃষার ঘোর কেঁদেছিল প্রাণ মোর
তাই প্রভু শিখালে প্রার্থনা ;
দুর্বলে আনিলে বল, নরকে স্বর্গের ফল,
ঘুচাইলে গভীর বেদনা।
আপনি রসনা বলে আপনি চরণ চলে
ধর্মরাজ্য আসি উপনীত !
জনমে দেখিনি যাহা চক্ষে দেখিলাম তাহা
দেখি চক্ষু হইল মোহিত।
আরো কোথা যাব আমি জান প্রভু অন্তর্যামি
জ্ঞানাতীত সে সব আমার ;
তোমার ইচ্ছার মর্ম বোঝা প্রভু কার কর্ম
নরজন্মে হেন ভাগ্য কার !

হিমালয়ের দেবস্তুতি

সৃষ্টির প্রভাতে অনন্ত-নীরধি
নিমগ্না মেদিনী ধীরে হৃদি খুলি ;
নবীন ভাস্করে, নিরীক্ষণ করে,
উত্তাল তরঙ্গ শূন্য-গর্ভে তুলি,
ধাবিত প্রমত্ত প্রচণ্ড জলধি !

সেই ঘোর প্রাতে চলরে কল্পনা,
স্মরণে কম্পিত হৃদয়-কন্দর !
না ছিল ধরণী জীবপ্রসবিত্রী
পশুপক্ষী কীট কিম্বা নারীনর ;
না ছিল জাহ্নবী গভীর-নিস্বনা ।

না ছিল যমুনা নীল কল্লোলিনী,
না ছিল সুরম্য বিশাল প্রান্তর ;
হস্তিনা কোশল, ছিল না সকল,
অমের বাল্মীকি শ্রীবাস শঙ্কর ;
ছিল না ভারত মস্তকের মণি ।

ছিল না সুন্দর ভারত দুহিতা
ছিল না কোমলা সতী লজ্জাবতী,
জনম দুখিনী, জনক নন্দিনী,
ছিল না সাবিত্রী সত্যবান-পতি,
ছিল না দুখিনী বিদর্ভ বনিতা ।

চতুর্বর্ণময় ভারত-সংসার
ছিল না পুরাণ স্মৃতি বেদ-মন্ত্র
কৌরব পাণ্ডব, আহব, খাণ্ডব,
কপিল, জৈমিনি, পাতঞ্জল-তন্ত্র
চার্বাক বেদান্ত ন্যায় সবিস্তার ।

সেই ঘোর প্রাতে ঘর্ঘর অশনি,
গগন ফাটায়ে দশ দিকে ধায় ;
আবর্ত পুষ্কর আদি জলধর,
গগন প্রাঙ্গন নীলাম্বরে ছায় ;
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কাঁপে বীর নগমণি ।

বায়ু পদাঘাতে অর্ণব কুপিত,
শত হস্ত হয়ে উঠি পড়ি ধায় ;
গিরীন্দ্র কন্দরে, বীর দর্প ভরে
তাল ঠুকি সিন্ধু বিহরিতে চায়,
পাষাণ-প্রাচীর দেখে সঙ্কুচিত ।

অনন্ত কল্লোলে অর্ণব-উল্লাস !
রোদসী কন্দরে ঘোর প্রতিধ্বনি ;
হিমাদ্রি-চরণে লুঠি ক্ষণে-ক্ষণে
মত্ত সিন্ধু রোষে ডুবায় ধরণী,
না ছিল মনুষ্য, কোথায় সন্ত্রাস ?

সিন্ধুর আঘাতে গিরিবর দোলে,
কার্পাস পর্বত সম ফেনা ফুটে ;
ঘোর অট্টহাসে প্রমত্ত উল্লাসে,
বাহু তুলি সিন্ধু দিগ্দিগন্তে ছুটে ;
রঙ্গে হাসে গিরি জম্বু দ্বীপ কোলে।

প্রচণ্ড দিগ্দাহ তথা পূর্বাকাশে,
বালার্কো ময়ূখ- বিভাসিত ধরা ;
ভূধর, সাগর, গগন-প্রান্তর,
তরল সুবর্ণে স্বর্গ মর্ত্য পোরা,
ছিল না মানব, কে আনন্দে ভাসে !

নিরখি সে শোভা হিমাদ্রি অধীর,
দেবস্তুতি আশে হৃদি আন্দোলিত ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ তুলি হৃদি-দ্বার-খুলি
আরম্ভে বন্দনা, বিশ্ব চমকিত !
বালার্ক সমুদ্র শুনে দুই বীর।

বন্দনা

জয় ব্রহ্ম সনাতন, মঙ্গলময় হে,
জয় দেব গুহাশয় জগতালয় হে॥
জয় রুদ্র বিশ্বম্ভর বিভাকর হে।
জয় ঈশ্বর সুন্দর বচনোত্তর হে॥
জয় অপার অগাধ অবোধ্য বিভু হে।
জয় সূক্ষ্ম পুরাতন অগম্য প্রভু হে॥
জয় আদি অনাদি অচিন্ত্য শান্ত হে।
জয় অভেদ্য অছেদ্য ভূগোলপতি হে॥

জয় মহেশ বিভূতি-গণ-ভাবিত হে।
জয় বিষ্ণু অনন্ত
জয় তুঙ্গ-তরঙ্গিত অর্ণব কর হে।
জয় জয় সুন্দর প্রভাকর ধর হে।
জয় হিমাদ্রি-হ্রদাব্ধি-তরঙ্গ-বিধু হে।
জয় জয় সুন্দর রসাল মধু হে॥

ছুটি-ছুটি সাগর উলটি-পালটি
পদরজ লেহিছে তোমার,
পদরেণু লেহিছে তোমার!

গম গম মারুত ভেরী বাজাইছে
তব নাম ঘুষিছে অপার,
তব যশ ঘুষিছে অপার !

অগণন তারকা উজলি প্রজলি
নিতি ফুটিয়া মিলায়,
ফুটি ফুটি আবার মিলায় !

যেন তব আসন করি প্রদক্ষিণ
মআল আরতি গায় ;
প্রভু যেন আরাতি গায় !

পুন গেল তামস আসি দেখা দিল
বিভাকর ঘুষিয়ে সুযশ,
প্রভু তব ঘুষিয়ে সুযশ !

হিমগিরি আকুল শোভা নিরখিয়ে
ভরি গেল যেন দিক দশ,
পূরি গেল যেন দিক দশ !

হৃদি মম পাষাণ দেব বিদরিল,
ঝরি গেল নির্ঝর বারি,
প্রভু ঝরে ঝর্ঝর বারি !

জয় জয় শঙ্কর শিব হে সুন্দর
জয় জয় করুণা তোমারি,
জয় প্রভু মহিমা তোমারি !

ফুরাল বন্দনা স্থির গিরিবর
দুই নেত্র দিয়া বহে দুটী ধার ।
বহিয়া বহিয়া মিলিল আসিয়া
গঙ্গা ও যমুনা নামেতে প্রচার ।

ক্রমে প্রকাশিল, ভারত সংসার ;
সূর্য চন্দ্র বংশ শৌর্যের আধার,
বিপিন প্রান্তর সুরম্য নগর
ধন ধান্যে পূর্ণ শোভার ভাণ্ডার
অপরূপ সৃষ্টি দৃশ্য চমৎকার ।

আনন্দমোহন বসু

[দীর্ঘ চার বছর আট মাস বিলাতে থেকে ১২ই অক্টোবর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসু কলকাতায় ফেরেন। অকৃত্রিম সুহৃদ্ শিবনাথ শাস্ত্রী স্বদেশ-প্রত্যাগত এই বন্ধুকে কবিতা রচনা দ্বারা সম্বর্ধিত করেন।]

সাধিয়ে অসাধ্য কাজ সুযশে ভূষিত,
হয়ে আজ পুনঃ বঙ্গে হইলে উদিত!
কি দিব তোমারে মোরা দীনহীন বেশে,
দীনহীন হয়ে আছি দুঃখিনীর দেশে।
দুঃখিনী জনমভূমি প্রাণের সন্তান
দিলেন তোমারে পুনঃ নিজকোলে স্থান।
তোমার সুযশ শুনি আজি ঘরে ঘরে,
রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি বলে নারী নরে।
ধন্য তুমি যার নামে উজল-ভবন,
দেশের গৌরব তুমি অমূল্য রতন।
বাড়ালে দেশের মান তুমি যে প্রকার
তার মত বঙ্গবাসী কিবা উপহার
দিতে পারে? তাই বলি, হৃদয় খুলিয়া
ঘরে এস বন্ধুবর! লই হে বরিয়া।
ঘরে এস জন্মদুঃখী বঙ্গের রতন,
যা আছে তোমারে সব করি সমর্পণ।
কি আছে? হৃদয় আছে, আছে আলিঙ্গন,
দিব তাহা। অশ্রু আছে করি বিসর্জন।

ব্রাহ্মসম্মিলন

আয় আয় ভাই, মিলিয়ে সকলে,
কোভ দুঃখ যত, আয়রে অন্তত:
দুদিনের তরে সব যাই ভুলে।
কার অভিশাপে, মরি মনস্তাপে
প্রাণের বন্ধন, ছিঁড়ে কোন্ জন
ভাসালে সবে নয়নের জলে;
হৃদয়ের আশা সকল ডুবালে।
কি সুখে যে ছিনু আশা কে ভাঙ্গিল?
সুখের সংসারে, কেবা এ প্রকারে
বিদ্বেষ অনল জ্বালাইয়া দিল?
প্রেমের সাগর; যাদের ঈশ্বর,
তাহাদের ঘরে আজ সবে মরে
এই ঘোর কথা কেবা প্রচারিল।
ধর্মের গৌরব কেবা ঘুচাইল।

কে শিখালে কথা
বাঁধে না হৃদয় !
এ অসত্যে ভাই !
সব বাধা যায়,
আয়রে সকলে,
দেখাই জগতে
সব বাধা যায়,
ধিক্ ব্রাহ্মনাম !
ধিক্ ধর্মোৎসাহ !
ব্রাহ্মগণ ! বল্
এ মন্ত্রে সবায় ?
প্রেমের সংসার
এক হস্তে প্রেম
অন্যে ভ্রাতৃবক্ষে

"মতে না মিলিলে
দিও না প্রশ্রয়"
হৃদয় থাকিলে,
তাই বলি আয়
আজি দলে বলে
সব ভাই মিলে
হৃদয় থাকিলে।
ধিক্ ব্রাহ্মশিক্ষা !
উৎসব প্রবাহ !
কে করিল দীক্ষা
কে বলে ধরায়
করিবে প্রচার ?
করিতেছে ভিক্ষা
ছুরির পরীক্ষা।

ছাড় বিড়ম্বনা ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম নাম,
ছিলে সবে যথা, ফিরে যাও তথা,
দলাদলি স্থান নয় ব্রহ্মধাম।
শাখা মৃগ যারা, বনে থাক্ তারা
সুসভ্য সমাজে, জ্ঞানলোক মাঝে,
সে সব জীবের নাহি কোন কাম,
বুঝিয়াছি বিধি তোমা সবে বাম !
কি হলো ঈশ্বর কি হইবে গতি !
ঘোর পাপার্ণবে, ডুবে মরি সবে,
কি হবে ঈশ্বর ! কি হবে হে গতি !
সোনার সংসার, হলো ছারখার,
মরিনু মরিনু, বুঝি ডুবাইনু
তোমার পবিত্র নাম বিশ্বপতি !
কি হবে ঈশ্বর কি হবে গতি !
যে আশা দিয়াছ সে কি সব বৃথা।
আজো সে অনল, রয়েছে উজ্জ্বল,
রসনাও বলে আজো সেই কথা।
তব রাজ্য যাহা, প্রেম রাজ্য তাহা
আসিবে জগতে ; জানি কোন মতে
পারে না মানুষ রাখিতে সর্বথা ;
তাই ত আজিও বলি সেই কথা।
তাই আজ বলি, হাসুক যে হয় ;

তাই আজ বলি, জয়ধ্বজ তুলি,
তাই আজ বলি জয় ব্রহ্ম জয়।
ব্রহ্মের সংসার, মিলেছে আবার,
যেবা আছে যথা, লিখে রাখ কথা,
বিশেষ ঘটনা স্মরণে হৃদয়
আনন্দ উল্লাসে মধুরতাময়।
আয় আয় ভাই। গাইরে সকলে,
প্রেমের মহিমা, অনন্ত অসীমা
আয় আয় ভাই, ব্রহ্ম জয় বলে।
মানসের আশা প্রাণের পিপাসা
বুঝি বা মিটিল, বুঝি পোহাইল
দুঃখ নিশা ; বুঝি মঙ্গলের জলে
ডুবিল দুর্দশা ব্রহ্ম কৃপা বলে।

প্রার্থনা

বিশ্বরাজ! ক্ষুদ্রমতি অতি হীন প্রাণ
কি জানি তোমার বিভো! অনন্ত স্বরূপে
কি যে আছে কি তা বুঝি! যত দূর যাই
তত ডুবি ; আরো ডুবি ; শেষে ক্ষুদ্র প্রাণ
রুদ্ধশ্বাসে রুদ্ধকণ্ঠে বলে হে অগাধ!
আমি ক্ষুদ্র বিশ্বপতি! আমার কামনা,
আমার কল্পনা, চিন্তা, ক্ষুদ্র যে সকলি!
কি জানাব? ও হে দেব! এই মাত্র জানি
ভগ্ন প্রাণে বাস তব! তাই ভগ্ন-হৃদে
সংসার-দুর্দিন মাঝে, যন্ত্রণা-সাগরে
তাই হে হৃদয়-বন্ধু! ডাকি বারে বারে।
কোটি বিশ্ব ভিক্ষা করে যে কটাক্ষ-তলে
সে কটাক্ষে এ দাসের নয়নের ধারা
দেখ তুমি ; এ সান্ত্বনা পারি কি ভুলিতে!
বেঁচে আছি এই সুখে ; তবে কর যোড়ে
এই চাই, দেখো দেব! দেখো হে আমারে
সংসার-যন্ত্রণা-চক্রে দেখো পিতা মোরে।

শ্রমজীবী

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই !
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারীনর
ঘুমাবার আর বেলা নাই,
উঠ জাগো ডাকিতেছি ভাই ।

ঘোর রোল ভারতে উঠিল
অগ্রসর অগ্রসর
এই রব ঘোরতর
শুনে কর্ণ বধির হইল,
উঠিয়েছে যে যেখানে ছিল ।

ওই দেখ চলেছে সকলে,
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্বাগ্রেতে ধায় তারা
পায় পায় ধনীরাও চলে,
ছোট বড় ধায় কুতূহলে ।

জাগিবার বাকী কেবা আর
যাহারা অবলা বলে
বিখ্যাত ধরাতলে,
সেই নারী উঠেছে এবার,
মহানন্দে হয় আগুসার ।

নবদৃশ্য ভারতে উদয় !
নবরাজ সমাগমে
নবশক্তি নবোদ্যমে,
পূর্ণ আজি সবারি হৃদয়
আজ দেশ যেন অগ্নিময় ।

হেনকালে কে ঘুমাতে পারে !
অকর্মণ্য জড় যারা
ঘুমায় ঘুমাক তারা !
থাকে থাক অজ্ঞান আঁধারে,
শ্রমজীবি ! ডাকিছে তোমারে ।

সমাজের মূল তোরা ভাই !
কে দেখেছে ধরাতলে
মূল বিনা তরু চলে ।
মাথা চলে তাতে লাভ নাই ;
যথা ছিল রহিবে তথায় ।

ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শত শত
কেমন সংগ্রামে রত ।
এই ব্রত—রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে ।

আয় তবে শ্রমজীবীগণ
নবোৎসাহে চলে আয়,
সময় বহিয়া যায়,
ঘোরতর বাজিতেছে রণ
যা করিয়ে সার্থক জীবন ।

শ্রম নামে কল্পতরু
অতি চমৎকার,
যাহা চাবে তাহা পাবে—
নিকটে তাহার ।*

* শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার প্রথমবর্ষের (১৮৭৪) প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত । শ্রমজীবীদের সম্পর্কে এটিই সম্ভবত: প্রথম রচিত কবিতা ।—বর্তমান সম্পাদক

পুষ্পমালা

(পদ্য-সংগ্রহ)

[প্রথম প্রকাশ : ১২৮২ সাল]

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এর অতি যত্নে গ্রথিত 'পুষ্পমালা' পুস্তকখানি আমি সাদরে সাধারণ পাঠক সমাজের করে অর্পণ করিতেছি। শিবনাথ বাবুর প্রতি কবিতা দেবী যেরূপ সুপ্রসন্ন, তাহাতে ইতিমধ্যে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। 'নির্বাসিতের বিলাপে' তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয়, তৎপরে অনেকগুলি সমাদৃত সাময়িক পত্র তাঁহার কবিতা হারে মধ্যে মধ্যে শোভিত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকের অনেক স্থল তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিবে। বলিতে কি, এ প্রকার ধাতুর পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। ভদ্রাঙ্গনাগণের পাঠোপযোগী একখানি বিশুদ্ধ কাব্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় নাই বলিলেই হয়, এজন্য স্ত্রীশিক্ষা হিতৈষীদিগকে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, শিবনাথবাবুর এই পুস্তক দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষোভের কারণ নিরাকৃত হইবে অনায়াসে বলা যাইতে পারে। রমণীগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য ইহাতে স্ত্রীচরিত্র ও ধর্মবিষয়ক কবিতার কিছু অধিক সংখ্যক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই পুস্তক কেবল স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ অভাব পূর্ণ করিবে এমত নহে, ইহা দ্বারা বঙ্গ বিদ্যালয়ের বালকদিগেরও কাব্যপাঠের সহায়তা করিবে। বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভাগ পদ্যপাঠের পর কোন কবিতা পুস্তক পাঠার্থে ব্যবহৃত হইবে, স্থির করিতে হইলে অকূল ভাবনায় নিমগ্ন হইতে হয়। এখন 'পুষ্পমালা' সেই ভাবনা দূর করিবে। ইহাতে স্ত্রী-চরিত্রের সুন্দর চিত্র, দেশ হিতৈষণার জ্বলন্ত উত্তেজনা এবং ধর্মানুরাগের উদ্দীপ্ত ভাব, যেরূপ প্রসাদ গুণান্বিত প্রাঞ্জল ভাষায় এবং ওজোগুণান্বিত সরস কবিতায় চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়রঞ্জন ও সদ্ভাবোন্মেষণের সম্পূর্ণ সহায়তা করিবে।

কবিতাগুলির অধিকাংশই পূর্বে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে একত্র সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা গেল। তদ্ভিন্ন দুই একটা নূতন রচিত কবিতাও আছে। কবির বয়োবৃদ্ধি সহকারে কবিত্ব শক্তির কিরূপ বিকাশ হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য পূর্ব প্রকাশিত কবিতাগুলি প্রায় অবিকল রাখা হইয়াছে এবং সূচীপত্রে তাহাদের রচনার সময় নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হরিনাভি
ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস
১২৮২।১২ ভাদ্র

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা *

পুষ্পমালা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। প্রথমবারের অনেক কবিতা এবারে পরিত্যক্ত হইল এবং তৎস্থানে অনেক নূতন কবিতা সন্নিবেশিত হইল। মালা গাঁথিবার সময় লোকে কোন ফুলটীর পর কোন ফুলটী বসাইবে তাহা ভাবিয়া থাকে, কিন্তু এ মালাতে সে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। যদি পুষ্পগুলির বাস্তবিক সৌরভ থাকে লোকে এ অপরাধ মার্জনা করিবেন, আর যদি সৌরভ না থাকে, মহাযত্নের সহিত গাঁথিলেও কিছু হইত না।

১২৮৭ আশ্বিন }

* বর্তমান সংস্করণে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সংস্করণের কবিতা একত্রে প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের যে কবিতাগুলি গৃহীত হয়নি, সেগুলি প্রথমে মুদ্রিত হল।—সম্পাদক

দুঃখিনী

ওই কে বিজন গৃহে বসিয়া কামিনী,
উদাস উদাস মুখ যেন পাগলিনী,
শূন্য শূন্যদৃষ্টে চায়, দুই গণ্ড ভেসে যায়,
মরুভূমে পথহারা যেন কুরঙ্গিনী।
পাশেতে দাঁড়ায়ে শিশু বিষণ্ণ বদন,
কেন মা কাঁদিস বলে করে আকর্ষণ ;
তাহাতে না দেয় কান, নিতান্ত অস্থির প্রাণ,
দর দর অশ্রু শুধু করে বরিষণ।
আজো যে যৌবন তার নহে অস্তমিত,
এখনো সুন্দর মুখ আছে প্রস্ফুটিত,
এ বয়সে কেন তার, এ হেন হৃদয় ভার ?
সন্ধ্যা না আসিতে পদ্ম কেন মুকুলিত।
জীবন তরণী তার সুখের সাগরে,
কোথা ভাসি বেড়াইবে প্রফুল্ল অন্তরে,

তা না হেন ভাবে কেন ?
রাজ্যের বিষাদ যেন

মলিন সুধাংশু মুখে এসে রাজ্য করে।
কেহ কি তোমার নাই এ তিন সংসারে,
ও চক্ষের জলধারা মুছাইতে পারে ?
হা অভাগি ! স্থির হও ; পুত্রটীকে কোলে লও ;
ওই দেখ সাশ্রুনেত্রে ডাকিছে তোমারে।
হা পাঠক ! ‹ ান কি হে কেন অভাগিনী
কাঁদিতেছে ?—কার তরে আজ পাগলিনী ?
বন্যার জলের প্রায়, দুটী গণ্ড ভেসে যায়,
বুঝি আজ বুক ফেটে মরে রে কামিনী।
পতি তার মৃত্যু-মুখে পড়িয়া শয্যায়
ছট ফট করিতেছে রোগ-যাতনায়।
অকালে ভাঙ্গিল খেলা, ফুরায়ে আসিল বেলা,
ধীরে ধীরে প্রাণ রবি মেঘেতে লুকায়।
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো ভাবিছে কামিনী,
সংসার-সাগর-কূলে বসে একাকিনী।
পথের ভিখারী করে, স্বামী যায় পরিহরে,
কোথায় মস্তক আজ রাখে অভাগিনী।
পিতৃকুলে কেহ নাই কে দিবে আশ্রয় ;
বিধুরা রমণী সব দেখে শূন্যময় !

এক ঘর লোক ছিল, মৃত্যু সব হরে নিল ;
শ্মশান-সমান আজ হইল আলয় ।
গেছে পিতা, গেছে মাতা, আজ পতি যায় ;
গলেতে কলস বাঁধি সাগরে ডুবায় ।
এই সব ভাবি মনে ধারা বহে দু নয়নে ;
এই দুঃখে আজ তার বুক ফেটে যায় ।
কিবা খায় কিবা দেয় প্রাণের কুমারে ।
অন্তরের ভাব তার কে বর্ণিতে পারে ।
সরল হৃদয় তার, ভাবিতে পারে না আর,
গুরু-ভারে ভেঙে বুঝি যায় একেবারে ।
যায় একেবারে ;—আহা সুধাংশু বদন
ওই যে মুদিত হলো জনম-মতন ;
এ বয়সে অভাগিনী, হলো হায় কাঙ্গালিনী,
ঘুচিল মধুর হাসি জনম মতন ।
জনম মতন বালা হলো তপস্বিনী,
দারিদ্র্য-কাননে আজ পশে একাকিনী ;
পুত্রটীকে কোলে লয়ে, কাঁদিছে ব্যাকুল হয়ে ;
শাবক লইয়ে যথা কাঁদে বিহগিনী ।
মৃত্যু রে কি করে গেলি । দেখে প্রাণে মরি,
বল না কেমনে এত সহিবে সুন্দরী ?
এ কি হলো নিরুপায়, একা বালা ভেসে যায় ;
কে কোথায় আছ বন্ধু রাখ তারে ধরি ।

ভাবনা

অর্থাৎ

ইংলণ্ডগামী যুবার রমণী

স্থান—মহানগর প্রাসাদ শিখর ; সময়—সন্ধ্যা,
অমাবস্যার নিশি সন্নিকট ; পদতলে শিশু সন্তান অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতেছে ।

দিবস হইল শেষ ;
ধরিয়া বিষন্ন বেশ
ওই রবি অস্তাচলে যায় ;
প্রাণ-পতি রহিলা কোথায় !

সারাদিন চরা করি
ক্ষেত মাঠ পরিহরি
পাখীগণ গগনে উঠিল ।
কলরবে বাসাতে চ'লল ।

ছিল তারা দেশান্তরে,
মহানন্দে আসে ঘরে,
মোর পতি কোথা ভেসে যান !
কেবা করে সে সংবাদ দান।

নানা জনে গান ধরে,
কার্য হতে যায় ঘরে,
মোর প্রাণ এক গান গায় ;
'প্রাণ-পতি রহিলে কোথায় !'

বিরস বদনা নিশি,
অভাগীর সনে মিশি
কাঁদিবারে মৃদুপদে আসে,
প্রাণ মোর কাঁপিছে হুতাশে !

ছেলে কাঁদে মা মা বলে,
কেবা তারে করে কোলে।
ভাল আর লাগে না শ্রবণে,
শুধু তরি পড়িতেছে মনে।

লোকে বলে ভয়ঙ্কর
ধূ ধূ করে সে সাগর,
প্রাণ-পতি তাতে ত এখন !
মাগো ! এ কি কেঁপে উঠে মন !

বস্ত্রে মুছি অশ্রুজলে,
ফিরিয়া শিশুরে বলে ;
'কাঁদিস্ নে আয় কোলে আয় ;'
বলি বালা কোলে নিল তায়।

আদরে হৃদয়ে নিয়ে
মুখ চন্দ্রে চুম্ব দিয়ে,
বলে, 'বাবা কোথায় তোমার ?
বাবা বলে ডাক একবার।'

যত শিশু বাবা বলে
দর দর নেত্র জলে
বিধু মুখ মরি ভেসে যায়,
প্রাণ-পতি রহিলে কোথায় !

এ দিকেতে বিভাবরী
শোকের বসন পরি,
ধীরভাবে আসিয়া পৌঁছিল
ভয়ে বিশ্ব নীরব হইল।

'এলে কি লো বিভাবরি !
হতে মোর সহচরী ?
অশ্রুবারি মুছাতে অঞ্চলে ?'
বলি, বালা ভাসে নেত্র জলে ।

দুঃখের সঙ্গিনী হতে,
আজ আসিবার পথে
রেখে কি লো এলে শশধরে ?
আজি কেন হেন বেশ পরে ?

শিশু ঘুমাইল কোলে ;
লয়ে বালা গৃহে চলে,
শয্যা পাশে যাই উতরিল,
শোক সিন্ধু উথলে উঠিল ।

প্রাণ-নাথ ! তব তরে
শয্যাও অপেক্ষা করে
কতদিনে পুন অভাগীরে
দয়া করে, আসিবে হে ফিরে ।

ভাস কোথা সিন্ধু-জলে
কেবা বসে পদতলে
এতক্ষণে সেবিছে তোমায় ?
প্রাণ-পতি রহিলে কোথায় !

পীড়া যদি হয়ে থাকে,
আজ বলিতেছ কাকে ?
অভাগীকে করিছ কি মনে ?
কাঁদিছ কি পড়িয়া বিজনে !

কেবা আছে এ সংসারে
মোরে যে লইতে পারে,
সেই ঘোর সাগরের জলে,
আমি যাঁর, তাঁর পদতলে ।

ডানা পেলে পরী হয়ে,
পুত্রটীকে কোলে লয়ে,
উড়ে যাই শূন্যে একাকিনী,
ঢেকে মোরে রাখে নিশীথিনী ।

উড়ে উড়ে যাই তথা,
প্রাণ-পতি শুয়ে যথা ;
পুত্রটীকে তাঁর কোলে দিয়ে,
কাঁদি খুব হৃদয় ভরিয়ে ।

কেঁদে নিয়ে প্রাণ ভরে
বলি,—‘প্রাণ হু হু করে
তাই নাথ! এলাম ছুটিয়া ;
ক্ষমা কর অবলা বলিয়া!’

দেখি আজিকার তরে
নিশা-শেষে যাব ঘরে,
পোড়া ঘরে যাব ত নিশ্চয়
যেতে নাথ! মন নাহি লয়!

এত বলি উঠে যায় ;
নাথের ছবির পায়
জানু পাতি বিনয়ে বসিল ;
বসি বালা বলিতে লাগিল।

যদি তাঁর ছবি হও,
অরে ছবি!! কথা কও,
প্রিয়া বলে ডাক একবার ;
মুছে দাও নয়নের ধার!

সেই হাসি সেই সব
শুধু কেন নাহি রব ?
অসময়ে বুঝাতে আমার!
প্রাণ-নাথ দিলা যে তোমায়!

সেই প্রাণনাথ যেন
বসি, বোধহয় হেন ;
তবে কেন নাথের মতন
কর না হে সুধা বরষণ ?

ছবিখানি খুলে লয়ে
যতনে রাখে হৃদয়ে,
পদযুগে চুম্বে বার বার,
প্রাণ-পতি তুমি কি আমার!

হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!
যুড়িয়া যুগল কর,
তনয়ার এই নিবেদন,
নাথ মোর কর হে গ্রহণ।

মাতার সমান হয়ে,
ছবিখানি বক্ষে লয়ে,
লয়ে যাও সেই দূরদেশে,
যান তিনি যাহার উদ্দেশে।

ভাই বন্ধু পরিবার
কাছে কেহ নাহি তাঁর,
রোগ শোকে কে দেখিবে তাঁয় !
তাই দেব ডাকি হে তোমায় ।

তুমি নাকি অন্তর্যামী,
সর্বব্যাপী সর্বগামী,
তাই বলি, সেই সিন্ধুজলে
দেখ তাঁরে অসহায় বলে ।

জগদীশ ! সঙ্গী হয়ে,
নিজে তুমি যাও লয়ে,
মনোরথ পূরাও তাঁহার,
শুনে প্রাণ জুড়াক আমার

লোকে গা'ক তাঁর যশ,
পূর্ণ হোক্ দিক্ দশ,
বঙ্গভূমি হউক উজ্জ্বল,
আমি শুনে, মুছি অশ্রুজল ।

মনোরথ সিদ্ধি করে,
আবার আসুন ঘরে,
যাই আমি আগ বাড়াইতে ;
প্রাণেশ্বরে বরিয়া লইতে ।

আর রাখে কে আমারে !
লোক-লজ্জা পরিহরে,
ছুটে পড়ি তাঁর বক্ষঃস্থলে,
প্রাণ-নাথ এলে কি হে ব'লে ।

কাঁদে বালা এ প্রকারে ;
নিদ্রা এলো নেত্র-দ্বারে ;
সুভাষিণী ওই ঘুমাইল ;
নেত্র জল নেত্রেতে রহিল !

উত্তেজনা

(দ্বৈতবনবাসী যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদী)

থাকিবে কি মহারাজ ! বনেতে বসিয়ে,
যেন তাপস সুজন ?
সাজিয়ে বীরের সাজে, আমি কি সমর মাঝে,
পশিব একাকী গিয়ে, করিবারে রণ ?

তুমি না ক্ষত্রিয় বীর পাণ্ডুর নন্দন ?
মরি খেদে হাসি পায় ।
চারি দিক্‌পাল যার অনুচর, সাধ্য কার
হৃদয় বাঁধিয়া তার সমীপে দাঁড়ায় ।

নিমেষে তোমার যদি পায় অনুমতি,
তবে কারে তারা ডরে ?
শুখায় সিন্ধুর জল, রসা করে রসাতল,
সাগরে লইয়া ফেলে যতেক ভূধরে ।

যাহাদের বীর-নাদে পূরিল গগন,
ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন ।
তারা অপমান স'য়ে, কিরূপে শরীর ল'য়ে,
ফিরিবে হে বনে বনে ব্যাধের মতন ?

এখনো তাদের তনু হয়নি অঙ্গার ;
তবে সহি' অপমান,
থাকিবে বল কি ব লে ? প্রবল সমরানলে
অরিগণে না করিয়ে পূর্ণাহুতিদান ?

জানিলাম মহারাজ ! দ্রুপদ-নন্দিনী
হায় বড় অভাগিনী ।
নতুবা কি কেশে ধ'রে অপরে বিবস্ত্র করে
সভা মাঝে ? হায় আমি রাজার গৃহিণী !

পাঁচ ভাই উপস্থিত না থাকিতে যদি,
তবে সাজি' বীর-সাজে,
ঘোর অসি করে ধরি', কুরু-কুল চূর্ণ করি'
একাকী নাচিত কৃষ্ণা সমর-সমাজে ।

অবিরল ভাসি নাথ ! নয়নের জলে,
মনে হলে সেই দিন ।
যেই মাত্র দুর্যোধন বলিল হে কুবচন,
মুখ-শশী সকলের হইল মলিন ।

কর দেখি মহারাজ ! বারেক স্মরণ
সেই ভীমের বদন ।
কোপভরে ওষ্ঠাধর ঘন কাঁপে থরথর,
ঘূর্ণিত নয়নে যেন জ্বলে হুতাশন ।

গাণ্ডীবী ধরিল নাথ ! সেদিন যে ভাব,
তাহা পড়ে না কি মনে ?
অভিমানে ছল ছল দু নয়নে বহে জল,
অধোমুখে বসি বীর মুদিত-বদনে ।

অথবা অভাগী বৃথা কি বলিবে আর,
ছি ছি দয়ামায়া নাই।
অভাগীর নিবেদনে দয়া নাহি হয় মনে,
বলিতে সকল কথা লাজে মরে যাই।

সবে বলে পুরুষের সাহস বসন,
আর পৌরুষ ভূষণ ;
এই কি হে মহারাজ। তব পুরুষের কাজ ?
লাজে মরি ছি ছি তেজ করি' দরশন।

অথবা আমাকে তুমি দেও শরাসন,
থাক হয়ে বনচর।
কাঁপাইয়ে জলস্থল, ফাটাইয়ে ধরাতল,
দ্রুপদ-নন্দিনী আজ করিবে সমর।

মুনি ঋষি লয়ে তুমি থাক হৃষ্ট-মনে,
তুমি থাক এই বনে।
জ্বালিয়ে সমরানল, বিনাশিয়ে কুরুদল,
বসাবে তোমাকে কৃষ্ণা পুন সিংহাসনে।

দ্রুপদ-নন্দিনী আমি ক্ষত্রিয়-কুমারী
আমি ডরি কি সমরে ?
কিরীটীর রথ লয়ে যাইব সারথি হয়ে,
দেখিব সমীপে আসি' কে বা রণ করে।

অতএব মহারাজ। কর বিবেচনা,
দেখ যাইছে সময়।
অধীনীর মাথা খাও, রণে অনুমতি দাও,
পায়ে ধ'রে বলি নাথ, হও হে সদয়।

সহে না সহে না আর অপমান ভার
নাথ বলহে কেমনে,
এ জীবনে হবে সুখ ? কিরূপে বা কালামুখ
দেখাইব পুন সেই পুরবাসিগণে ?

যে কথা বলিল দাসী গর্বিত বচনে,
নাথ, প্রগল্‌ভার মত,
স্বাধীনতা দেও যেই, এত বলিয়াছি তেঁই,
নতুবা কে কহে এত হয়ে অনুগত ?

গভীর নিশীথে

কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার-সাগরে
মগ্ন ধরা। চারিদিক এমনি সুস্থির,—
প্রহরী কুক্কুর ডাকে, তার সেই রব
সহরের প্রান্ত হ'তে আর প্রান্তে যায়।
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদেরা মিলে
লোফালুফি করে। এ কি ভয়ঙ্কর ভাব!
অগাধ জলধি-তলে শৈবাল-কুহরে
কীটাণু নিবসে যথা, আমি সেইরূপ
আঁধার-সাগর-গর্ভে আপন কুটীরে
ডুবে আছি। পরিজন সকলে নিদ্রিত।
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক্! নিশার আকাশে
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে
ফুকারিছে সাঁ সাঁ ক'রে; বিশ্ব চমকিত!
কে আমি? পড়িয়ে এই জলধির তলে
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, কে আমি, রজনি?
ভূতধাত্রি! গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ,
তরুলতা, জীব জন্তু, কোটি কোটি ল'য়ে
ফিরিতেছ। আগে শুনি, কে তুমি, ধরণি?
এ বিশ্বে ত রেণু তুমি!—তবে আমি কোথা?
কল্পনে, ভারতি, স্মৃতি,—মোর প্রিয় ধন—
তোমরা কি? করি আমি কার অহঙ্কার?
আমি কই? এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে!

বিশ্বদেব! তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত,
কি জানি? কীটাণু হ'য়ে রেণু-কণা মাঝে
পড়ে আছি। আমি, দেব, কি আর বর্ণিব
তব কথা! কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা,
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যাঁর ভয়ে,
সেই তুমি! আমি কীট কি আর বর্ণিব!
বাঁধিয়া বুদ্ধির সেতু ভাবি আগুলিব
অনন্ত স্বরূপ তব! তুমি পদাঘাতে
ভাঙ্গি সেতু, শতধারে যবে এই হৃদে
এসে পড়,—ডুবে যাই! বলি, হে অপার,
অনন্ত কি, কি জান! আমি ক্ষুদ্র কীট,—
আমি ক্ষুদ্র কীট, প্রভু,—কি তার বুঝিব!

তর্ক ছাড়ি মূর্খ হ'য়ে সহজ দৃষ্টিতে
দেখি যবে,—দেখি বিশ্বে, দেব, প্রাণরূপে
বিরাজিত। প্রাণরূপে অন্তরে বাহিরে।
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, দ্যুলোকে, ভূলোকে।
আমি মূঢ ভয়ে স্তব্ধ! আমি নীচ মতি
ভয়ে স্তব্ধ! আমি, দেব, আপনা নেহারি
ভয়ে স্তব্ধ! ক্ষুদ্র নর, অধম, নিকৃষ্ট,
ক্ষুদ্রাশয়, ক্ষুদ্রস্পৃহ,—আমি কি বর্ণিব
প্রাণরূপী ভগবান্, তোমার স্বরূপ?
এই যে আঁধার, ইহা তব স্নেহ-ছায়া।
ঢেকেছে আমারে, যথা মাতা বিহঙ্গিনী
আপন শাবকে ঢাকে। ঢেকেছে আমারে
প্রাণ-বাসে। তবে আমি লুকাই, জননি,
লুকাই তোমার ক্রোড়ে। জগতের ঘৃণা,
লোকের বিদ্বেষ, নিন্দা, আর কি ধরিতে
পারে মোরে? চেয়ে দেখ্ দেখ্ ধরাবাসি!
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লুকাল সন্তান!

উৎসর্গ

অরুণ উদিল, জাগিল অবনী।
জাগিল ভারত, দুখিনী জননী।
"উঠ মা জননি উঠ মা জননি,"
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি।
ঘোর কোলাহলে, ডাকিছে সকলে,—
"উঠ গো উঠ গো প্রিয় জন্মভূমি!
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
কিসের বিষাদ, কি অভাব তার?"
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে
"আর ঘুমায়ো না ভারত জননি!"

তনু পুলকিত; ভূত ভবিষ্যৎ
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ।
দেখে বর্তমান সকলেই ম্লান,
কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ।
বর্তমান পারে দেখি দুই ধারে
অপরূপ দৃশ্য! দেখি শত শত

ভারতের প্রজা, ভারত সন্তান,
ওই উচ্চরবে করিতেছে গান।
বিশ কোটি লোকে হেথা মগ্ন শোকে।—
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত।

ওই যে বাল্মীকি! ওই কালিদাস!
ওই ভবভূতি! ওই বেদব্যাস!
ওই যে শঙ্কর বুদ্ধির সাগর,
তর্কযুদ্ধে বীর, নাস্তিকের ত্রাস!
আরো শত শত নাম করি কত,
ভারত আকাশে সবে সুপ্রকাশ!
নাচরে লেখনি, জাগরে হৃদয়!
আজ শত সূর্য প্রাণেতে উদয়!
উর গো ভারতি, ভাল করে সতি!
ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ!

অন্যদিকে দেখি নবোৎসাহময়
অন্য এক জাতি। দেখে বোধ হয়,
মিলিয়া সকলে কোন শত্রু দলে
আসিছেছে যেন সবে করি জয়।
সবে বলে "জয় ভারতের জয়!
সুখ-সূর্য ওই হইল উদয়।"—
চিনি না সবারে নাহি জানি নাম,
কিন্তু দেখে যেন পূর্ণ মনস্কাম।
দেখিয়া হৃদয় হলো অগ্নিময়।
কে বলে ভারত তোর দুঃসময় ?

ওগো জন্মভূমি! পরপদতলে
অনেক লাঞ্ছনা এ প্রাণে সহিলে।
বহুদিন ধ'রে মরমেতে ম'রে,
দুটি চক্ষু মুদে পড়িয়া রহিলে।
আর কত কাল— আর কত কাল,
রবে বল, মাতা! ভাসি নেত্র-জলে
জিজ্ঞাসি তোমারে।— ওই ভবিষ্যতে
চক্ষু খুলে দেখ, তোমারি জগতে
নব সূর্যোদয়। নব শোভাময়!
তোমারি সন্তান গাইছে সকলে।

উঠ গো দুর্বল শিশুদের মাতা
ভাবনা কি তোর, ত্রিশ-কোটি-সুতা ?
বারেক উঠিয়া, নয়ন মুছিয়া,
ভূত ভবিষ্যতে যে সব জনতা,
নিজ পুত্র ব'লে দেখাও সকলে।
দুটি রত্ন-ল'য়ে কর্ণালিয়া মাতা*
করে অহঙ্কার। তুমি গো, জননি,
রত্নগর্ভা নিজে। এত রত্নমণি
সকলি তোমার। তবে অহঙ্কার
কেন না করিবে হয়ে হর্ষযুতা ?

পারি কি ভুলিতে, ভারত-রুধির
বহি যত কাল রেখেছে শরীর,—
পারি কি ভুলিতে, জীবন থাকিতে,
প্রিয় জন্মভূমি ! তব অশ্রুনীর ?
ধিক্ সে পাষণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড,
তব আর্ত-নাদে যে জন বধির !
আয় মা, দরিদ্র-ভিখারী-জননি,
তোমারে উৎসর্গ করিনু লেখনী।
ভীরু বাঙ্গালীর আছে অশ্রুনীর,
তাহাও উৎসর্গ করিনু এখনি।

চাইনা সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি !
দেও ধর্মধন প্রাণে পূরে রাখি।
হায়, জন্মভূমি, পুণ্য-ভূমি তুমি,
দেও পুণ্য-বারি, দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে খ্যাত এ সংসারে,
আন সে বিশ্বাস, তাই লয়ে থাকি।
"সভ্যতা সভ্যতা" করে লোকে ধায়,
কই তাতে সুখ ? মরীচিকা প্রায়
প্রতি পদে দূরে ওই যায় স'রে।
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি।

---

* পুরাতন রোমনগরে কায়স গ্রাকস্ ও টাইবীরিয়স্ গ্রাকস্ নামে দুইজন ক্ষমতাশালী ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের জননীর নাম কর্ণালিয়া। একদিন কোন প্রতিবেশিনী তাঁহার মণি-মুক্তাদি দেখিতে চাওয়াতে তিনি পুত্র দুটিকে নিকটে ডাকিয়া বলেন, "এই দুইটিই আমার মাণিক।"

দেখে অধীনতা—ঘোর কাল রাত্তি—
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি।
যাহা কিছু ছিল সকলি হরিল,
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি।
সভ্যতার নামে আসি আর্যধামে
নরশত্রু যত, করিছে ডাকাতি।
যাক্ এ সভ্যতা! দাও সে বিশ্বাস,
দাও সে নির্মল হৃদয়-আকাশ,
দাও সে বৈরাগ্য,— ভারত-সৌভাগ্য!
আমি পুনরায় ধর্ম লয়ে মাতি।

ধর্মহীন হলো ভারত-সন্তান।
কারে ডেকে বলি? পশুর সমান
ইন্দ্রিয় সেবায় সবে মগ্নপ্রায়;
তবে তোর মাতা কই পরিত্রাণ?
শুধু চক্ষু জলে কি হবে ভাসিলে,
তাতে কি রজনী হবে অবসান?
সুদৃঢ় সংকল্পে আজ প্রতিজন
করুক উৎসর্গ নিজের জীবন।
দেখি, দেখি, তায় যায় কিনা যায়
এ ঘোর দুর্দশা, রজনী সমান।

যার আছে ভাষা, দিক্ সে রসনা।
কবি যদি থাকে, দিক্ সে কল্পনা।
শিবরাত্রি মত থাক্ অবিরত
জ্বালায়ে সলিতা বসে যত জনা।
হবে না কথাতে, কেবল লেখাতে,
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত-সন্তান তবে বলি তারে।
নতুবা লিখিতে অথবা বলিতে
আমিও তো পারি, তাতে কি বল না?

দেখে হাসি পায়,—"ভারতের জয়"
গাইলেন কবি, নবোৎসাহময়।
না ফুরাতে গান পশুর সমান
আবার নরকে নিলেন আশ্রয়।

ওরে বঙ্গ-বাসি! তোদিগে' জিজ্ঞাসি,
এরূপে কি হবে ভারতের জয়?
ছাড় সে কল্পনা, তাহাতে হবে না।
বৃথা কেন কর সে সুখ বাসনা?
ইন্দ্রিয়ের দাস, যেবা যার দাস,
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।

ওরে! পতিব্রতা বিধবা হইয়ে,
যে রূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য লয়ে,
আর সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচার
মৃত স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে তবে রে উল্লাসে
নাচিব গাইব সকলে মিলিয়ে।
যতদিন নাহি সেই দিন আসে
থাক্ অমানিশি ভারত আকাশে।
আশার সলিতা,— রাবণের চিতা—
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে।

তবে, মা জননি! আমি হীন নর
তব ত্রিশ কোটি সন্তান ভিতর।
কি আছে আমার যার উপহার
করিব চরণে পূরায়ে অন্তর।
পেয়েছি লেখনি লও গো জননি!
পেয়েছি রসনা, ক্ষীণ যার স্বর।
লও তুমি তাহা, সাধের ভারত!
ভাষা, চিন্তা, কাজ, বহুক নিয়ত
তোমার চরণে! পবিত্র জীবনে
করি তব সেবা, দেখুন ঈশ্বর।

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই;
নিজে ত কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি,—এই ভিক্ষা চাই।
সত্য!—ধন মান চাহে না এ প্রাণ।
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই।
বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্বাদ কর হে ঈশ্বর!
খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা,—পূর্ণ কর তাই।

দ্বীপান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত মাতাল

এই ত এলাম দেশে ;—কি করি এখন,
যাই কোথা,—কারে ডেকে করি সম্ভাষণ ?
এই সেই কলিকাতা ;—সুখদে নগরি !
বাল্যের সুহৃদ তুমি নমস্কার করি !
এই সেই রাজপুরী ; সেই ভাগীরথী
সাগর উদ্দেশে চলে মৃদু মন্দ গতি।
কিন্তু এত পরিবর্ত করেছে সময়,
সেই পুরী বটে কি না, জনমে সংশয়।
পর্ণের কুটীর যেথা গিয়াছি দেখিয়া,
আজি সেথা সৌধমালা আছে দাঁড়াইয়া।
উন্নত প্রাসাদ শত দেখেছি যেখানে,
আজি সেথা রাজপথ ; পতিতের স্থানে
আজি দেখি হাসিতেছে কুসুম-কানন ;
যেন সমুদয় পুরী প্রফুল্ল বদন !
কিন্তু আমি যাই কোথা ?—সেই গৃহে আর,
হতভাগ্য সুতদ্বয় আছে কি আমার।
চতুর্দশ বর্ষ পরে, এই পুরী যখন
হেন বিসদৃশ ভাব করেছে ধারণ,
তখন দেখিব কি রে প্রেয়সী আমার
(প্রেয়সী বা বলি কেন ? প্রিয়া নামে তার,
সেদিন দিয়াছি কালী জনম মতন,
যে দিন বারুণী-রসে হয়েছি মগন।)
তখন দেখিব কি রে কামিনী আমার,
পুত্র দুটি ল'য়ে সুখে আছে সে প্রকার ?

ভাবিতে ভাবিতে হেন ক্রমে পায় পায়,
আসিল পূর্বের গৃহে। আসিয়া তথায়
ধীরে ধীরে করাঘাত করে বহির্দ্বারে,
"কে আছ খুলিয়া দ্বার লহ রে আমারে।"
ঘোর রবে খুলে দ্বার, যুবা একজন
জিজ্ঞাসিল, "কে হে তুমি ? হেথা কি কারণ ?"
উত্তরিল হতভাগ্য কাতর হৃদয়ে,—
"অভাগী রমণী কেহ দুটি পুত্র ল'য়ে,
কিছুকাল গত হলো ছিল এই খানে।
কোথায় গিয়াছে তারা ? আছে কোন্ স্থানে ?"
যুবা বলে,—"হাঁ হাঁ, হলো বহুদিন গত,
এ বাটীতে দুটী শিশু খেলিত নিয়ত।

শুনেছি তাদের পিতা ছিল দুরাচার।
মত্ত হয়ে বন্ধু সনে করিয়া প্রহার
কোন এক গণিকারে, করিল সংহার।
ছাড়িয়া কলত্র সুত, ছাড়ি পরিজন,
সিন্ধু-পারে দ্বীপান্তরে গেল সে কারণ।
তাহার ঋণের দায়ে বাড়ী বিকাইল,
অপত্য কলত্র তার পথেতে ভাসিল।
শুনেছি অমুক স্থানে রয়েছে এখন
অন্বেষণ কর, সেথা পাবে দরশন।"

"যে আজ্ঞা", বলিয়া তারে, বিদায় লইয়া,
অভাগা বিষণ্ণ মুখে চলিল ফিরিয়া।
পায় পায় যায়, আর ভাবে মনে মনে,
"ছি ছি! আমি কোন্ মুখে যাব সে ভবনে?
কেন না করিল দণ্ড জনমের তরে?
চিরদিন থাকিতাম জলধি-উপরে,
সেইখানে এই তনু হইত পতন,
হতো না ত এ সংবাদ করিতে শ্রবণ।
কি লজ্জা! ভদ্রের কুলে জনম লইয়া
রেখেছি কলত্র সুতে ভিখারী করিয়া।
কিরূপে দেখাব মুখ তাহাদিগে' আর?
ঘরে ফিরে আসা হলো যাতনা আমার।
ধিক্ রে মদিরে! তোরে ধিক্ শত বার,
যার গুণে এ দুর্দশা আজ অভাগার।"

ভাবিতে ভাবিতে শেষে আসিয়া পৌঁছিল;
ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিল।
দ্বার খুলে জিজ্ঞাসিল বৃদ্ধা এক জন,
"কে গো বাছা! কারে হেথা কর অন্বেষণ?"
তাকে স্ত্রীপুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল।
শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল।
বলিল,—"কে তুমি, বাবা, এত কাল পরে
আসিয়া তাদের কথা জিজ্ঞাস আমারে?
মাতাল স্বামীর হাতে প'ড়ে অভাগিনী
রাজার সংসারে থেকে হলো কাঙ্গালিনী!
স্বামী দ্বীপান্তরে গেলে, ছানা দুটী লয়ে
ছিল বটে হেথা আসি মৃত-প্রায় হয়ে।

"বিধাতা সাধিল বাদ তাহার উপরে,—
অকালে মাণিক দুটী নিল তার হরে।
অমুক খোলার ঘরে রহেছে এখন,
যাও, বাবা, সেই খানে পাবে দরশন।"

কানে যেন বজ্রাঘাত হইল তাহার।
একেবারে দশদিক্ দেখে অন্ধকার।
বৃদ্ধা দ্বার দিল কথা বলিয়া তাহারে।
দাঁড়াতে না পেরে আর, পয়োনালা-ধারে
শোকে অভিভূত হয়ে বসিয়া পড়িল।
অবিরল জলে মুখ ভাসিতে লাগিল।
মনে বলে,—"হে দুরন্ত অনন্ত সাগর।
সুরম্য নগরী কত, কত নারী নর,
বাহু প্রসারিয়া তুমি করেছ সংহার,—
কেন এত দয়া, সিন্ধু, উপরে আমার?
এতকাল ছিনু আমি তোমার উদরে,
অভাগার পাপ অস্থি গর্ভসাৎ করে,
কেন কেন, রত্নাকর দিলে না নিস্তার?
তা হলে ত এ যাতনা থাকিত না আর?
হায় রে, ছিলাম যবে জলধি উদরে
দেখেছি কত যে বজ্র মস্তক উপরে,—
সে অনলে কত তরু গেল দগ্ধ হয়ে।
কেন তার এক খণ্ড এ পাপ হৃদয়ে
না পড়িল? তা হলে যে হইত নিস্তার,
তা হলে যে এ যাতনা থাকিত না আর।
যোগেন, সুরেন, বাপ। গেলি রে কোথায়?
কার কাছে রেখে গেলি অভাগিনী মায়?
বহুকাল পরে পিতা আসিয়াছে ঘরে,
এস এস, দুই দিকে ঝোল গলা ধরে।
সোহাগেতে বাবা বলে আসিতে যখন,
অপমান করে ফেলে দিতাম তখন—
তাই কি মনের দুঃখে গেলে পলাইয়া?
এসে দেখ, সেই পিতা এসেছে ফিরিয়া।
এস, আমি পায়ে ধরে মার্জনা চাহিব,
কাছে এলে অপমান আর না করিব।
আর যে আমার নাই কেহ এ সংসারে;
কোথা ফেলে গেছ, বল, অভাগী মাতারে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে উঠিল আবার,
কাতর চরণে পুন হয় আগুসার।
শূন্য শূন্য নেত্রে হেরে, পাগলের প্রায়;
শ্মশ্রু, কেশ, পরিচ্ছদ ধূসর ধূলায়।
এদিকে দিবস শেষ, ডুবু ডুবু রবি,
আঁখি মৃদু-মৃদু যেন প্রকৃতির ছবি।
অভাগার চক্ষে যেন ঘুরিছে সংসার,
ভোঁ ভোঁ রব কানে যেন শুনে অনিবার।
সারাদিন অনাহারে উঠে না চরণ,
প্রতিপদে ঢলে যেন পড়ে অনুক্ষণ।
অবশেষে সেই গৃহে আসিয়া পৌঁছিল,
ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিল।
"কে আছ? সত্বর এস, কবাট ঘুচাও,
দাঁড়াতে পারি না আর, দ্বার খুলে দাও।
দ্বার খোলো, দ্বার খোলো, কর জল দান,
তৃষ্ণায় হৃদয় ফাটে, বাহিরায় প্রাণ।
ভ্রমিয়া চরণযুগ হয়েছে কাতর,
দুরু দুরু কাঁপে উরু, সর্ব কলেবর;
দয়া ক'রে ত্বরা ক'রে কবাট ঘুচাও,
যায় যায় যায় প্রাণ, জল বিন্দু দাও।"

গৃহ হতে দীন স্বরে "কে তুমি" বলিয়া
একজন বহির্দ্বার খুলিল আসিয়া।
দুঃখিত কবাট যেন কাঁদি উদ্ঘাটিল,
বিবর্ণা বিশীর্ণা এক নারী দেখা দিল।
যেমন মেঘের পাশে ডোবে শশধর,
সেরূপ লাবণ্য তার সহজ সুন্দর
মলিনতা মেঘে যেন আছে আচ্ছাদিয়া।
গলিত মলিন বাস। আহা, সম্বরিয়া
কেমনে বা রাখে লজ্জা বিধুরা কামিনী!
কাতর নয়নযুগ দিবস যামিনী
বরষিয়ে অশ্রুধারা; পাগলিনী প্রায়,
চারি ধারে রুক্ষ কেশ উড়িয়া বেড়ায়।
অভাগা দেখিল যবে সেই অভাগিনী,—
সেই অভাগিনী তার সরলা কামিনী,—
আর তারে নিবারিয়ে রাখে কোন্ জন?
আর তার শোক-সিন্ধু কে রোধে তখন?

দুকরে আচ্ছাদি মুখ হাহাকার করে,
উঠিল কাঁদিয়া। বলে,—"এত সহ্য করে,
আছ কি রে এত কাল পামরের তরে ?
পাপীর দুঃখের ভাগী করিতে তোমায়,
রেখেছ শমন কি রে আজিও ধরায় ?"
বলিতে বলিতে রুদ্ধ হইল বচন,
করিতে লাগিল শুধু ফুলিয়া রোদন।

এ ভাব দেখিয়া তার, জড়ভাব ধ'রে,
রহিল অবলা মূক ক্ষণকাল তরে।
অবশেষে অনুমানে বুঝিল প্রকার।
শোকে অভিভূতা হয়ে পারিল না আর
ভাঙ্গিতে মনের কথা। ঘোর ভাব ধরি,
অন্তরে বহিল তার শোকের লহরী।
তখনি মূর্ছিতা হয়ে পড়ে ধরাতলে।
না পড়িতে অর্ধ-পথে, ধরে বাহুবলে,
অভাগা তুলিল তারে আপন হৃদয়ে;
বসনে ব্যজন করে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে।
আলু থালু কেশ-পাশ পড়িল ঝুলিয়া।
নয়নের জল তার ক্রমে গণ্ড দিয়া
ধীরে ধীরে অভাগার হৃদয়ে বহিল;
বসন অঞ্চল মরি খসিয়া পড়িল।
ডাকিয়া অভাগা তবে বলে কতক্ষণে,—
"উঠ উঠ, শশিমুখি! ও চারু নয়নে
পামরের দিকে, প্রিয়ে, চাও একবার!
হয়েছে দুরন্ত কাল সকলি আমার;
অসময়ে অভাগারে করিতে সান্ত্বন
একা তুমি মাত্র আছ হৃদয়ের ধন!
বহুদিন পরে, প্রিয়ে, আসিয়াছি ঘরে।
উঠ উঠ; চারু-হাসি মাখি বিম্বাধরে
জিজ্ঞাস,—কোথায় ছিনু, ছিনু বা কেমন;
পুন ইন্দীবর আঁখি কর উন্মীলন।
স্বামী হয়ে যে যাতনা দিয়াছি তোমায়
ভোলো তাহা; আজ ক্ষমা কর লো আমায়!
কাঁদিবার তরে ফিরে এসেছি আবার,
উঠ উঠ, উভে মিলি কাঁদি একবার।"
ডাকের উপর ডাক অভাগা ডাকিল,
তথাপি রমণী তার নীরবে রহিল।

উঠিল না।—উঠিবে কি?   এতদিন পরে
মৃত্যু তারে দুঃখী বলে নিজ-কোলে করে।
হরিষে বিষাদ আজ দেখা স্বামী সনে;
না ফুটিতে ভাষা তার মিলাল বদনে;
জীবন প্রদীপ, মরি, সহসা নিবিল;—
এ সংসার অন্ধকারে অভাগা রহিল।

পাখী

(নির্জন উদ্যানে লিখিত)

১

কত ডাক ডাকিবি রে পাখি!
সুখের ভাণ্ডার তোর   অক্ষয় কি? প্রাণে মোর
স্বর-সুধা কত দিবি মাখি?
ডেকে ডেকে হ'লে সারা,   তবু বর্ষ স্বর-ধারা,—
কি আনন্দ! ফুরাল না ডাকি।
তরুকুঞ্জে ব'সে   মনের হরষে
করিতেছ গান,   জুড়াইল প্রাণ!
ইচ্ছা, রে বিহঙ্গ, তোর সনে থাকি;
সংসার যাতনা   আর ত সহে না,—
উড়িয়া পলাই ধন জন রাখি!

২

যাই উড়ে, পাখি, তোর দেশে।
আনন্দে মিলিয়া সবে   গান করি কলরবে,
দেখে আসি স্বদেশে বিদেশে।
তোর সনে, প্রিয় পাখি,   ভূধর সাগর দেখি,
বনে বনে গাই রে উল্লাসে।
দুঃখে শোকে ভরা   এই পাপধরা,
ইহাতে চরণ   দিব না কখন,
উড়িয়া বেড়াই আকাশে আকাশে;
যতেক বিহঙ্গে   মিলে এক সঙ্গে
সুখের তরঙ্গে যাই শুধু ভেসে।

৩

তব কণ্ঠ সুধার ভাণ্ডার।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে, পাখি, তোর কি আশ্চর্য, এত জোর।
বন পূর্ণ সুস্বরে তোমার।
রে বিহঙ্গ, আমি নর, বুদ্ধি বলে শ্রেষ্ঠতর,
এত শক্তি নাই রে আমার।
তোমার উৎসাহ আনন্দ প্রবাহ,
দেখে ভাবি মনে,— ধিক্ এ জীবনে,
নর জন্মে ধিক্, ধিক্ রে সংসার।
পাখী ক্ষুদ্র প্রাণী, তোরে শ্রেষ্ঠ মানি,
স্বদেশে বিদেশে সদানন্দ যার।

৪

বল, শুনি, কি কারণে ডাক'?
কাহার সন্তোষ তরে এমন মোহন স্বরে
বন-কুঞ্জ আনন্দেতে মাখ'?
প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কি রে প্রেম-পাত্রী বিহগীরে
স্বর-সুধা দানে তুষ্ট রাখ'?
বল', কার তরে এ হেন সুস্বরে
গাও প্রতিদিন, কভু নও ক্ষীণ,
এসে দেখা দাও যেখানেই থাক'?
তবে কি আমার হৃদয়ের ভার
ঘুচাবার তরে এই ব্রত রাখ'?

৫

নর ভাগ্য তুমি ত বুঝ না।
কি দুঃখেতে তার প্রাণ দিবানিশি থাকে ম্লান,
ক্ষুদ্র পাখি, তুমি ত জান না।
তুমি যদি হতে নর, থাকিত না এ সুস্বর,
বুঝিতে রে গভীর বেদনা।
কারে বলে পাপ, কি যে অনুতাপ
কভু কি স্বপনে দেখেছ জীবনে?
তবে, রে বিহঙ্গ, নরের যাতনা,
নরের ভাবনা নরের লাঞ্ছনা,
কিরূপেতে তুমি বুঝিবে, বল না?

৬

ওরে পাখি। ডাক্ ডাক্ ডাক্।
কোথা তোর সহচরী, ডেকে আন্ ত্বরা করি,
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক্।
শুনিয়া শু'নয়া যাই রে ডুবিয়া,
পাসরি যাতনা; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণকাল তরে দূরে প'ড়ে থাক্।
ওই মধু-ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্।

৭

সত্য। পাখি, বড় হিংসা হয়।
বড় ইচ্ছা মনে মনে,— এ ভব গহন বনে
থাকি সদা প্রফুল্লতাময়।
কেবল প্রেমের কথা প্রচারি রে যথা তথা,
বিভু-প্রেমে জুড়ায়ে হৃদয়।
লোকের বিদ্বেষ দারিদ্র্যের ক্লেশ,
যাই সব ভুলে। পাখা দুটী তুলে,
গাইয়া বেড়াই বিশ্বরাজ্য-ময়।
সুস্বর তোমার হোক্ রে আমার,
তোর সম, পাখি, হোক্ রে হৃদয়।

৮

পাখি, তোর দু'দিনের প্রাণ।
দু'চারি বৎসর তরে থা'কিবি রে এ সংসারে,
তরু-কুঞ্জে করিবি রে গান।
একদিন হলে ভোর, মধুর সুস্বর তোর
আর, পাখি, শু'নিবে না কান।
কিন্তু, রে বিহঙ্গ। জীবন-তরঙ্গ
বহুদিন আর রহিবে আমার,—
তবে রে সংগ্রাম হবে অবসান।
আঁধার জগতে আর ভবিষ্যতে
হ'তে অগ্রসর চাহে না যে প্রাণ।

৯

পাখি, তোর নাহি কোন আশ।
কোন সাধ নাহি মনে, তাই ত রে বনে বনে
করিতেছ আনন্দ প্রকাশ।

নিরাশা যাতনা ঘোর এ ক্ষুদ্র জনমে তোর
হ'লো না ত,—তাই রে উল্লাস।
প্রিয় আশা যত ক্রমে ক্রমে হত
এক দুই ক'রে সব গেল স'রে;
তাই, রে বিহঙ্গ! বাড়িয়াছে ত্রাস।
আরো কিবা হয় আরো কিবা হয়,
এই ভেবে, পাখি, বাড়িছে হুতাশ।

১০

শিশুকালে ছিনু তোর মত।
হেথা যাব, সেথা যাব, এমন তেমন হব
ব'লে আশা করিতাম কত।
কিন্তু কি দুর্বল প্রাণ, পাই নাই সে সন্ধান,
প্রতি পদে তাই আশা হত।
বাল্যের স্বপন গিয়াছে এখন;
আর অহঙ্কার নাই রে আমার;
বুঝিয়াছি বেশ মোর মূল্য কত।
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব,
এই আশা এবে প্রাণেতে উদিত।

১১

ওরে পাখি! ডাক্ ডাক্ ডাক্!
কোথা তোর সহচরী, ডেকে আন্ ত্বরা করি,
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক্!
শুনিয়া শুনিয়া যাই রে ডুবিয়া
পাসরি যাতনা; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণকাল তরে দূরে প'ড়ে থা'ক্!
ওই মধু-ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্।

১২

তোর ডাকে জাগে বনবাসী!
সাধ্য যদি থাকে তোর, কণ্ঠে যদি থাকে জোর,
ডাক্ তবে সুস্বর প্রকাশি,—
উৎসাহে সবল হ'য়ে ডাক্ গিয়ে লোকালয়ে,
"উঠ জাগ, হে ভারতবাসি!"

নির্জন কাননে আপনার মনে
কি হবে ডাকিলে ? কি হবে শুনিলে
একা এই স্বর ? ইচ্ছা, দেশবাসী
শুনুক্ সকলে। ইচ্ছা, দলে বলে
উঠুক্ সকলে নয়ন বিকাশি।

১৩

আরো বলি, শোন, রে বিহঙ্গ !
শুনি কেহ পুরাকালে আপন সঙ্গীত বলে
পেয়েছিল মৃত প্রিয়াসঙ্গ।*
তোমার মধুর গানে মৃতের অসাড় প্রাণে
বহে কি রে জীবন-তরঙ্গ ?
তাহা যদি হয়, ছাড় লোকালয়।
অতীত আঁধারে গিয়া, স্বর-ধারে
পূর্ব পিতৃদের কর নিদ্রা ভঙ্গ !
আন জাগাইয়া ; পূজি রে দেখিয়া,
হই রে উন্নত, পেয়ে সাধু সঙ্গ।

১৪

ওরে পাখি ! ডাক্ ডাক্ ডাক্ !
কোথা তোর সহচরী, ডেকে আন্ ত্বরা করি,
দুই কণ্ঠে স্রোত ব'হে যাক্ !
শুনিয়া শুনিয়া যাই রে ডুবিয়া,
পাসরি যাতনা ; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণকাল তরে দূরে প'ড়ে থাক্ !
ওই মধু ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্।

---

* এরূপ কথিত আছে যে, অর্ফিয়স্ নামক একজন গ্রীক সঙ্গীত-বেত্তা সঙ্গীতের গুণে যমালয় হইতে মৃত পত্নীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

প্রকৃত সাহস

১

দীপ কি উজ্জ্বল রূপ-শোভা ধরে,
গভীর রজনী না ঘেরিলে তারে ?
নব জলধরে বিজলি বিচরে ;
শারদ আকাশে কে না প্রকাশে ?
সুনীল নিকষ বিনা স্বর্ণ মরে ।
সেইরূপ কি রে মানব-জীবন
কভু শোভা পায়,— যদি নাহি তায়,
ঘোর অমানিশি একেবারে গ্রাসি
গভীর আঁধারে করে বিসর্জন ?
তবে ত পৌরুষ জাগে রে অন্তরে ।

২

সুখের শয্যাতে মোহ-নিদ্রাগত,
কে চায়, কে চায় থাকিতে নিয়ত ?
নারীর রুধিরে জন্ম ব'লে কি রে
নারীর সমান হব ক্ষীণ-প্রাণ ?
সংসার তর্জনে, হব অভিভূত ?
ধিক্ সে জড়তা, ধিক্ সে বাসনা ।
বীর দর্পে ভরা ওই দেখ ধরা ।
কি সে দুঃখ, যার হেন গুরু ভার,
ঈশ্বরের নামে যাহা সহিব না ?
যার ভারে শক্তি একেবারে হত ?

৩

যত বার পড়ে, উঠে তত বার,
বীরমন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার ।
নরের নরত্ব পশুত্ব দেবত্ব,—
এ সংগ্রাম বিনা নর দেব কি না,—
কে আর প্রকাশে ? রক্ত-স্রোতে যার
বক্ষঃস্থল ভাসে, কিন্তু তবু প্রাণ
কভু ম্লান নয়, শুভ ইচ্ছাময়,—
যার খরতর শরে জর জর,
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান,—
নরত্ব দেব এক স্থানে তার ।

৪

আয় তবে আয়, ঘোর দরিদ্রতা,
রুধির-শোষিণী পৈতৃক দেবতা!
আয় বজ্রধ্বনি, আয় কালফণি!
নর-শত্রু যারা আয় সবে তোরা
ঘের চারিদিকে করিয়ে জনতা!
জীবন-আকাশ বিপদ-দুর্দিনে
ঘেরিয়া আমার হোক অন্ধকার!
সব কষ্ট স'য়ে রব স্থির হ'য়ে।
কে পায় পৌরষ দুঃখ কষ্ট বিনে?
ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা?

৫

তবে মুছি অশ্রু উঠিয়া দাঁড়াই!
যা হবার হ'ল, এ জনম গেল
বিষম সংগ্রামে, তাতে দুঃখ নাই।
রক্ত-বিন্দু হ'তে শুনি এ জগতে
শত রক্ত-বীজ জন্মে যে প্রকার,—
জীবন-সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্ত বিন্দু পড়িল এবার,
শত পুত্র হবে বীর অবতার!
ভারত আঁধার ভারতের ভার
ঘুচাইবে তারা।- ভেবে ম'রে যাই।

চৈতন্যের সন্ন্যাস

[চৈতন্যের জীবনচরিতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বরূপ, কনিষ্ঠ চৈতন্য। বিশ্বরূপ পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তদবধি পাছে চৈতন্যও তাঁহার জ্যেষ্ঠের পদবীর অনুসরণ করেন, এই বলি পুত্র-বৎসলা শচী সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে একজন সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। চৈতন্য গোপনে তাঁহার নিকটে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নবদ্বীপ পরিত্যাগপূর্বক হরিনাম প্রচারার্থে দেশভ্রমণে নির্গত হন। শচী আদর করিয়া চৈতন্যকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন।]

১

আজ শচী মাতা কেন চমকিলে?
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে "নিমু নিমু" ব'লে
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে?

২

"বউ মা। বউ মা। ঘুমায়োনা আর।
উঠ অভাগিনি। দেখ একবার।
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘ'র নাই।
বুঝি বা পলাল করি অন্ধকার।"

৩

তাই বটে হায়! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিত,— সরলা কামিনী।
শূন্য পড়ি ঘর। কোথা প্রাণেশ্বর?
"গেছে গেছে" ক'রে উঠে বিনোদিনী।

৪

"সে কি বল, বউ? ওমা সে কি কথা?
হা মোর নিমাই পলাইল কোথা?"
পাগলিনী প্রায়, দ্বারে গিয়া, হায়,
নাম ধ'রে কত ডাকিলেন মাতা।

৫

ডাকেন জননী "নিমাই। নিমাই।"
প্রতিধ্বনি বলে "নাই, নাই, নাই।"
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে; কোথা রে নিমাই।

৬

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি "যাই যাই" করে।
ভাবেন জননী, আসে গুণমণি;
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে—

৭

"নিমাই। নিমাই।" হা মাতা সরলে,
পাগলিনী হ'লে সকলেই ছলে।
কাঁদ, মা জননি। তব গুণমণি
আঁধারে লুকায়ে ওই গেল চ'লে।

৮

ওই গেল চ'লে   পাগলের প্রায়।
জান না ত, মাতঃ,   কে তারে লওয়ায়।
উন্মত্ত আকাশে   খধূপ* প্রকাশে,—
আপনার বেগে   সে কি সেথা যায় ?

৯

প্রবল আগুন   জ্বলেছে ভিতরে,
আর তারে হেথা   কেবা রাখে ধ'রে ?
তাই মহা বেগে   যায় অনুরাগে,
পাপী জগতের   পরিত্রাণ তরে।

১০

ধ'রেছে জঠরে   তাই ব'লে তারে
পার কি রাখিতে   আপন আগারে ?
যে কাজ সাধিতে   আসা অবনীতে
নিলেন ঈশ্বর   সে কাজে তাহারে!

১১

নদীয়া'তে ছিল   তোমার নিমাই,
আজি সে হইল   পাপীদের ভাই।
জগতের তরে   সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না, মাতঃ,   কাঁদিতেছে তাই।

১২

শচী মাতা কাঁদে,   ঘর ফেটে যায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে   পুত্তলীর প্রায়,
দাঁড়ায়ে ললনা,   বিষণ্ণ-বদনা ;
বিন্দু বিন্দু অশ্রু   পড়িতেছে পায়।

১৩

কেঁদনা, লেখনি!   কর রে বর্ণনা,
স্নেহময়ী মার   সে ঘোর যাতনা।
শোকে অভিভূত   ধড় ফড় কত
করিছেন মাতা   হারায়ে চেতনা।

---

*খধূপ—হাওয়াই।

১৪

বধূ নিজ মুখ মুছিছে অঞ্চলে,
আর হস্তে ঠেলে "মাগো, মাগো" বলে
শোকের সাগরে দুটি নারী মরে ;
উঠ, প্রতিবাসি ! উঠগো সকলে।

১৫

কেঁদনা, লেখনি ! পেও না রে ভয়।
লোকে ত বলিবে, নিমাই নির্দয় !
তুমি কি জানিবে, তুমি কি বুঝিবে ?
আমি ত জানি না কিসে কি যে হয় !

১৬

রজনী পোহাল, দিক্ প্রকাশিল,
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল।
উঠি প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
"কি হইল" বলি দ্বারেতে ডাকিল।

১৭

ঘরে আসি দেখে সে ঘর আঁধার !
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর !
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে ;
"হায় কি হইল।" মুখেতে সবার।

১৮

এ দিকেতে গোরা নিজ বেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায়।
হরি-গুণ গান করি পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

১৯

নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা।
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ,
আর বার ভাবে জননীর কথা।

২০

বলেন সঘনে, "কোথা দয়াময় !
রহিলা জননী ক'রো যাহা হয় !
আমি দ্বারে দ্বারে ঘুষিব তোমারে,
এ দেহ জীবন যত কা'ল রয়।

২১

নির্মল প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী ;
তারে দয়া করি তবে দেখো, হরি !
ক'রো ক'রো নাথ, তাহার সদ্গতি !

২২

প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি, দেও অনুমতি ।
হরি-সংকীর্তনে তোমা দুইজনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি ।

২৩

প্রিয় হরিনাম ঘুষিব বিদেশে,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে ;
নিজ পায়ে ধরি ভজাইব হরি,
হরিনামে পাপী ঘুচাইবে ক্লেশে !"

২৪

এত বলি গোরা ন'দে ছাড়ি যায়,
ন'দে পুরী শোকে করে হায় হায় !—
কারে কি যে কর, জান হে ঈশ্বর !
দেখে শুনে কবি হত বুদ্ধি প্রায় ।

মাতৃ-দর্শন

[এইরূপ কথিত আছে যে, যখন চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন নিত্যানন্দ কৌশলক্রমে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের ভবনে লইয়া যান। সেখানে পুত্রশোকাকুলা শচীদেবী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত।]

১

"ওগো শোন, শচি, শোন গো শ্রবণে,
তোর গোরা নাকি ফিরে আসে ঘরে !"
শুনে চমকিত, প্রাণ প্রফুল্লিত,
আপাদ মস্তক সহসা কম্পিত ।
ভূমিকম্প যেন সহসা অন্তরে !
রহিল সংসার, সংসারের কাজ !—
"প্রিয় প্রতিবাসি, কি শুনালি আজ !
শুষ্ক মরুভূমে আজ দয়া ক'রে,
নিদাঘের ধারা আনিলি কেমনে !"

২

বড় সাধ মনে সে ভাব বর্ণিব।
আয় আয় তবে সাধের কল্পনা
আয় গো ভারতি! আজ মোর প্রতি
বিশেষ করুণা কর, কর সতি
ক্ষুদ্র কি মহৎ কবি যত জনা
স্বদেশে বিদেশে যুগ যুগান্তরে
জন্মেছে, সকলে আজ দয়া ক'রে
দেহ পদছায়া পূরায়ে বাসনা
শচী মার সেই বেদনা চিত্রিব।

৩

অন্যে ডাকি কেন? কোথা গো জননি
এস মা আমার, জনম-দুখিনি!
মায়ের বেদনা অন্যে তো জানে না,
সন্তানের মায়া অন্যে তো বোঝে না!
তুমি, মা আমার স্নেহ-কল্লোলিনি,
সন্তানের প্রাণে এস একবার।
এ হস্তের সৃষ্টি শোণিতে তোমার;
তব পদার্পণে, পুত্র-পাগলিনি,
জাগিবে হৃদয়, নাচিবে লেখনী।

যে হস্তের সৃষ্টি শোণিতে তোমার,
আজ সে চিন্তিত বড় গুরু-ভারে।
চাই না ভারতী, কবির শকতি,
চাই না কল্পনা! সন্তানের প্রতি
দেহ পদ ছায়া; দেখাই সবারে,
পুত্রহারা শচী বিষাদে মরিয়ে
ন'দে পুরী মাঝে কিরূপে পড়িয়ে।
আজ সেই চিত্র দেখাই সবারে,
দেখাই, জননি, প্রসাদে তোমার!

৫

সম্মার্জনী হাতে গৃহকাজে রত,
রয়েছেন শচী আপনার মনে।
দীন হীন বেশ, রুক্ষ রুক্ষ কেশ,
বিষণ্ণ বদনে নাহি সুখ-লেশ;
জাগিয়া, কাঁদিয়া, কালি দুনয়নে।

তিল তিল ক'রে যেন দিন দিন
মরিছেন মাতা ; গণিছেন দিন,
কবে মৃত্যু আসি এ কারা-ভবনে
ঘুচাইবে তাঁর শোক দুঃখ যত।

৬

সম্মার্জনী হাতে গৃহকাজে রত,—
হেন কালে কথা প্রবেশিল কানে।
পড়িল মার্জনী, দাঁড়াল জননী।
ইচ্ছা, শত কর্ণ পেলে পুন শুনি।
"কি শুনালি কথা আজ মোর প্রাণে।
এ অমৃত ছড়া কে আনিয়া দিল ?
শচী দুঃখী ব'লে আজ কে চাহিল ?
প্রিয় প্রতিবাসী, বল্, কোন্ স্থানে
শুনে এলি কথা স্বপনের মত ?"

৭

ওই বিষ্ণুপ্রিয়া রন্ধন-আগারে
নিজ কাজে রত বিরস হৃদয়ে।
প্রফুল্ল নলিনী সমান ললনা,
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিতে পেল না।
দলে দলে যেন যায় ম্লান হ'য়ে।
হৃদয়-শ্মশানে চিন্তাগ্নির মত
একমাত্র শিখা জ্বলিছে নিয়ত।
আহা সেও যেন আছে পথ চেয়ে
কবে কাল আসি নিভাবে তাহারে।

৮

এই কথা যেই প্রবেশিল কানে,
সমগ্র হৃদয় চমকি উঠিল।
শুনিতে শুনিতে যেন পৃথিবীতে
আর নাই সতী। আবার শুনিতে
ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রবণ পাতিল।
বল্ প্রতিবাসি, আর বার বল্ ;
শুকায়েছে প্রাণ, পেয়ে শান্তি জল
বাঁচুক্ আবার। কে আজ রোপিল
মৃত আশা-লতা পুন তার প্রাণে ?

৯

"আসিলাম শুনি আজ গঙ্গাতীরে,
শান্তিপুরে নাকি তোদের নিমাই
আচার্যের ঘরে এসে বাস করে।
তোদের দুর্দশা দেখে ম'রে যাই
তাই বলি, শচি, বউমাকে ল'য়ে
আয় সবে যাই, আসিগে দেখিয়ে।
দেখে চাঁদ মুখ নয়ন জুড়াই!
আহা, পাবি প্রাণ এ মৃত শরীরে।"

১০

"ওগো প্রতিবাসি, তোর ওই মুখে
হোক্ পুষ্পবৃষ্টি! তাও নাকি হয়?
নিমাই আমার আসিছে আবার?
বল্, প্রতিবাসি, বল্ শতবার!
বউমা, বউমা! আয় মা! হৃদয়
ভ'রে দেখি আজ ও চাঁদ বদন!
মরমে মরিয়ে আছ বাছা ধন,
মা তোর সৌভাগ্য আবার উদয়!
এস, শুনে যাও, শুনে ভাস সুখে!"

১১

করিলেন শচী যাবার মন্ত্রণা।
বাল বৃদ্ধ নারী, পাড়ার সকলে,
সে বার্তা শ্রবণে আনন্দিত মনে
চলিল সবাই গৌর দরশনে।
আহা! পথে তারা কত কথা বলে।
নদীয়াতে ছিল যত শিষ্যগণ
সকলে সংবাদে আনন্দিত মন।
যায় ন'দেবাসী ওই দলে দলে;
প্রবল সংঘট্টে ধায় শত জনা।

১২

হেথা শান্তিপুর করে টলমল!
কে এসেছে ব'লে ঘোর গণ্ডগোল।
বাজারে বাজারে কথা পরস্পরে,—
কে নাকি এসেছে আচার্যের ঘরে,

হরিনাম শুনি সে হয় পাগল।
পাপী তাপী সাধু যারে কাছে পায়,
"ধর হরি-প্রেম" ব'লে যাচে তায়।
বিপুল জনতা, ঘোরতর রোল।
চল্ দেখে আসি, চল্ সবে চল্।

১৩

যে দেখিতে আসে সেই ভুলে যায়।
যেন হরিনাম কভু শুনি নাই।
বলে নারীগণে, "হায় রে কেমনে
এ নব বয়সে কৌপীন বসনে
ঢেকেছে শরীর। এই কি নিমাই।
মরি মরি, শচি, তোর দুঃখে মরি।
এ নিধি হারায়ে কিসে প্রাণ ধরি
আছিস্ জগতে। চল গো শুধাই,
দুখিনী মাতারে কেন সে ভাসায়।"

১৪

নিত্য নবোৎসব, টলে শান্তিপুর,
টল টল বঙ্গ প্রেমের হিল্লোলে।
যে যেখানে ছিল সকলে আসিল;
মনোহর কান্তি নেহারি ভুলিল।
শুধু কান্তি নয়, সে মুখের বোলে
যুড়ায় শরীর, যুড়ায় হৃদয়।
শান্তিপুর যেন প্রফুল্লতাময়।
আনন্দ তরঙ্গে যেন পুরী দোলে;
হরি-প্রেমে দেশ হ'লো ভরপুর।

১৫

হেনকালে শচী দরশন দিলা।
শ্রীচৈতন্য শুনি, মাতার চরণে
লুটায়ে শরীর, নয়নের নীর
ফেলেন শ্রীপদে।— তুমি না সুধীর।
কে আছে সুধীর এ তিন ভুবনে,
দীন হীন বেশে আসিলে জননী,
দুই চক্ষে ধারা বহে না অমনি?
তাই আজ গোরা ধরিয়া চরণে
স্নেহময়ি। ব'লে কতই কাঁদিলা।

১৬

কেঁদ না লেখনি! বল রে সবারে
শচী মাতা তাঁরে কি কথা বলিল।
বুঝি কটু কথা বলিলেন মাতা?
না, না! সেই মুখ রুক্ষ রুক্ষ কথা
কখনো জানে না; কেবল কাঁদিল।
পুত্র-মুখ খানি হৃদয়েতে ধ'রে,
কাঁদিলেন মাতা শুধু আর্তস্বরে!
শান্তিপুর যেন কাঁদিয়া উঠিল।
আহা, যার মুখ ভাসে অশ্রুধারে!

১৭

"বাবা রে আমার, প্রাণের নিমাই!
অভাগী শচীর প্রাণের রতন!
সোনার শরীরে কেন এ প্রকারে
মাখায়েছ ছাই? বল আমি কি রে
কোন অপরাধ করেছি কখন?
যদি ক'রে থাকি পাগলিনী ব'লে,
প্রাণের নিমাই, সব যাও ভূলে!
দয়ার ঠাকুর বলে সর্ব জন —
মার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই?

১৮

সে সুন্দর কেশ কেটে কোন্ প্রাণে
মুড়ায়েছ মাথা ভিখারীর মত'?
তোর কি জননী মরেছে এখনি?
তাই এই দশা করেছ, বাছনি?
আজো মরি নাই। আরো কষ্ট কত
না জানি যে আছে এ পোড়া কপালে!
একমাত্র ধন, তাও গেল ফেলে!
বল্ রে নিমাই, তোর মার মত'
জনম দুখিনী আছে কোন্ স্থানে?"

১৯

পাগলিনী হ'য়ে কভু বা জননী
চাঁদমুখ তুলে দেখেন কাঁদিয়ে।
ভাসি অশ্রুনীরে কভু ধীরে ধীরে
আশীর্বাদ হস্ত বুলান শরীরে;

কি করেন তারে, পান না ভাবিয়ে!
এ দৃশ্যের মত' কি সুন্দর আছে?
কোন্ ছবি লাগে এ ছবির কাছে?
বর্ণিব কি? চক্ষু গেল যে ভাসিয়ে।
শোকে অভিভূত চলে না লেখনী।

২০

বলেন চৈতন্য, "ও মা উন্মাদিনি!
আর কেন মায়া আমার উপরে?
তব অপরাধে মনের বিষাদে
লইনি সন্ন্যাস। সদা প্রাণ কাঁদে
জগতের দীন দুঃখীদের তরে;
তাই মা ছেড়েছি সাধের সংসার,
তাই মা নিমাই সন্ন্যাসী তোমার।
প্রাণ যদি যায় পাপীদের তরে;
যাক্।—আশীর্বাদ কর মা জননি।"

২১

"পাপীদের তরে কাঁদিয়াছে প্রাণ?
পাপীয়সী মা'র কি হবে উপায়?
কি পেয়েছ হরি? ভিখারিণী করি
ফেলে গেলি একা! কিসে প্রাণ ধরি?
এ মন্ত্র সাধনা কে দিল তোমায়?
ধনে পুত্রে পূর্ণ যাহাদের ঘর,
তাহারা যে পারে ধরিতে অন্তর।
সবে ধন তুই শচীর ধরায়,
তোরে জগতেরে কিসে করি দান?"

২২

"স্নেহময়ি! নয় সন্ন্যাসীর কাজ,
থাকে জন্মভূমে। আপনার ঘরে
পারি না যাইতে আর কোন মতে।
ক্ষম অপরাধ এই পৃথিবীতে
দেখিবেন হরি সতত তোমারে।
ধন্য গর্ভ তব, যদি হরি পাই!
সে আশে সন্ন্যাসী তোমার নিমাই।
ফিরে যাও, মাতা, প্রসন্ন অন্তরে,
ফিরে যাও পুন কুটুম্ব-সমাজ।"

২৩

শুনি তবে শচী পুত্র ধনে ল'য়ে,
অন্তঃপুরে গেলা, যেথা বিষ্ণুপ্রিয়া
লজ্জাবগুণ্ঠনে বিনত বদনে
দাঁড়ায়ে কাঁদিছে, ধারা দুনয়নে।
উত্তরিলা গোরা ; গলে বস্ত্র দিয়া,
পতিব্রতা সতী প্রণমে চরণে।
বলেন চৈতন্য. "তোমার কারণে
প্রিয় বিষ্ণুপ্রিয়া ! সদা কাঁদে হিয়া।
তোমার জীবন গেল বৃথা হয়ে !

২৪

কি করিবে, বল. চিরব্রত ধ'রে
থাক লো সুন্দরি ! যখনি হৃদয়ে
বিষাদের ভার উঠিবে তোমার,
মোর এই ব্রত ভেবো একবার।
স্বামী যার থাকে হরিনাম ল'য়ে,
তার ভাগ্য হেন কার ভাগ্য আছে ?
তাই লো বিদায় মাগি তব কাছে।
কৃতার্থ হয়েছি তোমার প্রণয়ে,
রহিলাম ঋণী সে ধনের তরে।"

২৫

শুনিতে শুনিতে ফুলিতে লাগিল !
বিষ্ণুপ্রিয়া আজ হ'লো পাগলিনী !
"কেঁদনা, কেঁদনা. আর কাঁদায়ো না,
ধর ধৈর্য ধর. প্রাণের ললনা !
যে সকল আশা ছিল, প্রণয়িনি,
বিস্মৃতি সাগরে বিসর্জন ক'রে,
জননীর সেবা কর গিয়ে ঘরে।
পতিব্রতা সতী তুমি লো কামিনি !
চৈতন্যের নাম তোমাতে রহিল।"

২৫

পাইয়া বিদায় পুন গোরা যায়,
টল্ মল বঙ্গ প্রেমেতে ভাসায় !
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্র-বধূ সাথে
পুন শচী মাতা গেলা নদীয়ায়।

ফুল

(নির্জ্জন উদ্যানে লিখিত)

১

সুন্দর কুসুম ! এ ঘোর নির্জ্জনে,
ঘন-পত্রাবৃত নিজ সিংহাসনে,
নিজ মনে হাস, আনন্দেতে ভাস ।
তোমার তুলনা করি কার সনে ?
এমন সুচারু এমন কোমল,
এমন পবিত্র এমন উজ্জ্বল,
লাবণ্যে গঠিত, নির্জ্জনে চিত্রিত,
কি পদার্থ আছে এ পাপ ভুবনে ?

২

কোমল প্রফুল্ল বদনে তোমার,
কি সুন্দর মাখা নিশার নীহার ।
একে ত কোমল, তাতে হিমজল ;
যেন ঢল ঢল লাবণ্যের ভার ।
নিরখি নিরখি যেন ডুবে যাই
ওরে প্রিয় ফুল ! তুলনা ত নাই ;
কি তুলনা দিব, মিছা কি বর্ণিব ?
অতুলন তুমি বলেছে সংসার ।

৩

নবীন যৌবনে নব প্রস্ফুটিত,
সারল্য বিনয় আনন্দে জড়িত,
নারীর বদন সুন্দর কেমন ।
তার সঙ্গে কি রে করিব তুলিত ?
জগতের শোভা রমণীর মুখ,
তাতেও জীবের হরে শত দুখ ।
সকল হৃদয়ে সকল সময়ে
কিন্তু হেন ভাব হয় না উদিত ।

৪

যেরূপ নির্জ্জনে দূর লোকালয়ে
তরু পত্রাবৃত কুটীর-হৃদয়ে,
সতী পতিপ্রাণা গৃহস্থ ললনা
থাকে একাকিনী কুল-ধর্ম্ম ল'য়ে ;

তার সে সতীত্ব দেব-প্রশংসিত,
তুচ্ছ রূপ-শোভা যেখানে নিন্দিত,
অসাধুর দৃষ্টি হলাহল বৃষ্টি
করে না ; সে আছে তব সম হ'য়ে।

৫

অথবা সুন্দর শিশু সুকুমার
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠে যে প্রকার,
প্রফুল্ল কোমল মুখে স্বেদ জল,
ঠিক যেন এই নিশার নীহার ;
নিষ্কলঙ্ক মুখে নিষ্কলঙ্ক হাসি,
এমনি দেখিতে বড় ভালবাসি।
তবে প্রিয় ফুল যদিও অতুল,
তার সনে করি তুলনা তোমার।

৬

অথবা নির্জন পল্লীতে যেমন
লুকাইয়া থাকে সাধু কোন জন,
তাঁর যে চরিত্র, উজ্জ্বল পবিত্র.
নিজে প্রকাশিত, জানে না ভুবন ;
আপন পল্লীতে, আপনার ঘরে,
নিজের সৌরভে আমোদিত করে।
সেই অজানিত চরিত্র সহিত
হও রে তুলিত, হেন লয় মন।

৭

কোথা দিনমণি সুদূর গগনে !
কোথা তুমি, ফুল, সহস্র যোজনে !
কিন্তু রে উষার না হ'তে সঞ্চার,
ফুটিয়া উঠিলে আনন্দিত মনে।
দিবাকরে দেখি হইলে পাগল.
ঢল ঢল রূপে, আনন্দে বিহ্বল,
কতই হাসিছ হেলিছ দুলিছ,
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুলি দিবাকর পানে।

৮

কোথায় অগম্য অপার ঈশ্বর !
কোথা ক্ষুদ্র জীব হীনমতি নর।
কিন্তু রে গগনে দেখে' সে তপনে
হয় প্রস্ফুটিত জীবেরো অন্তর।

প্রাণ-পদ্ম ফুটে তারো দলে দলে ;
তারো তনু সিক্ত প্রেম-ভক্তি-জলে।
এ পাপ ভুবনে সেই জীব সনে
হওরে তুলিত, কুসুম সুন্দর।

৯

তুমি ক্ষুদ্র চক্ষে দিবাকর পানে
যে ভাবে চাহিয়া আছ এক মনে,—
নিজ ক্ষুদ্র আঁখি তাঁর চক্ষে রাখি
জীবাত্মা মগন থাকে যোগধ্যানে
চক্ষে চক্ষে উঠে প্রেমের লহরী,
এ পাপ সংসার যায় রে পাসরি।
সব আশা ফুটে, কি সৌরভ ছুটে,
কার সাধ্য তাহা বর্ণেতে বাখানে।

১০

তোমার আদর করে সর্বজনে,
সুসভ্য অসভ্য সকল ভুবনে।
ব্যাধের যুবতী, সরল প্রকৃতি,
তোমারে তুলিয়া পরম যতনে
গাঁথিয়া কোমল সুচিকণ হার,
সোহাগে হৃদয়ে পরে আপনার।
তুমি, প্রিয় ফুল। কর্ণে হও দুল,
সব অলঙ্কার তুমি তার সনে।

১১

সুসভ্য ইংরাজ পাইলে তোমারে,
এখনি সাজাবে তুলি থরে থরে,
প্রণয়িনী-পাশে লইয়া উল্লাসে
দিবে বসাইয়া বসন-উপরে।
বঙ্গবালা পেলে পরিবে যতনে ;
সুনীল সুন্দর কবরী-বন্ধনে
বসাবে পুলকে ; দোলাবে অলকে,
দেখাবে হাসিয়া নিজ প্রাণেশ্বরে।

১২

কিন্তু, রে কুসুম। আর্য-সুতগণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা-চরণে
ঠিক্ ব্যবহার সেই রে তোমার
সেই রে সদ্‌গতি, ভাবি মনে মনে।

এমন পবিত্র, এমন কোমল,
দেব-পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল ?
তোমার মহিমা মানব জানে না,
তব গুণ-গ্রাহী শুধু দেবগণে।

পরিত্যক্তা রমণী

সময়—নিশীথ। সমীপে নির্বাণোন্মুখ
প্রদীপ ; নবপ্রসূতা কুমারী শয়ানা।

১

অভাগীর কেউ নাই! কার কাছে কাঁদিব ?
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে বলিব ?
তাই বলি বিভাবরি!
অভাগীরে কৃপা করি
আঁধার-অঞ্চলে ঢাকো, প্রাণ ভ'রে কাঁদিব ;
তোমারি নিকটে সখি! অশ্রুজলে ভাসিব।

২

কত শত অশ্রু তুমি রেখেছ ত ঢাকিয়া,
সহস্র নিঃশ্বাস যায় বায়ু সনে বহিয়া।
মোর অশ্রু সেই সনে,
রাখ, সখি, সংগোপনে ;
জুড়াই তাপিত প্রাণ প্রাণ ভ'রে কাঁদিয়া ;
তোমার অঞ্চল যাক্ অশ্রুজলে ভিজিয়া।

৩

অয়ি সুখময়ি নিশি! তারা-হার পরিয়া,
বসুধার সিংহাসনে রয়েছ ত বসিয়া!
চেয়ে দেখ পদতলে,
পড়ে লতা, ভাসে জলে।
তুলে লও প্রাণ ফুল, দয়া ক'রে ছিঁড়িয়া।
নিরমল ফুল থাক্ তারা সনে মিশিয়া।

৪

অথবা পার লো যদি হাহাকার বহিতে,
অভাগীর হাহাকার লও তথা ত্বরিতে,
যথা সেই নিরদয়
ঘুমাইছে এ সময় ;
যাও তথা হাহাকারে নিদ্রাভঙ্গ করিতে,
নিদ্রাভঙ্গে অভাগীর দুঃখ-কথা কহিতে।

৫

অভাগীর হাহাকারে যেই আঁখি মেলিবে
অমনি, রজনি ! তুমি ধীর স্বরে বলিবে,—
"ঘুমাও ; এ রবে কেন
নয়ন মেলিলে হেন ?
অবলার হাহাকার কেন বৃথা শুনিবে !
ঘুমাও ! কাঁদুক তারা, চিরকাল কাঁদিবে।"

৬

রে দীপ ! তোমার তৈল ফুরাইয়া আসিছে,
তাই মরি শিখা তব নিভু নিভু করিছে।
আশা-তৈল পামরার
বিন্দুমাত্র নাহি আর,
তবু কেন প্রাণ-শিখা এত ক্ষণ জ্বলিছে ?
দুর্বল হৃদয়-বাতি হুহু ক'রে পুড়িছে ?

৭

পুড়িতে পুড়িতে শেষ অবশ্যই হইবে
তখন এ পাপ শিখা একেবারে নিভিবে।
হাহাকার, অশ্রুজল,
ঘুচে যাবে এ সকল।
নির্দয় পতির আশ সেই দিন মিটিবে,
সেই দিন কমলের শত-দল ফুটিবে।

৮

বিপন্নের বন্ধু তুমি চিরদিন ঘোষণা,
তবে কেন, মৃত্যু ! আজ অভাগীরে লহ না ?
নারী-প্রাণে কত সয়,
তা যদি দেখিতে হয়,
যথেষ্ট হয়েছে। সত্য ! আর প্রাণে সয় না ;
ফেটে মরি, পুড়ে মরি। সত্য ! আর সয় না !

৯

একা ছিনু, ছিনু ভাল! একাকিনী পড়িয়া
ছিনু, বাছা, এ বিজনে অশ্রুজলে ভাসিয়া।
কত কষ্ট আছে ভালে,
কেন এলি হেন কালে?
নিজে মরি, কি করিব তোমা-ধনে লইয়া?
যাই যদি, কার কাছে যাইব লো রাখিয়া?

১০

তোমারি মায়ায় প্রাণ আর যেতে চায় না,
অনলে কি বিষ-পানে আর মন ধায় না।
এ হেন জ্বালায় মোরে
চিরদিন রাখিবারে,
এলে কি রে? কি আশ্চর্য! যে তোমারে চায় না,
তারি ঘরে এলে তুমি! অন্যে সেধে পায় না।

১১

এখনো নিতান্ত শিশু, কিছু তুমি জান না;
সর্বনেশে "মা, মা," কথা বলিতে ত পারি না।
"কেন মা কাঁদিস্" ব'লে
জিজ্ঞাসিবে বড় হ'লে;
কি উত্তর দিব তার?—প্রাণে ধৈর্য রবে না।
কাঁদিবে আমার সনে, তাও প্রাণে সবে না।

১২

স্বর্গের বিহঙ্গ! তুমি নিজ পক্ষ ধরিয়া,
অতএব এই বেলা শীঘ্র যাও উড়িয়া।
চিরদিন কাঁদিবারে,
কেন এলে কারাগারে?
মায়ের দুর্দশা দেখে' উপদেশ লইয়া,
নিষ্কলঙ্ক মূর্তি! যাও মানে মানে উড়িয়া।

১৩

জন্মেছি কাঁদিতে আমি, মরিব ত কাঁদিয়া।
প'ড়ে আছি, প'ড়ে থাকি। তুমি যাও চলিয়া।
এই বেলা যাও তবে;
"মা" ব'লে ডাকিবে যবে,
নারিব বিদায় দিতে এইরূপ করিয়া।
দোঁহারে পুড়িতে হবে মায়া জালে পড়িয়া।

১৪

যাইবার কালে তুমি সেই পথে যাইবে,
তাহাকে নিদ্রিত তথা দেখিবারে পাইবে।
ধীরে বসি পদতলে,
প্রথমেতে "বাবা" ব'লে,
মধু স্বরে ধীরে ধীরে তিনবার ডাকিবে;
সম্বোধিয়া তিনবার শেষে চুপ করিবে।

১৫

তাতে আঁখি নাহি মেলে,—পদতলে বসিয়া
"হে নির্দয়! জাগো।" ব'লে জাগাইবে ডাকিয়া।
তবু যদি নাহি চায়,
তখনি ডাকিবে তায়
"নারী-হত্যা-পাতকিন্! জাগো জাগো!" বলিয়া;
গগন-বিদারি-স্বরে বলিবে লো ডাকিয়া।

১৬

জাগিলে বলিবে, "কেন এনেছিলে আমারে
সেই অভাগীর সনে ভাসাইতে পাথারে?
যাই আমি, হে কঠিন!
'সুখে থাকো চিরদিন'
এই আশীর্বাদ সে যে করিয়াছে তোমারে,—
ব'লে গেনু; কর তুমি, যাহা হয় বিচারে।"

১৭

পবিত্র বিহঙ্গ! তুমি এই কথা বলিয়া,
নিরমল পাখা দুটী গগনেতে তুলিয়া,
বিধুমুখে মৃদু হেসে
উড়ে যেও নিজ দেশে।
তুমি গেলে, পিছু পিছু আমি যাব ছুটিয়া।
কমলের শতদল শোভা পাবে ফুটিয়া।

মার্জনা

রামের প্রতি রাবণ

(রামায়ণের অনুকরণ)

প্রহারের যাতনায় প্রাণ যায় যায় প্রায়
ভূমে প'ড়ে লুঠিছে রাবণ।
আপাসিছে কুড়ি হাত, যেন হিমালয় পাত।
দাপটেতে কম্পিত ভুবন।
ইন্দ্র যম আদি ক'রে বাঁধা সদা যার ঘরে,
ছয় ঋতু খাটে বার মাস,
সমীরণ ভয়ে ভয়ে চলে মৃদুগতি হ'য়ে,
দেব যক্ষ লক্ষ যার দাস,
আজ সেই মহারাজা যেন রবি হীন তেজা,
ভূমে প'ড়ে ধূলাতে লুটায় ;
সঙ্গে শত সহচরী মহারাণী মন্দোদরী
পাশে প'ড়ে অচেতন-প্রায়।
স্বর্ণলঙ্কা অন্ধকার সবে করে হাহাকার,
কাঁদিতেছে যে আছে যেখানে।
মরেছে পুরুষ যত ; বিধবারা শত শত
কাঁদিতেছে, মিলে স্থানে স্থানে।

হেথা দেব রঘুমণি রাবণ মরিল গণি
বসিলেন বিষণ্ণ হইয়ে।
মহাবীর হনুমান মন্ত্রিবর জাম্ববান্
আদি সবে আইল ধাইয়ে।
এসে দেখে, রঘুরায় বসি স্তম্ভিতের প্রায়
বিষাদেতে মলিন বদন ;
বাম করে রাখি শির এক দৃষ্টে ভাবে বীর,
যেন ঘোর দুঃখেতে মগন।
সবাই দাঁড়ায়ে পাশে হঠাৎ সমীপে আসে
হেন সাধ্য কারো নাহি হয় ;
ইঙ্গিতেতে কোলাহল ছাড়িয়া বানর দল
দাঁড়াইল হইয়া সভয়।
অবশেষে কিছু পর লক্ষ্মণ যুড়িয়া কর
আগে গিয়া করিলা প্রণাম।
"এস, ভাই রে লক্ষ্মণ! এস, করি আলিঙ্গন,"
বলি কোলে করিলা শ্রীরাম।

একে একে কপিগণে প্রণমিল শ্রীচরণে;
সকলেই দিলা আলিঙ্গন।
পদধূলি ল'য়ে শিরে বসিলা চৌদিকে ঘিরে
ভয়ে সবে মুদিত বদন।

কতক্ষণে রঘুবর ধরি লক্ষ্মণের কর,
বলিলেন, "লক্ষ্মণ রে, ভাই,
মহাবীর লঙ্কাপতি, তাঁর আজ কি দুর্গতি।
ম'সে আমি ভাবিতেছি ভাই।
এত সব আয়োজন করিলাম যে কারণ,
সে কামনা পূরিল আমার।
সাগর তো বাঁধা হ'লো শত্রুরা সবংশে ম'লো,
জানকীর হইল উদ্ধার।
রাবণের মত, ভাই, কিন্তু আর বীর নাই;
বীর-শূন্য ধরণী হইল।
লঙ্কার গৌরব যত আজি হ'তে হ'লো হত
সব সুখ আজ ফুরাইল।
যদিও রাবণ মোর শত্রুতা করেছে ঘোর,
তবু আজ কাঁদিছে পরাণ।
ইচ্ছা হয়, একবার দেখি গিয়ে কি প্রকার
প'ড়ে বীর, পর্বত সমান।
ইচ্ছা হয়, কাছে গিয়ে প্রেম আলিঙ্গন দিয়ে
অবসানে করি রে সান্ত্বনা
ইচ্ছা হয়, নিজ করে তাহারে শুশ্রূষা ক'রে
ঘুচাইগে প্রহার যাতনা।"
বলিতে বলিতে রায় চলিলেন পায় পায়;
বানরেরা চলে মৃদুগতি।
ক্রমে আসি উপনীত, কুড়ি নেত্র নিমীলিত
ক'রে যেথা প'ড়ে লঙ্কাপতি।
চেড়ীরা বলিল কানে চাহি শ্রীরামের পানে;
মন্দোদরী কাঁদিতে লাগিল।
শত শত সহচরী কাঁদে অধোমুখ করি,
শোকে যেন তরঙ্গ উঠিল।
হেরিয়ে তাদের মুখ রামের বিদরে বুক,
দুঃখিত কুণ্ঠিত অতিশয়।
কমল নয়ন দিয়া পড়ে অশ্রু গড়াইয়া,
বিষাদেতে পূরিল হৃদয়।

কাঁদিছেন রঘুপতি, হেন কালে লঙ্কাপতি
মূর্চ্ছা-ভঙ্গে মেলিলা নয়ন ;
নব-জলধর-শ্যাম সমীপে দেখিলা রাম,
শান্ত-মূর্ত্তি-কমল-লোচন ।
দৃষ্টিমাত্রে, যুড়ি কর প্রণমিলা বীরবর
শ্রীরামের যুগল চরণে।
বিষাদে পূরিল প্রাণ, বদন হইল ম্লান,
ধারা বহে বিংশতি নয়নে।
রাজা বলে, "রঘুবর, এই দেখ যুড়ি কর
তব পদে মাগি হে মার্জনা ;
আপন কুকর্ম-ফলে গেনু আমি রসাতলে,
নিজ দোষে এত বিড়ম্বনা ।
তব নারী লক্ষ্মী সতী অত্যাচার তাঁর প্রতি
কভু তাহা ধর্মে নাকি সয় ?
তাই এত পরিবার,— এক প্রাণী নাহি তার,
স্বর্ণ লঙ্কা হ'লো শূন্যময় !
সতীর চক্ষের জল যেথা প'ড়ে, সেই স্থল
উড়ে পুড়ে যায় সেই ক্ষণে ;
শুনে কভু মানি নাই, আজ দেখিলাম তাই,
সত্য আজ বুঝিলাম মনে ।
নিজ-বল-অহঙ্কারে ভাবিতাম, এ সংসারে
অধর্মের হবে বুঝি জয় ;
কিন্তু আজি সেই ঘোর স্বপন ভাঙ্গিল মোর,
আজ জ্ঞান হইল উদয় ।
যা হবার হ'লো তাহা, তোমার কর্তব্য যাহা
করিলে ত বনিতার তরে ;
আপন বনিতা ল'য়ে যাও তুমি সুখী হ'য়ে
সুখে রাজ্য কর 'গয়া ঘরে ।
ব'লো ব'লো জানকীরে যেন তিনি এ পাপীরে
নিজগুণে করেন মার্জনা ;
যে কষ্ট করেছি দান সব যেন ভুলে যান্;
এই মাত্র শেষের প্রার্থনা ।"

বলিতে বলিতে হায় ! চৈতন্য মিলায়ে যায়,
ওই আঁখি মুদিল রাবণ !
সবে করে হাহাকার, ফেটে যায় ত্রিসংসার
কাঁদিছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ !

ভর্ৎসনা

রাবণের প্রতি সীতা

স্থান— অশোকবন।

একে তুই লঙ্কা, সাগর দুহিতে!
রূপে অতুলিত সুরেন্দ্র-বাঞ্ছিতে!
তাহে পূর্ণ শশী সুষমা প্রকাশি,
গগনে উদিত তোরে হাসাইতে,
সৌন্দর্য-তরঙ্গে তোরে ভাসাইতে।

সুনীল বিস্তৃত জলধি-তরঙ্গে,
সুবর্ণ মণ্ডিত সে পুরীর অঙ্গে,
ঢালি সুধা রাশি, শশী যায় ভাসি।
মত্ত রক্ষপতি প্রণয়-প্রসঙ্গে
বিহরে উদ্যানে প্রণয়িনী-সঙ্গে।

মদে মাতোয়ারা, ভাবে ঢল ঢল,
চঞ্চল চরণ হৃদয় চঞ্চল,
বলে,—"এইক্ষণে অশোক-কাননে
গিয়ে দেখি সীতা ধরে কত বল।
যায় যাবে লঙ্কা যাক্ রসাতল।"

বলি উঠে ধায়।— রাণী মন্দোদরী
কাঁদিয়া নিবারে পদযুগে ধরি।
বলে,—"ক্ষমা কর, শোন প্রাণেশ্বর!
বড় পতিব্রতা রামের সুন্দরী।
যেও না, যেও না, অনুরোধ করি।"

ছোটে দশানন, ছোটে সঙ্গী যত।—
হেথা তরুতলে, ভিখারিণী মত',
মলিন বসনা মলিন বদনা,
শ্রীরাম-ললনা বসি অবিরত
নয়নের নীর ভাসিছেন কত!

জনকের প্রিয় প্রাণের দুহিতা,
রঘু-কুলবধূ শ্রীরাম-বনিতা,
চীর মাত্র প'রে মরমেতে ম'রে,
গুন্ গুন্ স্বরে কাঁদিছেন সীতা
অশোক-কাননে শোকে অভিভূতা।

হেনকালে আসি যমের সমান
দাঁড়াল সম্মুখে! অবলার প্রাণ
কিরূপ হইল, রাণী তা বুঝিল।
কঠিন পুরুষ কি জানে সন্ধান?
জনক-নন্দিনী ভয়ে কম্পমান।

ভয়ে কাঁপে আজ শ্রীরাম-রমণী,
ব্যাধ-হস্তে যথা কাঁপে কুরঙ্গিনী।
সে প্রাণের ভাষা, সে ঘোর নিরাশা,
কে পারে বর্ণিতে? দুর্বল লেখনী
পারে না চিত্রিতে সে ঘোর কাহিনী!

সীতার দুর্দশা দেখিয়া রাণীর
দুটী পদ্ম-চক্ষে বহে দুটী নীর।
মুছিয়া অঞ্চলে সকাতরে বলে,
"মার' যদি, মার'! আর অভাগীর,
এ যাতনা কেন দেখ, রক্ষোবীর?"

রাবণ হাসিয়া বলে, "শুন ধনি!
এখনো ভদ্রতা করি লো সজনি!
এখনো সুমতি হইয়ে যুবতি,
ভজ লো আমারে; সহস্র রঙ্গিণী
দেখ, ভজে মোরে দিবস-রজনী!

আমি রক্ষপতি, এই লঙ্কা মোর
সৌন্দর্য-ভূষিতা। কোথা, ধনি, তোর
রাম, ক্ষুদ্র নর! বুঝায়ে অন্তর
ভজ লো আমারে। এ যাতনা ঘোর
পাইতে হবে না, এহেন কঠোর।"

"ছি ছি মহারাজ!" —বলে মন্দোদরী,
"ব'লো না, ব'লো না। শ্রীরাম সুন্দরী
পতিব্রতা সতী, ওহে রক্ষ-পতি!
সতী অভিশাপে দগ্ধ হবে পুরী;
দিবে স্বর্ণ-লঙ্কা ছার খার করি।"

রাবণ হাসিয়া ধরিবারে চায়,
পথ আগুলিয়া মহিষী দাঁড়ায়।
"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না পরের অঙ্গনা"
ব'লে রাণী ধরে বার বার পায়—
সবলে রাবণ ছাড়াইয়া যায়।

ধরিবারে যায় ; সিংহীর সমান,
উঠিল গর্জিয়া জানকীর প্রাণ।
বলে, "দুরাচার! কি সাধ্য তোমার,
আমার শরীরে কর হস্ত দান।
দাঁড়াও, লম্পট! এ নহে বিধান।

ওরে মূর্খ! ধৃষ্ট! ওরে জীবাধম!
কে আছে পাষণ্ড বল্ তোর সম?
চৌর্য বৃত্তি ক'রে, পর নারী হ'রে
এনে, কাপুরুষ! আবার বিক্রম!
দাঁড়াও, বর্বর! নারকী অধম!

জনম দুখিনী জনক-নন্দিনী,
তাতে কিবা ভয়, ওরে দুরাশয়!
মারিস্ মরিব না হয় প্রাণে।
কখনো ভেবো না স্বপনে দেখো না,
জীবন থাকিতে এই পৃথিবীতে
চাহিবে জানকী তোমার পানে।

হোন্ ক্ষুদ্র নর মোর প্রাণেশ্বর,
হোন্ বনবাসী, হোন্ বা সন্ন্যাসী,
সীতা চিরদিন তাঁহারি দাসী।
তাঁহারি কারণে এসেছিনু বনে ;
তাঁহারি কারণে বেঁচে আছি প্রাণে,
নতুবা যে গলে দিতাম ফাঁসি।

শোন্ রে বর্বর! মোর প্রাণেশ্বর,
ধর্ম অবতার ; চরণে তাঁহার
দশ মুণ্ড তোর বিকায়ে যায়!
তুই যে লম্পট, পাষণ্ড কপট,
ধর্মের মহিমা অচিন্ত্য অসীমা
কি জানিস্? কিসে বুঝিবি তায়?

পর নারী হ'রে নিত্য আন ঘরে ;
কাল ভুজঙ্গিনী জনক-নন্দিনী
এবারে এনেছ মরিবে ব'লে!
শ্রীরামের বাণে ভেবেছ কি প্রাণে
বাঁচিয়া ফিরিবে? ভাব' কি থাকিবে
এক প্রাণী আর তোমার কুলে?

কুলকন্যা যত হ'য়েছে নিহত,
তাদের নিঃশ্বাসে, প্রাণের হুতাশে,
আজ দাবানল জ্বলেছে দেখ।
আর রক্ষা নাই, লঙ্কা হবে ছাই,
তুমি ভস্ম হবে, সবংশে মরিবে,—
এই কথাগুলি জানিয়া রেখ।

এই মন্দোদরী পরমা সুন্দরী
গৃহ-লক্ষ্মী মত' সঙ্গে অবিরত,—
নির্লজ্জ পুরুষ! ইঁহারি সম্মুখে,
কিরূপে আমারে চাহ ধরিবারে
যদি থাকে মান ত্যজ গিয়ে প্রাণ
চূর্ণ কালি দাও ও পাপ মুখে।

পশু জন্ম ল'য়ে আছ পশু হ'য়ে।
এ নারীর মর্ম বোঝা তব কর্ম
নয়, রে বর্বর! সতীর প্রেম
কেমন সুন্দর, ও পাপ অন্তর
কেমন বুঝিবে? কপি কি চিনিবে
সংসারে কিরূপ পদার্থ হেম?"

শুনিয়া রাবণ জ্বলিয়া উঠিল;
আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল!
"কাট্, কাট্" ব'লে ধায় খড়্গ তুলে,—
রাণী মন্দোদরী পথ আগুলিল।

ওদিকে বাজিল সমর বাজনা!
বাল বৃদ্ধ আদি জাগে সর্ব জনা!
সাগর তরিয়া শ্রীরাম আসিয়া,
উত্তর দুয়ারে দিতেছেন থানা।

কাঁপিল রাবণ; —গেল রসাভাস;
হৃদয়-কন্দরে উপজিল ত্রাস!
ভাবিতে ভাবিতে মন্দোদরী সাথে,
ভবনে ফিরিল।— সীতার উল্লাস!

ভীরু

লজ্জাবগুণ্ঠনে কেন সুধাংশু বদন,
ঝাঁপ বোন! ভয় নাই, আমি লো সবলে,
ও পবিত্র মুখে তব, নীচের মতন
ফেলিবে না পাপ-দৃষ্টি চাও মন খুলে।

অন্ধ হোক্ দৃষ্টি তার, পুড়ুক্ হৃদয়,
যার প্রাণে, প্রস্ফুটিত কুসুম-নিন্দিত
সুকোমল কান্তি তব পবিত্রতাময়
দেখে, নীচ পাপচিন্তা হয় লো উদিত।

ওই মুখে স্বর্গ-শোভা, সে চক্ষে নিরয়,
ওই নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভর্ৎসনা ;
সতীত্ব উন্নত শৃঙ্গে তোমার আলয়,
কীট-সম ভূলুণ্ঠিত তাহার বাসনা।

শুন গো ললনে! প্রাতে বিহগী যেমতি
তরল তপনালোকে খেলে নিজ মনে,
কোথা বাধ ধরা-পৃষ্ঠে! তুমি লো তেমতি
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সে জনে।

বালকে কুসুম তোলে, পণ্ডিতে তাহার
সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল,
ম্লান হয়, যার শোভা, যার গন্ধ ভার ;
থাক বৃক্ষে, গন্ধে দেশ কর লো আকুল।

তুমি নারী, জান না কি নারী এ জগতে
মরুভূমি মাঝে যেন বটচ্ছায়া সমা ;
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে ;
গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, নারী নিরুপমা।

কিন্তু বঙ্গে নারী-জন্ম বড় বিড়ম্বনা।
তাই ভাবি, ও বিশাল সুন্দর নয়নে
বহে না ত ধারা, বোন্? নারীর যাতনা
এ বঙ্গ সংসারে দেখে কাঁদি লো নির্জনে।

কে এত সহিষ্ণু বঙ্গ-বালার সমান?
বন-মৃগী সম ভীরু, লাজে নিমীলিতা,
প্রেমের কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্লিত প্রাণ।
সে কিরণে কিন্তু, হায়, অনেকে বঞ্চিতা।

জানি, বোন্, তোমা সম অনেক যুবতী
এই বঙ্গে পশুসম পুরুষে ভজিয়ে,
কাঁদিতেছে দিবারাতি! প্রেমে পূজে সতী,
পতি সে পবিত্র প্রেম আসে বিকাইয়ে।

আরো কত বঙ্গবালা নিরাশ-সলিলে
প্রেম-আশা বিসর্জিয়ে বৈধব্য-আগারে
বসি কাঁদে। বল দেখি, সে কথা স্মরিলে
এ বঙ্গে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পারে?

তুমি যার, তোমারো কি তিনি লো সুন্দরি !
আহা যেন তাই হয় ! হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রাণে প্রাণে মিশে সুখে বহুক্ লহরী,
প্রণয় আনন্দ শান্তি থাকুক্ আলয়ে।

বুঝেছ কি, কি পদার্থ প্রণয় জগতে ?
প্রাণে প্রাণে সদা কথা, প্রাণে প্রাণে লয়,
এক প্রাণ স্রোত যেন অন্য প্রাণে বয়,
ভাঙ্গে না ছেঁড়ে না প্রেম যেন কোনমতে।

প্রণয় সহিষ্ণু ; প্রেম মধুরতাময় ;
চক্ষের কজ্জল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন,
প্রাণে সুধা-বিন্দু-সেক ; প্রেম জ্যোতির্ময়
বিষম বিপত্তি ঘোরে ; নির্জনে সজন।

প্রেমে ভীরু দুঃসাহসী ; বোবারে বলায়,
নির্বোধে সুবুদ্ধি করে ; হাসায় দুঃখীরে ;
ভুলায় আহার নিদ্রা ; স্বার্থ দূরে যায় ;
মজে প্রাণ করি স্নান সুধা-সিন্ধু-নীরে।

এ প্রণয়ে বাঁধা কান্ত আছে কি তোমার ?
ভাল বেস, ভালবাসা মিলিবে তখনি !
সমগ্র প্রাণটী ধ'রে দিও উপহার,
সমগ্র প্রাণটী হাতে পাইবে অমনি !

কবি আমি, দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা।
এই মন্ত্র মনে রেখে কর লো সাধনা ;
এই মন্ত্রে নিজ কান্তে করাইও দীক্ষা ;
বিমল আনন্দ-স্রোতে ভাসিবে দুজনা।

বহু দূর নয়

(গভীর নিশীথে লিখিত)

গভীর রজনী ! ডুবেছে ধরণী,
জাগ রে জাগ রে সাধের লেখনী !
প্রাণ-প্রিয় ভাই ভারত-সন্তান !
জাগ রে সকলে ! শোন, করি গান !
ভারতের গতি ভারত-নিয়তি
ভেবে আজ কেন উথলিল প্রাণ ?
দুখের কাহিনী তাই করি গান।

আজ যাও, নিদ্রে আজ ঘুমাব না,
সুখের শয্যায় আজ শুইব না।
মৃতপ্রায় প'ড়ে জন্ম-ভূমি যার,
এ সকল কি রে ভাল লাগে তার?
কিরূপে ঘুমাই? শুনিবারে পাই
যেন আর্তনাদ, যেন হাহাকার।
শুনে যে কেঁদেছে পরাণ আমার।

ঘুমাইতে যাই,— কেহ কানে বলে,
"ঘুমায়ে কি আছ সন্তান সকলে?"
তাই ত আমার ঘুম দূরে গেল;
তাই ত আমার প্রাণ উথলিল।
একাকী জাগিয়া রয়েছি বসিয়া,
অন্য সব ভাই কেন ঘুমাইল?
কেন না সকলে সে রব শুনিল?

শুনে যে জ্বলিল উৎসাহ-অনল:
কি করি, ভাবিয়ে হৃদয় চঞ্চল।
সাধে কি রে জাগি? কে ঘুমাতে পারে,
এ হেন আগুনে ঘেরিয়াছে যারে?
কি করি, কি করি, কিসে অগ্নি ধরি?
ইচ্ছা, ডাকি গিয়ে উঠে দ্বারে দ্বারে,
"ঘুমাস্‌নে, ভাই! আর এ প্রকারে!"

দুর্বলের মাতা প্রিয় বঙ্গ ভূমি,
লক্ষ শিশু কোলে ঘুমাইলে তুমি?
গভীর আঁধারে ঢাকি প্রিয় মুখ
লুকালে কি মাতা অন্তরের দুখ?
নিজে ত ঘুমালে আমারে জাগালে,
কি রব শুনালে হরে নিলে সুখ!
হৃদয় ভরিয়া উথলিল দুখ।

কার কথা ভাবি কোন্ দিক্ দেখি?
সব অন্ধকার, যে দিকে নিরখি।
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান আঁধারে
চিরমগ্ন; যেন আছে কারাগারে।
দারিদ্র্য, ভাবনা, অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে;
নির্বাক্ হইয়া কাঁদে পরস্পরে।

অভদ্র কি ভদ্র লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ, দেখি অবিরত।
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে
বিষাদ নিরাশা দেখি এক সনে।
দারিদ্র্য-যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়,
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে।
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে?

জ্ঞান পেয়ে যারা হয়েছে শিক্ষিত,
দেশের দুর্দশা তারাও বিস্মৃত।
জঘন্য আমোদে দেখি কাল হরে;
অকারণ বকে, হাসে হা হা ক'রে;
নীচ পশু প্রায়, ইন্দ্রিয় সেবায়
মগ্ন নিরন্তর। জ্ঞান শিক্ষা ক'রে,
নীচ সুখ মাত্র চিনেছে সংসারে।

ঘৃণা করি কিংবা কাঁদি ডাক ছেড়ে,—
"মা তোর সৌভাগ্য কে লইল কেড়ে?"
আর বার ভাবি যাই, পায়ে ধ'রে
বলি, "ক্ষমা কর; আর ভারতেরে
ডুবাস্‌নে ভাই। বাকি কিছু নাই,
যথেষ্ট হয়েছে। বহু দিন ধ'রে
আছে জন্ম-ভূমি মরমেতে ম'রে।"

হায় রে। রমণী জগতের শোভা,
মানবের ঘরে স্বরগের প্রভা।
সে বঙ্গ-ললনা স্নেহের মূরতি,
সারল্যের ছবি, কোমল প্রকৃতি,
সবার ঘৃণিত চরণে দলিত
হ'য়ে সহিতেছে অশেষ দুর্গতি।
দুঃখিনী সারিকা কাঁদে দিবারাতি।

সাধে কি রমণি। তোরে ভাল বাসি?
সাধে কি ভারতি। তোর কাছে আসি?
যুগ যুগান্তর অজ্ঞান-আঁধারে
বদ্ধ হ'য়ে, গেল কত অত্যাচারে;
স্নেহের জলধি, অমৃতের নদী,
তবু দেখি নারী এ পাপ সংসারে।
দেখে' মুগ্ধ আঁখি চায় দেখিবারে।

কার কথা ভাবি ? কোন্ দিকে হেরি ?
গভীর দুর্দশা চারিদিকে ঘেরি।
আজি তবে আমি ঘুমাই কেমনে ?
তাই ত জাগিয়া কাঁদি রে নির্জনে।
ভাই, বঙ্গবাসি ! উঠে কাঁদ আসি।
কি আছে সম্বল অশ্রুপাত বিনে ?
ওঠ ওঠ, ভাই, থাকি জাগরণে।

কাজ কি ঘুমায়ে ? থাকি জাগরণে।
কাজ কি বিশ্রামে ? খাটি প্রাণপণে।
এ ঘোর দুর্দশা ঘুমালে কি যায় ?
বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ুক ধরায়।
তিল তিল ক'রে আয় যাই ম'রে ;
বল বুদ্ধি মন মিলিয়া সবায়
আয় ধ'রে দিই ভারতের পায়।

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তাও যদি হয়, হোক্ রে কপালে !
বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,—
তবে যে জাগিবে ভারত-সন্তান।
আর জন কত ধরি এই ব্রত,
খাটিয়া জীবন করি অবসান,—
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান।

আয় রে বোম্বাই ! আয় রে মান্দ্রাজ !
দ্বন্দ্ব কোলাহলে নাহি কোন কাজ।
ভারতের তোরা অমূল্য রতন ;
আয় সবে মিলে করি জাগরণ।
মিলে পরস্পরে দেশের উদ্ধারে
আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ।
দেখি রে দুর্দশা না যায় কেমন ?

ভাই মহারাষ্ট্র ! তোমার কপালে
পৌরুষের আভা আছে চির কালে।
দাঁড়াও আসিয়া কাছে একবার,
মুখ দেখে' আশা বাড়ুক আমার।
সাহসের কথা শুনে যাক্ ব্যথা,
প্রিয় ভারতের হোক্ রে উদ্ধার ;
জয় মহারাষ্ট্র জয় রে তোমার।

আয় রাজপুত, আয় প্রিয় শিখ !
জাতি ধর্ম ভেদ সকলি অলীক ।
ভারত-রুধির সবার শরীরে,
তা'ই ব'লে নতে তবে ভয় কি রে ?
আয়, ভাই ব'লে দিব প্রাণ খুলে ;
ভাই হ'য়ে রব তোদের মন্দিরে !
ক'রো না রে ঘৃণা ভীরু বাঙ্গালীরে ।

পাইয়াছি শিক্ষা, পেয়েছি ত মান ।
তোরা ভাই সব আছিস্ অজ্ঞান
তা ব'লে ভেব' না, করিব মমতা,
আর বলিব না সুশিক্ষার কথা ।
তোদের যে গতি আমারো সে গতি,
তোদিগে ফেলিয়া চাই না সভ্যতা ;
সবে এক হ'য়ে থাকিব সর্বথা ।

শেষে ডেকে বলি, মুসলমান ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই ।
দেশের দুর্দশা দেখ হ'ল ঢের,
তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের ।
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে ।
পুতে রাখ কথা,—"মুসলিম", "কাফের"
বল শুধু —"মোরা প্রিয় ভারতের" ।

ভারতের তোরা, তোদের আমরা
আয়, পূর্ণ হল আনন্দের ভরা !
সবে এক দশা । তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর !
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুরিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,—
আমাদের মাতা বাঁচিল আবার ।

আর কারে ডাকি, ওঠ গো ভগিনি,
ভারত ললনা, কারার বন্দিনী !
তোরা না উঠিলে দেশ যে উঠে না,
তোরা না জাগিলে দেশ যে জাগে না !
ওঠ একবার ; দেশের উদ্ধার,
কেবল পুরুষে হবে না হবে না ।
এক পায়ে দেশ কভু দাঁড়াবে না ।

ওঠ গো আবার, সুচারু-হাসিনী
প্রিয় ভারতের যতেক নন্দিনী।
প্রাণকান্তে যবে কর সম্ভাষণ,
পৌরুষের কথা করাও স্মরণ;
কোমল সন্তানে স্তন দুগ্ধ সনে
পিয়াও পৌরুষ; হোক্ শত জন
ভারতের চূড়া ভারত-ভূষণ!

ওই চাঁদ মুখে সব বল আছে!
বীরত্বের শিক্ষা ও দৃষ্টির কাছে!
প্রেমে মাখাইয়া জুড়ায়ে হৃদয়,
পশ্চাতে থাকিয়া দেও সে অভয়!
সাহসে মাতিয়া যাই উড়াইয়া
বিজয় নিশান। আর কারে ভয়?
মোদের সদ্‌গতি বহু দূর নয়।

দুর্গাবতী

ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই ইঁহার নাম বিদিত আছেন। ইনি সৌন্দর্য ও সুবুদ্ধি উভয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ যখন নর্মদা তীরবর্তী গড়া রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এই রমণী অসামান্য বীরত্ব সহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে জয়াশায় হতাশ হইয়া বক্ষস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়া রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন।

হের হের রণ মাঝে নাচিছে সুন্দরী রে
নাচিছে সুন্দরী।
করে অসি খরশাণ, মুখে ডাক হান হান,
পদতলে কাঁপে ধরা থর থর করি।

রণমদে মত্ত সতী পাগলিনী প্রায় রে
পাগলিনী প্রায়!
প্রবল ধূমের মাঝে চপলা রূপসী সাজে,
নবঘনে সৌদামিনী খেলিয়া বেড়ায়।

বীরভাবে বিকশিত বদন কমল রে,
বদন কমল।
একে যৌবনের শোভা, তাহে বীরত্বের আভা,
দরশনে প্রাণ-পূর্ণ যেন রণস্থল।

রবি-তাপে দুই গণ্ড আরক্ত-বরণ রে,
আরক্ত-বরণ।
প্রবল শ্রমের ভরে, ঝর ঝর স্বেদ ঝরে,
কোমল অঙ্গুলে মুছে ফেলে অনুক্ষণ।

কোন দিকে বীর পত্নী ফিরিয়া না চায় রে,
ফিরিয়া না চায়;
সেনা ল'য়ে অগ্রসর, সচকিত নারীনর,
কার সাধ্য সে নারীর সমীপে দাঁড়ায়!

বলে বামা, "যায় যাবে যায় যাবে প্রাণ রে,
যায় যাবে প্রাণ।
সকলে নিহত হব, এইখানে প'ড়ে রব,
সহজে কি গড়া আমি করিব প্রদান?

দেখিব কেমন বীর দুরাত্মা যবন রে
দুরাত্মা যবন।
যেই পথে মহারাজ গিয়াছেন, ছাড়ি লাজ
সেই পথে আমি আজ করিব গমন।

কি ভয় আমার, বল, কি ভয় আমার রে,
কি ভয় আমার?
একে একে প্রতি জন পড়িব, তথাপি রণ
ছাড়িব না; তবু গড়া না খুলিবে দ্বার।

বীরের রমণী আমি বীর-ধর্ম জানি রে
বীর-ধর্ম জানি।
দেহে কি থাকিতে প্রাণ যবনে করিব দান
এ সুখের গড়া রাজ্য স্বর্ণ-থালা খানি?

ভয় নাই, ভয় নাই, হও অগ্রসর রে,
হও অগ্রসর!
ক্ষত্রিয়ের তরবার সহ্য করে, সাধ্য কার!
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর-শিখর।

গজ বাজী রথ রথী কে পাবে নিস্তার রে,
কে পাবে নিস্তার?
দুর্গার সমরানলে দেখি দেখি কে না জ্বলে!
বড় যে বীরত্ব শুনি যবন রাজার!

বাজাও বাজাও বাদ্য, বাজাও বাজাও রে,
বাজাও বাজাও।
হর হর কি কৌতুক! এ হ'তে মনের সুখ
বল শুনি, বীরগণ, কেবা কোথা পাও?

এই ক্ষেত্রে মহারাজ ত্যজিলেন প্রাণ রে
ত্যজিলেন প্রাণ;
যদি তাঁর পত্নী হই, বীর বংশে জন্ম লই,
রাখিব রাখিব আজ তাঁহার সম্মান।

শুনেছি, যবন চাহে হরিতে আমারে রে,
হরিতে আমারে।
এই ত সমর বেশে, এসেছি এ হেন দেশে,
দেখি দেখি এই তনু স্পর্শিতে কে পারে।

কোথা গেলে আর্যপুত্র! শৌর্য অবতার হে
শৌর্য অবতার!
রাখিতে তোমার মান, আজি যে করিবে দান
জীবন যৌবন দুর্গা, বড় সাধ তার!

কাঁদিয়া তোমাকে, নাথ, দিয়াছি বিদায় হে,
দিয়াছি বিদায়।
তাই কি আঁধার ক'রে অধিনীরে পরিহ'রে
গেছ, নাথ? বল আজ দাঁড়াব কোথায়?

অথবা অভাগী দুর্গা রমণী তোমার হে
রমণী তোমার!
তাহার কিসের ভয়? অনা'সে করিবে জয়,
ভক্তি যদি শ্রীচরণে থাকে হে তাহার।"

বলিতে বলিতে কথা নয়নের জল রে,
নয়নের জল,
ঝ'রে দর দর ক'রে বিন্দু বিন্দু হৃদি 'পরে
পড়িতে লাগিল যেন স্থূল মুক্তাফল।

নয়নে বহিছে জল, মুখে মা'র্ মা'র্ রে,
মুখে মা'র্ মা'র্!
সাবাসি সাবাসি সতি! সত্য সত্য গুণবতী!
বীর পত্নী বট তুমি! ক'রি নমস্কার।

এরূপে খেলিছে সতী সমর চত্বরে রে,
সমর চত্বরে ;
উড়ে ধূলি ঘনাকার, চারিদিক্ অন্ধকার,
অস্ত্রে অস্ত্রে উঠে বহ্নি ঝক্ ঝক্ ক'রে।

গড়ার বীরেন্দ্র বীর সেনাপতিগণ রে
সেনাপতিগণ।
রুধির'ক্ত কলেবরে, নয়ন মুদ্রিত ক'রে,
অশ্ব হ'তে ধরাপৃষ্ঠে করিছে শয়ন।

বিশাল ললাট ফাটি বহিছে রুধির রে,
বহিছে রুধির।
সমর হুতাশে প্রাণ করিয়া আহুতি দান
একে একে ধরাশায়ী হয় যত বীর।

প্রসারি বিশাল বক্ষ অগাধ নিদ্রায় রে
অগাধ নিদ্রায়,
আছে যত বীরগণ ; পদে দ'লে কত জন
দড় বড় চারি দিকে অবিরত ধায়।

ক্রমে ক্রমে অর্ধশেষ হইল বাহিনী রে,
হইল বাহিনী।
তথাপি সাহস ধরি মার্ মার্ শব্দ করি
সমর-রঙ্গেতে মত্ত রয়েছে কামিনী।

বিদ্ধ হ'ল অবশেষে বিশাল নয়ন রে,
বিশাল নয়ন ;
উজ্জ্বল নয়ন-তারা হ'য়ে গেল দৃষ্টি-হারা,
বিধুমুখে রক্ত-স্রোত বহে ঘন ঘন !

জ্বালায় অস্থির আহা বিধুরা কামিনী রে,
বিধুরা কামিনী !
তথাপি অভয় দান,— খুলিয়া ফেলিল বাণ,
অঙ্গুলে মুছিয়া রক্ত ফেলে বিনোদিনী।

কোন্ দিকে আর কত রাখিবে সুন্দরী রে,
রাখিবে সুন্দরী ?
চারিধার ভাসে যবে, কে পারে রাখিতে তবে
প্রবল বন্যার জল সেতুবন্ধ করি ?

দেখিতে দেখিতে সেনা ভঙ্গ দিল রণে রে,
ভঙ্গ দিল রণে।
"দাঁড়াও! দাঁড়াও!"—আর কথা শুনে কেবা কার!
দড় বড় ছোটে সবে যে পারে যেমনে।

এ ভাব দেখিয়া সতী হইল হতাশ রে,
হইল হতাশ।—
সেনাগণ ভঙ্গ দিল, রণ ছাড়ি পলাইল;
কারে ডাকি, কেবা শুনে! বিফল প্রয়াস!

আজি গেল অস্তাচলে সুখের তপন রে,
সুখের তপন;
বিধাতা হইল বাম, আজি ডোবে উচ্চ নাম,
বীরপুত্রী গড়া আজ হইল পতন!

এত ভাবি, বলে সতী, "দে রে তরবার, ওরে
দে রে তরবার!
যবনে হারিয়া রণ রাখিব না এ জীবন,
বহিতে নারিবে দুর্গা কলঙ্কের ভার।

কি হইবে রাজ্যে মম কি হইবে ধনে রে,
কি হইবে ধনে?
বীর-চূড়া যার স্বামী, সেই অভাগিনী আমি,
জীবন থাকিতে কি রে ভজিব যবনে?

ভেবেছ জিনিয়া রণে লইবে আমারে রে,
লইবে আমারে!
আমি কি রাখিয়ে প্রাণ, প্রাণকান্তে অপমান
করিব রে? প্রতিশোধ দিব কি তাঁহারে?

নারীর সতীত্ব ধন অমূল্য রতন রে,
অমূল্য রতন;
হেন ধন হারা হ'য়ে এ পাপ শরীর ল'য়ে
কি হইবে? চাহিনা রে এ ছার জীবন।"

এত বলি সুলোচনা ল'য়ে তরবার রে
ল'য়ে তরবার,
হৃদয়ে আঘাত ক'রে ভবধাম পরিহ'রে
হায়, গেল শশিমুখী ক'রে অন্ধকার!

ব্রহ্মবিদ্যা

হত বৃত্রাসুর। আজ বৈজয়ন্ত ধামে
ধরে না আনন্দ। যত দিক্‌পালগণ
মিলেছেন একস্থানে। দানব-সংগ্রামে
নিজ নিজ কীর্তিকথা করেন কীর্তন।
অট্টহাস্য-প্রতিধ্বনি কৈলাস-কন্দরে।
নাচে রম্ভা, গায় গীত গন্ধর্ব কিন্নরে।

ঘর্ঘর গরজে ঘোর আবর্ত-পুষ্কর, *
গগন ফাটায়ে বজ্র করে হুহুঙ্কার;
ঐরাবত ধরি টানে কৈলাস শিখর।
আনন্দে বিহ্বল আজ ত্রিদিব-সংসার।
গভীর দুন্দুভিনাদ বহে মন্দাকিনী;
সংশয় বিস্ময় ভয়ে কম্পিতা মেদিনী।

বায়ু অগ্নি দুই সখা মিলি এক সনে
নৃত্য করে। উল্কারাশি গগনে ছুটিছে।
বীরদর্পে প্রভঞ্জন ভূধরে, কাননে,
সিন্ধুগর্ভে, জনস্থানে আনন্দে লুঠিছে।
লক্ লক্ রক্ত জিহ্বা প্রসারি অনল,
সখা-সনে আলিঙ্গনে আনন্দে বিহ্বল।

এদিকে বরুণ-গৃহে ঘোর সিন্ধু-নীর
আজ্ঞা পেয়ে দশ দিকে আজি প্রবাহিত;
উত্তাল-তরঙ্গ-বাহু প্রসারিয়া বীর
সিন্ধু আজ কূলে কূলে যেন উপনীত,
দানব দলন-বার্তা করিতে প্রচার।
বায়ু সঙ্গে মহারঙ্গে হয় আগুসার।

এরূপে বিহ্বল দেব, হেন কালে দেখি,—
ও কি জ্যোতি, নিরুপম, প্রচণ্ড, করাল।
চকিত অমরগণ সে জ্যোতি নিরখি।
আলোকে ভুবন ভরি শোভে দীপ্তি জাল।
পুণ্য-ভাতি দেখে' চিত্ত পাইছে আশ্বাস;
তবু পাশে যেতে প্রাণে উপজে সন্ত্রাস।

---

* আবর্ত ও পুষ্কর, দেবরাজ ইন্দ্রের কর্মে নিযুক্ত দুই প্রধান মেঘ।

দীপ্তি দেখি দেবগণ ডুবিল বিস্ময়ে।
বলে, "বহ্নি! যাও দেখি, এস নিরূপিয়া।"—
অগ্রসর বৈশ্বানর। জিজ্ঞাসে সভয়ে,
"কে, দেব, এ দীপ্তি-বাসী?"—দিক্ কাঁপাইয়া
গম্ভীর নিনাদে প্রশ্ন সে তেজে নিঃসরে,—
"কে তুমি, অমর? পূর্বে কহ তা আমারে।"

অগ্নি বলে, "আমি অগ্নি, আমি বৈশ্বানর,
সর্বব্যাপী, সর্বভুক্।"—"কি শক্তি তোমার?"
"কি শক্তি? শুষিতে পারি নিমেষে সাগর।
দেখিলে রসনা মোর কাঁপে ত্রিসংসার।
কটাক্ষে নক্ষত্রপাত। বিদ্যুতে বিহরি,
সাগর তরঙ্গে আমি সুখে নৃত্য করি।"

"হে অগ্নি! হে বৈশ্বানর!" বলে তেজোরাশি,
"হে অমর মহাতেজা! এই ক্ষুদ্র তৃণে,
ভস্ম কর।" শুনে বহ্নি বদন বিকাশি,
ধক্ ধক্ লোল জিহ্বা উড়ায়ে গগনে,
ধরে তৃণে। তৃণ দেহ না হয় দহন।
সংহরে রসনা বহ্নি বিষণ্ণ বদন।

"সে কি, বহ্নি? সর্বভুক্ তুমি না জগতে?
যাও ফিরে। ডেকে দেও আর কোন দেবে।"—
অভিমানে চলে বহ্নি ডাকিতে মারুতে।
ধায় বায়ু। কম্পান্বিত ভূতল ত্রিদিবে।
গম্ গম্ পদাঘাতে ভগ্ন ভূপঞ্জর;
আকুল উত্তাল সিন্ধু; দুলিছে ভূধর।

"কে অমর ঘোর বেগে এস হুহুঙ্কারে?"—
"আমি বায়ু, মাতরিশ্বা; আমি সদাগতি।"—
"কি শক্তি?"— "ব্রহ্মাণ্ড আমি চূর্ণিবারে পারি।
ছিঁড়ি হিমাদ্রির মাথা, তটিনীর গতি
রোধ করি। পদাঘাতে তুলিয়ে সাগরে,
নিমেষে ভাসাতে পারি লক্ষ লক্ষ নরে।"

"হে বায়ু! হে মাতরিশ্বা, হে দেব দুর্জয়!
উড়াও এ তৃণে।"—বায়ু গর্জি ঘন ঘন,
তাল ঠুকি গিরি-পৃষ্ঠে, হইয়া নির্ভয়,
আক্রমিলা তৃণ-দেহ। বৃথা আক্রমণ!
কেশ মাত্র নাহি চলে! বিহীন শকতি,
বিস্ময়ে লজ্জায় ধীরে ফিরে সদাগতি।

আসিল বরুণ এবে তরঙ্গে চড়িয়া।
হুহু রবে ধায় জল পর্বত সমান।—
"দাঁড়াও! কে তুমি, দেব, আসিছ ধাইয়া?"—
"আমি হে প্রচেতা, পাশী, জ্ঞান দীপ্তিমান্!"—
"কি শক্তি?"—"ধরণী আমি ভাসাইতে পারি,
লক্ষ গৃহ, লক্ষ জীব, লক্ষ নরনারী।"

"হে প্রচেতঃ! হে বরুণ! হে তরঙ্গ-পতি!
ভাসাও এ তৃণে।"—পাশী ধাইলা গর্জিয়া।—
"থাম থাম! বুঝিয়াছি! রোধ কর গতি।
দেখ, তৃণ কেশমাত্র না যায় ভাসিয়া।"—
এ কি! ভাবি অপমানে তরঙ্গ সংহারি,
ফিরিলা প্রচেতা। সঙ্গে ধীর বহে বারি।

অবশেষে কাল দণ্ড ধরি ঘোর করে,
মহিষে দিলেন বার দেব ধর্মরাজ।—
"কে তুমি?"—"কে আমি, তাহা জিজ্ঞাস সংসারে!
আমি কাল দণ্ডধর।"—"তোমার কি কাজ?"—
"সময় দেখিলে জীবে লৌহ-করে ধরি
দেখিতে দেখিতে আমি অদর্শন করি।

নর রাজ্যে হাহাকার মোর পদার্পণে।
ছাড়ায় আমার দণ্ড, নহে সাধ্য কার।
পাপীর নরক-শাস্তি আমার ভবনে।
দোর্দণ্ড প্রতাপে মোর বিষণ্ণ সংসার।
কারু আশা চূর্ণ করি; অমৃতে কাহার
বিষ ঢালি; গৃহ করি শ্মশান-আকার।"—

"হে বীর! হে দণ্ডধর! ওই দণ্ডঘাতে
ভাঙ্গ তৃণে।"—মহাকাল রুষি দণ্ড হানে।
পড়ে দণ্ড তৃণ-দেহে। ভাঙ্গিবে কি? তাতে
রেখা মাত্র নাহি সরে! কাল, অপমানে
কালী হ'য়ে, পুন চ'ড়ে মহিষ বাহনে,
ফিরে যায়। হাসে দেব জ্যোতিঃ-আবরণে।

শেষে ঐরাবতে বার দিলা সুরপতি।
অঙ্কুশ প্রহারে রুষি ঘর্ঘরে কুঞ্জর।
পুষ্কর আবর্ত আদি চলিলা সংহতি।
সুমন্দ্র ধ্বনিতে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-কন্দর।
বজ্রের উজ্জ্বল দীপ্তি গগনে গগনে;
তাড়িত-পতাকা পৃষ্ঠে উড়িছে পবনে।—

"কে তুমি, হে দেব-শ্রেষ্ঠ ?"—"আমি সুরেশ্বর,
আজি বজ্রী।"—"কি শকতি ?"—"এই যে অশনি
করে ধরি, যদি হানি, চূর্ণিত ভূধর।
যাহে পড়ে, তাই দগ্ধ হইবে তখনি।
বৃত্র হত এই বজ্রে। এ বজ্র-আলোকে
নিভাই সকল আভা, সংহারি পলকে।"—

"হে বজ্রি, হে দেবরাজ! এ তৃণ-শরীরে
হান বজ্র।"—বজ্র বাণ হানে পুরন্দর।
গগন ফাটিয়া যেন যায় শত চিরে!
বাজায় সমর-ডঙ্কা আবর্ত পুষ্কর।
ঘোর দীপ্তি দেখে' চক্ষু মূদে ত্রিসংসার;
কঠোর নিনাদে কর্ণ বধির সবার।

কিন্তু সেই ক্ষুদ্র তৃণ নহে বিচলিত!—
"কি হে বজ্রি!"—অভিমানে ম্লান সুরেশ্বর,
ফিরিলা দেবতাগণ যেখানে মিলিত।
মন্ত্রণা করিলা সবে, "চল, অতঃপর
স্তুতি করি। মহাজ্যোতি দেখি না এমন!
দেবের অগম্য এ কে, বলে কোন্ জন ?"

আসি দেখে দেবগণ, জ্যোতি অন্তর্হিত!
তার স্থানে এ কি দৃশ্য মোহন সুন্দর!
অপূর্ব ললনা এক তথা বিরাজিত।
প্রসন্ন নির্মল মুখে স্মিত মনোহর।
লাবণ্যে জড়িত পুণ্য। প্রফুল্ল আননে
আনন্দ তরঙ্গ ধারা বহে ক্ষণে ক্ষণে।

বিশাল নয়ন যুগে প্রীতি পবিত্রতা
একত্র মিশ্রিত যেন! সে দৃষ্টি সরল,
হাব নাই ভাব নাই; সহজ নম্রতা।
সুন্দর-আনন-জ্যোতি সুস্নিগ্ধ শীতল।
আলোক মণ্ডল যেন ঘেরে সে মাধুরী;
রূপের বিভায় পূর্ণ বৈজয়ন্তপুরী।

কর যুড়ি জানু পাতি বসি সুরেশ্বর
স্তুতি আরম্ভিলা।—"বল, কে তুমি, ললনে ?"
বলে বালা,—"স্তুতি কেন কর, পুরন্দর ?
'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে আমি বিদিতা ভুবনে।
অবোধে সুমতি দান শুধু মোর কাজ।
বলি, শুন। অবধান কর, দেবরাজ!

যে অপূর্ব জ্যোতি-দেহ দেখেছ এখানে,
ব্রহ্মদীপ্তি ব'লে জেন। বৃত্রবধ করি,
আপন গৌরব সবে আপনি বাখানে,
অহঙ্কারে,—দেখি দেব দীপ্তিরূপ ধরি
প্রকাশিলা দর্পহারী, দর্প চূর্ণিবারে ;
কার বলে বলী, তাহা দেখাতে সবারে।

হে বজ্রি! বজ্রের তব কি থাকে শকতি,
শক্তিদাতা শক্তি যদি করেন সংহার ?
বুঝিলে ত! আসি তবে। আর সুরপতি
প'ড়ো না এমন ভ্রমে। জানিও যাহার
যাহা কিছু শক্তি, সব তাঁরি অনুগ্রহ।
কে থাকে, কে রাখে, তিনি করিলে নিগ্রহ ?

আসি তবে, আসি তবে!"—বলিতে বলিতে
ওই মিলাইয়া গেল সে রূপ-মাধুরী!
অবাক্ অমর-কুল ভাবিতে ভাবিতে
ফিরিল বিনীত ভাবে বৈজয়ন্তপুরী।

কবি বলে,—ব্রহ্মবিদ্যে! ব'লে যাও মোরে,
আমি তবে কোন্ কীট বিপুল সংসারে!

উন্মাদিনী

[পাগলিনী রাজকন্যা বা জীবাত্মার ঈশ্বরান্বেষণ নামে প্রথম প্রকাশিত]

স্বপনে দেখিনু, যেন ঘোর সিন্ধুনীরে
তরি আরোহণে ভাসি। নিশীথ সমীরে
নারীর কোমল কণ্ঠে রোদনের ধ্বনি
ব'হে আসে। যেন কর্ণে সেই রব শুনি
দাঁড়াইনু তরি পৃষ্ঠে। চারিদিকে চাই,
আঁধারে নিমগ্ন ধরা, না দেখিতে পাই
জলস্থল। শুধু সেই হৃদয়-বিদারী
করুণ বিলাপ-ধ্বনি, চৌদিকে সঞ্চারি,
নিশার নিঃশ্বাস দেয় শোকে মাখাইয়া।

উত্তরিনু তরি হ'তে। কূলে দাঁড়াইয়া
চেয়ে দেখি, কিছু দূরে জ্বলিছে অনল,
ধিকি ধিকি। যাই,—কিন্তু হৃদয় চঞ্চল
সংশয়ে বিস্ময়ে ভয়ে। নিঃশব্দ চরণে
কিছু দূর গিয়া যাহা দেখিনু নয়নে
অপরূপ,—"এ কি দৃশ্য!" ভাবিয়া বিস্ময়ে
রহিলাম ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হ'য়ে।
এ কি দৃশ্য! এ কে বালা রূপের আভায়
যেন আলো করে দিক্? তরুবর গায়
রাখি পৃষ্ঠ, দুই হস্ত রাখিয়া হৃদয়ে,
এলোকেশী, ভাবে যেন চিত্রার্পিতা হ'য়ে।
এ কি রূপ-মাধুরী মরি! কাহার নন্দিনী?
কেন হেথা এ বিজনে কাঁদে একাকিনী?
যাই কাছে, মনে ভাবি; দেবযোনি ভ্রমে
কাঁপে প্রাণ। পদদ্বয় উঠে না সম্ভ্রমে।
হেন কালে পুনরায় সেই আর্ত ধ্বনি!
হাহাকারে পূর্ণ দিক্, কম্পিতা ধরণী!
বলে বালা,—"কোথা আছ, মোর প্রাণেশ্বর!
দেখা দাও! এই ঘোর অপার সাগর,
এ ঘোর আঁধার, নাথ! নেত্র আবরিয়া
রাখিয়াছে। প্রাণকান্ত! কোথা লুকাইয়া
রহিলে হে এর মাঝে? দেখি, দেখি, দেখি,
আবার মিলাও শূন্যে! আঁধারে নিরখি,
দেখি দেখি আলো যেন!—আবার আঁধার!
এ কি খেলা খেল, হৃদি-বল্লভ আমার?
গোপনে বারেক দেখা দিয়া লুকাইলে।
উঠে ধরিবারে ধাই ভূধরে, সলিলে,
মহারণ্যে, লোকালয়ে, বিজন প্রান্তরে;
কোথা প্রাণেশ্বর! ব'লে কাঁদি উচ্চস্বরে।
সমীপে অপার সিন্ধু, চৌদিকে আঁধার,
কে দিবে আমারে নাথ! উদ্দেশ তোমার?
কি হবে আমার, হায়! আমি ভিখারিণী
যাঁর তরে, কোথা তিনি, বল গো যামিনি!
বল্ না সাগর! ওরে দক্ষিণ মলয়,
তুই কি পারিস্ দিতে তাঁর পরিচয়?
অগ্নি, তুমি থাকি থাকি জ্বলিছ নিভিছ,
তুমি বুঝি তাঁরে জানি আনন্দে নাচিছ?
এই যে—এই যে,—হা হা! পেয়েছি, পেয়েছি,

প্রাণ সখা ! এইবার ধরেছি, ধরেছি !”
বলি বালা শূন্যে করে গাঢ় আলিঙ্গন ।
আবার কাঁদিয়া বলে,—“কোথা প্রাণধন !”

দেখিতে দেখিতে অশ্রু ঝরিল আমার ।
বুঝিলাম, উন্মাদিনী । নিকটে তাহার
গিয়া দেখি, পুনরায় স্তম্ভিতের প্রায়
দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে । জিজ্ঞাসি, “সুন্দরি !
কে তুমি একাকী হেথা বন আলো করি ?
কারে চাও ? কার তরে কাঁদ লো ললনে ?
কার তরে ভিখারিণী এ নব যৌবনে ?”
শূন্য শূন্য দৃষ্টে বালা চাহি মুখ পানে,
বলে,—“তুমি কে হে, বন্ধু ? প্রাণ-সখা সনে
হয়েছে কি পরিচয় ?”—“শুন, বরাননে !
কে তোমার প্রাণ-সখা ?”—অমনি কাঁদিল ;
অমনি বিশাল আঁখি শোকেতে মুদিল ।
“ও রে, আমি কিসে দিব তাঁর পরিচয় ?
জানি না ত নাম ধাম । কেবল হৃদয়
চায় তাঁরে, এই জানি !”—“শুন লো সরলে !
কোথা তিনি যাঁর তরে ভাস নেত্রজলে ?”—
“ওই যে—ওই যে । হা হা ! এস, প্রাণেশ্বর !
হাসিতেছ কি ভাবিয়া ?—কে বলে দুস্তর,
সিন্ধু, তুই ? নিশা, তুই কে বলে আঁধার ?—
ঐ দেখ, রূপ-রাশি করিয়া বিস্তার
হৃদয়-বল্লভ মোর আসি উতরিলা !”
বলিয়া, আবার বালা হৃদয়ে চাপিলা ।
শূন্য দৃষ্টি পুনঃ স্থির পড়িল ধরায় ।
তরু পৃষ্ঠে রাখি পৃষ্ঠ, পুত্তলীর প্রায় ।
ভাবিলাম, এ কি কাণ্ড ! নাহি পরিচয়,
না জেনে কাহারে বালা সঁপিল হৃদয় ?
শূন্য সনে প্রেমালাপ, শূন্যে আলিঙ্গন,
শূন্যে হারাইয়া, শূন্যে করিছে ক্রন্দন !
ভাবিতেছি ; পুনরায় আঁখি-ইন্দীবর
মেলি বালা বলে,—“ওহে পরম সুন্দর !
ওহে প্রাণারাম ! দাসী ব্যাকুল-অন্তর
পারে না কাঁদিতে আর । ভূধরে কাননে
পারে না ভ্রমিতে আর দুর্বল চরণে ।
দেখা দাও, ধরা দাও, দাও পরিচয়,

হৃদয়-বল্লভ। আমি জুড়াই হৃদয়।”
হায় রে। সে আর্তনাদ শুনে কি পরাণে
থাকে কিছু। ভাবিলাম, যাই বন পানে ;
খুঁজে আনি কোথা আছে প্রাণেশ্বর তার ;
এ হেন যাতনা প্রাণে সহে না যে আর।
বলিলাম, “হে ললনে। রোদন সম্বর ’;
ব’লে দাও, কোন্ পথে তব প্রাণেশ্বর
গিয়াছেন। যাই আমি ; অন্বেষি তাঁহারে,
হৃদয়ের ধন আনি দিব লো তোমারে।”—
“গো সে কি ধরা দেবে ? ওইসিন্ধু পারে
চ. গেল। ওই—ওই—বিশাল আঁধারে।
ওই লে, ওই স্থলে, ওই ঘোর বনে,
এই কাছে। ওই দূরে। ধর গো যতনে,
ধর ধর। আমি ধরি। হা হা ধরিয়াছি।
এবার কি হবে, নাথ ? প্রাণে পূরিয়াছি।”
বলিয়া উন্মাদ বালা হইল আবার ;
শূন্যে আলিঙ্গন করি আনন্দ অপার।
আবার স্তিমিত আঁখি ; আবার নিশ্চল,
দুই গণ্ডে দুটি ধারা বহিল কেবল।

ভাবিলাম, কি বিপত্তি। ঘোর উন্মাদিনী।
চক্ষু খুলে বলে বালা,—“এমন করিয়া
কাঁদাতে কি হয়, প্রভু ? এরূপে আনিয়া
অনন্ত সাগর তীরে, ফেলিয়া আঁধারে,
লুকাতে কি আছে, নাথ ? ভাবি ভুলিবারে,
ভুলিতে দিলে না। মোরে ক’রে পাগলিনী,
কাঁদালে। তোমার তরে আমি ভিখারিণী।”
বলিলাম, “শুন শুভে, যদি নাম তাঁর
নাহি জান, বল দেখি, কি রূপ আকার,
কি প্রকৃতি ?” বলে বালা,—“হায় রে, কেমনে
বর্ণিব সে রূপ আমি ? দেখিনি নয়নে
হেন শোভা। কি উজ্জ্বল, কেমন পবিত্র,
কেমন মধুর স্নিগ্ধ অপরূপ চিত্র,
সুপ্রসন্ন সদানন্দ প্রেমিক সুজন,
প্রীতি পবিত্রতা পূর্ণ সুন্দর বদন।
স্মরণে উন্মত্ত চিত্ত ; পিপাসিত প্রাণ
সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য হ্রদে করিবারে স্নান।
পদার্পণে সুবাতাস বহে চারি ধারে ;

পলায় আঁধার যেন দেখিলে তাঁহারে।
শোন, পান্থ, প্রাণকান্ত যিনি রে আমার,
রূপে লোকাতীত, গুণে সর্বগুণধার।
কোথা তিনি, কি বলিব ? যেন রে মিশায়ে
চরাচরে। যেন দেখি, আছেন লুকায়ে
জলে, স্থলে, ওই শূন্যে, গভীর আঁধারে,
সিন্ধু নীরে !—ওই ! ওই !—ত্যজো না আমারে,
যেও না ফেলিয়া একা ! ধরি—ধরি—ধরি !"
বলিয়া সাগর পানে ছুটিল সুন্দরী।
ত্রস্তে ব্যস্তে নিবারিতে যাইব যেমন,
অমনি ভাঙ্গিল নিদ্রা ; গেল সে স্বপন।

জেগে ভাবি, জীবাত্মার গতি এ সংসারে
এইরূপ। এইরূপ অজ্ঞান আঁধারে
চিরমগ্ন। এইরূপ আদি অন্ত তার
নীহারে জড়িত। জীব ভবে এ প্রকার
সিন্ধু-কূলে, সে অদৃশ্য জগতের পাশে,
দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে যে ধনের আশে,
কোথা তিনি ? জ্ঞান বুদ্ধি সব পরাহত,
সে চিন্তায় ! তবু প্রাণ চায় অবিরত
সেই ধনে। তবু চক্ষু সদা ভাল বাসে
থাকিতে অদৃশ্য দেশে। তবু সিন্ধু পাশে
জ্বালিয়া বিশ্বাস বহ্নি করে জাগরণ
সদা জীব। নীচ-দৃষ্টি বিষয়ী যে জন,
দেখে' সে বিস্ময়ে ডোবে ! বাহু প্রসারিয়া,
দেখে সে, কাঁদিছে লোক শূন্যে আলিঙ্গিয়া।
দেখে সে, শূন্যের সনে করিয়া প্রণয়,
শূন্যে সম্ভাষিছে লোক। তাহার হৃদয়
জানে কি রে শূন্য পূর্ণ হয় যে কেমনে ?
সে কি বুঝে, কি মাধুরী দেখে' ভক্তজনে
কভু হাসে, কভু ভাসে নয়ন আসারে,
কভু বা বিচ্ছেদে প্রাণ পূর্ণ হাহাকারে ?

কবি বলে,—ওহে দেব ! ওহে প্রাণরাম !
প্রাণবন্ধু ! প্রাণ-সখা ! নিরাকার নাম
কে দিয়াছে ? দেখি না ত হেন নিরাকার,
জীবের হৃদয় কাড়া নিত্য কর্ম যার !
তুমি নাকি রস ? তৃপ্তি দাও আস্বাদনে ?
তুমি নাকি রূপ রাশি ? প্রেম আলিঙ্গনে

বাঁধা নাকি পড় তুমি ? ওহে নিরঞ্জন,
তুমি নাকি পাপ-দগ্ধ চক্ষের অঞ্জন ?
প্রাণের চন্দন তুমি, দেহের চন্দ্রিকা,
সংসার-বিষাক্ত-নেত্রে অমৃত-তুলিকা,
কর্ণের সুস্বর তুমি, নাসার সুঘ্রাণ,
অবসন্ন দেহ মনে তুমি নাকি প্রাণ ?
তাই বটে। তাই হও, প্রেমিক-বৎসল !
তাই হও,—এই ভিক্ষা কবির কেবল।

পুষ্পমালা সমাপ্ত

হিমাদ্রি-কুসুম

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম.এ.
প্রণীত

কলিকাতা
১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ;
১৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ব্রাহ্মাব্দ ৫৭ । খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৭ ।

উৎসর্গ-পত্র

হেম !

—প্রিয় পুত্রি ! আমি পাহাড়ে যখনি
যাই,—"বাবা ! পাতা ফুল আনিতে ভুল না"
বলি অনুরোধ কর । কুসুম এমনি
ভালবাস, ফুল যদি দেয় কোন জনা,
যেন সে অমূল্য নিধি, তারে বাঁচাইতে
কি প্রয়াস । হিমাদ্রিতে আ সয়া এবার
তুলেছি চারিটী ফুল ; এ ফুল তুলিতে
ঘুরেছি অনেক বন ; মনেতে আমার
এই ছিল, হেন ফুল করিব চয়ন
যাহা পেলে খুসী হবে, যাহার সুঘ্রাণ
না শুকাবে, না ফুরাবে ; সে আশা পূরণ
হলো কি না নাহি জানি । যা হোক এ দান
লও বৎসে ! ফুল কটী হৃদয়েতে ধরি,
প্রেম-শান্তি-গন্ধ তুমি পাবে আশা করি ।

তোমার পিতা ।

বিজ্ঞাপন

বিগত গ্রীষ্মের শেষভাগে আমরা চারিজন বন্ধু হিমালয়শিখরে একমাস কাল বাস করি। কার্য্যের ব্যস্ততা, ও সহরের উত্তেজনা হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়া, নির্জ্জনে ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে আত্ম-সমর্পণ করাই আমাদের

হিমালয়ে যাইবার উদ্দেশ্য ছিল। সেখানে অবস্থানকালে আমরা অনন্য-কর্ম্মা হইয়া দিনের অধিকাংশ ভাগ উপাসনা, আত্মচিন্তা, প্রকৃতি-চিন্তা, পাঠ ও সদালাপে যাপন করিতাম। এই একমাস কাল এইভাবে যাপন করিয়া আমরা অনেক ফল লাভ করিয়াছি। তাহার একটী ফল এই আকারে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। প্রতিদিন উপাসনা ও চিন্তা দ্বারা প্রাণে যে সকল ভাব পাইতাম, তাহা একখানি পুস্তকে লিখিয়া রাখিতাম; তাহারই কয়েকটী ভাব সেই সময়েই কবিতাতে নিবদ্ধ করিয়াছি।

পাঠক-পাঠিকা একটু নিমগ্নচিত্তে পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে সকল কবিতারই মূলে এক একটী বিশেষ সত্য নিহিত আছে। তদ্ব্যতীত আরও অনেক অবান্তর লক্ষ্য আছে। সে সমুদায় চিন্তাশীল পাঠক আপনিই নির্ধারণ করিতে পারিবেন সুতরাং সেগুলির উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। 'দীক্ষা' নামক কবিতাতে প্রধান প্রধান কয়েকটী ঘটনা পরম-ভক্তি-ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের কয়েকটী ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণিত। উক্ত মহাত্মার জীবনে দেখা যায় যে নক্ষত্র-খচিত আকাশের বষয় নিমগ্নচিত্তে আলোচনা করিয়াই তাঁহার প্রাণে প্রথমে ঈশ্বর-চিন্তার উদয় হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৭।৫৮ সালে তিনি যখন হিমালয়শিখরে বাস করেন, তখন একদিন একটী নির্ঝরিণীর গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এই ভাবের উদয় হইল, যে এই নির্ঝরিণী যেমন জীবের কল্যাণ-সাধনের জন্য নামিয়া যাইতেছে, আমার প্রীতিও কি সেইরূপ নামিয়া যাইবে না? এই চিন্তা হৃদয়ে প্রবল হইয়া তাঁহাকে আর গিরি-শৃঙ্গে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দিল না; তিনি আবার উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া অবতরণ করিলেন। উক্ত দুইটী ভাব আমি এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছি। তিনি তাঁহার অমৃত-নিস্যন্দিনী ব্যাখ্যান-মালাতে একস্থানে বলিয়াছেন;—"প্রীতি ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার যখন সংসারে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কি শোভা কি জ্যোতি!" এই মহাসত্যই আমি 'দীক্ষা' নামক গ্রন্থে যথাকথঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু নিজের আধ্যাত্মিক হীনাবস্থা-নিবন্ধন পারিয়া উঠি নাই। মানবের প্রীতি আমাদিগকে অনেক সময়ে সত্য-স্বরূপে লইয়া যায়, তাঁহাকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়া সেই প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া আবার বসুধাকে ধৌত করিতে থাকে, এই সত্যটী প্রদর্শন করাই উক্ত গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। এই জন্যই ভগিনীর প্রীতিকে ভ্রাতার নবজীবনলাভের সেতুস্বরূপ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভাই-ভগিনীর প্রগাঢ় প্রীতি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হয়ত এ দেশের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইবে। চিন্তাশীল পাঠক চিন্তা করিলেই ইহার স্বাভাবিকতা অনুভব করিতে পারিবেন। ইহার আর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, যাহা এখন প্রকাশ করা গেল না। এতদ্দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

৮ই মাঘ ১২৯৭
কলিকাতা

শ্রীশিঃ—

হিমাদ্রি-কুসুম

দীক্ষা

ভূমিকা

ছিল বঙ্গে এক ধনীর সন্তান ;
সহরের দূরে গ্রামে তার স্থান ।
নির্জন পল্লীতে মনোসুখে বসে ;
সম্পদের সুখ ভুঞ্জে সে হরষে ।
সুপ্রশস্ত-চিত্ত, অতি সদাশয়,
পর-দুখে দুখী কোমল-হৃদয়,
উচ্চ নীচে তার সমান ব্যাভার,
দীন বড় দয়া । সবে সদাচার,
সদালাপে মতি, জ্ঞান-লাভে রুচি,
নিজ-পত্নী-ব্রত, অন্তরেতে শুচি,
গুণিগণে মানে, তোষে ধন দানে,
কাব্যামোদে শ্রেষ্ঠ সুখ বলি জানে ;
কাব্যরসে যত সুরসিক জন,
সদা তার সঙ্গী ; আনন্দে মগন
থাকে সদা যুবা শাস্ত্র-আলাপনে ;
শ্রান্তি নাহি সেই রস আস্বাদনে ;
গুণিগণ সনে বসিয়া বসিয়া,
বহু শাস্ত্র-মর্ম লইল শিখিয়া ;
যদি পায় কোন শিক্ষিত সুজন,
প্রিয় বন্ধু ভাবি করে আলিঙ্গন ;
শাস্ত্রার্থ-বিচার করে প্রাণ খুলি,
উচ্চ নীচ ভাব যায় তবে ভুলি ;
হাসি-ভরা মুখ, প্রাণ-ভরা সুখ,
পরের কল্যাণে কভু না বিমুখ ;
যা কিছু দেশের কল্যাণ-সাধনে
করে কোথা কেহ, আনন্দিত মনে
নিজ হতে অর্থ পাঠায় তাহারে ;
আর ব্যয় নিজ গণনা না করে ;
পর দুঃখে কাঁদে ; নারে ফিরাইতে
দ্বার হতে অর্থী শকতি থাকিতে ;
এরূপে সে সাধু যুবা সদাশয়
বিমল আনন্দে যাপিত সময় ।
দোষ মধ্যে দেখি ভালবাসে যারে,
সমগ্র হৃদয় সঁপে দেয় তারে ।
সন্দেহ বির্তক তার মনে স্থান,
কভু নাহি পায় । কত সাবধান
করেছে স্বজনে ; বলেছে সংসার
বিঘ্ন-ময় স্থান ; মুখে মধু যার
হয়ত তাহারি হৃদে হলাহল,
ফুলবনে ফণী অমৃতে গরল !
হেথা স্বার্থ আর ইন্দ্রিয়-পিপাসা
করিছে সংগ্রাম ; নাহি হেথা আশা
সুখেতে বসিবে ; সতত আপনা,
বাঁচায়ে চলিতে পারিবে যে জনা,
সেই সে বাঁচিবে ; যে করে বিশ্বাস
সহজে অপরে তারি সর্বনাশ ।
এইরূপ কত সংশয়ের কথা,
প্রতিদিন যুবা শুনে যথা তথা ।
কিন্তু বিধি তারে এমনি গড়িল,
কথা কানে তার বৃথাই পড়িল ।
যারে ভালবাসে তারে দেয় প্রাণ ;
হয় বশীভূত নারীর সমান ।
ধন দিয়ে পোষে, প্রাণ দিয়ে তোষে,
শত অপরাধে কভু নাহি রোষে ।
কিন্তু রে ! মানব হেন দুরাচার
আছে দেখি, যারা এই সাধুতার
পাইয়া সুযোগ আত্ম-কাজ সারে ;
এ হেন পরাণে তীক্ষ্ণ ছুরী মারে ।
কোলে রাখি মাথা যে শিশু ঘুমায়,
দিতে পারে ফাঁসী তাহারি গলায় !
সরল বিশ্বাসে যে আছে জড়ায়ে,
মারিবারে পারে তাহারে পোড়ায়ে ।

যথা গ্রীষ্ম-দিনে গোখুরার ভয়,
নরকুল ত্রাসে কভু স্থির নয়,
এই সব জীব নরের কলঙ্ক,
যদি কাছে থাকে সতত আতঙ্ক।
সদাশয় যুবা সরল পরাণে
এই সব তত্ত্ব কিছু নাহি জানে।
ভাল বেসে ঠকে, ঠ'কে ভাল বাসে,
প্রেমের খাতিরে পড়ে সর্বনাশে।
বন্ধু সাজে সাজি এল কত জন,
কত শত মুদ্রা করিল হরণ।
হইলে প্রণয় জানে না সংশয়,
অপরের ঋণ নিজ শিরে লয়;
স্বকার্য সাধিয়া নাহি দেয় দেখা,
কে করে আদায় নাহি লেখা জোখা।
গেলে রাজদ্বারে খেলিয়া চাতুরী
ঠকাইয়া যায় করি বাহাদুরি।
পরঋণে ঋণী ধনে প্রাণে সারা
নিজদশা ভাবি চক্ষে বহে ধারা।
স্বভাবেতে মানী, তাই মনোদুখে
অন্দরেতে সদা থাকে ম্লান-মুখে!
বাহিরে না আসে, সমাজে না মিশে,
জর্জর অন্তরে অপমান-বিষে।
সঙ্গী তথা তার বিধবা ভগিনী,
বয়সে কনিষ্ঠা নাম বিনোদিনী।
দাদার সমান প্রেমিক সে প্রাণ,
ম্লান-মুখে হেরে তারো মুখ ম্লান।
নড়ে চড়ে আর কাছে কাছে থাকে;
এ কথা সে কথা ভুলায় তাহাকে।
আর ছিল পত্নী। জুড়াবার স্থান
লোকে বলে জায়া। সে কোমল প্রাণ
পাইয়ে আঘাত কপট সংসারে,
সব ভালবাসা সঁপিল তাহারে।
ভাঙ্গে যদি বৃক্ষে লতিকা তাহার,
কাছে যাহা পায় ধরে যে প্রকার।
সে রূপ সে হৃদি পুন জড়াইল,
রাখিয়া বিশ্বাস জুড়াবে ভাবিল।
কিন্তু রে! সে নারী করাল ভুজঙ্গী
ঈর্ষা কুমন্ত্রণা সদা তার সঙ্গী।
ধনের পিপাসা অসীম তাহার,
প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা-ভক্তি, সদাচার,
সকলি তাহার ধনের অধীন;
ধনাভাবে সেই হৃদয় কঠিন।
পেয়ে দুঃসময় বাক্যবাণ হানে;
উঠিতে বসিতে লজ্জা দেয় প্রাণে।
বলে—"কাপুরুষ! পুরুষ-অধম!
ঘরে বসে থাক কেন নারী-সম?
খোয়ায়েছ যদি এ হেন বিভব
মাটী কাট গিয়ে; বেশ অভিনব
দেখুক সকলে; দিক্ টিট্‌কারী,
সেই সমুচিত সাজা যে তোমারি।"
বাক্য-বিষে দহে, প্রাণে ব্যথা পায়;
জানে না যুবক পলাবে কোথায়।
যদি ক্রোধ করে দাবানল জ্বলে
সে ঘোর রসনা উগরে গরলে।
গুমে গুমে পোড়ে, দমে দমে ফাটে;
দারুণ সন্তাপে দিন তার কাটে।
অবশেষে তারে একাকী ফেলিয়া,
কুল-কলঙ্কিনী গেল পলাইয়া।
সে হেন সম্ভ্রম পঙ্কে ডুবাইল;
শাদা প্রাণে তার গরল ঢালিল।
কি যাতনা যে তার কে বর্ণিতে পারে!
একান্তেতে শুধু ভাসে নেত্রাসারে।
এত যে বিশ্বাস ছিল নর-কুলে,
সব গেল; ঘৃণা আসি তার স্থলে
ঢালিল গরল; মানব সংসারে
শ্বাপদ-সঙ্কুল বন সম হেরে।

একি হলো প্রাণে বিষ কে ঢালিল তার রে।
সাধের সংসার তার হলো কারাগার রে!
বিরস, বিষয়-কাজে আর মন বসে না ;
যে হাসিত দিবানিশি আর সেতো হাসে না!
স্বজনের মিষ্ট-ভাষা বিষ-সম লাগিছে ;
উদাস উদাস মন কোন দেশে ভাগিছে।
দশ জনে যথা বসে তার ধারে যায় না ;
কি যেন কি ভাবে ডাক শুনিবারে পায় না।
অন্ধকারে থাকে ভাল ; কারে যেন ডরিছে ;
কি যেন বলিবে বলে ভগিনীরে ধরিছে ;
বলে না, মুখের কথা মুখে যেন ফোটে না,
যদি বা ফুটিতে চায় ভাষা যেন জোটে না।
বিনোদিনী কেঁদে সারা ভ্রাতৃপাশে বসিয়া,
মা নাই ছুটিয়া যায় আনে তাঁরে ডাকিয়া।
শৈশবে বিধবা হয়ে পিতৃ-ঘরে রয়েছে,
সে নব যৌবনে তার বহু শোক সয়েছে।
গিয়াছে সবাই ফেলে, একাকিনী সংসারে,
ভাই মাত্র বাতি তার এই ভব-আঁধারে।
তাই তো রে এ বিপদে নেত্র তার ঝরিছে।
একা পেলে অভাগিনী দুটী হাতে ধরিছে ;
বলে,—"দাদা কথা কও, তব মুখ চাহিয়া,
সংসার-মরুর মাঝে আছি সব সহিয়া।
নিদয়া নিদয় হলো মরি নাই আমি তো,
কত ভালবাসি দাদা জান সব তুমি তো।
বোন বলে মুখ তুলে দুটী কথা কও গো,
বিদরে হৃদয় যদি ম্লান-মুখে রও গো।"

ভগিনীর অশ্রুবারি মুছাইয়া দেয়
কিন্তু কোন কথা নাহি কয়!
চেয়ে থাকে মুখ-পানে, বলি—বলি—রোধে প্রাণে,
দুটী নেত্রে দুটী ধারা বয়,
ভগিনী সে অশ্রুধারা অঞ্চলে মুছায়।

দারুণ মর্মের ব্যথা ক্রমে তো জুড়ায়।
ভাঙ্গা প্রাণ পুন জোড়া লাগে।
স্মৃতির গভীর রেখা কালে নাহি যায় দেখা,
হৃদয়ের অন্ধকার ভাগে ;
এই ত বিধির বিধি তাঁহারি কৃপায়।

সামালি উঠিল যুবা ধৈরয ধরিল
দেশে দ্বেষ হইল বিষম
থাকিব বিজন বনে, চরিব পশুর সনে
তাও ভাল! যমালয়-সম
এ গৃহে রব না বলি প্রতিজ্ঞা করিল।

যা কিছু বিষয় ছিল হইল বিক্রয়
দাস দাসী কাঁদিয়া আকুল।
পাষাণে বেঁধেছে প্রাণ ত্যজিবারে সে শ্মশান,
দেশে নাম করিতে নির্মূল;
ছাড়িতে জন্মের মত পাপ লোকালয়।

পল্লীর সকলে কাঁদে নিবারিতে নারে
ডুবিছে ত ডুবিব এবার।
বিজনে মাটীর সনে, মিশাব এ দেহমনে,
কেহ নাহি পাবে সমাচার;
কেহ না ফেলিবে অশ্রু এ পাপ সংসারে।

যাইতে ঝুকেছে মন; একটী ভাবনা
জাগে শুধু সতত হৃদয়ে;
ঘরে বিনোদিনী আছে, তারে রাখে কার কাছে
কে দেখিবে আপনার হয়ে;
তার কথা যত ভাবে বাড়য়ে যাতনা।

বিশ্বাস থাকিলে তারে করিত সঙ্গিনী,
কিন্তু নরে সে বিশ্বাস নাই।
হোক্ না সোদরা, মনে কি যে আছে সংগোপনে
কেবা জানে! জানেন গোঁসাই।
কে জানে ভগিনী নয় কাল-ভুজঙ্গিনী!

দারুণ সংশয়ে তারে লইতে না চায়
অভাগিনী আকুল কাঁদিয়া।
নিজের কি গতি হবে একবার নাহি ভাবে
কিন্তু দাদা যায় যে ভাসিয়া,
কোথা যাবে, কে দেখিবে, কে সেবিবে তাঁয়।

ভাই বালা পায়ে ধরে করিল মিনতি;
"দাদা মোরে ছাড়িয়ে যেও না;
লয়ে চল দাসী করে, তুমি বিনা এ সংসারে
কেহ নাই, নিদয় হও না,
তুমি না রাখিলে দাদা নাহি অন্য গতি।"

শৈশব হইতে ভাল বাসিত তাহারে,
তাই হাত ছাড়ান কঠিন।
অবশেষে সঙ্গে করি, চলে দেশ পরিহরি
প্রতিবাসী শোকেতে মলিন।
হায়! হায় রব পড়ে রহে ঘরে ঘরে।

প্রথম দল

নর-দ্বেষ

কোথা গেল ভাই বোনে? বসিল উড়িয়া
কোন্ শৃঙ্গে? কোন্ বনে? যথা শর-বন
ছাড়িয়া বিহগ দুটি যায় পলাইয়া,
যবে ক্রূর-মতি নর, দলিয়া কানন,
পাখিকুলে গুলি করে; প্রাণ বাঁচাইয়া
উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে এ বন সে বন,
বিজন অরণ্য মাঝে শেষে গিয়ে বসে,
যথায় মানব-অরি ভ্রমে নাহি পশে।

২

সেরূপ সে পাখী দুটী সোদর সোদরা,
সংসার-শ্মশান ছাড়ি ওই চলে যায়!
রোগ-শোক-পাপ-পূর্ণ দেখে বসুন্ধরা
ঘৃণাতে হেলিয়া যায়, ফিরিয়া না চায়!
কপালে যা থাকে থাক্! প্রবঞ্চনা-ভরা
সংসার-নরক! তোরে বিদায়! বিদায়!
নর-সহবাস হ'তে ভাল বন-বাস;
নর-শঙ্কা হতে শ্রেয় শ্বাপদের ত্রাস।

৩

কুসুম-কোমল প্রাণ বজ্রে বাঁধিয়াছে
ঘৃণামন্ত্রে কর্ণদ্বয় করেছে বধির!
বন্ধুতা, স্বজন-প্রেম, সব কাটিয়াছে
কঠোর প্রতিজ্ঞা-অস্ত্রে। না হয় অস্থির
নিমেষের তরে প্রাণ; শুধু ছুটিয়াছে
একি পথে; একি চিন্তা বাঁধিয়া কুটীর
ঘোর বনে, দুই জনে থাকিব তথায়
যতদিনে পাপদেহ ধূলিতে মিশায়।

৪

প্রাণ-ভয়ে করি-রাজ বন পরিহরি
ধায় যবে, লতা যদি জড়ায় চরণে,
গভীর আক্রোশে তারে খণ্ড খণ্ড করি
দূরে ফেলে ; সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনে
ছিঁড়ে ফেলি ধায় তারা, বারেক না স্মরি,
কিরূপে তাদের শোকে অনেক নয়নে
বহিতেছে অশ্রুধারা। যে প্রাণে গরল
সহজ নাই তো তাহা ঘৃণাতে পাগল।

৫

নরেন্দ্রের এই ভাব। কিন্তু বিনোদিনী
যায় যায় ফিরে চায় ; আধ-খানা প্রাণ
পিছে যেন পড়ে আছে ; সরলা কামিনী,
প্রাণ-ভরা প্রেম তার ; করি প্রেম দান
সুখ দিত সুখ পেত ; যতেক সঙ্গিনী
ছিল তার, কোথা আজ। করিছে প্রস্থান
জনমের তরে বালা জানে না কোথায়,
বিষাদ-সাগরে মন তাই ডুবে যায়।

৬

মন ডোবে তবু ধৈর্যে বাঁধিয়া হৃদয়
মিষ্ট-ভাষে তুষ্ট করে ; কত কথা দিয়া
ভুলায় সোদরে ; বলে দাদা আর নয়,
এসেছ তো সব ছাড়ি, হাসিয়া খেলিয়া
চল যাই ভাই-বোনে, হইবে যা হয় ;
ভাবিয়ো না আর বৃথা, দেখো না ফিরিয়া ;
কি হলে সুখেতে রও বল কৃপা করি ;
আমি যে প্রাণের ভাই। তোমার কিঙ্করী।

৭

দাব-দগ্ধ মৃগ যবে ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে,
অবশেষে আসি পড়ে বিশাল প্রান্তরে
তরুহীন পত্রহীন, যেখানে বাতাসে
সে করাল দীপ্তশিখা, তরু-সূত্রে ধরে
নারিবে আসিতে আর ; সে প্রান্তর-পাশে
আসি দেহে পুন যথা জীবন সঞ্চারে,
সেরূপ—"ছেড়েছি এবে পাপ লোকালয়"
ভাবিয়া নরেন্দ্র কিছু প্রফুল্ল-হৃদয়।

৮

কিন্তু যে বিষাক্ত শেল ফুটেছে সে প্রাণে,
হৃদি-যন্ত্রে সেই বিষ যেন রে সঞ্চারি
হৃদয়ে বিষাদ-কালি মাখায় সঘনে!
বিনোদ ভুলাতে চায়; কথায় তাহারি
যদিও বা হাসে কভু, দেখি পরক্ষণে
সে হাসি বিষাদে ডোবে; কুয়াসাতে বারি
ঢাকে যবে হেমন্তে, সেই বারি-পারে
খসিয়া প্রসন্ন শশী ডোবে যে প্রকারে।

৯

ভাই-বোনে রাত্রিবাস পথে পান্থ-শালে।
বিনোদিনী জাগি রহে শয্য পাতি পাশে;
আসে যদি তন্দ্রা, তবে দেখে ক্ষণকালে
কি যেন স্বপনে দেখি ডরি উঠি বসে;
কভু বা গভীর শোকে হৃদয় উথলে,
ফুটিতে না পায় রব কাঁদে নিরাশ্বাসে;
বিনোদিনী উঠে বসি ধরে আলিঙ্গিয়া,
নিজে কাঁদে আর অশ্রু দেয় মুছাইয়া।

১০

কি গভীর প্রেম তার নরেন্দ্র না জানে;
জানে না যে তারি তরে ছাড়িল সকল!
দাদার বিরস মুখ দেখিয়া পরাণে
কত যে পেয়েছে ব্যথা! নয়নের জল
কত যে ফেলেছে একা! যদি প্রাণ-দানে
দাদার প্রাণের শেল, দারুণ গরল,
দূর হয়, দিতে পারে প্রাণ বিনোদিনী;
এ প্রতিজ্ঞা করি আজ চলেছে কামিনী।

১১

আহা বয়ঃক্রম কিবা! নিজে তো নরেন
ত্রিংশ বর্ষ হয় কিনা। বিনোদিনী তার
ঢের ছোট। দুটী ভাই যোগেন সুরেন
অকালে মিলায়ে গেছে। কনিষ্ঠা সবার
বিনোদিনী। দ্বাবিংশতি বোধ হয় হেন।
প্রস্ফুটিত-ফুল-সম মুখখানি তার
মিলায়েও এত শোকে যেন না মিলায়;
বিমল লাবণ্য-রাশি সঙ্গে লয়ে যায়।

১২

বিনোদিনী মা বাপের আদরের মেয়ে ;
শৈশবে বিধবা হয়ে ছিল পিতৃঘরে ;
প্রেমিক নরেন্দ্র তারে আপনি না খেয়ে
খাওয়াইত ছেলেবেলা ; ভাবিত কি করে
দুঃখিনী ভগিনী তার সুখ শান্তি পেয়ে
ভুলিবে নিজের দশা ; সদা তারি তরে
করিত উপায় কত। আজ সেই প্রাণ,
হায় রে তাঁহারি প্রতি এত সন্দিহান।

১৩

কিরূপে এমন প্রাণে ঢালিল গরল!
ধিক্ ধিক্! ভাষা তোর নাহি কি শকতি ?
দে না শব্দ ; হেন প্রাণে যারা হলাহল
ঢালিয়াছে, ঘৃণা-বৃষ্টি তাহাদের প্রতি
করি আমি। দে গো বাণি! শত-বজ্র-বল ;
অগ্নিময় ভাষা প্রাণে জ্বেলে দে গো সতি!
পোড়াই সে বাক্যানলে নারকী অধমে,
এমন হৃদয়ে যেবা ভেঙ্গেছে মরমে।

১৪

যদিও অবলা তবু বেঁধেছে কোমর ;
ধৈর্য-বর্মে দৃঢ় করি বেঁধেছে হৃদয় ;
ডুবিবে প্রতিজ্ঞা মনে, বিপদ সাগর
দেখিয়া ডরে না তাই ; অন্ধকার-ময়
ভবিষ্যত ; এক পদ ফেলে ততঃপর
অন্যপদ কোথা ফেলে, তাহারি নিশ্চয়
কিছু নাই ; ভ্রাতৃ-সেবা লইয়াছে ব্রত,
বিনোদিনী আজ তাই ভাবিছে না তত।

১৫

সংগ্রাম-চত্বরে ঘোর কামানের মুখে
যে দাঁড়ায় ধীর স্থির যে পারে শুনিতে
মৃত্যুর সে অট্টহাস, আলিঙ্গিতে সুখে
যে পারে সে রণে মৃত্যু, এই পৃথিবীতে
সেই পায় বীর যশ ; কিন্তু আজ বুকে
যে বর্ম বাঁধিয়া বালা চলেছে ডুবিতে
বিপদ সাগরে, তার গুরুত্ব কে জানে ?
নারীর বীরত্ব-কথা কে কোথা বাখানে ?

১৬

রোগ-শোক-পাপ-দৈন্য, এ বিপত্তিভারে
ভগ্নপ্রায় নরকুল ; শক্তি পরাহত।
কিন্তু এ বিপত্তি-ভার কে বহে সংসারে ?
সে তো নারী। রব-হীন সে বীরত্ব কত,
যাহে বাঁধি প্রাণ নারী দিয়ে আপনারে
লঘু করে সেই ভার প্রেমেতে নিয়ত ?
ক্রোড়েতে মানব-জাতি, পৃষ্ঠে গুরুভার,
নির্ভরে সবল নারী চলে কি প্রকার !

১৭

নির্ভয়ে সবল আজি যায় বিনোদিনী,
'যা হয় তা হবে'। আর বৃথা ভবিষ্যত
ভাবিছে না। "কি বিপত্তি" ভাবিছে কামিনী—
"আছে হেন, সবে না যা। মরণের মত
কিছু নাই, আগে মৃত্যু আসুক ডরিনি ;
মরিব দাদার পাশে। ভ্রাতৃ-সেবা ব্রত
করেছি যখন সার কি কাজ ভাবিয়া,
সুখ দুঃখ দুই লব হৃদয় পাতিয়া।"

১৮

তাই ত প্রসন্ন আজ সে মুখ-মণ্ডল ;
নয়নে স্পর্ধার জ্যোতি ; আজ ওষ্ঠ-দ্বয়ে
দারুণ প্রতিজ্ঞা বসি ; সে দৃষ্টি উজ্জ্বল
আজ যেন হৃদয়ের সে বৈরাগ্য লয়ে
ছড়ায় সে ভাব বিশ্বে ; মুখ নিরমল
কেহ যদি স্থির-চিত্তে নিকটে দাঁড়ায়ে
পড়ে দেখে, বর্ণে বর্ণে বুঝিবে হৃদয়,
বিপদে জিনিতে নারী করেছে নিশ্চয়।

১৯

লাবণ্যের রাশি বালা কিন্তু কি পবিত্র
প্রাণমন। সেই তার ভাব চিত্ত-হারী ;
করেছে সংসারে বাস কিন্তু সে চরিত্র
ছোঁয় নাই মাটী যেন। স্বভাব-কুমারী
স্বভাব-সুন্দর আছে। সে মুখের চিত্রঃ
পায় যদি চিত্রকর যায় বলিহারি।
নয়ন সারল্য-প্রেম-সাধুতা-জড়িত ;
পবিত্র প্রাণের আভা মুখেতে ফলিত।

২০

কত গ্রাম জনপদ নগর প্রান্তর
ছাড়াইয়া ভাই-বোনে কোথা চলি যায়।
অবশেষে উপনীত যথা গিরিবর
হিমাদ্রি লুকায়ে শির জলদ-মালায়,
রয়েছে গভীর ধ্যানে। সুশ্যাম সুন্দর
কান্তি তার দূর হতে মেঘরাশি-প্রায় ;
চরণে অরণ্য-মালা চৌদিকে বিস্তৃত ;
শান্তিময় নির্জনতা চির-বিরাজিত।

২১

বিজন অরণ্যে এক ঝরে নির্ঝরিণী,
কুলু কুলু রবে ঘোরে পথ হারাইয়া ;
সুরম্য সে গিরি-কুঞ্জে, দিবস যামিনী
প্রশান্ত প্রকৃতি সতী রেখেছে খুলিয়া
নিজের লাবণ্য-ভার। ভ্রাতা ও ভগিনী,
যুক্তি করি, তারি পাশে কুটির বাঁধিয়া
বসিল সংসার পাতি অরণ্য-মাঝারে ;
লুকাল হিমাদ্রি-কোলে ভুলিল সংসারে।

২২

সে ধামের সঙ্গী বৃক্ষ প্রকাণ্ড সুন্দর
সুগম্ভীর বনস্পতি, কত লতা তার
আদরে জড়ায়ে আছে ; ফুল মনোহর
ফুটে ফুটে মিলাইছে, তাহার ছায়ায়
বসি বন-শোভা দেখ, চাবে না অন্তর
উঠিবারে ; মন প্রাণ ডুবিয়া শোভায়
ঘন-নির্জনতা-মাঝে এমনি পশিবে।
অনন্তেতে অন্তরাত্মা ক্রমে মিশাইবে।

২৩

আর তথা সঙ্গী পাখী, যাহার সুস্বরে
ঘুচায় সংসার-তাপ হৃদয়ে জাগায় ;
নানা জাতি কত পাখী নির্ভয় অন্তরে
যথা ইচ্ছা বসিতেছে, যাহা ইচ্ছা গায় ;
ক্ষুদ্র অঙ্গ যে বিহঙ্গ, যদি গান ধরে
বনে বনে প্রতিধ্বনি এমনি নাচায়,
কুঞ্জে কুঞ্জে বহে যেন সুধা-রাশি তায় !
ক্ষণে ক্ষণে হয় প্রাণে অমৃত-সঞ্চার।

২৪

এ নির্জন গিরি-কুঞ্জে জুড়াতে হৃদয়,
কতই সৌন্দর্য আছে। হিমানী-মণ্ডিত
তুঙ্গশৃঙ্গ পঞ্চ-শৃঙ্গ* বর্ণনা কি হয়
শোভা তার, প্রাতে যবে আলোক-রঞ্জিত,
করি তারে, নব রবি করে শোভাময়?
রজত মুকুট-প্রান্তে সুবর্ণ-নির্মিত
কলকা দিয়েছে যেন। সে গিরি সুন্দর
দেখিলে সৌন্দর্য-হ্রদে নিমগ্ন অন্তর।

২৫

দাঁড়াইয়া সানু-পৃষ্ঠে বন-রাজি প্রতি
চেয়ে দেখ, উপত্যকা সুদূর বিস্তৃত।
তার মাঝে প্রবাহিণী নামে মন্দগতি,
ফিরে ঘুরে; সে কি দৃশ্য। যেন রে চিত্রিত
করেছে সুচিত্র কর। নব পল্লবিত
সুশ্যামল তরুদল, নয়ন প্রোথিত
হয়ে থাকে; সে সৌন্দর্য-সুধারস-পানে,
চিত্তের উত্তাপ হরে স্নিগ্ধ করে প্রাণে।

২৬

গভীর কাননে পশ, যাও হারাইয়া
পশি পশি ঘন বনে, নির্জন-নির্জনে,
এমনি সে নির্জনতা, আপনা হেরিয়া,
আপনি সন্ত্রাস লাগে হয় ক্ষণে ক্ষণে
সর্ব-তনু কণ্টকিত; উঠি শিহরিয়া
যেন পদ-শব্দ শুনি; আরণ্য পবনে
কে কি বলে চুপে চুপে। সে নিশ্বাস আসে;
একাকী পাইয়া মনে যেন কেহ গ্রাসে।

২৭

বসিয়া উপলাসনে নির্ঝরিণী পাশে,
চেয়ে থাক জল-পানে, ঝর ঝর ঝর,
রাত্রি নাই দিন নাই, সে নির্জন দেশে
জলধারা নামিতেছে নির্মল সুন্দর।
ফেনা ফোটে রেণু রেণু; হরিয়া উল্লাসে
গিরিচারী সমীরণ সে জল-শীকর
সিঞ্চিতেছে লতা দেহ; যেন সে সোহাগে
কুসুম যৌবনা লতা হাসে অনুরাগে।

*হিমালয়ের যে তুহিনময় শিখরের নাম কাঞ্চনশৃঙ্গ, তিব্বতদেশীয় ভাষাতে তাহাকে কিন্‌চিন্‌ জঙ্গা বলে; তাহার অর্থ পঞ্চ-শৃঙ্গ পর্বত।

২৮

যা দেখিবে তাহে শান্তি। কিন্তু নরেন্দ্রের
প্রাণের বিষম-কালি আছে মর্মস্থানে।
ভুলাতে বিনোদ যুক্তি করেছে তো ঢের,
ছায়া-সম সঙ্গে থাকে; যখন যেখানে
যাহা করে, চক্ষু দুটি সদা সোদরের
পাশে রাখে; রাত্রিকালে তারি সন্নিধানে
নিদ্রা যায়; সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে
সদা ঘোরে পায় পায়, কভু নাহি ছাড়ে।

২৯

নরেন্দ্র বিরস থাকে; আহারে বিহারে
মতি নাই; যথা তথা পড়ি পড়ি রহে।
বিনোদ কতই সাধে; বহুক্ষণ পরে
উঠে যায়; বিনোদের নেত্রে ধারা বহে;
মুছিয়া সে ধারা, দুঃখ ঢাকিয়া অন্তরে,
পদ সেবা করে বসি; কত কথা কহে;
শুনিতে শুনিতে কথা সে যবে ঘুমায়,
শ্রান্ত দেহ-যষ্টি বালা রাখয় শয্যায়।

৩০

দুজনে আহারে বসে শূন্য শূন্য মনে
কি খেতে কি খায় যুবা; কতই কল্পনা
ভুলাতে ভগিনী করে; শোনে না শ্রবণে।
হায় রে! জানে না যুবা কি ঘোর যাতনা
পাইছে সে; কিন্তু দেখি সে বিধু-বদনে
চির-প্রসন্নতা মাখা! বারেক বলে না
একটি ক্লেশের কথা; গভীরে পুতিয়া
নিজ দুঃখ, হাসি-মুখে রাখে ভুলাইয়া।

৩১

একটি বিষয় আছে, যাহার চিন্তনে
নরেন্দ্র বাঁচিয়া উঠে, যে কথা বলিতে
উৎসাহে প্রফুল্ল মুখ, পুন সে নয়নে
আসে দীপ্তি, যাহে মজি পারে সে ভুলিতে
ক্ষুধা তৃষ্ণা; ভাই-বোনে যে কথা কীর্তনে
কাটায় অর্ধেক রাত্তি। ঘৃণার তুলিতে
নর-জঘন্যতা চিত্র আঁকিয়া আঁকিয়া,
দুজনে আনন্দে ভাসে সে চিত্র দেখিয়া।

৩২

শুধু পাপ শুধু দুঃখ শুধু হাহাকার
নর-রাজ্যে ; জোর যার, যে রাখে স্ববলে
অন্যে বশ, তা'র জয় ; পাপ অত্যাচার
নরের স্বভাবধর্ম। দরিদ্রের গলে,
পা দিয়ে পিষিছে ধনী। শুষিছে প্রজার
ধন প্রাণ রাজ-কুল। পাপ ধরাতলে
কে আছে নরের সম শঠ প্রবঞ্চক
স্বার্থ-পর, দয়া-হীন, বিশ্বাসঘাতক।

৩৩

বিনোদিনী সুশিক্ষিতা। ভাই-বোনে মিলে
নর-ইতি-বৃত্ত পড়ে। পাপ-মাখাচিত্র
যত পায় খুঁজি দেখে। কোথাও দেখিলে
কোন সাধুতার কথা, ঘটায় বিচিত্র
অর্থ তাতে ; শাদা নামে কালিমা পড়িলে
যেন সুখী ! হায় ! হায় ! উদার, পবিত্র,
মানব-কুলের রত্ন যত সাধু-জন,
সবারে করিয়া হীন আনন্দে মগন।

৩৪

হায় রে বিনোদ নয় এত তো কঠিন !
প্রেম পূর্ণ প্রাণ তার ! ভাল যে বাসিত
নর-কুলে ; ঘোর দুঃখে পড়ি কোন দিন
নিন্দেনি মানবে ; নিজ প্রেম বিলাইত,
করিত না পর-চর্চা ; যাপিত সে দিন
পর-সেবা সুখে কত ; সুখে সে ভাসিত
অপরে দেখিলে সুখী ; হায় সেই প্রাণে
নর-দ্বেষ-বিষ হেন পশিল কেমনে !

৩৫

সে যে নারী ; প্রাণ তার রয়েছে জড়ায়ে
ভ্রাতৃ প্রাণে ; নরেন্দ্রে সে পূজে মনে মনে ;
পুরুষ-প্রধান ভাবে ; এমনি মিশায়ে
প্রেম তার আছে প্রাণে, ভ্রাতার বদনে
যাহা শোনে, চুপে চুপে পশিয়া হৃদয়ে
সে কথা বিশ্বাস জিনে ; তাহারো চিন্তনে,
সেই চিন্তা মিশে যায় ; ভ্রাতা-ময় প্রাণ
তাই তো সে বিষ বালা করিয়াছে পান।

৩৬

মাপ কর মাপ কর এই দুর্বলতা।
সহস্র সবল হলে নারী প্রেমময়ী
বল-হীন সেই স্থলে প্রেম তারে যথা
করিয়াছে পরাধীন। ঘোর রণে জয়ী
যে রমণী, দেখ তার শূরতা বীরতা
প্রেমাগুণে গলে যায়, যথা অগ্নিময়ী
কোমল বর্তিকা গলে। তাই বিনোদিনী
ভ্রাতৃ-প্রেমে ডুবে হায় নর-বিদ্বেষিণী।

৩৭

একরূপেতে দিন যায়। নরেন্দ্র ভুলিছে
পূর্বকথা ; প্রসন্নতা আসিছে জীবনে ;
প্রকৃতি চিন্তনে সুখী ; ক্রমশ খুলিছে
হৃদয়-কবাট তার ; বিনোদের সনে
হাসে খেলে প্রতিদিন ; নিত্য না তুলিছে
নর-জঘন্যতা কথা ; একাকী কাননে
যায় এবে ; শয্যা-পাশে পাতিয়া শয়ন,
আর না বিনোদ করে নিশি জাগরণ।

৩৮

ক্রমে সে প্রাণের মেঘ প্রসাদ-পবনে
কেটে যায় ; হাসে পুন ভ্রাতা ও ভগিনী ;
নিজ হাতে বিনোদিনী সাজায় ভবনে ;
যথা যেটী সাজে তথা তাহারে কামিনী
রাখিয়াছে। লতা পাতা কুসুমে কেমনে
স্বর্গ হয় দেখায়েছে। দিবস যামিনী
কোমল অঙ্গুলি তার এটী ওটী করে,
করিছে ভ্রাতার সেবা প্রসন্ন-অন্তরে।

৩৯

বিনোদিনী পশু-ভক্ত ; যবে ছিল দেশে,
কুকুর, বিড়াল, পাখী, ছাগল, বানর,
কত কি যে পুষেছিল ; মনের হরষে
প্রতিদিন খাওয়াইত ; প্রফুল্ল অন্তর
হতো তার খেলা দেখে। সবে ভালবেসে
করেছিল এত বশ, শুনি তার স্বর,
সকলে আনন্দে যেন হইত পাগল,
ডাকে ছাগ, নাচে পাখী, বানর চঞ্চল।

৪০

বিনোদ শুইত যেতে, বিড়ালটী তার
বালিশে মাথাটী দিয়ে আরামে থাকিত ;
যেন দুটী সখী, যেন দোঁহাতে দোঁহার
আলিঙ্গনে বাঁধা আছে। কুকুর রহিত
সেই ঘরে, মাঝে মাঝে এক একবার
সাড়া শব্দ শুনে কিছু ডাকিয়া আসিত
ছাদে গিয়া ; যেন বলি আসে অন্ধকারে,
'সাধের পুতুলি ঘুমে, উঠায়ো না তারে।'

৪১

সাধের পুতুলি বটে। কি যে ভালবাসা
ছিল তার ! মুখ পানে চেয়ে চেয়ে বসে
থাকিতে বাসিত ভাল ; যেন রে পিপাসা
মিটিত না ; চক্ষে চক্ষে হইলে হরষে,
যেত গলি ; মাঝে মাঝে করিয়ে তামাসা
বিনোদে মারিল কেহ, গর্জি তারে রোষে
অমনি তাড়িয়া যেত ; ঘুমালে জাগিয়া,
সে ধনে পাহারা দিত নিকটে থাকিয়া।

৪২

বিলাতি কুকুর সেটী, নাম প্রাণধন,
মামাঘ্বাড়ী গিয়ে তারে বিনোদ আনিল
অতি শিশু ; কোলে করি, করিয়ে যতন,
শৈশব হইতে তারে আপনি পালিল।
সব ছেড়ে বিনোদিনী আসিল যখন,
ছাড়িতে নারিল তারে, সঙ্গেতে লইল।
এ সুরম্য গিরি-কুঞ্জে সঙ্গে সে এসেছে,
সাধের পুতুলি পাশে এখানে বসেছে।

৪৩

সে এক বড়ই সঙ্গী। আসিয়া নির্জনে
বেড়েছে আদর তার, নিজে অন্ন পান
বিনোদ যোগান তারে ; থাকেন রন্ধনে
তার সঙ্গে হয় কথা ; হবে অনুমান
অন্য গৃহ হতে কেহ শুনিলে বচনে,
দুজন মানুষ বুঝি তথা বিদ্যমান।
প্রাণধন, মনচোরা, মাণিক, রতন,
কত কি সুমিষ্ট নামে হয় সম্ভাষণ।

৪৪

প্রাণধন গৃহ-কর্ম্ম কিছু কিছু করে ;
কলমটী লয় ব'হে দাদার নিকটে ;
পুঁটুলিটী রেখে আসে ভাঁড়ারের ঘরে ;
যতটুকু বুদ্ধি আছে তার সেই ঘটে,
বেচারা খরচ করে তুষিবার তরে ;
আসি সে বনের মাঝে পড়েছে সঙ্কটে,
দিন রাত্রি থাকে তাই বিনোদিনী পাশে ;
মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে গিরি দেখে আসে।

৪৫

বাবুজী লাঙ্গুল পাতি সুগম্ভীর-ভাবে
বসিয়া প্রকৃতি-শোভা করেন চিন্তন ;
বিনোদ কৌতুক পায় দেখিয়া সে ভাবে ;
"কি দেখিছ পোড়া-মুখ !" বলিয়া চুম্বন
করে ধরে ; সে চুম্বনে সুখ-নীরে ডোবে ;
কি করিয়ে সে আনন্দ প্রকাশে তখন
জানে না ; শুইয়া পড়ে, ঘন লেজ নাড়ে,
লাফায়ে পাগল হয়ে কোলে আসি চড়ে।

৪৬

কোলে উঠি বিম্বাধর চাটিয়া জানায়
প্রেম তার ; বিনোদিনী হৃদয়ে চাপিয়া
করেন সোহাগ কত ; কোলেতে তাহায়
লইয়া দাদার পাশে, বলেন হাসিয়া,—
"দেখ দাদা ! প্রাণধন আসিয়া হেথায়,
বুঝি কবি হয়ে পড়ে ! নির্জ্জনে বসিয়া,
মাঝে মাঝে মগ্ন থাকে যেন কোন ধ্যানে ;
প্রকৃতির শোভা যেন ডুবিছে পরাণে !"

৪৭

নরেন্দ্র পড়েন বসি, মাঝে মাঝে এসে
সেথা কত রঙ্গ করে ; লাফায়ে চেয়ারে
উঠি বসে ; গ্রন্থখানি খুলিয়া হরষে
নরেন্দ্র ধরেন মুখে ; কভু বা তাহারে
তোলেন দেরাজ-মাথে, সেথা ব'সে ব'সে,
বড়ই বিভ্রাট গণে, নারে নামিবারে,
আঁচড় পাঁচড় করি শেষেতে ক্রন্দন,
বিনোদিনী ছুটে আসি করেন চুম্বন।

৪৮

ভাই বোনে কি কৌতুক লয়ে প্রাণধনে।
নরেন্দ্র তাড়িয়া গিয়া বিনোদেরে ধরে
প্রকাশি কপট ক্রোধ ; বিনোদ বদনে
ঢাকিয়া কপট কাঁদে ; প্রাণধন মরে
মনস্তাপে। কি যে করে, বাঁচায় কেমনে !
নরেন্দ্র রাগিয়া তাড়ে, প্রহারের ডরে
পারে না দংশিতে তাঁরে, হেথা হোথা ছোটে,
চীৎকারে ফাটায় ঘর, বুদ্ধি নাহি জোটে।

৪৯

প্রাণধন সঙ্গী আছে ; আর বিনোদিনী,
হেথা আসি, শ্বেতবর্ণ নধর সুন্দর,
দুইটী মেষের শিশু পুষিছে কামিনী।
নিরীহ পবিত্র ভাব অতি মনোহর,
দেখিতে বাসেন ভাল ; যবে একাকিনী
রন বসি পুষ্পোদ্যানে, ক্রোড়ের ভিতর
মস্তক রাখিয়া তাঁর একটী ঘুমায় ;
অন্যটী লাফায়ে পিঠে উঠিবারে চায় !

৫০

দুইটী অপূর্ব কান্তি ! উজ্জ্বল নয়নে
সুন্দর নিরীহ-ভাব ! কিঙ্কিণী-শোভিত
গলেতে ঘুঙ্গুর মালা ; যবে দুইজনে
খেলা করে, রুণু রুণু হয় নিনাদিত
মধুর কিঙ্কিণী রব। চরণে চরণে
বিনোদের সঙ্গে ফেরে। তরু পত্রাবৃত
বিনোদ হারালে বনে, সে কিঙ্কিণী-ধ্বনি
শুনিয়া নরেন্দ্র জানে কোথায় ভগিনী।

৫১

তারা যদি বনে যায়, তবে প্রাণধন
রক্ষী হয়ে আগুলিয়া লইয়া বেড়ায়,
ভগিনী দুটীকে ভাই রক্ষয়ে যেমন ;
যদি তারা দূরে যায়, ডাকিয়া তাড়ায়
মুখে গিয়া ; যবে লম্ফ দেয় দুই জন,
লম্ফ ঝম্প সেও করে, যেন বা শিখায়
বিচিত্র লম্ফন-বিদ্যা। তাহারে উভয়ে ;
প্রাণধন বড় সুখী সে দুজনে লয়ে।

৫২

বাহু পাশে বাঁধি দোঁহে, বিনোদ যতনে
ধরেন দুধের বাটী, সন্তানে জননী,
যেরূপ পিয়ায় দুধ ; তারাও দুজনে,
মাতৃ সম হেরে তাঁরে ; পোহালে রজনী,
ভাই-বোনে বেড়াইতে যান যবে বনে,
যেতে চায় ; কভু যদি বহু কষ্টে ধনি
রেখে যায় বুঝাইয়ে, পিছু প'ড়ে থাকে,
যত দূর যায় বালা মা মা করে ডাকে।

৫৩

আর এক সঙ্গী আছে এ গিরি কান্তারে ;
সেটী ভৃত্য পাহাড়িয়া নাম শ্রীদয়াল।
দুই ক্রোশ দূরে এক নির্ঝরের পারে
ঘর তার ; সুস্থ দেহ ; উন্নত, বিশাল,
বক্ষ তার ; বাহু যুগ মাংসল ; তাহারে
দেখিলে আনন্দ হয় ; কপটতা জাল
নগর-কলঙ্ক যাহা, এরা নাহি জানে ;
বিশ্বাস-সাহস, সত্যে প্রাণাধিক মানে।

৫৪

শ্রীদয়াল সত্য-প্রিয়, সরল সাহসী,
বিনোদ গভীর শ্রদ্ধা করে সে কারণে।
বিনোদে সে দিদি বলে ; সদা কাছে বসি
শুনে সে অমৃত-বাণী, বিনয়ে বদনে
নাহি কথা, কিন্তু ব্যস্ত থাকে দিবানিশি
অপূর্ব প্রেমের ধার শুধিবে কেমনে !
বেতনের ভৃত্য বটে গুণে ভুলিয়াছে,
প্রেমেতে হয়েছে কেনা আপনা দিয়াছে।

৫৫

বিনোদিনী নিজ ঘরে থাকে ঘুমাইয়া,
শ্রীদয়াল কোন কাজে যদি ঘরে আসে,
কত যে সে মুখখানি দেখে দাঁড়াইয়া।
হাসি হাসি মুখ শশী দেখে আর ভাসে
অপার আনন্দ-নীরে ; উঠে উথলিয়া
হৃদয়ের ভাব তার ; জানু পাতি শেষে
চরণে চুম্বন করি যায় নিজ কাজে ;
জাগে যদি বালা তবে মরে বুঝি লাজে।

দ্বিতীয় দল

নব-জীবন

১

একরূপেতে দিন যায় লয়ে সে সংসার,
বিনোদিনী দিন দিন উঠিছে ফুটিয়া।
প্রেম দিয়ে প্রেম পেয়ে প্রাণ-পদ্ম তার
দলে দলে ফুটিতেছে; সৌরভ ছুটিয়া
ধায় যেন। বন-মাঝে নরের সঞ্চার
নাহি যথা, বন-ফুল তথা লুকাইয়া
থাকে যথা, সেইরূপ এ গিরি-প্রান্তরে
আকুল সুবাসে যেন করিতেছে ঘরে।

২

প্রাণ-ভরা প্রেম তার, মুখ-ভরা হাসি।
নির্জন কুটীর আলো করিছে সুন্দরী।
ছায়া-সম ভ্রাতৃপাশে আছে দিবানিশি,
উঠিতে বসিতে তার সদা সহচরী।
দিন দিন দুটী প্রাণ যায় যেন মিশি;
একেলা নাড়িতে নারে অন্যে পরিহরি।
এক বৃন্তে দুটী ফুল, দুইটী হৃদয়
চুপে চুপে একে অন্যে হইতে লয়।

৩

প্রভাত হইলে নিশি ভাই-বোনে মিলে
গভীর অরণ্য-মাঝে ভ্রমিবারে যায়;
অঞ্চল ভরিয়া আনে বন-ফুল তুলে;
বিনোদিনী ফুলরাশি যতনে সাজায়;
কভু বা দুজনে বসি নির্জন উপলে
প্রকৃতির শোভা হেরি নয়ন জুড়ায়।
ভাই-বোনে কত কথা খুলিয়া পরাণে,
তরুরা সে ভাষা যেন কান পাতি শুনে।

৪

আসিয়া রন্ধনশালে যায় বিনোদিনী,
মিশিতেছে দুটী প্রাণ এমনি বন্ধনে,
দুই ঘন্টা পাকশালে থাকিবে ভগিনী,
সহে না ভেয়ের প্রাণে, গিয়া সে ভবনে
নরেন্দ্র আসন পাতি, কতই কাহিনী
বলে তারে, কত তর্ক হয় দুই জনে,
কভু বা সুগ্রন্থ কিছু পড়িয়া শুনায়
নিমেষে রন্ধন শেষ কথায় কথায়।

৫

দুজনে আহারে বসে, আহা সে সময়ে
যে সুন্দর দৃশ্য হয় কে করে বর্ণনা।
ভাই-বোনে পরস্পর খাদ্য দ্রব্য লয়ে
সাধাসাধি পীড়াপীড়ি। এরূপে দুজনা
পরস্পর সেবা করে, যেন রক্ষী হয়ে।
নরেন্দ্র ভুলিছে ক্রমে প্রাণের যাতনা।
ফুটে যথা ফুলরাশি নিশার শিশিরে,
ফুটিছে হৃদয় তার সেই প্রেম-নীরে।

৬

প্রেমের বাতাসে থাকি প্রেমের বিকাশ।
নিশার আঁধার দেখি, যে তরু ঝাঁপিয়া
পত্রের কবাট ছিল, উষার প্রকাশ
না হতে উদয়াচলে দিক উজলিয়া,
সেবি মাত্র সুপ্তোত্থিত ধরার নিঃশ্বাস,
যেমন সে খোলে দ্বার, সেরূপ সেবিয়া
সে পবিত্র সমীরণ হৃদয় খুলিছে;
দারুণ মর্মের ব্যথা ক্রমে পাসরিছে।

৭

সাধুতা এমনি বটে। চুপে প্রাণে পশি
ফিরায় দুরন্ত মনে। বহু উপদেশে
খোলে নি যে জ্ঞান-চক্ষু, সাধু সঙ্গে বসি
দেখেছি খুলেছে তাহা। প্রেমের বাতাসে
কি যে আছে। যার গুণে উষ্ণতা বিনাশি,
স্নিগ্ধ করি মন-প্রাণে, লয় অবশেষে
সেই পথে; মন্ত্রমুগ্ধ করি লয় প্রাণে;
যেমন চুম্বকে লৌহ চুপে চুপে টানে।

৮

স্বভাবে প্রেমিক যুবা, সে প্রেম তাহার
মর্মাঘাতে প্রাণ-মাঝে ছিল লুকাইয়া;
যেরূপ লুকায় কূর্ম দেহ আপনার,
দুরন্ত মানব তারে যবে প্রহারিয়া
দেয় ব্যথা; পেয়ে প্রেম সে প্রেম আবার
বাহিরিছে; জানে না সে কিরূপে বাঁচিয়া
উঠিছে সদ্ভাব-রাশি; এইমাত্র জানে,
দেখে বিনোদের মুখ বড় সুখী প্রাণে।

৯

আগে তো বাসিত ভাল, কিন্তু বিনোদিনী
নব-ভাবে হৃদয়েতে মিশিছে তাঁহার।
তারো যেন নবজন্ম। কখনো কামিনী
এরূপ বাসেনি ভাল ; কেহ এ প্রকার
পরাণে মিশেনি তার ; আর একাকিনী
থাকিয়া না হয় সুখী ; নিকটে দাদার
যত থাকে ; প্রাণ-ফুল যেন ফুটি উঠে ;
যুগ যুগ রাখে যদি ধৈর্য নাহি টুটে।

১০

পরাণ খুলিয়া কথা, কিছু ঢাকা নাই ;
ভাবে ভাবে দুইজনে অপূর্ব মিলন।
প্রেমের প্রভাবে আজ দেখিবারে পাই
সজাগ দোঁহার প্রাণ ; উৎসাহিত মন
সৎপ্রসঙ্গে, সদালাপে ; আনায়েছে ভাই
রাশি রাশি ভাল-গ্রন্থ ; পাঠেতে মগন
থাকে দোঁহা এক সনে ; জ্ঞানের পিপাসা
দিন দিন বাড়ে প্রাণে, পলায় নিরাশা।

১১

প্রেম দিল নব চক্ষু ; সেই সে ভূধর,
সেই সে সুরম্য বন, সেই পাখিকুল,
নব বেশ পরি যেন দ্বিগুণ সুন্দর।
যাহা দেখে তাহে সুখ। পরাণ আকুল
শুনিয়া বিহঙ্গ-ধ্বনি ; সামান্য প্রস্তর
কথা কয়, নির্ঝরিণী করে কুল কুল,
আনন্দে অধীর প্রাণ মিশিয়া তাহায়,
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ যেন লাফাইয়া যায়।

১২

তারা যদি পথ হাটে তৃণ কথা কয় ;
তরু করে সম্ভাষণ ; পুষ্প প্রাণ কাড়ে ;
অরণ্য-বিহারী বায়ু মধুরতা বয় ;
যথা যায় যাহা দেখে প্রেমানন্দ বাড়ে ;
আনন্দ ধরে না প্রাণে ; যেন সুধাময়
দশ দিক্ ; সুধা ক্ষরে কাননে পাহাড়ে;
জড় সচেতন যেন হয় পদার্পণে ;
বিমল আনন্দে সদা ভাসে দুইজনে।

১৩

নরেন্দ্র বনের মাঝে ভগিনীরে লয়ে,
উপলে বসায়ে, ফুল যতনে তুলিয়া,
বলে,—"বোন বস দেখি,বন-দেবী হয়ে,
নানা ফুলে মন সাধে দিব সাজাইয়া ;"
সাজায় আপন মনে, দেখে মুগ্ধ হয়ে
কভু পাশে, কভু দেখে দূরে দাঁড়াইয়া
সেই শোভা একে দেহ লাবণ্যে গঠিত
তাহে বন-ফুলরাশি কিবা সুশোভিত !

১৪

প্রেম রে ! পরশমণি যদি কিছু থাকে,
তুই তাহা ! যে পরাণ জ্বলিয়া গরলে
গিয়েছিল, চির-দুঃখী ভাবি আপনাকে,
যে মন ডুবিতেছিল নিরাশে অতলে,
কি জানি কি যাদুমন্ত্রে বাঁচাইলি তাকে !
আনিলি জীবন-নদী যেন মরু-স্থলে।
ধন্য গুরু ! তব দীক্ষা পেয়েছে যে জন,
জীবন-সৌন্দর্য-পূর্ণ সে দেখে ভুবন।

১৫

প্রেমেতে করিল কবি ভাবুক উভয়ে ;
যে যাহা রচনা করে অপরে শুনায়।
বিনোদিনী পড়ে যবে, পশ্চাতে দাঁড়ায়ে
নরেন্দ্র কুন্তল তার লইয়া খেলায়।
কভু বা চিবুক তুলি চাপিয়া হৃদয়ে,
আদরে কপোলে মারে;বলে—"লো কোথায়
পাইলি এ হেন ভাব !" এইরূপে দিন
কেটে যায়, নিত্য সুখ উথলে নবীন।

১৬

দুজনে বাঁচিল বটে প্রেমের পরশে,
নরকুলে কিন্তু প্রেম না হয় উদয়।
গত জীবনের কথা যদি কভু আসে,
দারুণ ঘৃণাতে প্রাণ হলাহল-ময়।
কীট-সম হেরে নরে ; মনের হরষে
নরের দুর্গতি কথা দুই জনে কয়।
নরকুলে দুটী রত্ন সেই দুই জন ;
মলিন পাঙ্কতে জন্ম পদ্মের যেমন।

১৭

নরের দারিদ্র্য-দুঃখ, পাপের যাতনা,
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, ইন্দ্রিয়-বিকার,
স্মরিয়া তাদের প্রাণে না লাগে বেদনা ;
নরের লাঞ্ছনা ভাবি আনন্দ অপার।
পাপিষ্ঠ মানব-কুলে শুধু প্রবঞ্চনা।
স্বার্থপর, ক্ষুদ্রাশয়, নীচ, দুরাচার,
মানব-সংসারে সবে ; যদি সিন্ধু জলে
ডুবায় মানব-কুলে, ডুবুক অতলে।

১৮

এক রোগ নর-দ্বেষ, অন্য অহঙ্কার,
দুই রোগে রোগী দোঁহে। উভয় উভয়ে
নিরখি মোহিত যেন। সমান দোঁহার
ধরা-ধামে নাহি দেখে। পাপ লোকালয়ে
কে আছে এহেন সুখী হেন সদাচার!
বিজনে একাকী ভাবে পুলকিত হয়ে।
আপনা নেহারি মুগ্ধ ; আপনা বাখানে ;
বিধির অপূর্ব সৃষ্টি এ উহারে জানে।

১৯

একদিন খাট পাতি গৃহের প্রাঙ্গণে
নরেন্দ্র চিন্তায় মগ্ন। বসি বিনোদিনী
নিজ কোলে পা-দুখানি লইয়া যতনে
বুলাইছে পদ্ম-হস্ত। তামসী যামিনী ;
অগণ্য তারকা-ফুল ফুটেছে গগনে!
যে নির্জন গিরি পৃষ্ঠে সেই নিশীথিনী
সহজে ডুবায়ে চিত্ত গভীর ধেয়ানে,
অপূর্ব গাম্ভীর্য-রস উথলিছে প্রাণে।

২০

অন্যদিন ভাই-বোনে নানা কথা চলে,
কিন্তু আজ নরেন্দ্রের ভাবাসক্ত মন।
রাখি দৃষ্টি তারাময় সেই নভস্তলে
কি জানি কি সূত্র ধরি চিন্তায় মগন।
এমনি কি ভগিনী যে বসি পদতলে
চরণে বুলায় হাত, না হয় স্মরণ।
বিনোদিনী সে চিন্তার ব্যাঘাত না করে,
না কহে একটি কথা চুল নাহি সরে।

২১

আজি নরেন্দ্রের মন চলেছে কোথায়!
অসীম অনন্ত রাজ্যে একাকী পশিছে।
জীব পূর্ণ ধরা-ধাম স্মৃতিতে মিলায়।
কি এক নূতন তত্ত্ব প্রাণে প্রকাশিছে।
জড় চেতনের পারে, নাহিক যথায়
দেশ কাল ব্যবচ্ছেদ, ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে
যে সত্তার পারাবারে বুদ্বুদ মতন,
সে নীরব সত্তা-নীরে ডুবিতেছে মন।

২২

বিনোদিনী দেখে দেহ হয় কণ্টকিত,
ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে তনু, উঠে শিহরিয়া,
দেখে ঘন বহে শ্বাস, যেন আকুলিত
অপরূপ দৃশ্য হেরে! ভাবে সম্বোধিয়া
ভাঙ্গিবে সে ধ্যান তার, হয় সঙ্কুচিত
ভ্রাতার সে সুগম্ভীর ভাব নিরখিয়া।
গভীর অস্ফুট সেই কি এক বিকার,
তারো প্রাণে কি অপূর্ব রসের সঞ্চার।

২৩

পাক-পাত্রে পাক-দ্রব্য তলায় যেমন,
জলস্থল সে আঁধারে তলাইয়া যায়।
গায়ে ঠেকে অন্ধকার! যেন কোন জন
দাঁড়ায়ে রহেছে পাশে! যেন তার গায়
লাগিছে নিঃশ্বাস বায়ু! না দেখে নয়ন
প্রকৃতির শোভা আর, ডুবেছে নিশায়!
আঁধারে আবরি দেহ শুধু গিরিবর,
সুগম্ভীর আবির্ভাবে পূরিছে অন্তর।

২৪

এভাবে যুবতী বসে, একি হেন কালে!
দু-করে আচ্ছাদি মুখ কাঁদিল ফুলিয়া
আস্তে-ব্যস্তে বিনোদিনী উঠি, নিজকোলে
লয়ে মাথা প্রেমভরে ধরে আলিঙ্গিয়া।
বলে—"দাদা কাঁদ কেন?" ভেয়ের কপোলে
দুটি অশ্রু পড়ে তার; আকুল হইয়া
"দাদা! দাদা! দাদা!" —ডাকে, ডাক সে শুনে না,
ফুলে ফুলে কাঁদে শুধু প্রবোধ মানে না।

২৫

বহুক্ষণ পরে হাত খুলিয়া গলিল ;—
"বিনোদ ! প্রাণের বোন ! পুছ না আমারে
আজ কিছু ; কালি শুন ।" বলিয়া চলিল
উঠিয়া শয়ন-ঘরে। সুন্দরী তাহারে
ধরিয়া লইয়া ব'স। কিছু না বলিল
শোয়াইল শয্যা ঝাড়ি ; চায় বসিবারে
পদতলে, ভাই বলে,—"প্রিয় বিনোদিনি !
রাত হলো শোও গিয়ে প্রাণের ভগিনি !

২৬

"বিনোদ ! ভেব না বোন, কি আছে আমার
তোমারে যা বলিব না ? আজ কিন্তু নয় ।
ভেব না প্রাণের বোন্ ! তোমার দাদার
এতদিন পরে বুঝি সৌভাগ্য উদয় ।
আজি সে পরম নিধি, সন্ধানে যাহার
বহুদিন কাটায়েছি—পেয়েছি নিশ্চয় !"
এত বলি ভাবাবেশে টানি নিজ কোলে
হৃদয়ে সবলে চাপি চুম্বে দু-কপোলে ।

২৭

মুখ তুলি নেত্রজল দিল মুছাইয়া ।
হায় রে ! এতই প্রেম আজি কেন প্রাণে !
আজ বিনোদের মুখ হৃদয়ে ধরিয়া,
বাঁধি আলিঙ্গন পাশে কার গুণ গানে
মত্ত যুবা ? প্রেমসিন্ধু আজ উথলিয়া
ভাসাইছে ভগিনীরে। সে বিধু-বদনে
আনন্দে বিভোগ হ'য়ে কেন মত্ত-প্রায়
ঘন ঘন চুম্বে আজ ? চুম্বিয়া কাঁদায় ।

২৮

"স্বর্গের দুহিতা ! তুমি তারিতে আমারে
এসেছ কি ?" বলে কাঁদে আবার ফুলিয়া।
কাঁদে ভাই, কাঁদে বোন, আজ সে সংসারে
কি এক তরঙ্গ নব যায় রে বহিয়া !
"না না আজ আর নয় !" ছাড়িল তাহারে
"যাও বোন ! রাত্রি হলো কিছুই ঢাকিয়া
রাখিব না ; তুমি মোর জীবন-দায়িনী !
তোমাকে লুকাতে কিছু পারি কি ভগিনি !"

২৯

বিনোদিনী মৃদুগতি শয়নের ঘরে
গিয়ে দ্বার দিল। যুবা শুইয়া শয়নে,
প'ড়ে প'ড়ে কত কাঁদে কে আর নিবারে?
কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রা আসিল নয়নে;
স্বপনে দেখিল যেন তাহার শিয়রে
স্নেহময়ী মাতা তার সহাস্য-বদনে
স্নেহে হাত দিয়ে শিরে বলেন,—"যে ধন
পিয়েছ কুড়ায়ে রেখ করিয়ে যতন!"

৩০

নিদ্রা-ভঙ্গে দেখে দিক হয় সুপ্রকাশ;
হেন ভাবে চক্ষু যুবা খোলে নি কখন।
আজি কি অপূর্ব শোভা! মৃদুল বাতাস
ঝলকে ঝলকে করে অমৃত সিঞ্চন,
যারে দেখে সে নূতন; পরি নব বাস
প্রকৃতি আজিকে প্রাণ করিছে হরণ।
প্রভাত দেখেছে ঢের হেন তো দেখেনি,
এ হেন অমৃত কেউ প্রাণে তো মাখেনি।

৩১

হেন কালে বিনোদিনী খুলিছে দুয়ার।
কি যে সে দেখিল আজ নরেন্দ্রের মুখে!
কি এক অপূর্ব জ্যোতি, বর্ণনা যাহার
হয় না, পড়েছে তথা; জানি না কি সুখে
ভাসিছে হৃদয় তার! শোভা এ প্রকার
দেখেনি বিনোদ কভু মানবের মুখে।
দরশনে সসম্ভ্রমে সমুন্নত প্রাণ,
আজি সে দাদাকে দেখে দেবের সমান।

৩২

দাদা গো! কেমন আছ? ভেবে ক'বে
সে মুখে দেখিয়া ভাষা মুখেতে রহিল;
আসিয়া দাদার পাশে দাঁড়াল নীরবে।
"বিনোদ প্রাণের বোন"—বলিয়া ধরিল
হাতে তার—"চল আজ যদি লো শুনিবে
কে কাঁদাল অভাগারে; কে যে ভাসাইল
সুধা সিন্ধুনীরে মন; নির্ঝরের পারে
বসে সুহাসিনি! সব বলিব তোমারে।"

৩৩

ভাই-বোনে সে বিপিনে পুনরায় পশে,
যায় যথা কুলু কুলু বহে নির্ঝরিণী ;
বিনোদে বসায়ে পাশে, মনের হরষে
আলিঙ্গিয়া কণ্ঠ তার, আরম্ভে কাহিনী।
ব্রহ্মাণ্ড ভাসিছে আজ সে আনন্দ রসে!
আজি সে অপূর্ব কথা গাইছে তটিনী!
নব রবিকর তাই পশে কুঞ্জবনে
আনন্দে বিহ্বল বিশ্ব সে কথা শ্রবণে।

৩৪

"শুন বোন! কাল আমি যবে খাটে শুয়ে
দেখিতেছিলাম তারা, ক্রমেতে পশিল
মনে যেন তারা-কুঞ্জ, মগ্ন হ'য়ে হ'য়ে
তলাইয়া অবশেষে অনন্তে ডুবিল।
ভুলিলাম এই বিশ্ব, এ দেহ আলয়ে
ভুলিলাম ; এই প্রশ্ন প্রাণেতে জাগিল
চঞ্চল, ঘটনা-পূর্ণ এ বিশ্ব-মাঝারে
আছে কি সত্যের ভূমি পারি ধরিবারে ?

৩৫

ছাড়িয়া তারকারাজি, কাল সূত্র ধরি
সৃষ্টির প্রারম্ভে গেনু ; যবে তারা-দল
নাহি ছিল, মহাকাশ যবে পূর্ণ করি
অগ্নিময় বাষ্পরাশি, খেলিত কেবল।
ভাবিলাম সে কি শক্তি, লক্ষ যুগ ধরি
ফুটায়ে তুলিল যাহা বিচিত্র কৌশল ?
দেশে কালে সেই শক্তি দেখিনু ব্যাপিয়া,
জড়ের বিচিত্র শোভা তুলিছে গড়িয়া।

৩৬

জড় চেতনের পারে, ডুবিতে ডুবিতে,
কি যেন ঠেকিল প্রাণে। ডুবুরি যেমন,
অগাধ সলিল ভেদি নামিতে নামিতে
পায় ভূমি ; আমি তথা হইয়া মগন,
দেখিনু অতল তলে যেন আচম্বিতে
সত্য-ভূমি। সেই শক্তি কূটস্থ চেতন,
এ বিশ্ব যাহারি লীলা, অদ্ভুত-প্রকাশ,
নিমেষে ভগিনি তার। দেখিনু আভাস।

৩৭

যতই ডুবিল মনতত্ত্ব -সাগরে ,
ভুলিলাম দেশকাল ; যেন প্রাণাকাশে
মিশাইল প্রাণ মোর ! বাহিরে অন্তরে
যেই সত্তা বিরাজিত, উজ্জ্বল বিশ্বাসে
ধরিনু সে সত্তা বোন ! তনু থর থরে
কেঁপে গেল ; মন প্রাণ পূরিল উল্লাসে ;
উথলিল সান্দ্রানন্দ হৃদয় গভীরে ;
ডুবিল পরাণ সেই পুণ্য-শান্তি-নীরে ।

৩৮

দেখিনু যে মহাশক্তি জগত মাঝারে
ভাঙ্গিছে গড়িছে সদা ; নিজে এক হয়ে
বিবিধ শক্তির খেলা বিবিধ প্রকারে
দেখাইছে ; যুগে যুগে অদ্ভুত উপায়ে
শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, পুণ্য বিতরে সংসারে ;
দেখিনু সে শক্তি বোন ! মানব-হৃদয়ে
লুকায়ে করিছে কাজ, না জানি সন্ধান,
সেই শক্তি নর-রাজ্যে বিতরে কল্যাণ ।

৩৯

ভেবে দেখি এই আত্মা নিয়ত শায়িত
তাঁরি ক্রোড়ে ! অভেদ্য যে যোগ দৃঢ়তম !
এ জীবন, আদি অন্ত যার লুক্কায়িত
এ ক্ষুদ্র নয়ন হতে, এ নির্ঝরিণী সম,
জনমিল এই উৎসে ; হইছে ধাবিত
ইঁহারি সঙ্গম অংশে ! একি নিরুপম
লীলা বোন ! প্রাণে তিনি, অথচ না জেনে
চলেছি তাঁহারি দিকে যেন কোন টানে ।

৪০

তিনিই সংসার সেতু, এই সত্য কথা ;
দেখ বোন ! নর-হৃদে ভাব যে সকল
গূঢ় থাকি, চালাইছে মানবে সর্বথা,
ঊর্ণনাভি নিজ হতে তন্তু অবিরল
সৃজে যথা, সেইরূপ প্রণয়, মিত্রতা,
বাণিজ্য, বিগ্রহ সন্ধি, বিজ্ঞান-কৌশল,
সকলি সৃজিছে নব যে ভাব প্রভাবে,
রোপিলা সে বীজ প্রভু নরের স্বভাবে ।

৪১

তাতেই সমাজ-সৃষ্টি, সমাজের স্থিতি ;
ভেবে দেখি প্রেম তাঁর এতহীন নরে,
দিয়ে মাত্র অগ্নি বায়ু জলে আর ক্ষিতি
নহিলা সন্তুষ্ট বিভু ; জুড়াতে অন্তরে,
মানব-পরাণ-মাঝে সুকোমল প্রীতি
রাখিলেন কৃপা ক'রে ; আপনা পাসরে
যার গুণে ডোবে নর অপরের সুখে,
যার গুণে পর-দুঃখে ধারা বহে মুখে।

৪২

শুনেছি নক্ষত্রমালা পরস্পরে টানে,
সূত্রে সূত্রে বাঁধা হয়ে গগনে খেলায়।
ভুবে দেখ, নর-রাজ্যে কিসে প্রাণে প্রাণে
বাঁধিয়েছে ? এক অন্যে মিশিবারে চায়
কার গুণে ? কি সে রজ্জু, যাহার বন্ধনে
সকলে এমনি বাঁধা, সতত পোড়ায়
বিদ্বেষ-বিরোধ পাপে মানব-সংসারে,
প'ড়ে থাকে, কাঁদে কাটে, নারে ছাড়িবারে।

৪৩

দেখিলাম মূঢ় আমি। এই ধনে ভুলে
মোহে পড়ে কি করেছি। রেখেছিনু আশা
ছার ধনে, গিরি-শৃঙ্গে ওই মেঘ চলে
ও হতে চঞ্চল যাহা। আমি ভালবাসা
মোহের কুহকে প'ড়ে কার পদতলে
দিয়েছিনু। তাই শাস্তি তাই তো নিরাশা।
শত্রু তো সে নারী নয় প্রাণের ভগিনি।
চিনায়ে পরম ধনে দিল যে কামিনী।

৪৪

ছেড়ে গেছে, সেই শাস্তি বিধি দিল মোরে
ফিরাইতে মোহ হতে ; আমি দুরাচার,
তাতেও চেতনা নাই, তাই বুঝি তোরে
"বিনোদ।—বিনোদ।"—হায় পারিল না আর
ভাঙ্গিতে মনের কথা কাঁদিছে অধীরে।
"দাদা।—দাদা।"—ডাক ছেড়ে করি হাহাকার
বলে ;—"ওরে নরাধম। কেন চিনিলি না ;
আগে এ প্রেমের লীলা কেন দেখিলি না।"

৪৫

"তাই বুঝি তোরে বোন। প্রতিনিধি করে
দিলা সঙ্গে, নরাধমে স্বর্গের মাধুরী
দেখাইতে, জুড়াইতে এ তপ্ত অন্তরে?
চাহিনি লইতে সঙ্গে তোরে ঘৃণা করি;
হায়, হায়! যেই যায় দূরে পরিহরে,
তাতেই ডুবিতে চাও আপনা পাসরি!
এ কার প্রেমের লীলা? একি তোর কাজ?
দেখ্‌লো পরাণে তোর সেই ধর্মরাজ!

৪৬

বলিতে উথলে প্রেম; প্রাণে তারে চাপে,
প্রেমানন্দে ঘন ঘন চুম্বে দু-কপোলে;
কাঁদিয়া আকুল বালা থর থর কাঁপে;
এ কি দীক্ষা আজ তার হয় বনস্থলে!
আধ প্রস্ফুটিত ফুলে, লতার মণ্ডপে,
রবিকর চুম্বে যবে, ফুটে দলে দলে;
সেরূপ এ প্রেম মন্ত্রে হৃদয় তাহার
খুলে গেল। এ কি উৎস খুলিল দুয়ার।

৪৭

কে যেন পরশে প্রাণে, ধরিতে না পারে,
অঙ্গ যষ্টি তাই কাঁপে; সহসা খুলিয়া
যেন কোন আবরণ, প্রেমের পাথারে
কে যেন ডুবাল মনে। সে প্রেম স্মরিয়া
পরাণ আকুল করে, ভাসে নেত্রাসারে।
ভাইবোনে কাঁদে আজ সে প্রেমে গলিয়া।
কবি বলে, ওহে প্রভু! ওহে প্রাণারাম!
হেন দীক্ষা দেও মোরে এই মনস্কাম।

৪৮

পরাণে কি ভাব আজ বহে বহে আসে!
উঠি উঠি প্রাণ যেন উঠিতে চাহে না।
ইচ্ছা হয় ডুবে থাকি সেই সহবাসে!
অন্যদিন একস্থানে যে চিত্ত রহে না
আজ সে থাকিতে চায় সেই জল-পাশে!
নির্ঝরিণী যাহা বলে, আজ তা কহে না;
ধীরি ধীরি যায় আর হেসে হেসে বলে,
জীবনের উৎস আছে লুকান অচলে।

৪৯

ভগিনী রে ছেড়ে দিয়ে নরেন্দ্র গিয়েছে;
ভাবিতে ভাবিতে একা পশেছে নিবিড়ে।
সুন্দরী জানে না তাহা, নিজে হারায়েছে,
একাকিনী প্রকৃতির সেই ক্রোড়-নীড়ে
বসিয়া ধেয়ানে আছে। উড়িছে ডাকিছে,
পাখী কত! কত ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে।
নির্জনতা তলে মন গভীরে ডুবিয়া,
যেন সে পরম রত্ন বেড়ায় খুঁজিয়া।

৫০

বসিয়াছে বিনোদিনী যুড়ি দুই কর,
মুদিয়া বিশাল নেত্র; দুটী অশ্রুধার
ধীরে ধীরে গড়াইছে; শ্রীমুখ সুন্দর,
কি দেখায় কি বর্ণিবে! লাবণ্যের ভার
প্রেমালোক পড়ি আজ কিবা মনোহর!
দরশনে ভক্তি-রস মানসে সঞ্চার!
কুঞ্চিত কুন্তল-জাল পবন দোলায়,
মুখচন্দ্র, যেন চন্দ্র জলদ-মালায়।

৫১

আছে ধ্যানে হেনকালে নরেন্দ্র ডাকিল,
"বিনোদ ঘরেতে চল,"—চলিল নামিয়া
সুন্দরী উপর 'তে। পূর্বে পূর্বে ছিল
কত কথা, কত হাসি, আজিকে উঠিয়া
ধীরে চলে, ক্রমে আসি দুজনে মিলিল;
পায় পায় ঘরে যায় সে ভাবে ডুবিয়া;
আজ আর বন ফুল না করে চয়ন,
তালি দিয়ে প্রতিধ্বনি করে না শ্রবণ।

৫২

আত্মস্থ উভয়ে আছে; যে ভাব পেয়েছে,
মনে মনে তাই ভাবে; কোথা দিয়া যায়
যেন তাহা নাহি জানে; যে সুধা পিয়েছে
তাহাতে বিভোর, কথা মুখেতে মিলায়।
ফুল তোলে নাই বটে, যে ধন লয়েছে
প্রাণে পূরে তাহে মগ্ন; রাখিবে কোথায়
সেই ধন! ধীরে ধীরে কুটিরে পৌঁছিল;
নূতন দুয়ার আজ জীবনে খুলিল।

৫৩

দরিদ্রে মাণিক পেলে, ভিক্ষুকে রাজত্ব,
মৎস্যেতে পাইলে জল, বিহঙ্গে আকাশ,
সেরূপ দুজনে পেয়ে সে পরমতত্ত্ব
কি যেন পেয়েছে ধন, মিটিয়াছে আশ ;
বুঝেছে কিরূপে হয় নরের নরত্ব ;
পরাণে পেয়েছে তারা স্বর্গের বাতাস !
কি জানি কোথায় হতে আসিছে সুঘ্রাণ,
যত পায় তত বাঁচে, তত জাগে প্রাণ।

৫৪

থাকে না ঝড়ের ভয় পর্বতের আড়ে
যে রূপ বাঁধিলে ঘোর, কুকুর যেমতি
প্রভুকে পাইলে বাঁচে যবে তারে তাড়ে
দুরন্ত কুকুর-দলে। যথা বাঁচে সতী
নর-পিশাচের হাতে যদি কভু পড়ে,
পুরুষ-প্রধান বীর আসে যবে পতি,
তেমনি তারাও আজ পেয়েছে কাহারে,
নির্ভয় নিশ্চিন্ত প্রাণ পাইয়া যাহারে।

৫৫

বিদেশে পথিক একা পড়ি দস্যু-দলে,
হারায়ে সর্বস্ব ধন বিপথে পড়িয়া,
ঘুরে ঘুরে প্রাণ-দায়ে প্রান্তরে, জঙ্গলে,
অবসন্ন দেহ মনে শেষেতে আসিয়া,
শৈশবের বন্ধু কোন পায় সেই স্থলে,
নারীর অমূল্য স্নেহ মিলে যথা গিয়া,
তাহার যে ভাব হয়, সে অপূর্ব ধনে
পাইয়া সেরূপ ভাব বুঝিছে দুজনে।

৫৬

মরুতে উড়িছে পাখী, উড়ে উড়ে উড়ে
বসিতে না পায় স্থান, যাইছে ভাবিয়া
পাখা দুটী, ত্রাসে প্রাণ যেন ধড়ফড়ে,
অবশেষে বহু পথ আসি উত্তরিয়া,
মরু-মাঝে যদি তরু পায় জল-পাড়ে,
যে রূপ সে লভে প্রাণ সে শাখে বসিয়া,
সেরূপ সে পাখী দুটী এ মরু-সংসারে,
বসেছে বসেছে আজ কোন তরু-পরে।

৫৭

সাগরে জাহাজ ডুবি নাবিক তাহার
কাষ্ঠ-খণ্ড মাত্র ধরি ভেসেছে অকূলে ;
গর্জিয়া দুর্জয় সিন্ধু আসে বার বার,
দাপটে ডুবাতে চায় তাহারে অতলে,
কাষ্ঠ-খণ্ড ! তাও গেল দিতেছে সাঁতার,
হাবু ডুবু খায়, ডোবে বুঝি বা সে জলে,
হেনকালে গিরি-শৃঙ্গ ঠেকিলে চরণ
যাহা পায়, তাই আজ পেয়েছে দুজন ।

৫৮

অনাবৃষ্টি দেশে, কূপ খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে
কতই গভীর হ'লো, মিলল না বারি,
কৃষকের হাহাকার শস্য যায় পুড়ে,
সে কূপে সবার আশা, শত নরনারী
শুষ্ক-কণ্ঠে নিরাশেতে বসে আছে পাড়ে
সহসা খুলিল উৎস, জল স্নিগ্ধকারী
যত লয় তত উঠে, সে রূপ দোঁহার
প্রাণেতে প্রেমের উৎস খুলেছে এবার ।

৫৯

স্বরগ তাদের ঘরে প্রেমে হয়েছিল,
আজি তাহে প্রেমচন্দ্র হলেন উদয় ;
প্রাণ দুটী এক অন্যে এমনি মিশিল,
এমনি আনন্দ-শান্তি-পবিত্রতা-ময়,
কে যেন সে দুটী ফুলে উড়ায়ে লইল,
স্বর্গের নন্দন যথা দেবের আলয়,
সেথা যেন পুতে দিল ; দোঁহার বাতাসে
দোঁহার ফুটিছে প্রাণ, দুটী যেন হাসে ।

৬০

হায় ! কবি অপারগ সে ভাব বর্ণনে ।
ভারতি ! ভারতি ! আমি পড়েছি সঙ্কটে ;
কোথায় সে তুলি হায় এ তিন ভুবনে,
কোথা সেই রঙ্গ, যাহা কল্পনার পটে
ঢালিয়া দেখাতে পারি, পরাণে পরাণে
মিশে কি তরঙ্গ উঠে ! চিত্রিয়াছি বটে
বহু চিত্র, এবারে যে ঠেকিয়াছি দায়,
করিতে অধ্যাত্ম-চিত্র রঙ্গে না কুলায় !

৬১

বিশ্ব-গুরু! বিশ্ব-বন্ধু! প্রাণ, জগৎ-পতি!
কৃপা কর; আমি মূঢ় অধম পাতকী,
প্রেমহীন, ভক্তিহীন, আমি হে দুর্মতি!
তোমার মহিমা প্রভু আমি তা কব কি!
দেও ভাষা, দেও ভাব, দেও হে শক্তি;
তব বলে বলী হলে, সে ঘোর নারকী
সেও পারে চিত্রিবারে স্বরগের ছবি,
হও হে উদয় তবে প্রাণে প্রেম রবি।

৬২

বিনোদিনী নরেন্দ্রের আছিল সোদরা;
প্রেমালোকে পুণ্যালোকে আজি সে ভগিনী,
জ্যোতির্ম্ময় বপু যেন। তারে যেন ধরা
ধরেছিল গর্ভে যাতে হইয়ে সঙ্গিনী,
লইবে অনন্ত ধামে, শোক দুঃখে ভরা
সংসার-মরুতে হয়ে প্রেম প্রবাহিনী
জুড়াইবে; মুখ পানে যত তার চায়
নরেন্দ্রের প্রাণ যেন আলোকে ডুবায়।

৬৩

নারী-প্রেমে সে প্রেমাংশু হায় রে পড়িলে,
কি হয় জানে না তাহা এ পোড়া সংসার!
সুনির্ম্মল অয়স্কান্তে ভানু বিরাজিলে,
অগ্নি উদ্গীরণ যথা, নারী সে প্রকার,
নিজ প্রেমে সেই প্রেম বারেক ধরিলে,
বিস্তারে পুণ্যের জ্যোতি, হয়ে অন্ধকার;
কিন্তু রে সে জ্যোতি-রাশি মধুরতা-ময়,
পরশে পবিত্র করে, জুড়ায় হৃদয়।

৬৪

ধিক্ ধিক্ স্থূল-মতি, ইন্দ্রিয়ের দাস,
পুরুষ চেনে না নারী কোন্ উপাদানে
গঠিত। বিধাতা তারে কি প্রেম প্রকাশ
করিবারে, এ সংসার নন্দন-উদ্যানে
পুতিয়াছে। সে সৌরভে কে পায় উল্লাস?
রিপু-সেবা হতে সুখ নাহি যার ধ্যানে,
সেই নীচ, সে বর্ব্বর, জড়-বুদ্ধি নরে
বুঝে কি, বিহরে নারী কি উচ্চ শিখরে?

৬৫

থাক্ হেথা একথার নাহি প্রয়োজন।
নরেন্দ্র চিনেছে ওই নারী-শিরোমণি
বিনোদিনী কি যে তার। সমুন্নত-মন
সঙ্গে থাকি। প্রাণে তার কি রত্নের খনি,
যত ভাবে, তত ছোটে প্রীতি-প্রস্রবণ।
যা বলে, যা ভাবে তার কাছে তুচ্ছ গণি।
"বিনোদ! বিনোদ!"—বলে মুখ পানে চায়,
হেরে হেরে মুখ-খানি যেন ডুবে যায়।

৬৬

শুনিলে পায়ের শব্দ জাগয়ে পরাণ,
দেখেছ কি কেহ হেন? শত কাজ ফেলে
অমনি ফিরিয়া চায়; সর্বেন্দ্রিয় কান
হয়ে যেন শুনে! সে যে দুটা কথা বলে,
তাহাতে কি থাকে যেন সৌরভ-সমান!
গেলে বালা যায় যেন সে সৌরভ ফেলে;
নরেন্দ্র বসিয়া ভাবে, এ পাপ-সংসারে,
কিরূপে এমন বিধি গড়িল তোমারে।

৬৭

নরেন্দ্র ভাবুক বড়; মাঝে মাঝে তার
কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া বসি কত কথা বলে।
মধু মাখা সেই কথা, অমৃত সঞ্চার
করে প্রাণে; নাহি জানে আকাশে, ভূতলে,
জলে কিম্বা স্থলে বালা; হৃদয় তাহার
বর্ণে বর্ণে ডুবে যেন প্রেম-সিন্ধু-জলে।
সে প্রেমে অনন্ত প্রেম পায় দেখিবারে;
যেন কে আলোক-রাজ্যে লুকায় তাহারে।

৬৮

দুজনে বিপিনে পশে; উপলে বসিয়া
দুই কণ্ঠ মিলাইয়া বিভু-গুণ গায়;
বায়ু লয়ে প্রতিধ্বনি বেড়ায় ঘুষিয়া,
কুঞ্জে কুঞ্জে যেবা আছে সবারে জাগায়;
গিরি যেন গলে যায় সে রসে রসিয়া;
তরুদের অশ্রু ঝরে পাতায় পাতায়,
বিহগে মিলায়ে তান সেই গান ধরে;
বিভুনাম-ধ্বনি জাগে কন্দরে কন্দরে।

৬৯

কভু বা স্বতন্ত্র পশে নির্জন নির্জনে,
প্রকৃতিতে ডুবি করে বিভু-আরাধনা।
এমনি নিস্তব্ধ ফুল ফুটিতেছে বনে
তাও যেন শুনা যায় ; সেখানে সাধনা
করে বসি ; কি সৌরভ প্রভাত-পবনে
ব'হে আসে ; কোথা হ'তে জানে কোন্ জনা।
সে সৌরভ ধ্যানে মিশি মিষ্টতা বাড়ায়,
ডুবে ডুবে মন শেষে অনন্তে মিশায়।

৭০

ধ্যানে মগ্ন বিনোদিনী, মুকুতা গলিয়া
বহে যেন দু-কপোলে। বায়ু দিবাকর
উভয়ে ঝগড়া করে, সে মুখ চুম্বিয়া
কে আগে শুখাবে অশ্রু। ভক্তিতে সুন্দর,
প্রস্ফুটিত মুখ-পদ্ম দেয় ছড়াইয়া
কি এক অপূর্ব ভাব। বনের বানর
বিস্ময়ে অবাক হয়ে সেই মুখ হেরে ;
বন-পশু যায় আর চায় ফিরে ফিরে।

৭১

যে যাহা সাধনে পায়, ঘরে আসি করে
পরস্পর বিনিময় ; ভাবে ভাবে মিলে
প্রেমের লহরী উঠে ; জাগয়ে অন্তরে
আত্ম-দৃষ্টি ; গূঢ়তত্ত্ব অনেক খুঁজিলে
তবুও মেলে না যা'হা, দিব্য-চক্ষে হেরে।
সংযম, বৈরাগ্য, প্রেম, একই শৃঙ্খলে
বাঁধা দেখে ; আর তারা নরের আইনে
নীতি না খুঁজিতে যায়, দেখে তা নয়নে।

৭২

সেই কি সংযম, তারা যে ভাবেতে আছে ?
তাই যদি হয় হোক, তারা তা জানে না ;
জল বায়ু তাপে যথা পালে ফুল-গাছে
সেরূপ বাড়িছে তারা ; আর ত মানে না
আপনারে বড় বলে ; প্রাণে যা পেয়েছে,
তারি রসে বাঁচে যেন ; মুখেতে আনে না
আর নর-দ্বেষ দোঁহে, যে যা করিয়াছে,
দেখিয়া প্রেমের লীলা ভুলিয়া গিয়াছে।

৭৩

আগে আগে পাখী-দুটি মাটিতে বসিত ;
মাটির পতঙ্গ কীট করিত আহার,
পার্থিব ধূলায় ব'সে সে গান গাইত।
প্রভু হে! বিচিত্র লীলা কি দেখি তোমার!
উড়ালে দুটীকে তুমি, করিলে তৃষিত
স্বর্গের শিশির তরে ; ছাড়িয়া সংসার
তাই তারা নবালোকে আকাশে খেলায়,
উড়ে উড়ে গায় আর আলোকে মিশায়।

৭৪

শিশির খাইয়া বাঁচে, এমন বিহঙ্গ
দেখেছ কি কেউ ? যদি নাহি দেখে থাক
হেলায় হ'য়ো না কাল কর সাধু-সঙ্গ।
আমাদের পাখী দুটী দেখ, দেখ, দেখ,
প্রভাতে সুবর্ণ-দ্রব্যে মাখাইয়া অঙ্গ,
পান করে সেই জ্যোতি ; তুমি পড়ে থাক,
ওলো ধরা! পড়ে থাক্ ওলো নির্ঝরিণি!
না চায় তোদের বারি নর-বিনোদিনী।

৭৫

ফের বিনোদিনী এল! কবি কি প্রণয়ে
পড়ে গেল ? তাই হবে, বিনোদ নেশায়
করেছে আচ্ছন্ন মন ; ভুলে লোকালয়ে
তারি পাশে পড়ে আছি ; নির্জন চিন্তায়
বিনোদ মিশিয়া গেল ; ঘুমায়ে ঘুমায়ে
বিনোদ স্বপন দেখি ; এত বড় দায়!
পড়িলে প্রেমের কূপে নাইরে নিস্তার ;
কল্পনে! লইয়া চল দেশে একবার।

তৃতীয় দল

নর-প্রীতি

১

দেশে গিয়ে দেখি যথা জলের তরঙ্গে
করিলে আঘাত বাড়ি, যেমন লহরী
উঠে উঠে চলে ছুটে, পবনের সঙ্গে
মিলি ধায়, ক্ষণ মধ্যে চৌদিকে প্রসারি
ক্ষণে পুন পায় লয় সরসীর অঙ্গে
সেরূপ তাহারা গেল দেশ পরিহরি,
উঠেছিল যে তরঙ্গ পাইয়াছে লয় ;
প্রাচীন কাহিনী সেই অল্প লোকে কয়।

২

অথবা অস্ত্রেতে হাত কেহ যদি কাটে
ঝরে নবরক্ত-ধারা, সবাই শিহরে,
কি হলো কি হলো ধ্বনি, যেন ঘর ফাটে,
ডাকাডাকি ছুটাছুটি করে পরস্পরে,
কিছুদিন থাকে ক্ষত, দুঃখে দিন কাটে,
পুন কাটা জোড়া লাগে, পুন কাজ করে
সেই হাতে, সেইরূপ তাদের বিরহে
কেঁদেছিল, থামিয়াছে, দাগ-মাত্র রহে।

৩

দাঁড়াতে না দেয় কাল ঠেলিয়া লইছে ;
নদীর বালুকা মত, সদা পদতলে
যেন মাটী সরে যায় ; জন্মিছে মরিছে
জীব কত ; দাঁড়াবে যে হাসি কাঁদি বলে,
তা হবে না ; কেবা হেথা বসিতে পাইছে ?
ছোট আর হাস কাঁদ ; দেখ ভূমণ্ডলে
কালচক্রে দিনরাত এক দুই করে
ঘুরে যায় হাসি-কান্না ডোবে পরস্পরে।

৪

কার বিশ্ব, মূঢ় নর ! তোমার গৌরব
সাজে কোথা ? যারে তুমি এত ভালবাস
সে জীবন তোমার কি ? এই শক্তি সব
ভাঙ্গিছে গড়িছে যারা, যাহাদের ত্রাস
তোমার পরাণে প'শে করিছে নীরব,
তারা কি তোমার ? নয় ! দেখ তুমি ভাস
যে শক্তির পারাবারে, সেই শক্তি কার ?
ভাঙ্গিছে চূর্ণিছে দর্প সতত তোমার।

৫

যেন কোন চক্রে পড়ি ঘুরিবে সকলে।
যেন সামালিতে নারি। না নিতে নিঃশ্বাস
ঘুরায় প্রবল বেগে, সামালিব বলে
যুক্তি আঁটি, গুঁড়া করে, দেখে লাগে ত্রাস !
আমার ইচ্ছার মত কিছু নাহি চলে।
এ কে শক্তি ? জোরে মোরে করিতেছে দাস !
আশার প্রাসাদ মোর স্রোতে ভাসাইছে ;
পাষাণ-শিলায় মৃত্যু বাসনা পিষিছে।

৬

টেনে ফেল্ সিন্ধু-জলে নাস্তিক বিজ্ঞান,
কাণা-মাছি খেলে সে যে, ভাল তো লাগে না।
হায়রে! খাঁচার পাখি! হাত মাত্র স্থান,
তাতেই রাজত্ব তোর! দিনে ও ভাগে না
খাঁচার আঁধার যার, আঁধারেতে গান
ভাগ্য যার, তার গানে ব্রহ্মাণ্ড জাগে না!
কেবা তোর তত্ত্ব লয়? কাল-স্রোত টানে,
তিষ্ঠিতে পারে না কিছু যায় কোন খানে!

৭

ছি ছি রে! মানব! তুই লয়ে হাঁড়ি-কুড়ি
সময়-বেলাতে বসি কতই খেলিবি?
না দেখি সিন্ধুর শোভা, বিজ্ঞানের ঝুড়ি
লয়ে শুধু এটী ওটী কত কুড়াইবি?
আপনি আগুন জ্বালি সে অনলে পুড়ি,
অবোধ শিশুর মত কতই কাঁদাবি?
কাঁদ মুখে হাত দিয়ে, অট্ট অট্ট হাসি
ওদিকে অনন্ত সিন্ধু লয় সব গ্রাসি।

৮

মুখে থু থু দিয়ে দূর কর সে বিজ্ঞানে,
দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ-সীমা যে লঙ্ঘিতে নারে,
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ মাত্র সার জানে,
বোতোলে ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব চায় পূরিবারে।
কে গো শক্তি! বেদে যারে অরূপ বাখানে,
দে গো দেখা। অজ্ঞতার এই কারাগারে
বন্দী হয়ে ডাকি তোরে। নয়নের ঠুলি
খুলে দে মা অনন্তের শোভা দেখে ভুলি।

৯

দূর কর! কি দেখিতে আসি কিবা করি!
সুরেন্দ্র-বিনোদ-শোকে যে দাগ পড়েছে,
ক্রমে ক্রমে লোকে তাহা যাইছে পাসরি;
তাদের সে নাম দেখি গ্রামেতে ডুবেছে,
মাঝে মাঝে দুই এক জনে শুধু স্মরি,
হায় হায় করে; বলে, দেশ ছেড়ে গেছে,
আছে কি মরেছে তারা কেহ নাহি জানে,
দশেতে উঠিলে কথা চরিত্র বাখানে।

১০

এদিকে উঠেছে বঙ্গে ঘোর হাহাকার ;
পড়েছে অকাল দেশে ; ক্ষেতে শস্য নাই ;
গোলাতে নাহিক ধান ; বিন্দু বারি-ধার
পড়ে নাই কত কাল ; যে দিকেতে যাই
এক কথা, এক দৃশ্য, অস্থি-মাত্র-সার
শত শত নর-নারী, করি খাই খাই,
ছুটিছে উন্মত্ত-মত নগরে নগরে ;
জমিছে ধনির দ্বারে দেয় দূর করে ।

১১

কোথা বা দরিদ্র জন, শ্রমে, অনাহারে,
জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন ; না পারে খাটিতে,
না খাটিলে নয়, সব মরে একেবারে,
খাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়িছে মাটিতে ;
তবু গোঁয়াইয়ে উঠি চায় খাটিবারে ।
পায়ে পা জড়ায়ে পড়ে, পারে না হাঁটিতে ।
সঙ্গেতে তিনটী শিশু, অস্থির পঞ্জর,
পিতাকে ধরিয়া তোলে ক্ষুধায় কাতর ।

১২

কোথা বা পেটের দায়ে দরিদ্র-সন্তান
গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরে ভিক্ষা মাগি ;
এঁটো পাতা ফেলে যদি, কুক্কুর সমান
মারামারি হুড়পরি করে তার লাগি ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রমে হইয়ে অজ্ঞান
ঘুরে ঘুরে পড়ে পথে ; জননী অভাগী
খুঁজে খুঁজে আসি তথা কাঁদে পথে বসে
কপোল-কঙ্কাল তার অশ্রুজলে ভাসে ।

১৩

হায় রে নারীর লজ্জা রয় না এবার ।
ভুলি ভুলি বস্ত্রগুলি, কোন দিক ঢাকে,
লজ্জায় যুবতী তাই টানে বার বার ।
অনাহারে যায় প্রাণ, লজ্জা কিরে থাকে,
সকাতরে যোড়করে পথেতে সবার
চরণে পড়িয়া কাঁদে ; ঘৃণা করি তাকে
ভদ্র-লোক যায় সরি ছুঁসূনি বলিয়া ;
পাগলিনী মত নারী বেড়ায় বুলিয়া ।

১৪

শুকায়েছে স্তনে দুগ্ধ, মনে তার স্নেহ ;
কোলের শিশুটা ঘোর ভার বোঝা লাগে ;
যারে তারে দিতে পারে যদি লয় কেহ ;
কোথা বা শিশুরে ফেলে মাতা তার ভাগে
প্রাণ-দায়ে, কেঁদে কেঁদে অবসন্ন-দেহ,
মরণ-গ্যাঙ্গানি তার কণ্ঠে শুধু জাগে ;
চৌদিকে দারিদ্র্য-অগ্নি কে কোথা নিবারে ?
দেখিছে অনেকে, কেহ নাহি লয় তারে।

১৫

নরের অখাদ্য যত পাতা লতা মূল
তাই খাদ্য ; তারি তরে কত মারামারি !
শূকর সমান খোঁড়ে, ক্ষুধাতে আকুল,
যাহা পায় তাহা খায়, লাগে মারামারি।
যে বাঁচে অকালে, রোগে সে হয় নির্ম্মূল ;
ছুটা-ছুটী চারিদিকে রাজ-কর্মচারি,
বাঁচাও বাঁচাও রব উঠিয়াছে দেশে,
শুনিনু বিদেশ হতে শস্য না কি আসে।

১৬

একি রে দারুণ দুঃখ ! হা শস্য শালিনি !
জন্মভূমি ! মাগো তোরে স্বর্ণ-ভূমি ব'লে
কত যে বাড়ায় লোকে। হায় অভাগিনি !
এই কি মা স্বর্ণভূমি ? ক্ষুধার অনলে
পুড়ে পুত্রকন্যা তোর, দিবস-যামিনী
কেঁদে কেঁদে বুলে ;—মাগো ভাসি নেত্র-জলে
এ দৃশ্য সহে না প্রাণে, এই হাহাকার
যথা যাই প্রাণ-মাঝে জাগে অনিবার।

১৭

বিনোদের ভয়ে ভেগে অগ্নি-কাণ্ডে প'ড়ে
কবির যাতনা হলো। হৃদয়-বিদারি
এ দৃশ্য সহে না আর ; প্রাণ ধড়ফড়ে
যাইতে সে গিরি-কুঞ্জে ; এ বিপত্তি ভারি।
দেখি যদি তারে যাই প্রেম-কূপে পড়ে,
না দেখিলে বহুকাল রহিতেও নারি।
সাধে কিরে ভাল বাসি ওই নারী-ধনে,
হৃদয় উন্নত যার পবিত্র দর্শনে।

১৮

চাইত সে প্রেম যাহে চিত্ত সমুন্নত ;
নহে কুবাসনা, স্বার্থ দেয় ভুলাইয়া ;
নীচ-রুচি কবি যত, শূকরের মত
প্রেমে অপকৃষ্ট বস্তু বেড়াক্ খুঁজিয়া।
বিনোদ। পবিত্র মুখ তোমার নিয়ত
ফুটে থাক ভ্রাতৃ-পাশে ঘর আলোকিয়া—
সে কি নারী-মূর্ত্তি ? কবি মনে মনে বলে
পুণ্যালোক এক খণ্ড পড়েছে ভূতলে।

১৯

কে পারে বর্ণিতে প্রেমে, পার্থিব কুয়াসা
মাঝে পড়ি, ধরাতলে যেই ভেক বসে,
সে কি বোঝে, কোন সুখে, পেয়ে কোন আশা,
সুদূর আকাশে পাখী মনের হরষে,
তরল তপনালোকে সাঁতারিয়া ভাসে ?
জ্ঞানীর জ্ঞানের সুখ বোঝে কিরে চাষা ?
সেরূপ কি প্রেম-শৃঙ্গে নারীর আলয়,
কুরুচি কবির তাহা বোঝা সাধ্য নয়।

২০

মহা-পঙ্কে গজ-রাজ পড়িয়ে যেমতি
পায়ে দলে, বড় বড় পূতি-গন্ধ-ময়।
অনেক কবির প্রেম দেখিয়ে তেমতি,
ইন্দ্রিয়-বিকার-গন্ধে যেন বমি হয়।
তাহাদের হাতে কোন পড়িলে যুবতি,
কি দুর্দ্দশা। সেই প্রেম পবিত্রতা-ময়
তাহারে ডোবায় পাঁকে ; তাহে তুচ্ছ জানি
রক্ত-মাংস লয়ে শুধু করে টানাটানি।

২১

ইন্দ্রিয়-বিকার রোগ জন্মেছে যাহার,
তার যদি মহৌষধ কেহ মোরে চায় ;
আমি বলি—খুঁজে লও নারী এ প্রকার,
পার্থিব পাপের কালি স্পর্শেনি যাহায়
লাবণ্যে কলঙ্ক-রেখা হয়নি সঞ্চার,
নারী যদি পাও হেন, গিয়ে তার পায়
আপনারে ফেলে রাখ, সাধুতা-বাতাসে
ইন্দ্রিয়-বিকার-রোগ পলাবে তরাসে।

২২

রাজহংসী পদ্ম-বনে, নির্মল সলিলে,
ডোবায়ে কোমল অঙ্গ যথা ভেসে যায়,
তেমনি যে নারী-রত্ন, পুণ্যের অনিলে
বিস্তারি প্রেমের পাখা খেলিয়া বেড়ায়,
দেখি প্রতিবিম্ব তার যেন স্বচ্ছ জলে।
সে রত্নে যদি রে! কবি একবার পায়,
তবে বুঝি সিংহাসনে বসায়ে তাহারে
নর-কুলে দেবী বলে পূজিবারে পারে।

২৩

ওই যা! অখ্যাতি রাষ্ট্র হলো যে জগতে.
রমণী পূজক বলে দিবে টিট্‌কারি।
দি'ক্ দি'ক্। ওগো নারি! ঈশ্বর-কৃপাতে
সে সত্য পুরুষে যদি পরাণ আমারি
নাহি পেত; নাহি কিছু সংশয় ইহাতে,
এ কবি পূজিত বসে চরণে তোমারি।
প্রকৃতির শোভা তুমি, স্বর্গের সুঘ্রাণ,
নয়নের জ্যোৎস্না তুমি জুড়াইতে প্রাণ।

২৪

প্রেমে প্রেমে চেনে, দেখে পুণ্যবানে পুণ্য।
নব উষা যবে দেখা দেয় পূর্বাচলে,
গো-মেষ দেখিলে তাহা দেখে শুধু শূন্য,
ভাবুক ভাবেতে ভোলে ভাসে নেত্রজলে;
সেরূপ তোমার শোভা দেখে সেই ধন্য,
যে জানে তোমার গুণ; জড় বুদ্ধি হলে
তোমার রূপের ফাঁদে বাঁধা পড়ি রহে;
যাবে কি অধ্যাত্মে, আঁখি খুলিবার নহে।

২৫

দূর হোক যাই তথা। গিয়ে দেখি তারা
উঠেছে দুজনে দূরে পাহাড় উপরে।
কি সুরম্য স্থান সেটা! দুটী জল-ধারা
ঝরিছে দুপাশ দিয়ে ঝরঝর ঝরে;
শাখে শাখে মিশি শিরে চন্দ্রাতপ-পারা!
অথচ সম্মুখে দৃষ্টি রোধ নাহি করে।
তথা বসি ওই দূরে অসীম বিস্তৃত
সমতলে, গ্রাম নদী হইছে লক্ষিত।

২৬

আজিকে দেশের কথা প্রাণে জাগিয়াছে ;
সেই কথা ভাই-বোনে একান্তে বসিয়া
একি নর-দ্বেষ দেখি ঘুচিয়া গিয়াছে,
মানবের দিকে প্রেম চলেছে ছুটিয়া :
দেশের দুর্গতি-চিন্তা প্রাণে উঠিয়াছে ;
নরেন্দ্র বর্ণনা করে ; সে মুখ চাহিয়া
বিনোদ শুনিছে বসি ; মাঝে মাঝে তার
সুন্দর কপোল বেয়ে বহে অশ্রুধার।

২৭

"সমতল ক্ষেত্র বোন ! ওই যে প্রসার
দেখেছ ত কি উর্বরা ! এমনি ভারতে
সর্বত্র দেখিবে ক্ষেত্র ; তবু হাহাকার
অর্থাভাবে ! স্বর্ণ-ভূমি বাখানে জগতে
সেই ভূমে তারি দশা আজ এ প্রকার।
থাকিলে এ ধন-ধান্য প্রজাদের হাতে,
আয়-ব্যয় বাণিজ্যেতে থাকিলে প্রভুত্ব,
থাকিত না দরিদ্রতা লভিত মহত্ত্ব।

২৮

দারিদ্র্যে প্রজারা মগ্ন, রাজ্যেশ্বর যারা
পরদেশে, পরভূমে, স্বার্থের কারণে
কিছুকাল তরে হেথা আসে যায় তারা ;
মরিলে দেশের প্রজা তাদের পরাণে
লাগে না ভগিনি ! তাই দেখে অশ্রুধারা
নাহি জাগে ; লুটে লয় যে পারে যেমনে !
এ নূতন জাতি বোন ! জেতা ও বিজিত ;
তাড়িত দেশের লোক চরণে দলিত।

২৯

সাশ্রু-নেত্রে বলে বালা ;—"শুনি পুরাকালে
হিন্দুর পৌরুষ কথা ; এমনি কি হীন
হ'য়ে গেল ? ডুবিল কি এমনি পাতালে ?
পরিতে দাসত্ব গলে মুখ কি মলিন
হইল না ? যবনেরা আসিল যে কালে
থাকিতে পৌরুষ এরা দিত না সে দিন
পরাইতে এ শৃঙ্খল। দাদা ! বন-পাখী,
তারে যদি ধরে কেউ সেও যাবে না কি ?

৩০

ভাই বলে—"তাতো বটে, সহজে ইহারা
নিল যে দাসত্ব-পাশ, তাতেই প্রমাণ,
শৌর্য-বীর্য যাহা কিছু এককালে তারা
পেয়েছিল, কালে সব হ'লো অন্তর্ধান।
এ হ'তে দুঃখের কথা :—দারিদ্র্য যাহারা
পিষে যায়, তারা দেখ মেষের সমান।
দিশাহারা। যেন এক খোঁয়াড়ে পুরেছে ;
যা হ'লে বাঁচিতে পারে তাহা না করিছে।"

৩১

বিনোদ জিজ্ঞাসে—' দাদা। বিদেশিরা চ'লে
যায় যদি, তাহলে কি দেশবাসিগণ
আপনা শাসিতে পারে ?" ভাই হেসে বলে,
"ভাবনা কি তাহা হ'লে, বল দেখি, ধন
উপার্জিতে জানে, কিন্তু তাহা কি কৌশলে
রাখিতে খাটাতে হয় জানে না যে জন,
তার ধন লাভ কি চলা বিড়ম্বনা নয় ?
স্বাধীনতা ধন তথা জানিও নিশ্চয়।

৩২

স্বাধীনতা বড় সুখ, কিন্তু লো রাখিতে
না জানিলে, স্বাধীনতা ঘোর বিড়ম্বনা।
রাজারা ফিরুক পৃষ্ঠ জাতিতে জাতিতে
মারামারি কাটাকাটি, বাড়িবে যাতনা,
বর্গীর হাঙ্গামা পুন হবে বা সহিতে,
আবার বাজিবে ঘোর সমর বাজনা,
হিন্দু ও যবন পুন হবে অগ্নিময় ;
মানব-রুধিরে দেশ ডুবাবে নিশ্চয়।

৩৩

কোথা বোন। সে একতা, সে আত্ম-সংযম,
যাহা বিনা স্বাধীনতা উগরে গরল,
যাহা বিনা মহানর্থ ঘটে লো বিষম ;
যাহা বিনা ডুবে দেশ যায় রসাতল।
ভারতে বিভিন্ন জাতি ভাবে শত্রুসম
পরস্পরে, এই ভাব থাকতে সুফল
ফলিবে না সেই বৃক্ষে। প্রেমের বিস্তার
দেশে না হইলে গতি দেখি না লো আর।"

৩৪

বলে বালা, "দাদা! তুমি মহামূল্য সত্য
প্রকাশিলে কথা-মাঝে। আপনা-শাসনে
যে অক্ষম, সুনিশ্চিত এই সার তত্ত্ব
সে যদি স্বাধীন হয়, স্বাধীনতা ধনে
তাহারে দরিদ্র করে, ঘুচায় মহত্ত্ব ;
পশুর অধর্ম করে ইন্দ্রিয় সেবনে।
আমি বলি সেই নারী আপনা শাসিতে
নাহি জানে, এ দুর্দশা তার পৃথিবীতে।"

৩৫

নরেন্দ্র পুলকে হৃদি চাপিয়া আদরে
বলে,—"বোন! বেঁচে থাক। দেখ একবার
জাতিভেদে কি করেছে! খণ্ড খণ্ড করে
ভারত-সমাজে। বিষ ঢালিয়া ঘৃণার,
দিয়াছে আগুন-জ্বালি ; যুগ যুগান্তরে
সে আগুন নিবিল না ; ভাই ভাই আর
ভাই ভাই নাহি জানে ; ঘৃণা করি ঠেলে,
এক জাতি অন্যে যেন কতদূরে ফেলে।

৩৬

বিষাক্ত লতার ফল পড়ি যথা বনে
শতেক লতিকা জন্মে, সে রূপ ভগিনি!
এই বিষ-বৃক্ষ হ'তে ভারত-কাননে,
বিষ বৃক্ষ শত শত জন্মি সুহাসিনি!
হরেছে মনের শান্তি, ভবনে ভবনে
ঢালিয়াছে বিষ ; জন্মভূমি অভাগিনী
পড়েছে এমনি বাঁধা অধীনতা-জালে
জানি না সরলে! রক্ষা পাবে কত কালে।

৩৭

হাত পা এমনি বাঁধা এজাতি শৃঙ্খলে,
পৌরুষ-বিহীন লোক, প্রতিভা, মহত্ত্ব,
সব লুপ্ত, দশ জনে, এক জন-গলে
পা দিয়ে চাপিয়া রাখে ; নাহি মনুষ্যত্ব ;
দল ভয়ে ভীত সবে ; প্রাণ যাহা বলে
তাহা না করিতে পারে। শুন সার তত্ত্ব
পৌরুষ-বিহীন যারা, তাদের দুর্গতি
কে নিবারে? সে রোগের সেই পরিণতি।

৩৮

নারীর দুর্গতি দেখ ; এই মহাপাপে
ভুগেছে অনেক সাজা মূঢ় দেশ-বাসি।
প্রেমের প্রতিমা নারী, যদি মনস্তাপে
ফেলে অশ্রু, দুঃখানল ত্বরা করি গ্রাসি,
পোড়ায় তাহার শান্তি। পদতলে চাপে
নারী-কুলে, জ্ঞান-জ্যোতি তাদের বিনাশি,
রাখিয়াছে অন্ধকারে, এই সাজা তার
ডুবিছে পাপের পঙ্কে দেশ অনিবার।

৩৯

ক্ষুদ্রাশয়, নীচ, অজ্ঞ, থাকিলে রমণী,
তার সনে পাপ-কূপে পুরুষ ডুবিবে,
বুঝ কি লো ? নারী প্রেম-পবিত্রতা-খনি,
নারী পুণ্য-স্থিতি রক্ষা জগতে করিবে,
সে নারী পঙ্কেতে যদি ফেলে লো ভগিনি!
কে বাঁচায় সেই দেশে ? কে তার তুলিবে
দুরন্ত পুরুষে বোন! এক গর্তে যাবে ;
আপনি ডুবিয়া নারী পুরুষে ডুবাবে।

৪০

তাই দেখ রমণীকে রাখিয়ে আঁধারে
পাপ-পঙ্কে ডুবি মোরা, প্রাণের বিনোদ!
তুমি বোন! শিখায়েছ এ তত্ত্ব আমারে ;
রমণীর মূল্য কি হইয়াছে বোধ
তোমার আলোকে থেকে।" বালা লজ্জা-ভাবে
নত-মুখ। ভাই বলে,—' এ ঋণের শোধ
নাই লো ভগিনি! আমি তোমার কৃপায়
নূতন জীবন যেন পেয়েছি ধরায়।"

৪১

বলি শুন, "আমি ভাবি, ও পবিত্র মুখ
হেরে মোর অন্তরাত্মা যেরূপ উন্নত,
যদি ঘরে ঘরে লোক পায় এই সুখ,
জ্ঞানে ধর্মে প্রেমে নারী যদি সমুন্নত
হয় এ প্রকার, তবে পুরুষ বিমুখ
হ'য়ে কি ডুবিতে পারে পাপে অবিরত ?
নারী-প্রেমে সুরক্ষিত হইয়া, পুরুষ
জ্ঞানে ধর্মে বাড়ে বোন! পায় লো পৌরুষ।

৪২

বিনোদিনি ! কি বলিব, বহু স্থান ঘুরে
ভারত-নারীর বোন ! যে দশা দেখেছি,
প্রাণেতে বেজেছে শেল, শোকের অক্ষরে
সে কথা হৃদয়-পটে লিখিয়া রেখেছি।
অবলা পাইয়া তাকে কাপুরুষ নরে
কাঁদাইছে দিন-রাতি ! পরাণে দেখেছি
সেই অশ্রু ! আজি বোন ! কথায় কথায়
কে যেন সে দুঃখ-চিত্র খুলিয়া দেখায়।

৪৩

বঙ্গের নারীর দশা কি বলিব আর !
পিঞ্জরের পাখী তারা, যে নারীর মুখ
সংসার-পথের জ্যোৎস্না, প্রেমা শু যাহার
পরশে পবিত্র করে, হরে সর্ব দুখ,
সে মুখ লুকায়ে রাখে, সংসার আঁধার
হ'য়ে থাকে, গৃহবাসে হইয়া বিমুখ
পুরুষ সুখের আশে যায় স্থানান্তরে,
তাহাতে সমাজ-নীতি কলুষিত করে।

৪৪

অধিক কি পোড়া দেশে ভ্রাতা ও ভগিনী
কত দূর পরস্পর ! ছিলাম তো ঘরে
তুমি তো নিকটে ছিলে, কিন্তু বিনোদিনি !
স্বর্গের এ সুখ বোন ! দিনেকের তরে
মিলে নাই ; প্রাণ খুলে এমন ভগিনি !
হয় নাই কথা ; যেন অন্তরে অন্তরে
বেড়াতাম ; বিধি কৃপা করিয়া দুজনে,
দিলেন অমূল্য শিক্ষা আনিয়া নির্জনে।

৪৫

নীতির অবস্থা ভাবি হৃদয় শুকায় !
বেশী কথা কি বলিব, সত্যটা বলিতে,—
হয়েছি এমন হীন— বলে না কুলায় !
কর্তব্য বলিয়া বুঝি, সে কাজ করিতে
শক্তি নাই ; লোক-ভয়ে সবে জড়-প্রায় !
কপটতা নিত্য কার্য ; ছলিতে ছলিতে
পৌরুষ-বিহীন লোক, দুর্বল, অসার !
সত্যকে করিতে প্রীতি শক্তি নাহি আর !

৪৬

আরো প্রবেশিয়া দেখ, গভীর স্থানেতে
বসেছে রোগের বীজ। সেই প্রাণাধার,
সেই সত্য, সেই জ্যোতি। যাঁহার ধ্যানেতে
জীবনের উৎস খোলে, অমৃত-সঞ্চার
হয় প্রাণে, ভুলে তাঁরে ধরম জ্ঞানেতে
অসারে সেবিছে লোক ; ক্রিয়ামাত্র সার
করে আছে ; নাহি জানে, অন্ধের সমান
করিয়া অসত্য-সেবা খোয়াইছে প্রাণ।

৪৭

ধর্ম কি জানে না তারা, অমৃতের খনি
ফেলে, তৃষ্ণানল তারা নিবারিতে চায়
পচা জলে। বিনোদিনি! দেখে মনে গণি,
দুর্ভিক্ষে অভাগী নারী যবে মরে যায়,
শিশু তার বক্ষোপরে হাতাড়ে যেমন
করিবারে স্তনপান, তেমনি কি হায়!
লক্ষ লক্ষ নর-নারী মৃত-দেহোপরে
হাতাড়িছে বৃথা তৃষ্ণা মিটাবার তরে।

৪৮

ওই দেখ তরুরাজি পল্লব-ভূষণে
সাজিয়াছে, সাজে যথা উৎসবের কালে
গ্রাম বাসি, শ্যাম-কান্তি জুড়ায় নয়নে।
প্রতিবারে নবরূপ, সুবসন্ত হ'লে
দেয় বিভু ওই বৃক্ষে ; পরের সদনে
হয় না করিতে ধার ; মেঘ জল ঢালে,
ধরণী যোগায় রস, সুখাদ্য পবন,
শিশির সুস্নিগ্ধ বারি, উত্তাপ তপন।

৪৯

প্রাণের ভগিনি! বাড়ে দেখ বনস্পতি,
ঈশ্বরের ভৃত্য-দলে বাঁচায় উহারে।
তবে কি লো এই আত্মা, অনন্ত শকতি,
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা যোন! দিয়ে এ প্রকারে
যারে গড়েছেন প্রভু সেই আত্ম'-প্রতি
নাহি কি লো দৃষ্টি তার? বাঁচাইতে তারে
নাহি কি ব্যবস্থা কিছু? তাঁহার উদ্যানে
সকলে বাড়িবে এটি শুকাইবে প্রাণে!

৫০

না না দেব নিন্দা হবে একথা ভাবিলে।
আছে আছে সেই উৎস, যার জল-রাশি
নিত্য-স্নিগ্ধ, যার পাড়ে বারেক রাখিলে
এ জীবনে, নিত্য নব সৌন্দর্য বিকাশি
বাড়িবে বাড়িবে; তাহা বারেক পাইলে
পুন এ দেহে পাবে প্রাণ মৃত দেশ-বাসি।
হায়রে এ উৎস ফেলে, কি লইয়া আছে।
বিকায় অমর আত্মা কুহকের কাছে।

৫১

পচিলে জীবের দেহ, কৃমি কীট তাতে
জন্মে যথা, বজ্‌ বজ্‌ গলিছে খসিছে।
তেমনি ভুলিয়া সত্যে মৃতের সেবাতে
মরেছে অধ্যাত্ম-ভাব, তাহাতে বসিছে
যেন লো অগণ্য কৃমি; পাপের ক্রিয়াতে
গুরুরা ডুবায় শিষ্যে; দুর্নীতি পশিছে
হাড়ে হাড়ে; পূতি-গন্ধ সমাজ-শরীরে;
অথচ ধর্মের ঠাট রয়েছে বাহিরে।

৫২

মানবের মনুষ্যত্ব গিয়াছে মরিয়া;
ঘোর ভ্রান্তি, ঘোর মোহে, মগ্ন নর-নারী;
কি যে করে, কেন করে, বারেক ভাবিয়া
নাহি দেখে; চিন্তা-শক্তি আবরি সবারি
রাখিয়াছে কুসংস্কারে; শিরেতে ধরিয়া
শাস্ত্রাদেশ, লোকাচার, সবে সারি সারি
গড্ডলিকা-প্রবাহবৎ এক কূপে ডোবে;
মনে ভাবে পরকালে তাতে শান্তি পাবে।

৫৩

ভগিনি! ধর্মের তত্ত্ব এই মাত্র জানি;—
সত্য যিনি তাঁরে পাব; সত্যের জ্যোতিতে
আনন্দে করিব বাস; সত্যে শ্রেষ্ঠ মানি
সমগ্র হৃদয়-মন তাঁহারি প্রীতিতে
নিয়োজিব; সত্য অন্নে বাঁচিবে পরাণ।
সত্য গৃহ, সত্য বস্ত্র লজ্জা নিবারিতে;
সত্যালোক পায় যেই সেই ত স্বাধীন,
নব শক্তি নব আশা ফুটে দিন দিন।

৫৪

এই শক্তি, এই আশা, এই স্বাধীনতা,
পাইতে হৃদয়ে আশ। সুনীল গগনে
আনন্দে বিহগ খেলে উষালোক যথা,
তেমনি বাসনা খেলি সে সত্য-তপনে;
সে আগুনে পাপশক্তি পোড়াই সর্বথা।
বুঝেছি বুঝেছি বোন! না পেলে সে ধনে,
আত্মার অস্থির কালি যাবে না যাবে না,
আসক্তি উত্তাপটুকু কভু নিবিবে না।

৫৫

এই শক্তি, স্বাধীনতা পা'ক দেশ-বাসি,
দেখি তারা জাগে কি না? নিশার আঁধার
যায় চলি, পূর্বাচলে সুষমা প্রকাশি
যবে উষা যায় দেখা। পাপ অত্যাচার,
কুরীতি কুনীতি সব সেই রূপ নাশি,
করিবে লো মৃতদেহে চেতনা সঞ্চার,
পাইবে পৌরুষ সবে, আসিবে মহত্ব,
আপনি পড়িবে খসি সকল দাসত্ব।"

৫৬

শুনিয়া বিনোদ বলে, "এই দুঃখার্ণবে
মগ্ন দেশ, আমরা কি বসিয়া নির্জনে,
কেবল স্মরিব দশা? চিত্রিলে কি হবে
ও দুর্দশা? হেন ইচ্ছা হইতেছে মনে,
ছুটে যাই, এই দেহে যতদিন রবে
প্রাণ-বায়ু, দিবানিশি খাটি প্রাণ-পণে,
নরের দুঃখের বোঝা যা কমাতে পারি;
সেই সমুচিত দাদা। সেবা যে তাঁহারি।

৫৭

ডুবিয়া আপন সুখে রহেছি আমরা;
জগতের দুঃখে কর্ণ করেছি বধির।
আজ যেন শোকে পূর্ণ দেখিতেছি ধরা,
কি এক ক্রন্দন ধ্বনি করিছে অস্থির
আজ প্রাণে। 'স্বার্থপর বড়ই তোমরা'
কে যেন বলিছে কানে। যেন নেত্র-নীর
ফেলে কেহ ডাকিতেছে! শুনিয়া তোমার
শোকের কাহিনী প্রাণ বসে না যে আর।

৫৮

এমনি কি হবে এই ঘোর দুঃখানলে
পুড়ে পুড়ে দেশ বাসি ধূলিতে মিশিবে,
নাই কি উদ্ধার দাদা! যাঁর কৃপাবলে
পাইয়াছি নব-জন্ম, সে প্রভু দেখিবে
এ দুর্দশা? তবে তাঁর নাম ধরাতলে
কে করিবে? না না এই দেহে কি হইবে,
যদি এ দুর্গতি-ভার, এ ঘোর আঁধার
ঘুচাইতে রক্ত-মাংস না যায় ইহার।

৫৯

দাদা গো! এই না বেগে ছোটে নির্ঝরিণী,
ইহার উৎপত্তি হলো উন্নত অচলে;
কিন্তু দেখ শৃঙ্গে শৃঙ্গে নামি প্রবাহিনী
ধাইছে আনন্দে কেন? ছোটে সমতলে
কার তরে? কেন নদী, এ গিরী-নন্দিনী,
না রহিল চিরদিন জনকের কোলে?
জীবের কল্যাণ-তরে ওই নেমে যায়,
কুলু কুলু কুলু কুলু যায় আর গায়।

৬০

স্বর্গের দুহিতা কোন গাইতে গাইতে,
পবিত্র প্রেমের উৎস ঢালিয়া ঢালিয়া,
পুণ্যধাম হতে যথা নামে অবনীতে,
তেমনি নামিছে নদী। দাদা গো! দেখিয়া
বড়ই বাসনা আজ হইতেছে চিতে,
সখী হয়ে ওর সনে যাই গো নামিয়া;
লয়ে যাই প্রেম, পুণ্য, শান্তি, উর্বরতা,
সন্তাপ-দারিদ্র্য-দুঃখে মগ্ন লোক যথা।"

৬১

নরেন্দ্র চুম্বিয়া বলে, "ভগিনি আমার!
তটিনীর সখী হবে? প্রেম কল্লোলিনি!
তোই তো তোমারে সাজে। হৃদয় তোমার
যে প্রেমের উৎস বোন! সামালিতে আর
যখন পারে না নদী, হয় প্রবাহিনী।
উঠেছে তোমার প্রেম আজ উছলিয়া,
মানব-সংসার-পানে চলেছে ছুটিয়া।

৬২

তাই হবে প্রেম নদি ! স্বার্থপর হয়ে,
এ ক্ষুদ্র পল্বলে বাঁধি আর রাখিব না,
যাও ছুটি, শান্তি-জল লয়ে যাও বয়ে।
আমি কি কঠিন এত ? আমি কি দিব না
এই প্রাণ তব কাজে ? একই আলয়ে
ছুটী ধারা জন্মিয়াছে, কেন মিশাব না
ও জীবনে এ জীবন ? চল ছুই জনে
এ ছুই ধারার মত নামি লো ভুবনে।

৬৩

যদি আমি সেই রূপ আজি স্বার্থপর
থাকিতাম, তবু তুমি এমনি পরাণে
মিশেছ পশেছ বোন ! ও মুখ সুন্দর
না দেখে কিরূপে আমি এ বন-শ্মশানে
থাকিতাম ? কৃপা করি আমারে ঈশ্বর
দিয়াছেন নব-চক্ষু ; বুঝেছি এখানে,
এই মর্ত্যে, পরসেবা যেবা করে সার,
সেই সুখী, সেই ধন্য, সে হয় উদ্ধার।

৬৪

আমি যাব প্রেম-নদি ! তব পাশে পাশে
এ অধমে স্বর্গ-কন্যে ! যেও না ফেলিয়া।''
বলিয়া নরেন্দ্র কাঁদে। অশ্রুজলে ভাসে
মুখ-পদ্ম, ভ্রাতৃ-হস্ত বিনোদ ধরিয়া
বলে,—"দাদা ! ওই মুখ দেখিবার আশে
এসেছি গহনে ; আজ তোমারে ফেলিয়
যাব আমি ! শুধু ভাই নও তো আমার ;
তুমি যে জীবন-দাতা বন্ধু এ আত্মার !

৬৫

জন্মিয়া অভাগা দেশে ছিলাম আঁধারে,
তুমি যে প্রাণের ভাই ! কত ভালবেসে
দিলে জ্ঞান, দিলে প্রাণ ; ভাঙ্গি কারাগারে
হাত ধরি ছেড়ে দিলে পুণ্যের বাতাসে ;
ডুবায়ে পবিত্র প্রেমে তুলিলে আমারে
কোন শৃঙ্গে ! ধর্ম-গুরু হয়ে অবশেষে
হাতে ধরি আত্ম-ধামে নির্জনে লইয়া,
জীবনের উৎস মোরে দিলে দেখাইয়া।

৬৬

দেখেছি অপূর্ব জ্যোতি, পাইয়াছি আশা
হইবে ধর্মের জয়। পাইবে উদ্ধার
পাপী-তাপী; তাই প্রাণে বেড়েছে পিপাসা;
এই দেহ, এই অস্থি, এই মাংস তার
দিব তাঁর কার্যে দাদা। এই ভালবাসা
যা পেয়ে বেঁচেছি আমি, দিব একবার
বাঁটিয়া জগত-জনে।" মুদ্রিত-নয়নে,
নরেন্দ্র ওদিকে ওই ডুবে গেল ধ্যানে॥

৬৭

হায় রে বিনোদ! আজ কি ভাবে পরাণে
উথলিয়া উঠে! আজ স্পন্দহীন হয়ে,
চেয়ে চেয়ে সেই মুখে, যেন কোনখানে
ডুবে যায়! নেত্র দুটী তারও নিমীলিয়ে
গেল; বালা কর যুড়ি, সুমধুর তানে
ধরে গান; দুই কণ্ঠ একত্র মিলিয়ে
কি এক অপূর্ব ধ্বনি জাগায়ে তুলিল;
পাহাড়ে পাহাড়ে রব ঘুরিতে লাগিল।

৬৮

গাইছে আচ্ছন্ন হয়ে, শুনি বন-পাখী
উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে, মস্তক উপরে
বসিছে সে বৃক্ষ-শাখে; বনে বনে থাকি,
পাহাড়িরা কাজ ফেলি ডুবে সে সুস্বরে।
প্রাণ-ধন প্রজাপতি-ধরা ফেলে রাখি,
এক-দৃষ্টে দুজনের দেখে নেত্রনীরে।
এ হেন সুন্দর ভাবে, সে সুন্দর স্থানে,
আত্মোৎসর্গ মন্ত্র দীক্ষা লইল দুজনে।

৬৯

জ্বলেছে দুর্ভিক্ষ-অগ্নি শুনিল স্বদেশে,
বালক-বালিকা-শত কাঁদে নিরাশ্রয়ে।
প্রার্থনার পরে স্থির করে অবশেষে,
ভাই-বোনে পুনরায় গিয়ে লোকালয়ে,
কুড়ায়ে সে সব শিশু, রাখি ভালবেসে,
জ্ঞান-ধর্ম শিক্ষা দিবে মিলিয়া উভয়ে।
সে কারণে পুন তারা দেশে ফিরি যায়;
মানবের প্রতি প্রেম উথলিয়া ধায়।

৭০

রহিল সে গিরি-কুঞ্জ, সেই নির্ঝরিণী,
সেই শান্তিময় স্থান, প্রত্যেক প্রস্তর,
প্রতি বৃক্ষলতা যার। আজ বিনোদিনী
ছাড়িতে আকুল কাঁদি ; গ্রথিত অন্তর
তার সনে ; কত চিন্তা করেছে কামিনী
বসি তথা, তাই প্রীতি তাদের উপর
এত দূর, বাঁধা তারা জীবনের সনে ;
না ফেলিয়া অশ্রু আজ ছাড়ে বা কেমনে।

৭১

শ্রীদয়াল। আজ তুমি কেন রে আকুল ?
সমীপে না আসে, দেখি আড়ালে আড়ালে
ফেলে অশ্রু ; প্রাণে তার সংগ্রাম তুমুল !
একবার ভাবে, যাই নামি সমতলে,
এই সহবাসে রব ; ভাব প্রতিকূল
পুন আসে, যবে চিন্তে পরিজন দলে ;
বিনোদ ডাকিয়া কাছে মুখ-পানে চায় ;
আপনি দুইটি ধারা দুচক্ষে গড়ায়।

৭২

গৃহের সামগ্রী কত দিল বালা তারে,
ভগিনীকে দিও বলি, দিল উপহার।
বিদায় লইয়া চলে। সে কুঞ্জ আঁধারে
ডুবিল রে। সে বিচ্ছেদে শোকের সঞ্চার
সর্ব-জীবে। আর পাখী তেমন সুস্বরে
আজিকে ডাকে না যেন। বন পশু আর
না দেখি সে মুখ যেন দাঁড়াইয়া ভাবে !
পশেছে বিষাদ যেন তাদেরো স্বভাবে।

চতুর্থ দল

নর-সেবা

তাহারা ফিরিল দেশে। ফিরিয়া প্রথমে
নিজ-গ্রামে গেল, আজ বহুদিন পরে
কি আনন্দ ঘরে ঘরে এই সমাগমে !
সদা আসে যায় লোক ; প্রসন্ন-অন্তরে
সকলে সম্ভাষে যুবা ; বাড়ায় সম্ভ্রমে
গুরু-জনে ; বন্ধু যারা, বাঁধি সে সবারে
আলিঙ্গনে, প্রেমে যেন দেয় মাখাইয়া ;
বাল বৃদ্ধ সবে তৃপ্ত সে প্রেম পাইয়া।

২

রয়েছে সেই সে বাটী, সেই সে উদ্যান,
সবে করে হায় হায়। কিন্তু তার প্রাণে
নাহি বিন্দুমাত্র ক্লেশ; করে তুচ্ছ জ্ঞান
সে সকলে; জ্ঞাতি-গৃহে আনন্দে দুজনে
করে বাস; উচ্চ নীচে করি প্রেম দান,
সবার হৃদয় কাড়ে; নির্জনে কেমনে
গেল কাল, ভেঙ্গে বলে; কথা শুনিবারে
আত্মীয়-স্বজন-মিত্র ঘেরে চারিধারে।

৩

উথলে আনন্দ প্রেম কি এক হৃদয়ে।
হাসি-রাশি প্রেমালাপে পড়ে উছলিয়া।
যে আসে নিকটে, সেই নবভাব পেয়ে,
যতক্ষণ থাকে পাশে, যায় পাসরিয়া
পাপ তাপ; কেহ যেন মনগুলি লয়ে
গালিয়া সে সুধা-রসে দেয় ফিরাইয়া।
কি এক অপূর্ব শক্তি সেই আবির্ভাবে,
দুদণ্ড থাকিলে পাশে ফুটায় স্বভাবে।

৪

বিস্ময়ে সকলে বলে, "এই কি সে জন?
এই কি নরেন। যার হৃদয় ভাঙ্গিয়া
গিয়াছিল, অভিমানে যে কভু ভবন
ছাড়িত না, প্রাণ যার গরলে পুড়িয়া
হয়েছিল জর জর কীটের মতন
হেরে নরে, ঘৃণা ভরে গেল যে ছাড়িয়া?
এই কি নরেন। একি ভাবের সঞ্চার?
পেয়েছ কি ধন যাতে আনন্দ অপার?"

৫

ওদিকে বিনোদ দেখ প্রেম-ফুল ডালা
সাজায়ে এনেছে দেশে; নিষ্কলঙ্ক মুখ
প্রেমেতে ফাটিয়া পড়ে; প্রেমালোকে বালা
ঢল ঢল করিতেছে; অন্তরের সুখ
হাসিতে উছলে পড়ে; পেয়ে শত জ্বালা
বাল্যের সঙ্গিনী তার আজ ম্লান-মুখ
কাছে এলে, অশ্রুজলে অশ্রু মিশাইয়া,
অর্ধেক যাতনা যেন দেয় জুড়াইয়া।

৬

পবিত্র বসন-ভূষা, পবিত্র ব্যভার,
বিনোদিনী নয় সেই ধনীর দুহিতা।
প্রসন্ন, বিনীত, শান্ত যৌবনে তাহার
আজ যোগিনীর ভাব। হয় হরষিতা
নারীগণ তারে দেখি, করে বার বার
কতই প্রশংসা, লাজে যেন নিমীলিতা
বিনোদিনী, কৌশলেতে অন্য কথা আনে ;
প্রেমালাপে তোষে প্রাণে, বাড়ায় সম্মানে।

৭

সাধিল গ্রামের লোক ;—"ঘর কর দেশে,"
তা কি পারে ? এসেছে যে দিতে প্রাণ-মন
নরের কল্যাণ-ব্রতে ; তাই অবশেষে
লইয়া বিদায় উভে করিল গমন,
যে প্রদেশে নর-নারী দুর্ভিক্ষের গ্রাসে
পড়িয়া তরাসে কাঁদে, যথা শিশুগণ
পিতৃ-মাতৃ-হীন হ'য়ে পথের ভিখারী,
অনাহারে শুষ্কমুখে নেত্রে বহে বারি।

৮

কুড়াইল ভাই-বোনে সে সব সন্তানে ;
লয়ে যায়, সহরের অদূরে, যথায়
প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গা, সুমন্দ গমনে,
প্রবাহিত, বাঁধি তথা গৃহ দুজনায়
শিশুগু'ল লয়ে বসে। একই ভবনে
দুই খণ্ড ; এক খণ্ডে বালক সবায়
লইয়া নরেন্দ্র থাকে ; অন্যে বিনোদিনী
লইয়া বালিকা-দলে থাকয়ে কামিনী।

৯

দুইখণ্ড-মাঝে গৃহ বিশাল সুন্দর,
পরিষ্কৃত, সুসাজ্জত, সেখানে দিবসে
শিশুরা সকলে পড়ে। উভে নিরন্তর
তাদিগে লইয়া ব্যস্ত ; প্রাণের হরষে
করে সেবা ; শ্রমে কভু না হয় কাতর ;
অশনে, শয়নে, কার্যে রজনী-দিবসে
সদা সঙ্গী ; প্রতিদিন তাহাদের সনে
খাটিয়া, খাটিতে সবে শিখায় দুজনে।

১০

মা হয়েছে বিনোদিনী, মাতুল নরেন।
সে কি দৃশ্য। চারিদিকে তাহারা যখন
ঘেরে আসি মা মা বলে, আনন্দেতে যেন
স্বরগ সে হাতে পায়। সুমিষ্ট বচন
বরষে অমৃত ধারা। ভালবাসা হেন
দেখি নাই। যবে বালা হইয়া মগন
নিজ কাজে বসি রহে গৃহের উদ্যানে,
খেলে আর এসে তারা চুমে সে বদনে।

১১

পতিত জঙ্গল-পূর্ণ আছিল যে স্থান,
শ্রম-গুণে ছবিখানি। প্রাতে পূর্বাচলে
ঊষা না খুলিতে দ্বার, নরেন্দ্র আহ্বান
করেন বালক-দলে, আনন্দে সকলে
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য, সুললিত গান
করিতে করিতে নামে সেই ক্ষেত্রতলে;
কেহ বা কাটয়ে মাটি, কেহ বহে জল,
কেহ বা বপয়ে বীজ, কেহ তোলে ফল।

১২

শ্রম-ভরে ঘর্ম ঝরে, তবু শ্রান্তি নাই;
খাটে আর গান গায় মনের উল্লাসে;
কে কত খাটিতে পারে ইহারি লড়াই;
নরেন্দ্র শ্রমেতে পটু, বড় ভালবাসে
পালিতে সে তরুলতা, ভুলিয়াছে তাই
ধন-গর্ব, ফলফুল যে কালে যা আসে
সকলি ফলায় তথা; সে বিচিত্র স্থান
এমনি সুন্দর, দেখি মুগ্ধ হয় প্রাণ।

১৩

শ্রমে সুস্থ, দৃঢ় দেহে দিন দিন সবে;
প্রসন্নতা মুখে যেন সতত ফুটিয়া;
এ উহারে ভালবাসে; শ্রম অন্তে যবে
পাঠে বসে, কি উৎসাহ, নরেন্দ্র বসিয়া
দেখেন সবার পাঠ; কভু বা বিজনে[১]
একাকী বসিয়া, পাঠে মগন হইয়া,
চিন্তাতে গভীর রত; জ্ঞানের পিপাসা
হৃদয়ে অনন্ত তার পূরে নাকো আশা।

১। শুদ্ধ পাঠটি কি 'নীরবে' (?)?

১৪

হইলে স্নানের বেলা দল-বদ্ধ হয়ে
সাঁতারে সে গঙ্গা-জলে ; নগেন্দ্র সাঁতার
দেন নিজে ; কত খেলা ! কে কারে ছাড়ায়ে
যেতে পারে, তোলপাড় সেই জলভার !
হাস্য-পরিহাসে সবে প্রফুল্ল-হৃদয়ে
উঠে আসে। ওদিকেতে সময় পূজার ;
বিনোদ বালিকা-দলে লইয়া সে ঘরে,
ওই যে ধরেছে গান সুমধুর-স্বরে !

১৫

শিশু সনে দুইজনে কণ্ঠ মিলাইয়া,
মরি রে কি গান গায় ! ভক্তি-অশ্রু-ধার
গড়ায় দোঁহার মুখে ; সে অশ্রু দেখিয়া
শিশুরা অবাক, ভক্তি-রসের সঞ্চার !
ভক্তিভাবে বিনোদিনী ! দুকর যুড়িয়া,
যখন প্রার্থনা করে, পারে নাক আর
রাখিতে নেত্রের জল, কাঁদে সবে মিলে ;
সবারি পরাণ ডোবে প্রেমের সলিলে।

১৬

লইয়া বালিকা-দলে আপনি রন্ধন
বিনোদ করেন নিত্য ; প্রেমগুণে তাঁর
সকলে খাটিতে চায় ; জল আনয়ন
করে কেহ, কেহ বাটে, যে কার্যেতে যার
শক্তি আছে, সে তা করে ; প্রসন্নবদন
এমনি সে, নাহি দেখি বিরক্তি-সঞ্চার
নিমেকের তরে তথা ; সে মুখ দেখিয়া
প্রাণ পেয়ে শিশু-দলে কি সুখী খাটিয়া।

১৭

দ্বিপ্রহরে পাঠ-গৃহে সবে সমাগত ;
ভাই-বোনে শিক্ষকতা ; জ্ঞান-বিতরণে
কি উৎসাহ ! মুখে মুখে শিখায় নিয়ত
কত তত্ত্ব ! এত মগ্ন, নাহি থাকে মনে
কিরূপে সময় যায় ; ক্রমে দিন গত,
আবার গৃহের কার্যে শিশুদের সনে
রত উভে ; এই ভাবে দিন কেটে যায়
উভয়ে পাইছে প্রাণ পরের সেবায়।

১৮

মুখে যা শিখায় উভে, গ্রন্থে যা পড়ায়,
সে তো তুচ্ছ. শিখে যাহা নয়নে নয়নে,
প্রত্যেক কথাতে, কাজে, সবে সে শিক্ষায়
পড়িছে সুন্দর করে, পবিত্র পবনে
থাকিয়া বাড়িছে তারা ; চক্ষু খুলে যায়
সে আলোকে ; পুণ্যানন্দ প্রাণে জ্বলে উঠে ;
জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতা-পিয়াস এমনি
যত বাড়ে তত চায় না নিবে আগুনি ।

১৯

বিনোদের একি শক্তি ! সাধুতার প্রতি
এমনি গভীর প্রেম ! তাঁহার বাতাসে
থাকি তারা বিষ-সম পাপে পায় ভীতি ;
অসাধু কামনা যদি কভু প্রাণে আসে,
জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে দিলে যেই গতি
হয় নরে, সেইরূপ ছুঁড়ে ফেলে ত্রাসে ;
বিনয়ে লজ্জায় ক্ষোভে, অশ্রুজলে ভাসি
একান্তে মায়েরে কয় সকলি প্রকাশি ।

গোপন থাকে না কিছু ; বন্ধু হিতকারী
সে জননী ! কি আশ্চর্য একদিন তরে
একটী কর্কশ বাণী বদনে তাঁহারি
শুনে নাই, তবু দেখ, পাপ দেখি ডরে ;
হাসি হাসি মুখখানি যদি হয় ভারি,
তা হ'তে শাণিত খড়্গ যদি রে অন্তরে
পুতে দেয়, তাও ভাল ! সে মুখ আঁধার
হইলে তারাও সবে দেখে অন্ধকার ।

২১

প্রেমে তো ফুটায় প্রেমে ; পিঞ্জর-তিমিরে
বন্দী পাখী, জড়-প্রায় দুরন্ত শীতেতে,
নিশা অন্তে নব-রবি কর সে কুটীরে
প্রবেশে হরি তম যবে পিঞ্জরেতে
পশে ধীরে, সে উষ্ণতা পাইয়া শরীরে
ডাকে সে বিহঙ্গ যথা, প্রেম পরশেতে
তেমনি মানব প্রেমে চেতনা-সঞ্চার !
তেমনি অপূর্ব নীতি উঠে অনিবার !

২২

বিনোদের প্রেমে তারা সবে সঞ্জীবিত ;
জানে না যে দিন দিন সাধুতা ফুটিছে ;
জ্ঞান-লাভে, সাধু-কার্য, সবে আনন্দিত ;
সেই প্রেমে প্রেম ধারা সবার ছুটিছে ;
পরস্পরে সেবি তারা কত হরষিত।
সকলে এমনি বশ, চরণে লুঠিছে
মনগুলি যেন তাঁর ; লয়ে সে সংসার
বিনোদ সার্থক জন্ম ভাবে আপনার।

২৩

দেখিয়া দোঁহার কাজ গ্রাম বাসি জন
সবে মুগ্ধ ; সেই কথা হয় ঘরে ঘরে ;
সবাই বাখানে, আসি করে দরশন
সে কুটীর ; সদালাপে সবার অন্তরে
বাড়য়ে অপূর্ব প্রীতি ; দুই এক জন
এমনি আকৃষ্ট, শুধু আহারের তরে
গৃহে যায়, দিবানিশি নতুবা সেখানে
পড়ে থাকে, সহায়তা করে শিক্ষা-দানে।

২৪

বিনোদ সাধিয়া লোকে নিজ-গৃহে ডাকে ;
কত স্নেহ! হাসি হাসি সেই মুখখানি
যে দেখে সে ভুলে যায় ; কোথা রাখে তাঁকে
যেন না ভাবিয়া পায় ; করি টানাটানি
নারীগণ লয়ে যায়, বসায় তাঁহাকে
নিজ ঘরে, কত কথা! ভাল গ্রন্থ আনি
বিনোদ যোগান সবে ; উৎসাহে তাঁহার
দিন দিন জ্ঞানে রুচি বাড়িছে সবার।

২৫

নিত্য নিত্য উপহার পুষ্প মূল ফল
আসে কত বাড়ী হতে ; যে যা ভাল পায়,
অমনি পাঠায় কিছু ; নিত্য শিশুদল
পায় প্রেম উপহার ; দশদিকে ধায়
এ বারতা ; কভু দেখি করিয়া কৌশল
না দিয়ে দাতার নাম, কেহ বা পাঠায়
বহু অর্থ ; দিন চলে কেমনে না জানে ;
একান্তে বিধির কৃপা উভয়ে বাখানে।

২৬

প্রেমের আবর্ত এক খুলেছে সেখানে ;
যে আসে ঘুরায় তারে। যেন রে কি খানা
আছে তথা প্রাণ-মন টানিয়া সে টানে
অমনি ডুবায়। ক্রমে যুবক দুজনা
এমনি মিশিল আসি তাঁহাদের সনে,
থাকে, খায়, খাটে সুখে ; গ্রাম-বাসি মানা
করে কত, নীচে-জাতি শিশুদিগে লয়ে
খেয়ে, শুয়ে, জাতি-ভ্রষ্ট তাহারা উভয়ে।

২৭

বারণ কে শুনে ? প্রাণ পেয়েছে তাহারা
সহ-বাসে, প্রাণ-মন ঢালি সে কারণে
মিশিয়াছে ; প্রেম স্পর্শে প্রেমের ফোয়ারা
খুলে গেছে ; নব-রাজ্য দেখেছে নয়নে ;
সে সত্য-পুরুষে দেখি আজি প্রেম-ধারা
ছুটেছে তাঁহারি পানে ; দুর্জয় গমনে
ধায় নদী, শৃঙ্খলিতে কেবা তারে পারে ?
সে টান পড়িলে প্রাণ কে রোধে তাহারে ?

২৮

ক্রমেতে বিধবা দুটী আসিয়া জুটিল ;
দিল প্রাণ সেই কাজে ; একই অনল
জ্বলিল সবার প্রাণে ; তাহাতে পুড়িল
সুখাসক্তি, মন-প্রাণ ঢালিয়া কেবল
করে সেবা ; প্রাণগুলি এমনি মিশিল,
আহারে, বিহারে, পাঠে, সুখ নিরমল
পায় তারা ; তিন ভাই তিনটী ভগিনী ;
তার মধ্যে মধ্য মণি যেন বিনোদনী।

২৯

পাঠে, শ্রমে, গৃহ-কার্যে ছয়টী হৃদয়
ক্লান্ত নয়। কি বৈরাগ্য দেখি সে ভবনে!
ঈশ্বরে সঁপিলে প্রাণ এমনি কি হয় ?
এমনি কি পুণ্য, শান্তি, বিরাজে জীবনে !
এমনি কি সুখ চির-প্রসন্নতা ময় ?
হাসে, খেলে, মিশে সুখে, কাহারো বদনে
ইন্দ্রিয়-বিকার-রেখা না দেখি সঞ্চার ;
আপনা পাসরি সেবা করে অনিবার।

৬০

ক্রমে পাড়া ব'সে যায়। কত পরিবার
ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হ'তে আসিয়া বসিছে!
কোন্ গূঢ় আকর্ষণে? দুজনেতে আর
বিজনে না করে পূজা; এখন পূরিছে
লোকে গৃহ; কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া সবার
মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি সন্ধ্যাতে উঠিছে;
তা শুনি পথিক-দল চিত্রাপিত-প্রায়।
দাঁড় হস্তে মাল্লাগণ বহা ভুলে যায়!

৬১

মাঝে মাঝে ভাই-বোনে তরি-আরোহণে,
সহরেতে গিয়া, গ্রন্থ বাছিয়া বাছিয়া
কিনে আনে; গ্রন্থাবলী বাড়ে দিনে দিনে;
সে গ্রন্থ ছড়ায় গ্রামে; গৃহেতে বসিয়া
কুল-নারী-গণ পড়ে; তাঁদের যতনে
নূতন জীবন যেন পড়িয়ে ব্যাপিয়া
সেই গ্রামে; সদুৎসাহে সবে অগ্রসর;
যে থাকে দু'দিন গ্রামে জুড়ায় অন্তর।

৬২

নর-সেবা-ব্রতে তারা দেহ-মন-প্রাণ
যত দেয়, তত ডোবে, ততই হৃদয়ে
পুণ্যানল জ্বলে উঠে, হয় অন্তর্ধান
কু বাসনা, বিভু-প্রেম তত গাঢ় হয়ে
প্রাণে বসে, তত করে সেই সুধা-পান,
সে প্রেমে সবারে গড়ে, সে প্রেম-প্রভাবে
কি এক স্বর্গের ছায়া পড়িল স্বভাবে।

৬৩

ফিরিল দেহের কান্তি, নয়নের জ্যোতি;
ঔদ্ধত্য, উগ্রতা, গর্ব, হরিল সে প্রেমে;
উৎসাহে উজ্জ্বল মুখ, তাহে স্নিগ্ধ প্রীতি,
সোহাগা পড়িল যেন সে পবিত্র হেমে।
যে দেখিবে সে ভাবিবে, নাহি আর ভীতি,
নাহিক সংশয় প্রাণে, যথা চির-ক্ষেমে
থাকে নর, সেই পথ পেয়ে পূর্ণ আশ,
প্রীতি-পবিত্রতা-শান্তি তাই বার মাস।

৩৪

নিত্য নিত্য নবোৎসাহ, নব নব কাজ ;
গ্রামে গ্রামে ফিরে তারা ; পাপাচারী জনে
ফিরায় সে পথ হ'তে : ছাড়ি লোক-লাজ
সামান্য দীনের বেশে, ভবনে ভবনে,
নিজে যায় ; লোকে বলে কি বৈরাগ্য আজ
দেখি ইহাদের প্রাণে ! সবাই বাখানে।
তারা ত জানে না তাহা, নর-সেবা-সুখে
এমনি ডুবেছে, নাহি গণে নিজ-দুখে।

৩৫

পানাসক্ত, পাপাচারী, কত শত জনে
ফিরাইল ; কত নারী নয়ন আসারে
ভাসিত, তাদেরি গুণে পেয়ে স্বামী-ধনে,
প্রাণ খুলি শুভাশীষ করে সে সবারে।
ছিল যারা মগ্ন-প্রায় বিষয়-সেবনে
নিদ্রাসক্ত, শুনে কথা চমকি অন্তরে,
তারাও জাগিয়া উঠে ; অপূর্ব সে কথা !
একি শক্তি ! যথা পড়ে জ্বলে যেন তথা।

৩৬

তুমুল সে আন্দোলন। ধর্মের চর্চাতে
রত লোকে ; শাস্ত্রে রুচি ; যেখানে সেখানে
সেই কথা ; সে বিচার পাড়াতে পাড়াতে
স্বপক্ষ-বিপক্ষ-দলে ; এদিকে উদ্যানে
স্বরগ খুলেছে তারা। হৃদয় জুড়াতে
যে আসে, কি যেন শক্তি আছে রে সেখানে !
আপনা পাসরি ডোবে ; মক্ষিকা যেমন
পড়িয়া মধুর হ্রদে হারায় চেতন।

৩৭

আত্ম-পর নাহি তথা, ভিন্ন ভিন্ন ধন
নাহি আর, যেবা যাহা সঙ্গে এনেছিল
সব দিয়ে, এক ধন, এক প্রাণ-মন,
এক লক্ষ্য, এক আশা, হইয়া মিশিল
ধনে প্রাণে ; সুনির্মিত খিলানে যেমন
ইষ্টকে ইষ্টকে জমে, এমনি বাঁধিল।
একটী ধরিয়া টান, কভু পারিবে না ;
সমগ্র আসিবে খসি এক খসিবে না।

৩৮

নাহি করে ভিক্ষা, চাঁদা নাহি মাগে দেশে,
ধনে ধন মিশাইয়া শ্রমেতে খাটায়
কৃষি-কার্যে, শিল্প-জাতে, শ্রমের পরশে
চৌদিকে ফলিছে সোনা ; বাজারে বিকায়
কত দ্রব্য, নানারূপে, কত অর্থ আসে !
ছুতার-কামার-কাজ সকলি শিখায়
শিশু দলে কারু-কার্যে বালিকা-সকলে
পরিপক্ক ; কত দ্রব্য যায় কত স্থলে ।

৩৯

সন্ধ্যাতে ভজন-অন্তে, সবে এক ঘরে
বসে আসি ; নানা কথা সেখানে বসিয়া ;
হাসে গায় মন-সুখে ; প্রীতি পরস্পরে ।
বালক-বালিকা কভু দু-দল হইয়া
সারি গায় ; কি সম্ভ্রম এক অন্যে করে ।
নর-নারী এক সনে প্রেমেতে মিশিয়া
উভয়ে উন্মত্ত হয় ; নিত্য বাড়ে প্রীতি ;
হৃদয় পবিত্র করে, প্রাণে জাগে নীতি ।

৪০

কভু বা সকলে মিলি তরি-আরোহণে
নদীতে বেড়াতে যায় । পূর্ণিমা শর্বরী
শোভে যবে, তরি-পৃষ্ঠে সঙ্গীত-নিঃস্বনে
পূরি দিক্, নদী-বক্ষে গায় তারা সারি ।
অপূর্ব-আনন্দ-সুধা তাদের ভবনে
নিরন্তর বহে । ধর্ম কি দেয় মাধুরী
দেখিতে বাসনা যদি সেই গৃহে যাও ;
গিয়ে আর পালটিতে বুঝি বা না চাও ।

৪১

বালক-বালিকা বাড়ে । প্রণয়-সঞ্চার
হয় যদি, সে দুজনে দাম্পত্য-বন্ধনে
বেঁধে দেয় ; কি আনন্দ সেদিন সবার !
বিবাহ-উৎসব-গৃহে । তাহারা দুজনে
নিকটে বাঁধিয়া ঘর, নব পরিবার
হ'য়ে বসে ; নিজ-শ্রমে উন্নতি জীবনে ।
যত দূর যায় তারা, প্রাণে লয়ে যায়
সে আলোক ; সেই যশ দশ দিকে গায় ।

৪২

দুটী প্রাণ এইরূপে মিশিয়া খাটিছে !
কৃষি-দলে মিশি মিশি সে ভাব প্রচার
করে তথা ; একি শক্তি ! তাহারা ছাড়িছে
পানাসক্তি, বর্বরতা, শঠ, মিথ্যাচার ;
দেখিয়া অবাক্ লোকে ; বাজারে যাইছে
দেখে সত্যবাদী তারা। দেখে পূর্বকার
মত প্রবঞ্চনা নাই ! দেখিয়া বিস্ময়ে
ডোবে লোকে ; পরস্পর কথা তাহা ল'য়ে।

৪৩

যৌবন হয়েছে গত, ক্রমে বিনোদিনী
প্রৌঢ়-দশা-প্রাপ্ত। আজ সে পবিত্রমুখে
গাম্ভীর্য-মাধুরী কিবা ! আজিকে কামিনী
বিশ্বাস-বিনয়-প্রেম-পবিত্রতা-সুখে
এত সুখী, ঢল ঢল দিবস-যামিনী
মুখখানি ; সে কি ভাব ! দেখিলে সে মুখে
অপূর্ব সম্ভ্রম-ভক্তি-রসের সঞ্চার !
লাজে লুকাইয়া যায় ইন্দ্রিয়-বিকার !

৪৪

নরেন্দ্র প্রাচীন-প্রায় ; ভক্তিতে উজ্জ্বল
মুখ তাঁর ; গভীরতা সে মুখে বিরাজে।
বিভু-নাম শুনি মাত্র ধারা অবিরল
বহে নেত্রে, মধু-সম বাসে তাঁর কাজে ;
সুকবি, সংগীত তাঁর গায় শিশু-দল
শুনিলে পাষাণ গলে ! সেজন-সমাজে
চৌদিকে ছড়ায়ে গেছে ; হাট করি যায়
কৃষিগণ, উচ্চস্বরে সেই গীত গায়।

৪৫

জ্ঞান-ভক্তি-কর্মে কিবা অপূর্ব মিলন !
একি রাজ্য খুলিয়াছে। মানব-পরাণ
এমনি কি জয় হয় ? কি সে দুইজন
এ সংসারে যাপে দিন ? তাহার সন্ধান
জান কি মানব ! যেবা করে সমর্পণ
দেহ-মন বিভু-পদে, করে বলিদান
স্বার্থ-আশা, বিভু তারে আপন করিয়া,
নিজ বলে বলী করি লয় বাঁচাইয়া।

৪৬

সে প্রেমে যে মজে, প্রেম রক্ষা হয় তার।
বৈরাগ্য-অনল জ্বালি, বাসনা দহিয়া,
নব-জন্ম দিয়ে তারে, প্রাণ-মন তার
ফেলিয়া সে ইচ্ছা-স্রোতে লয় ভাসাইয়া।
রিপুকুল পরাজিত ; অথচ তাহার
থাকে না গৌরব তাহে ; অপরে দেখিয়া
হয় ত বিস্ময়ে ডোবে ; কিন্তু তার প্রাণে
আশ্চর্য না লাগে, শুধু ভেসে যায় টানে।

৪৭

দুরন্ত প্রবৃত্তি-কুলে, উচ্ছৃঙ্খল মনে,
কেবা পারে শৃঙ্খলিতে বিনা শক্তি তার ?
যে দেয় তাঁহারে প্রাণ, সে বিভু সে জনে
নূতন করিয়া গড়ে ; হরিয়ে তাহার
কু-বাসনা, নবালোকে উজলি নয়নে,
প্রাণ-মাঝে শক্তিরূপে করেন বিহার।
বীরের বীরত্ব দর্প চূর্ণ যার পাশে,
হাসিয়া খেদায় তারে সে যে অনায়াসে।

৪৮

দশদিকে ছুটে রব, স্বর্গের ব্যাপার
খুলেছে সে গঙ্গাতীরে ; কত পান্থজন
যাইতে যাইতে তরি ধরি একবার
দেখে যায় ; ফিরে গিয়ে সে শোভা কীর্তন
করে দশে ; মুখে মুখে সে রব বিস্তার।
দোকানি, পসারি, চাষা বুঝি কোন জন
শুনিতে নাহিরে বাকি। হুলস্থুল দেশে।
পাপী-তাপী দলে দলে শান্তি পায় এসে।

৪৯

একদিন রাত্রিযোগে, তরি-আরোহণে
কে আসিল ? বৃদ্ধা দাসী উঠি একজন
আসিয়া বিনোদে ডাকে বিনয়-বচনে ;
তরীতে কে নারী আছে, বড় আকিঞ্চন
বিনোদ দেখিতে তার ; যদি কৃপাগুণে
দেন দেখা, ক্রীত হয় জন্মের মতন।
এ কে নারী ? কেন ডাকে ? হায় বিনোদিনি !
কি দৃশ্য দেখিবে তুমি জান না কামিনী।

৫০
গিয়ে না দাঁড়াতে কূলে, দেখে বস্ত্রাঞ্চলে
ঝাঁপি মুখ, কাঁদে নারী, সামালিতে নারে।
"হাত খোলো কে গো তুমি?" তার ক্ষুদ্র বলে
সে হাত খুলিতে নারে; নয়ন-আসারে
ভিতিল অঞ্চল, তবু কাঁদে ফুলে ফুলে;
বিনোদ দাঁড়ায়ে ভাবে, কথা নাহি সরে
আর মুখে;—হায়! হায়! এ কোন্ দুখিনী?
কি শোক উথলে প্রাণে? কাহার কামিনী?

৫১
"কেঁদ না কেঁদ না"—হায়! সে অমৃত-বাণী
কর্ণে যত পড়ে, তত আকুল কাঁদিয়া।
অবশেষে হাত খুলি দেখে বিনোদিনী
সে নারী তো অন্য নয়, উঠে চমকিয়া,
এই তো বৌদিদী তার। সেই অভাগিনী
কঠিন-হৃদয়া হ'য়ে, কুলে কালি দিয়া,
যে পালাল। হায়! হায় বিনোদ! বিনোদ
কাঁদ কেন? কেন কণ্ঠ হয়ে গেল রোধ?

৫২
কণ্ঠ-রোধ, স্পন্দহীন, ধরণী-উপরে
নেত্র স্থির শুধু দেখি দর-দর-ধার
সুন্দর কপোল দিয়া অশ্রুধারা ঝরে!
হাতখানি ধরে তার নারী বার বার
ঠেলিতেছে হুঁস নাই! তাঁহার অন্তরে
পূর্বাপর কথা জাগে; সিন্ধু যে প্রকার
পবন-তাড়নে দোলে, সে রূপ হৃদয়
ভাবের তরঙ্গে প'ড়ে আন্দোলিত হয়।

৫৩
"বিনোদ! বিনোদ!"—আহা পারে না বলিতে,
প্রাণ বুঝি ফাটে!—"বোন! চিনিতে কি পার?"
বলিয়া আকুল নারী! নারে সামালিতে।
বিনোদ মুছিয়া আঁখি বলে, "এ প্রকার
দশা কেন?" হায় হায়! একথা বলিতে
কণ্ঠ-রোধ হয়ে আসে—"কি জন্যে আবার
দেখা দিলে? আমাদিগে পারনি ভুলিতে?"
গভীর আবেগে ওই হারায়ে চেতনা,
মূর্ছিত হইল নারী, ধরিছে দুজনা।

৫৪

জেগে বলে—"বিনোদিনি ! ভাল যে বাসিতে,
ডাকিতে যে দিদি ব'লে, আজ কৃপাগুণে
ক্ষমা কর, সাহসী যে হয়েছি আসিতে,
করো না বিরাগ তাতে ; পাপের আগুনে
পুড়িয়া হয়েছি খাক ; আপনা নাশিতে,
সঁপিয়া পাপের হাতে নিজে জেনে শুনে,
দেহ মন, কি যে শাস্তি পেয়েছি জীবনে,
বলিব সকলি বোন ! তোমার সদনে !

৫৫

"এখন প্রার্থনা, মোরে লও কৃপা করি,
দাস্য-বৃত্তি দিয়ে রাখ ; শুনি লোক-মুখে,
দেবত্ব পেয়েছ দোঁহে ; বহু নর-নারী
পেয়েছে উদ্ধার নাকি, শুনি স্বর্গ-সুখে
আছ সবে, ভাবিলাম যাই পায়ে ধরি
মাগি ক্ষমা, পাপে, তাপে ঘোর মনোদুখে
গেল দিন, তাঁরি পদে মরি অবসানে ;
হেনেছি বিষাদ-শেল যাঁহার পরাণে।

৫৬

"শুনি বহু পাপাচারী গিয়াছে তরিয়া
সহবাসে ; পাপীয়সী আমার সমান
আর ত পাবে না বোন ! করুণা করিয়া
আমাকে তরাও ; মোরে দেও দেও স্থান।
করেছি যে পাপ আমি, জনম ধরিয়া
দাস্য-বৃত্তি করি যদি, যদি এই প্রাণ
যায় কারাদণ্ডে, তবু প্রায়শ্চিত্ত তার
হয় না বিনোদ ! তবে কি গতি আমার।"

৫৭

আবার ফুলিয়া কাঁদে ; বিনোদের প্রাণ
সহজে কোমল ; তাতে বাল্যাবধি যারে
কতই বেসেছে ভাল, ভিখারী-সমান
আজ সে মাগিছে কৃপা, থাকিতে কি পারে !
অঞ্চলে মুছায়ে আঁখি, করি আশা দান,
বলে হোক মহাপাপী, ঈশ্বরের দ্বারে
আছে প্রবেশের পথ,—হও আশ্বাসিত,—
যে কাঁদে পাপেতে পড়ি সে পাবে নিশ্চিত।

৫৮

"বৌদিদি !"—শুনিয়া সেই পুরাতন নামে
কাঁদিয়া উঠিল নারী —"এ ক্ষুদ্র আলয়ে
হ'তে পারে স্থান, কিন্তু তোমার এ ধামে
লইতে, লাগে বা ব্যথা দাদার হৃদয়ে
তাই ভাবি ; যে যাতনা তাঁহার মরমে
লেগেছিল, বহু-কষ্টে যদি পাসরিয়ে
গিয়াছেন, পুন পাছে প্রাণে তাহা জাগে,
সেই চিন্তা, অন্য বাধা কিছু নাহি লাগে।

৫৯

"চল যাই একবার ডাকিয়া বিজনে
বলি তাঁকে। পূর্বভাব নাহিক তাঁহার ;
হয়ত আনন্দ হবে তোমার জীবনে
দেখি অনুতাপ-অগ্নি ; কিন্তু যে প্রকার
আছি আমি, আছে নারী অপর দুজনে
যে সংযমে, ভেবে দেখ মনে আপনার,
পারিবে কি চিরদিন সে ব্রত রাখিতে ?
ঘুচেছে দাম্পত্য-সুখ এই পৃথিবীতে।"

৬০

"দিও না যাতনা বোন !" বলিলা কামিনী
"পোড়ায়েছি এ অনলে সে সব বাসনা ;
মিটেছে পাপের ক্ষুধা ; আমি অভাগিনী
সহেছি অনেক শাস্তি, নরক-যন্ত্রণা :
এখন আকাঙ্ক্ষা এই, প্রিয় বিনোদিনি !
চরণে মাগিয়া লই তাঁহার মার্জনা ;
থাকি কাছে যদি তাঁর পাই অনুমতি ;
দাস্য-বৃত্তি ক'রে মরি, পাই লো সদ্গতি।"

৬১

বিনোদ লইয়া নিজ শয়নের ঘরে
বসাইল ; ডাকি আনে দাদাকে গোপনে।
নরেন্দ্র প্রবেশে যেই, পদ-যুগ ধ'রে
কাঁদে নারী, লুকাইয়ে মুখ সে চরণে ;
নরেন্দ্র টানিয়া তোলে ; ঝাঁপি দুই করে
পাপ-মুখ, ফুলে কাঁদে ; সুমিষ্ট-বচনে,
কেঁদ না কেঁদনা বলি নরেন্দ্র নিবারে ;
নিজেরো উথলে শোক রুধিতে না পারে।

২

সাধে কি রে সে আবেগে উথলে হৃদয়!
বিস্মৃতি-পাষাণ চাপা আছিল যে কথা,
উঠে তা কবর হ'তে ; সুখ-দুঃখ-ময়
ভূত কাল জেগে উঠে ; তাই তো রে ব্যথা
সহসা লাগিল প্রাণে ; সেই সমুদয়
সেই গৃহ, সে ঐশ্বর্য, বন-বাস কথা
সকলি চকিতে দেখে। সে প্রিয় বদনে
অশ্রু-জল দেখে আজ ধারা দু-নয়নে।

৬৩

ডানি হস্তে বাম হস্ত ধরিয়া তাহার,
বাম হস্তে মুছে আঁখি ; দু-হস্তে অঞ্চলে
মুখ ঢেকে কাঁদিছে সে ; দুটী অশ্রুধার
বিনোদের মুখে ঝরে ; চাহিয়া ভূতলে
অদূরে দাঁড়ায়ে আছে। ছবি এ প্রকার
কে দেখেছে কবে? পুন সমতলে
যে দিন নামিল তারা জানিত কি তবে,
জীবনে এমন দিন এক দিন হবে?

৬৪

পায় অনুমতি, ধন্য ভাবে আপনারে ;
লাজে দুঃখে মুখ-খানি সতত মুদিয়া
দাসীর অধিক খাটে ; আহারে বিহারে
উদাসীন ; ধরাসনে রাত্রিতে পড়িয়া
বাহু-যুগ করে আর্দ্র নয়ন-আসারে ;
স্মরিয়া পাপের কথা হৃদয় ফাটিয়া
যায় যেন। নরেন্দ্র সে দেব সম জানে
তাকাতে সাহসী নয় তাই মুখ পানে।

৬৫

কি বিনীত! না ডাকিলে নাহি যায় পাশে ;
সেই ঘোর মনস্তাপ দেখিয়া নরেন
সর্বদা ডাকেন কাছে ; বিবিধ আশ্বাসে
বলেন আশার কথা ; বুঝিবে সে কেন,
যতই সাধুতা দেখে ততই হুতাশে
পোড়ে প্রাণ! হায় আমি এই প্রাণে কেন
দিয়াছি দারুণ ব্যথা! এ প্রশ্ন অন্তরে
জেগে উঠে, দাঁড়াতে না পারে সেই ঘরে।

৬৬

বিনোদ ভুলাতে তারে কত মিষ্ট-ভাষে
আশ্বাসিছে। অবশেষে আনি নিজ ঘরে
শয্যা পাতি, পাশে থেকে, যবে নেত্র ভাসে
ক্ষোভে তার, আলিঙ্গিয়ে, মুছি নেত্র ধারে,
শুনায় বিধির কৃপা ; কভু উঠি ব'সে,
মধুর সঙ্গীত করি জুড়ান অন্তরে।
বিশ্বাস-বৈরাগ্য-প্রেমে জীবন সে পায় ;
নিরাশ-দুর্দিন যেন ক্রমে কেটে যায়।

৬৭

এ কি রে! এই না সেই ধনীর দুহিতা!
ঈর্ষ্যা ময়ী, বিলাসিনী, কর্কশ-ভাষিণী ?
এই না সে নরেন্দ্রের নির্দয় বনিতা ?
একি হলো ? কার ভারে ভাঙ্গিয়া কামিনী
পড়িয়াছে ? কোন্ দুঃখে আজ নিমীলিতা ?
প্রভু হে! তোমারি স্পর্শে আজ অভাগিনী
পাইয়াছে নব-জন্ম! আঁখি খুলিয়াছে ;
অসার-অসত্য-মাঝে সত্য চিনিয়াছে।

৬৮

সকলি তো হলো! সেই পতি সদাশয়,
বাড়ী ঘর, লোক জন, সেই ননদিনী,
সব আছে ; কিছু নাই! চায় না হৃদয়
আর তো পার্থিব সুখ ; ডুবিছে কামিনী
বিভু-প্রেমে ; ভাঙ্গা প্রাণে প্রভু দয়াময়
শুনেছি বাসেন ভাল, তাই অভাগিনী
নিত্য নিত্য তাঁর কৃপা জীবনে পাইছে ;
দেখিতে দেখিতে যেন উঠিয়া যাইছে।

৬৯

আছে ঘর, গৃহস্থতা গিয়াছে চলিয়া ;
আছে পতি, সে দাম্পত্য জনমের মত
ঘুচিয়াছে ; আছে জন, গেছে ফুরাইয়া
সে প্রভুত্ব ; আছে দেহ, রক্ত-মাংস যত
হয়েছে আত্মার দাস ; গিয়াছে দহিয়া
রিপু-কুল ; এখন সে দেখ অবিরত
চেয়ে আছে তাঁর পানে, যিনি প্রাণাধার ;
সুখ-দুঃখ-সম দুই, দুই তুচ্ছ তার।

৭০

"রাখ রাখ লও লও প্রভু হে। তোমার
দাসী আমি।"—এই মন্ত্রে এবে সে ধরেছে।
এই মন্ত্র সাধে সদা; ভব-দুঃখ আর
দুঃখ বলে নাহি গণে; আশ্রয় করেছে
সেই কৃপা; মৃত্যু-ভয়ে অন্তরে তাহার
আর না লাগিছে ডর; আজ সে পরেছে
সুদৃঢ় বিশ্বাস-বর্ম; জেনেছে উদ্ধার,
পেয়েছে পেয়েছে সত্য কৃপায় তাঁহার।

৭১

প্রাণ পেয়ে নারী ক্রমে কলঙ্কিনী-দলে
বলে সে মুক্তির বার্তা। আরো কত প্রাণে
সে আগুন জ্বলে উঠে। পড়ি সে অনলে
পতিতা রমণী কত ক্রমে সে উদ্যানে
পায় স্থান; বিনোদিনী লয়ে সে সকলে
জ্ঞান-ধর্ম-শিক্ষা দেয় বিবিধ-বিধানে।
এক-তরু-ফলে শত তরু জন্মে যথা,
কার্য হ'তে কার্য-সৃষ্টি হইতেছে তথা।

৭২

দু-জন আছিল তার ছয় শত জন
আশে পাশে; কত শিশু মানুষ হইয়া
আজ প্রৌঢ়-দশা প্রাপ্ত; সকলে এখন
করে সেবা ভাই-বোনে; নিজেরা খাটিয়া
খাটিতে না দেয় দোঁহে; তাঁহারা এখন
আত্ম-চিন্তা, উপাসনা, ধ্যানেতে ডুবিয়া
আনন্দে হ'রন কাল; প্রগাঢ় বিশ্বাসে
উজ্জ্বল সে মুখ সদা ভক্তি-জলে ভাসে।

৭৩

ক্রমে তো বার্ধক্য এল; পলিত স্থবির
হলো তারা; আয়ু-রবি যায় অস্তাচলে!
জীবনের সন্ধ্যাকালে সেনাপতি বীর
পুত্র-কন্যা-স্কন্ধে ভর করি যথা চলে,
জীবন-সংগ্রাম-অন্তে আজ ধীর স্থির
সেরূপ চলেছে দোঁহে! ধরিয়া সকলে
ধীরে ধীরে নামাইছে যেন মৃত্যু-পানে;
শেষ-শয্যা সুখ-শয্যা করিছে যতনে।

৭৪

মরি রে বিচিত্র প্রেম! যদি ক্রোধ করি
বকে কভু, যারে বকে সেই ছুট আসি
চুমে মুখে; মিষ্ট-ভাষে সে বিরক্তি হরি
অমনি সে কাজ করে; সে উদ্যান-বাসি
রাখিয়াছে সে উভয়ে যেন প্রাণে পূরি।
বসায়ে দু-জনে মাঝে আনন্দেতে ভাসি,
হাসে খেলে, ফুল তুলে গাঁথি প্রেমহার,
সোহাগে চুম্বিয়া, গলে পরায় দোঁহার।

৭৫

আর কি শুনিবে? দিন হয় অবসান;
দিন দিন ভাটা পড়ে উভয় জীবনে।
প্রভু হে! এমনি ভাবে, দেহ-মন-প্রাণ
এমনি সেবাতে দিয়ে, এমনি সাধনে
রত থাকি, এইরূপে প্রেম-সুধা-পান
করি তব, অবসানে বিশ্বাস-নয়নে
ওই সত্য-জ্যোতি হেরি, সন্ধ্যা কি আসিবে?
জীবন তোমারি ক্রোড়ে অন্তে লুকাইবে?

সৌন্দর্য

সূচনা

একদা বিরলে বসি বন্ধু কয়জন
কহে কথা পরস্পরে। মজিয়াছে মন
এমনি সে-কথা-রসে, যাইছে সময়
কোথা দিয়ে বহে, তাহা লক্ষ্য নাহি হয়।
ক্রমে বাড়িছে রাতি; আট নয় দশ,
বেজে গেল; আজ তারা ফেলি কথা-রস
উঠিতে না পারে, আজ ভুলেছে আহার;
বিচিত্র কথার স্রোতে দিতেছে সাঁতার!
ভ্রমি নানা স্থানে কেবা কি কোথা দেখেছে,
সুন্দর সুরম্য দৃশ্য কি মনে রেখেছে,
বন্ধু-গোষ্ঠী মাঝে বসি করিছে বর্ণন;
শুনিতে শুনিতে মন সবারি মগন।

প্রথম দল

অরণ্য

প্রথম বলিল ;—"ভাই ! আমি একবার,
আমোদ-নগর হতে, সরস্বতী-পার
প্রহ্লাদ-পুরেতে যাই ; যাইতে তথায়
অরণ্যের মধ্যে পথ : দেখিনি কোথায়,
এ হেন সুন্দর দৃশ্য ! দেখি বনে পশি,
কি খেলা খেলিছে বিধি সে নির্জনে বসি !
নির্জন গহন কিবা, কিবা তরু-রাজি
অযত্ন-সম্ভূত কত ফল-ফুলে সাজি,
নির্জনে বিস্তারে শোভা ; বায়ু-ভরে দোলে ;
সোহাগে ছড়ায় ফুল প্রকৃতির কোলে।
হেন শান্তি-ময় কুঞ্জ, সকলি সেখানে
চিত্তের উত্তাপ হরে ; সৌরভ আঘ্রাণে,
প্রফুল্লিত প্রাণ মন ; নেত্র তৃপ্তি কর,
চৌদিকে শ্যামল-কান্তি কিবা মনোহর।
বসি থাক তরু-তলে, সর সর সর,
সুমন্দ মলয়ানিল বহে নিরন্তর ;
সে পরশে স্নিগ্ধ দেহ, শ্রান্তি লয় হরি ;
ক্ষণেক বসিলে যেন সংসার পাসরি।
নিস্তব্ধতা, পবিত্রতা, শান্তি ও বিশ্রাম
সতত বিরাজে তথা ; অপূর্ব্ব আরাম
হলো প্রাণে : সে বাতাসে যেন নির্জনতা,
বহে বহে আসি প্রাণে, হরিল উষ্ণতা।
তরুগুলি পল্লবিত সতেজ সুন্দর।
কোনটী ধরেছে ফুল, ফল মনোহর
কোনটীতে শোভা পায়, লতায় পাতায়
কোনটী এমন ঘেরা, লুকায়ে তথায়,
কি পাখী দিতেছে শিশ্ ! চেয়ে চেয়ে দেখি,
উঁকিঝুঁকি মারি ঝোপে, কিছু না নিরখি।
বহু অন্বেষণে দেখি, সে কুঞ্জ গভীরে,
সুন্দর বিহঙ্গ দুটী বাঁধিয়া কুটীরে,
আনন্দে করিছে বাস ; মানব যায়নি
ভুলে যেন, কোন দিন দেখিতে পায়নি,
সূর্য তারে, চির-শান্তি-ময় সেই স্থান ;
সে কুঞ্জে বসিয়া পাখী করিতেছে গান।

কোন স্থানে দেখি বায়ু বহিয়া বহিয়া,
কি জানি কাহার লাগি যেন ঝাড়ু দিয়া
তরুতল রাখিয়াছে। অজ্ঞ লোকে বলে,
সে সুরম্য বন-কুঞ্জে, সেই তরু-তলে,
যবে জ্যোৎস্নাময়ী হাসে শারদ শর্বরী,
নাচে আর গায় আসি কিন্নর-কিন্নরী।
সে বনের মাঝে বিল দূর-প্রসারিত
দেখিলাম ; শত-দল তাহে প্রস্ফুটিত !
এমনি প্রশান্ত, স্বচ্ছ, সুনির্মল বারি,
জল-পাশে বসি বক, মূরতি তাহারি
দর্পণে পড়েছে যেন, জলেতে ফলিত ;
সুগম্ভীর জলরাশি, চির-বিনিদ্রিত !
একটীও পদ-চিহ্ন নাহি তার ধারে ;
যে যেখানে জন্মিয়াছে, জন্মাবধি তারে
কেহ না ছুঁয়েছে যেন, আছে সেইখানে,
আপনা আপনি বাড়ে, বিবিধ বিধানে
জড়াইয়ে পরস্পর শাখায় শাখায় ;
গর্বিত চরণে নর কভু না মাড়ায়।
সারা-দিন বসি বক কত ঘণ্টা গণে,
কভু না শিহরে তনু কোন রব শুনে।
এ বন সে বন ঘুরে বসি তরু-তলে,
কাননে নয়ন রাখি। নির্জনতা তলে
ডুবিতেছি ভাবিতেছি কি জানি কেন হেন,
কি যেন হারায়ে গেছে, খুঁজিতেছি যেন,
আধ-জাগা আধ-ঘুম, আসিছে বাতাসে
কি সুঘ্রাণ ! ফিরে দেখি, সেই বন-পাশে
কি জানি কি ফুল সেটী, ফুটেছে নির্জনে ;
মধুর নিঃশ্বাস দেয় মাখায়ে পবনে।
সৌরভে আকুল হয়ে দেখি মত্ত-প্রায়
কোথা যেতে অন্ধ অলি যেন কোথা যায় !
এ গাছে ও গাছে পথ জিজ্ঞাসিয়া ঘোরে,
ঘুরিয়া ফিরিতে চায়, ফিরিবারে নারে।
সে ভৃঙ্গের রঙ্গ দেখি ডুবিনু হরষে,
লুকায়ে রাখিনু ফুলে ; আসি অবশেষে
পায়ে ধরি হাতে ধরি সাধাসাধি কত,
গুণ-গুণ-রবে মধু লোভী মধু-ব্রত।
বসি সেই প্রকৃতির নির্জন মন্দিরে,
কেহ নাহি তবু দেহ উঠিছে শিহরে :

বিশুদ্ধ শান্তি নীরে পরাণ ডুবিল ;
মনের দুশ্চিন্তা যত কোথা পলাইল।
দেখেছি অনেক দৃশ্য এমন সুন্দর,
দেখিনি সুরম্য কিছু অবনী ভিতর।"

দ্বিতীয় দল

পর্বত

দ্বিতীয় হাসিয়া বলে,—"তুমি যা বলিলে,
আমি যদি ভেঙ্গে বলি, সে কথা শুনিলে,
কোথায় বনের শোভা লাগে তার কাছে।
দক্ষিণে সহ্যাদ্রি-শৃঙ্গে স্থান এক আছে ;
কি সুন্দর কি বলিব। আগে ভাবিতাম,
না জানি কিরূপ গিরি ; একা করিতাম
কতই কল্পনা মনে ; তৎপরে যখন,
অনেক পাহাড় ঘুরে করিনু দর্শন,
প্রাণ পুলকিত হলো ; দাঁড়ায়ে শিখরে
দেখিলাম উপত্যকা ; পুলক-অন্তরে
যত চাই তত ডুবি আনন্দ-সলিলে ;
বসে থাকি সে কান্তারে দুটী চক্ষু ফেলে,
ক্রমে সে সৌন্দর্য-হ্রদে ডোবে মন-প্রাণ,
কিরূপে সময় কাটে থাকে না সন্ধান।
এ সব সুন্দর বটে, কিন্তু সহ্য-কোলে
দেখেছি যে শোভা ভাই। এই ধরাতলে
তেমন সুন্দর কিছু আছে কি সন্দেহ ;
জানি না দেখেছ কি না তার মত কেহ।
আছে এক গিরি-দুর্গ, তিন দিকে তার
অভ্র-ভেদী তুঙ্গ-শৃঙ্গ দুর্জয় প্রাকার ;
দক্ষিণে শ্যামল-ক্ষেত্র দূর-প্রসারিত,
কত শত ক্রোশ যেন হইছে লক্ষিত।
সুরম্য সে গিরি-দুর্গে প্রকৃতির শোভা
কি বলিব। যোগী-মুনি-কবি-মনোলোভা।
বলেছ বনের কথা, সে গিরি-কান্তারে,
ঘোরারণ্য জন-শূন্য। কিবা চারিধারে
সুগম্ভীর তরুবর মস্তক-উন্নত,
মেঘেতে ঢাকিছে শির। যেন কত শত
বর্ষ ধরি বসিতেছে শৈবাল তাহাতে ;
আবেষ্টিত লতা-পাশে ; দাঁড়ালে তলাতে,

সামান্য জীবের মত ভাবিবে আপনা ;
যেন তার গ্রাহ্য নাই তুমি কোন্ জনা !
জঙ্গলেরি কিবা শোভা ! বিধির তুলিতে
এতই কি বর্ণ ছিল ? সে বৃক্ষগুলিতে,
কি বিচিত্র কারিগরি ! কেহ শ্বেতবর্ণ-
পত্র-ধারি, কেহ লাল, কোনটীর পর্ণ
যেন মকমলে গড়া ! পাতায় পাতায়,
কত সূক্ষ্ম রেখা, তাহা গণা নাহি যায়।
পথে যেতে, প্রতি পদে অপূর্ব সুবাস,
বহিয়া আসিবে, প্রাণে বাড়িবে উল্লাস।
গম্ভীর পাষাণ-মূর্তি সে কি গিরি-বর !
বলিবার সাধ্য নাই ; কাঁপিবে অন্তর,
চাও যদি মাথা তুলি সে পাষাণ-পানে ;
অপূর্ব সম্ভ্রম এক উপজিবে প্রাণে।
শৃঙ্গ-দেশ মেঘ-জালে আছে লুকায়িত ;
চিকি মিকি চিকি মিকি বিজলী জৃম্ভিত !
এক দিকে শৃঙ্গ হ'তে ঝ'র নির্ঝরিণী,
প্রস্তর-মাঝারে ঘোরে কল-নিনাদিনী,
ধীরে ধীরে, নেমে নেমে পাথরে পাথরে,
শেষেতে লুকায়ে গেছে জঙ্গল-ভিতরে।
নয়ন চলে না তথা, সুস্বর-লহরী
কুলু কুলু কুলু শুধু দিবস-শর্বরী !
নির্ঝরের চারি পাশে সুরম্য বিপিন,
কত বাদ্য-যন্ত্র তথা বাজে সারাদিন !
গভীর নির্জনে পাখী বসি বসি ডাকে ;
ঘুমায় যে প্রতিধ্বনি জাগাইছে তাকে।
দিবা শেষে রবি যবে পশ্চিম অচলে
ঢলে পড়ে, প্রবেশিয়ে দেখ সেই স্থলে,
জলে প্রপাত কি বা পূর্ব-শৃঙ্গ হ'তে
ঝরিতেছে ; যেন কেহ রৌপ্য-ময় পাতে
খেলায়ে সে গিরি-শৃঙ্গে পথিকে দেখায় !
সায়াহ্নিক ভানু-কর পড়ি তার গায়,
প্রসবিছে ইন্দ্র-ধনু ; ক্ষণে ক্ষণে তার
নব নব ভাব দেখি, নূতন আকার।
কোথা বা প্রকাণ্ড দেখ পর্বত-কন্দর,
কত দূর প্রসারিত, জানে কোন্ নর !
গিয়ে দেখ, লেখা আছে অতীতের কথা,
শ্রমণ তাপস দল বসিতেন তথা ;

প্রমাণ তাহার দেখ পাষাণ খুদিয়া,
সুন্দর মন্দির কত রেখেছে নির্মিয়া।
প্রবেশিতে গিরি হ'তে সংস্রধারায়
ঝরে বারি দিবানিশি ; দাঁড়ায়ে তথায়
কর স্নান, হবে প্রাণ তখনি শীতল।
শিশির-কণিকা জিনি স্বচ্ছ সেই জল।
পশু-পাল নামে সবে সন্ধ্যা-সমাগমে,
গিরি হ'তে, ধীরে ধীরে এক দুই ক্রমে
নেমে যায়, পূরে দিক্ কিঙ্কিণী-নিঃস্বনে ;
শতেক কিঙ্কিণী বাজে, সান্ধ্য সমীরণে
সেই ধ্বনি জাগে কানে ; যেন নানা-যন্ত্রে
মিশায়ে সুস্বর বাজে ! যেন যাদু মন্ত্রে
কি রসে ডুবায়ে প্রাণ কোথা লয়ে যায় !
ঠুনু ঠুনু ঠুনু ধ্বনি চিত্তাতে মিশায় !
সুরম্য গাম্ভীর্য তথা আনন্দ বিস্ময়
মিশায়ে সৌন্দর্য-রসে ডুবায় হৃদয়।"

তৃতীয় দল

সাগর

তৃতীয় বলিল,—"ভাই ! কভু কি সাগরে
গিয়েছিলে ? তাহা হলে সবে সম-স্বরে
বলিতে সিন্ধুর সম সুন্দর জগতে
কিছু নাই। প্রকাশিতে নারি কোন মতে
সে সুন্দর, সে গম্ভীর, সে পবিত্র ভাব ;
পরাস্ত কল্পনা ভাই ! ভাষার অভাব।
একবার গিয়াছিনু যখন সিংহলে,
এখনো পরাণ জাগে তাহা মনে হ'লে।
যদি হে জাহাজ দেখি ছুটিয়া উঠিতে
এমনি আবেগ হয়, হয় নিবারিতে
বহু-কষ্টে সেই মন। সে নীলাম্বু-নিধি,
গাম্ভীর্যে সৌন্দর্যে তারে কি করেছে বিধি,
বাসনা দেখিতে যার, সুদূর সাগরে
যাক্ সে একটি বার ; জনমের তরে
ভুলিতে হবে না আর প্রাণে মিশে রবে ;
যখনি স্মৃতিতে দেখ সুখোদয় হবে।

অসীম সুনীলে যবে পহুঁছিল তরি,
বাহিরিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি ;
সে কি দৃশ্য! নীল নীল কেবল নীলিম!
জল-রাশি আছে গ্রাসি চৌদিকে অসীম।
এতো প্রকাণ্ড তরি শহর-সমান,
সে অসীমে পড়ি, হেন হয় অনুমান,
যেন কি জলের পাখী, বুকেতে ঠেলিয়া
জল-রাশি, ভাসি ভাসি বেড়ায় খেলিয়া!
যত যায় চেয়ে দেখি তরি পিছে পিছে
জল-চারী গল্ পক্ষী সঙ্গেতে আসিছে।
ঘুরিতে তরির ধারে এরা ভালবাসে ;
কভু পাশে, কভু পিছে, কভু বা আকাশে,
কভু সে তরঙ্গোপরি বসিয়া ভাসিছে ;
দোলায় তরঙ্গ তারে, দুলিয়া আসিছে।
ক্রমে দিন গত ; তরি প্রবেশে গভীরে ;
ওই পড়ি রহে বঙ্গ ; মিলাইছে নীরে ;
আর গল্ নাহি আসে, ফিরে ডাঙ্গা-পানে ;
এদিকে অপূর্ব্ব শোভা মোহিছে পরাণে!
ডুবিছে রবির ছবি নীল-জল-পারে ;
অসীমে অসীম মিশি গ্রাসিছে আঁধারে।
নিমেষে নিমেষে যেন খসি পড়ি যায় ;
দেখি দেখি! সে নীলাম্বু-তলেতে লুকায়!
অনন্ত-জল-প্রান্তরে আসিল গোধূলি ;
আকাশে সাগরে যেন হয় কোলাকুলি!
ওই দূরে অন্ধকার বেয়ে বেয়ে আসে ;
নিমেষে নিমেষে দৃষ্টি তিল তিল গ্রাসে!
না হ'তে আঁধার, উর্দ্ধে হাজার হাজার
ফুটিয়া উঠিল ফুল ; তারা এ প্রকার
দেখি নাই কোনদিন! সে ঘন আঁধারে
সে সুন্দর দৃশ্য প্রাণ ডুবাল পাথারে।
দেখি না নীলাম্বু আর কানেতে তখন
শুনিতে বিচিত্র বাজে গভীর গর্জ্জন।
তারালোকে দেখি ফেনা দু দিকে ছুটিছে,
শত শত বেল যেন একত্র ফুটিছে।
ব'সে আছি সুগম্ভীর ভাবে এ প্রকার,
নাক, মুখ, চোখে যেন পশে অন্ধকার।
প্রশ্বাসে আঁধার গিলি, নিঃশ্বাসে উগারি!
চিন্তা যায় কোন রাজ্যে ধরিতে না পারি।

সপ্তর্ষি-মণ্ডলে ছাড়ি ধ্রুবেতে পশিছে ;
ধ্রুবে ছাড়ি ছায়া-পথে শেষেতে মিশিছে !
কানে বাজে সাঁ সাঁ রব, প্রাণে নির্জনতা,
কি গভীরে, পশে মন। এমনি ঘনতা
চারিদিকে। মন তাতে ডুবিয়া ডুবিয়া,
আপন খুঁজিতে গিয়া যায় হারাইয়া।
প্রভাত হইলে নিশি এ কি দেখিলাম!
উঠিনু শিহরে ভাই। এমন সুশ্যাম
জলরাশি হতে পারে, কভু তা স্বপনে
ভাবি নাই ; কিবা স্বচ্ছ, দেখিনু নয়নে
অতল গভীরে, যথা শৈবাল বিহরে,
তাহাও সুস্পষ্ট দেখি। জলরাশি 'পরে,
মৃদু মৃদু সমীরণ ব'হে ব'হে যায় ;
কোমল লহরী মালা এমনি খেলায়,
কে যেন তুলিকা ধরি সূক্ষ্ম রেখা টানে!
যে দেখে মাধুরী তার সবাই বাখানে।
এইত প্রশান্ত সিন্ধু, প্রবল পবনে
কি মূর্তি সাগর ধরে বর্ণিব কেমনে।
উন্মত্তের মত জল যা পায় আছাড়ে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ে কেবা কার ঘাড়ে।
কূলেতে রয়েছে গিরি অট্ট অট্টহাসি,
গিরি-দেহে বল-দর্পে তাল ঠোকে আসি ;
আঘাতে তরঙ্গ ভেঙ্গে রেণু রেণু উড়ে ;
শত শত রাম ধনু খেলে সে পাহাড়ে।
তীরের নিকটে ধায় উলটি পালটি,
কামান দাগিছে কোথা বা শতটী।
তীরে লোটে, ফেনা ফোটে, সদর্পে লাফায়
হাসে জল খল খল উন্মত্তের প্রায়।
দেখেছি দাঁড়ায়ে কূলে সে নৃত্য সুন্দর,
শুনেছি দু-কান ভরে রব মনোহর।
দেখেছি অনেক শোভা সিন্ধু দেখে ভাই,
বুঝেছি এমন দৃশ্য ধরা-ধামে নাই।"

চতুর্থ দল

বাসন্তী পূর্ণিমা

চতুর্থ হাসিয়া বলে,—"আমার বিষয়
ছোটখাট ; গাম্ভীর্যেতে সিন্ধু-সম নয়।
কিন্তু ভাই দেখিব না কেবল গাম্ভীর্য,
সৌন্দর্যে দেখিতে হবে প্রথমে মাধুর্য

বাসন্তী পূর্ণিমা আমি আজ বাখানিব,
কেমন সুন্দর লাগে পরে তা জানিব।
একদা বিদেশে ভাই। পথ হারাইয়া,
প্রকাণ্ড মাঠের মাঝে বেড়াই ঘুরিয়া;
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো না পাই সন্ধান,
না পাই দেখিতে গ্রাম কোথা লই স্থান।
হেন কালে সে প্রান্তরে উদ্যান হেরিনু,
চন্দ্রালোকে হাসে যেন; আহ্বান করিনু
দ্বারে গিয়ে; কেহ নাই; পশিনু ভিতরে;
ভাবিনু কাটাব রাত্রি সে সুরম্য ঘরে।
পশিয়া দেখিনু সেই উদ্যান-মাঝারে,
বসিবার আছে স্থান; বসি তদুপরে,
ক্রমে হলো শ্রান্তি দূর; ক্রমে যেন মন
সে সৌন্দর্য-নীরে শেষে হইল মগন।
বসন্তের পৌর্ণ-মাসী, কি শোভা ফুটিছে।
সুধার সাগরে যেন তরঙ্গ উঠিছে!
সুনীল আকাশ, নাই একটুকু রেখা;
ডুবেছে নক্ষত্র কোথা নাহি যায় দেখা।
উঠিছে জ্যোৎস্নার ঢেউ কানায় কানায়;
না ধরে ব্রহ্মাণ্ডে যেন উছলিয়া যায়।
চন্দ্রের সে হাসি-রাশি, প্রেমের কিরণ,
সুষুপ্ত ধরার মুখে চন্দ্রের চুম্বন।
এমনি সে নিশি ভাই মধুর-হাসিনী,
এমনি আনন্দ-ময়ী, সন্তাপ নাশিনী,
প্রাণের আরামে কিম্বা দিবস ভাবিয়া,
তরু-কুঞ্জে থাকি পাখী উঠিছে ডাকিয়া।
ফুটেছে অগণ্য ফুল; বায়ু মাতোয়ারা;
খুলিয়া গিয়েছে যেন সুখের ফোয়ারা!
হাসি হাসি তথা হাসি, কুসুম কলিকা,
দুপাশে দাঁড়ায়ে আছে সরলা বালিকা,
কি যেন বলিছে কানে; আদরে নাচায়;
সোহাগে চুম্বিছে সবে, চুম্বিয়া হাসায়।
অঙ্গে লাগে জ্যোৎস্না-রস, নাসাতে সুঘ্রাণ
কি অপূর্ব সুধা-রসে ডুবাইছে প্রাণ!
এমনি হইল বোধ ডুবিয়া সাঁতার
সেই রসে দেয় মন। ভব দুঃখ আর
মনে নাই; সে সৌন্দর্যে ডুবিতে ডুবিতে,
কোথায় গেলেম আমি রাহনু মহীতে,

কিম্বা সে চন্দ্রিকা ধরি চন্দ্রেতে উঠিনু,
কিম্বা সে বায়ুর সনে ফুলে মিশাইনু!
কতই হইল রাত্তি, উড়িয়া বাদুড়,
পড়িছে কলার গাছে কার দুড় দুড়,
অদূরে আমের বনে বায়ু সর সর;
চিঁকি মিকি খেলে পত্রে সে সুধা রশ্মি কর;
মর মর শুষ্কপত্রে বন-জন্তু যায়;
স্বপনে ডাকিয়া পাখী আবার ঘুমায়।
ব্রহ্মাণ্ডের সাঁ সাঁ রব বহি আসে কানে;
পরাণ ডুবিছে তাহে সে ভাবে পরাণে।
দেখেছি অনেক শোভা তেমনটী আর
দেখিব না; নাহি দেখি তুলনা তাহার।"

পঞ্চম দল

রমণী

পঞ্চম বলিল,—"ভাই! গুজরাটে গিয়া,
যা দেখেছি তাহা যদি বলি হে বর্ণিয়া,
জানি না পারিব কি না সে শোভা দেখাতে,
দেখিয়া আমার মন মজেছিল যাতে।
সুরট-নগরে বসে, যুবক-দম্পতী
ছ-মাস তাদের ঘরে করি হে বসতি।
দেখছি অনেক দেশ, বহু পরিবার,
এমন শান্তির কুঞ্জ, প্রেমের আগার,
দেখি নাই; দুটি তারা যেন চকাচকি!
এক সূত্রে বাঁধা দুটী। তোমরা জান কি
নাহি অবরোধ পীড়া বঙ্গের মতন;
স্বাধীনতা সুখ তথা ভুঞ্জে নারীগণ।
আমি হে অতিথি যাঁর, অতি সদাশয়,
শিক্ষিত, সুজন, নম্র, উদার-হৃদয়,
এমনি সপ্রেম-ভাব, এমনি সততা,
হ'য়ে লয় পর ভাব জন্মে আত্মীয়তা।
ভুলিনু বিদেশ-বাস সুমিষ্ট ব্যভারে;
সেই হলো ঘর, নিজ ভাবি সে দোঁহারে
কিন্তু সে গৃহের কর্ত্রী যিনি, সে রমণী
কি যে ভাই! কি বলিব? নারী-শিরোমণি,
এ কথা, রমণী-কুলে যদি কারো প্রতি
খাটে, তবে শিরোমণি জানি সে যুবতী।

প্রথমে রূপের কথা কিছু বলি শুন,
বর্ণিব পশ্চাতে তার কি দেখেছি গুণ।
নর কুলে হেন রূপ হইতে যে পারে,
ভাবি নাই কোন দিন ; সত্য, আলো ক'রে
আছে ঘর ; রূপে গুণে নারী নিরুপম ;
স্বর্গের উদ্যান-সার গোলাপের সম।
বয়সে পঁচিশ হবে, নাতি দীর্ঘকায়,
নাতি-উচ্চ সুস্থ-দেহ, কি এক আভায়
ঘেরিয়া রেখেছে তারে। যেখানে যাইছে,
যেন সে অপূর্ব জ্যোতি তথা ছড়াইছে।
লজ্জা আবরণ ভিন্ন অঙ্গে নাহি ঢাকে ;
নিষ্কলঙ্ক মুখখানি সদা ফুটে থাকে।
দেহের লাবণ্য কি বা! সে বর্ণ সুন্দর,
ঢালিল স্বর্গের রঙ্গে কোন চিত্রকর।
প্রেমে বিকশিত মুখ করে ঢলঢল,
কি যেন ভাসিছে নেত্রে সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল।
সুবিশাল নেত্র দুটি কে যেন টানিয়া,
বসি বসি চিত্রিয়াছে প্রেম-তুলি-দিয়া।
ঘন-নীল পক্ষ্মগুলি কোমল কোমল,
প্রেমের আসন পাতা, যেন মক-মল!
কজ্জল সুরমা আদি যেন মাখাইয়া,
রাখিয়াছে পক্ষ্মগুলি সুস্নিগ্ধ করিয়া।
থাক মুদে, থাক খুলে, সে দুটি নয়ন
সতত সুন্দর ভাই। গগনে যখন
দিবা-শেষে দৃষ্টি ফেলে সুন্দরী দাঁড়ায়,
কথা কি কহিব প্রাণ দেখে ডুবে যায়।
কি এক সাধুতা সেথা, কি এক স্নিগ্ধতা!
কি এক শীতল জ্যোৎস্না! কি এক মিষ্টতা!
দুটি চোকে ভাব যেন গলায় গলায়,
হাসি হাসি প্রেমে ভাসি দুটিতে খেলায়।
প্রেম পবিত্রতা শান্তি থাকিলে পরাণে,
যে হাসিতে সে বারতা বাহিরে বাখানে,
সেই হাসি বিরাজিত সুপ্রসন্ন মুখে ;
দরশনে সুখোদয়, হরে মনোদুখে ;
অধরে ফুটিয়া হাসি তরঙ্গে বহিয়া,
দু-কপোলে গিয়া যেন যায় মিলাইয়া।
সুন্দর ললাট! সে কি রক্ত মাংস-ময়!
পড়েনি একটী রেখা ; দেখে বোধ হয়,

না গড়িল সব নারী এক উপাদানে।
নহে সোনা নহে মাটি, এরি মাঝ-খানে
কি এক কোমল ধাতু, লাবণ্যে মিশ্রিত,
তাহাতে নির্মল বিধি মুখ আনন্দিত।
সে ললাটে শোভা-রাশি কি যেন খেলায়,
প্রসন্ন নির্মল স্বচ্ছ অপূর্ব দেখায়।
কুঞ্চিত চাঁচর ঘন চিকুর সুন্দর,
নামিয়াছে দুই স্কন্ধে কিবা থরে থর!
ঢেকেছে দুদিকে পড়ি আধ দু-কপোলে
ভ্রমরের পাল যথা ঘেরে নবোৎপলে।
প্রেমের তরঙ্গ যেন কপোলে লুঠিছে,
ভিতরে থাকিয়া প্রেম ফুটিয়া উঠিছে।
সন্তোষ, লাবণ্য, প্রেম সে মুখ-মণ্ডলে,
দেখা যায় যেন। দেখে প্রাণ-মন ভোলে।
নধর কপোল দুটি স্বাস্থ্যেতে ফুটিয়া,
বিম্বাধর-প্রান্তে এসে গিয়াছে ডুবিয়া।
ওষ্ঠদ্বয় সুরক্তিম অস্থূল গঠন,
দুটীতে মগন দুটী অপূর্ব মিলন।
সুগোল সুঠাম বাহু; সে বাহু চিত্রিতে
চিত্র-করে বহুক্ষণ হইবে ভাবিতে।
নহে স্থূল নহে ক্ষীণ, নহে নতানত,
নহে হ্রস্ব, নহে দীর্ঘ, নহে শ্বেতপীত।
এমনি সে দেহ-যষ্টি, ছবি যা দেখেছি,
কাব্যে যা পড়েছি কিম্বা মনে যা লিখেছি,
সেই নারী-মূর্তি যেন দেখিনু সেখানে।
ফুটিয়া রয়েছে সেই সংসার-উদ্যানে।
রূপ-সম গুণ বিধি দিয়াছে তাহারে;
কি যে স্নেহ সর্বজনে, এ পাপ-সংসারে,
এমন সৌজন্য ভাই! আর কি রে হবে।
আমি ত সামান্য পর, আপনার ভেবে
প্রাণ খুলে কত কথা! সে মিষ্ট-বাণী
শুনিলে জুড়ায় কর্ণ জাগয়ে পরাণি।
নির্জনে বিরস-মুখে, যদি কোন দিন,
বসিয়াছি, দেখিয়াছি সে মুখ মলিন।
কিসে যে মনের ভার ঘুচিবে আমার,
ভাবিয়া আকুল বালা। এক একবার,
সে পবিত্র প্রেম দেখে কেঁদেছি নির্জনে;
নারীকুলে রত্ন তুমি বলিয়াছি মনে।

বিমল দাম্পত্য-সুখ যা দেখেছি সেথা
জানি না এ দেহে আর দেখিব হে কোথা!
কি গভীর শ্রদ্ধা মরি দোঁহাতে দোঁহার,
দেখিলে নয়ন ভোলে, লাগে চমৎকার।
এমনি অপূর্ব প্রেম, যেন পরস্পরে
হেরে হেরে ক্লান্ত নয়; অতৃপ্ত অন্তরে
চাহি চাহি মুখ পানে, কি আনন্দে ভাসে!
ঢাকিতে না পারে সুখ আপনা প্রকাশে।
দুজনে শিক্ষিত, দুটী চিন্তায় চিন্তায়
কি সুন্দর লয় মরি! সুন্দরী সহায়
সব কাজে; পতি যবে ক্লান্ত-দেহে আসি,
লভেন বিশ্রাম-সুখ, প্রিয়তমা বসি,
দিনের সংবাদ সব পড়িয়া শুনায়।
কভু বা সে পদ্ম-হস্ত চরণে বুলায়।
পতি কার্যে ব্যস্ত সদা, সে মুখ সুন্দর
পাশে পাশে ফুটে থাকে; পত্রের উত্তর
কখনো সে নিজে দেয়, কভু বা সুন্দরী,
সংসারে চিন্তায়, কার্যে, সদা সহচরী।
এমনি মিশেছে দুটী জীবনে জীবনে,
দুই কিংবা এক তারা ভাবি মনে মনে।
পতির উৎসাহ, কার্য, প্রাণের দৃঢ়তা,
সতীর মাধুর্য, প্রেম, স্নেহ, কোমলতা,
মিশে কি অপূর্ব দৃশ্য খুলেছে তথায়,
তটিনী পড়েছে ঢ'লে সাগরের গায়।
তাদের চরণ ফেরে এ নর-লোকেতে,
পরাণ ফিরিছে দুটী কোন আলোকেতে!
প্রেমে কি এমনি হয়! সংসার কুয়াসা
এমনি কি দূর করে! পুণ্যের বাতাস
এমনি কি আনে ঘরে! স্বরগ প্রকাশ
এমনি কি মর্ত্যে হয়! আগে তো স্বপনে
জানি নাই, হেন স্বর্গ আছে এ ভুবনে!
কি ছার সৌন্দর্য-কথা বলিয়া শুনাও,
ধরার সৌন্দর্য-সার দেখিবারে চাও,
যাও গিয়ে একবার দেখ সে সংসারে
স্বর্গের কুসুম দুটী ফুটে কি প্রকারে।

ষষ্ঠ দল

সাধুতা

ষষ্ঠ বলে, "তরুলতা, ভূধর, সাগর,
বাসন্তী পূর্ণিমা, নারী, সকলি সুন্দর,
তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভাবি মনে
সাধুর প্রসন্ন-মুখে, যখন নির্জনে
যোগ মগ্ন দেখি তাঁরে, যে সৌন্দর্য নিরখি।
একবার নানা তীর্থ দেখিয়া বেড়াই
যেখানে জনতা দেখি তারি মাঝে যাই।
দেখিলাম কোন তীর্থে সাধু একজন,
কহেন ধর্মের কথা প্রসন্ন-বদন।
আরক্ত বিশাল নেত্র, প্রশস্ত ললাট,
আস্ক-বধিত ঘন কেশ পরিপাট,
পলিতার্ধ শ্মশ্রুরাজি, রেশম সমান.
ব্যাপিয়া বিশাল বক্ষ সদা বিদ্যমান।
গৌর-কান্তি, সুস্থ-দেহ, সবল, সুঠাম,
সংযমে উজ্জ্বল-মূর্তি, নয়নাভিরাম।
অধ্যাত্ম-সংগ্রাম রাখে নাহিক ললাটে,
বিজিত প্রবৃত্তি-কুল সুখে দিন কাটে।
সন্তোষ-বিশ্বাস-প্রীতি-জড়িত সুন্দর
দৃষ্টি তাঁর. অর্ধ-দণ্ডে জুড়ায় অন্তর।
এমনি সে দৃষ্টিমাত্রে যেন প্রাণ কাড়ে,
বিশ্বাস উৎপন্ন করে নিরাশা উপাড়ে।
গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব হাসি হাসি কয়,
সুমধুর আবির্ভাবে স্থান জ্যোতির্ময়।
কি যে আছে আবির্ভাবে অব্যক্ত শকতি।
কুসুমে ফুটায় যথা দিবাকর-জ্যোতি,
সে রূপে ফুটায় প্রাণে ; সাধুতার আশা
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ; পেয়ে ভালবাসা,
পাপেতে মলিন চিত্ত আপনা ধিক্কারে,
সন্তাপ-অনলে প্রাণ যেন দগ্ধ করে।
দুদণ্ড থাকিয়া সেই সাধুতা পবনে
দৃষ্টি খোলে ; মনুষ্যত্ব হয় যে কেমনে
বুঝি তাহা ; এমনি সে মধুর সমান
সহবাস, একেবারে মজে মন-প্রাণ।
প্রথম দাঁড়ায়ে শুনি, বসি না জানিয়া
সে কথা-রসেতে মজি গেলাম ভুলিয়া

কোথা আছি, আসিয়াছি কি কাজে কোথায়।
কুসুম ভ্রমরে বাঁধে, সেরূপ আমায়
কি এক ভাবেতে বাঁধি যেন বসাইল ;
বসায়ে চিত্তের ক্রমে উদ্বেগ হরিল।
সন্ধ্যা হলো প্রাণ ঘরে ফিরিতে না চায় ;
ইচ্ছা হলো দিবানিশি পড়ে থাকি পায়।
যেতে হলো, পরদিন না যেতে শর্বরী,
এসে দেখি, সে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করি,
স্নানান্তে বিপিন-প্রান্তে, বসি পদ্মাসনে
আছেন মগন যোগে ; আজি সে বদনে
কি জ্যোতি দেখিনু আমি। দেখিনি নয়নে
মানবের মুখে হেন ; পোহাইলে নিশি
তরল তপন-কর গিরি শৃঙ্গে আসি,
তুহিন-শিখরে যথা সুমণ্ডিত করে,
দেখিনু সে শোভা যেন সে মুখ-ভিতরে।
ভিতর হইতে আলো আসিছে ফাটিয়া,
তদুপরে অশ্রুজল যায় গড়াইয়া।
ভাবাবেশে প্রস্ফুরিত, পুণ্যে বিকশিত,
আলোক-মণ্ডলে মুখ দেখিনু মণ্ডিত।
গভীর অস্ফুট সুখ জাগিছে পরাণে ;
পড়িয়া তাহারি আভা সে পবিত্র ধ্যানে,
কি এক অপূর্ব জ্যোতি করিছে বিস্তার,
সম্ভ্রমে বিস্ময়ে চিত্ত ডুবিল আমার।
এই কি অধ্যাত্ম-যোগ, ভাবি মনে মনে,
সে সত্য-পুরুষে জীব ধরিলে পরাণে,
এমনি কি প্রাণ-পদ্ম হয় প্রস্ফুটিত।
স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুখ এমনি রঞ্জিত।
দেখিনু আচ্ছন্ন হ'য়ে, ভাবিনু একান্তে
বসেছেন ধ্যানে আসি এই বন-প্রান্তে,
অনুচিত থাকা হেথা ; আসিনু সরিয়া ;
ধ্যানান্তে আসিলে ফিরে, বিনয় করিয়া
চাহিনু থাকিতে সঙ্গে, পাই অনুমতি ;
তদবধি থাকি সঙ্গে ; দেখি মোর প্রতি
কি অপূর্ব ভালবাসা। থাকি তাঁর সনে
জ্ঞানের পিপাসা মোর নিত্য বাড়ে মনে।
পড়িলাম কত শাস্ত্র ; এদিকে আবার
হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি সদা দেখি তাঁর।

মাতার বাৎসল্য, আর সতীর প্রণয়ে,
শিশুর সারল্য-গুণে, সাধুর বিনয়ে,
ঈশ্বরের প্রেমচ্ছবি, সৌন্দর্যের খনি
কথায় কথায় খুলে দেখান এমনি,
হৃদয়ে পবিত্র ভাব এমনি উপজে
ঈশ্বরে নিকটে যেন পাই হে সহজে।
পাপেতে দারুণ ঘৃণা; অন্যায় শুনিলে
না শুনি কর্কশ ভাষা, কিন্তু হে দেখিলে
বোধ হয় অগ্নি-হ্রদ, ছুটিলে অন্তরে
আগ্নেয় পর্বত যথা কাঁপে থর থরে,
সে রূপে সে হৃদি কাঁপে, দেখে লাগে ত্রাস।
ঘোর বেগে বহে যেন পুণ্যের বাতাস।
বিশ্বাসী, সুদৃঢ়-চিত্ত, নির্ভয়ে সাহসী,
স্থির, ধীর, সুগম্ভীর, জিতেন্দ্রিয় বশী,
পুরুষ-প্রধান সেই ধার্মিক সুজন;
আজিও স্মরণে হয় সমুন্নত মন।
এ-দিকে যেন হে বজ্র অন্যদিকে ফুল,
দীনজন প্রতি তাঁর করুণা অতুল।
মায়ের মতন প্রেমে পালেন আমারে;
সামান্য অসুখ হ'লে, রেতে বারে বারে,
দেখেন বুলায়ে হাত এ পাপ-শরীরে;
ভাসেন শুনিলে দুঃখ নয়নের নীরে।
ছিল তাঁর সুতদারা অকালেতে গত;
লয়েছেন চির প্রিয় প্রচারের ব্রত।
কিন্তু প্রেমে এমনি সে বাঁধেন সকলে,
ভাই বন্ধু সুত দারা কত ধরাতলে।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-ভেদ সে প্রেম জানে না;
ধনী দরিদ্রের বেড়া সে প্রেম মানে না;
উদার হৃদয় কিবা। নরের কল্যাণে
যে যা করে, কেহ যদি বলে তাঁর কানে,
অমনি আনন্দ রেখা দেখি সেই মুখে;
এতই গভীর সুখ অপরের সুখে।
কি গভীর শ্রদ্ধা মরি রমণীর প্রতি,
জীবন্ত সদ্ভাব ব'লে জীবিত সে নীতি!
সেথান-বৈরাগ্য নাই; নারীর বদনে
ফেলিতে পবিত্র আঁখি নাহি ভয় মনে;
আমাদের মত কত নারী ভালবাসে;
তোষেণ সদ্ভাবে সবে; কভু বা উল্লাসে

বয়সে কন্যার মত যে সব যুবতী
দেখান কতই স্নেহ তাহাদের প্রতি।
সোহাগে ধরিয়ে করি মস্তক আঘ্রাণ;
গুণের প্রশংসা করি কতই বাড়ান।
এরূপে ছিলাম সুখে, সহসা তাঁহারে
আসিয়া হ'রল মৃত্যু ফেলিয়া আঁধারে।
তদবধি ঘুরিতেছি অবনী-ভিতর
সে চরিত্র-সম কিছু না দেখি সুন্দর।"
কবি বলে সৌন্দর্য্যের সার কথা যাহা,
সবাই না জেনে ভাই ব'লয়াছে তাহা,
যা দেখিলে, যা শুনিলে, প্রাণ সমুন্নত,
নীচ কুবাসনা হরে, পশু-ভাব যত
লজ্জা পায়, দেব-ভাব ফুটে ফুটে উঠে;
স্বর্গীয় সৌরভ যেন প্রাণ-মধ্যে ছুটে,
আমি বলি ধরা-ধামে সেইত সুন্দর;
সর্ব-শ্রেষ্ঠ, অরূপ সে রূপ মনোহর।

বিচ্ছেদ

প্রথম দল

পুরুষ

কথায় কথায় আজ বন্ধু দুই-জন
যায় কোথা? পরস্পর কণ্ঠ আলিঙ্গন;
গ্রাম ছাড়ি নামিয়াছে বিশাল প্রান্তরে,
কথায় ভুলিয়া যায় দূর বনান্তরে।
উৎসাহী যুবক দুটি, প্রেমিক সুজন,
সুশিক্ষিত, আজ দোঁহে হয়েছে মগন
দেশহিত-চিন্তা-স্রোতে; তরঙ্গ উঠিছে
কত তাহে, কথা-সূত্রে কি কথা যুটিছে।
রাজনীতি, সাম্যনীতি, সমাজচরিত্র,
দুর্নীতি দুর্গতি, ঘোর দারিদ্র্যের চিত্র,
একে একে কত তত্ত্ব আসিছে যাইছে;
চরণ কোথায় যায় টের না পাইছে।
ওদিকে দিবস-শেষ; ওই চরা করি
দলে দলে ধায় পাখী মাঠ পরিহরি।
কোথা বা প্রকাণ্ড কোন বনস্পতি-শিরে,
শত শত পাখি আসি বসে ধীরে ধীরে;

হেলে দুলে গাভীকুল যায় সারি সারি,
রাখাল ধরিছে তান, দূর হতে তারি
ধ্বনি বহে বহে আসে, অপূর্ব শুনায়।
অদূরে চাষার গ্রামে, শিশুরা খেলায়,
অস্ফুট সে কোলাহল আসিছে বাতাসে;
হাল গরু সনে চাষা গৃহমুখে আসে।
জলের কলস কাঁকে কৃষক সুন্দরী
দোলাইয়া বাহু ঘরে যায় ত্বরা করি।
দূরেতে গ্রামের আড়ে লুকাইল রবি;
গগনে সিন্দুর-ছটা, প্রকৃতির ছবি
আধ খোলা আধ ঢাকা গোধূলি আঁধারে,
সে গ্রাম-প্রান্তরে সন্ধ্যা আসে এ প্রকারে।
বন্ধু দুটি বন-পার্শ্বে ধরা-স্তূপোপরে
বসিয়াছে; বসি এক অন্যে প্রশ্ন করে।
"শুন সখা! বহুদিন এ-বাসনা চিত্তে,
জিজ্ঞাসি কি কারণে কয় মাস হ'তে,
তোমারে কিরূপ দেখি? বিষাদের রেখা
পড়েছে বদনে; আর নাহি যায় দেখা
সেই সদানন্দ ভাব; সতত চিন্তিত,
নির্জনত'-প্রিয় তুমি; হেন লয় চিত,
কি এক দারুণ শেল প্রাণে বসিয়াছে;
গভীর অস্ফুট দুঃখ লুকাইয়া আছে।
শুনেছি বিবাহ তরে সাধিছে স্বজনে,
করেছ প্রতিজ্ঞা না কি দাম্পত্য-বন্ধনে
পড়িবে না বাঁধা কভু; দেশ-হিত-তরে
দিবে প্রাণ; সে কঠোর প্রতিজ্ঞার ডোরে
বাঁধিয়াছ; ভব-সুখে নাহি আর আশ।
বল সখা, কিসে এত হইলে হতাশ?"
ওদিকে ছাইয়া এল আঁধার যামিনী।
যুবা বলে, "শুন ভাই যে দুঃখ-কাহিনী
কব আজ, কর সত্য, না বলিবে কারে,
সকলি ভাঙিয়া বন্ধু! বলিব তোমারে।
মাতুল-আলয়ে ভাই গত জ্যৈষ্ঠমাসে
গিয়াছিনু; তথা গিয়ে, মনের উল্লাসে,
ভাই-বোনে সবে মিলি হাসি খেলি গাই;
কোলাহলে সেই ঘর আনন্দে জাগাই।
একদিন নবাগতা আসিল কামিনী
মাতুলীর ভ্রাতুষ্পুত্রী নাম মৃণালিনী।

শুন সখা, পক্ষিকুলে যদি হে ময়ূরী
আসি পশে, যে প্রভেদ সবে লক্ষ্য করি,
সেরূপ সে নারী-রত্ন অপূর্ব স্বভাবে
পূরিল সে ঘর এক নব আবির্ভাবে।
বয়সেতে বিংশ বর্ষ, কিন্তু হে সম্ভ্রমে
না পারে ঘেঁসিতে কাছে মন কোনক্রমে।
দৃষ্টিতে সাধুতা বৃষ্টি, নাহি চপলতা,
বিনয়ে সলজ্জ সদা, প্রেম, কোমলতা,
দিয়ে কি গড়িল বিধি? প্রেমেতে সবারে
কিনিয়া ফেলিল যেন। পাইয়া তাহারে
সবে সুখী; একা বালা সব পরিজনে,
করে সেবা; পর-দুঃখে তার দু-নয়নে
দেখেছি ঝরিতে অশ্রু। কি যে এক জ্যোতি
ঘিরে আছে! কাছে যাই না হয় শকতি।
সুন্দর সে মুখ-শশী দেখিবারে চাই,
দেখিতে পরাণ-খুলে যেন বা ডরাই।
নধর সে মুখখানি, বিশাল নয়নে
কি শোভা করেছে তার। যেন এক সনে
স্বর্গের বিচিত্র রঙ্গ মিশায়ে ঢেলেছে।
প্রেমের অপূর্ব রস দৃষ্টিতে লেগেছে।
নীলোজ্জ্বল নেত্র-দুটী আকর্ণ-বিশ্রান্ত,
দৃষ্টিতে মিলিলে দৃষ্টি মন পথ-ভ্রান্ত!
সুঠাম কপোল দুটী আরক্ত-বরণ,
স্বাস্থ্য প্রস্ফুটিত তথা, দুটীতে মগন
ওষ্ঠ-প্রান্তে; ঘন-নীল কিবা কেশ-ভার!
আম্ব-শোভিত তাহা; কুন্তল তাহার
আপনি পড়েছে আসি দুই নেত্র-কোণে;
করিছে শোভিত মুখে অপূর্ব শোভনে।
উজ্জ্বল সুশ্যাম-কান্তি, কোমল গঠন
সর্বাঙ্গ-সুন্দর তনু, প্রসন্ন বদন
সদা মধুরতা-ময়। হাসি-রাশি যবে
সে অধরে দেখা দেয়, কি সৌন্দর্য তবে
প্রকাশিত, কি বলিব? এই মাত্র জানি
দেখিলে না ভোলা যায় সেই মুখখানি।
সরল সে মুখখানি যার তার কাছে
ফুটে থাকে। সে মুখের জান হে কি আছে,
অপূর্ব মোহিনী-মন্ত্র, বিচিত্র চাতুরী,
চুপে চুপে প্রাণে পশি মন করে চুরি!

সে সৌন্দর্য-নীরে ভাই, ডুবিলে নয়ন
আর না উঠিতে পারে। সারসী যেমন
উঠিতে জলজ-লতা পায়ে টেনে আনে,
সেরূপ সুন্দরী যেন আমার পরাণে
যথা যায় টেনে লয়! রূপ-রাশি তার
হৃদয়ের ছায়ামাত্র! যথা গন্ধ ভার
ছড়ায় কস্তুরী, তথা সে নারী-রতন,
স্বর্গের সুঘ্রাণ আনি, যেন সে ভবন
পূর্ণ করে। সে বাতাসে পরাণ আমার
দলে দলে ছুটে গেল; অমৃত সঞ্চার
হলো মনে; জীবনের মহিমা বাড়িল;
সুখের স্বপনে চিত্ত যেন ডুবাইল।
শুনেছি নক্ষত্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ,
সৌর-রাজ্য-বাসিগণ, এই ধরা-সহ,
মধ্যবিন্দু রবি-দেহে ডুবিবারে চায়,
কেন্দ্র-বিবর্জনী গতি ডুবিতে না দেয়,
অনন্ত অম্বরে তাই নিয়ত ঘুরিছে;
সেই মধ্যবিন্দু ফেলে যাইতে নারিছে;
সেরূপ পরাণ চায় ডুবিতে পরাণে,
সম্ভ্রমে বাঁধিয়া রাখি; রাখি মাঝখানে
সে আলোকে যেন ঘুরি। দীপালোকে ঘিরে
শলভ চৌদিকে যথা বুলে বুলে ফিরে,
শেষে সে অনলে করে আত্ম-সমর্পণ;
বাসনা আমিও ঢালি জীবন-যৌবন
সে আলোকে; কিন্তু মন সহসা বসিতে
নাহি পারে; ঘুরে ঘুরে ফিরে চারিভিতে,
পরিচয় যত বাড়ে, যে লজ্জা-আড়ালে
ছিল বালা, ক্রমে তাহা খসি পড়ে কালে।
কত কথা দুই জনে, সজনে নির্জনে,
কভু বা পূর্ণিমালোকে, যবে উপবনে
সকলে বেড়াতে যাই, আমরা উভয়ে
বিবিধ প্রসঙ্গে শুধু থাকি মগ্ন হয়ে।
কি উদার, কি পবিত্র, কি সাধুতা-ময়,
সেই চিত্ত। দিন দিন আলাপে হৃদয়
উচ্চ হয়; সে আলাপ কত গুণ ধরে,
ফুটায় সদ্ভাব-রাশি, অসাধুতা হরে।
কভু বা আঁধার ছাদে, একান্তে দুজনে,
ফেলি দৃষ্টি তারা-ময় অনন্ত গগনে,

বিশ্বের অনন্ত ভাবে যেন ডুবে যাই।
কি বলিব সখা, আমি কভু দেখি নাই
এ হেন ঈশ্বর-প্রীতি ; বলিতে বলিতে
কতদিন অশ্রু-বারি দেখেছি ঝরিতে
সেই নেত্রে ; ধর্মতত্ত্ব কতই সুন্দর
শুনাল সে ; জড়-প্রায় আমার অন্তর
ছিল ভাই। তার স্পর্শে পাইল চেতন ;
জানিনু পরম-তত্ত্ব, পাইনু জীবন।
দিন দিন সদালাপে মন-প্রাণ ভোলে ;
নবালোক দেখি নেত্রে, জ্ঞান-চক্ষু খোলে।
কি সুখে যে দিন কাটে না হয় বর্ণনা।
কভু সারা-নিশি জাগি, বসি দুই জনা
করি হে রোগীর সেবা ; করি বিনিময়
ভাবে ভাবে, মনে মনে প্রাণে প্রাণে লয়।
দরশনে আনন্দের কি লহরী উঠে,
হয়ত জানে না বালা, মুখে নাহি ফুটে
প্রাণের সে ভাষা মোর, মুখখানি চেয়ে,
কেবল সুধার রসে যাই রে ভলায়ে।
আগুনে আগুনে জ্বালে তাই কি ঘটিল ?
প্রাণ মোর কানে কানে যেন হে বলিল,
সে যে ভালবাসে ; দেখি তাহারো অন্তরে
সেই অগ্নি জ্বলে ; কথা এত সমাদরে
বলে মোরে, মনে মনে বড় লজ্জা পাই ;
আমি জানি সে পদার্থ এ অধমে নাই।
দেখিলে আমার মুখ কি যে প্রফুল্লতা
ফুটে উঠে। দেখি আমি থাকি যথা তথা,
একাজ সে কাজ ল'য়ে সেই ঘরে আসে,
ভুলিয়া অপর কাজ থাকে মম পাশে।
কি যেন মনের ভাষা ফুটিবারে চায়,
ভাবের সমুদ্রে যেন তখনি ভলায়।
কপোলে রক্তের ছটা, শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়,
দেখে বুঝি সেই প্রাণে কিবা ভাবোদয়।
ইচ্ছা হয় হাত ধরি বসাইয়া পাশে,
জিজ্ঞাসি, কি ভাব তাহা, যাহা প্রাণে আসে,
অথচ না আসে মুখে, সম্ভ্রমে লুকায় ;
বলেছে অনেক কথা, ঘুরিয়া বেড়ায়
কিন্তু সকলের সেরা কি কথা হৃদয়ে,
কপোল ফুটিয়া যাহা যায় মগ্ন হয়ে ?

কি যেন জানিতে চায়, বলি বলি বলি,
অমনি সে প্রশ্ন তার কোথা যায় চলি!
সম্ভ্রমে ভাঙ্গিতে নারি; তৃষিত-নয়নে
হেরি শুধু নিষ্কলঙ্ক সুধাংশু-বদনে।
কি দশা হইল মোর! পদ-শব্দে তার
জাগে প্রাণ; সর্বাঙ্গেতে অমৃত সঞ্চার,
কাছে এলে ভাব-সিন্ধু উথলে অন্তরে;
প্রাণ তন্ত্রী বাজে তার অক্ষরে অক্ষরে।
মনে সে জড়ায়ে গেল, অথবা তাহাতে
যেন হে পশিল মন: সে আসে চিন্তাতে;
একা থাকি, সে নির্জন করে সে সজন;
জাগি'ল সে চিন্তা প্রাণে, নিদ্রাতে স্বপন।
চিনি-অণু জল-অণু যথা শরবতে
মিশে রয়, তাহে আমি সে এল আমাতে।
অথচ বাসি যে ভাল, এ-কথ বলিতে
শরমে বাঁধিছে মুখে; হেন লাগে চিতে
বলিলে প্রেমের মূল্য বুঝি বা কমিবে,
সুন্দরী আমারে হীন বুঝি বা গণিবে।
আগুন কি ঢা'কা থাকে বসন-অঞ্চলে?
না জানিতে মোরা যেন জানিল সকলে।
করে তারা কানাকানি বুঝিবারে পারি;
আমি জানি লুকায়েছি লুকাইতে নারি,
আধ ঢাকা আধ খোলা লাবণ্যে যেমন
ঢাকে নারী, আরো খোলে; সে প্রেম তেমন,
ঢাকার প্রয়াসে ভাই, আরো পড়ে ধরা।
এরূপে বিষম ফাঁদে পাড়ছি আমরা,
হেনকালে, মামা মোর ডাকি একদিন,—
উদার প্রেমিক তিনি সুবিজ্ঞ প্রবীণ—
জিজ্ঞাসেন দ্বার দিয়ে, 'কানাকানি শুনি,
মিশিছ অন্যায়-ভাবে তুমি মৃণালিনী?'
হয়েছিল বড় লজ্জা; কিন্তু হে 'অন্যায়'
কথাটা গোলার মত প্রাণকে পোড়ায়।
কে দিল সাহস মোরে। বলি, মামা। আমি
লুকাব না কোন কথা। জানে অন্তর্যামী,
"ভালবাসি" এ-কথাটা বলি নাই তারে।
কিন্তু মামা! ঘিরিয়াছি কি চিত্ত-বিকারে,
তাহে মগ্ন মন-প্রাণ; নারি ফিরাইতে;
বলেছে, মাতুল। মোর যত নিবারিতে

চাহি চিত্তে, আরো যেন পড়ি সে নেশায় ;
আমারে পরের করি যেন কে ডুবায়।
আরো বলি, মৃণালিনী বড়ই পবিত্র,
অতি ধীর, সুসংযত, উদার চরিত্র,
বুঝিয়াছি বাসে ভাল, কিন্তু কোন দিন,
দেখিনি এ হেন ভাব, যাহাতে মলিন
আছে কিছু ; ভয় হয়, উপরে তাহার
অন্যায় সন্দেহ মামা। জন্মে আপনার।'
বলিলেন মামা,—'আমি চিনি তো তোমায়
তোমাতে বিশ্বাস আছে ; তুমি যে নেশায়
পড়িয়াছ, নর-নারী প্রথম যৌবনে
পড়ে হেন ; কিন্তু বৎস। জেনে রাখো মনে
বিধবা সে, পিতা তার সমাজের দাস ;
দিবে না বিবাহ কভু ; এ-কথা প্রকাশ
হইলে মেয়েটি পাবে বিষম যাতনা ;
নিগ্রহ সহিতে হবে অশেষ গঞ্জনা।
ফিরাও হৃদয় ; ধৈর্যে বাঁধ আপনারে ;
প্রাণ হ'তে উপাড়িয়ে ফেলে দাও তারে।'
গেলেম আপন কাজে ; দেখি তাড়াতাড়ি
যোগাড় করিছে তারে পাঠাইতে বাড়ি।
কি সংগ্রাম দুটী প্রাণে, বিধাতা জানিল ;
তেমন প্রসন্ন পদ্ম দেখি শুকাইল।
আর নাহি কোন কথা দোঁহে; ফেলিয়া ভবনে
বাণ-বিদ্ধ-মৃগ-সম ফিরি বনে বনে ;
ফিরি বটে, মন মোর সেই দিকে ছুটে ;
শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, প্রাণ বুঝি টুটে।
আসিল যাবার দিন ; ভাবিলাম মনে,
থাকিব যাবার কালে নিকটে কেমনে ?
অথচ শেষের দিনে দিব না বিদায়,
তাই বা কেমনে হয় ? বহু কষ্টে হায়।
বেঁধে প্রাণ সেই দিন র'হিনু দাঁড়ায়ে ;
অশ্রুকে থামাই, রাখি মনকে বুঝায়ে।
ক্রমে বালা একে একে বিদায় লইল ;
অবশেষে অভাগার নিকটে আসিল।
সে এল নিকটে বটে, আমি যে তখন
কোথা ছিনু জানি না তা ; সে কোনো বচন
বলিল কি নাহি জানি ; মুখ বলে নাই ;
নয়ন যা বলেছিল, তাই শুনে তাই,

ধরণী ফাটিয়া যেন গিলিল আমায়।
বলিতে নারিনু কিছু মরিনু লজ্জায়।
আঁখি হেন, মৃণালিনী পায় পায় চলে ;
ঘন ঘন মুছে মুখ বসন-অঞ্চলে।
অবশেষে যানে যবে বসিতেছে গিয়া,
একবার এই মুখে দেখিল চাহিয়া।
ব'লে গেল 'মনে রেখ', নয়নে নয়নে।
তদবধি ভাই আমি রাখিয়াছি মনে।
একি দেশাচার! আমি মামার চরণে
পড়িয়া করিনু ভিক্ষা, যদি এ জীবনে
আর না হইবে দেখা, হয় হোক্ ভাই ;
পত্রাদি লিখিতে যেন অনুমতি পাই।
শুনিনু জনক তার জানি সে বারত',
অশেষ নিগ্রহ করি, নিষেধ সর্বথা
করিলেন কোন কথা লিখিতে, শুনিতে,
তদবধি বহু-কষ্টে বাঁধিয়াছি চিত্তে।
বিষাদে নিরাশ-নীরে, জনম মতন,
আশার প্রতিমা ভাই! করি বিসর্জন ;
ভাবি প্রাণ হ'তে চিন্তা ফেলি হে উপাড়ে,
জড়াইয়া থাকে প্রাণে কেন নাহি ছাড়ে?
দুরন্ত বালকে মাতা ঘুম পাড়াইতে
চায় যবে, বলে চাপি তাহারে শয্যাতে,
শিরে করে করাঘাত, কিন্তু সে সন্তান,
বিষম দুরন্ত শিশু, না শুনে সে গান,
জননীর হাতে ঠেলি উঠে বার বার ;
ভাই রে! আমার মন যেন সে প্রকার,
এ কাজ সে কাজে ফেলে ঘুম পাড়াইতে
যত চাই, তত যেন জেগে উঠে চিতে
সেই চিন্তা ; যথা যাই প্রাণ মাঝে জাগে ;
সংসারের সুখরাশি তাই তিক্ত লাগে।
করেছি প্রতিজ্ঞা ভাই, যেই দেশাচারে
সরলা নারীর প্রাণ পিষে এ প্রকারে,
তাহার উচ্ছেদ-ব্রতে সঁপিব জীবন ;
নিব না এ কণ্ঠে আমি দাম্পত্য বন্ধন।
যে অনলে জ্বেলে বালা গিয়াছে হৃদয়ে,
নির্জনে স্মৃতির কাষ্ঠ তাহাতে যোগায়ে,
সজাগ রাখিব তারে ; সে প্রেমের ধার
সখা হে! শকতি নাই শুধিতে আমার,

তবে যদি দিতে পারি এই মন-প্রাণ
তাঁর প্রিয়-কার্যে ভাই, যাঁহার সন্ধান
সে শিখাল মোরে, তবে বুঝি লোকান্তরে
গেলেও পাইতে পারি মরণ-অন্তরে ।"

দ্বিতীয় দল

রমণী

শারদ পূর্ণিমা আজ, সহরের দূরে,
বহু দূরে, কোন গ্রামে, গৃহস্থের ঘরে,
দুটী সখী বেড়াইছে গৃহের প্রাঙ্গণে।
গভীর কথাতে মগ্ন, একে অন্যজনে
বাঁধিয়াছে আলিঙ্গনে, বাঁধিয়া জিজ্ঞাসে ;—
"বল সই। ম্লান প্রাণ কি ঘোর নিরাশে ?
কেন নির্বাসিত হেথা করেছে তোমারে ?
নষ্ট দুষ্ট নও তুমি, তবে এ প্রকারে
কেন লো পাইলে সাজা। কেন বা তোমার
বদনে কালিমা-রেখা দেখি অনিবার ?
প্রাণ-সই, ওই মুখে মধুময় হাসি
সাজে ভাল, সেই হাসি সদা ভালবাসি।
বল লো সরলে, কেন কঠিন নিগড়ে
বেঁধেছ রসনা তুমি ? দেখি অশ্রু পড়ে
ওই মুখে, একা তুমি বিজনেতে বসি
ভাব যবে ; কিন্তু যদি কারণ জিজ্ঞাসি,
প্রাণ-সই, ধৈর্য-বস্ত্রে ঢেকে শোক-রাশি,
এ কথা সে কথা বলি ভুলাইতে চাও,
লুকান বেদনা যেন গভীরে লুকাও।
কি শেল, কি বিষ সেই, যাহা প্রাণে পশি
খাইছে অন্তর খুলে, ম্লান মুখ-শশী ?
প্রাণ-সখি। পায়ে ধরি ফেল না আমারে
এত দূরে। ভেঙ্গে বল, যদি করিবারে
কিছু নাহি পারি সই। ওই অশ্রু সনে
মিশাইয়ে অশ্রু পারি কাঁদিতে দুজনে।
সখি লো। তোমার তাতে না হোক্ সান্ত্বনা,
আমার ঘুচিবে সই, এ ঘোর যাতনা।"
বলিতে সে পদ্ম-নেত্রে অশ্রুধারা ঝরে,
বিন্দু বিন্দু বাহি পড়ে সখী-বাহু'পরে।

মৃণালিনী প্রেম-ভরে বসন-অঞ্চলে
মুছি তার অশ্রু, বলে,—"সই লো সরলে,
জনম-দুঃখিনী আমি ; কেন মোর প্রতি
এত স্নেহ ! কি হইবে শুনিয়ে দুর্গতি।
বাড়িবে দুঃখের বোঝা, তাই ত বলি না
দুঃখের কাহিনী মোর ; তোমারে ছলি না
প্রাণ-সই, পর ভাব নাহি লো তোমাতে।
শুন তবে, পিসী মোর, যাঁর কথা প্রাতে
হয়েছিল, তাঁর গৃহে, গত জ্যৈষ্ঠমাসে
গিয়েছিনু। পিসী মোরে বড় ভালবাসে,
কথা ছিল রব তথা কিছুকাল তরে।
কিন্তু সই! দেখি নর এক মনে করে,
ঘটনা-চক্রেতে বিধি অপর ঘটায় !
সেখানে বিষম-ফাঁদে ফেলিল আমায়।
সই লো! বিধবা আমি, জানি তো নিশ্চয়,
বিমল দাম্পত্য-সুখ, পবিত্র প্রণয়,
জীবের কল্যাণ তরে বিধি যা রচিল,
সংসারে করিতে স্বর্গ ধরাতে থুইল,
সে সুখ মোদের নয় ; তাই দৃঢ় করি
বেঁধেছিনু প্রাণ-মন, জীবনের তরি
চালাইব একা একা, পুরুষের পানে
ফেলিব না সেই দৃষ্টি, কবিরা বাখানে
যে দৃষ্টিতে জন্মে প্রেম ; লজ্জা-আবরণে
সতত ঢাকিব নিজে ; রাখিব চরণে
দূরে দূরে, গুরু-সেবা ভ্রাতৃ-সেবা লয়ে
জীবনের দিন ক'টা দিব লো কাটায়ে।
আলস্যে কাটিলে দিন পাপে হয় মতি,
তাই সখি, আনাইনু যেমন শকতি
নানা গ্রন্থ ; ধর্ম তত্ত্ব আলোচনা করি,
মহা সুখে কাটে দিন বিভু-গুণ স্মরি।
ভেবেছিনু নিরাপদে জীবনের পথে
একরূপে চলিয়া যাব ; আমি কোন মতে
পড়িব না বাঁধা সই! কোন মায়া-জালে ;
প্রণয় কাহাকে বলে তাহা কোনকালে
জানি নাই ; শুনিতাম প্রণয় প্রণয়,
শুনিতাম এক প্রাণ অন্যে কাড়ি লয় ;
ভাবিতাম, আমি নাহি দিলে মন-প্রাণ,
কে পারে লইতে কেড়ে ; দুর্বল অজ্ঞান,

ভাবিতাম সেই সবে প্রণয়ের ফাঁদে
পড়ি যারা এ সংসারে শুনিতাম কাঁদে।
সই লো! জানিনি তবে মোর অহঙ্কার,
চূর্ণ হবে, সেই দশা ঘটিবে আমার।
তাই হলো; পিসী মোরে নিলেন নিকটে
ভাল ভেবে, কিন্তু সই, এমনি সঙ্কটে
পড়ে গেনু, কেঁদে দশ শেষে হই সারা,
বুঝেছি বুঝেছি এবে প্রণয় কি ধারা।
অনেক নূতন লোক মিলিল সেখানে;
সে বাড়ীর ছেলেমেয়ে সবে প্রেম-দানে
তুষিল আমারে, নিল পরম আদরে;
অকপট প্রেম গুণে শাখি নিজ ঘরে।
কিন্তু সই, তার মাঝে পুরুষ সুন্দর
দেখিলাম এক; দেখে সম্ভ্রমে অন্তর
পূর্ণ হলো; ধীর, স্থির, সুজন, বিনীত,
অথচ প্রসন্ন-চিত্ত সদা প্রফুল্লিত,
পুরুষ-প্রধান সেই, প্রশস্ত ললাট,
আকুঞ্চিত ঘন নীল কেশ পরিপাট
ঢেউ খেলাইয়া তাহে পড়েছে দু পাশে;
জ্যোতি-পূর্ণ, আরক্তিম, নেত্র-দুটী ভাসে
যেন প্রেমে; শুন সই, সে দুই নয়ন
সারল্য-সাধুতা-মাখা সুন্দর এমন,
চাহে যদি কারো পানে বুঝি বা জুড়ায়
দেহ তার; সেই মুখ বুদ্ধির আভায়
এমনি উজ্জ্বল সখি, বারেক দর্শনে
ভুলিতে নারিবে কভু সদা রবে মনে।
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেন ওষ্ঠেতে বিরাজে;
দু-কপোলে লোমাবলি কি সুন্দর সাজে।
গৌর-কান্তি, বলবান, বিশাল উরস,
আসন পেতেছে তথা যেন লো সাহস।
আকৃতির মত গুণ। সে কি সরলতা,
সে কি উচ্চ-ভাব সখি! নাহি কপটতা
লেশ মাত্র; অনুরাগ বিরাগ গণনা
করে না সে; সত্য প্রিয়, নাহি লো সে জনা
এ জগতে, যারে ডরে, কিম্বা যায় তরে
কর্তব লঙ্ঘন করে; নির্ভীক অন্তরে
করেন সত্যের সেবা; কাপুরুষ মত
চলে না সে; গ্রীবা তার সদা সমুন্নত।

পদভরে কাঁপে ধরা ; ধীর-কণ্ঠ-স্বর
নবীন নীরদ জিনি জাগায় অন্তর ;
বীরদর্পে ভরা প্রাণ ; অথচ বিনয়ে
নারী-পাশে সসম্ভ্রমে থাকে নত হয়ে।
কি সাধুতা মোর প্রতি! সখি লো, দেখিয়া
আপনারে দিনু লজ্জা ; নির্জনে বসিয়া,
কতই ধিক্কার নিজে দিয়া বলি মনে ;
সাধুতার পাঠ মন লও ও চরণে।
যত পরিচয় বাড়ে, নূতন জগত
দেখি সই ; জ্ঞান-ধর্মে এত সমুন্নত
পুরুষ দেখিনি কভু ; উদার চরিত্র!
হায় সখি, সে হৃদয় এমনি পবিত্র,
যেন স্বার্থ-গন্ধ নাই ; বুঝি অনুমানে
আমাতে গভীর প্রেম ; উভে কত স্থানে
বিজনে হইল কথা, সই! কোন দিন
না দেখিনু না শুনিনু কামনা মলিন।
নাই লো নীচতা তাঁতে, পুরুষ-প্রধান,
বীরত্বের উচ্চ শৃঙ্গে সদা তাঁর স্থান।
সখি লো, পড়িনু জালে ; পুরুষ-রতন
যাদু-মন্ত্রে প্রাণ মোর করিল মোহন।
জানি না কেন যে প্রাণ চায় হেরিবারে
সেই মুখ, দিবানিশি যাই বারে বারে
নানা ছলে তাঁর পাশে ; নিকটে দাঁড়ালে,
এক নব ভাব-সিন্ধু অন্তরে উথলে ;
যতনে সামালি তারে ; দেখি ও স্বর
না পারে কহিতে কথা যেন শুষ্ক হয়।
দুরন্ত সংগ্রাম সই, বাজিল পরাণে ;
ফিরাইতে চাহি মনে, বারণ না মানে ;
যত রোধি তত বলে সেই দিকে ধায় ;
সে মোহনমূর্তি-পাশে থাকিবারে চায়।
সই লো, বর্ষার দিনে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
ধেয়ে বেগে মহা-রবে পড়ে দ্রুত-গতি,
সেরূপে জীবন মোর দেখি পরস্থিয়া
তাহাতে মিশিতে যেন যায় লো ছুটিয়া!
যাই যাই, ডুবি ডুবি, সামাল সামাল,
কি আবর্তে পড়ে ঘুরি! যে প্রতিজ্ঞা-জাল
দৃঢ় করি বেঁধেছিনু, ছিন্নভিন্ন হয়ে
কোথা গেল! নব-ভাব জাগিল হৃদয়ে ;

প্রাণ সেই-ময় হলো ; বসিয়া নির্জনে
চমকে চমকে উঠি ; যেন আলিঙ্গনে
বাঁধে মোরে সে সহসা, যেন হাসি হাসি,
কি কর মৃণাল বলে জিজ্ঞাসিছে আসি !
চিন্তাতে মিশিল মোর ; প্রাণেতে পশিল ;
ভাবে জড়াইল সই, হৃদয়ে বসিল ।
সখি, মোর পূর্বকার যতেক কল্পনা
ঘুচে গেল ; একা তরি চালান গেল না ।
চুরি করে প্রাণে পশি, সে তরির শিরে
কে বসিল ! নিজ দশা ভাবি অশ্রু নীরে
ভাসিলাম ; যেই আশা কভু পূরিবে না,
কেন তাহে ডোবে মন, কেন শুনিবে না
কঠোর প্রতিজ্ঞা মোর, এই বলি মনে
আবার বাঁধিতে চাই প্রতিজ্ঞা-বন্ধনে ।
সই ! সই ! নিম্ন মুখী, দুর্জয়-গামিনী,
বাঁধ ভাঙ্গি ধায় যথা কল-নিনাদিনী,
প্রতিজ্ঞার সেতু মোর কোথায় ভাসায়ে
লয়ে গেল ! পারিনু না সে প্রাণ ফিরায়ে
আনিবারে ; প্রাণ-মন গেল পরহাতে ;
সে জনে গেলাম আমি সে এল আমাতে ।
তিনি যে সুজন সাধু, সই, কত দিন
ভাবিলাম খুলে বলি, কিরূপ কঠিন
সংগ্রামে পড়েছি আমি, কত উপদেশ
পেয়েছি তো, পাই যদি সন্ধান বিশেষ,
যাহে উচ্ছৃঙ্খল মনে শৃঙ্খলিতে পারি,
সে দায়ে বাঁচিয়া যাই কৃপায় তাঁহারি ।
কিন্তু তাই পারি নাই ; দাঁড়াইয়া পাশে
বলি বলি মুখে কেন সে কথা না আসে !
ফোটে ফোটে কথা সই, সম্ভ্রমে লুকায় ;
হৃদয়ের ভাবাবর্তে পুন ডুবে যায় ।
এ কথা সে কথা বলি যাই কার্যান্তরে,
আন্দোলিত ভাব-সিন্ধু পূরিয়া অন্তরে ।
এ রূপেতে দিন যায় বুঝি কানাকানি
হলো সই, এক দিন, কেন যে না জানি,
পিসীমা চাহিল মোরে পাঠাতে স্বদেশে ;
লজ্জায় মরিনু সই ; আমি বহু-ক্লেশে,
ভেবেছিনু লুকায়েছি সে নব-বিকার ;
ডুবায়েছি সুগভীরে সংগ্রাম আমার ;

কিন্তু তা হলো না সখি, মরি লো সরমে
এই ভেবে, তাঁর প্রতি যদি কোন ক্রমে
অন্যায় সন্দেহ করে, সাধু সদাশয়
শেল-সম সেই প্রাণে বাজিবে নিশ্চয়।
কি করিব পরাধীনা বঙ্গের রমণী
যা করেন বিধি বলে বাঁধিনু সজনি
প্রাণ-মন। সখি, আমি সেদিনের ছবি
কিরূপে আঁকিব বল? মোর সুখ-রবি
সেই দিন অস্তে গেল জনম মতন।
নিরাশ সমুদ্রে আমি ভাসানু জীবন।
লইনু বিদায় সবে, দেখি এক পাশে
একাকী দাঁড়ায়ে সাধু চক্ষু জলে ভাসে,
কঠোর প্রতিজ্ঞাবলে বোধি সে আবেগে;
সে হেন প্রসন্ন-মুখ মলিনতা মেঘে
ঘিরিয়াছে; বুঝিলাম কি ব্যথা মরমে।
নিকটে গেলাম শেষে; কিন্তু লো শরমে
কি বলিতে কি বলিনু জানি না সকল;
দেখি নোয়াইলা দৃষ্টি, দুই বিন্দু জল
অমনি পড়িল বক্ষে। সখি লো, আমার
হৃদিপিণ্ডে সুশাণিত যেন তরবার
কে বসাল। ইচ্ছা হলো পড়ি পদতলে
কেঁদে বলি, যত দিন এই ধরাতলে
রবে দেহ, এ মুরতি যেন হৃদে ধরি,
পবিত্র প্রণয়-ব্রত উদ্‌যাপন করি।
ইচ্ছা হলো হাত দুটী নিজ হাতে লয়ে
বলি—"সাধু! অভাগিনী তব পরিচয়ে,
পেয়েছে নূতন জন্ম; সেই ঋণ তার
থেকে গেল; দিতে পারে কিবা উপহার
তার মত? আপনি সে আপনার নয়;
তাহা হলে দেহ মন সঁপিত নিশ্চয়।
নারিনু বলিতে কিছু; কাঁদিতে কাঁদিতে
জন্মের মতন সখি, উঠিনু গাড়িতে।
বসে শুধু চোকে চোকে হল একবার;
যা দেখিনু প্রাণ সই দেখিব না আর।
নীরব সে প্রেম-ভাষা কত কি কহিল।
সে দৃষ্টি পরাণে যেন পুতিয়া রহিল।
তদবধি সহিতেছি অশেষ গঞ্জনা;
এ দেহে গিয়াছে মোর প্রহার যাতনা;
পিতার আক্রোশ ঘোর; পত্রটী লিখিতে
নাহি বিধি; লিখি না তা; কিন্তু লো মহীতে
আছি যত কাল আমি, হৃদয়-আসনে
পূজিব লো নিরন্তর; কায়-মন-প্রাণে,
সে আদর্শ প্রাণে রাখি, কঠোর সাধনে
সাধিব সে গুণ-রাশি, সেই পবিত্রতা,
সে ঈশ্বর-প্রীতি বোন, সেই সে সাধুতা;
তবে যদি মৃত্যু-অন্তে পাইলো সে ধনে,
এই এক মহা লক্ষ্য এখন জীবনে।"

বৈধব্য

একবার বসন্তেতে দুটী পাখী আসিল;
 দুটী পাখী পরম সুন্দর।
কিবা কান্তি! কিবা ডাক! সকলেই বলিল
 দুটী পাখী বড়ই সুন্দর।

পাখী দুটী ঘন বনে, নির্জনের নির্জনে
 সূর্য-রশ্মি যায় না যথায়,
যেখানে পাখিরা রবে থাকে সুখ-স্বপনে,
 ভুলে নর কভু নাহি যায়।

এ হেন বিজনে তারা বাসা বুঝি বাঁধিল;
 আসে যায় দেখি সারাদিন।
কুটী কুটী পাতা-লতা কত কি যে বহিল;
 ঘর বুঝি বাঁধিল নবীন।

সংসার পাতিল তারা; প্রফুল্লিত পরাণে
 যথা তথা গাইয়া বেড়ায়।
আঁখির আড়াল হ'লে, সুমধুর আহ্বানে
 ডেকে বন প্রেমেতে ভাসায়।

পাখীর প্রেমের ডাক একা শুনি বসিয়া;
 কি মধুর কিরূপে বাখানি।
প্রাণ-মন ভেসে যায় সেই সনে মিশিয়া;
 কোথা আছি যেন তা না জানি।

বিহগ সোহাগে ডাকে বিহগী তা শুনিয়া,
 তরুতলে ডাকয়ে নিবিড়ে;
ডাকের উপর ডাক প্রণয়িনী আসিয়া
 অবশেষে উড়ে বসে নীড়ে।

একদা ভাবিনু দেখি কি করিছে দুজনে
দ্বি-প্রহরে রৌদ্রের সময়ে,
গিয়ে দেখি পত্রাবৃত তরু-কুঞ্জ-ভবনে
পাশাপাশি বসেছে উভয়ে।

এমনি কি প্রেম! দূর একটুও সয় না,
ঠেকা-ঠেকি পাখায় পাখায়;
ধরা-ধামে হেন দৃশ্য আর বুঝি হয় না!
একে বসি অন্য-মুখে চায়।

মাঝে মাঝে প্রেয়সীর পক্ষ দেয় খুঁটিয়া
প্রণয়িনী যায় তাতে গ'লে;
মনের আনন্দ তাই প্রকাশিছে চুম্বিয়া;
প্রাণে প্রাণে যেন কথা বলে।

এরূপেতে যায় দিন গিয়ে গিয়ে দেখি রে,
দেখি দেখি যেন ডুবে যাই;
দেখি আর মনে ভাবি ধন্য তোরা পাখি রে
হেন প্রেম নর-রাজ্যে নাই।

একদিন দেখি তারা বহিতেছে যতনে
মুখে করি শিশুর আধার।
দোঁহে বহে এক ভার, দেখি শোভা নয়নে,
ভাবে মন ডুবিল আমার।

একদিন বসে আছি কি জানি কি খেয়ালে
আঁখি রাখি গাছের পাতায়;
ডুবিতে ডুবিতে মন ডুবে গেল কো'থানে
হারাইল গভীর চিন্তায়।

হরেক পাখীর ডাক প্রাণে গেল মিলায়ে,
কানে আর বাজে না তখন;
শুনেও না শুনি যেন, মন যেন ঘুমায়ে
কি দেখিছে সুখের স্বপন।

জাগিয়া ঘুমাই; ওকি! সে বিহগে তাড়িয়া
বাজ তরু কুঞ্জেতে আসিল;
না নিতে আশ্রয় নীড়ে, নখাঘাতে পাড়িয়া,
তীক্ষ্ণ চঞ্চু বক্ষেতে হানিল।

আস্তে-ব্যস্তে ঢিল মারি তাড়াইতে চাহিনু,
সে যে যম বিহগের কুলে।
তাড়াইনু বটে কিন্তু বাঁচাইতে নারিনু
মৃত পাখী পড়িল ভূতলে।

নাড়ি-চাড়ি তুলে রাখি আর সে তো নড়ে না ;
রক্তে দেহ যাইছে ভাসিয়া ;
শাখাতে বসাতে যাই, আর সে তো চড়ে না,
ফল-সম পড়িছে খসিয়া।

তারপরে কি দেখিনু বলিব তা কেমনে,
ডাকি ডাকি বিহগী আসিল,
শোকের ক্রন্দন হেন শুনি নাই শ্রবণে,
শুনে মুখ অশ্রুতে ভাসিল।

বৃশ্চিকে দংশেছে, তাই আর সে তো বসে না
কেঁদে বুলে এ ডালে ও ডালে ;
শাবক ক্ষুধায় কাঁদে, কুলায়েতে পশে না ;
পাখী-কুল কাঁদে কোলাহলে।

বিহগী রহিল একা সেই কুঞ্জ-ভবনে,
কিন্তু গেল তাহার সুস্বর ;
আর প্রাতে স্বর-সুধা ঢালে নাক শ্রবণে,
বসি থাকে বিরস অন্তর।

গিয়েও যায় না দিন, ছানাগুলি লইয়া,
বসি থাকে বিজন কুলায়ে ;
সুখের দিনের কথা ভাবে শুধু বসিয়া,
বাঁচে শুধু সে স্মৃতি জাগায়ে।

বিহগিনী পলাইলে পলাইতে পারিত,
কিন্তু তা' ত পারিল না আর।
ছাড়িতে সে শূন্য বন প্রাণ তার চাহিত
স্নেহে গতি রোধিত তাহার।

শিশুদের মুখ দেখে, ভবিষ্যত চাহিয়া,
কোনো রূপে প্রাণ ধরি রয় ;
দুজনের ভার একা ম্লান-মুখে বহিয়া
অতিকষ্টে যাপিছে সময়।

দিন যায়, রাত যায়, রোদ বৃষ্টি সকলে,
নীরব সে বনের প্রদেশ।
ভুলাতে পাড়ার পাখী কত করে কাকলী,
নাহি তাতে মনোযোগ লেশ।

একেলা চরিয়া আসে, একাকিনী বিজনে
বসি বসি সতত কি ভাবে ;
দারুণ বৈরাগ্য দেখি আজি তার জীবনে
কে ফিরাল তাহার স্বভাবে ?

একদা বিহগ এক আসি ডালে বসিল ;
প্রেম-ভাষা বসিয়া শুনায় ;
কানে তার সেই ভাষা বিষ-সম পশিল ;
ঘৃণা করে দূরে সরে যায় ।

বিহগ করিল তার বহু সাধ্য সাধনা,
সকাতরে যাচিল হৃদয় ;
যতই বিহগ সাধে, বাড়ে তার যাতনা
হয় প্রাণ তপ্তাঙ্গার-ময় ।

না কহে অধিক কথা, যায় শুধু সরিয়া,
গাম্ভীর্যেতে আপনারে ঢাকে ;
বিহগ যখন ডাকে, শুধু ঘৃণা করিয়া,
অন্যদিকে চেয়ে চেয়ে থাকে ।

বুঝিল নির্বোধ পাখী পরাণ সে দিবে না,
ভাঙ্গিবে না সে ব্রত দুষ্কর ।
দিলে প্রেম-উপহার কভু তাহা নিবে না ;
ঘৃণা করে দিবে না উত্তর ।

হইয়া নিরাশ শেষে পলাল সে উড়িয়া,
একাকিনী রহিল সে বনে ;
শিশুগুলি কোলে করি কুলায়েতে পড়িয়া,
বিষাদেতে যেন দিন গণে ।

আছে তো বনের শোভা, আছে ফুল ফুটিয়া
পাখিদের আছে কোলাহল ;
সজনে নির্জন তার, আপনাতে ডুবিয়া
শোক-সিন্ধু দেখিছে অতল ।

দিন যায়, মাস যায়, ছানাগুলি বাড়িল ;
শিখাইল উড়িতে সবারে ;
তারা উড়ে গেল ; সেও সেই বন ছাড়িল ;
কোথা গেল ? কে জানে সংসারে ?

বিদায় ! বিদায় !

পাখিকুল চরা করি দূর দেশ হতে
আসিতে আসিতে শ্রান্ত ; চারিটী তাহার,
প্রকাণ্ড বৃক্ষের শাখে, বিশ্রাম ল'ভতে,
ক্ষণকাল তরে আসি বসে যে প্রকার,
সেরূপ হে গিরিরাজ। হিমাদ্রি সুন্দর !
আমরা চারিটী ভাই, পান্থ চারিজন,
তোমার সুরম্য শৃঙ্গে, জুড়াতে অন্তর
এসেছিনু ; তুমি গিরি হওনি কৃপণ
সুধা-দানে ; বায়ু তব দেহ-তাপ-হারি ;
কিন্তু হে সে বায়ু হতে, শ্রেষ্ঠ সে বাতাস,
হৃদয়-কন্দরে যাহা এ শৃঙ্গে সঞ্চারি,
মিলাল আনন্দ শান্তি, ঘুচাল নিরাশ !
চারিটী অতিথি তব আজ নেমে যায় ;
গিরি হে ! থাকিবে মনে।—বিদায় ! বিদায় !

হিমাদ্রি-কুসুম সমাপ্ত

শিশুপাঠ্য কবিতা

সাধের নৌকা

সামাল সামাল, ওই ডেকে আসে বান,
দেশ ছেয়ে আসে ধেয়ে জল কানে কান।
নিমেষে নিমেষে বাড়ে কে কোথা পালায়,
তরাসে সকল জীব হাবুডুবু খায়।
ঘর দোর পড়ে গেল ভেসে যায় চাল,
হেনকালে দেখ চেয়ে সাধের নৌকায়,
চড়িয়া কয়টী শিশু সুখে ভেসে যায়।
এক ভায়া বসেছেন তক্তির উপরে ;
কয়জন দেখিছেন বসিয়া ভিতরে।
টানে পড়ে ছোট তরি, হুহু করে ধায়,
আরামেতে কয়জনে বসিয়া তাহায়।
এমন অপূর্ব তরি কে দেখেছে কবে ?
এ তরির ইতিহাস শুন কিছু তবে।
আছিল কৃষক এক মুরগী পুষিত,
পরিয়া কাঠের জুতা কাদাতে চষিত।
আসিলে বন্যার জল কে কোথা ছুটিল,
মুরগী শাবক ছাড়ি কোথা পলাইল।

ছানাগুলি জলে পড়ি না দেখি উপায়,
অবশেষে লম্ফ দিয়া উঠিল জুতায়।
এলো জল ভাসে জুতা নৌকার মতন,
আরোহী হইল তাতে এই কয় জন।
বড়রা ডুবিয়া মলো ; ছোটরা বাঁচিল,
ভাসিতে ভাসিতে তরি ডাঙ্গাতে লাগিল।

আবদারে ছেলে

সুন্দর খেলনা দেখে অন্য শিশু হাতে,
অবোধ শিশুর লোভ পড়িল তাহাতে।
দুই শিশু, হিত-কথা কেহই বোঝে না,
একজন যাহা চায় অন্যে তা ছাড়ে না।
হলো যে বিষম জ্বালা, কাঁদিল সন্তান,
কতই বুঝান মাতা, নাই দেয় কান।
মা তারে চাপেন বুকে, করেন চুম্বন,
লক্ষ্মী ছেলে, সোনামণি, বাপ যাদুধন,
কত কি বলেন মাতা, কোলেতে করিয়া,
এ ঘর ও ঘর করে বেড়ান ঘুরিয়া।
এটী ওটী সেটী দেন তার হাতে তুলে,
আবদারে ছেলে মার কিছুতে না ভুলে।
আধ ভাষে সেই বুলি, সেই অশ্রু ঝরে,
'কি দিয়ে ভুলাই', মাতা ভাবেন অন্তরে।
অবশেষে কাকাতুয়া আছিল যথায়
লইয়া প্রাণের ধনে চলেন তথায়।
এত যে ক্রন্দন তার, এক আবদার,
কি আশ্চর্য, পাখী দেখে কিছু নাহি আর!
মা বলেন,—"কাকাতুয়া", পাখী তাই বলে;
যে দিকে পেয়ারা যায় সেই দিকে চলে।
খোকামণি বড় খুসি, গালভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা-রাশি!
সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে এই শোভা স্বরগ সমান।

রামকান্তের ঘোড়া

পক্ষীরাজ ঘোড়া আর তালপত্র সিপাই,
শুনেছ ত সকলেই, কভু দেখ নাই।
ওই দেখ অশ্বপৃষ্ঠে রামকান্ত বীর,
নবাবের মত বসে আনন্দে অস্থির!

ঘন ঘন কশাঘাত হেট হেট মুখে
লম্বা লম্বা পা দুখানি দোলাইয়া সুখে ;
তোমরা অনেক ঘোড়া দেখিয়াছ সবে,
এমন মজার ঘোড়া কে দেখেছ কবে ?
যেমন ঘোড়ার রূপ তেমনি সোয়ার,
ঠমকে ঠমকে চলে আনন্দ অপার।
সহসা পশ্চাতে কেহ কাণ পাকড়িল,
"কেরে" বলে রামকান্ত ফিরিয়া দেখিল ;
দেখে সেই রুদ্রমূর্তি ইস্কুলের ঘরে,
যাহার হুঙ্কারে প্রাণ কাঁপে থর থরে ;
উড়িল অর্ধেক প্রাণ মুখে কথা নাই,
কাণ নিয়ে টানাটানি এ বড় বালাই !
ইস্ক্রুপের মত পেঁচ যত লাগে কাণে,
হা করে রামকান্ত সেই টানে টানে।
সোয়ার পড়িল ধরা ঘোড়া দুইখান,
দ্রুতপদে দুইজনে করিছে প্রস্থান।
উলটি পালটি উঠি দুই শিশু ধায়,
ছট্ ফট্ রামকান্ত কাণের জ্বালায়।
হে শিশু ! একপ ঘোড়া তুমি যদি চাও,
তবে কাণ মলে মলে কাণটা পাকাও।

পেটুক পুষী

খাবার পেয়ে খোকা বাবুর মুখটী যেন আলো।
ধামা হাতে, নির্জনেতে বসলেন গিয়া ভালো।
ভাবছেন মনে, ভাই-বোনে টের না পেলেই হয়,
একলা বসে, খাবেন বসে, খাবার সমুদয়।
নিষ্কণ্টকে, দিচ্ছেন মুখে যেই হাসি হাসি,
হেন কালে, দেখতে পেলে, পুষী সর্বনাশি।
শত্রুর জ্বালায়, খাওয়া যে দায়, এত শত্রুও আছে,
পেটুক পুষী বড়ই খুসী ঘনিয়ে আসে কাছে।
খোকা ভাবে নেমে যাবে একটু পেলেই পরে
নতুবা ডেকে আনবে কাকে না জানি এ ঘরে ;
ডাক শুনে ভাই-বোনে যদি ছুটে আসে,
কেড়ে খাবে সব ফুরাবে কাঁদব একা বসে !
ভাবি মনে, তার বদলে প্রথম খানি তুলে,
দিয়ে তারে তুষ্ট করে, নিয়ে যাক চলে।

একটী পেয়ে খুসী হয়ে যায় না হতভাগী,
লেজটী তুলে কাঁধে ঠেলে আর একখানির লাগি।
এমনি করি, হয় যে দেরী, ভাই-বোনেরা আসে;
একলা খাবার, চেষ্টা খোকার, দেখে সবাই হাসে।

বুলবুল

জগৎটা কি তোদের জন্য
ওরে বুলবুল?
তোদের তরেই সুনীল আকাশ?
তোদের তরেই ফুল?
তোদের জন্যই ফোটে গোলাপ
রূপে ঢল ঢল?
তোদের তরেই ক্ষেতের শস্য
তোদের জন্যই ফল?
তোদের জন্য কি নবীন অরুণ
হাসে আকাশে?
তোদের জন্যই সেই আলোকে
ধরা কি ভাসে?
কোন্ বনেতে থাকিস্ তোরা
কি মন্ত্র জানিস্?
কোথা হ'তে এতটা সুখ
বহিয়া আনিস্?
বলে বুলবুল, "ক'রো না ভুল,
সুখ হাতের কাছে;
সাদা প্রাণট যে রেখেছে,
সেই সুখে আছে।"

রূপী বিড়াল ও ভেলো কুকুর

ভেলো নামে কুকুর ছিল শুয়ে আঙ্গিনায়,
রূপী বিড়াল মুখটী চেটে সে দিক দিয়া যায়;
রূপী বলে—কি ভাই ভেলো শুয়ে আছ যে,
মুখটী শুকনো, কিছুই বুঝি জোটেনি আজকে?
ভেলো বলে—আমার ভাগ্যে কি আর ঘুট্‌বে ভাই,
শিক্ষা-দোষে চুরিচামারীর অভ্যাসটা ত নাই।
রূপী বলে—চুরিচামারী? আমিই বুঝি চোর,
ঠারে ঠোরে বলিস্ কথা, বড়ই স্পর্দ্ধা তোর।
রাগে আমার জ্বলিতেছে গা, সামলে বলিস্ বাত,
তা না হলে এক থাপড়ে উড়িয়ে দেব দাঁত।

ভেলো বলে—রূপিমণি ! চট্‌ছ কেন এত,
রাগের কথা তোমায় আমি কিছুই বলিনে ত ;
বল্‌ছি আমি. আমর সুযোগ তেমন নাই,
যে ক্ষীর চপাচপ্ মাছ গপাগপ্ পুরবো গালে ভাই।
রূপী বলে—দেখ্ ভেলো ভাই ! বলবো আমি কি,
কপাল পোড়া তোর মত আর জন্মে দেখিনি !
ঘরে উঠতে নাইক হুকুম, উঠানেতেই বাস ;
পাড়ার ছেলের ঢিলের ভয়ে সদাই প্রাণে ত্রাস !
দয়া কোরে এক মুঠো ভাত কেউ বা যদি দেয়,
ঢিলের ভয়ে খেতে নারিস. এমনি প্রাণের দায়।
আস্তাকুঁড়ে পাতা কুড়ান, যে যা দেয় ফেলে,
চোরের মত লুকায়ে তায় আসিস্ পেট টেলে।
দুধের সঙ্গে দেখা নাই তোর, মাছের সঙ্গে আড়ি ;
এক বাড়ীতে পেট ভরে না, বেড়াস দশ বাড়ী।
ভেলো বলে—দুঃখ কিসের ? দিন ত চলে যায়,
ওসব দুঃখ সয়ে গেছে লাগে নাক গায়।
রূপী বলে—এই জগতে চতুর হতে হয়,
বুদ্ধির চোটে সবই জোটে কষ্ট নাহি রয়।
হাক্‌না চুরি. বাহাদুরী দেখান ত চাই,
না যদি ভাই পড়িস ধরা চুরিতে দোষ নাই।
আয় দেখি তুই আমার সনে কারস্ নাক ডর,
ঢুকে ঘরে পেটটা পুরে খাবি দুধের সর।
আমি থাক্‌বো দোরের কাছে যদি বা কেউ আসে,
দিব সাড়া, কানটি খাড়া দৌড় দিবি কসে।
ভেলো বলে—না ভাই রূপী ! সেটা হবে না,
শুকিয়ে মরি সেটাও ভাল ওটা পারব না।
রূপী বলে—পুরুষের মন্ এমন দেখিনি !
এত ভয় যার কপালে তার সুখ ত লেখেনি।
ভেলো বলে— পাপের কাজে ভয় থাকাই ভাল,
দিন চলে যায় কোনো মতে তাই হলেই হল।
রূপী বলে—তোমার বুদ্ধি আমার যদি হয়,
নাহারে ঘুরে ঘুরে মরিব নিশ্চয়।
পরের খেয়ে এই শরীরটা, কাকেই বা ডরাই
আমার চুরি ধরতে পারে এমন মানুষ নাই।
এত বলি গেল রূপী পাশের ভবনে,
লম্ফ দিয়ে উঠলো ঘরে ঢোকে নির্জনে।
দুধের কড়ায় মুখটী রূপী যেমন দিতে যায়।
কোথা হতে হঠাৎ ফাঁসি লাগিল গলায় ;

গলায় ফাঁসি সে রূপসী ডাকে কাতর স্বরে,
সাড়া পেয়ে আসে ধেয়ে গৃহস্থ সে ঘরে।
"বারে বারে মোরোগ তুমি খেয়ে যাও খান,
এইবারে মোরোগ তোমার বধিব পরাণ।"
এই বলে তার দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়;
উলটি পালটি রূপী পিছে পিছে ধায়।
শপ শপাশপ পড়ে ছড়ি সোনামণির গায়।
চক্ষে আঁধার দেখে রূপী ছড়ির যাতনায়।
পথে শুয়ে ছিল ভেলো দেখে রূপীর দুখ,
ভয়েতে তার উড়িল প্রাণ শুকাইল মুখ।
ভেলো বলে—রূপিমণি। বুঝিলে এবার,
খাইতে না পাই ধর্মে থাক ইহাই জেনো সার।
আর কারে বা দিচ্ছে ভেলো নীতি উপদেশ?
সেই দড়ির আর ছড়ির টানে রূপীর হলো শেষ।

মোদের পুষী

মোদের পুষী বড়ই চালাক ছোট পাখীর যম,
চোখ দুটীতে আগুন জ্বলে দেখিতে বিষম।
ইঁদুর ছুঁচো, সাপ কেঁচো, কার নাই নিস্তার,
সকাল বিকাল করে পুষী কত কি শিকার।
পুষীর জ্বালায় ছোট পাখী বসে না উঠানে;
পুষীর জ্বালায় কীট পতঙ্গ আসে না বাগানে;
পুষীর জ্বালায় ইঁদুরকুলে সদাই লাগে ত্রাস;
পুষীর জ্বালায় চড়ুই-দলে সদাই সর্বনাশ।
গাছের আগায় আপন বাসায় পাখীর ছানা থাকে,
সে গাছ বেয়ে সেথায় গিয়ে ধরে আনে তাকে।
প্রকাণ্ড সাপ চলে গেলে তারেও থাবা মারে,
লোকে বলে, সাবাস বিড়াল ডরে না কাহারে!
একদিন দেখি, কি এক পোকা ধীরে ধীরে যায়,
পিছন হতে এসে পুষী থাবা মারে তায়;
থাবা খেয়ে কামড়ে জোড়ে ধরে দাঁড়া দিয়ে,
একি হলো ব'লে পুষী উঠে শিহরিয়ে।
যতই আড়ে নাহি পড়ে এত বিষম দায়,
পুষীর গেল বুদ্ধিশুদ্ধি করে কি উপায়।
আ-মলো রে কি হলো রে একি সর্বনাশ,
দাঁড়ার জোরে চামড়া ছিঁড়ে বিঁধে হাড় মাস।

চালাক পুষী এবার বোকা, পোকার কামড়ে,
"কে আছ গো বাঁচাও আমায়," ব'লে ডাক ছাড়ে।
সঙ্গে ছিল পুষীর ছানা, এল শিকারে,
মায়ের দশা দেখে তাহার কথা না সরে!

চোরের উপর বাটপাড়ি

পরের জিনিষ না বলে লয়, তাকেই চুরি বলে;
সেই চুরির ধন কেউ যদি লয়, বাটপাড়ি তা হলে।
চোরের পিছে চোর ত আছে, বাঘের পিছে ফেউ,
এ সংসারে পাপটী করে রক্ষা পায় না কেউ।
চোরের জিনিষ চুরি করে, সে বড় তামাসা।
তবে শোন 'কেলো' 'ভেলো'র কি হল দুর্দশা।
গৃহস্থেরা মাংস কিনে টবটী চাপা দিয়ে,
ঘরের কাজে সবাই গেল নিরাপদ ভাবিয়ে।
কেলো-ভেলো দুটী কুকুর খেল্‌ছিল উঠানে;
টবের নীচে মাংস রইল, দেখল তা দুজনে।
মাংস দেখে ধূলা-খেলা আর কি ভাল লাগে?
দুই ইয়ারে যুক্তি ক'রে ছুটলো অনুরাগে।
টবের গায়ে আঁচড়-পাঁচড়, ঠেলাঠেলি কত,
করতে চুরি সয়না দেরি, পেটের দায়টা এত।
আঁচড় কামড় দুই ইয়ারে, দুটীই বলবান,
অনেক কষ্টে বাহির করে মাংস একখান।
একখানাতে মন উঠে না, সেখান ফেলে দূরে,
আবার করে আঁচড়-পাঁচড় আর একখানার তরে।
মাঝে থেকে কি এক পাখী কোথা হতে এসে,
ছোঁ মেরে সেই মাংস নিয়ে টবের উপর বসে।
কেলো-ভেলো হতভোম্বা ফ্যালফ্যালিয়ে চায়;
উঠতে নারে টবের মাথায়, ডেকেই রাগ মিটায়।
বসে বসে মাংসটা খায় পাখী আপন মনে,
কেলো-ভেলোর ভ্যাকভ্যাকানি কিছুই নাহি গণে।
পাখী বলে,—"মিছামিছি কেন চ্যাঁচাও ভাই।
চুরির ধনটা তোমরা খেতে, না হয় আমিই খাই।"

বর্ষশেষ

দুঃখ

এই ত বৎসর যায়, আসিলাম পায় পায়,
জীবনের পথে আগাইয়া ;
স্রোতের জলের মত, কাল বহে অবিরত,
কার সাধ্য রাখে আগুলিয়া।
সুখ দুঃখ, খেলা হাসি, সকলি ত গেল ভাসি,
স্মৃতি মাত্র মনেতে রহিল,
মনে করিলাম যত, কাজে নাহি হলো তত
এই দুঃখে পরাণ দহিল।

সুখ

কিন্তু এ দুঃখের মনে, এক সুখ আছে মনে
গত বর্ষে বাড়িয়াছে জ্ঞান ;
কত কথা শুনিয়াছি, কত কথা শিখিয়াছি
সাধিয়াছি পরের কল্যাণ।
বরষ ফুরায়ে এল সুখ দুঃখ ভেসে গেল,
ভেসে গেল কতই ঘটনা।
দেখিনু শিখিনু যাহা হৃদয়ে রহিল তাহা
কালস্রোতে তাহাত গেল না।

আশা

সাহসে উঠিয়া ভাই, আবার সম্মুখে ধাই,
আশা করে বাঁধি গো কোমর,
উঠে পড়ে কেঁদে হেসে, যদিও চলেছি ভেসে,
বৃথা মোর যায়নি বৎসর।
না খাটিলে না ভাবিলে, কারু কি পৌরুষ মিলে
ঘুমায়ে মানুষ কেবা হয় ?
শ্রম নাহি বৃথা যায়, যতনে রতন পায়
নববর্ষে পাব তা নিশ্চয়।

দাদামশায়ের সাধের নাতি

দাদা মশার সাধের নাতি ফড়িং বাবু নাম।
চুয়াল্লিশ নম্বর রসা রোড ভবানীপুরে ধাম।
তালপত্রের সিপাই ভায়া লিকলিকে শরীর।
চলেন যদি উড়েন যেন পা দুটী অস্থির।
কি যে করেন, কোথায় যান হয় না তা নির্ণয়।
বুদ্ধিশুদ্ধি গজাবে যে, হয় না সে সময় ;

লেখা-পড়ায় মন বসে না বইকে লাগে ভয়।
পড়াশুনা শিকেয় তোলা কেবল খেলায় জয়,
বাড়ীর লোকে পাগলপারা এক ফড়িং-এর চোটে,
কি হবে যে তাদের গতি আর একটা যদি জোটে?
দিবে আজি ফড়িং ভায়া সাত বছরে পা—
দাদা বলে আপদ বালাই সব দূরে যা—
মা-বাপের আশা বিফল হবে না কখন
দাদা মশার সাধের নাতি হবেন একজন।
শুন মীরাবাঈ, ওগো শুন মীরাবাঈ।
কি চিঠি লিখেছ তুমি বলিহারি যাই।
কাশি সেরে খুশী আছ শুনে সুখী বড়,
সুখে থাক খেলা কর মন দিয়া পড়।
মীরা হবে ভাল মেয়ে তাতে ভুল নাই,
ঈশ্বর চরণে আমি এই শুধু চাই—

ইতি তোমার দাদামশাই

(অপ্রকাশিত)

শিশুপাঠ্য কবিতা সমাপ্ত

শিবনাথ-রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত

১

একতালা

আজ পরাণে পরাণে মিলে,
হৃদয়-মন-প্রাণ খুলে গাও সবে ভাই।
আজ দাও রে সেই প্রেমময়ের নামেরি দোহাই।
(মনের সাধে সবে মিলে)
বল, ডাকিলে হে দীন সখা যেন দেখা পাই।
(সবাই মিলে বল বল রে)
বল, দীনবন্ধু ভবসিন্ধু যেন তরে যাই
(চরণতরী দিও দিও হে)।
বল, তোমা বিনা পাপীতাপীর আর গতি নাই।
(সবাই মিলে বল বল রে)
এস প্রাণ খুলে সবাই মিলে জয়ধ্বনি গাই।
(জয় জয় প্রেমের জয় রে) (এমন দিন আর হবে না রে)
মিল। আজি তব শ্রীচরণে, কাঁদি হে নাথ পাপিগণে,
অপার করুণা-গুণে (ওহে দীনবন্ধু)
দাও প্রভু দরশন। (পাপিজনে)॥

২

দশকুশি

আজি শোন রে, তাঁর বাণী, (মধুর আবাহন রে)
এমনি মধুর আহ্বান, মৃতদেহে জাগে রে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে। (মধুর ডাক শুনে রে)
(পরাণ আকুল করে রে)
সে বাণীর বর্ণে বর্ণে, সুধারস পশে কর্ণে, (কিবা মধুর মধুর)
কাটে মোহ নিদ্রার স্বপন রে।
(ভাবের ঘুম আর থাকে না) (মৃত প্রাণ জেগে উঠে)
সে বাণী-পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে। (বিভু-প্রেমানলে রে)
(অনলে পতঙ্গ যেমন)
বিষয়-বাসনা ফেলি, সুখ-স্বার্থ পায়ে ঠেলি,
ধায় তারা মত্তের মতন রে। (প্রেমে পাগল হ'য়ে রে)
(সুধামাখা ডাক শুনে)
শুনি সে মধুরবাণী, ভব-সুখে তুচ্ছ মানি,
এস তবে এস ভক্তজন রে। (জীবন দিতে হবে যে রে)
(প্রেমময়ের প্রেমানলে)
বিশ্বাস-অনল জ্বালি, বৈরাগ্য আহুতি ঢালি,
সেবা-যজ্ঞের কর আয়োজন রে।
(জনম সফল কর রে) (আপনা আহুতি দিয়ে) ॥

৩

ঝুলন

আনন্দে উড়ায়ে চল প্রেমের নিশান রে;
পরাণ খুলিয়া গাও প্রেমময়ের নাম রে।
স্বর্গ হ'তে এল ধরায় মধুর আহ্বান রে;
"আয় পাপী, আয় পাপী, পাবি পরিত্রাণ রে।"
শুন শুন শুন বাণী, পাত আজি কান রে;
ডাকিছেন মুক্তিদাতা প্রভু ভগবান রে।
বিষয় গরল পিয়ে কি কঠিন প্রাণ রে;
বাণী শুনে, তবু ভোল আপন কল্যাণ রে।
চারিদিকে নরনারী করিছে উত্থান রে;
নবযুগে নবানন্দে জাগাও মন-প্রাণ রে।
দূরে যাক্ পাপ ভয় মান অভিমান রে;
প্রেমময়ের প্রেম ক্রোড়ে কর আত্মদান রে।
মিল। তাই আজি সকাতরে, ডাকি ভাই প্রেমভরে, নগরবাসী রে,
শুন শুন ভাই, বধির হয়ে থেক না ॥

৪

একতালা

আনন্দে গাইয়ে চল, আর কিবা ভয় রে,
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য এসেছে ধরায় রে,
কে যেন হৃদয়ের মাঝে বলে পাপী আয় রে।
(বলে আয় পাপী আয় রে) (বলে ত্বরা ক'রে আয় রে)
আজি সে সুরব শুনে ব্যাকুল পরাণ রে,
এতদিনে পাপিজনে পায় পরিত্রাণ রে।
(বুঝি) যায় স্বর্গধাম রে, (বুঝি) হয় পূর্ণকাম রে।
আজি সে মধুর ধ্বনি জাগে বিশ্বময় রে।
সবে মিলে হৃদয় খুলে বল ব্রহ্মজয় রে!
(বল জয় দয়াময় রে!)
মিল। ফেলিয়ে অসার সুখ আয় তোরা চ'লে, গেল বেলা মিছে
খেলা ছাড় সকলে, জীবন সফল হবে, প্রাণ-মন বিকাইলে।
(ওরে নগরবাসি!)।

৫

সোভা

আমরা চল যাই— চল যাই, সবে মিলে
প্রেমধামে, (আমরা চল যাই, চল যাই)
জগত মাতিল দেখ, মধুর ব্রহ্মনামে।
স্বর্গের বিভব এই মধুর ব্রহ্মনাম, জুড়াইতে জীবের জ্বালা এল ধরাধাম
(এ প্রাণ জুড়াইতে আর কি ধন আছে—ব্রহ্ম নামামৃত বিনে)
কেন আর ভুলিয়ে থাক, মোহের মায়ায়, ব্রহ্মনাম সুধারসে ডুবিব সবাই
(আমরা জন্মের মত, সবে ডুবে রব, ব্রহ্মনামামৃত-রসে)।

৬

একতালা

আমরা দয়ালনামে ত'রে যাব, আজ আমরা বেঁচে যাব।
পোড়ায়ে পাপ-বাসনা নবজীবন পাব,
সে চরণে হৃদয়-মন সবাই ঢে'লে দিব।
মজিয়া সে প্রেম-রসে নিজে পাসরিব,
প্রেমময়ের প্রেমজলে হাবুডুবু খাব।
প্রেমময়ের প্রেমের লীলা নয়নে হেরিব,
আর জয় জয় দয়াময় সবাই মিলে গাব।
নিবাব সংসার-তাপ হৃদয় জুড়াইব,
আর বাহু তুলে কুতূহলে আনন্দে নাচিব।
মিল। সে প্রেম ফেলিয়ে তোরা যাস্ কোথা রে ভাই
শান্তির লাগিয়ে, শান্তিদাতার প্রসাদ ভিন্ন ভাই,
সব মরীচিকাময়।

৭
আলেয়া—যৎ
(কীর্ত্তন ভাঙ্গা)

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে।
আর কোন্ মা আছে, এমন ক'রে পালিতে জানে ?
কি স্বদেশে, কি বিদেশে, মা আমার সর্ব্বদা পাশে,
প্রাণে ব'সে কহেন কথা মধুর বচনে।
আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি,
মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে।
এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমায় রেখেছেন কোলে,
কত শান্তি কত আশা দিতেছেন প্রাণে।
হায় আমি কি করিলাম, এমন মায়ে না চিনিলাম,
না সঁপিলাম প্রাণ-মন এমন চরণে ॥

৮
যৎ

আয় তোরা ভাই, নগরবাসি জন, ব্রহ্মকল্প তরুমূলে সকলে।
(তোদের) ভবের তাপ দূরে যাবে, হৃদয় মন শীতল হবে,
(তোরা আয় রে ব্রহ্মকল্পতরুর ছায়ায়)
(ও ভাই) অপার আনন্দ পাবে তরুমূলে বসিলে,
(ব্রহ্মকল্পতরুর মূলে
(ও ভাই) কোথা শান্তি-বারি ? (সংসার মরুর মাঝে)
(বৃথা সুখের লোভে দুঃখ পে'ও নারে)
সত্য সারাৎসারে ত্যজি, অনিত্য সংসারে মজি,
(বৃথা) সুখের কারণে, ভবের কাননে, বল কত আর বেড়াবে ঘু'র।
(মিছে আশায় ভুলে)
সুখ-সরোবর জ্ঞানে, ছুটিছ যাহার পানে, ও নহে শীতল,
জীবনের জল, ও যে মৃগতৃষ্ণা আছে প্রসারি।
(কেন বুঝলে না রে মায়ার ধোঁকায় প'ড়ে)
আশা-মরীচিকা পিছে, কি হবে ছুটিয়া মিছে,
সে সত্য চরণে সঁপ না জীবনে,
(চিরদিনের মত রে) (জীবন সফল কর রে)
সঁপিলে যাতনা যাবে পাসরি। (দুঃখ রবে না রে) ॥

৯
দশকুশী

(আর) থেক না নিরাশ মনে, প'ড়ে ভব বন্ধনে,
জয় রবে কর রে উত্থান ;
(প'ড়ে থেকনা, থেকনা, মহামোহে মুগ্ধ হ'য়ে)
দেখি সে প্রেম-মাধুরী, আপনারে যাও পাসরি,
প্রেমানন্দে কর নাম গান।

(নব জীবন পাবে রে, জীবনদাতার কৃপাগুণে)
আশাতে হৃদয় ধরি, চল চল ত্বরা করি,
দেখ দিবা হয় অবসান ;
(দিন চলে যায় রে, বৃথা কাজে দিন যায়)
পরাণে শকতি পাবে, পাপতাপ দূরে যাবে,
জেন জেন পাবে পরিত্রাণ।
(নিরাশ হ'ও না, হ'ও না, প্রেমময়ের প্রেম রাজ্যে)॥

১০

খং

উঠ নরনারী, বলি পায়ে ধরি, পরিহরি বিবাদ, নিরাশা, দুঃখ
এস ত্বরা করি। (তোরা আয় আয় রে)
তরী সাজাইয়ে, দেখ কৃপা দিয়ে, প্রভু আপনি হলেন কাণ্ডারী।
পূর্ব পাপের কথা স্মরি, ফেল না আর অশ্রুবারি,
পেয়ে সেই চরণ-তরী (এস) ভবের জ্বালা যাই পাসরি ॥

১১

লোভা

এতই কি সংসার-মায়া তোর ? (জেগে কি ঘুমালি রে)
অনিত্য সুখেরি তরে, ডুবিছ পাপ-সাগরে রে,
জ্ঞানহারা মোহ-মদে ভোর। (ওরে নগরবাসি রে)
স্বহস্তে অনল জ্বালি, দেহ মন তাহে ঢালি রে,
কি যাতনা পাইতেছ ঘোর। (দেখে হৃদয় ফাটে রে)
প্রেমমণি দূরে ফেলি, কাচখণ্ড হাতে নিলি রে,
একি ভ্রান্ত মতি দেখি তোর। (কি ভ্রমে ভুলিলি রে) ॥

১২

চল চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শুন শ্রবণে ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।
ভুলিয়ে সে ধনে এখানে এমনে,
নগরবাসি, তোরা কত দিন আর র'বি রে ভাই ?
হলো রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ কেমনে পাবি রে ;
তাই বিনয় ক'রে, বলি চরণ ধ'রে,
এসো রে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।
এ সংসারের মাঝে, সে ধন বিহনে, জেনো জেনো গতি নাই।
আর বিফলে কাটাইও না জীবনে ॥

১৩

শঙ্কর—ফেরতা

জয় জয় বিভু হে, করুণা তব হে, অগণন মহিমা তোমার ;
একমুখে কি বলিব আর ?

জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর! আজি কৃপা কি দেখি অপার
জয় জয় করুণা-আধার!
বিষয়ের বন্ধনে, সুখের শয়নে, ছিল শুয়ে যে জন ধরায় ;
জাগাইলে কিরূপে তাহায়!
জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর! প্রাণ-মন সঁপে সে তোমায়।
জয় জয় প্রভু কৃপাময়!
ধন মান যৌবন নানা প্রলোভন, পথে ছিল অচল সমান,
তবু তাতে বাঁধিল না প্রাণ।
জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর! এ সকলি তোমারি বিধান!
জয় জয় করুণা-নিধান!
দেহ-মন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে, আজি সে যে নিজে করে দান,
সঁপিতেছে দেহ-মন-প্রাণ!
জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর, লও লও করুণা-নিধান!
জয় জয় করুণা-নিধান॥

১৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে ;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দশা-আঁধার তার কর মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়ন-বারি,
অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন॥

১৫

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি

তুমি ব্রহ্মসনাতন বিশ্বপতি, তুমি আদি অনাদি অশেষ গতি।
তুমি সত্য সদাত্মক চিন্ময় হে, তুমি বিশ্বচরাচর আশ্রয় হে।
তুমি পূর্ণপরাৎপর কারণ হে, তুমি দীন জনাশ্রয় তারণ হে।
তুমি মঙ্গল চিত্তবিনোদন হে, মনোমোহন শোভন লোভন হে॥
তুমি পাবন বিঘ্ন-বিনাশন হে, তুমি পাতক-রাশি হুতাশন হে।
করুণা-কর হে গুণ-সাগর হে, কত যে করুণা অধমে কর হে।
প্রভু পাপ শতে মৃত যে জন হে, পরশে লভয়ে নব জীবন হে।
ভব-সিন্ধু-জলে অকূলে তরি হে, প্রভু দেহ সবে করুণা তরি হে॥

১৬

নমো নমস্তে ভগবন্, দীনানাং শরণ প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো, নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা মাতা পরিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তিঃ পরা সম্পৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে, মোহ নীহার-সংবৃতে,
ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎ-কৃপা-তরণিং দেহি দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যুমায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মেহমৃতং।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে, ভক্ত বৎসল,
নির্বাণং যাতু পাপাগ্নি স্তুৎ প্রসাদাৎ পরেশ্বর॥

১৭

গুজরাটী ভজন—একতালা

পাপী তাপী নরে, আজিকে দুয়ারে, ডাকিছে কাতরে, শুন হে দয়াময়;
পাপের দহনে, দহেছে পরাণে, এসেছে চরণে, মাগিছে আশ্রয়।
ভুলি তোমা ধনে, সুখের কারণে, ভবের কাননে, কাঁদিয়া চলেছি;
মোহের আঁধারে পাপের বিকারে, সে বন-মাঝারে পথ যে ভুলেছি।
সুধার সরসে ছাড়িয়া হরষে, প্রাণের পিয়াসে গরল পিয়েছি।
সেই বিষপানে, দেখিনি নয়নে, হে প্রভো জীবনে মরণ নিয়েছি।
ভজিয়ে অসারে, মজিয়ে সংসারে, ডুবেছি পাথারে উঠিতে না পারি;
হয়েছি হীনবল, বিরছে শত্রুদল, ভরসা কেবল করুণা তোমারি।
নাহিক শকতি, জগত-পতি, কি হবে গতি, এ ঘোর আঁধারে;
ও কৃপা বিনে, গতি যে দেখিনে, আকুল-পরাণে ডাকি হে তোমারে।
এস হে দয়াল, ঘুচায়ে জঞ্জাল, কাটিয়ে মোহজাল হও হে উদয়;
হেরিয়ে সে জ্যোতি, জাগুক শকতি, পাই হে সদ্গতি, পূজিয়ে তোমায়।

১৮

দেশমল্লার – ঝাঁপতাল

(স্বামী স্ত্রীর প্রার্থনা)

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেকো জীবনে।
তব দয়া কি বলিব, কিরূপ উপমা দিব,
দেখালে যে কত কৃপা বাঁধি দুজনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়াবে, সুখ-ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসরি সুখী হবে সেবনে।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাযে সদা রব।
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে।

১৯

বিষাদ-ভারে মলিন-অন্তরে, তোমার দ্বারে করিছে ক্রন্দন ;
সদয় হ'য়ে, দেখ চাহিয়ে, হৃদয়-বেদন কর হে শ্রবণ।
স্নেহের বন্ধন, ছিঁড়িয়া শমন, করিল হরণ জননী-ধনে ;
শূন্য সংসারে, শোকের আগারে, বিষাদে ডুবে থাকি কেমনে ?
জননীর কোলে, রোগ শোক ভুলে, সন্তান সকলে ছিলাম কুশলে ;
কে জানে এমন, ছিঁড়িয়া বন্ধন, করিবে হরণ, সে মায় অকালে।
মা হারা হ'য়ে, এখন কাঁদিয়ে, ডাকি হে তোমায় দেও দরশন ;
বিষাদের ভার, ঘুচাও হে সবার, আশ্বাস-দানে কর হে সান্ত্বন।
সে পরকালে, চরণ তলে, প্রিয় মাতারে রেখো দয়াময় ;
অজ্ঞান হরি, শান্তি বিতরি, পরম পদে দিও হে আশ্রয় ॥

২০

হিয়ার মাঝারে, সেই প্রাণেশ্বরে ;
পূজ রে যতনে ভক্তিভরে।
হৃদয়-সখা তিনি, তাঁরে রেখো না রেখো না দূরে।
পরম রতন ফে'লে, ও ভাই থেক না রে এ সংসারে।
নয়ন-মণি ছেড়ে, আর বেড়া'য়ো না অন্ধকারে।
মিল। খুলে মুক্তির দ্বার, কাঙ্গালে আজ, প্রভু করেন নিমন্ত্রণ।
(পুরবাসী রে ব্যাকুল হ'য়ে, ধেয়ে আয় রে) ॥

ব্রহ্মসঙ্গীত সমাপ্ত

উপন্যাস

মেজবউ

বৈশাখের অর্ধেক অতীত-প্রায়, প্রবোধচন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে আসিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র কে? নিশ্চিন্তপুরের মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। নিশ্চিন্তপুর কোথায়? কলিকাতার অন্যূন বিশক্রোশ উত্তরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত একখানি গ্রাম। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কে? ইনি একজন অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতী-ব্যবসায়ী। আজকালকার দিন, পাছে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অগৌরব করা হয়, এই ভয়ে আরও একটু বলিতে হইতেছে। একবার পল্লীগ্রাম হইতে নবাগত একটি সরলমতি ব্রাহ্মণের সহিত কলিকাতার একটি নব্য ইয়ার-সম্প্রদায়-ভুক্ত যুবকের রাজপথে কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণটি চিত্তের সরলতা ও সভ্যতার রীতি-বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ যুবকটিকে অনেক অনাবশ্যক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; "বাপু, তোমার নাম কি? পিতার নাম কি? কোন্ গাঁই? কাহার সন্তান? বিবাহ হইয়াছে কি না? কি কর?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এত অন্তরঙ্গ প্রশ্ন যুবকটি পছন্দ করে না; মনে মনে কিছু চটিয়াছিল। তাহার সময় যখন আসিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়ের কি করা হয়?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্যবসায়।" "টাকায় কয়টী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিক্রয় করেন?" সরলমতি ব্রাহ্মণ কৌতুক বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি কোথাকার অর্বাচীন? ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্যবসায় বলিলে, কি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিক্রয় করা বুঝায়?" যুবক উত্তর করিল, "আজ্ঞে ব্যবসায় বলিলেই তো ক্রয় বিক্রয় বুঝাইয়া থাকে।" অবশ্য ঠিক, পাঠকপাঠিকাকে একথা বলিয়া দিতে হইবে না যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবসায় এ প্রকার ব্যবসায় ছিল না; কিংবা বর্তমান সময়ে অনেক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতী-ব্যবসায়ের অর্থ যেমন ভিক্ষাবৃত্তি, ধনীর উপাসনা প্রভৃতি বুঝায়, তাহাও ছিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বস্তুত সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল। কিছুদিন নবদ্বীপে বাস করিয়া, পাঠ সমাধা করিয়া ন্যায়চঞ্চু উপাধি পাইয়াছিলেন এবং প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর টোল-চতুষ্পাঠী করিয়া ছাত্র রাখিয়া পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময় সে টোল-চতুষ্পাঠী ছিল না। তথাপি অধ্যাপক-বিদায়রূপে তাঁহার যথেষ্ট আয় ছিল। তদ্ভিন্ন বিষয়ী লোকদিগের গৃহে মধ্যে মধ্যে পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র, দ্বিতীয় প্রবোধচন্দ্র, তৃতীয় পরেশচন্দ্র, চতুর্থ প্রকাশচন্দ্র, কন্যা দুইটির নাম শ্যামা ও বামা। হরিশ্চন্দ্র প্রাচীন প্রথানুসারে কিয়ৎকাল পিতার টোলে ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কুসঙ্গে পড়িয়া পাঠ-অভ্যাস অপেক্ষা আমোদ-প্রমোদে অধিক রত হন। এক্ষণে তিনি গ্রামের জমিদার মহাশয়দের কাছারীর খাতা-পত্রের কাজ করিয়া থাকেন এবং বেতন ও উপরি প্রভৃতিতে দুই দশ টাকা উপার্জন করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধিমান্ লোক, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যে দিনকাল আসিতেছে, তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতী-ব্যবসায়ে আর দিন চলিবে না; ছেলেদিগকে ইংরাজী না শিখাইলে উপায় নাই। এইজন্য তিনি মধ্যম পুত্র প্রবোধচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতেই গ্রামের ইংরাজী স্কুলে দিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় গিয়া পাঠ করিতেছেন। এ বৎসর তাঁহার বি-এ পরীক্ষার বৎসর। তৃতীয় পুত্র পরেশচন্দ্র তিনবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া পড়া সাঙ্গ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কর্তার প্ররোচনায় ও প্রবোধের তিরস্কারে কর্ম দেখিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় যান; কিন্তু দুই-চারিদিন থাকিয়া ঘরে পলাইয়া আসেন। পরেশ যে কেন কলিকাতায় তিষ্ঠিতে পারে না, কিরূপে বলিব? সে বলিত, কলিকাতার রান্না তার ভাল লাগে না; কিন্তু বোধ হয় সেটা প্রকৃত কথা নহে। গ্রামে

তাহার সমবয়স্ক কতকগুলি অলস ও আমোদপ্রিয় বালক আছে; তাস, পাশা, গান, বাজনাতে তাহারা দিন কাটায়, পরেশ তাহাদের সংগী। তাহারা পত্র লিখিলেই সে পলাইয়া আসে। সে যাহাই হউক, পরেশের কিছু করিবার গা নাই। কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র কলিকাতার কোন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। মধ্যম সহোদরের আশীর্বাদে কনিষ্ঠের পাঠ উত্তমরূপেই চলিতেছে, তাহার বিষয় আর অধিক বলিতে হইবে না। পাঠক মহাশয় মনোযোগসহকারে এই পুস্তক পাঠ করিলে বধূগুলির পরিচয় ক্রমেই প্রাপ্ত হইবেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী এবং শ্যামা ও বামার পরিচয় ভবিষ্যতে পাইবেন। শ্যামা জ্যেষ্ঠা কন্যা, বয়ঃক্রম ১৭ কি ১৮ বৎসর, কুলীনের ঘরে পড়িয়াছিল; সুতরাং তাহার আর শ্বশুরঘর করিতে যাইতে হয় নাই, সে পিত্রালয়েই বাস করে। চাটুয্যে মহাশয়ের পরিবারমধ্যে আর কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা এক্ষণে গণনার মধ্যে আসিলেন না; অথবা সংক্ষেপে উল্লেখ করাই ভাল। হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা—ক্ষেমি ও পুঁটি, ও এক পুত্র—শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র। পরেশের একটি কন্যা, নাম নাই; পিতামহী আদর করিয়া অনেক নাম দিয়া থাকেন,—টেঁপি, গণেশ, ভুঁদাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিবারের অপর ব্যক্তির মধ্যে দুই গাভী, এক নারায়ণশিলা, এক শ্বেতপাথরের শিব ও বামার প্রতিপালিত ফুলী বিড়াল। কেহ যদি বলেন, এ কিরূপ হইল ? এগুলি কি আবার পরিবারের মধ্যে গণনীয় ? তদুত্তরে বক্তব্য, অন্যগুলিকে ছাড়িয়া দিলেও বিড়ালটি যে এই পরিবারের একটি বিশেষ ব্যক্তি, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি। কারণ সে গৃহে তাহার যত আদর, এত কাহারও নাই। তাহার জন্য মাছ বরাদ্দ আছে; সে রাত্রিকালে বামার শয্যায় তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শয়ন করে; বধূরা দুইজনে গল্প করিতে বসিলেই সে কাহারও না কাহারও ক্রোড়ে উঠিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে থাকে; বামা তাহার দন্তপাটিবিকসিত মুখে কতই চুম্বন করে, কখনও কখনও তাহার গুম্ফশোভিত মুখ নিজের মুখের মধ্যে লয়, এবং বাড়ীতে কেহ বেড়াইতে আসিলেই সর্বাগ্রে ফুলীর পরিচয় করিয়া দেয়। দোষের মধ্যে ফুলী মধ্যে মধ্যে উনান-কাঁথায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে ভালবাসে এবং ধূলা মাখিয়া বামার নিকট অনেক নিগ্রহ সহ্য করে। গৃহিণী বিড়াল দেখিতে পারেন না; সর্বদাই বলেন, "মলো রে, বিড়ালটা লইয়া কী করে দেখো !" কিন্তু কন্যা ও বধূদিগকে পারিয়া উঠেন না, কাজেই সহ্য করেন। কেবল কন্যা ও বধূগুলি কেন, কর্তারও ফুলীর প্রতি বিশেষ কৃপা। আহারের সময় সে পাতের নিকট না আসিলে তাঁহার ভাল লাগে না।

সে যাহা হউক, বৈশাখের অর্ধেক অতীত প্রায়, প্রবোধচন্দ্র গ্রীষ্মাবকাশে অদ্য ঘরে আসিয়াছেন। বাড়ীতে পেঁছিছতে প্রায় তিনটা বাজিয়া যায়; স্নান আহার করিতে দিবা অবসান হয়। সন্ধ্যার সময় তিনি পল্লীস্থ বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখাশুনা করিয়া রাত্রি চারি-ছয় দণ্ড হইলে ঘরে ফিরিয়াছেন। প্রমদাও এদিকে সত্বর সংসারের কাজ সারিতেছেন। অদ্য বেলা তিনটার সময় হইতে তাঁহার একপ্রকার নবভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। চতুরা যুবতী বহু সতর্কতা দ্বারাও হৃদয় আবরণ করিতে পরিতেছেন না; চরণের গতি, মুখের প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কান্তি, অধরের সস্মিত ভাব ও কথার মিষ্টতা সমুদয় যেন তাঁহার হৃদয়ের লুকানো কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছে; শ্বশ্রূঠাকুরাণী এত উল্লাস ভাল বাসিতেছেন না, মৌনী আছেন।

কিন্তু প্রবোধচন্দ্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তথাপি প্রমদার দর্শন নাই। তিনি ঘরের মধ্যে প্রমদার চেয়ারখানির উপর বসিয়া এটি ওটি নাড়িতেছেন; কলমটি পেন্সিলটি একবার তুলিয়া লইতেছেন, আবার যেমন সজ্জিত ছিল, তেমনি করিয়া রাখিতেছেন; প্রমদার খাতাগুলি টানিয়া পাতা উল্টাইতেছেন, এবং হয়তো কোন অর্ধলিখিত চিঠির তিন পঙ্ক্তি কিংবা কোন অর্ধরচিত কবিতার চারি পঙ্ক্তি পাঠ করিয়া আপনার মনে হাস্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্রবধূ, তাঁহার ঘরে টেবিল চেয়ার, এ কিরূপ ? ইহা ইংরাজী সভ্যতার বন্যার বলে, দূর গ্রামে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে; অথবা প্রমদার পিতৃগৃহে এ সকলের অভ্যাস থাকাতে এখানেও অল্পে অল্পে প্রবেশ করিয়াছে। সে যেরূপই হউক, প্রমদার তিনটি মহৎ দোষ আছে

সে দোষগুলির এখানেই উল্লেখ করা ভাল। প্রথম দোষ—তিনি বড় পরিষ্কার। তাঁহার ঘরটি খড়ের ঘর, কিন্তু ভিতরটি এরূপ পরিপাটীরূপে সাজানো যে, দেখিলে দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রমদার কাপড়গুলি পরিষ্কার, বিছানার চাদর পরিষ্কার, মশারিটি পরিষ্কার, অন্নব্যঞ্জন পরিষ্কার; এইজন্য কেহ তাহাকে ‘‘বাবু বউ’’, কেহ “বিবী বউ”, কেহ “মেম সাহেব” প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিয়া থাকেন। তাঁহার ঘরটি “মেজবউ-এর ঘর” বলিয়া পাড়ায় প্রসিদ্ধ। অন্য পাড়ার গৃহিণীরা বেড়াইতে আসিলে সর্বাগ্রে “কই, তোমাদের মেজবউ-এর ঘর দেখি” বলিয়া দেখিতে যান; পাড়ার বউ-এরা “বাপ রে! মেজবউ-এর ঘর, নোংরা করিস্ নি” বলিয়া শিশুদিগকে নিবারণ করেন। প্রমদার দ্বিতীয় দোষ—তিনি পড়াশুনা করিতে বড় ভালবাসেন। পিত্রালয়ে বিবাহের পূর্বেই তিনি বেশ বাংগালা শিখিয়াছিলেন, বিবাহের পর দশ-বারো বৎসর প্রবোধচন্দ্রের সাহায্যে আরও অনেক উন্নতি করিয়াছেন। সর্ববিধ গৃহকার্যে তিনি সুদক্ষ এবং সর্বদা ব্যস্ত, তথাপি দিবার মধ্যভাগে ও রাত্রিকালে যে কিছু অবসর পান, তাহা জ্ঞানালোচনাতে যাপন করেন। তাঁহার তৃতীয় দোষ এই যে, তাঁহার পিতা ৪০০ শত টাকা বেতনের একটী চাকরি করেন। অবোধ পাঠিকা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহাতে তাঁহার দোষ কি? দোষ আছে বই কি? নতুবা শ্বশ্রূঠাকুরাণী এই কারণে তাঁহার প্রতি এত বিরক্ত হইবেন কেন? এইজন্য তাঁহাকে “রাজার মেয়ে”, “নবাবের ঝি”, “বড় মানুষের মেয়ে” প্রভৃতি নানাপ্রকার বাক্যে লাঞ্ছনা দিবেন কেন? অতএব ইহাও তাঁহার একটি দোষ। এই তিনটি দোষ ভিন্ন তাঁহার আর কোন প্রকার দোষ দেখা যায় না।

এদিকে প্রবোধচন্দ্র আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। এক-এক বার সতৃষ্ণনয়নে রন্ধনশালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, যদি প্রমদার প্রফুল্ল নেত্র তাঁহার নেত্রগোচর হয়; এক-একবার মন উৎসুক হইয়া প্রমদাকে ধরিয়া আনিতে চাহিতেছে। মনটা যেন বলিতেছে, কি অবিচার! স্ত্রীলোক এমন নির্বোধও হয়! বুঝিতেছেন না যে, সে বিলম্ব নির্বুদ্ধিতা-নিবন্ধন নহে, বরং বুদ্ধির আতিশয্যনিবন্ধন; তাহা চিত্তের আগ্রহাতিশয্য-গোপনের ছল মাত্র।

ওদিকে প্রমদা জ্যেষ্ঠা বধূ হরসুন্দরীকে আহারের জন্য সাধাসাধি করিতেছেন এবং দুরন্ত শিশু গোপালকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য নানাপ্রকারে ভুলাইতেছেন। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী হরসুন্দরীকে দেখিতে পারেন না। অদ্য সন্ধ্যার সময় সামান্য কারণে তাঁহাকে কতকগুলি অভদ্রোচিত কটূক্তি করিয়াছেন, তাই হরসুন্দরী ধরাশয্যায় অংগ ঢালিয়া মানিনী হইয়া আছেন। প্রমদা সাধাসাধি করিতেছেন এবং কর্ত্রী-ঠাকুরণী কতক্ষণে ঘরের মধ্যে যান, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহার সম্মুখ দিয়া স্বামীর নিকট যাইতে সাহস হয় না। যেই কর্ত্রী ঘরের ভিতর একটি পা দিয়াছেন, অমনি প্রমদা একটি প্রদীপ লইয়া অর্ধাবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্র অর্ধাবৃত করিয়া শয়নগৃহাভিমুখে ধাবমানা! গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়াই অবগুণ্ঠন উত্তোলনপূর্বক প্রীতিবিকসিত বিশাল নয়নে প্রবোধচন্দ্রের দিকে চাহিলেন; দুইজনের চক্ষে চক্ষে মিলিল এবং এক সময়েই দুই মুখে হাস্য ধরিল না। ইহা কিরূপ অভ্যর্থনা। আসিতে আজ্ঞা হউক, বসিতে আজ্ঞা হউক ইত্যাদি সম্মানসূচক পদাবলী ইহার মধ্যে নাই, কিন্তু সেই হাস্যরাশি যে গভীর ভাবরাশির উচ্ছ্বসিত তরংগ মাত্র, তাহার মূল্য কে নির্ণয় করিতে পারে?

প্রবোধচন্দ্র প্রমদাকে নিজ পার্শ্বস্থ আসনে বসাইয়া বলিলেন, “আজ আমি এসেছি বলেই বুঝি ঘরে আসতে বিলম্ব হচ্ছিল?”

প্রমদা। যে তোমার মা, ওঁর সুমুখ দিয়ে কি আসতে পারা যায়?

প্রবোধ। কেন, মা কি তোমায় খেয়ে ফেলতেন?

প্রমদা। কেবল তা নয়, দিদি আজ রাগ ক’রে কিছু খান নাই, তাঁকে খাওয়াবার চেষ্টাও করছিলাম।

প্রবোধ। খান নাই কেন?

প্রমদা। ঠাকরুন কতকগুলো গালাগালি দিয়েছেন।

প্রবোধ। ছিঃ, আমার মাকে আর বুঝিয়ে পারা গেল না! যেমন মা, তেমনি বউ।

প্রমদা। তোমার আজ বড় ক্লেশ হয়েছে, না?

প্রবোধ। যে কিছু ক্লেশ হয়েছিল, তোমার মুখ দেখে সব গেল।

প্রমদা। তুমি এবার বড় রোগা হয়েছ!

প্রবোধ। পরীক্ষা আসছে কিনা, এখন হ'তে পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তুমিও রোগা হয়েছ!

প্রমদা। তুমি তো আমাকে রোগাই দেখ; ভাল, বাড়ীর কথা দুই একটা জিজ্ঞাসা করি। আমার দাদার সঙ্গে কি দেখা হয়েছে?

প্রবোধ। আসবার দুই দিন পূর্বে হয়েছে; তোমাদের বাটীর সকলে ভাল আছেন।

প্রমদা। অনেকদিন বাটীর চিঠিপত্র পাই নাই।

ইত্যবসরে গোপালের ক্রন্দন-ধ্বনি কর্ণগোচর হইল। প্রমদা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া আসিয়াছেন, আবার হঠাৎ জাগিয়াছে। হরসুন্দরী মান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ডাকিলেও কথা কহেন নাই, অবশেষে গোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের বাহিরে আসিয়াছে।

প্রবোধ। গোপাল কাঁদছে বুঝি?

প্রমদা। হাঁ, এই যে ঘুম পাড়িয়ে এলাম!

প্রবোধ। চলো দুজনে যাই, বউ-এর শরীর ভাল নয়, অনাহারে থাকা কর্তব্য নয়।

উভয়ে হরিশ্চন্দ্রের ঘরে উপস্থিত হইলেন। হরিশ তখনও ঘরে ফিরেন নাই। প্রমদা গোপালকে কোলে করিয়া মুখচুম্বনপূর্বক অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। গোপাল মেজ কাকীর বক্ষঃস্থলে আবার মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইল। প্রমদা হরসুন্দরীর মস্তকের কাপড় টানিয়া বলিলেন, "দিদি দেখো! কে এসেছেন দেখ!"

হরসুন্দরী প্রবোধচন্দ্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া আবার মুখ আবরণ করিলেন। মানিনী কিনা!

প্রবোধ "সে কি বউদিদি! এই আমাকে এত ভালবাস, এত দিনের পর এলাম, একটা কথাও কইলে না!" বলিয়া মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন। মুখের আবরণ উদ্ঘাটিত হইল, কিন্তু হরসুন্দরী চক্ষু মুদিয়া রহিলেন, যেন নূতন বউ মুখ দেখাইতেছেন! দেখিয়া প্রমদা এবং প্রবোধচন্দ্র উভয়ের হাস্যের উদয় হইল। অবশেষে প্রমদা হরসুন্দরীর বাহু ধরিয়া বারকতক "ওঠো ওঠো" করাতে হরসুন্দরী ধূলি-ধূসরিত অঙ্গযষ্টি তুলিলেন। ইতিপূর্বে মান এবং ক্ষুধা-দেবীর মধ্যে ঘোর বিবাদ বাধিয়াছিল, সুতরাং অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। অঙ্গযষ্টি ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে রন্ধনশালার দিকে চলিল; ক্রমে অন্নব্যঞ্জনের কাছে বসিল। আহার করিতে করিতে দেবরের সহিত অনেক বাক্যালাপ হইতে লাগিল। নিজ স্বামীর ও শ্বশুরের গুণের পরিচয় দিয়া অবশেষে দেবরের প্রশংসা হইতে লাগিল। কিরূপে বিবাহের সময় আসিয়া তাঁহাকে ৭।৮ বৎসরের বালক দেখিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি 'বউদিদি খাবার দাও' বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন, কিরূপে তিনি উপকথা শুনিবার জন্য বউদিদির ঘরে অর্ধেক রাত্রি থাকিতেন, কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন, এই সকল পুরাতন কাহিনী বলা হইল। আহারান্তে মান পরিহার করিয়া হরসুন্দরী স্বীয়গৃহে গমন করিলেন, আমাদের যুবকদম্পতীও শয়নাগারে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা তৃতীয় প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। আহারান্তে কর্ত্রীঠাকুরাণী বিলক্ষণ এক ঘুমাইয়া উঠিয়া, শ্যামাকে জগাইয়াছেন। এদিকে প্রমদার ঘরে পাড়ার বধূদিগের তাসের খেলা বসিয়াছিল। প্রমদা তাস, দশপঁচিশ, অষ্টাকষ্টে প্রভৃতি স্ত্রীজনসুলভ কোন খেলাই জানেন না। কিন্তু তাঁহার ঘরেই বধূদিগের খেলা বসিয়া থাকে, তিনি সেই সময়ে পড়েন কিংবা চিঠিপত্র লেখেন এবং মধ্যে মধ্যে এক-আধটী পরিহাসের কথা বলেন। গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তাসগুলি বিছানার তলে গেল;

বউগুলি স্ব স্ব গৃহে গেল; বামা প্রমদার নিকট চুল বাঁধিতে বসিল; সেজবউ একটি জলের কলস কাঁকে করিয়া বাহির হইলেন; ছোটবউ একগাছি ঝাঁটা হাতে করিয়া গৃহিণীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন; বড়বউ নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাড়ার অপরাপর বধূরা স্বীয় স্বীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে গোপালচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর ভিতর আসিতেছে। গোপালের বয়ঃক্রম চারি বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন, বর্ণটি শ্যামল, শরীরটি গোলগাল। তবে পেটটি কিঞ্চিৎ বড়। পেটের অপরাধ কি? গোপালের মুখটি সমস্ত দিনই চলিতেছে। বাঙ্গালীরা দিনে দুইবার খান, বাবুরা তিনবার খান, ইংরেজেরা চারিবার খান, কিন্তু গোপালচন্দ্র কতবার খান তাহা কে বলিবে? শয্যা হইতে উঠিয়াই আহার, তৎপরে নড়িতে-চড়িতে আহার—পিতার পাতে আহার, কাকীদের পাতে আহার। ইহাতেও যদি গোপালের ভুঁড়িটি বর্তুল না হইবে, তবে বর্তুলতা কিরূপে জন্মিতে পারে? এইজন্যই পিতামহী তাহাকে ননীগোপাল নাম দিয়াছেন। গোপালের কণ্ঠে পিতামহীর দত্ত ব্যাঘ্রনখ-বিশিষ্ট পদক, হস্তে মেজকাকীর দত্ত বালা, কোমরে মাতামহের দত্ত নিমফল কোমরপাটা। ছেলেটি বড় শান্ত, হস্তে হয় একখানি কাটারি, না হয় একগাছি ছড়ি সর্বদাই আছে এবং ঐ ছড়ি আবশ্যকমত ক্ষেমি, পুঁটী, মা, কাকী প্রভৃতির পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকে। কিন্তু গোপালের প্রহার সকলেরই মিষ্ট লাগে। গোপাল একটি গালি শিখিয়াছেন এবং কোন কাজ মনের অনভিমত হইলে "ছালা" বলিয়া থাকেন। কর্তামহাশয় সর্বদা গোপালকে ঐ মিষ্ট সম্বোধনে ডাকিয়া গালটি শিখাইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিন্দাটাই কেবল কেন করি? তিনি যে কেবল গালি শিখাইয়াছেন তাহা নহে, মুখে মুখে তাহাকে অনেক কথা শিখাইয়াছেন। "তোমার নাম কি? তোমার পিতার নাম কি, তোমার পিতামহের নাম কি, তোমরা কোন্ কুলে জন্মিয়াছ? কতদিন ব্রাহ্মণকুলে আছ?" ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর গোপাল আধ-আধ ভাষায় দিতে পারে, এবং আধ-আধ, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা রকমে চাণক্যের দুই-একটা শ্লোকও বলিতে পারে। গোপালের তো বেশ এইপ্রকার—বস্ত্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। অন্যদিন সাধ করিয়া বস্ত্র পরাইয়া দিলে অর্ধ-দণ্ড সহ্য করে না, আজ কিন্তু গোপালের কাপড় পরিবার সাধ হইয়াছে; এবং আমি 'আঙা কাপল পলবো' বলিয়া কাঁদিয়া বাড়ীর ভিতর আসিতেছে। ছড়িগাছি কিন্তু ছাড়া হয় নাই। প্রমদা বামার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে 'গোপাল গোপাল' বলিয়া ডাকিলেন; গোপাল শুনিতে পাইল না, একেবারে গিয়া পিতামহীর অঞ্চল ধরিল। গৃহিণী গোপালকে ভালবাসেন; কিন্তু সেদিন তাহার পিতামাতা উভয়ের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, সুতরাং বলপূর্বক গোপালের হাত ছাড়াইয়া ঠেলিয়া দিলেন; বলিলেন, "কাপড় পরবি তো আমার কাছে মরতে এলি কেন? তোর কে কোথায় আছে যা, তাদের কাছে গিয়ে বল্।" গোপাল আবার কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিল। হরসুন্দরীর মনও সেদিন উষ্ণ ছিল, তিনি গোপালের কোমল অঙ্গে মনের ঝাল ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। গোপালের চীৎকারে প্রমদার মন আকৃষ্ট হইল; তিনি দ্রুতপদে আসিয়া গোপালকে কোলে করিয়া লইলেন; অঞ্চলে চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া মুখচুম্বন করিলেন। গোপাল যে এত প্রহার খাইয়াছে, তথাপি সেই এক বুলি, "আমি আঙা কাপল পলবো।"

প্রমদা। বাবা ছেলে, যাদু ছেলে, কেঁদো না, আমি তোমাকে রাঙা কাপড় দেবো।

গোপাল ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা বাহিরের দ্বার দেখাইয়া দিল; প্রমদা বুঝিলেন যে দ্বারে কাপড় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। তিনি গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া বাহিরের দ্বারে গেলেন, দেখিলেন, সেখানে পাড়ার সকল মেয়ে একত্র হইয়াছেন। কেহ বা স্বীয় স্বীয় পুত্রকন্যাকে কাপড় কিনিয়া দিতেছেন; কেহ বা দর করিতেছেন; কেহ বা গোপনে পুত্রকন্যার কানে কানে কথা বলিয়া, অন্যায় অনুরোধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। প্রমদা দেখিলেন, ক্ষেমি ও পুঁটি সেখানে চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা মেজকাকীকে পাইয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল। প্রমদা বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বামার দ্বারা কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ছেলেরা কাঁদিতেছে, তাঁহার

পিতা সেই দিন তাঁহার জন্য কয়েকটি টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতে তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিবেন কি না। কর্ত্রী প্রথমে কথা কহিলেন না; বামা বার বার জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "দেয় দিক।" তখন প্রমদা আবার দ্বারে আসিয়া গোপালকে একখানি রাংগা কাপড় কিনিয়া দিলেন। যেই কাপড় পাওয়া, অমনি মেজকাকীর কোল হইতে নামা; আর গোপালকে রাখা ভার। নামিয়া কাপড় পরিয়া কাচাকোঁচা দিয়া নব-ব্রহ্মচারীর ন্যায় পিতামহীর নিকটে চলিল। প্রমদা ক্ষেমি এবং পুঁটীকেও এক-একখানা কাপড় লইতে বলিলেন। ছেলেরা এক-একখানি কাপড় হস্তে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রমদা বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা দোকানদারকে দিলেন, এবং গৃহকার্যে গমন করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী মনে মনে বড় পছন্দ করিলেন না।

কর্তামহাশয় সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিবামাত্র, গোপাল কাপড়খানি পরিয়া ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিল। কর্তা শ্যালকের নববেশ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপড় কে দিলে রে গোপাল?" অমনি গোপাল হস্তের ছড়িগাছি ঊর্দ্ধ করিয়া "মেদকাকী দিয়েতে, মেদকাকী দিয়েতে" বলিয়া কর্তাকে প্রদক্ষিণপূর্বক নৃত্য আরম্ভ করিল। গোপালের আনন্দ দেখিয়া ক্ষেমি-পুঁটীও ছুটিয়া আসিল এবং "মেজকাকী দিয়েছে, মেজকাকী দিয়েছে" বলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কর্তামহাশয় পৌত্র ও পৌত্রীগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছেন এবং বলিতেছেন, "এ যে পুজো-বাড়ী দেখছি।" এমন সময়ে গৃহিণী আসিলেন। তিনি এতক্ষণ মৌনী ছিলেন; কিন্তু ও দৃশ্য আর তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি কর্তার প্রতি বিকৃত মুখভংগী করিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! কি রংগই দেখছেন!"

কর্তা। দেখ দেখি কত আনন্দ! তোমার কি দেখে সুখ হচ্ছে না?

কর্ত্রী। তুমিই সুখ করো, আমি ঢের দেখেছি!

কর্তা। কি বিপদ্! তোমার কাছে কি কিছুতেই নিস্তার নাই; অপরাধটা হলো কি?

কর্ত্রী। মন্দ কি, আমি বড়মানষি ঢঙ দেখতে পারি নে।

কর্তা। বড়মানষি ঢঙ কি দেখলে?

কর্ত্রী। তা বই কি, কেন না—আমার বাপের টাকা আছে, সকলে দেখুক।

কর্তা। কি বিপদ্! দোষটা কি হয়েছে? তোমাদের হাতে টাকা ছিল না, ওঁর হাতে টাকা ছিল, কিনিয়া দিয়াছেন; কোথায় এতে আনন্দিত হয়ে প্রশংসা করবে, না আবার রাগ! তোমার মত নীচ অন্তঃকরণ আমি দেখি নাই।

কর্ত্রী। তুমি মিছে বকো না বলছি, হতো গরীবের ঝি, কেমন খোসামুদি করতে দেখতাম!

কর্তা বিরক্ত হইয়া আর উত্তর করিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্য চাটুয্যে মহাশয়দের একজন অতি নিকটস্থ জ্ঞাতির বাড়ী সপরিবারে নিমন্ত্রণ। প্রাতঃকাল হইতে বধূগণ মনে মনে নৃত্য করিতেছেন; বেলা চারিদণ্ড না হইতে হইতেই তাঁহারা গৃহের কাজ সারিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। পূজার সময় চারি বউএর যে পোষাকি কাপড় হয়, সকলে তাহাই পরিয়াছেন। প্রমদার পিতৃদত্ত ভাল ভাল কাপড় আছে, কিন্তু তিনি একখানি সাদা মোটা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন এবং বামাকে নিজ ঘরে লইয়া ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া একটি টিপ পরাইয়া নিজের বিবাহের সময় যে গহনা হইয়াছিল, তাহার দুই-একখানি পরাইয়া দিতেছেন। ও-দিকে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী বার বার আহ্বান করিতেছেন। বামা অলংকার পরিয়া বাহির হইল দেখিয়াই কর্ত্রী চটিয়া গেলেন। "মর! অভাগী যেন বিয়ের কনে সেজে বেরুলেন, যা ওগুলো খুলে আয়।" সে ছেলেমানুষ, শুনবে কেন, খুলিতে গেল না! কর্ত্রীঠাকুরাণী চাকরকে গরুর

সেবা করিতে ও ঘরবাড়ী দেখিতে আদেশ করিয়া নিমন্ত্রণভবনাভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সর্বাগ্রে গৃহিণী, তৎপরে শ্যামা, তাহার ক্রোড়ে পরেশের কন্যা, তৎপরে বড়বউ, তৎপরে বামা, তৎপরে প্রমদা এবং তাঁহার ক্রোড়ে গোপাল, সর্বপশ্চাৎ সেজ ও ছোটবউ এবং ক্ষেমি পুঁটী। তাহারা এক-একবার পিছাইয়া পড়িতেছে এবং এক-একবার ছুটিয়া ছুটিয়া সংগী হইতেছে। গোপাল মেজকাকীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া সেই ক্রোড় হইতেই ভগ্নীদ্বয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রমদা তাহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে চলিয়াছেন, "বাবা ছেলে, পরের বাড়ী গিয়ে গোল করো না, কেঁদো না, খাবার জন্য হাংগামা করো না; লক্ষ্মী ছেলের মত চুপ করে বসে থেকো" ইত্যাদি। গোপালের কর্ণ সেদিকে নাই, সে এক-একবার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; প্রমদা বলপূর্বক বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিতেছেন।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর ক্ষুদ্র সৈন্যদলটি ক্রমে নিমন্ত্রণভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রণকর্ত্রী পরম সমাদরে সকলকে গ্রহণ করিলেন; বউগুলির দাড়িতে হাত দিয়া "মা সকল এলে, বাঁচালে, এ তোমাদেরই ঘরবাড়ী; করে নিয়ে খেতে হবে! আমি মানুষের কাংগালী, আমার বাড়ীতে এলে খাটতে হয়" প্রভৃতি কত মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহারা দুই গৃহিণীতে রন্ধনাদির পরামর্শ করিতে গেলেন, বধূগণ এ-ঘর ও-ঘর রন্ধনশালা প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাস্তবিক নিমন্ত্রণকর্ত্রীর লোকের অভাব, তাঁহার নিজের শরীর ভগ্ন, বধূ দুইটির একটি অসুস্থ। নিরামিষ পাক করিবার জন্য পাড়ার দুই-একজন বিধবা বৃদ্ধাকে আনাইয়াছেন; কিন্তু মৎস্য পাক করিবার লোকের এখনও যোগাড় হয় নাই। নিমন্ত্রণকর্ত্রীর ইচ্ছা যে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রবধূরা সে বিষয়ে সাহায্য করেন; কিন্তু তাঁহাদের শ্বশ্রূর নিকট সে প্রস্তাব করাতে তিনি একপ্রকার সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়াছেন। "আর বোন, বড়বউটার কথা ছাড়িয়া দাও; সেজবউ কাঁচা পোয়াতি, ছেলে কোলে; ছোটবউটা গবারাম; মেজবউ বড়মানুষের ঝি, সে কি যজ্ঞি রাঁধতে পারবে" ইত্যাদি নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া নিমন্ত্রণকর্ত্রীর প্রস্তাব কাটাইতেছেন; তিনি সংকটে পড়িয়া ইতস্ততঃ ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। প্রমদা তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বধূর দ্বারা নিজে মৎস্য রন্ধনের অভিপ্রায় জানাইলেন। গৃহিণীর তো আনন্দের সীমা-পরিসীমা নাই। তৎক্ষণাৎ রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিতে বলিলেন। প্রমদা ও নিমন্ত্রণকর্ত্রীর দ্বিতীয়া বধূ উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত হইলেন।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল; ব্রাহ্মণে বাহির-বাড়ী এবং সমাগত মহিলাগণে অন্তঃপুর পূর্ণ হইয়া গেল। নিমন্ত্রণকর্ত্রীকে রুগ্নশরীর লইয়াও আজ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তিনি সমবয়স্কাদিগকে "এসো বোন, বসো বোন", বধূদিগকে দাড়িতে হাত দিয়া "এসো মা, বসো মা, সোনার চাঁদ" প্রভৃতি নানা মিষ্ট ভাষায় অভ্যর্থনা করিতেছেন; এমনকি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক-বালিকাগুলির প্রতিও তাঁহার অমনোযোগ নাই; এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে দুগ্ধপোষ্য শিশু, তাহার দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন; এবং মধ্যে মধ্যে আপনার জ্যেষ্ঠা বধূকে নির্জনে ডাকিয়া বলিতেছেন, "দেখ মা, আজ আমার লোকের অপ্রতুল নাই, তুমি বেশী ছুটোছুটি করো না, পিত্তি পড়িয়ে থেকো না, কিছু খাও, খাইয়া ইহাদের কার কি চাই দেখো।"

ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত-প্রায়, বাহিরবাড়ীতে ব্রাহ্মণদিগের পাত হইল, এবং লোকের ছুটোছুটি, দে-রে, নে-রে, জল-জল, নুন-নুন শব্দ ও অন্নব্যঞ্জনের গতায়াতে বাড়ী কোলাহলময় হইয়া পড়িল। প্রমদা এতক্ষণ বসিয়া মৎস্য পাক করিতেছিলেন, এক্ষণে কোমর বাঁধিয়া অন্ন বাড়িয়া যোগাইতে আরম্ভ করিলেন। এক-একজন বৃদ্ধা রমণী পাকশালার দিকে আগমন করেন এবং প্রমদার স্বেদকণাসিক্ত প্রফুল্লমুখারবিন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহার রূপগুণের প্রশংসা করেন, সকলেই বলেন, "যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!"

অন্নপূর্ণা তো এইরূপে অন্নব্যঞ্জন বণ্টন করিলেন। ক্রমে বাহিরে পুরুষদিগের আহার শেষ হইতে হইতে অন্তঃপুরে রমণীদিগের আহারের আয়োজন হইল। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আসিয়া প্রমদার

হস্ত হইতে অন্নের থালা কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহাকে রমণীদিগের সঙ্গে বসিতে বলিলেন। প্রমদা কি করেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রন্ধনশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

বামাকুল ভোজে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন যুবতী বাম হস্তে বৃহৎ নতখানি ঈষৎ সরাইয়া প্রকাণ্ড অন্নপিণ্ড কবলিত করিতেছেন; কেহ বা কোন পুরুষ দৈবাৎ পরিবেষণস্থলে আসিবামাত্র অবগুণ্ঠনাবৃত ও কেন্নাইয়ের ন্যায় গুটাইয়া যাইতেছেন; কেহ বা পীযূষপূরিত স্তন সন্তানের মুখে দিতেছেন—মাতা ও পুত্রের একসঙ্গে আহার চলিতেছে; কেহ বা মৎস্যের তরকারীর গুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপে রমণীগণ ভোজনকার্যে ব্যস্ত আছেন। আমাদের গোপাল ইতিমধ্যে জাগিয়াছেন। তিনি নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইয়া মেজকাকীর সদুপদেশ লঙ্ঘনপূর্বক গৃহস্থের কুকুর ও বিড়ালের কর্ণ ও লাঙ্গুল প্রভৃতির দুরবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কুকুরটি তাঁহার জ্বালায় প্রাঙ্গণের এপাশ হইতে ওপাশে, ওপাশ হইতে এপাশে এইরূপ অবশেষে বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়াছে; বিড়ালও লাঙ্গুল বাঁচাইয়া গোলার ভিতর গিয়া আশ্রয় লইয়াছে; শেষে গোপালের জননী অনেক কষ্টে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন। সে এতক্ষণ নিদ্রার পর উঠিয়া রমণীদিগের আহারস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং মেজকাকীর বামজানুরূপ সিংহাসন আক্রমণপূর্বক যষ্টিরূপ রাজদণ্ড হস্তে করিয়া বসিয়াছে। আহারের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই; নিমন্ত্রণের গন্ধে যে দেশের বিড়াল উপস্থিত, সে মধ্যে মধ্যে তাহাদের শাসনার্থ রাজদণ্ড লইয়া অগ্রসর হইতেছে। রাজভয়ে প্রজাগণ বামাকুলের পাতের মুড়াগুলি চুরি করিতে সাহসী হইতেছে না। গোপাল মধ্যে মধ্যে মেজকাকীর হস্তার্পিত অন্নের গ্রাসও কবলিত করিতেছে।

আহারান্তে কুলকামিনীগণ একে একে বিদায় লইলেন। হরিশের মা পরমাত্মীয়া, সুতরাং তাঁহার যাত্রা করিতে বেলা অবসান হইল। নিমন্ত্রণকর্ত্রী বধূগণের বিশেষত প্রমদার মস্তকে হস্ত দিয়া অনেক আশীর্বাদ করিলেন। গোপালকে কোলে লইয়া মুখচুম্বনপূর্বক হাতে একটি সন্দেশ দিলেন; চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী আবার সসৈন্যে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, গোপাল পুনরায় মেজকাকীর কোলে আরোহণ করিয়া সন্দেশটির মান রক্ষা করিতে করিতে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রবোধচন্দ্র জ্যৈষ্ঠের শেষে কলিকাতায় গিয়াছেন; কর্তামহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া গ্রামান্তরে গমন করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্রও বাড়ীতে নাই, তিনি স্বীয় প্রভুর জমীদারীতে প্রেরিত হইয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার পরেই গৃহকার্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। প্রমদা আজ হরসুন্দরীর ঘরে শয়ন করিবেন। বামা প্রমদার নিতান্ত অনুগত, সেও বড়বউ-এর ঘরে গিয়াছে। পাঠিকা দেখিতেছেন, কেমন দুইটী দল। এক ঘরে কর্ত্রীঠাকুরাণী, শ্যামা, সেজবউ এবং ছোটবউ; অপর ঘরে হরসুন্দরী, প্রমদা এবং বামা। কর্ত্রীঠাকুরাণী বার বার বামাকে ডাকিতেছেন, "বামা, এদিকে আয়, বামা এদিকে আয়।" বামা "কেন কেন" করিয়া উত্তর দিতেছে, কিন্তু যাইতেছে না। গৃহিণী ততই বিরক্ত হইতেছেন; অবশেষে হরসুন্দরী শিখাইয়া দিলেন, "বলু না আমি জলে পড়েছি, না অন্য জেতের বাড়ী এসেছি, এত ডাকাডাকি কেন?" বামা গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া জননীকে সেই কথাগুলি বলিল। গৃহিণী অনুমান করিলেন, উহা প্রমদার কথা, অমনি উদ্দেশে নানাপ্রকার শ্লেষ কটূক্তি সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হরসুন্দরীর প্রকৃতি কিছু উগ্র; তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না। প্রমদা বার বার তাঁহার মুখ আবরণ করেন, হস্ত ধরিয়া ফিরান, "দিদি তোমার পায়ে পড়ি, কিছু বলো না, উনি বকিয়া আপনিই থামিবেন।" হরসুন্দরী কিয়ৎক্ষণ আপনার মনে গজগজ করিলেন, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলপূর্বক প্রমদার হস্ত ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া বলিলেন, "যা হোক, অনেক শাশুড়ী দেখেছি, তোমার মতো শাশুড়ী আর দেখলেম না! কি সামান্য কথায় যে এত গাল দিচ্ছো? কেন, সে করেছে কি? সে ত কিছু বলেনি, ও কথা তো আমিই শিখিয়ে দিলাম, অবিচার করে গাল দেও কেন?"

কর্ত্রী। গাল দেব না? কতকগুলো ছোটলোকের মেয়ে জুটে জ্বালয়ে মারলে!

হর। তোমরা তো বড়লোকের মেয়ে, সেইজন্যেই বুঝি অমনি ব্যবহার; সেইজন্যেই বুঝি একচোকা হয়ে এক দিক দেখতে পাও না?

কর্ত্রী। ও অসতের ঝাড়! আমার যারে যা ইচ্ছা দেব, তোর বাবার কি রে? মেজবউ-এর হিংসাতেই ম'লো; হা ছোটলোক! আসুক হরিশ, তোরে ভাল করে শেখাব।

হর। আর শেখাবে কি? না হয় মেরেই ফেলবে, তা হলে তো তোমার মতো শাশুড়ীর হাত হতে নিস্তার পাব।

প্রমদা দেখিলেন, কলহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, তিনি বলপূর্বক হরসুন্দরীকে ধরিয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং দ্বার বন্ধ করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী নিজের মনে বকিতে লাগিলেন।

এ কি সর্বনাশ! পরেশ একে গোঁয়ার, তাহাতে বোধহয় কোনপ্রকার নেশা করে; সে হঠাৎ সেই সময়ে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আসিবামাত্র গৃহিণী একগুণ কথা দশগুণ করিয়া শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে তাহার কোপানল আরও জ্বলিয়া উঠিল,—"কি! এত বড় আস্পর্ধা, মাকে ছোটলোকের মেয়ে বলে," এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল, এবং গিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। প্রমদা দ্বার খুলিলেন বটে, কিন্তু দুই পার্শ্বে দুই হস্ত দিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরপো, আমার কথা শোনো; না শুনে রাগ ক'রো না।" পরেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া "সরো সরো" বলিয়া তর্জন করিতে লাগিল। বলিল, "তুমিও ছোটলোক হয়ে গেছ, সরো দেখি, পাজি ব্যাটার মেয়ে এত বড় আস্পর্ধা যে মাকে ছোটলোকের মেয়ে বলে!"

হরসুন্দরীর দৃক্‌পাতও নাই, তিনি বলিলেন, "আরে মর্‌ লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া, কাল ওকে দুধের ছেলে দেখলেম, উনি আবার কর্তৃত্ব করতে এলেন। তুই আমাকে পাজি ব্যাটার মেয়ে বলিস কেন রে?"

পরেশ। বলবো না? দুশবার বলবো। হয়েছে কি? জুতোয়ে হাড় ভেঙে দেব, জান!

হর। হুস্‌, ঢের ঢের জুতো দেখেছি, মুখ সামলে কথা ক'স।

পরেশ একেবারে অধীর হইয়া প্রমদাকে বেগে দূরে ফেলিয়া দিয়া হরসুন্দরীর প্রতি ধাবিত হইল; হরসুন্দরী উঠিয়া, "মার্‌ না মার্‌ না" করিয়া পরেশের সম্মুখীন হইল। প্রমদা মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দৌড়িয়া পরেশের হস্ত ধরিলেন, "ঠাকুরপো, স্থির হও স্থির হও," বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং পরেশকে টানিয়া বাহিরে আনিলেন।

প্রমদা পিতৃগৃহে আদুরে মেয়ে ছিলেন, শ্বশুরকুলেও শ্বশুরের বিশেষ স্নেহ ও আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন। দেবরগুলিও বাড়ীর মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসিত ও অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। আজ পরেশ রাগের বশে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছে ও তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে সেগুলি তাঁহার প্রাণে লাগিয়াছে। তিনি পরেশকে ধরিয়া নিরস্ত করিলেন বটে, কিন্তু অপমানে নেত্রজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। দক্ষিণহস্তে পরেশের হাত ধরিয়া বামহস্তে বসনাঞ্চলে নয়ন মার্জন করিতে লাগিলেন।

পরেশ। মেজবউ, তুমি কি ক্লেশ পেলে? রাগের বশে যা বলেছি, কিছু মনে ক'রো না।

প্রমদা। মনে আর কি করবো, তোমরা কি এইরূপ ক'রে সংসার করবে?

পরেশ। আচ্ছা মেজবউ! তুমি কেন বল না, মা যদিই একটি অন্যায় কথা বলেন, ওর কি ওরূপ বলা উচিত হয়?

প্রমদা। তা তো নয়, তোমরা ত দিদির প্রকৃতি জান, একটু বুঝে চললেই ত হয়!

ইতিমধ্যে গৃহিণী পরেশকে ডাকিলেন, পরেশ বড়বউ-এর গৃহ হইতে নামিয়া গেল। প্রমদা হরসুন্দরীর গৃহের দ্বার দিলেন, বামা সেই ঘরেই রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভাদ্র মাস অতীত-প্রায়, কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রি, এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পরেই এক পশলা ভারি জল হইয়া গিয়া এক্ষণে ছিপছিপ করিয়া জল হইতেছে। মহানগরী কলিকাতা, যাহাতে রাত্রি একটা পর্যন্ত রাজপথ সকল জন-কোলাহল-পূর্ণ থাকে, আজি সেই নগরীও জনশূন্য! কেবল মধ্যে মধ্যে দুই-একটি লোক হাঁটুর কাপড় তুলিয়া, জুতাজোড়াটি হস্তে লইয়া, ছাতাটি ভালরূপে ধরিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক-একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ঝনঝন শব্দ করিয়া দেখা দিতেছে এবং অল্পক্ষণ পরেই অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। অধিকাংশ দোকানের ঝাঁপতাড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছে। দুই-একখানি খোলা আছে, তাহারাও বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই নিস্তব্ধ সময়ে প্রবোধচন্দ্র একাকী বাহির হইয়াছেন। আজ তাঁহার আর একপ্রকার বেশ; তাঁহার পরিধানে একখানি অর্ধ-মলিন বস্ত্র। চাদরখানি ও বস্ত্রখানিতে মিল নাই; গায়ে একটি জামাও নাই; চুলগুলি রুক্ষ-রুক্ষ; চক্ষের দৃষ্টিতে গভীর চিন্তা ও রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন দেদীপ্যমান; বামহস্তে একটি ভাংগা ছাতি এবং দক্ষিণহস্তে একটি ঔষধের শিশি। তিনি এই বেশে অদ্য কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রে কেন কলিকাতার রাজপথে বাহির হইয়াছেন? তাঁহার ঘরে আজ ঘোর বিপদ! কর্তামহাশয় আষাঢ় মাসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গৃহে আসার পর পীড়িত হন। সেই পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া জ্বরাতিসারে দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের চিকিৎসকদিগের দ্বারা যতদিন প্রতিকারের আশা ছিল, ততদিন বাড়ীতেই চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াতে এবং নানাপ্রকার উপসর্গ প্রকাশ পাওয়াতে অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করাইবার পরামর্শ স্থির হয়, তদনুসারে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছে। কর্ত্রী গোরু, বাছুর ও বধূদের রক্ষা এবং ঠাকুরসেবা ফেলিয়া আসিতে পারেন নাই। হরিশ্চন্দ্র বাড়ীর রক্ষা ও জমিদারের কার্য লইয়াই ঘরে আছেন; কেবল প্রমদা, বামা ও পরেশ তাঁহার সংগে আসিয়াছেন। কর্তার জন্য বহুবাজারের এক গলিতে বাসা ভাড়া করা হইয়াছে, সেখানে কয়েকজন ভাল ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতেছেন, অদ্য রাত্রে একপ্রকার নূতন উপসর্গ উপস্থিত হওয়াতে, প্রবোধচন্দ্র চিন্তিত-অন্তরে চিকিৎসকের গৃহে চলিয়াছেন।

এদিকে কর্তামহাশয় নয়ন মুদ্রিত করিয়া রোগশয্যায় শয়ান আছেন। তাঁহার সেই প্রসন্ন মুখকান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীর কংকালসার, চক্ষু গাঢ়প্রবিষ্ট; স্বর বিকৃত ও ক্ষীণ; হস্তপদও রক্তবিহীন ও বিশীর্ণ, উত্থানের শক্তি নাই, ধরিয়া পার্শ্ব ফিরাইতে হয়। তাঁহার এক-পার্শ্বে প্রমদা, অপরপার্শ্বে পরেশ। প্রমদা তাঁহার যাতনা দর্শন করিয়া, রোদন সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। বামহস্তে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন, এবং দক্ষিণহস্তে মৃদু ব্যজন সঞ্চালন করিতেছেন। পরেশ মস্তকে মৃদু মৃদু জলের প্রলেপ দিতেছেন। কর্তামহাশয়ের ন্যায় ধীর ও সহিষ্ণু ব্যক্তি আমরা দেখি নাই। অন্য লোক হইলে এইরূপ গভীর ও অসহ্য বেদনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত, কিন্তু তিনি আশ্চর্য সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সহ্য করিতেছেন। তাঁহার চৈতন্য প্রভাতের স্বপ্নের ন্যায় এক-একবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, আবার যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। একবার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে তিনি প্রমদার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রমদার মুখ আর অবগুণ্ঠনাবৃত নয়; কলিকাতাতে আসা অবধি তিনি আর কর্তার পুত্রবধূ নন, কন্যার অধিক হইয়াছেন। তাঁহার নিকট কর্তার লজ্জা নাই, কর্তার নিকটও তাঁহার লজ্জা নাই। তিনি কাপড় পরাইতেছেন, তিনি আহার দিতেছেন, তিনি পাশ ফিরাইতেছেন, তিনি ব্যজন করিতেছেন, তিনি গায় হাত বুলাইতেছেন। প্রবোধ, পরেশ ও বামা আছেন সত্য কথা, কিন্তু প্রমদা নিকটে থাকিলে যেন কর্তা অনেক ভাল থাকেন, চেতনা হইলেই "মা মা" করিয়া ডাকিতে থাকেন, সুতরাং মায়ের আর তাঁহার ঘর ছাড়িবার যো নাই। পাকশাক করিবার সময় প্রবোধচন্দ্র প্রভৃতি বসিয়া থাকেন, তথাপি বার বার আসিয়া দেখা দিয়া যাইতে হয়।

আমাদের প্রমদাও রাত্রিজাগরণ, চিন্তা ও পরিশ্রমে আর-এক আকার ধারণ করিয়াছেন। তিনি তিন সপ্তাহ চুল বাঁধেন নাই, দুই-তিন দিন স্নান আহার ভাল করিয়া করেন নাই। বসন মলিন, মুখ বিষন্ন, তাঁহার প্রসন্ন পবিত্র কান্তির উপর চিন্তা ও বিষাদের আভা পড়িয়া একপ্রকার সুন্দর ভাব হইয়াছে। তাঁহাকে যেন দ্বিগুণ সুন্দর দেখাইতেছে। পরের সেবাতে যে শরীর কালি হয়, সে কালি যে স্বর্ণালঙ্কার অপেক্ষাও ভাল, প্রমদা সেই কথার যেন পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কর্তামহাশয় জাগিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিলেন, অমনি মা অবনত হইয়া উত্তর দিলেন। কর্তা মাকে ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, মাও তাঁহাকে সাদরে ধরিয়া ঈষৎ তুলিয়া পাশ ফিরাইয়া দিলেন। কেমন মায়ের সন্তান! কর্তামহাশয় শয়ন করিয়া প্রমদার সুকোমল করতল নিজ করতলে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি কি আর জন্মে আমার মা ছিলে?" প্রমদা কাঁদিতে লাগিলেন।

কর্তা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, অনেক পুণ্য না হ'লে তোমার মতো মেয়ে ঘরে আনা যায় না।

প্রমদা। আপনি কথা কবেন না; বেদনা বাড়বে।

কর্তা। আর ত বেশীদিন কথা কইতে হবে না, যতক্ষণ জ্ঞান আছে, গোটাকতক কথা করে নি; যতক্ষণ দেখবার শক্তি আছে, তোমাদের মুখ দেখে নি।

প্রমদা। বাতাস করবো?

কর্তা। না মা। অনেকক্ষণ বাতাস করেছ, আর বাতাসে কাজ নাই। তুমি অমনি বসে থাক, আমি কথা কই! তুমি যেদিন হ'তে আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেছ, সেইদিন হ'তে আমার প্রবোধের সুপ্রতুল; আশীর্বাদ করি তোমরা সুখে থাক। পরেশ কোথায়?

পরেশ। বাবা, এই যে।

কর্তা। এস, বাবা এস (বামহস্তে পরেশের কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন)। তোমার বৌদিদিকে কখনও অমান্য ক'রো না। উনি তোমাদের ঘরের লক্ষ্মী।

পরেশ। উনি আপনার গুণেই সকলের মান্য, আমিও ওঁকে বোনের মত জ্ঞান করি।

কর্তা। মা লক্ষ্মী, তুমিই আমার বাড়ীর মধ্যে মানুষের মত! তুমি যদিও বয়সে বালিকা, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি প্রবীণার ন্যায়। মা, তোমার হাতেই ইহাদিগকে দিয়া গেলাম। সংসারটা যাতে ছারেখারে না যায় তাই ক'রো। তোমার শাশুড়ী বড় কর্কশ। মা, তোমরা অনেক ক্লেশ পেয়েছ, সহ্য করিয়া থেক, জগদীশ্বর তোমাদিগকে সুখী করিবেন।

গুরুজনের মুখে মা কথাটি শুনিতে কেমন মিষ্ট! এক-একবার মনে হয় কর্তার পুত্রবধূ কেন হইলাম না, তাহা হইলে ত মৃত্যুশয্যায় পবিত্র সুস্নিগ্ধ মা শব্দ কর্ণগোচর হইত। আবার ভাবী পুত্রবধূ ত অনেক আছে, প্রমদার মত পুত্রবধূ হওয়া চাই। ঐটিই শক্ত কথা! অসময়ে গুরুজনের শুশ্রূষা করায় যে কত সুখ, তাহা তাঁহার ন্যায় কুলকন্যারাই জানেন। যাহা হউক, মায়ে পোয়ে এইরূপ আলাপ চলিয়াছে, এমন সময়ে প্রবোধচন্দ্র কবিরাজ লইয়া আসিলেন। প্রমদা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া একটু সরিয়া বসিলেন। কবিরাজ মহাশয় দেখিয়া বাহিরে গেলেন এবং প্রবোধচন্দ্রকে যথাকর্তব্য উপদেশ দিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলা তৃতীয় প্রহর। ভাদ্রের তাল পাকান রৌদ্র; এই রৌদ্রে প্রবোধচন্দ্র ঘুরিয়াছেন। এখনও তাঁহার স্নান আহার হয় নাই। লোকে পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগের পর শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে; আমাদের প্রবোধ পিতৃবিয়োগের পূর্ব হইতেই যেন সেই চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। বিশেষ, অদ্য যেন প্রবোধের মুখে কেহ বিষাদের কালি ঢালিয়া দিয়াছে; নিরাশার ঘন অন্ধকার যেন মুখ-

মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অন্যদিন তিনি দ্রুতপদে আসেন, দ্রুতপদে যান, অদ্য চরণ যেন আর বাড়ীতে আসিতে চায় না। প্রমদা ত অন্তরের কথা সমুদায় জানেন না, তিনি, প্রবোধচন্দ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার জন্য যে সরবত করিয়াছিলেন, তাহা হস্তে লইয়া নিকটে উপস্থিত হইলেন।

প্রমদা। আমার মাথা খাও, এই সরবতটা খাও।

প্রবোধ। থাক্, খাব এখন।

প্রমদা। রৌদ্রে মুখটি যেন কালি হয়ে গেছে, এইটে খাও।

প্রবোধ "আর সরবত খাব কি প্রমদা, বাবাকে এ যাত্রা ফিরাইতে পারিলাম না" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রমদারও নেত্রে জলধারা বহির্গত হইল। দুইজনে কিয়ৎকাল এইরূপ অশ্রুপাত করিলেন।

প্রমদা। (অশ্রুমার্জন করিয়া) কবিরাজ কি বললেন?

প্রবোধ। আর বলবেন কি? আর বড় জোর পাঁচ-সাত দিন।

প্রমদা। তবে তো আর বিলম্ব করা উচিত নয়, দেশে লইয়া আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গঙ্গাবাস করাইতে হইবে। উনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবোধ। আমিও তাই স্থির করেছি, কিন্তু একটু গোলযোগ ঘটেছে।

প্রমদা। কি গোলযোগ?

প্রবোধ। এখন যেতে গেলে অনেকগুলি টাকা চাই। এখানে বাড়ীভাড়া, বাজারের দেনা, দুধের দেনা শুধিয়া যাইতে হইবে। বাড়ী লইয়া যাইতেও খরচ। আমার হাতে আর টাকা নাই।

প্রমদা। তার জন্য এত ভাবনা কেন? আমার গহনা তবে কি জন্য আছে? দেখো, একখানা বিক্রী করো; বিক্রী ক'রে সব দেনা একেবারে পরিষ্কার ক'রে ফেলো; পরিষ্কার ক'রে চলো কর্তাকে নিয়ে যাই, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

প্রবোধ। প্রমদা, তোমার গহনা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা হয় না। তোমার পিতৃদত্ত যৌতুকে তোমাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, আমি দুইশত টাকা ধারের চেষ্টা দেখিতেছি।

প্রমদা। তুমি এমন বোকার মতো কথা বল কেন? এই কষ্টের উপর আবার তুমি দেনার জন্য ধার ক'রে বেড়াবে, সেকি হ'য়ে থাকে। তার পর বিনা সুদে টাকা পাবে না; হয়তো টাকা যোগাড় করতে দেরি হয়ে যাবে। এখন আর একদিন বিলম্ব করা উচিত নয়। তুমি আমার গহনার জন্য ভাব কেন? তুমি বেঁচে থাকো, আমার ঢের গহনা হবে। আর যদি জগদীশ্বর এমন দুরবস্থাতেই ফেলেন, তাতেই বা দুঃখ কি। না হয় কাঁচের চুড়ি প'রে গাছতলায় দুজনে থাকব।

"প্রমদা, তুমি তো এত করিলে, কিন্তু আমার বাবাকে বাঁচাইতে পারিলাম না" বলিয়া প্রবোধ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রমদা। কই, কি করিলাম? আমি যে এমন শ্বশুর আর পাব না।

বলিতে বলিতে নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। অবশেষে প্রমদা বাক্স খুলিয়া একখানি গহনা বাহির করিয়া দিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেখানি বস্ত্রাবৃত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

ওদিকে কর্তামহাশয় জাগরিত হইয়া "মা মা" করিতেছেন। সন্তানের আর্তস্বর শুনিয়া মায়ে কি কখন স্থির থাকিয়াছে? চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধের মাও স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বাক্সটি তুলিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ হইলেন। কর্তামহাশয় জিজ্ঞাসিলেন, "প্রবোধ কি আবার বাহিরে গেল?"

প্রমদা। হাঁ, আপনার বাড়ী যাবার যোগাড় করতে গেলেন।

প্রমদা বিপদে পড়িলেন, কিন্তু তিনি না বলিতেই কর্তা বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "তা

বলতে এত সঙ্কোচ কেন মা, আমি তো পূর্ব হতেই বলছি আমার দিন শেষ হয়েছে। তাতে দুঃখ কি মা, আমার তো সুখের মৃত্যু!"

প্রমদা। আমার প্রাণে একটা বড় দুঃখ রহিল।

এই কথা কয়টি বলিতে প্রমদার শোকাবেগ এরূপ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর বলিতে পারিলেন না। কেবল বসনাঞ্চলে নয়ন মুছিতে লাগিলেন।

কর্তা। বলো, বলো।

প্রমদা। আমার এই দুঃখ রহিল যে, আপনি কষ্টের দিনই দেখলেন, সুখের দিন আর দেখলেন না। আমরা বেঁচেও থাকব, ভালও হবে; কিন্তু আপনার মতো শ্বশুর তো পাব না।

বলিতে বলিতে বাষ্পভরে প্রমদার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

কর্তা। আমি তোমাদের সকলগুলিকে যে রেখে গেলাম, এই আমার পরম সুখ। তুমি সতী সাধ্বী, কাছে এসো, আমার মস্তকে হাত রাখো, প্রার্থনা করো পরকালে আমার সদ্গতি হয়।

এই বলিয়া প্রমদার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া নিজের মস্তকের উপর রাখিলেন এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জলপথে নৌকাতে দুইদিন যাপন করিয়া অদ্য সকলে কর্তাকে লইয়া বাড়ীতে পেঁছিয়াছেন। পথিমধ্যে কর্তার পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। নৌকা ঘাটে পেঁছিবামাত্র প্রবোধচন্দ্র আত্মীয়স্বজনকে সংবাদ দিয়া পিতার গঙ্গাবাসের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মহীধরপুর ও নিশ্চিন্তপুর পাশাপাশি গ্রাম। মহীধরপুর গঙ্গার উপরে, সেখানে গঙ্গাতীরে একটি ঘর লইয়া গঙ্গাবাসের বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে বাড়ীর পরিবার পরিজন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পার্শ্বের এক বাড়ীতে বাসা স্থির করিলেন। সেস্থানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল: শ্যামা আলুলায়িত কেশে পিতার মুখের উপর পড়িয়া "বাবা! ও বাবা! কথা কও, ও বাবা একবার কথা কও," বলিয়া পাগলিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে; কর্ত্রীঠাকুরাণী "ও মা আমার কি হ'লো গো" বলিয়া শিরে করাঘাত করিতেছেন; বধূগণ চারিদিকে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া কাঁদিতেছেন; প্রতিবেশবাসিনী নারীগণ আসিয়া রমণীদিগকে তিরস্কার করিয়া স্থির হইতে বলিতেছেন এবং নাড়ী দেখিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র একজন দেশীয় কবিরাজ সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আর্তনাদ দ্বিগুণ হইল। কর্ত্রী "ও বাপ, কি করিতে গেলি—কি নিয়ে এলি রে?" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অমনি চারিদিক হইতে "চুপ করো, চুপ করো, ওগো, যতক্ষণ আছেন অমঙ্গল করো না" এইরূপ নানাপ্রকার তিরস্কার হইতে লাগিল, ক্রমে বেলা অবসান হইল; প্রতিবেশিগণ শোকার্তচিত্তে 'হায়! হায়!' করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। গৃহিণী ও কন্যাদিগের আর্তস্বর গুনগুন রবে পরিণত হইল। প্রমদা আবার শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আর সেবা করিবেন কার! ঔষধ আর গলাধঃকরণ হয় না; দৃষ্টি আর উন্মীলিত হয় না; কালনিদ্রা আর ভঙ্গে না। ক্রমে রাত্রি প্রহরকাল অতীত হইতে না হইতে শ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। হরিশ গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিলেন এবং সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তীরস্থ করিলেন।

সদাশয় পাঠিকা ক্রন্দন করিও না, সেই সময়কার দৃশ্যটি একবার মনে করো। চট্টোপাধ্যায়ের শরীর যখন তীরে নীত হইল, তখন রমণীগণের হাহাকার-ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল। শ্যামা "ও বাবা, বাবা গো, কোথায় যাও গো!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে চলিল; গৃহিণী শিরে করাঘাত করিয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইলেন। পুত্রবধূরা কে কোথায় পড়িল তাহার ঠিক নাই। প্রমদা এতক্ষণ ধৈর্যাবলম্বন করিয়াছিলেন,

এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বসনাঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র পাগলের ন্যায় "বাবা বাবা" করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রবোধ অতি শান্ত-প্রকৃতি, তিনি অধোবদনে বসিয়া কেবল বসন-প্রান্তে অশ্রুমার্জন করিতে লাগিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিজনগণের আর্তনাদে প্রতিবেশী সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। অন্য কেহ হইলে তাহারা সে গভীর রাত্রে শয্যা পরিত্যাগ করিত না; কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি দেশশুদ্ধ লোকের প্রগাঢ় ভক্তি, সুতরাং আবালবৃদ্ধ সকলেই ছুটিয়া আসিল। এমনকি, কুলের কুলবধূ পর্যন্ত ক্রোড়স্থ শিশু ফেলিয়া শোকার্ত পরিবারের সান্ত্বনার্থ আসিল। আজ তাঁহার জন্য শত শত চক্ষে জলধারা বহিতেছে। দুঃখের বিষয় চাটুয্যে মহাশয় ইহার কিছুই দেখিলেন না! অবশেষে প্রাচীন গৃহিণীগণ শোকার্ত পরিবারের সান্ত্বনা ও পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে শ্যামা পথে বসিয়া কাঁদিতেছে, কেহ তাহাকে ধরিয়া আনিতেছেন; কেহ কর্ত্রীঠাকুরাণীকে তুলিয়া মুখে জল দিতেছেন; কেহ বধূদিগকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা করিতেছেন; কেহ প্রমদাকে মিষ্ট ভাষায় বুঝাইতেছেন! কেহ বা হরিশের পুত্রকন্যাদিগকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। আহা! তাহারা আজ নিরাশ্রয় হইয়া কাঁদিতেছে।

ক্রমে বধূদিগের আর্তনাদ থামিয়া গেল; শ্যামার এবং গৃহিণীর আর্তনাদ আর থামিল না। প্রতিবেশিগণ আবার সকলে 'হায়! হায়!' করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রবোধচন্দ্র এক স্থানে অনেকক্ষণ জড়ের ন্যায় বসিয়াছিলেন, অবশেষে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। কালরাত্রি ক্রমে প্রভাত হইয়া গেল; পশুপক্ষী আবার জাগিল! বন-কুঞ্জ আনন্দ-কোলাহলে আবার পূর্ণ হইল; প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব কার্যে আবার নিযুক্ত হইল; কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী আজ ঝটিকাবসানে উদ্যানের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া রহিল। আজ সূর্য সেই ভবনে আলোক না আনিয়া যেন অন্ধকার আনয়ন করিল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্তার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে প্রবোধচন্দ্র পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার মস্তকে অপার ভাবনা। সমুদায় পরিবারটি প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে। এদিকে তাঁহার পরীক্ষা সম্মুখে, স্কলারশিপের দরুন যে কয়েকটি টাকা পান, তাহাতে তাঁহার নিজের খরচই ভাল করিয়া চলে না। বাটীতে এখন মাসে মাসে অন্ততঃ ২০।২৫টি টাকা না দিলে কোনক্রমেই কুলায় না। কয়েক মাসের জন্য কলেজটি ছাড়িতে ইচ্ছা করে না! যদি লোকের বাটী ছেলেপড়ানো কর্ম গ্রহণ করেন, তদ্দারা আয়ের কিছু সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু পাঠের সমূহ ক্ষতি। কি করেন, ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না।

ওদিকে প্রমদাও সুস্থির নয়। কর্তার মৃত্যুদিন হইতে সংসারে বিশৃঙ্খলা বাধিয়াছে। গৃহিণী কর্তার ভয়ে বধূদিগকে বিশেষ উৎপীড়ন করিতে পারিতেন না, এক্ষণে সে ভয় চলিয়া যাওয়াতে তিনি দিন দিন অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছেন। হরসুন্দরী পূর্বাপেক্ষা অনেক মুখরা হইয়াছেন। হরিশ মনে মনে বরাবর মাতার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এক্ষণে কথায় কথায় তাঁহার অপমান আরম্ভ করিয়াছেন। পরিবার শুদ্ধ লোকে অনাহারে থাকিলে তিনি দেখেন না। নিজের অর্থে নিজের পুত্রকন্যার দুধের রোজ করিয়া দিয়াছেন। নিজের স্ত্রীপুত্রের কাপড়-চোপড় কিনিয়া দিতেছেন। পরেশ কর্তার মৃত্যুর পর দিন দিন আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে; সর্বদাই বাড়িতে বসিয়া থাকে এবং ইয়ারকি দিয়া বেড়ায়। শ্বশ্রূঠাকুরাণী পূর্বাবধিই তৃতীয়া বধূর প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন। এক্ষণে তাহার দিকে হইয়া নিরন্তর অপর সকলের সহিত কলহ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্র এক মাস কর্জ করিয়া ২৫ টাকা মাতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, প্রমদা তাহা গোপনে জানিতে পারিয়া আরও চিন্তিত হইয়াছেন।

অদ্য প্রবোধ তাঁহার পত্র পাইয়াছেন, তাহা এই :—

"প্রিয়তমেষু,

তোমার শ্রীচরণাশীর্বাদে এ দাসী ভাল আছে। কিন্তু এখানকার সমুদায় বিশৃঙ্খলা। শুনিলাম, তুমি বাড়ীর খরচের জন্য কর্জ করিতেছ। আমি দেখিতেছি তুমি দেনায় জড়াইয়া পড়িতেছ। আমাকে যে এ সকল কথা জানাও নাই, সেজন্য আমি মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি। আমি কি কখনও তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া উপেক্ষা করিয়াছি? তবে কোন্ অপরাধে আমাকে আজ নিজ চিন্তার ভার দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ? সেখানে যে চিন্তায় তোমার শরীর মন জীর্ণ হইবে, আর আমি সুখে নিদ্রা যাইব, আমাকে কোন্ অপরাধে এমন শাস্তি দিতেছ? তুমি কি জান না যে, তোমার একটি দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্য লক্ষ টাকা আমার কাছে টাকা নয়? তুমি কি জান না, তোমার মুখ একটু বিষণ্ণ দেখিলে আমার প্রাণে নিতান্ত ক্লেশ হয়? তবে কোন্ অপরাধে আজ দাসীকে হৃদয়ের বাহির করিয়া দিতেছ? লোকমুখে শুনিলাম, কলেজ ছাড়িবার ইচ্ছা করিতেছ। এমন কাজ করিও না; পরীক্ষার এই কয়টা মাস যো-শো করিয়া চালাইতে হইবে। কোন ছেলে পড়াইবার কাজও জুটাইও না, তাহাতে পড়াশুনার ক্ষতি হইবে। তোমার প্রমদাকে এই কয় মাস তোমার হইয়া সংসার চালাইবার ভার দাও। আমি আজ বাবাকে পত্র লিখিলাম, আমাকে মাসে যে দশটাকা দেন, তাহা একেবারে তোমার কাছে পাঠাইবেন। সেই দশ টাকা তুমি লইয়া এখানে পাঠাইবে। আমি দিতে গেলে মা অপমান বোধ করিবেন বলিয়া তোমার হাত দিয়া পাঠাইতে বলিতেছি। এই দশ টাকা, এবং এই লোকের হস্তে আমার গলার চিকগাছি পাঠাইতেছি, বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে, তাহা হইতে প্রতি মাসে পনের টাকা করিয়া পাঠাইবে; এই পঁচিশ টাকা হইলেই আমাদের চলিয়া যাইবে। তুমি ভাবিও না; আমার মাথা খাও, চিকগাছি ফিরাইয়া দিও না। তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন ওরূপ কত চিক হবে। আর আমার চিকেই বা প্রয়োজন কি? তুমিই আমার চিক, তুমিই আমার মহামূল্য ভূষণ। পত্র লিখিতে এত বিলম্ব কর কেন? আমার একদিন যায়—না এক বৎসর যায়। শীঘ্র পত্রের উত্তর দিও।

তোমারই প্রমদা।"

প্রবোধচন্দ্র প্রমদার পত্র পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রমদাকে নিজের কষ্ট জানান নাই, সেজন্য তখন মনে মনে লজ্জা হইতে লাগিল। কিন্তু প্রমদার প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাঁহার প্রাণ চায় না। তাঁহার এক-একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, কলেজ ছাড়িয়া কোন কাজকর্ম আরম্ভ করেন, আবার সে ইচ্ছা নিবারণ করেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া প্রমদার পরামর্শানুসারে কার্য করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন।

প্রমদার পরামর্শানুসারে কার্য চলিল বটে, কিন্তু কাচের গ্লাসটি ভাঙ্গিলে যেমন আর তাকে যোড়া যায় না, সেইরূপ মৃত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহের ভগ্ন সুখ আর প্রতিষ্ঠিত হইল না। কলিকাতা হইতে টাকা আসিতে লাগিল; সংসারে গ্রাসাচ্ছাদনও চলিল; কিন্তু সে অন্ন আর কাহারও উদরে যায় না। বউএ বউএ বিবাদ, ভাইএ ভাইএ বিবাদ। হরিশ মাতার অত্যাচার আর সহ্য করেন না; আর জননীর কথায় রুষ্ট হইয়া হরসুন্দরীর নিরপরাধ অঙ্গে প্রহার করেন না; হরসুন্দরীর ন্যায় তিনি মাতাকে দশ কথা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। হরসুন্দরীর তো কথাই নাই, তিনিই পূর্বাবধিই কুপিতা ফণিনীর ন্যায় স্পর্শ করিবামাত্র ফোঁস করিয়া উঠিতেন, এখন আরও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছেন। মাঝে মাঝে শাশুড়ীর নাসিকাগ্রের নিকট বলয়যুক্ত হাতখানি নাড়িয়া অনেক কথা শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহিণীর এক-একদিন রাগে সমস্ত দিন অনাহারে যায়; কখনও কখনও রাগ করিয়া পরেশের প্রথম-কন্যাটিকে কোলে করিয়া (কারণ তাহার আর-একটি কন্যা জন্মিয়াছে) আত্মীয় গৃহস্থের বাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরেশ পূর্বের ন্যায় আর হরসুন্দরীকে অপমান করিতে পারে না। ইতিমধ্যে সেইজন্য ভাইএ ভাইএ একদিন হাতাহাতি পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সে হরিশের প্রহারে ও মাতার গালাগালিতে আবার রাগ করিয়া কাজকর্ম দেখিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু কোথায় গিয়াছে কেহ জানেন না। শ্যামা এবং সেজবউ একটি ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া প্রমদাকে কথায় কথায় অপমান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে প্রমদা তাহাতে ঘৃতাহুতি দেন না বলিয়া সে অগ্নি বড় জ্বলিতে পায় না। কর্তা মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সুতরাং তিনি এখন প্রাণপণে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। যিনি বাপমায়ের আদুরে মেয়ে ছিলেন, যাঁহাকে একটি সামান্য অপমানের কথা বলিলে দুই চক্ষে ডবডব করিয়া জল আসিত, এখন তাঁহার মানাপমানের দিকে দৃষ্টি নাই। তিনি একবার শ্বশ্রূর পায়ে ধরেন, একবার হরসুন্দরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, একবার শ্যামার হাতে ধরিয়া মাপ চান, একবার সেজবউকে গোপনে ডাকিয়া তাঁহার নিকট অশ্রুপাত করেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হয় না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাঙ্গা ঘর আর যোড়া লাগে না।

প্রবোধচন্দ্র গৃহের এত ব্যাপার কিছুই জানেন না। তিনি মাসে মাসে টাকাগুলি পাঠাইয়া দেন, বাড়ী হইতে প্রমদার চিঠিপত্র পাইয়া থাকেন; কিন্তু পাছে তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয়, পাছে তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত হয়, এইজন্য প্রমদা তাঁহাকে এ সকলের কিছুই বলেন না। কত ক্লেশে যে তাঁহার উদরে অন্ন যায়, তাহার আভাস কিছুই দেন না।

যাহা হউক, প্রবোধের পরীক্ষার দিন অবসান হইয়া গেল। অন্য সময়ে তিনি পরীক্ষান্তে একেবারে বাড়ীতে যাইতেন। কিন্তু এবার তাঁহার এক ভাবনা যাইতে না যাইতে দ্বিতীয় ভাবনা উপস্থিত। এখন তিনি উপার্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। প্রমদা তাঁহাকে বার বার বাড়ী যাইতে লিখিতেছেন, কিন্তু তিনি যাই-যাই করিয়া বিলম্ব করিতেছেন; এবং ক্রমাগত শিক্ষা-বিভাগের কর্তাদের আফিসে যাতায়াত করিতেছেন। একদিন দেশ হইতে একজন চাষা লোক প্রমদার একখানি পত্র লইয়া কলিকাতার বাসায় উপস্থিত। প্রবোধচন্দ্র সেখানে নাই। বাসার লোকে বলিল তিনি চারিদিন অদর্শন আছেন এবং তাহারা তাঁহার কোন সংবাদ জানে না। লোকটি দেশের লোকের দশ-পাঁচটি বাসায় অন্বেষণ করিল, কোথাও উদ্দেশ পাইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রবোধের হঠাৎ শহর পরিত্যাগ করার পর দুই-তিন মাস গত হইয়াছে। তিনি একটি কর্মের সূচনা পাইয়া কোন কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হঠাৎ শহর ত্যাগ করেন। আসিয়াই কর্ম পান, কিন্তু বাটিতে যাইবার সময় আর পান নাই, কেবল কলিকাতাতে দুইদিনের জন্য যাইতে পারিয়াছিলেন। প্রমদাকে পত্রদ্বারা সমুদায় বিবরণ অবগত করিয়া দুইদিন পরেই শহর ত্যাগ করিয়াছেন এবং বর্ধমান জেলার কোন গ্রামে একটি হেডমাস্টারি কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনেও নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরেশ কোথায় গিয়াছে, এখন তাহার উদ্দেশ নাই। হরিশ্চন্দ্র মাতার সহিত বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়াছেন। প্রমদাও সে গৃহে নাই। প্রসবকাল সন্নিকট হইতে তিনি পিতাকর্তৃক পিত্রালয়ে নীত হইয়াছেন। বোধহয়, প্রবোধচন্দ্রের পরামর্শানুসারেই এই কার্য হইয়া থাকিবে। কারণ প্রমদার ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে চিঠিপত্র চলিয়াছিল।

প্রমদার পিতার নাম গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার ট্রেজারিতে একটি ভারী কর্ম করেন; বেতন গত বৎসর ৩০০ টাকা ছিল; এ বৎসর ৪০০ টাকা হইয়াছে। তাঁহার সন্তানসন্ততির মধ্যে একমাত্র পুত্র ও একমাত্র কন্যা। পুত্রটি প্রবোধচন্দ্রের সমবয়স্ক;

তিনি এক বৎসর হইল কলেজ ছাড়িয়া উকীলের বাড়ী কর্ম করিতেছেন। উপেন্দ্রনাথের দুইটি তিনটি পুত্রকন্যা।

প্রমদা একে আদুরে মেয়ে, তাহাতে আবার ত্বরায় সন্তানের মুখ দর্শন করিবেন, মাতা-পিতার আর আনন্দের সীমা নাই। আমাদের প্রমদা আলস্যকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, সুতরাং মাতা পরিশ্রম করিতে বার বার নিষেধ করিলেও তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। পিতা বাড়ীতে আসিলে তাঁহাকে ব্যজন করা, তাঁহার অন্নব্যঞ্জন বহন করা প্রভৃতি কার্য তিনিই করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন দাদার পুত্রকন্যাগুলির পরিচর্যাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যে মধ্যে প্রমদাকে ধরিয়া, দাড়িতে হাত দিয়া বলিয়া থাকেন, "মা লক্ষ্মী! তোমাকে কি খাটাবার জন্য বাড়ীতে আনিয়াছি? বাপের বাড়ীতে কি খাটতে আছে? আমার খাটবার লোকের অপ্রতুল কি? তুমি পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে থাকবে আর খাবে।" বাস্তবিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাটিকে বড়ই ভালবাসেন। কেবল কন্যাটিকে কেন, উপেন্দ্রের ছোট ছোট ছেলেগুলি পর্যন্ত তাঁহার গলার হার। তিনি বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র তাহারা, তাঁহার সঙ্গ লয়; তাঁহার সঙ্গে স্নান, তাঁহার সঙ্গে আহার, তাঁহার সঙ্গে নিদ্রা। আহার করিতে বসিবার সময় যদি কোন কারণে তাহারা কাছে না থাকে, তাঁহার আহার হয় না। তাহারা যে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে এটি ওটি তুলিয়া লইবে, বামহস্তে মৎস্যের লেজটি ধরিয়া দুধের বাটীতে ফেলিবে, ভাজাখানি তুলিয়া জলের গ্লাসে ডুবাইবে, ইহা না হইলে তাঁহার খাওয়া মঞ্জুর নয়। এমনকি উপেন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটি পর্যন্ত পাতের কাছে থাকা চাই; আঙ্গুলে করিয়া একটু একটু কিছু তাহার মুখে দিবেন, এবং সে নবোদ্গত চারিটি দন্তে হাসিবে এবং দন্তবিহীন মাঢ়ী দ্বারা সেই দ্রব্যটুকু একবার এদিক ওদিক করিবে, ইহা দেখিতেও পরম আনন্দ। প্রমদার মাতাঠাকুরাণী এজন্য কখনও কখনও বিরক্ত হন, এবং এক-একবার বলপূর্বক তাহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যান। ছেলে এবং বিড়াল কি সহজে পাতের নিকট হইতে যায়? তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেলেই তাহারা 'দাদা দাদা' করিয়া কাঁদে এবং কর্তা মহা অসুখী হন ও গৃহিণীর সহিত এই কারণে বিবাদ হয়। বাস্তবিক গৃহিণীর চটিবারই কথা, কখনও কখনও রাত্রে নিদ্রিত শিশুকে জাগাইয়া পাতের নিকট বসানো হইয়া থাকে। প্রমদা হাস্য করিয়া বলেন, "বাবা, তোমার খাওয়াই হলো না।" তাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "তুমি আগে মা হও, তার পর এরূপ খাওয়ার সুখ বুঝবে।"

ফল কথা, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারটির মতো সুখী পরিবার প্রায় দেখা যায় না। এমন শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব সংসার দুর্লভ। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় কন্যা নাই বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী পুত্রবধূটিকে কন্যার ন্যায় ভালবাসেন, কখনও একটি উচ্চ কথা বলেন না। আর বউটি এরূপ লক্ষ্মী যে, উচ্চ কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না। বধূটি প্রমদার সমবয়স্কা, সুতরাং দুজনে বড় প্রণয়। প্রমদা পিত্রালয়ে আসা অবধি যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, সর্বদাই সহাস্যবদন, দুইজনে সর্বদাই একত্র আহার, বিহার, একত্র শয়ন প্রভৃতি হইয়া থাকে।

প্রমদা পিত্রালয়ে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির আদর ও ভালবাসার মধ্যে বাস করিতেছেন। শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর অবধি দুর্ভাবনা, অনাহার প্রভৃতিতে তাঁহার অঙ্গে যে কালি পড়িয়াছিল, সে কালি আর নাই। তাঁহার শরীরের কান্তি দ্বিগুণ সুন্দর হইয়াছে। তাঁহার অসুখের কারণ আর কিছুই নাই, কেবল প্রবোধচন্দ্রকে অনেকদিন দেখেন নাই এই ক্লেশ; এবং মধ্যে মধ্যে প্রবোধের পত্রে বাড়ীর গোলযোগের সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্ন হইতে হয়। এইরূপে প্রমদার দিন কাটিয়া যাইতেছে; ক্রমে যথাসময়ে এক সুকুমারী তাঁহার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিল। হিন্দুকুলে কন্যা জন্মিলে গৃহস্থের মুখ মলিন হয়, কিন্তু প্রমদার পিতামাতার মুখ মলিন হইল না, তাঁহাদের সে ভাব ছিল না। প্রমদার প্রথমজাত সন্তানকে তাঁহারা পুত্রাধিক জ্ঞান করিয়া

আনন্দ করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্র সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সাতদিনের ছুটি লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিলেন এবং সূতিকাগৃহে গিয়া প্রমদার ক্রোড়ে শয়ানা নবকুমারীকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রমদা পিত্রালয়ে কিয়ৎকাল সুখে বাস করিয়া বামার বিবাহের সময় আবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন। তিনি বামাকে বড় ভালবাসিতেন, বহুদিন মনে মনে সংকল্প করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাহার বিবাহের সময় তিনি তাহাকে ভাল ভাল কয়েকখানি অলঙ্কার দিবেন, কিন্তু সে আশা চরিতার্থ করিতে পারেন নাই। প্রবোধচন্দ্র যে কয়েক টাকা বেতন পান, তাহা হইতেই নিজের ও প্রকাশের ব্যয় চালাইতে হয়, পিতার ঋণ শুধিতে হয়, সুতরাং বামার বিবাহ অতি সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, ওদিকে প্রবোধচন্দ্র অলস নন। তিনি পর বৎসরে শীতকালেই আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন। বিধি যেন তাঁহার অনুকূল। তাঁহার ন্যায় অনেক উকীল পাঁচ-সাত বৎসর আদালতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ ডাকিয়া কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। তাঁহারা কেবল নিত্য নিত্য জামাযোড়া পরিয়া আদালতে গমন করেন এবং তীর্থের কাকের ন্যায় মক্কেলের পথে চাহিয়া থাকেন; কখনও বা কোন পুস্তকের দুই পংক্তি পড়িয়া, কখন কখন বা ঠাকুর-বাড়ীর ঘরপোষা জামাইয়ের ন্যায় মুখোমুখি বসিয়া আমোদ-কৌতুক করিয়া, কখনও বা নিরপরাধ ভদ্রলোক ও ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের প্রতি অযথা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া দিন কাটাইয়া আসেন। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন। তিনি আদালতে প্রবেশ করিবার পর দুই-এক মাসের মধ্যে পসার হইয়া গিয়াছে। এমনকি তিনমাসের মধ্যে তিনি ৪০০।৫০০ টাকা আনিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্রের আয় একপ্রকার বাঁধিয়া গেলে, তিনি প্রণয়িনীকে নিকটে আনিবার সংকল্প করিয়াছেন। তদনুসারে ভবানীপুরে এক সুন্দর বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে; খাট পালঙ্ক চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ক্রীত হইয়া আসিয়াছে; দাস-দাসী নিযুক্ত হইয়াছে; নানাবিধ দ্রব্যে ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে; এবং বাড়ীটি ধৌত ও পরিষ্কৃত হইয়া ঝকঝক করিতেছে।

অদ্য গৃহের কর্ত্রী নবগৃহে আসিতেছেন। বাড়ীর দ্বারে আসিয়া গাড়ী লাগিল। প্রকাশ সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন; একজন পশ্চিমে বেহারা জিনিসপত্র নামাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, দাসীটি নবাগত স্বামিনীর অভ্যর্থনার্থ অন্তঃপুরের দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে; প্রমদা প্রকাশকে দেখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে গাড়ী হইতে নামিলেন। প্রকাশচন্দ্র খুকীকে প্রমদার কোল হইতে লইয়া কপোলে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। কি সুন্দর মেয়ে! দেখিলে শত্রুরও কোলে করিতে ইচ্ছা হয়। প্রমদা প্রথমে হাসিতে হাসিতে ও দেবরের সহিত কথা কহিতে কহিতে বাহিরের ঘরগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে কোথায় কি বসিবে, কোথায় কি থাকিবে, তাহা স্থির করিয়া ফেলিলেন; টেবিল ওদিকে বসিয়াছে কেন? খাটখানি এদিকে পাতিয়াছ কেন? প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদের রুচির অনেক দোষ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। প্রবোধচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "এইবারে সব ঠিক হবে।" ক্রমে কর্ত্রী অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি বেহারা অবনতমস্তকে সেলাম করিল; দাসী কুটনা কুটিতে কুটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; পাচক ব্রাহ্মণ হাঁড়ি ফেলিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। আমাদের প্রমদা যেন আজ রাজ্যেশ্বরী রাণী। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র রাজ্যের তিনিই মহারাণী। ক্রমে শয়ন-ঘর, ভোজন-ঘর, বিশ্রাম-ঘর, ভাঁড়ার-ঘর, রান্না-ঘর প্রভৃতি এক এক করিয়া সমুদায় দেখিলেন এবং বাড়ীটি তাঁহার মনের মত হইয়াছে বলিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে স্নানের সময় উপস্থিত হইল, পশ্চিমে ভৃত্য খোদাই কর্ত্রীর জন্য জলের ভার বহনে

করিয়া আনিল, দাসী স্নানার্থ তৈল আনয়ন করিল, খুকী ওদিকে কাকা-বাবুর কোলে কোলে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম দশ মাস; সবে বসিতে শিখিয়াছেন। প্রকাশ তাঁহাকে বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর বসাইয়া দিয়াছেন, তিনি সেইখানে বসিয়া হস্তস্থিত রবারনির্মিতটির সংগে ক্রীড়া করিতেছেন, কখনও তাহাকে বদন-ব্যাদানপূর্বক গ্রাস করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এবং সে কার্যে অসমর্থ হইয়া তাহাকে লালারস সংযুক্ত করিতেছেন, কখনও বা তক্তপোষের গায়ে ঠুকিতেছেন, কখনও বা কাকার হস্তে রাখিয়া আবার তুলিয়া লইতেছেন, কখনও বা মুখে দিতে নাকে দিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইতেছেন।

প্রবোধচন্দ্র নূতন সংসার পাতিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণে কিঞ্চিৎ ক্লেশ থাকিয়া গেল। গৃহের সমুদায় পরিবারকে ফেলিয়া একা প্রমদাকে আনা ভাল দেখায় না, এইজন্য হরিশ্চন্দ্রের পরিবার ভিন্ন তার সকলকে আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া অবধি বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহাতে অমত করেন। প্রবোধ সে বিষয়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া অবশেষে ছোটবউ এবং বামাকে প্রমদার সহিত আনিবার ইচ্ছা করেন, কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহাতে সম্মত হন নাই। আহা! বামার প্রাণ মেজবউ-এর সংগে আসিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু প্রবোধ মাতাকে বিরক্ত করা সংগত বোধ করিলেন না; মাতা-ঠাকুরাণী প্রমদাকে যে বিদায় দিয়াছিলেন, তাহাও ভাল মনে দেন নাই; সেই কারণে প্রবোধচন্দ্র কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইয়াছেন। যাহা হউক, কালে আর সে ক্লেশ থাকিল না। পরিবার-পরিজন সংগে আসিলেন না বলিয়া যে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ত্রুটী হইতে লাগিল তাহা নহে। প্রবোধচন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণসকল বাড়ীর পরিজনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। এমনকি, যে হরিশ্চন্দ্র পূর্বাবধি পৃথক্ হইয়াছিলেন, তাঁহারও স্ত্রীপুত্রের জন্য মাসিক কুড়ি টাকা নিরূপিত হইল। ধন সুপাত্রে পড়িলে অনেকের সুখের কারণ হয়, প্রবোধচন্দ্রের ধনের দ্বারাও অপরাপর বহুসংখ্যক দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্র এইরূপে গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রমদা নূতন সংসারে ব্রতী হওয়ার পর মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল, ক্রমেই গৃহের শ্রীসৌন্দর্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তিনি শ্বশুরালয়ে গুরুজনের ভয়ে সম্পূর্ণরূপে নিজের রুচি অনুসারে ঘর সাজাইতে পারিতেন না; এবং তদনুরূপ সংগতিও ছিল না। একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার কত অখ্যাতি! এক্ষণে বিধাতার কৃপায় অর্থের অনটন চলিয়া গেল, এবং গুরুজনের গঞ্জনা বা লোকের বিদ্রূপেরও ভয় নাই; সুতরাং তাঁহার হৃদয়-নিহিত বহুদিনের বাসনা ও রুচিসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে পাঁচটি বড় ও তিনটি ছোট ঘর। একটি শয়নাগার, একটি পাঠাগার, একটি বিশ্রামাগার রূপে নিযুক্ত হইয়াছে, চতুর্থটিতে বসনভূষণ রাখিবার ভাঁড়ার হইয়াছে; পঞ্চমটি বসিয়া আহারাদি করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। ছোট তিনটির একটি স্নানের ঘর, একটি ভাঁড়ার ও অপরটি পাকের ঘর হইয়াছে। প্রমদার রুচি যেমন পরিষ্কৃত, সৌভাগ্যক্রমে ভিতর ও বাহির বাড়ীর উঠানে অনেক জমি পড়িয়াছিল। সেই দুই ভূমিখণ্ড কিছুদিনের মধ্যেই বিচিত্রশোভা ধারণ করিয়াছে। প্রমদা সেই উভয় স্থানকে সুরম্য উপবনে পরিণত করিয়াছেন। সেজন্য একজন স্বতন্ত্র লোকই আছে। চারিধারে পুষ্পরাজি, মধ্যে মধ্যে শাকের সময় শাক, মূলার সময় মূলা, কপির সময় কপি প্রভৃতিও দুই-একটা দেওয়া হইয়া থাকে। বাড়ীতে প্রবেশ করিলে উঠানটি দেখিলেই সুখ হয়; ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেও যেন দুই দণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করে! তাহার মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা নাই; নিরর্থক বৃথা ব্যয় নাই; সমাগত ব্যক্তিদিগকে ধনগৌরব দেখাইবার উপযোগী কিছু নাই; কিন্তু যেটির যেখানে থাকা উচিত, সেটি সেখানে আছে। এমন একখানি

কাপড় নাই, যাহা পরিপাটীপূর্বক রাখা হয় নাই; এমন একখানি পুস্তক নাই, যাহা সাজাইয়া রাখা হয় নাই; দোয়াতের পাশে কলমটি, কলমের পাশে পেন্সিলটি, পেন্সিলের পাশে কাগজগুলি। যখন যেটির প্রয়োজন হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, সেজন্য অর্ধদণ্ড অন্বেষণ করিতে হয় না। কোন্ জিনিসটি বাড়ীতে আছে না আছে বলিতে অর্ধদণ্ড বিলম্ব হয় না। অনেক গৃহে দেখা যায় যে, একখানি বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে, আছে কি না জানিবার জন্য তিনটি দেরাজ, দুইটি সিন্দুক, তিনটি পেটরা খুলিয়া নীচের কাপড় উপরে, উপরের কাপড় নীচে করিতে হয়; একখানি পুস্তকের প্রয়োজন হইলে দশ দণ্ড ধরিয়া তিনজনকে একবার শয্যার নীচে, একবার আলমারির পার্শ্বে পরিত্যক্ত কাগজপত্রের মধ্যে, একবার স্তূপাকার ছিন্ন পুস্তকের তলে, এইরূপ করিয়া অন্বেষণ করিতে হয়। ডাক্তার মহাশয়ের রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিবার সময় কাগজ আনো, কাগজ আনো, কাগজ যদি আসিল—কলম কলম কলম, কলম যদি যুটিল, দোয়াত দোয়াত করিয়া দুই-পাঁচজনকে ব্যস্ত হইতে হয়। প্রমদা এরূপ বন্দোবস্তের নিতান্ত বিরোধী। বিরোধী হইবার সম্পূর্ণ কারণ আছে। নিতান্ত প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় বস্তুটি পাইতেছি না, ক্রমশঃই মন বিরক্ত হইতেছে, এবং সেটির অভাবে দুই দণ্ডের কাজে দশ দণ্ড বৃথা যাইতেছে, এইরূপ অবস্থায় যাঁহারা একবার পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এরূপ বিশৃঙ্খলার বিরোধী হইবেন। কিন্তু এ বিষয়ে বাল্যকালের অভ্যাস প্রবল থাকে। আমরা অনেক সময় নিজেদের প্রতি বিরক্ত হই, বিশৃঙ্খলার ভাব দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করি,—কিন্তু অভ্যাস-দোষে যে বিশৃঙ্খল সেই বিশৃঙ্খল থাকিয়া যায়। প্রমদার রুচি যে এ বিষয়ে উন্নত, তাহাও পিতামাতার গুণে; বাল্যকাল হইতে পিতামাতার এদিকে দৃষ্টি থাকাতে এগুলি তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল।

বামা ও ছোটবউ প্রমদার সহিত আসেন নাই, সেজন্য প্রমদার পরিবার অল্প নহে। দাসী দুইজন, চাকর দুইজন, পাচক ব্রাহ্মণ একজন, এতদ্ভিন্ন বাহিরের অনেকগুলি লোক প্রতি-পালিত হইতেছেন। দাসী দুইটির একটি লীলাবতীর (কন্যাটিকে এই নামে ডাকা হয়) রক্ষণা-বেক্ষণে নিযুক্ত; অপরটি পাকশালার কার্যে ব্যাপৃত। চাকর দুইটির একজন এদেশীয়, সে বাগানের তত্ত্বাবধান করে; এবং অপরটি পশ্চিমদেশীয়, নাম খোদাই, সে হাটবাজার জল-বহন কার্য করিয়া থাকে। অপর পরিবারের মধ্যে—লীলা এখন চলিতে শিখিয়াছেন। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া খোদাইয়ের ক্রোড়ে বা নিজ দাসীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া থাকেন, এবং কখনও হয় একটি ফুল, না হয় একটি খেলনা, না হয় একটি ফল হাতে করিয়া ঘরে আসেন। লীলা যার বাড়ী যায় সেই তাহাকে কোলে করে; পাড়ার কুলাঙ্গনারা কেহ কোলে করেন, কেহ মুখচুম্বন করেন, কেহ রূপগুণের প্রশংসা করেন, কেহ কিছু আহার করিতে দেন। লীলার সমাদরের সীমা-পরিসীমা নাই। পাঠিকা পূর্বে যে ঝুমঝুমির বিবরণ পড়িয়াছেন, লীলা সে ঝুমঝুমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঘরই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে। তবে চৌকাঠটি পার হইবার সময় ধরিয়া পার হইতে হয় এবং না তুলিয়া দিলে চেয়ারখানি অথবা খাটখানির উপর উঠিতে পারেন না। তাঁহার নধর কোমরে সোনার কোমরপাটা নিমফলের মে কি শোভা হইয়াছে, তা আর বলিব কি? লীলা এখন আর একপ্রকার খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি অনেকগুলি হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের চক্ষে সেগুলি কাষ্ঠ-নির্মিত। লীলা এখন সেগুলির পরিচর্যাতেই সর্বদা ব্যস্ত। এমনকি, নিজের স্নান-আহারের সময় হইয়া উঠা ভার। তাঁহাকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া দুধ পান করাইতে হয়। তিনি একখানি পাতলা ডুরে কাপড় পরিয়া এককোণে বসিয়া কখনও সেই কাষ্ঠনির্মিত সন্তানগুলিকে স্তন্যপান [illegible], কখনও ঘুম পাড়াইতেছেন, কখনও চোখ রাঙ্গাইতেছেন, কখনও নিজ জননীর কোলে শয়ন করাইয়া রাখিয়া যাইতেছেন। এইরূপ নির্জীব পদার্থের সেবাতেই তাঁহাকে রত থাকিতে হইত। কিছুদিন হইল একটি সজীব পদার্থ জুটিয়াছে। তিনি কোন প্রতিবেশীর

বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া একটি মার্জার-শিশু আনয়ন করিয়াছেন। সেইটিকে হয় স্কন্ধে, না হয় কুক্ষিতলে করিয়া সর্বদাই এঘর ওঘর ঘুরিয়া থাকেন। সেইটিকে স্কন্ধে করিয়া চৌকাঠ পার হওয়া তাঁহার পক্ষে একটি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার, বোধহয় কেহ অস্বীকার করিবেন না, সুতরাং তাঁহার স্নেহের গভীরতাতেও কেহ অবিশ্বাস করিবেন না।

পাক-শাকের ভার না থাকাতে প্রমদার কখন অবসরের অপ্রতুল নাই এবং সেই সময়ের কিরূপ সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও তিনি জানেন। পূর্বাবধিই তাঁহার লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল; শ্বশুরগৃহে থাকিয়াও তিনি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না, নানাপ্রকার উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও তিনি লিখিতে পড়িতে ত্রুটি করিতেন না। সম্প্রতি সেসব ভয় আর নাই, সুতরাং তিনি অবাধে পড়াশুনা আরম্ভ করিয়াছেন, মিশনারি সাহেবদিগের একজন মেমও তাঁহার ভবনে গতায়াত করিয়া থাকেন। প্রবোধচন্দ্রের বাড়ীর পার্শ্বে আর একজন উকীলের বাসা। তাঁহার নাম যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একটি ছোট দ্বার দিয়া উভয় বাড়ীতে গতায়াত করা যায়। এ বাড়ীতে আসা অবধি যোগেশচন্দ্রের মাতা ও সহধর্মিণীর সহিত প্রমদার বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছে। বিশেষ যোগেশবাবুর পত্নী তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন, তাঁহাকে নিজ ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিয়া ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রমদা সেই বধূটিকে নিত্য পড়াইয়া থাকেন।

প্রবোধচন্দ্রের দিন এইরূপ সুখে কাটিয়া যাইতেছে, আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ঋণগুলি সমুদায় শোধ হইয়াছে; দুই-একখানি করিয়া প্রমদার অলঙ্কারগুলি আবার হইয়াছে; বাড়ীতে রীতিমত অর্থাদি যাওয়াতে সেখানেও পরিজনগণ সুখে বাস করিতেছেন। একদিন প্রবোধচন্দ্র কাছারী হইতে আসিয়া আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রি চারি-ছয় দণ্ড অতীত হইয়াছে। লীলা এতক্ষণ প্রদীপের আলোকে নিজের ছায়া দেখিয়া, এবং মার্জার-শিশুটিকে খাটের নীচে হইতে টেবিলের তলে, টেবিলের তল হইতে আলমারির পার্শ্বে, আলমারির পার্শ্ব হইতে পিঁড়িখানির অন্তরালে তাড়া করিয়া বেড়াইতেছিল, এইমাত্র সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দাসদাসীগণ পাকশালার দিকে আহারাদি ও গল্পগাছা করিতেছে। প্রতিবেশীদের ভবনে বালকেরা কোলাহল করিয়া ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ সকল মুখস্থ করিতেছে। প্রবোধচন্দ্র একখানি বড় চেয়ারে অর্ধশয়নভাবে বসিয়া গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছেন এবং প্রমদা কিছু দূরে টেবিলের নিকট বসিয়া একখানি নবপ্রকাশিত গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছেন। এমন সময় বাহির বাড়ীতে "মেজদাদা কি বাড়ীতে আছেন?" এই রব শ্রুত হইল। অনুমানে বোধ হইল, তাহা প্রকাশচন্দ্রের স্বর। প্রকাশ মেডিকেল কলেজে পড়েন, ভবানীপুরে থাকিয়া অনেক দূর হয় বলিয়া, তিনি কলিকাতাতেই থাকেন। অদ্য তাঁহার আসিবার কোন কথা ছিল না, সুতরাং প্রবোধ ও প্রমদা উভয়েই তাঁহার স্বর শুনিবামাত্র গৃহের বাহিরে আসিলেন।

প্রবোধ। কে রে? প্রকাশ?

প্রকাশ। হাঁ দাদা। (নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন)

প্রবোধ। রাত্রে কেন?

প্রকাশ। বড় বিপদ ঘটেছে।

প্রবোধ। সে কি!

প্রকাশ। সেজদাদা কয়েদ হয়েছেন।

প্রবোধ। সে কি! সে কোথায় আছে?

প্রকাশ। বেরিলিতে, আপনার নামে এই তারে খবর এসেছে।

প্রবোধ। আমার নামে, তুই পেলি কোথায়?

প্রকাশ। আপনি কোথায় আছেন না জানার জন্যই বোধ হয় সেজদাদার একজন বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছেন।

প্রবোধ। কে পাঠিয়েছেন?

প্রকাশ। চিনি না।

প্রবোধচন্দ্র দীপালোকে পাঠ করিবার জন্য ঘরের ভিতরে গেলেন, প্রমদা প্রকাশকে আরও নানা প্রশ্ন করিতে করিতে গৃহের মধ্যে আসিলেন। তারের সংবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ বিবরণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সংবাদদাতার নাম গঙ্গাচরণ বক্সি। সে ব্যক্তি কে? পরেশ কি অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার কিছুই জানিবার উপায় নেই। কেবল এই কয়টি কথা লিখিত আছে—

"পরেশ কারাগারে, বড় বিপদ্, শীঘ্র আসুন।"

ব্যাপারটা কি? এক-এক জন এক-এক প্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকলি বৃথা। পরদিন অতি প্রত্যুষে দুই ভাই-এ বেরিলি যাত্রা করা স্থির হইল। পরেশ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর অবধি প্রবোধচন্দ্র অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, অনেককে চিঠিপত্র লিখিয়াছেন; যে পশ্চিম হইতে আসিত, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন; কিন্তু কেহই কোনও সন্ধান বলিয়া দিতে পারিত না। এখন বুঝিলেন, পরেশ আত্মীয়স্বজন যে পথে আছে, সে পথে যায় নাই। প্রবোধচন্দ্র ভায়ার চরিত্রের জন্য বরাবর দুঃখিত; এখন আবার দারুণ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল।

প্রকাশচন্দ্রের আহার হয় নাই, প্রমদা তৎক্ষণাৎ তাহার আহারের ব্যবস্থায় নিযুক্ত হইলেন। বলিলেন, "ঠাকুরপো! এস, আমি তোমার জন্য লুচি কয়খানা ভাজিয়া ফেলি, তুমি রান্না-ঘরের দোরে বসিয়া গল্প করিবে এসো।"

প্রকাশ। কেন বউদিদি? বামুন তো আছে।

প্রমদা। তাতে দোষ কি। আমি তো আর ননীর পুতুল নই। বামুন ভাল পারবে না।

দুই দেওর-ভাজে পাকশালায় গমন করিলেন। প্রকাশচন্দ্র দ্বারে বসিয়া নানাপ্রকার কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন। প্রমদা দেখিতে দেখিতে লুচি-তরকারী প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন, এবং পাতের নিকট বসিয়া আহার করাইলেন। আহারান্তে নিজ হস্তে পার্শ্বের ঘরে দেবরের অতি উত্তম শয্যা করিয়া দিলেন। প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "বউদিদি! তুমি ব্যস্ত হও কেন, আমি তো আর কুটুম্ব নই।" প্রমদা তো সকলকেই ভালবাসেন; বিশেষ প্রকাশ সৎ বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ ভালবাসা আছে।

রজনী প্রভাত না হইতে হইতে প্রকাশ জাগরিত হইয়া প্রবোধ ও প্রমদাকে জাগরিত করিলেন। দাসদাসী সকলে জাগিল। তাড়াতাড়ি গমনের আয়োজন হইতে লাগিল। প্রবোধ তাড়াতাড়ি গমনের আয়োজন করিতে লাগিল। প্রবোধ তাড়াতাড়ি কাছারীর কাজের বন্দোবস্ত করিলেন; তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইলেন। তাড়াতাড়ি লোকের উপর লোক গাড়ী আনিতে ছুটিল; তাড়াতাড়ি কিছু আহার করিয়া লওয়া হইল। এই গোলমালে লীলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে এতক্ষণ স্বপ্নে হয়তো কাষ্ঠের পুতুলের পরিচর্যা করিতেছিল অথবা বিড়ালের ছানাটির অনুসরণ করিতেছিল; কিংবা কোন কামিনীর হস্তের ফুলটি চাহিতেছিল; নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, সে সকলের কিছুই নহে, সকলেই ব্যস্ত। লীলা জাগিবামাত্র প্রকাশ তাহাকে কোলে তুলিয়া দুই কপোলে দুইটি চুম্বন করিলেন। সে বলে "এ কে?" তাহার ঘুমের ঘোর তখনও ভাঙ্গে নাই। প্রমদা হাসিয়া বলিলেন, "ও যে কাকা-বাবু!" ক্রমে ত্বরা বাড়িয়া গেল; কাপড়ের গাঁঠরি-গুলি গাড়ীর উপর উঠিতে লাগিল; খোদাই সমভিব্যাহারী হইবার জন্য প্রস্তুত হইল; প্রবোধ-চন্দ্র প্রমদার বাক্স খুলিয়া ৫০০ টাকার নোট সঙ্গে লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে প্রমদার প্রতি উপদেশের মধ্যে দাসদাসীদের প্রতি দুই-চারি কথা, এইরূপ আদেশ-উপদেশ গমন ও পশ্চাদ্দর্শন মিশাইয়া গৃহের যথাকথঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। প্রমদা লীলাকে কোলে

করিয়া বাড়ীর ভিতর-দ্বার পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। প্রকাশচন্দ্র লীলার মুখে পুনরায় চুম্বন করিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন, খোদাই স্বামিনীকে অভিবাদনপূর্বক গাড়ীর পশ্চাতে উঠিল। তাঁহারা যাত্রা করিলেন। প্রমদা বিষণ্ণমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ওদিকে প্রবোধচন্দ্র ও প্রকাশ পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছেন, এদিকে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। তাঁহাদের পশ্চিমে যাত্রার দুই দিন পরেই বাড়ী হইতে হরিশ্চন্দ্রের পত্র লইয়া লোক সমাগত। প্রমদা পত্র খুলিয়া দেখেন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সংকট পীড়া। তিনি ফুলিয়া পড়িয়াছেন, উদর-ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার উপর জ্বর। দেশে ভাল ডাক্তার বা কবিরাজ নাই, প্রতিবেশীরা সকলে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। প্রমদা অপার ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া যে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আনে কে? ডাক্তার কবিরাজ ডাকে কে? ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করে কে? এইসকল ভাবিয়া আকুল হইলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে যে আনানো কর্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না, কিন্তু কিরূপে সমুদায় যোগাযোগ হয়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশের একটি বন্ধুর কথা মনে পড়িল। ইঁহার নাম হরিতারণ। এই যুবাপুরুষটি বড় সচ্চরিত্র বলিয়া প্রবোধচন্দ্র তাঁহাকে বড় ভালবাসেন; তাঁহার কলেজের বেতনাদি দিয়া থাকেন, এবং প্রকাশের পরম বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে সর্বদা নিমন্ত্রণাদিও করিয়া থাকেন। সেই সূত্রে প্রমদারও তাঁহার সহিত বেশ পরিচয় হইয়াছে এবং তিনিও তাঁহাকে দেবরের ন্যায় দেখিয়া থাকেন। এই যুবক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। যাহা হউক, প্রমদা তাঁহাকে ডাকাইয়া এই বিপদের সময় সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতেই ভাশুর মহাশয়কে মাতাকে লইয়া সপরিবারে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন এবং ভৃত্যের দ্বারা হরিতারণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হরিতারণ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদা বলিলেন, "দেখুন, আমি আপনাকে দেবরতুল্য জ্ঞান করি; সুতরাং এই বিপদের সময় আপনাকে সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়াছি; যদি তাঁহারা কেহ থাকিতেন, আপনাকে কষ্ট দিতাম না।"

হরি। আমিও আপনাকে বড়ভাজের ন্যায় দেখি। আপনি যদি আমাকে 'আপনি' না বলিয়া প্রকাশকে যেমন 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করেন, সেইরূপ 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাতে আমি অধিক সুখী হইতাম। তাঁহারা এখানে কেহ নাই, সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই; আমি ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিব, আমি কবিরাজ আনিব, আমি ঔষধাদির যোগাড় করিব; সেজন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

প্রমদা নিশ্চিন্ত হইলেন। চারি-পাঁচ দিনের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্র মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামা, বামা, সেজবউ, ছোটবউ সঙ্গে আসিয়াছে, হরসুন্দরী আসেন নাই। প্রমদা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতায় থাকা বড়কর্তার অভিপ্রায় নয়। এজন্য তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইল; কিন্তু মনের ক্লেশ নিবারণ করিয়া তিনি গৃহিণীকে পানসি হইতে তুলিয়া ঘরে আনিলেন। শ্যামা, বামা, সেজবউ, ছোটবউ প্রভৃতিকে পরমসমাদরে আর-এক ঘরে লইয়া বসাইলেন, এবং পরেশের কন্যা দুটির মুখচুম্বন করিয়া পরিচর্যার্থে দাসীদিগকে আদেশ করিলেন। লীলা ঘরে একা একা খেলা করিত, 'এরা আবার কে' বলিয়া একটু জড়সড় হইয়াছিল, কিন্তু বালকের প্রণয় অর্ধদণ্ডেই। সে পিসীদের কোল হইতে কাকীদের কোলে ক্ষণকাল বিচরণের পর নামিয়াই পরেশের কন্যাদের সহিত যুটিয়া গিয়াছে। আধ আধ বকিয়া এঘর ওঘর বেড়াইতেছে, কাষ্ঠের পুতুলগুলি বাহির করিতেছে, ভগিনীদিগকে এটি ওটি দেখাইতেছে।

বাহির-বাড়ীতে বাবুদের পরামর্শ হইয়া কবিরাজ দেখানোই স্থির হইল; তদনুসারে হরিতারণ একজন সুযোগ্য কবিরাজ ডাকিয়া আনিলেন। চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল, ঔষধপত্র

আসিল, সেবাশুশ্রূষাও চলিল। হরিশ্চন্দ্র দুইদিন পরেই ঘরে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, তিনি বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পারেন নাই, কাজকর্মও ফেলিয়া আসিয়াছেন, না গেলেই নয়। প্রমদা কি করেন, নিরুত্তর রহিলেন। হরিশ্চন্দ্র মাতাকে একাকিনী ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

শুনিতে পরিবারে অনেক লোক আছেন বটে, কিন্তু প্রমদা ও হরিতারণ ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা বিশেষ সাহায্য হয় না। প্রমদা সর্বদা শ্বশ্রূর নিকটে বসিয়া থাকেন, দণ্ডে দণ্ডে জল, বেদানা প্রভৃতি দেন, কখন কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা লক্ষ্য করেন। হরিতারণ দিনের বেলায় একবার কলেজ যান এবং অবসর হইলেই আসিয়া রোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হন। প্রমদার পরিচয়ে হরিতারণ দুই দিনের মধ্যেই শামা বামা প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইলেন এবং পুত্রাধিক যত্নের সহিত কর্ত্রীঠাকুরাণীর সেবা করিতে লাগিলেন।

প্রমদা দিন-রাত্রি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পার্শ্বে থাকেন বটে, কিন্তু সেখানে বসিয়াই সকল দিক রক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে হরিতারণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২০০ টাকা কর্জ করিয়াছেন। সেখানে বসিয়া বসিয়াই একজন নূতন চাকরাণী ঠিক করিয়াছেন; দুধের বন্দোবস্ত হইয়াছে; সকলের এক-এক জোড়া নূতন কাপড় আসিয়াছে; কোন দিকে কোন অসুবিধা বা অপ্রতুল নাই। শ্যামা, বামা, সেজবউ, ছোটবউ-এর কর্ত্রীর সেবা করিতে আসা নামমাত্র, তাহারা শহরে নূতন পদার্পণ করিয়াছে, সুতরাং শহর দেখিবার উৎসাহেই সর্বদা ব্যস্ত; দ্বার দিয়া কোন দ্রব্য ডাকিয়া যাইবার যো নাই, অমনি বামা ছুটিয়া গিয়া ডাকিয়া আনে এবং আজ বেলারি চুড়ী, কাল কাচের বাটী, পরশু মুক্তার মালা, তৎপরদিন খুকীদের জন্য কাচের খেলনা এইরূপে প্রত্যহই কিছু না কিছু দ্রব্য ক্রয় হইতেছে। পাছে পয়সা চাহিতে হয়, এইজন্য প্রমদা শ্যামা ও সেজবউ-এর হাতে পাঁচ টাকা, এবং বামা ও ছোটবউ-এর হাতে তিন টাকা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা রিপু-কর্মটী পর্যন্ত খাইবার দ্রব্য মনে করিয়া ডাকিতেছেন।

প্রমদার গৃহ ইতিপূর্বে নীরব থাকিত। লীলা মধ্যে মধ্যে নিজের কাষ্ঠনির্মিত সন্তান-দিগকে নিজের ভাষায় যে তিরস্কার করিত কিংবা দৈবাৎ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে রোদন করিত, তদ্ভিন্ন কোন শব্দ শ্রুত হইত না। এখন পরেশের দুই কন্যা ও লীলা, তিনজনে বাড়ী কোলাহল-ময় করিয়া তুলিয়াছে। গৃহিণীর পীড়ার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই; মাতাদিগের শহর দেখিবার ঔৎসুক্যের সহিতও তাহাদের কোন বিষয়ে যোগ নাই; তাহারা ঘণ্টার মধ্যে দশবার বিবাদ, দশবার নালিশ ও প্রণয় করিতেছে; কেমন সকল মহামূল্য সামগ্রীর জন্য বিবাদ! হয় একগাছি ভাঙ্গা চুড়ি, না হয় একটু ছেঁড়া সুতা, না হয় একটি পাখীর পালক! এই সকল লইয়া সর্বদাই মারামারি। পরেশের ছোট কন্যাটি দংশনকার্যে বড় পটু। এক-একবার লীলাকে কামড়াইয়া কাঁদাইয়া দিতেছে। প্রমদা আসিয়া সকলের মুখচুম্বন করিয়া হাতে কিছু কিছু খাবার দিয়া দাসীর কোলে পাঠাইয়া দিতেছেন।

একদিন প্রমদা ননদ ও যা-দিগকে শহর দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। হরিতারণ গাড়ির বাহিরে বসিয়া গেলেন। হরিতারণ গাড়িতে উঠিবার সময় প্রায় সমগ্র দ্বার বন্ধ করিয়া একটু খুলিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে আদেশ করাই বৃথা। তবে তাঁহারা শহর দেখিবেন কি! আর তাঁহারাই যদি সে আদেশ পালন করিতে পারিতেন, পরেশের কন্যা দুইটি শুনিবে কেন? যতবার দ্বার টানা হয়, তাহারা খুলিয়া দেয় এবং দেখিবার পথে ব্যাঘাত আরম্ভ করে। তাঁহারা শহর দেখিতে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু উত্তম শহর দেখিতেছেন। "কত গাড়ি দেখ, কত মিঠাই দেখ, কেমন কলা টাঙাইয়া রাখিয়াছে দেখ" এই বলিতে বলিতে এবং একবার এধারে একবার ওধারে মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে চলিয়াছেন; হরিতারণ উপর হইতে বলিতেছেন, "এই গড়ের মাঠ।" মহিলারা গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দে তাঁহার কথা শুনিতে না পাইয়া কেহ বা গাধা-গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, "ও বুঝি ঘোড়ার ছানা!" হরিতারণ বলিতেছেন,

"ওই জেলখানা।" ভিতর হইতে একজন বলিতেছেন, "ও ভাই। জল খাবার কথা কি বলছে?" আর একজন একটি হাড়গিলা দেখিয়া বলিয়া উঠিতেছেন, "ও বাবা। ও কি পাখী? আ মরণ আর কি, পাখীর ঢং দেখ!" হরিতারণ উপর হইতে বলিতেছেন, "ওইটে যাদুঘর।" একজন আভাস মাত্র শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "যাদু কাকে বলছে রে ভাই?" অমনি অপর একজন বলিয়া উঠিতেছেন, "দেখ্ দেখ্ আমাদের পুঁটির মত একটা মেয়ে—ও কাদের মেয়ে রে ভাই?" ইতিমধ্যে এক-একবার এক-একজন সাহেবকে দেখিয়া কেহ শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "ও ভাই। ওই বুঝি গোরা রে ভাই!" অমনি সেদিকের দ্বার বন্ধ করা হইতেছে। হরিতারণ কেল্লাতে প্রবেশ করিবার পূর্বে একবার নামিলেন এবং গাড়ীর দ্বারের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এখন কেল্লার ভিতর যাইব, আপনারা এত গোল করিবেন না। সাহেব-সান্ত্রী আছে দেখিয়া ভয় পাইবেন না।" রমণীদিগের মনে আরও ভয়ের সঞ্চার হইল। "এই যে ঐ যে" গিয়া ফুস্‌ফুস্ ধ্বনি ও গা টেপাটিপি আরম্ভ হইল। প্রবেশের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সেই সঙ্গিন বন্দুকবিশিষ্ট ইংরেজ-প্রহরী দর্শন, অমনি ঝনাৎ করিয়া দ্বার বন্ধ। পরেশের কন্যারা শুনিবে কেন, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সেজবউ প্রথমে তাহাদের গা টিপিলেন, কানে কানে বলিলেন, "বাপরে! গোরা ধরে নেবে।" তাহাতে নিরস্ত না হওয়াতে বিরক্ত হইয়া অন্তর্টিপুনী দিতে আরম্ভ করিলেন। শিশুদের রব দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তখন হরিতারণ আবার অবতরণ করিয়া বলিলেন, "এখানে দোর খুলিয়া দেখিতে পারেন, ছেলেরা কাঁদে কেন?" দ্বার খুলিবা-মাত্র বালকদিগের ক্রন্দনধ্বনি নিরস্ত হইল। হরিতারণ সেখানে দাঁড়াইয়া কামান ও গোলাগুলি দেখাইয়া দিলেন এবং তাহাদের কার্য কিরূপ, তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া রমণী-দিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

কেল্লা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে গেলেন। হরিতারণ নামিয়া জাহাজ দেখাইলেন। অপর একজন বলিলেন, "বাবা! কত নৌকা দেখ।" গঙ্গাতীর হইতে ফিরিবার সময় বড়-সাহেবের বাড়ী ও মনুমেণ্ট দেখাইয়া আনা হইল। রঙ্গিণীরা কল কল করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং অর্ধদণ্ডের মধ্যে কেহ কলার কাঁদির বিবরণ, কেহ হাড়গিলা পক্ষীর বৃত্তান্ত, কেহ পুঁটির মত মেয়েটার কথা প্রভৃতি যাঁহার যা বলিবার ছিল, বলিয়া ফেলিলেন। প্রমদা কন্যা দুইটিকে কোলে লইয়া মুখচুম্বনপূর্বক তাহারা কি কি দেখিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা কি দেখিয়াছিল এবং কি বর্ণন করিল, কিছুই বোঝা গেল না। যাহারা বলিবার সময় ব্যাকরণ মানে না, কর্তা-ক্রিয়ার বিচার করে না, দুইটা কথা বলিয়া তিনটা পেটের মধ্যে রাখিয়া দেয়, যাহাদের এক অক্ষর বলিতে আর এক অক্ষর বাহির হইয়া যায়, তাহাদের শব্দসকলের ভাব গ্রহণ করা পিতামাতার চিরাভ্যস্ত ও স্নেহানুরঞ্জিত কর্ণ ভিন্ন মহা-টীকাকর্তারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

রঙ্গিণীরা শহর দেখিবার আনন্দে আছেন, কিন্তু প্রমদার অহোরাত্রের মধ্যে বিশ্রাম নাই বলিলেই হয়; গৃহিণী ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। চিকিৎসা বা পথ্যাদির কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, শহরের সর্বোৎকৃষ্ট কবিরাজেরা দেখিতেছেন, কিছুতেই কোন ফল দর্শিতেছে না। অন্যান্য পীড়া হইলে আশু ভয়ের কারণ থাকিত, কিন্তু এ পীড়াতে কিছু অধিক দিন ভুগিতে হইবে। কর্ত্রীঠাকুরাণী পূর্বাবধিই প্রমদার প্রতি বড় প্রসন্ন নন, কলিকাতায় আসিতে কোনক্রমেই সম্মত হন নাই। অবশেষে তাঁহাকে বলপূর্বক আনা হইয়াছে। একে কর্ত্রীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ উগ্র, তাহাতে রোগে পড়িয়া দশগুণ অসহিষ্ণু হইয়াছেন। সর্বদাই খিট্ খিট্ করেন। ক্ষীণস্বরে কি বলেন, মুখের নিকট কর্ণ না দিলে কেহ বুঝিতে পারে না; অথচ মনের মত কাজটি না হইলে বিরক্ত হন এবং শিরে করাঘাত করিয়া ভাগ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন। এই কারণে প্রমদা ভিন্ন আর সকলেই তাঁহার প্রতি এক প্রকার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি, শ্যামাও এক একবার "তবে মরো গে" বলিয়া চলিয়া যায়। প্রমদা অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, সুতরাং কর্ত্রী

কখন কি বলেন, তাহা তিনি অনেক বুঝিতে পারেন, এবং তদনুরূপ কার্য করেন। শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী কখনও কখনও প্রীত হইয়া বলেন, "ভাগ্যে তুমি মানুষের মেয়ে ছিলে, ওদের হাতে পড়লে এতদিন আমার প্রাণটা যেত।" প্রমদা অহোরাত্র সতর্ক হইয়া শ্বশ্রূর সেবা করিতেছেন; সপ্তাহ গেল, দশ দিন গেল, প্রবোধচন্দ্রের দেখা নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ওদিকে প্রবোধচন্দ্রেরা দুই ভেয়ে বেরিলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পেঁছিতে রাত্রি প্রায় প্রহরকাল অতীত হইল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে বিদেশ। মুটেদিগের কথানুসারে প্রথমে এক বাঙালীর দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অনেক ডাকাডাকির পর দ্বার খুলিল; কিন্তু গঙ্গাচরণ বক্সির বাসার কথা সে ব্যক্তি বলিতে পারিল না। প্রবোধচন্দ্র রাত্রিকালের জন্য আশ্রয় চাহিলেন, তাহারা আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে মুটিয়াদিগের পরামর্শানুসারে পান্থশালাতে গিয়া সে রাত্রি যাপন করা উচিত বলিয়া স্থির হইল। পশ্চিমে পথিকদিগের জন্য অনেকস্থানেই এক একটি পান্থশালা আছে। হয়ত কোন রাজা বা কোন ধনী ব্যক্তি কতকগুলি ঘর নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। যাও, থাক, রন্ধন করিয়া খাও; দুইটি পয়সা দাও, এক রাত্রির জন্য একখানি ভাঙ্গা খাটিয়া পাইবে। কিন্তু জিনিষপত্রের জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। প্রবোধচন্দ্র একে পথশ্রমে ক্লান্ত, তাহাতে দুই তিন দিন আহার হয় নাই বলিলেই হয়। সে রাত্রেও আহারাদির কোন সুবিধা হইল না। দুই ভেয়ে দুইখানি ভাঙ্গা খাটিয়া লইয়া পড়িলেন। খোদাই কিঞ্চিৎ আহারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল, কিন্তু তাঁহারা দুইজনেই কিছু আহার করিতে সম্মত হইলেন না। ত্বরায় উভয়ের নিদ্রা আসিল, খোদাই একবার ব্যাগটির কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রবোধচন্দ্র ঘুমাইতে ঘুমাইতে নিজের গলা হইতে ছোট ব্যাগটি খুলিয়া খোদাইএর নিকট দিলেন; দিয়া সত্বর নিদ্রিত হইলেন। খোদাই বেচারা আর চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিল না, সে স্বীয় প্রভুর দ্রব্যসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইল। প্রবোধচন্দ্রের গায়ে কাপড়-খানি সরিয়া গেলে টানিয়া দেয়, মুখটি খুলিয়া গেলে চাপা দিয়া দেয়, এইরূপ করিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিল। খোদাই যে কিরূপ মায়ের মত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, প্রবোধচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে ভ্রাতৃদ্বয় গাত্রোত্থান করিলেন; মুখাদি ধৌত করিলেন, বোচ্কা বুচ্কী আবার বাঁধা হইল, এইবার গঙ্গাচরণ বক্সির বাসাতে যাইতে হইবে। প্রবোধচন্দ্র পান্থশালার তত্ত্বাবধায়কদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য খোদাইয়ের নিকট হইতে ছোট চামড়ার ব্যাগটি চাহিয়া লইলেন। খুলিয়া দেখেন—তাহার মধ্যে টাকার ব্যাগটি নাই। অমনি চক্ষুস্থির। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একবার খোদাইএর মুখের দিকে চাহিলেন, এ পকেটে ও পকেটে হাত দিলেন, কাপড়-চোপড় উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন, কোন স্থানে পাইলেন না। অবশেষে মনে পড়িল যে, পূর্বদিন রাত্রে পান্থশালায় আসিয়া মুটিয়াদিগকে দাম দিবার সময় সেটি বাহির করা হইয়াছিল, তৎপরে বোধহয় আর ভিতরে রাখা হয় নাই। খোদাই সে সময় তত দেখে নাই, বোধহয় মুটিয়াদের একজন লইয়া থাকিবে। পান্থশালার কেহ নিশ্চয় লয় নাই; কারণ খোদাই বরাবর জাগিয়াছিল। সে মুটিয়ার নাম কি এবং বাড়ী কোথায়, তাহা ত জানা নাই। অন্ধকার রাত্রে একবার দেখিয়া দিনের বেলা চিনিয়া লওয়া ভার। কি করেন, ৫০০ টাকার নোটও তাহার মধ্যে। সে চিন্তা যাক্, এখন পান্থশালার লোকদিগের বিদায় করেন কিরূপে? অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশচন্দ্রের পকেট হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির হইল, তদ্দারা তাহাদিগকে বিদায় করা হইল।

তাঁহারা গঙ্গাচরণ বক্সির উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন, কিন্তু সেই পাড়ায় আসিয়া শুনিলেন, সে ব্যক্তি পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইবার ভয়ে পলাতক হইয়াছে। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহা-দিগকে বিপন্ন দেখিয়া আশ্রয় দিলেন। প্রবোধচন্দ্র বসিয়া তাঁহার নিকট টাকা চুরির কথা

বলিতেছেন এবং পরেশের সবিশেষ সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইত্যবসরে খোদাই আর এক কার্যে ব্যস্ত আছে। সে দেখিল, প্রভুর ঘোর বিপদ্, হাতে একটিও পয়সা নাই; যাহার নাম শুনিয়া আসা হইল, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না; প্রবোধচন্দ্র যেরূপ মানী লোক, অপরিচিত ব্যক্তির নিকট ঋণ করিতে বিশেষ লজ্জিত হইবেন। ইহা ভাবিয়া খোদাই প্রমদার দত্ত গলার মোহরটি বিক্রয় করা স্থির করিল। ইত্যবসরে সেই সন্ধানে বাহির হইয়াছে এবং অল্পকাল মধ্যে ১৪টি টাকা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ ছেলেমানুষ, তার মুখখানি শুকাইয়া যেন তুলসীপাতার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। সে অপার ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া বাহিরে একটি মোড়ার উপর বসিয়া ভাবিতেছে। খোদাই আসিয়া তাঁহার হস্তে ১৪টি টাকা দিল; কিরূপে সে টাকা আনিল, তাহাও বলিল।

প্রবোধচন্দ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকটিকে আপনাদের বিপদের কথা সমুদায় জানাইয়াছেন; আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি আপনা হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ কর্জস্বরূপ দিতে চাহিবেন, কিন্তু তাঁহার ভাব-গতিকে সেরূপ আকার বোধ হইল না, সুতরাং আর সেরূপ প্রার্থনা জানাইতেও সাহসী হইলেন না। পরেশের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া একমাত্র জানিতে পারিলেন যে, সে এক মার-পিটের মোকদ্দমাতে কয়েদ হইয়াছে। পরেশ যে এত দুরাচার হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে প্রবোধচন্দ্রের প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পরেশের অন্বেষণ পরের কথা, এখন টাকা না হইলে এক পা চলাই দুষ্কর, প্রবোধ ঋণ চাই চাই করিয়াও চাহিতে পারিলেন না। বাহিরে প্রকাশের কাছে আসিবামাত্র প্রকাশ টাকাগুলি হাতে দিলেন এবং খোদাইয়ের কার্য বর্ণনা করিলেন। প্রবোধচন্দ্রের একবার ইচ্ছা হইল খোদাইকে কোল দেন, কিন্তু তাহা করিলেন না, কেবল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। টাকাগুলি পাইয়া মনটা অনেক সুস্থির হইল।

প্রবোধচন্দ্র আহারাদির পর পরেশের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং সন্ধ্যার সময় একেবারে তাহার মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল শুদ্ধ লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বিষয়টা এই,—একজন হিন্দুস্থানী গৃহস্থের বাড়ীর পাশে কয়েকজন বাঙ্গালী বাবু আমোদ প্রমোদের জন্য জুটিতেন। তাঁহাদের মাতলামি ও উপদ্রবে সে গৃহস্থের সপরিবারে বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে। এই সূত্রে সে ব্যক্তির সহিত মাতালবাবুদের প্রায় গালাগালি হইত, এমনকি একদিন মারামারি পর্যন্ত হইয়া যায়। বাবুরা প্রতিহিংসার্থে একদিন গৃহস্থের বাটীতে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার করেন। এমনকি তাহার অন্তঃপুরে পর্যন্ত যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কেবল তাহাও নহে, তাহার কতকগুলি দ্রব্যও বলপূর্বক লইয়া আসেন। সে ব্যক্তি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করে। উক্ত গৃহস্থের পরিজনগণ কেবল একজন বাবুকে বিশেষরূপে চিনিয়া বাহির করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু উহারা পরেশকে সর্বদা তাহাদের সঙ্গে দেখিত এবং পূর্বে কয়েকবার যে গালাগালি হয়, তাহাতে পরেশই বাবুদের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিল, সুতরাং সে সন্দেহের উপর পরেশের নাম করে। দুর্ভাগ্যক্রমে পরেশের গৃহ হইতে অপহৃত দ্রব্যের কিছু কিছুও পাওয়া যায়, এই অপরাধে পরেশের মেয়াদ ও জরিমানা এবং জরিমানা না দিলে আরও কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

প্রবোধচন্দ্র দেখিলেন, সামান্য প্রমাণে পরেশের দণ্ড হইয়াছে। সে যে মারামারির সময় উপস্থিত ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ নাই, বরং সে সময়ে তাহার গৃহে থাকার প্রমাণ আছে, এবং অপহৃত দ্রব্য তাহার পাইবার যে কারণ পরেশ বলিয়াছে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত। পরেশ বলিয়াছে যে, উক্ত মারামারিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদিগের একজন সে রাত্রে তাহার বাটীতে আশ্রয় লয়, এবং ঐ দ্রব্য সেই ব্যক্তি ফেলিয়া যায়। তাহার প্রমাণও ছিল, কিন্তু বিচারপতি তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই। দেখিবামাত্র প্রবোধচন্দ্র আপীল করা কর্তব্য স্থির করিলেন।

পরদিন প্রাতে জেলের তত্ত্বাবধায়কের অনুমতিক্রমে পরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া পরেশ অধোবদন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রবোধচন্দ্রের মর্মের মধ্যে কি যাতনা হইয়াছিল তাহা তিনিই জানেন। প্রবোধচন্দ্র জেল হইতে আসিয়াই, আপীল করিবার জন্য এলাহাবাদ যাত্রা স্থির করিলেন। কিন্তু মোকদ্দমাটি চলিতে কতদিন লাগিবে তাহার স্থিরতা নাই। তিনি কার্যের ক্ষতি করিয়া ততদিন থাকিতে পারিবেন না; টাকাকড়ির যোগাড় করিয়া উকীল নিযুক্ত করিয়া প্রকাশকে তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া যাইতে হইবে। টাকা কোথায় পাইবেন? একবার ভাবিলেন প্রমদাকে টাকা পাঠাইতে লিখি। আবার মনে করিলেন, প্রমদাই বা কোথায় পাইবেন। অবশেষে লক্ষ্ণৌনগরে একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর কথা মনে পড়িল। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ কর্জ করা স্থির করিলেন; এ কয়েকদিন তাড়াতাড়িতে তিনি প্রমদাকে পত্র লিখিতে সময় পান নাই; এক্ষণে তাড়াতাড়ি সমুদায় বিপদের সংবাদ দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ-এর বন্ধুটির ঠিকানায় পত্র লিখিতে বলিয়া প্রবোধচন্দ্র সেইদিন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন, এবং লক্ষ্ণৌ হইতে অর্থাদির যোগাড় করিয়া এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে প্রমদার প্রত্যুত্তর-লিপি আসিয়া চারি পাঁচদিন লক্ষ্ণৌএ পড়িয়া আছে। তাঁহার বন্ধু বাড়ীতে না থাকাতে কেহ পাঠায় নাই। প্রবোধের পত্র না পাইবার কারণ এই। প্রমদার পত্র হস্তগত হইলে প্রবোধচন্দ্র মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা অবগত হইলেন। তখন পরেশের মোকদ্দমার দিন স্থির হইয়াছে, তিন চারি দিন পরে হইবার কথা। প্রবোধচন্দ্র সেই কয়দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। দুইজন ভাল উকীল নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিয়া খোদাই এবং প্রকাশচন্দ্রকে রাখিয়া কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রবোধচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া পেঁছিলেন। কর্ত্রীর পীড়া ক্রমেই অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্র বাড়ী আসাতে প্রমদার মৃতদেহে যেন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি এখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্বশ্রূর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। কবিরাজেরা নিরাশ হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে ভবানীপুরে তাঁহাকে গংগাযাত্রা করাই স্থির হইয়াছে। গংগাযাত্রার বন্দোবস্ত হইতেছে। কে কে সংগে থাকিবেন, কে কে রাত্রি জাগরণ করিবেন, তাঁহাদিগের আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, এই সকল আলোচনা হইতেছে। কর্তার যখন পরলোক হয়, তখন যেমন শোকের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল, এখন সেরূপ দেখা যাইতেছে না। প্রবীণগোছের লোকেরা বলিতেছে, বুড়ীর মরিবার বয়স হইয়াছে; আহা পুণ্যবতী, এরূপ বৌ বেটা নাতিপুতি রাখিয়া মরিতে পারিলে তো হয়। শ্যামা একবার মায়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া কাঁদিতেছে, এক-একবার মুখের নিকট আনত হইয়া "মা মা" করিয়া ডাকিতেছে। কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর চৈতন্য নিমীলিত নহে; তিনি হস্ত নাড়িয়া বারণ করিতেছেন। অন্য দুই বধূও শ্যামার রোদনের সহিত যোগ দিয়া ঘোমটার অন্তরালে এক-একবার কাঁদিতেছেন। প্রমদার মুখখানি নিতান্ত মলিন। প্রবোধচন্দ্র মায়ের পার্শ্বে দিনরাত্রি বসিয়া আছেন। কর্ত্রী ক্ষীণস্বরে মধ্যে মধ্যে "বাবা প্রবোধ" বলিয়া ডাকিতেছেন, এবং হয়তো হাতখানি তুলিয়া তাঁহার কোলের উপর দিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র আসিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! গংগাদর্শনে কি ইচ্ছা আছে?" কর্ত্রী হস্তের ইসারা দ্বারা সম্মতি জানাইলেন। অমনি তাঁহাকে গংগাযাত্রা করাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বালকগণ সাজিয়া প্রস্তুত হইলেন; রমণীদিগের জন্য গাড়ী আসিল; হরিশ্চন্দ্র, প্রবোধ ও হরিতারণ পাদুকাবিহীন পদে কোমরে গামছা বাঁধিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; সেজবউ ও প্রমদা কন্যাগুলি ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না; শ্যামা, বামা ও ছোটবউ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রবোধের অন্তঃপুর মধ্যে শ্যামার আর্তনাদ ও বধূদিগের গুনগুনে রোদনধ্বনি উত্থিত হইল। শ্যামা, বামা ও ছোটবউ

কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সকলে গৃহিণীকে বহন করিয়া বাহির হইলেন।

গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া হরিশ্চন্দ্র চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মা! গঙ্গাদর্শন কর।" কর্ত্রী উদ্দেশে কোন প্রকারে নমস্কার করিলেন। তৎপরে একটি ঘর মনোনীত করিয়া তাহাতে শয্যা প্রস্তুত হইল। কর্ত্রীকে পুনরায় শয়ন করাইয়া হরিশ্চন্দ্র, শ্যামা, ছোটবউ ও একজন চাকর সেখানে রহিলেন, প্রবোধচন্দ্র হরিতারণ ও বামাকে লইয়া একখানি গাড়ী করিয়া আহার করিবার জন্য বাড়ীতে আসিলেন এবং তাড়াতাড়ি কয়জনে স্নান আহারাদি সমাপন করিয়া পুনরায় গঙ্গাতীরে গিয়া শ্যামা প্রভৃতিকে আহারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এক দল যান, এক দল আসেন, প্রমদা ও সেজবউ ছেলেদিগকে আহারাদি করাইয়া দাসীর নিকটে দিয়া দুপুরবেলা যান, সমস্ত দিন শ্বশ্রূর নিকট বসিয়া থাকেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন। এইরূপে কর্ত্রীর সেবা চলিল। বৃদ্ধ লোকের প্রাণ যাইতে যাইতেও দশদিন থাকে। গৃহিণী গঙ্গাতীরেই চার-পাঁচ দিন শ্বসিতে লাগিলেন। ফিরাইয়া আনিবার মতো আকার নয়, অথচ হঠাৎ মৃত্যু হইবারও আকার নয়।

পঞ্চম দিন প্রত্যূষে পরেশ এবং প্রকাশ প্রবোধচন্দ্রের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন, প্রমদা পরেশকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া গৃহের বাহির হইলেন, কিন্তু তাঁহারা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। সত্বর জননীর উদ্দেশে গঙ্গাতীরের দিকে ধাবিত হইলেন। প্রবোধও মুখে হাতে একটু জল দিয়া গঙ্গাতীরের দিকে ধাবিত হইলেন। প্রমদা প্রভৃতিও সত্বর গাড়ি করিয়া পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। পরেশ ও প্রকাশ উপস্থিত হইবামাত্র, শ্যামা "সেজদাদা গো! মা আর নাই গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরেশ এবং প্রকাশ উভয়েই অবনত হইয়া "মা মা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। আর মা চক্ষু উন্মীলিত করেন না। হরিশ্চন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "মা! পরেশ ও প্রকাশ আসিয়াছে, দেখো।" জননীর আর সংজ্ঞা নাই, গলদেশে ঘড়ঘড় ধ্বনি দ্রুত হইতেছে, চক্ষে জাল পড়িয়া আসিতেছে; হস্তপদাদি শীতল হইয়া আসিতেছে; ইত্যবসরে প্রবোধচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সময় বুঝিয়া 'ধর ধর' করিয়া চারি ভ্রাতায় গঙ্গাজলে নামাইলেন। গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া দিলেন। অন্যান্য মৃত্যুকালীন আচরণের কিছু ত্রুটি করিলেন না। হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণহস্তে জলগণ্ডূষ লইয়া জননীর মুখে দিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে জননীর কর্ণে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ওদিকে শ্যামা আলুলায়িত কেশে "মা রে! আমাকে কার কাছে রেখে গেলি রে" বলিয়া চীৎকার করিতেছে; বধূরা আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। পরেশের আজ দুঃখের অবধি নাই। সে মায়ের সঙ্গে বিবাদ করিয়া গিয়াছিল। কোথায় আসিয়া পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিবে, আপনার দুর্দশা ও কারাবাসের কথা বলিবে, না, মা একবার চাহিলেন না, একটি কথা বলিলেন না, জন্মের মতো পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। আহা! হতভাগ্য পরেশ আজ কাদার উপর বসিয়া পড়িয়াছে এবং "মা গো! একটা কথা কয়ে যাও গো, মা গো! অধম সন্তানকে মাপ ক'রে যাও গো" বলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছে। কতক্ষণ পরে প্রাণবায়ু জননীর দেহকে পরিত্যাগ করিল। ভ্রাতৃচতুষ্টয় তীরের উপর উঠিয়া আসিলেন এবং দাহাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। হরিতারণ রমণীদিগকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য গাড়িতে তুলিলে, তাঁহারা কোলাহলপূর্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিলেন।

দাহকার্য সমাধা হইল; ভ্রাতৃগণ গৃহে ফিরিলেন; হরিশ্চন্দ্র শ্যামা প্রভৃতিকে কতক বুঝাইয়া, কতক তিরস্কারপূর্বক নিরস্ত করিতে লাগিলেন। এখন শ্রাদ্ধাদির পরামর্শ আরম্ভ হইল। দুইদিন পরেই হরিশ্চন্দ্র ও প্রকাশ শ্যামা প্রভৃতিকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন; প্রবোধ ও পরেশ ক্রয়বিক্রয়াদি করিয়া শেষে যাইবার জন্য কলিকাতায় রহিলেন। বলা বাহুল্য যে, প্রমদাও স্বামীর সঙ্গে যাইবার জন্য থাকিলেন। বামাও মেজবউ-এর সঙ্গিনী হইয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কর্ত্রী'র শ্রাদ্ধাদির পর অনেকদিন গত হইয়াছে। বামা প্রমদার সঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছে। সে হতভাগিনী জননীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বিধবা হইয়াছে। তাহাকে শ্বশুরঘর করিতে হইল না। অন্যান্য পরিবার দেশেই আছে। পরেশ এখন সুমতি হইয়া প্রকাশের সঙ্গে এক বাসাতে আছে। প্রবোধচন্দ্রের দিন আবার পূর্বের ন্যায় সুখে যাইতেছে। তিনি বামার লেখা-পড়া শিখিবার বিশেষ উপায় করিয়া দিয়াছেন। সে দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালা ইংরাজী অনেক শিখিয়া ফেলিয়াছে এবং শিল্পকার্যে বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। লীলা এখন তিন-চার বৎসরের হইয়াছে। আর চৌকাঠটী পার হইতে হইলে দশ জনের সাধ্যসাধনা করিতে হয় না; এখন সে ভিতরবাড়ী, বাহিরবাড়ী, এমনকি প্রতিবেশীদের গৃহ পর্যন্ত গতায়াত করিতে পারে। প্রবোধচন্দ্রের সকল দিকই সুপ্রতুল। আয় বাড়িয়াছে, তিনি একখানি নিজের বাড়ী করিয়াছেন। ভাল ভাল সামগ্রীও অনেক বাড়িয়াছে। তাঁহার আর কোন অসুখ নাই, কেবল বামার বৈধব্যই শেলসমান প্রাণে বিঁধিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে প্রমদার সহিত নির্জনে সেই কথাই হয়। দুই স্ত্রী-পুরুষে যুক্তি করিয়া অবশেষে বামাকে হরিতারণের সহিত বিবাহ দিবার পরামর্শ করিয়াছেন। হরিতারণ তাঁহাদের অপরিচিত লোক নন। বামারও তাঁহার সহিত পূর্বাবধি পরিচয় আছে, সুতরাং হরিতারণ যখন বাড়ীতে আসেন, প্রমদা উভয়ের ভাবগতিক লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হরিতারণের যে বামার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই। বামার ভাব সেরূপ জানিতে পারা যাইতেছে না। প্রমদা বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বামা লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া থাকে, সুতরাং হঠাৎ জানিবার উপায় নাই।

যাহা হউক, তাঁহারা উভয়ে মনে মনে এ প্রকার সংকল্প করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন ঘোর বিপদ উপস্থিত। প্রমদা দিবাভাগে প্রায় নিদ্রা যান না; কিন্তু একদিন দুর্দৈব-বশতঃ প্রমদা আহারান্তে শয়ন করিয়া পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দাসীরা তাঁহার নিকট লীলাকে রাখিয়া স্নানার্থে গিয়াছে। লীলা ঘরের কোণে আপনার মনে হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া খেলিতেছে।

প্রমদা অর্ধঘণ্টার অধিককাল নিদ্রিত ছিলেন না। চকিতের ন্যায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখেন, লীলা ঘরের মধ্যে নাই। 'লীলা লীলা!' বলিয়া ডাকিলেন; আর সে ময়না পাখীটির মতো "উ" করিয়া ডাক শুনিল না। প্রমদা বাহিরে আসিলেন, দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, "লীলা ঘরেই আছে।" এঘর ওঘর দেখিলেন, কোন স্থানে নাই। পরে বাহিরে খোদাই-এর নিকট দেখিতে বলিলেন, সেখানে নাই। ক্রমে অন্তঃপুর মধ্যে "ওমা সে কি গো! ও মা সে কি গো!" শব্দ উত্থিত হইল। দাসীরা আহার করিতে করিতে উঠিল। খোদাই আহার ফেলিয়া ধাবিত হইল। সকল দিক হইতে লোক ফিরিয়া আসিল, কোন দিকে লীলার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তখন জননী অধীর হইয়া উঠিলেন এবং আবার এঘর ওঘর খুঁজিতে এবং 'লীলা লীলা' করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে লীলার বিড়ালটি আর্তনাদ করিতে করিতে একবার খিড়কীর দ্বারের দিকে যাইতেছে, আবার ঘরে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রমদা লক্ষ্য করিয়া দেখেন, দ্বারটি খোলা রহিয়াছে। তখন তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। লীলা যে বিভ্রাট ঘটাইয়াছে, তাহা অনুভব করিতে আর বাকী রহিল না; তৎক্ষণাৎ খিড়কীর দ্বার দিয়া পার্শ্ববর্তী পুষ্করিণীর দিকে ধাবিত হইলেন। বিড়ালটি ডাকিতে ডাকিতে পুকুরের চারি ধারে বেড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রমদা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় কি করেন ভাবিয়া পান না। সকলেই স্ত্রীলোক, কাহারও সাধ্য নাই যে জলে অবতরণ করে। পুরুষেরা কেহ বাড়ীতে নাই, খোদাই তখন লীলার অন্বেষণে বাহিরে ঘুরিতেছে। প্রমদা ও দাসীদের ক্রন্দনে প্রতিবেশী উকীলবাবুর মাতা ও পত্নী ছুটিয়া

আসিয়াছেন এবং তাঁহারাও আসিয়া সেই ক্রন্দনের রোলে যোগ দিয়াছেন। এমন সময় খোদাই আসিয়া উপস্থিত। খোদাইয়ের আর কথাবার্তা নাই, প্রশ্ন নাই, শোকসূচক আর্তনাদ নাই, একেবারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং ডুবের পর ডুব দিয়া লীলার দেহের অন্বেষণ আরম্ভ করিল। কয়েকবারের পর খোদাই একেবারে লীলার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া উঠিল। হায়! হায়! লীলা যে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নব-বিকসিত দন্ত-পংক্তির শোভাতে নয়ন মন হরণ করিয়া বেড়াইত, আজ সেই স্কন্ধে লীলা চড়িল, কিন্তু সে হাসি আর প্রকাশ পাইল না। শরীর উঠিবা-মাত্র প্রথমে আনন্দ-ধ্বনি উঠিল; কিন্তু সে ধ্বনি অচিরাৎ ঘোরতর শোকধ্বনিতে পরিণত হইল।

প্রমদা তনয়ার মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। "লীলা, লীলা" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, একবার হাতখানি নাড়েন, একবার নাসারন্ধ্রে হস্ত দিয়া দেখেন, একবার গলদেশে হস্ত দিয়া স্পর্শ করেন; লীলার চেতনা নাই। অবশেষে অধীর হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিতেছে, "ওগো প্রবোধবাবুর নিকট লোক পাঠাও," কেহ বলিতেছে, "ডাক্তার ডাকো।" এমন সময় প্রবোধচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খোদাই লীলাকে তুলিয়া তাঁহার নিকট গিয়াছিল। প্রবোধ পদার্পণ করিবামাত্র শোকের ধ্বনি চতুর্গুণ হইল; প্রমদা তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রবোধচন্দ্রের আজ আর চলিবার শক্তি নাই; বলিবার শক্তি নাই; একেবারে যেন বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে ডাক্তার আসিল, ঔষধও আসিল, জলও বাহির হইল; কিন্তু লীলার চেতনা হইল না। সে তো আর ক্ষুদ্র দন্তগুলিতে মিষ্ট হাসিয়া 'মা' বলিল না; অন্যদিন পিতা কাছারী হইতে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আধ-আধ ভাষায় কত কি জিজ্ঞাসা করে, আজ তো সংবাদও লইল না; অন্যদিন খোদাইকে কেহ তামাসা করিয়া মারিতে গেলে রোদন করে, আজ সেই খোদাই-এর চক্ষে জলধারা বহিল; লীলা সান্ত্বনা করিল না। ক্রমে লোকে প্রমদার ক্রোড় হইতে মৃত কন্যা বলপূর্বক লইয়া গেল; তিনি গৃহে আসিয়া ধরাশায়িনী হইলেন। তিনি বামার ন্যায় উন্মাদিনী হইলেন না; দাসীদের ন্যায় শিরে করাঘাত করিলেন না; তাঁহার সেই গভীর গুন্‌গুন ধ্বনির পশ্চাতেই প্রবল অন্তর্দাহ রহিল।

উকীলবাবুর মাতা ও পত্নী অদ্য শোকার্ত পরিবারের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। আজ আর কেহই শোক করিতে বাকী রহিল না। রূপী বিড়াল আজ কাঁদিয়া এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল; আর তো লীলাবতী তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইবে না! তাহার কাতরধ্বনিতে দর্শকদিগের চক্ষে অশ্রু বহিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কাল মানবের শোককে অধিক দিন নূতন রাখে না। লীলাবতীর দারুণ শোক প্রবোধচন্দ্রের ও প্রমদার প্রাণে বড় বাজিয়াছিল, কিন্তু শোকের তীব্রতা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তবে লীলাবতী মরা অবধি প্রবোধচন্দ্রের মন যেন কিছু কিছু উদাস হইয়াছে। আর তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যার পর গীতবাদ্যের ধ্বনি শ্রুত হয় না; আর শিক্ষা দিবার জন্য সে বাড়ীতে বিবিদের গতিবিধি নাই, আর তাঁহারা সন্ধ্যার সময় বায়ুসেবনার্থ যান না; আর কাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। প্রমদা লীলাবতীর পুতুলগুলি, ছোট ছোট গাড়িগুলি, ছোট হাঁড়িগুলি, ছোট কাপড়-খানি একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার একটিও কাহাকেও সরাইতে দেন না; মধ্যে মধ্যে সেই ঘরে গিয়া সেইসকল দ্রব্যের মধ্যে এক-একবার শয়ন করিয়া রোদন করেন। প্রবোধ-চন্দ্রের নিজের প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি প্রমদাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত. মধ্যে মধ্যে নানা স্থানে লইয়া যাইতে চান, কিন্তু প্রমদা কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছুক হন না।

যাহা হউক, প্রাণের মধ্যে এই গুরুতর বেদনা থাকিলেও প্রবোধচন্দ্রের গৃহের কার্যসকল পূর্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; লোকজনের যাওয়া আসা, কাজকর্ম পূর্বের ন্যায় চলিতেছে। প্রকাশ-চন্দ্র ও হরিতারণ পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিয়া থাকেন। প্রমদাকে নানাপ্রকার বিনোদন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। দাদা ও বউদিদির শোকের অন্তরালে বামার প্রণয় অল্পে অল্পে বর্ধিত হইতেছে। তিনি মনে মনে হরিতারণের অশেষ সদ্গুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছেন। সেজন্য প্রবোধ, প্রমদা এবং প্রকাশচন্দ্র সকলেই সুখী হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে উক্ত সৎপাত্রগত করিবার সংকল্প আবার তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছে।

কিছুদিন পরে আবার একটি সুসন্তান প্রমদার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিল। কিন্তু এবার প্রসব-সময়ে প্রসূতিকে ভয়ানক ক্লেশ পাইতে হইল। দুই-তিন দিন যাতনা ভোগের পর তিনি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজন, হিতৈষী বন্ধু সকলে পরম আনন্দিত হইলেন; কারণ প্রমদার শোক সকলেরই প্রাণে বাজিয়াছিল। বাদ্যোদ্যম ও আমোদ কোলাহলে দুই-তিন দিন পাড়ার লোকের কান পাতিবার যো রহিল না। কিন্তু হায়! সে সুখ স্থায়ী হইল না। দুই-তিন দিন পরেই নবজাত শিশুর একপ্রকার পীড়ার সঞ্চার হইল, এবং অষ্টাহের মধ্যেই সেই পুষ্পটি বিলীন হইল; আমাদের প্রমদা সূতিকাগারে রোদন করিবেন কি নিজেই গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার চিন্তায় প্রবোধচন্দ্রের আর শোক করিবার অবসর হইল না। তাঁহার পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তিনি সূতিকাগৃহ হইতে শয়নাগারে আনীত হইলেন। যে প্রমদা প্রবোধচন্দ্রের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, যিনি প্রবোধের চিন্তার ভার নিজ মস্তকে লইয়া ছিন্নবস্ত্রা ও অস্থিচর্মসার হইয়াছিলেন, সেই প্রমদার চিকিৎসার সময়। পাঠিকা, আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, চিকিৎসার কিরূপ আয়োজন হইল। একজন ভাল এ দেশীয় ডাক্তার ও একজন ইংরেজ ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের জন্য নিত্য ৪০।৫০ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েকদিন পরেই কাছারী যাওয়া বন্ধ করিলেন। প্রমদা রোগ-যাতনার মধ্যে থাকিয়াও বার বার তাঁহাকে কাছারী যাইবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের হস্তপদ চলে না, তিনি কি করিবেন। প্রমদার পীড়ার সংবাদ পাইয়া প্রকাশ-চন্দ্র বাড়ী আসিলেন। প্রকাশ, বামা, হরিতারণ এবং প্রবোধচন্দ্র এই কয়জনে পালা করিয়া রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। প্রমদা রোগযন্ত্রণার দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন; যাতনার আধিক্যবশতঃ এক-একবার মূর্চ্ছিত হইতেছেন; কিন্তু তাহার ভিতর হইতেই সর্বদা পরিবারস্থ সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। কখনও বা প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণকে নিদ্রা যাইবার জন্য উঠিয়া যাইতে বলিতেছেন, এমন কি, দাসীগুলির ক্লেশ হইতেছে কি না, তাহারও সংবাদ লইতেছেন।

আজ আমাদের প্রমদা পীড়িতা; তাঁর সেবা করিবার লোকের অপ্রতুল কি? তাঁহার বন্ধু নয়, তাঁহার গুণে বাধ্য নয়, এমন কে আছে? উকীল-মাতা ও উকীল-পত্নী সর্বদাই তাঁহাদের ঘরে উপবিষ্টা, নামমাত্র এক একবার আহার করিতে যান। রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে প্রমদার মুখশ্রী বিকৃত নয়। এমন সহিষ্ণুতা আর ত কখনও দেখি নাই! তিনি তাহারই ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে উকীলবাবুর পত্নীকে কত মিষ্ট কথা বলিতেছেন এবং তাঁহার মাতাকে মাতৃ-সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেছেন। দাসীগুলির হাত পা আর কাজে উঠে না! বাবুরা সর্বদাই মাঠাকুরুণকে ঘেরিয়া আছেন, তাহারা নিকটে আসিতে পারে না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে ও জানলার কাছে দাঁড়াইতেছে এবং তাহাদের চক্ষে জলধারা বহিতেছে। প্রমদার দৃষ্টি যখনই তাহাদের দিকে পড়িতেছে, তখনই ডাকিয়া মিষ্ট বচনে রোদন করিতে নিষেধ করিতেছেন। প্রিয় খোদাই কি এখন সুস্থির আছে? সে যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে; কেবল ঔষধ ও বরফ আনয়ন করিতেছে, ডাক্তার ডাকিতেছে, মাতাঠাকুরাণীর পথ্যাদির আয়োজন করিয়া দিতেছে। তাঁহার শয়ন-ঘরে যাইতে ত আর সাহস হয় না। লীলাবতীর মৃত্যু অবধি খোদাই যে কৃশ হইতে আরম্ভ

হইয়াছে, এখন তাহাকে অর্ধসার বলিলেও হয়। তাহার গলার শিরাগুলি আর গলাতে পরে না; লীলাবতীকে লইয়া যে খাটে শুইত, আর সে খাটে শয়ন করে না; এখন খোদাই ধরাশায়ী হইয়াছে। খোদাই নিকটে আসিতে সাহসী নয়, কিন্তু প্রমদা যখন একটু নির্জন পান, তখন খোদাইকে ডাকাইয়া "আহার করেছ কি না", "কাল রাত্রে ঘুমায়েছ কি না", এইসকল প্রশ্ন করেন। খোদাই আর চক্ষে জল রাখিতে পরে না।

জগদীশ্বরের কৃপায় ৬। ৭ মাস এইরূপ কর্মভোগ করিয়া প্রমদা আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই কয় মাসে প্রবোধচন্দ্র ধনে-প্রাণে একপ্রকার সারা হইলেন। তাঁহার রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইয়া গেল; কাজকর্মের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইল; পসার খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু প্রমদা যে রোগমুক্ত হইলেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে পরম লাভ; তিনি সকল ক্ষতি বিন্দুমাত্র গণনা করিলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসকেরা প্রমদার বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। প্রমদার ইচ্ছা নয় যে তাঁহার জন্য আর অধিক ব্যয় হয়; কিন্তু প্রবোধচন্দ্র শুনিবেন কেন? প্রমদার জন্য তাঁহার শেষ বস্ত্রখানি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হয়, তাহাতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। তিনি প্রমদার আপত্তি ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। ব্যাঙ্কে যে দুই চারি সহস্র টাকার কাগজ অবশিষ্ট ছিল, তাহা ভাঙগাইয়া লইয়াছেন; কলিকাতার বাড়ীটা ছাড়িয়াছেন, বাসার বালক-গুলির স্থানান্তরে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, বাসার আসবাবগুলি একজন বন্ধুর বাড়ীতে রাখিবার পরামর্শ করিয়াছেন।

অদ্য তাঁহার পশ্চিমে যাত্রার দিন। দুইদিন হইল, প্রমদার পিতা মাতা আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। অদ্য প্রভাত হইতে যাত্রার আয়োজন হইতেছে; অনেকগুলি জিনিসপত্র ইতিমধ্যেই রেলে প্রেরিত হইয়াছে, অবশিষ্ট জিনিসপত্র বাঁধা হইতেছে। প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণ বাজার করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রমদা কয়েকবার পশ্চিম যাত্রার পূর্বে বামার বিবাহ দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রবোধচন্দ্রও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বামা তাহাতে নিতান্ত বিরক্ত প্রকাশ করাতে সে প্রস্তাবও আপাততঃ স্থগিত হইয়াছে। আজ বামারও হরিতারণের নিকট বিদায় লইবার দিন। দাসীগুলির নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে সঙ্গে যায়, প্রমদারও তাহাদিগকে ছাড়িতে প্রাণ চায় না; কিন্তু কি করেন, তাঁহাদের অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এতগুলি লোক এত ব্যয় করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত বোধ হয় না। কেবল খোদাই ও একজন ঝি সঙ্গে যাইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। দুপুর-বেলা আহারের পর প্রবোধচন্দ্র একবার কাছারীতে গিয়া যে সকল বন্দোবস্ত বাকী ছিল, তাহা করিয়া আসিলেন; পশ্চিমে মাসে মাসে টাকা পাঠাইবার ভার একজন বন্ধুর উপর দিয়া আসিলেন। প্রমদাও আহারান্তে সংসারের নানাপ্রকার দ্রব্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনী উকীল-মাতাকে কয়েকখানি শাদা পাথর দিলেন, কোন দাসীকে শিলখানি, কাহাকেও যাঁতাটি, কাহাকেও কম্বল-খানি, এইরূপ অনেক দ্রব্য বিতরণ করিলেন; এমন কি, চারিপার্শ্বের দরিদ্র পরিবারগণ লেপ বালিশ শীতবস্ত্র প্রভৃতি লাভ করিল।

ক্রমে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। দাস দাসী ও প্রতিবেশীমণ্ডলে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখ বিষণ্ণ। তাহারা পরস্পরে বলিতেছে, "আজ হ'তে পাড়াটা নিবিয়া গেল।" প্রমদা দাসীদিগকে ডাকিলেন এবং বাক্স খুলিয়া তাহদের বেতন চুকাইয়া দিলেন। তাহারা হস্ত পাতিয়া সে অর্থ গ্রহণ করিল না; অঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। প্রমদা তাহাদের এক এক মাসের বেতন পুরস্কার দিলেন। আজ যাহার নেত্রে জলধারা বহিতেছে না, এরূপ

লোকই নাই। প্রতিবেশিনী উকলী-পত্নী আজ প্রমদার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। প্রমদা অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া দিতেছেন বটে; কিন্তু নিজের অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। বধূটি প্রমদার নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন, স্বামীর নিকট অথবা শ্বশ্রূর নিকট নিগ্রহ সহ্য করিলে প্রমদারই নিকট আসিয়া কাঁদিতেন; প্রমদা তাঁহাকে মিষ্ট ভাষায় সান্ত্বনা করিতেন; যত্ন করিয়া পড়াইতেন; মোজা প্রভৃতি সেলাই করিতে শিখাইতেন; এটি সেটি উপহার দিতেন; এবং প্রত্যহ চুল বাঁধিয়া দিতেন। প্রমদা আজ তাঁহার অধীরতা দেখিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না, তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া "কেঁদো না বোন্‌। আবার আমরা আস্‌বো" বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। বধূটির শ্বশ্রূর প্রাণেও আজ দারুণ ব্যথা লাগিতেছে। তিনি মুখে "মা, তুমি যেখানে থাক সুখে থাক" বলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন বটে, কিন্তু নয়নের জল রাখিতে পারিতেছেন না।

গাড়ি দ্বারে দাঁড়াইয়াছে; লোকজনের ছুটাছুটি পড়িয়া গিয়াছে; প্রবোধচন্দ্র এক একবার ঘড়ি দেখিতেছেন এবং ত্বরা দিতেছেন; বাক্স, সিন্দুক, বিছানা গাড়ীর পৃষ্ঠে বোঝাই হইতেছে। প্রমদা একে একে হাত ধরিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলেন, দাসীদের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, প্রতিবেশী বালকবালিকাদিগের নিকট কাহাকেও বা চুম্বন করিয়া, কাহাকেও বা দাড়ীতে হাত দিয়া বিদায় লইলেন; গলবস্ত্র হইয়া উকীল-মাতার চরণে প্রণত হইলেন, আর একবার তাঁহার পুত্রবধূর কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন; পরিচিত লোক যাহাকে দেখিলেন, তাহাকে মিষ্ট ভাষায় সম্ভাষণ করিলেন, ব্রাহ্মণঠাকুরকে প্রকাশদিগের বাসায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং সকলের নিকট বিদায় লইয়া গাড়িতে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের গাড়ি চক্ষের অদর্শন হইল এবং শোকের অন্ধকার যেন সে পাড়াতে পড়িয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হায়, হায়! পড়ন্ত রৌদ্র যেমন আর উঠে না, নিবন্ত প্রদীপ যেমন আর পূর্ব শোভা ধরে না, শুকন্ত ফুল যেমন আর ফুটে না, মানবের কপালও বুঝি একবার ভাঙ্গিলে আর গড়ে না। সংসারে ক্লেশ পাইতে হয়, অসৎ, অধম ও অধর্মাচারী ব্যক্তিরাই পাউক; যাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া হৃদয় মন শ্রদ্ধাতে অবনত হয়, তাঁহাদের ক্লেশ দেখিলে প্রাণে সহ্য হয় না, তাঁহাদের চক্ষে জল দেখিলে মনে হয়, ঐ অশ্রু আমার চক্ষে আসুক, ঐ ক্লেশভার আমার পৃষ্ঠে পড়ুক, আমি কাঁদি—ইঁহারা সুখে বাস করুন। কিন্তু বিধাতার কি দুরবগাহ বিধান, কখনও অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেও এ জীবনে অসহ্য ক্লেশ যাতনা ভোগ করিতে দেখি। কিন্তু তখন তাঁহাদের ধর্মানুরাগের জ্যোতি ম্লান না হইয়া দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা ধারণ করে। আমাদের প্রবোধ ও প্রমদাকে পরিণামে যে এত ক্লেশ পাইতে হইবে, তাহা পূর্বে জানিতাম না।

তাঁহারা প্রায় এক বৎসর হইল ইটোয়া নগরে আসিয়া বাস করিতেছেন। প্রমদা এখানেও একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন; খোদাইয়ের সাহায্যে এই অল্প পরিসর বাটীর মধ্যে নানাপ্রকার ফুলের গাছ বসাইয়াছেন। তিনি ও বামা স্বহস্তে প্রাতঃসন্ধ্যা তাহাতে জলসেচন করিয়া থাকেন। ভালবাসা যাহার স্বাভাবিক বনের পশুপক্ষীও তাহার বশীভূত হয়, মানুষ ত হইবেই; চারিপার্শ্বের কাহার প্রভৃতি নীচজাতীয় স্ত্রীলোকেরা সকলে তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কোন কিছু ভাল দ্রব্য পাইলেই তাঁহার কাছে আনয়ন করে, কষ্ট পাইলেই তাঁহাকে আসিয়া জানায়, পুত্রকন্যার পীড়া হইলে তাঁহাকে আসিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, স্বামী প্রভৃতির হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিলে তাঁহার নিকট আসিয়া রোদন করে। তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বলেন, বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করেন, সৎপরামর্শ দিয়া কুপথ হইতে নিবৃত্ত করেন, বিবাদ হইলে বিবাদ ভাঙ্গিয়া দেন। তাহাদের পীড়াদি হইলে তাহাদের কুঁড়ে ঘরে

শনশ্রূষা করিতে যান, এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাগুলিকে ক্রোড়ে করিয়া বাড়িতে হাত দিয়া আদর করিয়া থাকেন।

প্রবোধচন্দ্র ইটোয়াতে আসিয়া সমুদয় বাংগালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়াছেন। অনেকের সহিত তাঁহার আত্মীয়তাও জন্মিয়াছে। তিনি তাঁহাদের সকল অবস্থায় পরামর্শদাতা, তাঁহারাও সর্বদা প্রমদার স্বাস্থ্যের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। প্রবোধচন্দ্র ছয় সাত মাস হইল বসিয়া আছেন, একটি পয়সাও উপার্জন নাই, ব্যয় বিলক্ষণ আছে, এই যা একটু ভাবনা। নতুবা দিন দিন প্রমদার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেছেন।

যে বামা কলিকাতায় থাকিতে চারি পাঁচ বৎসর পাকশালার দিকে যায় নাই, কেবল শিল্প সংগীতাদি শিক্ষা ও পুস্তকাদি লইয়া থাকিত, সেই বামা আনন্দচিত্তে দাদা ও বৌদিদির পরিচারিকার কার্যে ব্রতী হইয়াছে। বামা নিত্য নিত্য রন্ধন করে, তাহাতে প্রমদার প্রাণে কিছু ক্লেশ হয়। তিনি এক একদিন প্রাতে উঠিয়া পাকশালার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু বামা তাঁহাকে উনানের ত্রিসীমার মধ্যে যাইতে দেয় না। প্রমদা কি করেন, তরকারী কুটিয়া, রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিয়া এবং পাকশালার দ্বারে বসিয়া গল্প করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন।

তাঁহাদের দিন এইরূপে একপ্রকার মন্দ যাইতেছিল না। কিন্তু এ সুখও তাঁহাদের সহিল না; এই বৎসর শীতের প্রারম্ভ হইতেই প্রবোধচন্দ্রের গলা ভাঙিয়া গিয়া এক প্রকার কাসি জন্মিল। সে কাসি আর যায় না। প্রথম প্রথম তত গ্রাহ্য করেন নাই, অমনি দুই একটা ঔষধ খাইলেন। তাহাতে সম্পূর্ণ উপশম হইল না। ক্রমে বুকে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং মনে কিঞ্চিৎ আশংকার কারণ উপস্থিত হইল। একজন সুযোগ্য ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া জানিতে পারিলেন যে, যক্ষ্মার সূত্রপাত। কি করেন, হঠাৎ প্রমদাকে বলিতে সাহস হইল না, অথচ না বলিলেও নয়। অনেকদিন ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে যখন ভিতরে অল্প অল্প জ্বর অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন আর প্রমদার নিকট গোপন রাখা যুক্তিসংগত মনে করিলেন না। ইহা অপেক্ষা প্রমদার মস্তকে যদি বজ্রাঘাত হইত, বোধহয় তাঁহার এত ক্লেশ হইত না। কিন্তু প্রকৃত মনস্বিনী রমণীর ন্যায় স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ডাক্তার মহাশয়েরা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া মুংগেরে গিয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রমদা মুংগের যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এখন খোদাই তাঁহার একমাত্র সহায়। প্রবোধচন্দ্র দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন, প্রমদা তাঁহাকে আর প্রায় কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া চিন্তিত করেন না। নিজে খোদাইয়ের সাহায্যে ও পত্রাদি দ্বারা মুংগের গমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুংগেরের বাড়ী দেখা হইল, প্রমদা ইটোয়ার জিনিসপত্র কতক বিক্রয় করিলেন, কতক বিতরণ করিলেন এবং মুংগেরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মুংগেরে আসায় কয়েক মাস প্রবোধচন্দ্রের একটু উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল, তাহা অধিক দিন থাকিল না। তাঁহার শরীরের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া পড়িতে লাগিল; ক্ষুধার হ্রাস হইল ও শরীরের বল অত্যন্ত কমিয়া গেল। প্রমদা ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। এদিকে অর্থগুলি সমুদায় নিঃশেষ হইয়া কর্জ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রমদা হরিতারণবাবুকে, দেবরদিগকে ও আপনার পিতা ও ভ্রাতাকে বার বার পত্র লিখিতেছেন। দৈবের কি দুর্ঘটনা! এই সময়ে প্রমদার পিতার কর্মটিও গিয়াছে, তিনি একবার ৫০টি টাকা পাঠাইয়া নিরস্ত হইলেন; প্রকাশচন্দ্র ও হরিতারণ দুই এক বৎসর হইল কালেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতায় একখানি ঔষধের দোকান করিয়াছেন, তাঁহাদের আয়ও নিতান্ত অল্প। তাঁহারা যথাসাধ্য মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পাঠাইতেছেন; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আশ্চর্য এই, কলিকাতায় প্রবোধচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রবোধচন্দ্রের এরূপ পীড়ার কথা

শুনিয়া হস্ত গুটাইয়াছেন। হরিতারণ তাঁহাদের অনেকের বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করিতেছেন, কিন্তু কেহ সহজে কিছু দিতে চাহিতেছে না। ওদিকে প্রমদা এক একখানি করিয়া গহনা গোপনে খোদাইয়ের হস্ত দিয়া বিক্রয় করিতেছেন। প্রবোধচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলেন না, কেবল বলেন, "যেরূপে হউক আমি চালাইতেছি, তুমি ঈশ্বরের কৃপায় সারিয়া উঠিলে বলিব।" পতিব্রতা সতী এইরূপে একাকিনী সমুদয় বিপদের ভার নিজের মস্তকে বহন করিতেছেন; তাঁহার ভবিষ্যৎ আকাশ যতই মেঘাবৃত হইয়া আসিতেছে, ততই তাঁহার প্রাণ চিন্তায় আকুল হইতেছে। কিন্তু পীড়িত পতিকে সে চিন্তা জানিতে দিতেছেন না। যদি অশ্রুপাত করিতে হয়, নির্জনে অশ্রুপাত করেন; যদি বাম করতলে মুখ রাখিয়া ভাবনায় নিমগ্ন হইতে হয়, নির্জনে হইয়া থাকেন। প্রবোধচন্দ্র তাঁহার প্রসন্ন মুখই সর্বদা দেখিতে পান। তবে প্রমদা দিন দিন মলিন ও কৃশ হইয়া যাইতেছেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া থাকেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নিতান্ত দুঃখের কথাগুলো শীঘ্রই বলিয়া ফেলা ভাল। মিষ্ট দ্রব্যই লোকে রহিয়া বসিয়া খায়, তিক্ত দ্রব্য একেবারে গিলিয়া ফেলে। পাঠিকা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের প্রমদার সুখের রবি অস্তাচলের অভিমুখে চলিয়াছে; বেলা অবসানপ্রায়। কালরাত্রি যদি আসিবেই তবে আর বিলম্ব সয় না, শীঘ্র আসুক।

মুঙ্গেরে প্রমদার দুর্দশার সীমা পরিসীমা নাই। টাকা কড়ি আর এক কপর্দক নাই। এখন গোপনে অলঙ্কার পত্র বিক্রয় করিয়া চলিতেছে। প্রমদা নিজের মস্তকে এই সমুদয় অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া প্রিয়পতিকে রক্ষা করিতেছেন। খোদাই একমাত্র মন্ত্রী। বামা ছেলে-মানুষ, তাহাকে এসকল বলিয়া ক্লেশ দেওয়া নিরর্থকবোধে তাহাকেও কিছু বলেন না। খোদাই তিন চারিমাস হইল নিজের বেতন প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়াছে; কেবল তাহা নয়, মধ্যে মধ্যে টাকা কড়ির অভাবে যদি কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ জুটিতেছে না দেখিতে পায়, অমনি তাহাও আনিয়া দেয়। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমি এক স্থান হইতে যোগাড় করিতেছি, পরে আপনাকে বলিব।" প্রমদা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তিনি খোদাইকে যে গিনির মালা ছড়াটি পুরস্কার দিয়াছিলেন, খোদাই তাহার এক একটি গোপনে বিক্রয় করিতেছে। প্রমদা এই সংবাদ শুনিয়া অশ্রুপাত করিলেন, খোদাইকে আর কিছু বলিলেন না।

মুঙ্গেরে আসিয়া একজন মিশনারি সাহেবের মেয়ের সহিত প্রমদা ও বামার আলাপ হয়। তিনি প্রমদা ও বামার গুণে আকৃষ্ট হইয়া সর্বদা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। মেয়েটি বড় ভদ্রলোক, প্রমদা তাঁহাকে কষ্টের কথা কিছু জানাইতেন না, কিন্তু তিনি অনুমানে সমুদায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্যের জন্য স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে উপঢৌকন ছলে এটি ওটি প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারাও গরীব, এরূপে কতকাল সাহায্য করিবেন, অবশেষে দুই স্ত্রীপুরুষে পরামর্শ করিয়া বামার জন্য একটি কর্ম জুটাইলেন। কর্মটি এই, দিনের বেলা দুই তিন ঘণ্টা করিয়া মিশনারি সাহেবদিগের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়া পড়াইতে হইবে, এবং গান বাজনা শিখাইতে হইবে। বেতন ৪০ টাকা। বামা হিন্দুকুলকন্যা, কখন এমন কাজ করে নাই, সহজে কি প্রবৃত্তি হয়? কিন্তু দুই ননদ-ভাজে পরামর্শ করিয়া অনন্যোপায় হইয়া পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা এই কার্য অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থির করিলেন। প্রবোধচন্দ্রের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করাতে তিনি কেবল মৌনী হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; এবং দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তিনি যে বামাকে কত যত্নে মানুষ করিতেন, যাহাকে সুখের সময় একদিনও পাকশালার দিকে যাইতে দিতেন না, সেই বামা অদ্য তাঁহার জন্য অর্থোপার্জন করিতে চলিল, একি তাঁর প্রাণে সয়? কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন, এবং অশ্রুপাত দ্বারা মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।

বামার কি গুরুতর পরিশ্রম আরম্ভ হইল। সে প্রাতে উঠিয়া সংসারের কাজ করে, রন্ধনশালায় গিয়া দাদার পথ্য পাক করে, আহারান্তে তিন ঘণ্টার জন্য স্কুলে যায়, বৈকালে আসিয়া আবার পাককার্যে নিযুক্ত হয়, এবং ইহার পরে রাত্রে প্রায় জাগিতে হয়। প্রমদা দিবারাত্রি প্রবোধচন্দ্রের পার্শ্বে আছেন। কখন কখন বামা আসিয়া বসে, তিনি গিয়া রন্ধনাদি করেন। হায়! হায়! কপালটা একেবারেই যেন ভাঙ্গিল। কিছুদিন এইরূপে যাইতে না যাইতে বামার কাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দুই একদিন তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিল; জ্বরের প্রকোপও ক্রমে প্রকাশ পাইল। আর বামা শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। প্রিয় পাঠিকা, একবার প্রমদার অবস্থাটা মনে কর। হা প্রমদা! চারুশীলে! বিধাতা তোমার সহিষ্ণুতা-শক্তিকে এ যাত্রা বড় পরীক্ষা করিলেন। বামা যখন বাণবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইল, এবং দাদার পার্শ্বে নিজের মৃত্যুশয্যা পাতিল, তখন প্রমদা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তখন আর বিদেশে থাকা অসঙ্গত বোধে অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া মুমূর্ষু পতি ও প্রিয় বামাকে লইয়া দেশে যাত্রা করা স্থির করিলেন। ওদিকে খোদাই অন্নবস্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার হস্তে আর অর্থ নাই। তথাপি সে কষ্ট সে স্বামিনীকে জানায় নাই। বামা শয্যাশায়িনী হওয়া অবধি খোদাই প্রমদার একমাত্র সহায় ও মন্ত্রী হইয়াছে। একদিন প্রমদা খোদাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খোদাই! তুমি আমার বাবা! তুমি আমার বাপের অধিক কাজ করিলে; আমার এইবার সর্বনাশ উপস্থিত, আমাকে দেশে লইয়া চল; এই অলঙ্কারখানি লও, বিক্রয় করিয়া আন।" খোদাই অলঙ্কার লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অলঙ্কার বিক্রয় হইতেছে, জিনিসপত্র বাঁধা হইতেছে, এমন সময় হরিতারণ ও প্রকাশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র প্রমদা যেন মৃতশরীরে প্রাণ পাইলেন। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া 'দাদা কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, প্রমদা এতদিন একাকিনী যে সকল ক্লেশ সহ্য করিতেছিলেন, তাহা স্মরণ হইল। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে ঝর ঝর ধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না; নয়ন মুছিতে মুছিতে তাঁহাদিগকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহারা গৃহের মধ্যে গিয়া কি দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, একখানি খাটে প্রবোধচন্দ্র শয়ান, সে মূর্তি আর নাই, দেখিলে চিনিতে পারা যায় না, নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিষণ্ণ-বদনে পড়িয়া আছেন। পার্শ্বে ঔষধ ও পথ্যাদি প্রস্তুত আছে; অপর গৃহে বামা। সে কি বামা? প্রমদা বলিতেছেন, বামাকে তদ্ভিন্ন আর চিনিবার উপায় নাই। সেই সুগোল সুন্দর সুঠাম কমনীয় কান্তি বিলীনপ্রায়; সেই নবযৌবন-প্রস্ফুটিত মুখ শুষ্ক ও বিশীর্ণ; কথা কহিবার শক্তি নাই, দিবারাত্রি অস্থিভেদী মজ্জাগত জ্বর। দেখিয়া উভয়ে একেবারে বসিয়া পড়িলেন; বিশেষ হরিতারণের মর্মস্থান যেন কেহ শাণিত ক্ষুর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বামার মৃতদেহে একবার বিদ্যুতের ন্যায় চেতনার স্ফুরণ হইল; চক্ষু মেলিয়া একবার সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সেই চক্ষুই স্বাগতপ্রশ্ন করিতে লাগিল। হরিতারণ অনেকক্ষণ একভাবে থাকিয়া বাহিরে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে যাত্রার আয়োজন হইল, এবং সন্ধ্যা না হইতে হইতে সকলে পীড়িত ভ্রাতা ও ভগ্নীকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সুজন পাঠিকা, আরও কি শুনিবার ইচ্ছা আছে? তবে রোদন করিবেন না, আর একটু শুনুন; তাহা হইলেই আমার কথা সাঙ্গ হয়। হরিতারণ এবং প্রকাশ তাঁহাদিগকে লইয়া একেবারে হরিতারণের কলিকাতার বাসায় আনিয়া তুলিলেন। দেশ হইতে হরিশ্চন্দ্র, পরেশ প্রভৃতি সপরিবারে আসিলেন। প্রকাশ নিজে ডাক্তার, সুতরাং সহরের বড় বড় ডাক্তারের সহিত তাঁহার

আলাপ পরিচয় আছে; তাঁহাদের চিকিৎসার আর ত্রুটি রহিল না, কিন্তু মৃত্যু যাঁহার সন্নিকট, চিকিৎসায় তাঁহার কি করিবে? বামার পীড়া দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পাইল; তাহার জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। দেহকান্তি ক্রমেই বিলীন হইয়া আসিতে লাগিল। সে এতদিন, পাছে দাদার ক্লেশ বাড়ে এই ভয়ে, দারুণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া মুখ মুদ্রিত করিয়া থাকিত। অদ্য রজনীতে বামার যন্ত্রণার সীমা পরিসীমা নাই; কি যাতনা, কোথায় যাতনা বলিয়া বুঝাইতে পারে না। রাত্রি এক প্রহর হইতে না হইতে যাতনা বাড়িতে আরম্ভ করিল, প্রমদা প্রভৃতি অনেকে প্রবোধচন্দ্রের ঘরে বসিয়া আছেন। হরিশ্চন্দ্র, প্রকাশ ও হরিতারণ প্রভৃতি বামার ঘরে, তাহাকে দণ্ডে দণ্ডে ঔষধ দিতেছেন। ঔষধ দিয়া আর কি হইবে? নিশীথকাল অতীত হইতে না হইতে যাতনার বেগ কমিয়া আসিতে লাগিল। বামার চঞ্চলতা অচঞ্চলভাব ধারণ করিল। ক্রমে যখন কালরাত্রি অবসানপ্রায়, যখন প্রভাত-সমীরণ রজনীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের ন্যায় দ্বারে গবাক্ষে বহমান, যখন সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গকুল নিজ নিজ স্বরে পরস্পরকে সম্ভাষণ-তৎপর, যখন সহরের প্রহরিগণ সমস্ত রাত্রিজাগরণের পর অর্ধজাগরিত অর্ধনিদ্রিতভাবে গৃহাভিমুখে প্রতি-নিবৃত্ত, যখন রাজপথে দুই একখানি গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইতেছে, যখন গৃহস্থের ঘরে সুপ্তোত্থিত পরিজনের আলাপ ও শোকগ্রস্ত গৃহে আত্মীয়জনের রোদনধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তখন প্রাণবায়ু বামার কমনীয় দেহ-যষ্টিকে ধূলিসাৎ রাখিয়া পলায়ন করিল। প্রমদা মৃত্যুর কিছু পূর্ব হইতে আসিয়া বামার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। যে বামাকে পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সঙ্গে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, যাহাকে ভগিনীর অধিক স্নেহের সহিত এতদিন প্রতিপালন করিতেছিলেন, যাহার শিক্ষার জন্য এত ব্যয় করিয়াছেন, যাহাকে সুখী করিবার জন্য সর্বদা কত ব্যস্ত থাকিতেন, যাহাকে সুপাত্রগত করিবার আশায় এত বিপদের মধ্যেও তাহার অলঙ্কারগুলি স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলেন, সে বামা আজ তাঁহার চক্ষের সমক্ষে অন্তর্হিত হইল।

বামার প্রাণের প্রদীপ নিবিল; হরিতারণও একেবারে শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন; প্রকাশ তাঁহাকে বলপূর্বক ধরিয়া আর একটি ঘরে লইয়া গেলেন এবং অনেক প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শ্যামা "বামা রে! জন্মের মত কি ফেলে গেলি রে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বধূগণের এবং বালক-বালিকার কোলাহলে গৃহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

প্রবোধচন্দ্র মৃত্যুর সময় বামাকে দেখেন নাই, কিন্তু এই আঘাত তাঁহার প্রাণে এরূপ বাজিল যে, তিনি আর সামলাইতে পারিলেন না। বামা যে তাঁহার জন্য মরিল, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। যখন প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকটে গেলেন, তখন তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি দাদার জন্য ঘর প্রস্তুত করিতে গেল!" এই কথাটি বলিতে বলিতে দুই বিন্দু জল তাঁহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল। প্রমদা এত শোকেও কখনও ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন নাই, কিন্তু এ কথা শুনিয়া একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রবোধ হস্তের সঙ্কেত দ্বারা স্থির হইতে আদেশ করিলেন।

সমাপ্ত

নয়নতারা

শরদের বেলা অবসান প্রায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে চুঁচুড়া সহরের গঙ্গাতীরবর্তী রাজপথে দুই-জন প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ বায়ু সেবন করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন নবাগত ও অপর জন চুঁচুড়া প্রবাসী। তিনি হুগলী কালেজের অন্তর্গত স্কুলে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত আছেন।

নবাগত। তাই ত হে মহেন্দ্র, তোমাদের চুঁচুড়ার গঙ্গাধারে এই রাস্তাটি ত বেশ! কিন্তু আমার বোধ হয়, নিজ গঙ্গার উপরে ঐ বাড়ীগুলি না থাকলে ভাল হতো। গঙ্গাতীরে যে সব সহর আছে, তাতে লোকের বেড়াবার জন্যে খুব বড় বড় ষ্ট্রাণ্ড রোড রাখা উচিত।

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) যেমন কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড রোড।

নবাগত। আরে ছি! সে কথা বলো না। কলিকাতার গঙ্গার ধারে দুদণ্ড দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না। কেবল ষ্টীমারের ফোঁস্ ফোসানি, গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, রাস্তার ধুলো, আর গুদোম ঘরের কুলীদের চীৎকার, মনে হলেও ভয় হয়।

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) সভ্যতার এই একটা বড় দোষ, এতে জগতে কয়লার ধোঁয়া বড় বৃদ্ধি করে ও প্রকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট করে।

নবাগত। ঠিক্ বলেছ, সহরের কাছে একটা নদী পাওয়া বড় সৌভাগ্যের কথা। কোথায় নদীর ধারটা এমনি হবে যে গিয়ে দুদণ্ড দাঁড়ালে চোখটা জুড়াবে, প্রাণটা জুড়াবে, না চক্ষু ও মন দুয়েরই ক্লেশ! (বলিতে বলিতে দুজনে গঙ্গাতীরস্থিত একটি অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানের রেলের ধারে গিয়া) বেশ সুন্দর বাড়ীখানি ত! যেন ছবির মত! এ বাড়ী কার ভাই?

মহেন্দ্র। এ বাড়ীটি একজন বড় লোকের, তাঁর নাম কালীপদ রায়।

নবাগত। নামটা যেন শুনেছি শুনেছি বোধ হচ্ছে।

মহেন্দ্র। শুনে থাকবে, সুপ্রিম কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল, বেহালা বড়িশা নিবাসী, চন্দ্র-শেখর রায়ের নাম শোন নি?

নবাগত। শুনেছি বৈ কি?

মহেন্দ্র। উনি তাঁর মধ্যম পুত্র। ওঁর আর দুই সহোদর আছেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামাপদ রায়, তিনি বাড়ীর বিষয় কর্ম দেখেন; কনিষ্ঠ তারাপদ রায়, হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রিটারি কাজ করেন। কালীপদবাবু সেকালের হিন্দু কালেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র; পরে পশ্চিমে অনেক বৎসর ১২০০ টাকা বেতনে রেলওয়ের পে মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন; দুই বৎসর হলো পৈতৃক বিষয় পেয়ে পেন্সন নিয়ে, এই বাড়ী কিনে এখানে এসে বাস করছেন।

নবাগত। ওঃ হো মনে পড়েছে, ওঁর নয়নতারা নামে একটি মেয়ে আছে না? সে মেয়েটি নাকি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী?

মহেন্দ্র। এ ত দেখি বেশ, ওঁর বিষয়ে আর কিছু জান না জান, একটা জানা হয়েছে যে, ওঁর নয়নতারা নামে একটি মেয়ে আছে।

নবাগত। (ঈষৎ হাসিয়া) কাল বিদ্যারত্ন মশাই-এর মুখে মেয়েটির প্রশংসা শুনছিলাম। মেয়েটির প্রশংসা ত তাঁর মুখে ধরে না।

মহেন্দ্র। বিদ্যারত্ন মশাই তাকে সংস্কৃত পড়ান কিনা, তাই তাঁকে বেশ জানেন।

ইতিমধ্যে একজন নাতিস্থূলা, নাতিকৃশা, গৌরাঙ্গী, প্রবীণা আসিয়া সেই ভবনের বারাণ্ডায় দাঁড়াইলেন ও উদ্যানের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া কি দেখিতে লাগিলেন।

নবাগত। ও কে ভাই, বারাণ্ডাতে এসে দাঁড়ালেন?

মহেন্দ্র। (দৃষ্টিপাত করিয়া) উনি রায় মহাশয়ের গৃহিণী।

নবাগত। সে কি, উনি এরূপ প্রকাশ্য স্থানে বারাণ্ডাতে এসে দাঁড়ালেন!

মহেন্দ্র। আমি যে কালীপদ রায় মহাশয়কে একটি বড় লোক বলেছি তার অর্থ আছে। এই মানুষটিতে একটু বিশেষত্ব আছে। উনি পশ্চিমে কর্ম করবার সময় একবার ফার্লো নিয়ে একজন মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর অনুরোধে এক বৎসর সপরিবারে বোম্বাই সহরে বাস করেছিলেন। সেখানে দেখলেন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু-নারীদের অবরোধ নাই। এটা তাঁর এত ভাল লেগেছিল যে, সেই অবধি তিনি নিজ পরিবার হ'তে অবরোধ প্রথা তুলে দেন। তারপর এখন ত আর কথাই নেই; এক ছেলে বিলাত হ'তে এসে এই হুগলী কালেজে প্রোফেসারি করছেন; দ্বিতীয়টি বিলাতে ব্যারিষ্টার হয়েছে; তৃতীয়টি এ বৎসর সিবিল সার্ভিসে পাশ হয়েছে; এখন এঁদের চালচলন এংগলো ভার্নেকিউলার হ'য়ে পড়েছে। (উভয়ের হাস্য)

ইতিমধ্যে উদ্যানের মধ্য হইতে রমণীর কোমল কণ্ঠের ধ্বনি নবাগত ব্যক্তির কর্ণগোচর হইল। কে যেন বলিতেছে—"বড়দা! দুটি পায় পড়ি, অত জোরে নয়, পড়ে যাব।" চাহিয়া দেখেন ভবনসংলগ্ন উদ্যান মধ্যে আম্রশাখাতে একটি দোলা টাঙ্গান হইয়াছে; তাহাতে একটি বালিকা দুলিতেছে ও একজন যুবা পুরুষ নীচে দাঁড়াইয়া দোল দিতেছেন।

নবাগত। ও কে ভাই, দোলাতে দোল খাচ্চে?

মহেন্দ্র। (একটু সরিয়া দেখিয়া) ও মেয়েটি রায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনী। ওঃ এতক্ষণে বোঝা গেল, গৃহিণী ঠাকুরাণী উপর হতে কি দেখছেন। উনি মেয়েদের দোল খাওয়া দেখছেন। (পাশে লক্ষ্য করিয়া) নয়নতারা নয়নতারা করছিলে, ঐ দেখ নয়নতারা। ওই যে গাছের তলে বেঞ্চের উপরে দুটি মেয়ে বসে আছে দেখছ, ওর বড়টি নয়নতারা, আর ছোটটি সর্ব কনিষ্ঠা সরোজিনী, ডাক নাম টুনী। আর ঐ যিনি দোল দিচ্চেন উনি রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশচন্দ্র। আর যে ছেলেটি হাতে তালি দিয়ে হাসছে, উটির নাম নরেশ, সকলে পটলা পটলা বলে ডাকে। যোগেশ ও রমেশ বিলাতে আছে; তারা থাকলেই সকল সন্তানকে দেখা হতো।

নবাগত। কি আশ্চর্য! তুমি যে সকলের রাশনাম, ডাকনাম পর্যন্ত জান দেখছি!

মহেন্দ্র। (একটু হাসিয়া) এ বাড়ীতে হরেনের ও আমার খুব পসার। রায় মহাশয় এখানে আসার পর আমার সঙ্গে খুব বন্ধুতা হয়েছে। আমাকে সহোদরের মত স্নেহ করেন। তিনিও স্পিরিচুয়ালিষ্ট আমিও স্পিরিচুয়ালিষ্ট; দুজনে খুব মিলে গেছে। স্পিরিচুয়ালিজম্ সম্বন্ধে এমন ভাল বই নাই যা ওঁর কাছে পাওয়া যায় না।

নবাগত। (হাসিয়া) তবে ত তোমরা ভূতন্ত বিদ্যার একটা জাঁদরেল গোছ মক্কেল পাকড়েছ?

মহেন্দ্র। তা আর বলতে!

নবাগত। (আবার উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) যে মেয়েটি দোলাতে দুলছে ওটি ত বড় ছোট নয়!

মহেন্দ্র। ছোট কি, বয়স ২০।২১ বছরের কম হবে না।

নবাগত। এ ত দেখি একটা দেখবার জিনিষ! ২০।২১ বছরের মেয়ে দোলায় দুলছে আর তার ভাই দোল দিচ্ছে।

মহেন্দ্র। এ পরিবারে দেখবার জিনিষ ঢের আছে। ভিতরকার কথাটা কি জান? রায় মহাশয় সর্বদা বলেন যে গৃহ ও পরিবারটা এমন স্থান হওয়া উচিত, যে সন্তানগণ যেন সে স্থানটাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখের স্থান মনে করে। অসংকোচে মিশবে, অসংকোচে খেলবে, অসংকোচে মনের কথা বলবে, তা না হলে তারা এ স্থানে থেকে সুখী হবে না। এজন্য তিনি এদিগকে এমনি করে মানুষ করেছেন যে অনেক বিষয়ে এরা যেন শিশুর মত আছে। তিনি থাকলে তাঁকেই হয় ত দুলতে দেখতে। তিনি দোলেন ছেলেরা দোল দেয়, আবার ছেলেরা

দোলে তিনি দোল দেন। কেবল তা নয়। গাওনা বাজনা বিষয়ে তিনি একজন কালোয়াত। পশ্চিমে থাকবার সময় ওস্তাদ রেখে নিজে গাওনা বাজনা শিখেছেন। তার পর নিজে ছেলে-মেয়েদিগকে পাকা রকম গাইতে বাজাতে শিখিয়েছেন। ঐ সুরেশবাবু একজন পাকা সেতারী ও পাখোয়াজী; মেয়েরা বেহালা, সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়ম প্রভৃতি বাজাতে পরিপক্ক। এখনও হুগলীর এমামবাড়ীর মৌলবী মহাশয়ের একজন লোক এসে সপ্তাহে তিন দিন মেয়েদিগকে সেতার শেখায়।

নবাগত। মানুষটিতে বিশেষত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। এঁদের ব্রাহ্মসমাজের দিকে টানতে পার না? (হাসিয়া) ওঁরা ধর্মটর্মের ধার বুঝি বড় ধারেন না?

মহেন্দ্র। (বিরক্তভাবে) ওই ত তোমাদের ব্রাহ্ম গোঁড়ামি। তুমি বুঝি মনে কর, "ব" এর ফলা আকার, আর "হ" এ "ম" এ না দিলে ধর্ম হয় না? সব ধর্ম কেবল তোমাদের একচেটে, যত ধর্মের ধার তোমরাই ধার আর কেউ ধর্মের ধার ধারে না। এই গোঁড়ামির জন্যেই লোকে তোমাদের দেখতে পারে না।

নবাগত। (কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিত হইয়া) সে কিহে মহেন্দ্র! এমন কথা ত তোমার মুখে কখনও শুনিনি।

মহেন্দ্র। সাধে কি চটি, এই মানুষটা আপনাকে ব্রাহ্ম বলে না বটে, কিন্তু এমন ভক্ত লোক যে তুমি আমি এঁর চরণে বসে অনেক ভক্তি শিক্ষা করতে পারি।

নবাগত। বটে!

মহেন্দ্র। ওঁর কাছে একটি ঈশ্বরের নামের সংগীত করবার যো নেই তা হলে কেঁদে অধীর হন; অথচ ধর্মের কথা বলতে ভয় পান; জিজ্ঞাসা করলে বলেন—"ধর্মের কিছুই জানিনে ভাই।"

নবাগত। তাই ত যতই শুনছি মানুষটিকে যে বড়ই ভাল লাগছে।

মহেন্দ্র। কেবল কি তাই, এমন পণ্ডিত লোকই বা দেশে কয়টা মিলে। ইংরাজীতে ত পরিপক্ক; তার পর স্কুলে পড়বার সময়ে সংস্কৃত শিখেছিলেন; কাশীতে কর্মোপলক্ষে পাঁচ বছর থাকেন, তখন পণ্ডিত রেখে সেই সংস্কৃত পাকা করে নিয়েছেন। তা ভিন্ন পারসী ও আরবীতে বিলক্ষণ বিদ্যা আছে। যেমন সকল শাস্ত্রে দৃষ্টি তেমনি সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুতা। বিদ্যারত্ন মশাই-এর সঙ্গে কিরূপ বন্ধুতা তা ত শুনেছ; আমার ও হরেনের প্রতি কি প্রেম তা বলবার নয়; তার পর এমামবাড়ীর একজন মৌলবী সাহেব আছেন তাঁর সঙ্গেও গলাগলি ভাব। এমন উদার সদাশয় মানুষটি আর দেখা যায় না।

নবাগত। তাইত হে ইনি যে চুঁচুড়ার একটি দ্রষ্টব্য পদার্থের মধ্যে।

মহেন্দ্র। তাতে কি আর সন্দেহ আছে? মানুষটা কিরূপ সহৃদয় তার প্রমাণ দেখনা কেন, নয়নতারাকে সংস্কৃত পড়াবার জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে মাসে ৩০ টাকা দেন; পটলা ও টুনীকে পড়াবার জন্য হরেনকে মাসে ২৫ টাকা দেন; তাদের দুজনকে ব্রহ্মসংগীত শেখাবার জন্য আমাকে মাসে ১৫ টাকা দেন ও মৌলবী সাহেবের লোককে মাসে ১০ টাকা দেন। এই ৮০ টাকা দান বললেও হয়, কোনও রূপে আমাদের সাহায্য করা।

নবাগত। তা বুঝতে পেরেছি, নতুবা তুমি আবার গান শেখাবে কি? তোমার সঙ্গীত বিদ্যাতে যে দখল তা ত আমার অগোচর নেই। মানুষটি ধনেও কম নন দেখছি।

মহেন্দ্র। শুনেছি পৈত্রিক দেড় লাক দুলাক টাকা পেয়েছেন, তার পর নিজের সঞ্চয় আছে। এ ঘরে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী বিরাজ করছেন।

তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছে, ওদিকে রায় মহাশয়ের সন্তানদের দোল থামিয়া গেল। বন্ধুদ্বয় যেদিকে দণ্ডায়মান ছিলেন, রায়গৃহিণী সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেন্দ্র নবাগত বন্ধুকে বলিলেন, "কর্ত্রী বুঝি আমাকে দেখছেন, এখনি ডাক পাঠাবেন, চল সরিয়া

পড়ি।" এই কথা বলিয়া দুই বন্ধুতে সরিয়া পড়িলেন। গৃহিণী দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। শরদের বেলা অবসান প্রায়; ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শরদভ্রে অস্ত-গমনোন্মুখ দিবাকরের সিন্দুরাভ কিরণমালা পড়িয়া পশ্চিমাকাশকে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন করিয়াছে; সান্ধ্য সমীরণের সুরভি নিঃশ্বাস শরীর মনকে পুলকিত করিতেছে; অদূরে গঙ্গাসলিলে নৌকা সকল মরাল-কুলের ন্যায় পালপক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে; গঙ্গার পরপারবর্তী বৃক্ষশ্রেণীর পাদদেশে সন্ধ্যার ছায়া ও মস্তকে রবিকিরণের রক্তিম ছটা পড়িয়া তাহারা এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে; বিহঙ্গমকুল চরা করিয়া গঙ্গা পার হইয়া ডাকিতে ডাকিতে আবাসনীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। গৃহিণী গোধূলির এই অপূর্ব শোভা দর্শন করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন রহিয়াছেন। এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র হঠাৎ পশ্চাতে আসিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "এই যে মা তোমাকে একলা পেয়েছি, বসো দেখি একটা কথা আছে।"

গৃহিণী। (নিকটস্থ আরাম কুরসীতে বসিয়া) কি কথা?

সুরেশ। (উপবেশনান্তর) তুমি নয়নতারার কথা কি ভাবছ?

গৃহিণী। কি আর ভাববো? ওরা ত আর কচি মেয়ে নয় যে ধ'রে বেঁধে বিয়ে দেব।

সুরেশ। তুমি ওর মনের কথাটা জাননা কেন? যদি বিয়ে করবার ইচ্ছে না থাকে ভেঙ্গে বলুক, তা না হ'লে আমরা এক একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে ডেকে ডুকে আনবো, আর ও তাদের ধারেও যাবে না; এতে বড় অপমান বোধ হয়। দেখলে সেদিন এক বেচারাকে এনেছিলাম, ও কি রকম করলে! আমি ত বাপু প্রতিজ্ঞা করেছি ও রকম চেষ্টা আর করবো না।

গৃহিণী। কে জানে বাপু! ও গুলোর পেটের কথা বোঝাই ভার। আমি বললে গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে বলে, "মা জননি! আমরা কি তোমার ভার বোঝা হয়েছি যে, বিদেয় করতে পারলে বাঁচ।" ভাবে বোধ হয়, ঘটকালির বিয়েটা ওদের ভাল লাগে না।

সুরেশ। আচ্ছা, তা যেন বুঝলাম, বড় হয়েছে ঘটকালির বিয়েটা করতে চায় না, প্রেমে না পড়লে বিয়ে করবে না; কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেদের ডেকে আনলে সেধারেও ত যাবে না। লোকের সঙ্গে না মিশলে প্রেমে পড়বে কি করে? এ যে দেখি উভয়সঙ্কট, ঘটকালিতেও রাজি হবে না, লোকের সঙ্গেও মিশবে না।

গৃহিণী। কেন, এদিকে ত যে বাড়ীতে আসে তার সঙ্গে বেশ মেশে। লোককে খাওয়াতে দাওয়াতে আদর আপ্যায়িত করতে ত বেশ জানে।

সুরেশ। তা ত বেশ জানে, কিন্তু যখনি আমরা এই অভিসন্ধিতে কারুকে ডাকি, অমনি যেন গন্ধে টের পায়, অমনি যেন সে বেচারাকে দশ হাত দূরে রাখে, কাছে ঘেঁষতেই দেয় না। ওরা কি কম শয়তান! আমরা জাল পাতব কি আগেই যেন পথ কেটে রাখে।

গৃহিণী। ওমা আমি ত এত কথা কিছুই বুঝতে পারিনি!

সুরেশ। তুমি সাদাসিদে মানুষ, বালকের মত মনটি, তাই তুমি এ সব বুঝতে পার না, অন্য মা হ'লে ডুবুরি নামিয়ে পেটের কথা তুলে আনত। আমি নিশ্চয় বলছি ও হরেনকে ভালবাসে, তাই বিয়ে করতে চায় না।

গৃহিণী। ওমা তাই নাকি, কৈ আমি ত কিছু বুঝতে পারিনি। সে ঘরের ছেলের মত আসে যায়, সকলেই ত তার সঙ্গে মেশে।

এমন সময়ে রায় মহাশয় সেখানে উপস্থিত। ইঁহার বয়ঃক্রম ৫৭।৫৮ হইবে; কিন্তু ইঁহার দেহে বয়সের প্রমাণ কিছুমাত্র পাওয়া যায় না। বর্ণ গৌর, উন্নত দেহ, প্রশস্ত ললাট, নেত্রদ্বয় দীর্ঘায়ত, শ্মশ্রুবিহীন মুখ, মস্তকের কেশ দুই এক গাছি পাকিয়াছে।

কর্তা। এই যে সুরেশ! তুমি এখানে বসে আছ, তবে যে চাকরেরা বললে তুমি বাড়ী নাই, ভদ্রলোকটি ফিরে গেলেন।

সুরেশ। যাঃ ঐ ভদ্রলোকটির জন্যেই আমি আজ বেড়াতে বাহির হই নাই; তাঁকে বলে এসেছিলাম যে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে দেখা করবেন।

কর্তা। তা চাকরেরা কি করে জানবে, তারা জানে তুমি রোজ বেড়াতে যাও, আজও গিয়েছ।

সুরেশ। চাকরদের বলে রাখাই উচিত ছিল। (থামিয়া) দেখুন বাবা! আমি মাকে বলছিলাম, যে তুমি কেমন মা, তুমি নয়নতারার পেটের কথা টেনে বার করতে পার না। তার বয়স ২২।২৩ বৎসর হতে গেল, বিয়ে করবে কি না জানা ত উচিত।

কর্তা। আমার বোধ হয় ওর বিয়ে থাওয়া করবার ইচ্ছে নাই।

সুরেশ। না, তা নয়, আমি ত মনে করি ও হরেনকে ভালবাসে।

কর্তা। তাই নাকি, তা কেন ভেঙ্গে বলে না?

সুরেশ। জানে আমাদের কারুর মত হবে না।

গৃহিণী। তা যদি ওকেই ভালবাসে ত ওকেই বিয়ে করুক।

সুরেশ। হাঁ, তা আর নয়, হরেনের মা সেদিন পর্যন্ত রাঁধুনী বামনীর কাজ করেছে। রমেশ ত সিভিল সার্ভিস পাশ করেছে, কাল সে একটা জেলার মাজিস্ট্রেট হবে; কাল যোগেশ একটা বারিষ্টার হয়ে আসবে; তারপর বড়িশার চন্দ্রশেখর রায়কে কে না জানে? তোমার বাপেরাও ত কম লোক নন; রাঁধুনী বামনীর ছেলেকে মেয়ে দিলে আমরা কি আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারবো? যার সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারবো না, তাকে ভগিনীপতি করতে চাই না।

গৃহিণী। তা বললে কি হয়, হরেনের অবস্থা কি চিরদিন অমনি থাকবে? ও কি চির-দিন চল্লিশ টাকার চাকুরী করবে? উন্নতি হবে না? যা হোক্, বি.এ পাশ ত করেছে, আজ না হোক দুদিন পরে ত দু'টাকা এনে খেতে পারবে। আর আমাদের মত মানুষ কি সব সময় পাওয়া যায়?

সুরেশ। বল কি মা, রাঁধুনী বামনীর ছেলেকে মেয়ে দেবে? তুমি নিজে কত বড় ঘরের মেয়ে তা একবার স্মরণ করে দেখ।

গৃহিণী। তা ব'লে কি করা যাবে? ভগবান যাকে যেমন করেছেন। ও গরীব সেটা ত ওর দোষ নয়; আর অমন ছেলেই বা কটা পাবে? দেখতে শুনতে, বুদ্ধি বিবেচনাতে, লেখা-পড়াতে কোন্ বিষয়ে কম?

সুরেশ। সে যে ছেলে ভাল তা আমি স্বীকার করি। হাজারের মধ্যে অমন একটা ছেলে পাওয়া ভার, ত'ও সত্যি; কিন্তু সে যে রাঁধুনী বামনীর ছেলে সেটা ত আর গোপন থাকবে না।

গৃহিণী। ঐ ত মুস্কিল, তোমরা মত না করলে কি করে হয়? তবে আমি ভাবি মেয়েটার মত ত দেখতে হবে। সে যদি যথার্থই তাকে ভালবাসে তবে তার সঙ্গেই ত বিয়ে হওয়া উচিত; তা না হলে ত স্ত্রীলোকের ধর্ম থাকে না।

সুরেশ। বাবা, আপনি যে কথা কচ্চেন না? আপনি কি বলেন?

কর্তা। (গম্ভীরভাবে) আমি কেবল ভাবছি নয়নতারা কি যথার্থই হরেনকে ভালবাসে।

সুরেশ। আমার ত তাই বোধ হয়; দুজনের ভাবগতিক দেখলে ত তাই মনে হয়। হরেন যে কেবল টুনী ও পটলাকে পড়াতে আসে তাত নয়, আপনি চোখ রেখে দেখবেন সে কতটা সময় নয়নতারার সঙ্গে কাটায়।

কর্তা। আমরা ত আর তাকে ছেলেদের মাষ্টারের মত দেখি না; তাকে বাড়ীর ছেলের মতই বোধ করি; তার সঙ্গে ত আমার এক পুরুষের সম্পর্ক নয়; তাকে ত পরের মত ব্যবহার করতে পারি না।

সুরেশ। (গম্ভীরভাবে) I know all that; but as matters now stand, I think their intimacy should not be allowed to proceed further. এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

গৃহিণী। হাঁ গা সুরেশ কি বলে গেল?

কর্তা। ও বলে গেল, হরেন ও নয়নতারার মেলামেশিটা আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

গৃহিণী। তুমি কি করবে ভাবলে?

কর্তা। করবো আবার কি? হরেন আমার বন্ধুর ছেলে; তাকে ডেকে এনে কর্ম দিয়েছি; তার আচার ব্যবহারে কিছুই অন্যায় দেখিনে; সেও আমাদের পর দেখে না; হাজারের মধ্যে অমন একটা ছেলে পাওয়া ভার। আমি ত দেখতে পাচ্চি, তার সঙ্গে মিশে নয়নতারার বিশেষ উপকারই হয়েছে। সর্বদা লেখাপড়া ও ভাল বিষয়ের চর্চা নিয়ে আছে। আমি কি আজ হরেনকে কর্ম ছাড়িয়ে দিতে পারি, অথবা নয়নতারাকে এমন কথা বলতে পারি যে হরেনের সঙ্গে মিশো না?

গৃহিণী। আমিও তাই বলি, ওত বাড়ীর ছেলে বললেই হয়। সে সোনার চাঁদ ছেলে, তার দোষ কি যে বাড়ীতে আসতে বারণ করবো?

কর্তা। তার সন্দেহ কি? আর কেবল হরেন ভাল ছেলে বলেই যে ভালবাসি তাত নয়। ওর বাপের কথা কি কখনও ভুলবো? সে আমার যে বন্ধু ছিল, তাতে হরেনকে ছেলের মত মানুষ করাই উচিত।

গৃহিণী। হাঁগা সত্যি কি হরেনের মা রাঁধুনী বামনীর কাজ করতো?

কর্তা। কি করে জানবো? আমি অনেকদিন দেশে ছিলাম না। হতেও পারে। শুনেছি নাকি কিছুদিন রাঁধুনী বামনীর কাজ করেছে।

গৃহিণী। আহা! সাধে কি এমন কাজ করেছে! ছেলেটি নিয়ে খেতে পায় না কি করে!

কর্তা। তা বৈকি। ওরা কি বিপদে পড়েছিল তা আমিই জানি!

গৃহিণী। তুমি নাকি দু-হাজার টাকা দিয়েছ?

কর্তা। হাঁ দিয়েছি! সে ব্যাপারটা কি জান? আমরা যখন হিন্দু কালেজে পড়ি, তখন হরেনের বাবা হরদেব চাটুয্যে আমাদের পাড়াতে থাকতো। তখন সে সংস্কৃত কালেজে পড়তো। মানুষটি এমনি বুদ্ধিমান অথচ এমনি বিনয়ী ও সৎ ছিল, যে দেখলে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকা যেত না। তখন আমি মাসে দশ টাকা ক'রে দিয়ে তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়তাম। সেই সময়ে দুজনে খুব বন্ধুতা হয়। তারপর আমি বিদেশে গেলে শুনলাম যে হরদেব কালেজ হতে বার হয়েই সংস্কৃত কালেজে ৬০ টাকার একটি কর্ম পেয়েছে। চাকুরীটা পেয়েই সাধ হলো যে একখানা বাড়ী করবে। মানুষ আশার উপর খড়ি পেতে কাজ করে কি না! কর্মটা হলো দুচার বছর সবুর কর, তা না, মনে ভাবলো ধার ক'রে বাড়ীটা ক'রে ফেলি ক্রমে শোধ হবে। বাড়ীত ফেঁদে বসলো। আগে যা ভেবেছিল তার ডবল খরচ হলো। শেষে নিরুপায় হ'য়ে পশ্চিমে আমাকে লিখল, আমি দু-হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম। তারপর বছর না ফিরতে সেত চলে গেল। বিদেশ থেকে শুনলাম যে মারা গিয়েছে। তারপর দেনার জন্যে জমিজিরেত যা কিছু ছিল সব গেল। বিধবা স্ত্রী ছেলেটি নিয়ে ভাসলো। এসব আমাকে কেউ জানালো না। যাহোক পরে শুনলাম হরেন বড় হয়েছে ও পড়াশুনা করছে। দেশে এসে দেখি সে চুঁচুড়াতেই আছে। কিন্তু ৪০ টাকা বেতন পায়, তাতে তার চলে না; নিজের ও মার ভরণ পোষণ হ'য়ে অবশিষ্ট হাতে কিছু থাকে না। সে যে অভিমানী ছেলে, দান করতে চাইলে নেবে না। ভাবলাম টুনী ও পটলাকে পড়াবার ছুতো ক'রে কিছু দেওয়া যাক্। তাই মাসে ২৫ টাকা দিয়ে তাকে নিযুক্ত করেছি। আমি কি এখন ওকে তাড়াতে পারি? আমি যেদিন ওর বাবার কথা ভুলবো, সেদিন অধম হয়ে যাব।

গৃহিণী। ওঃ তুমি ওর বাপের কাছে সংস্কৃত পড়েছিলে?

কর্তা। তা জানতে না? সে সংস্কৃতে মহা পণ্ডিত ছিল। ওদের বংশটাই পণ্ডিতের বংশ। ঐ হরেনও ত বেশ সংস্কৃত জানে। ঐত নয়নতারাকে সংস্কৃত শেখবার জন্যে নাচিয়ে তুলেছে। ওরই উৎসাহে ত নয়নতারা এত মন দিয়ে লেখাপড়া করছে? ওরি সঙ্গে মিশেই মদ খাওয়ার এত বিরোধী হয়েছে; এবং মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছে। তাইতে ত সুরেশ বলে নয়নতারা হরেনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। তুমি কি সেরূপ ভাব কিছু বুঝতে পার?

গৃহিণী। না বাপু, প্রেমে পড়া টড়া আমি বুঝতে পারিনি। বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে আসে যায় এইমাত্র জানি।

কর্তা। (হাসিয়া) তা বুঝবে কি করে, কখনও ত প্রেমে পড়লে না; ছেলেবেলা মা-বাপে হাত পা ধ'রে একজনের সঙ্গে বেঁধে দিলে, প্রেমের ব্যাপার জানবে কি করে।

গৃহিণী। কেন তোমার সঙ্গে ত প্রেমে পড়েছি।

কর্তা। ধ'রে ভদ্র ঘটালে, না পড়ে আর করবে কি?

গৃহিণী। না না ঠাট্টা নয়, আমি যদি বড় হ'য়ে বিয়ে করতাম, আর তোমাকে দেখতাম, তোমার সঙ্গে নিশ্চয় প্রেমে পড়তাম। হাজার লোকের মাঝখানে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে, তোমাকে ধরে বলতাম এই আমার বর।

কর্তা। অমন ক'রে বলো না, সুপুরুষ বলে আমার অহঙ্কার হবে।

গৃহিণী। কেন সুপুরুষটা নও কিসে? যা একটু দাঁত দুটো উঁচু।

কর্তা। থামলে কেন, চলুক না, যা একটু নাকটা বাঁকা, যা একটু কপালটা টেপা।

গৃহিণী। ঠাট্টা তামাসা থাক্, এখন কি করা যায় বল দেখি। মেয়েটা যদি সত্যি সত্যিই হরেনকে ভালবাসে তাহলে কি করা উচিত? আমি বলি হলোইবা গরীবের ছেলে, ছেলেত ভাল, ঐ হরেনের সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া যাক।

কর্তা। আমার যে বড় অমত আছে তা নয়, তবে ছেলেদের ভাব ত দেখছ। ওদের বোনের বিয়েতে ওরা অসুখী হবে, সেও একটা কথা।

গৃহিণী। তবে কি করা যায়?

কর্তা। নয়নতারা আমার তেমন মেয়ে নয়; ও চিরদিন আমার ঘরে থাকলেও আমার ভাবনা নাই; দেখা যাক্ না, হরেন কি রকম দাঁড়ায়। সেও ভাল ছেলে, সে যদি নয়নতারাকে বাস্তবিক ভালবাসে, তাহলে আপনার অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে। তখন ভাইদের আপত্তি থাকবে না।

গৃহিণী। ওমা আর কত দিন মেয়ে আইবড়ো থাকবে! তোমাদের বাপু সবদিকেই বাড়াবাড়ি।

কর্তা। উপায় কি? এত জোরে ঘটাবার বিষয় নয়; এখন তার বয়স ২২ বৎসর, না হয় আর দু-এক বৎসর পরেই বিবাহ হবে।

ইতিমধ্যে টুনী ও পটলা হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পড়া শেষ করিয়া ঝগড়া করিতে করিতে নালিশ করিবার জন্য পিতা মাতার নিকট উপস্থিত হইল। টুনীকে কে বলিবে চৌদ্দ পনর বৎসরের মেয়ে! সে বাম হস্তে পিতার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক, তাঁহার কোলে বসিয়া, দক্ষিণ হস্ত তাঁহার দাড়িতে দিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ দেখি বাবা, আমি একটা আঁক কষ্তে পারিনি বলে ছোড়দা আমাকে বলে 'তোর মাথায় ব্রেণ নেই, কেবল গোবর'।" রায় মহাশয় তনয়াকে বুকে চাপিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "না না, সে কি কথা! আমি বলছি তোমার মাথায় ঢের ব্রেণ আছে; পটলা যে এমন কথা বলেছে, তাতেই প্রমাণ ওর ব্রেণ নাই।" এই বলিয়া পটলকে ভগিনীর প্রতি অসৌজন্যের জন্য তিরস্কার করিলেন। পটল পিতার নিকট তিরস্কার খাইয়া মাতার নিকট ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী কি কাজে ভিতরে উঠিয়া গেলেন; পটলও তাঁর সঙ্গে

সঙ্গে গেল। কর্তা দেখিলেন নয়নতারা উপরের সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কর্তা। কি নয়নতারা ওখানে যে?

নয়নতারা। (যেন কিঞ্চিৎ থতমত খাইয়া) এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কিয়ৎক্ষণ পরেই কর্তা দেখিলেন হরেন্দ্র আসিয়া নয়নতারার হস্তে কি একখানা পুস্তক দিয়া চলিয়া গেলেন।

কর্তা। ও কি বই? দেখি। আলোটা কাছে আন দেখি। নয়নতারা পুস্তকখানি পিতার হস্তে দিয়া আলোটা নিকটে দিলেন। কর্তা দেখিলেন, পুস্তকখানির নাম 'Women, Her Work Andh Wort । পাতা উল্টাইয়া তাহার পরিচ্ছেদ বিভাগগুলি ও দুই এক পত্রের দুই এক পংক্তি দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "বাঃ সুন্দর বইখানি ত, হরেন এ বই কোথা পেলে?"

নয়নতারা। উনি আমার কাছে একদিন এই বইখানার অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন; তাই আমি কিনতে বলেছিলাম; এবার কলকাতায় গিয়ে কিনে এনেছেন।

কর্তা। এ বই পড়লে যে আমাদেরই উপকার হয়। থাক্ আমি একবার নেড়ে চেড়ে দেখি, পরে তোমাকে দেব।

নয়নতারা অতি প্রসন্ন চিত্তে পিতৃসান্নিধান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কর্তা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সুরেশ যাহা বলিয়াছে তাহা কি সত্য?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বৈকালে মহেন্দ্রনাথ নবাগত বন্ধুকে রায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য লইয়া গেলেন। গিয়াই দেখেন রায় মহাশয় ও ভুবনেশ্বর বিদ্যারত্ন বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। হুগলীর এমামবাড়ীর মৌলবী সাহেবও সেখানে আছেন। তিনিও রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রায় মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এস হে ভাই, এইবারে মিলটা ঠিক হলো।"

মহেন্দ্র। সে কি রকম?

রায় মহাশয়। গুরুদেব ত হিন্দু, মৌলবী সাহেব ইসলাম, তুমি ব্রাহ্ম, আর আমি খ্রীষ্টান, মিলটা ঠিক হলো না?

মহেন্দ্র। (উভয় বন্ধুতে আসন পরিগ্রহান্তে) আপনি খ্রীষ্টান কিসে?

রায় মহাশয়। আরে লোকে ত আমাকে খ্রীষ্টান বলে, তাই বলে বলছি।

মহেন্দ্র। লোকে অমন কত কি বলে থাকে, আমি ত আপনাকে একজন ব্রাহ্ম মনে করি।

রায় মহাশয়। ভালবেসে যা ইচ্ছে বলতে পার।

বিদ্যারত্ন। আমাদের লৌকিক আচারগুলো সব মানেন না কিনা, তাই লোকে খ্রীষ্টান বলে। আমি ত সেকালের রাজর্ষি জনক প্রভৃতির কথা যেরূপ শুনেছি, আপনাকে তেমনি দেখি।

রায় মহাশয়। ওটাও ভালবাসার কথা হলো।

মহেন্দ্র। এই একটি ভদ্রলোককে আপনার সঙ্গে পরিচয় করে দিতে এনেছি; এঁর নাম পরেশনাথ রায়; রেলওয়ে আপীষে চাকুরী করতেন, সম্প্রতি চাকুরী ছেলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হয়েছেন।

রায় মহাশয়। দাঁড়াইয়া নবাগত ভদ্রলোকটিকে অভিবাদন করিলেন। (নবাগত ব্যক্তির প্রতি) আপনাদের স্বার্থত্যাগ ধন্য! আপনাদের দেখলে আশা হয় যে দেশটা একদিন উঠলেও উঠতে পারে। চুঁচুড়াতে কি মনে করে?

মহেন্দ্র। আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম, উনি এ সহরটি কখনও দেখেন নাই, তাই আমার মুখে শুনে দেখতে এসেছেন।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) চুঁচুড়াতে দেখার মত কি আছে?

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) কেন আপনি আছেন।

নবাগত বন্ধু। বিদ্যারত্ন মহাশয় ঠিক বলেছেন।

রায় মহাশয় দেখিলেন, কথোপকথনটা তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িতেছে; অমনি তাহার গতি ফিরাইবার জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এঁরা যে দেশ শুদ্ধ ছেলে ব্রাহ্ম করে নিলেন। আপনারা করেন কি?"

বিদ্যারত্ন। ওঁরা ত ধার্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী লোক, ওঁদের মত হলে ত ভালই হয়, তবু ধর্মে মতি থাকে; এখনকার ছেলেপিলে তাত হচ্চে না, তারা যে দুই-এর বার হ'য়ে যাচ্চে। না সেকালের কিছু মানে, না এঁদের কথা শোনে।

রায় মহাশয়। তা ঠিক বলেছেন। ইংরাজী শিক্ষাতে আমাদের দুই-এর বার করে দিয়েছে।

মহেন্দ্র। (রায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) পরেশবাবু বেশ গাইতে পারেন। আপনি এঁর মুখে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত শুনবেন?

রায় মহাশয়। কথাবার্তার মধ্যে ব্রহ্মসংগীতটা শুনবো? আর কোনও সময়ে উপাসনার একটু আয়োজন ক'রে শোনা যাবে।

মহেন্দ্র। সেই বেশ, তা হলে আর একদিন ওঁকে এখানে পাওয়া যাবে।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, প্রায় সন্ধ্যা সমুপস্থিত। এমন সময়ে কোথা হইতে সেতারের মধুর ঝংকারধ্বনি আসিয়া সমাগত ব্যক্তিদিগের চিত্তকে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

পরেশনাথ। (ইতস্ততঃ চাহিয়া) কে কোথায় চমৎকার সেতার বাজাচ্চে।

রায় মহাশয়। আমার কন্যারা ওস্তাদের কাছে সেতার শিখছে। (বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতি) গুরুদেব! আপনার ছাত্রীর সেতার বাজনা শুনবেন?

বিদ্যারত্ন। হাঁ হাঁ নয়নতারার সেতারটা একবার শুনতে হবে; খুব প্রশংসা শুনেছি।

রায় মহাশয়। মহেন্দ্র তোমরাও চল না।

সকলে উঠিয়া উপরের যে ঘরে নয়নতারা ও সৌদামিনী ওস্তাদের নিকট সেতার শিখিতেছিলেন, সেই ঘরে গেলেন। গিয়া দেখেন দ্বারে প্রবেশ করিতে বাম দিকে একখানি ছোট কার্পেটের উপরে সেতারহস্তে একটি বৃদ্ধ মুসলমান বসিয়াছেন ও তৎপার্শ্বে একজন বাদক বসিয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে অপর একখানি কার্পেটের উপরে নয়নতারা ও সৌদামিনী দুইজনে দুইটি সেতার হস্তে বসিয়াছেন। সংগত চলিতেছে। ইঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র বাজনাটা একবার বন্ধ হইল। রায় মহাশয়ের আদেশে আবার বাদন আরম্ভ হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে ও নবাগত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া কন্যাদ্বয়ের যেন কিঞ্চিৎ সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ থাকিল না। একটু বাজাইতে না বাজাইতে তাঁহারা আবার আত্মহারা হইয়া গেলেন ও সুস্বররসে মগ্ন হইয়া বাজাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে টুনী ও পটলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া শিষ্যদ্বয়সহ হরেন্দ্রও সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্যকার বাজনাটা রায় মহাশয়ের এমনি ভাল লাগিল যে, তিনি স্বয়ং যোগ না দিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি টুনীর কানে কানে নিজের সেতারটা আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেতার আনীত হইল; সুর বাঁধা হইল; এবং তিনি কন্যাদ্বয়ের সহিত বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একজন সেতারে সুপরিপক্ক লোক। তিনি সেতার ধরাতে কন্যাদ্বয়ের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কয় সেতারে সে কি এক স্বরতরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পিতার আদেশে কন্যাদ্বয় সেতার রাখিয়া বেহালা লইলেন ও গাইতে লাগিলেন। বেহালার সুরে ও বামাকণ্ঠে মিলিয়া মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্র বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘরে উপস্থিত। তিনি ভগিনীদ্বয়কে গাইতে দেখিয়া বাদকের হস্ত হইতে বাজনাটা টানিয়া লইলেন ও নিজে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সংগতটা এমনি জমিয়া গেল, যে বাড়ীর যে

যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায়! যেন নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য নাই। শ্রোতাদিগের বোধ হইতে লাগিল যেন মন প্রাণ সুধারসে সিক্ত করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে!

ক্রমে বাজনা থামিল। চারিদিকে প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় সায়ংসন্ধ্যার জন্য সত্বর গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মৌলবী সাহেব, মহেন্দ্রনাথ ও পরেশনাথ উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে পরেশনাথ এই রায় পরিবারের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ভাই, কি সুখী পরিবার! পিতা-পুত্রে, ভাই-বোনে, এমনভাবে মিশিতে কখনও দেখি নাই। রায় মহাশয়ের ঐ মেয়েটি সরস্বতীই বটে; তাতে কিছু সন্দেহ নাই। যেমন রূপ তেমনি গুণ।"

বাহিরের লোকেরা চলিয়া গেলে পরিবারস্থ সকলে বৈঠকের ঘরে গিয়া বসিলেন। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আহারের পূর্বে সকলে একত্রে এইরূপে বসা হয়। সে দৃশ্য কি সুন্দর! রায় মহাশয় একখানি আরাম কুরসীতে বসিয়াছেন। দক্ষিণ পার্শ্বের আসনে নয়নতারা ও বাম পার্শ্বের আসনে সৌদামিনী উপবিষ্টা। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে সংগীত-বিদ্যা বিষয়ে পিতার মতামত শ্রবণ করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র নয়নতারার চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পিতার কথা শুনিতেছেন ও অন্যমনস্কভাবে ভগিনীর কুন্তলগুচ্ছ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ওদিকে নন্দরাণী সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটিকে লইয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে দিয়াছেন। সে পিতামহীর ক্রোড়-সিংহাসন অধিকার করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী চপলা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুধীশের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। গৃহিণী সেই আনন্দেই নিমগ্ন আছেন। পটল একখানি কোচের উপরে নন্দরাণীর গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া, একখানি ছবির বই লইয়া ছবি দেখিতেছে ও তাঁহাকে দেখাইতেছে। নন্দরাণীর সহিত পটলের বিশেষ হৃদ্যতা। গোপনীয় কথা যাহা কিছু তাঁহাকেই বলে। মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখে, কিন্তু বাড়ীর লোকের ঠাট্টা তামাসার ভয়ে কাহাকেও দেখায় না। নন্দরাণী এ বিষয়ে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উৎসাহদায়িনী। সে যখন যাহা কিছু লেখে, নন্দরাণীকে তাহা পড়িয়া শুনায় এবং তাঁহার ভাল না লাগিলে ছিঁড়িয়া ফেলে।

জ্যেষ্ঠপুত্র ও কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে রায় মহাশয়ের কথোপকথন চলিতেছে, ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা মিনী চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া আসিয়া পিতামহের ক্রোড়ে উঠিয়া পড়িল। সুতরাং কথোপকথনটা ভাঙ্গিয়া গেল।

রায় মহাশয়। (পৌত্রীকে বুকে ধরিয়া) কি নাতিন, কি হয়েছে, ভয় কেন?

মিনী। বাঘ তাম্মাবে।

পার্শ্বে ফিরিয়া দেখেন টুনী চারি পায়ে হামা দিয়া ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বিকট রব করিয়া সেদিকে আসিতেছে। (সকলের হাস্য এবং টুনীর উত্থান ও হাস্য)। অতঃপর রায় মহাশয় সন্তানদিগের সহিত কথোপকথন বন্ধ করিয়া মিনীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মিনীর বয়স আড়াই কি তিন বৎসর। চেহারাটি গোলগাল, স্বাস্থ্যে প্রস্ফুটিত; বিশাল, উজ্জ্বল নীলাভ চক্ষু দুটি যেন আনন্দে ভাসিতেছে! কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি সিঁথীর দুপাশে ঢেউ খেলাইয়া স্কন্ধ পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় কি সুগঠন! হাসিলে উভয় প্রান্তে কি শোভাই হয়! কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মিনীর হাসি অপেক্ষা কান্নাই সুন্দর; আমাদের মতে মিনীর হাসি কান্না সবই ভাল, মিনী যা করে তাই ভাল লাগে। মিনীর আঙ্গুলগুলি যেন চাঁপার কলি! পিতামহের হাতখানির উপরে আঙ্গুলগুলি রাখিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন মোমে গড়া আঙ্গুলগুলি পড়িয়াছে। তাহার পরিধানে জুতা, মোজা, পাজামা ও হাতকাটা ফ্রক। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলির নীচে মোমে গড়া বাহু দুখানি বাহির হইয়া আছে, কি সুন্দরই দেখাইতেছে!

রায় মহাশয়। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে একখানা জানোয়ারের ছবির বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া একটা ছবি বাহির করিয়া) এটা কি নাতিন?

মিনী। চিংহ।

রায় মহাশয়। এটা ?
মিনী। বাদ।
রায় মহাশয়। এটা ?
মিনী। ভল্লুক।
রায় মহাশয়ের অট্টহাস্য।

নয়নতারা। বাড়ীতে এমন ছবির বই নাই, যার বিবরণ ও জানে না। সকলের গল্প জানে, আবার অভিনয় ক'রে দেখায়।

সৌদামিনী। ওটা ত first-class actress।

এই কথোপকথন ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র নয়নতারাকে ঠেলিয়া চেয়ার হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। Well, get up, get up before dinner time there is another duty waiting for you. You have to copy some of my notes

নয়নতারা। বাংগলা ক'রে না বললে আমি শুনব না।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) তুমি ইংরিজীর উপর এত গররাজি কেন ?

নয়নতারা। মা-বোনের সংগে কে কোথায় ইংরিজী বলে, বাংগালির ছেলে বাংগলা বল না বাপু।

সুরেশ। তুইত ভট্‌চাজ, আমি কি তোর মত বাংগলা বলতে পারি ?

নয়নতারা। বেশ পার, অতি উত্তম পার; মার সংগে বাংগলা বল না ? তখন ত চোস্ত চোস্ত বাংগলা আসে। আর আমরা একটু ইংরিজী জানি বলে বুঝি ঘোড়া দেখে খোঁড়া হও, যখন তখন ইংরিজী ছাড় ?

সুরেশ। বাপরে বাপ্‌, নাকে কানে খত, ঘাট হয়েছে, আর ইংরিজী বলব না। বাংগলায় বলছি—ওঠ ওঠ খাবার পূর্বে আমার কতকগুলো নোট নকল ক'রে দিতে হবে।

নয়নতারা। (হাসিয়া) আচ্ছা চল দিচ্ছি।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) ওকে বুঝি তোমার নকল-নবিশী কর্ম দিয়েছ ?

সুরেশ। ওর হাতের ইংরিজী লেখাটি অতি সুন্দর। আর এমন ও নিখুঁত লেখে যে একটি কাটতে কুটতে হয় না। তাই আমি প্রায় ওকে দিয়ে নোটগুলো কপি করাই।

এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র নয়নতারাকে নোটগুলি বুঝাইয়া দিতে গেলেন। তিনি নিজের পড়িবার ঘরের টেবিলে ভগিনীকে বসাইয়া বাতি, কালি, কলম, কাগজ প্রভৃতি দিয়া বলিয়া গেলেন, "তুই লেখ্‌ আমি আসছি।"

অর্ধঘণ্টা পরে সেই গৃহের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় আসিয়া দেখেন নয়নতারা লেখাতে নিমগ্ন। সুন্দর ললাট যেন দীপালোকে আভা উদ্গীরণ করিতেছে; বিমল গৌরবর্ণ কপোলযুগলে ভৃঙ্গ-রাজির ন্যায় কুন্তলরাজি পতিত হওয়াতে ভগিনীর মুখারবিন্দ কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। নয়নতারা লিখিতেছেন ও দাড়িম্ববীজসম বিমল দন্তাবলীর দ্বারা বিম্ব-ফল-সদৃশ অধরপ্রান্ত বার বার চাপিতেছেন; তাহাতে সেই মুখারবিন্দের শোভা দ্বিগুণ বর্ধিত হইতেছে! সুরেশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্বে একাগ্রচিত্তে সেই মুখখানি দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন—What a jewel of a sister! She is really charming; no wonder that people should go mad after her.

যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহারা হয়ত বলিবেন—একি বেজায়, মনে মনে চিন্তা করিবে তাতেও ইংরাজী? আমাদের অনেকের কিন্তু এই দশাই ঘটিয়াছে। আমরা ইংরাজীতে চিন্তা করি, বাংগালাতে অনুবাদ করিয়া বলি। সুরেশচন্দ্র বাংগালাতে চিন্তা করিলে বলিতেন— "বোন ত নয় একটি রত্ন! বাস্তবিক রূপে যেন আলো ক'রে আছে। ওকে দেখে মানুষ যে

পাগল হয় তাতে আর আশ্চর্য কি!" এরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠের দিকে দাঁড়াইয়া ভগিনীর লেখা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন—"What a fine hand you write!"

নয়নতারা। (জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া) আবার ইংরিজী?

সুরেশ। ওহো ভুল হয়েছে—তুই কি সুন্দর হাতে লিখিস্।

নয়নতারা। ওকি বাংলা হলো? তোর লেখাটি বেশ সুন্দর বললেই ত হয়।

সুরেশ। অত ব্যাকরণের ভুল ধরলে বাপু আমরা পেরে উঠব না। যা হোক, তুই কি মন নিমগ্ন করেই কাজ করিস! আমি কখন এসেছি তা টেরও পাসনি। আর এই যে একজন ভদ্রলোকের মেয়ে এসে বসে আছে তাও দেখিসনি।

নয়নতারা। (নন্দরাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ওমা, বড়বৌ, কখন এসেছ ভাই?

নন্দরাণী। প্রায় আধ ঘণ্টা।

নয়নতারা। ওমা, এতক্ষণ এসে বসে আছ! আমি কিছুই টের পাইনি।

সুরেশ। তুই যে সব কাজই ভাল করিস্, তার ভিতরকার কথা এই, যা করিস্ সমুদয় মন দিয়ে করিস্।

নয়নতারা। তাই ত ভাল, যা করা যায় সমুদয় মন দিয়ে করাই ত উচিত।

সুরেশ। উচিত তাতে কি আর সন্দেহ আছে; এইজন্যেই ত তোর হাতের লেখাগুলো পর্যন্ত নিখুঁত। এমন হাতের লেখা যার, তার যদি আর কোনও গুণ না থাকে, তাকে আমরা আপীষে ২৫।৩০ টাকা মাইনে দিয়ে রাখতে পারি।

নয়নতারা। কৈ আমি ত এত কেরাণীগিরি করি, আমাকে ত একটা পয়সাও দেও না।

সুরেশ। ঠিক বলেছিস, আমার কাজটা বড় স্বার্থপরের মত হয়, আচ্ছা আমি তোকে মাইনে দেব, কত মাইনে নিবি বল্?

নয়নতারা। (হাসিয়া) কেন নিজেই ত বলেছ একটা কেরাণীকে যা দেও তাই দিও।

সুরেশ। আচ্ছা বেশ কথা। তোকে আমি মাসে পঁচিশ টাকা করে দেব।

নয়নতারা। (হাসিয়া) আমার টাকায় কাজ নেই, তুমি সেই পঁচিশ টাকা ঐ ভদ্রলোকের মেয়েকে দিও, তা হলেই আমাকে দেওয়া হবে।

সুরেশ। ওর টাকার অভাব কি? বাবার কাছে ৩০ টাকা মাসহারা পায়। তারপর আমার বাক্স হতে চুরি চামারি করে।

নয়নতারা। তুমি এমনি স্বামীই বটে, যে তোমার কাছে চুরি চামারি করতে হয়। তোমার বলতে লজ্জা হলো না? তুমি কেন মাসহারা কিছু দেওনা?

সুরেশ। তা বুঝি দিই না? আমার পকেট খরচের জন্য মাসে ১৫০ টাকা রাখি, তার অর্ধেক ওর। তার উপর আবার চুরি চামারি করে।

নয়নতারা। ওমা তাই নাকি!

সুরেশ। তুই দেখছিস কি, ও দারুণ কিপ্টে, ওকি কারুকে জানতে দেয়, ওর বাক্স খুলে দেখিস দেখি কত টাকা জমিয়েছে।

নয়নতারা। যাও যাও তুমি বৌ-এর নিন্দে করো না, আমাদের বৌ লক্ষ্মী।

এই বলিয়া নন্দরাণীর কণ্ঠালিঙ্গন ও পার্শ্বে উপবেশন।

সুরেশ। আচ্ছা! এই কথা রৈল তুই মাসে মাসে আমার কাছে ২৫ টাকা করে পাবি।

নয়নতারা। আঃ দাদা তুমি কি পাগল হলে? সত্যি সত্যিই কি তোমার কাছে মাইনে চেয়েছি?

সুরেশ। তবে তোকে আর কোনও কাজ করে দিতে বলব না।

নয়নতারা। আচ্ছা! বাপু তোমার যা ইচ্ছে করো, আমি যে মাঝে মাঝে একটু একটু কাজ করতে পাই, তাতে বঞ্চিত করো না।

সুরেশ। তবে তাই হবে। ভাল কথা মনে এসেছে; দেখ্ শনিবার আমাদের বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক আসবেন; তিনি রবিবার এখানে থাকবেন; মিষ্টার মুখার্জির বেলা যেমন ব্যবহার করেছিলি, তেমন যেন করিস নে। বেশ খাওয়াবি দাওয়াবি আপ্যায়িত করে ছেড়ে দিবি।

নয়নতারা। লোকটা কে?

সুরেশ। বাঁকুড়ার সিবিল সার্জন ডাক্তার ন্যাণ্ডে। (নয়নতারার হাস্য) হাসলি যে?

নয়নতারা। ঐ জন্যেই ত বিলাত-ফেরতদের দেখতে পারিনি। আবার ন্যাণ্ডে কেন? নন্দী বললেই ত হয়।

সুরেশ। (বিরক্তভাবে) ঐ জন্যেই ত তোদের সংগে বনে না; মেয়েমানুষ বড় narrow —শ্রীবিষ্ণু—সংকীর্ণ—অনুদার।

নয়নতারা। ও আবার কি?

সুরেশ। তুই যে বাংগলার সংগে ইংরেজী কথা মিশান পছন্দ করিসনে।

নয়নতারা। তাই বলে তোমার বিলাত-ফেরতেরা যে ইংরিজী ও বাংগালা দুই-এর শ্রাদ্ধ করে, সে কি ভাল? তা শুনলে কেউ না হেসে থাকতে পারে না। "তিনি আমার উপরে call করেছিলেন", "অমুক আজ আমাদের বাড়ীতে teaতে আসবেন"। একি ইংরিজি না বাংগলা?

সুরেশ। তোর যে দেখি বিলেত-ফেরতের উপর বিষম রাগ।

নয়নতারা। যা বল আর কও, তোমার বিলেত-ফেরত বন্ধুগুলি বাপু বড় ছেপ্লো। কি পা ফাঁক করে দাঁড়ায়, স্থান অস্থান জ্ঞান নেই, বয়সের বিচার নেই, পদের বিচার নেই, সকলের মুখেই চুরুটের ধোঁয়া দেয়, স্বর্গে মর্ত্যে এমন ভাল বিষয় নেই—এমন ভাল কথা নেই—যাকে ঠাট্টা করে না উড়ায়, বলতে কি আমি এমন মানুষ ভালবাসিনে।

সুরেশ। তুই যা বললি, কতকটা তা সত্যি! তবে সকলেই কি ঐ রকম?

নয়নতারা। আমি ত বাপু আর সকলের সংগে মিশতে যাই নি, তোমার যে দু' একজন বন্ধুকে বাড়ীতে এনেছ, তাদের আচার ব্যবহার যা দেখেছি, আর পার্টিতে নিমন্ত্রণে গিয়ে যা দেখেছি ও শুনেছি, তাতেই এ দলের উপরে আর শ্রদ্ধা ভক্তি নেই।

সুরেশ। কেন মিষ্টার মুখার্জি ত এ প্রকৃতির লোক নয়।

নয়নতারা। রেখে দেও তোমার মুখার্জি, সে লোকটাও ছেপ্লো। আচ্ছা, বৌকে জিজ্ঞাসা কর; কি বল ভাই, লোকটা ছেপ্লো নয়?

নন্দরাণী। (গম্ভীরভাবে) হাঁ, ছেপ্লো বৈ কি।

সুরেশ। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। তোর ইচ্ছেটা বুঝি কেউ হাসবে না, খেলবে না, আমোদ করবে না, সব একেবারে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হয়ে বসে থাকবে।

নয়নতারা। কি আশ্চর্য! হাসি খেলা আমোদের কে নিন্দে করছে? আমাদের বাড়ীতে হাসি খেলা আমোদ নেই? তুমি আমি হাসি খেলি না? গাই বাজাই না? হাসি খেলা এক, ছেপ্লাম আর এক; এ দুয়ের প্রভেদ কি তুমি বোঝ না?

সুরেশ। কিছুদিন পরে তুই একটা মস্ত বিম্মী হয়ে যাবি দেখছি, যে গোঁড়া বেম্মা তোর পেছনে লেগেছে! মাছ-মাংস ছেড়েছিস, কোন্ দিন যোগিনী সেজে বসবি।

নয়নতারা। তুমি যদি অমন করে কথা বলো আমি এখানে থাকবো না। (বলিয়া প্রস্থানোদ্যত)

সুরেশ। নয়নতারা যাস্নে, শোন্ শোন্,—ডাক্তার ন্যাণ্ডে কিন্তু সে রকম মানুষ নয়।

নয়নতারা। আচ্ছা দেখা যাবে। (প্রস্থান)

সুরেশ। (নিজ পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া) দেখেছ, যেই হরেনের প্রতি একটু কটাক্ষ করেছি, অমনি একেবারে ফোস্ করে উঠেছে।

নন্দরাণী। তোমার কিন্তু অমন করে ঠাট্টা করা ভাল হয় নি।

ইতিমধ্যে নন্দরাণীর খোকাবাবু মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠাতে তিনি তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। আহারের সময় উপস্থিত, সুরেশচন্দ্রও আহারের স্থানে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহ্নে কালেজের ছুটির পর বিদ্যারত্ন মহাশয় আসিয়া নয়নতারাকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন। পাঠ্য গ্রন্থ 'রঘুবংশ'। যে স্থানটা পড়িতেছেন সেটা অজ-বিলাপ। অজরাজা ইন্দুমতীর অপমৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া বলিতেছেন;—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণা-বিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥

"হে প্রেয়সি! তুমি আমার গৃহিণী, আমার মন্ত্রী, আমার নির্জনের সখী, নৃত্য গীতাদি বিদ্যাতে আমার প্রিয়শিষ্যা ছিলে; বল নির্দয় মৃত্যু তোমাকে হরণ করিয়া আমার কি হরণ করিতে বাকি রাখিল?"

এই কবিতাটি পড়া হইলেই নয়নতারা বলিলেন—"এটা ত সেকালের লোকের মত কথা নয়, এ যে এ কালের সভ্য সমাজের কথা।"

বিদ্যারত্ন। কেন?

নয়নতারা। স্ত্রী পুরুষের সখী, এটা ত সেকালের ভাব নয়, এটা যে ইংরিজী ভাব। কালিদাসের কি আশ্চর্য কবিত্বশক্তি, তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে কোন কোনও স্থানে ভুলে যেতে হয় যে তিনি সেকালের লোক।

বিদ্যারত্ন। এটা আবার নূতন কথা কি? "মিথঃ" কথাটা ভুলো না; সকলের স্ত্রীই ত নির্জনের সখী।

নয়নতারা। আপনি যদি ইংরিজী জানতেন তবে আমার ভাব বুঝতে পারতেন। ইংরিজীতে companionship বলে একটা কথা আছে, সেইটে মনে করেই আমি কথাটা বলছি'

বিদ্যারত্ন। সে কথাটার অর্থ কি?

নয়নতারা। সেটার অনুরূপ বাঙ্গালা কথা মেলা ভার। স্ত্রী গার্হস্থ্যে, ভোগে, সুখে, জ্ঞানে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে পুরুষের সহচরী—এই বললে যা বুঝায়।

বিদ্যারত্ন। বাঃ সুন্দররূপে প্রকাশ করেছ ত! এ ভাবটা কি সেকালে ছিল না? বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, নলের দময়ন্তী, সত্যবানের সাবিত্রী কি এইভাবে পত্নী ছিলেন না?

নয়নতারা। ও ত আপনি দু-চারটা পুরাণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন। আমি সেকালের ভাবটার কথা বলছি।

এমন সময়ে হরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।

বিদ্যারত্ন। এই যে হরেন বাবু এসেছেন, উনি ত একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোক, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

হরেন্দ্র। আপনি আমাকে সংস্কৃতজ্ঞ বলবেন না; আপনার সমক্ষে আমার সংস্কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করলে লজ্জা হয়।

বিদ্যারত্ন। (নয়নতারার প্রতি) হরেন বাবুকে কবিতাটা পড়ে শোনাও ত।

নয়নতারা। (পড়িয়া শুনাইয়া হরেন্দ্রের প্রতি) স্ত্রী পুরুষের সখী এ ভাবটা কি আমাদের দেশে সেকালে ছিল না?

হরেন্দ্র। কেন থাকবে না? অনেক স্থানে আছে। তবে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের প্রতি বার বার এ আদেশ আছে যে পতিকে গুরুভাবে দেখতে হবে। তাই সেই ভাবটাই এ দেশে প্রবল হয়েছে। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে প্রণয় জন্মে বিবাহের নিয়ম থাকাতে সখীভাবটাই প্রবল—এইমাত্র প্রভেদ।

বিদ্যারত্ন। (একটু হাসিয়া) বাঃ বেশ মীমাংসা করে দিয়েছেন ত, আর কথাটাও ঠিক।

এই বলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। নয়নতারা উঠিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। পণ্ডিত মহাশয় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"আয়ুষ্মতী হও, সকল বিদ্যা তোমাকে আশ্রয় করুক।" প্রতিদিন পড়াইয়া যাইবার সময় নয়নতারা এইরূপে পদধূলি লইয়া থাকেন এবং বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এই প্রকারে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় চলিয়া গেলে দুইজনে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

হরেন্দ্র। আপনি ত খুব, এক বৎসরের মধ্যে 'রঘুবংশ' পর্যন্ত পড়ে ফেললেন!

নয়নতারা। তার আর কি, আমার ত বোধ হয় সকলেই পারে।

হরেন্দ্র। ও বাবাঃ—আমরা চারি বৎসরে 'রঘুবংশের' ক্লাসে এসেছিলাম।

নয়নতারা। কত ছেলেবেলায় পড়তে আরম্ভ করতে হয়েছিল তা মনে আছে? তার সংগে তুলনায় আমি ত বুড়ো ধাড়ি। আপনি এখন যদি একটা নূতন ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন, আপনি এক বৎসরে ঢের পড়ে ফেলতে পারেন।

হরেন্দ্র। এ কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। 'রঘুবংশ' আপনার লাগছে কেমন?

নয়নতারা। এটা আমার বড় আশ্চর্য বোধ হচ্চে ও কালিদাসের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে।

হরেন্দ্র। সেটা কি?

নয়নতারা। 'রঘুবংশ' ত একটা রাজাদের কুলুজী মাত্র, এক গ্রন্থে এত রাজার উল্লেখ, এরূপ গ্রন্থকে মনোরম করা ভয়ানক কঠিন কথা। কিন্তু প্রতিভার কি আশ্চর্য শক্তি! কালিদাস যেন শুষ্ক কাঠ হতে সুমধুর রস বাহির করেছেন! অজ-বিলাপটি কি সুন্দর! এক একটি কথা যেন প্রাণে পড়ে থাকে।

হরেন্দ্র। তা না হলে আর প্রতিভা কি! এর পরে যখন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়বেন তখন দেখবেন কালিদাসের প্রতিভার কি ইন্দ্রজাল রচনার শক্তি।

নয়নতারা। পণ্ডিতমশাই বলেছেন আর দু-মাস পরেই আমাকে শকুন্তলা পড়াতে আরম্ভ করবেন।

হরেন্দ্র। বিদ্যারত্ন মশাই যদি দয়া করে বরাবর পড়ান, তা হলে আপনি দু-বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠবেন।

নয়নতারা। পণ্ডিতমশাই না পড়ান আপনি আমাকে পড়াবেন।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) আমি ত ভারি পণ্ডিত!

নয়নতারা। দেখুন, সেদিন যে বইখানা দিয়ে গিয়েছেন, সেখানা কি সুন্দর! বাবা ত পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমাকে বলেছেন এ বইখানা পড়লে স্ত্রীজাতির প্রতি দশগুণ শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

হরেন্দ্র। ঠিক বলেছেন, আমিও তাই অনুভব করেছি।

নয়নতারা। আমার ত আর এক প্রকার ভাব মনে এসেছে। এ জগতে স্ত্রীলোকের জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব যে কত তা যেন কতকটা বুঝতে পেরেছি।

হরেন্দ্র। আপনি স্ত্রীলোক কিনা, আপনার ঐ প্রকার মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

নয়নতারা। আমার হাতে লাইব্রেরির দরুন আবার কিছু টাকা জমেছে। বলুন ত কি বই

কিনি? আপনার কি কোন বই পড়তে ইচ্ছে করছে? বইগ্দলো কেনবার সময় যেগ্দলোর দরকার হচ্চে সেইগ্দলো কেনাই ভাল।

হরেন্দ্র। অনেক দিন হলো ডারউইনের 'Origin of Species'খানা একবার চেয়ে পড়েছিলাম, আবার পড়তে ইচ্ছে হয়েছে।

নয়নতারা। বেশ কথা ১০ টাকা দিচ্চি কালই কিনে আনদ্ন; বইখানা আমার লাইব্রেরিতে থাকা দরকার। আর ১০ টাকা দিচ্চি একখানা শেলি কিনে আনবেন। বাবার লাইব্রেরিতে যে শেলিখানা আছে সে ১৮৩৯ সালের মিসেস শেলির এডিশন। আমি একখানা ন্তন এডিশন রাখতে চাই।

হরেন্দ্র। বটে। ১৮৩৯ সালের মিসেস শেলির এডিশন, এটা ত দেখবার মত জিনিস।

নয়নতারা। দেখবেন? (আলমারি হইতে পদ্স্তকখানি আনিয়া হরেন্দ্রের হস্তে অর্পণ)

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে Love's Philosophy নামক একটি কবিতার উপর হরেন্দ্রের দ্দিট পতিত হইল। হরেন্দ্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

The fountains mingle with the river,
And the river with the ocean,
The winds of heaven mix for ever,
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single,
All things, by a law divine,
In one another's being mingle,
Why not I with thine.

এইটি পড়িয়া হরেন্দ্র এমনভাবে নয়নতারার মদ্খের দিকে চাহিলেন যে চক্ষে চক্ষে মিলিয়া যদ্গপৎ দদ্জনের মদ্খে হাসি প্রকাশ পাইল।

নয়নতারা। ওটা দদ্ষ্টদ্মি করে আমাকে শোনাবার জন্যে পড়লেন,—না?

হরেন্দ্র। সত্য তা নয়, পাতা উলটাতে উলটাতে চোখ পড়লো, তাই পড়লাম; এটা আমি আগে কখনও পড়িনি।

নয়নতারা। আচ্ছা, এই কয় পংক্তি যেমন সদ্দর দেখদ্ন না কেন! কেমন একটা অস্ফদ্ট অথচ মহৎ ভাব হৃদয়ে এনে দিচ্চে! যেন সমদ্দায় ব্রহ্মাণ্ডটা একটা ডোরে বাঁধা, সে ডোরটা প্রেম! আমার বোধ হয় শেলির কবিতার বিশেষত্বই এই যে যতটা ভাব ব্যক্ত করে তদপেক্ষা বহ্দগ্দণে অধিক ভাব হৃদয়ে জাগায়ে দেয়! একটা ভাবাবেশে মনকে আচ্ছন্ন করে; কিন্তু পরিষ্কাররূপে ভিতরকার কথাটা যেন ধরতে পারা যায় না।

হরেন্দ্র। এই জন্যেই ত শেলিকে লোকে mystic (ভাবুক) বলে।

এই বলিয়া তিনি পাতা উলটাইয়া মিসেস শেলির লিখিত ভূমিকাগদ্লি পড়িতে লাগিলেন।

নয়নতারা। (বইখানি কাড়িয়া লইয়া) ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে এসে কে কোথায় বই পড়ে! পড়বার ঢের সময় আছে। না হয় যাবার সময় বইখানা নিয়ে যাবেন।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) আচ্ছা তাই দিন, আমিত এখনি যাচ্চি। (গমনোদ্যত)

নয়নতারা। অত ব্যস্ত কেন একটদ্ বসদ্ন না। একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র। কি কথা?

নয়নতারা। সেটা উড়দ্ উড়দ্ মনে শোনবার কথা নয়। তবে এখন থাক্ পরে হবে।

হরেন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) আমি এখনও আধ ঘণ্টা বসতে পারি, বলদ্ন শদ্নছি।

নয়নতারা। (গম্ভীরভাবে) কথাটা এই, সেদিন বলছিলেন যে সেকালের লোকে যেমন প্রতিদিন সন্ধ্যা আহ্নিক করে, আমাদেরও তেমনি প্রতিদিন ঈশ্বর-চিন্তাতে কিছদ্ক্ষণ মন দেওয়া

উচিত; সে কথাটা মনে লেগেছে। কিন্তু আমার যেন মনে হয় এই সম্পদ-ঐশ্বর্যের ভিতর থেকে ধর্ম হবে না। সেই যে একজন ফকীরের গল্প শুনেছিলাম তাই যেন ঠিক।

হরেন্দ্র। কোন্ গল্পটা বলুন দেখি?

নয়নতারা। সেই যে একজন ধার্মিক নবাব একবার আপনার রাজপ্রাসাদের উপরে শয়ন ক'রে আছেন, দাসদাসীরা সেবা করছে, এমন সময়ে হঠাৎ একজন ফকীর সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যেন কি হারিয়েছে, এরূপ করে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। নবাব সাহেবের প্রতি লক্ষ্যও করলেন না। নবাবের বড় আশ্চর্য মনে হ'ল। তিনি লোকটিকে আপনার নিকট ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি খুঁজছ?" ফকীর উত্তর করলেন, "আমার উট হারিয়েছে তাই খুঁজছি।" নবাব সাহেব হেসে বললেন, "তুমি কোথাকার পাগল! রাজপ্রাসাদের উপর কি উট থাকে?" ফকীর উত্তর করলেন, "তুমি যদি সম্পদ-ঐশ্বর্যের মধ্যে ধর্ম পেতে পার, আমি কি রাজপ্রাসাদের উপর উট পেতে পারি না?" আমার যেন মনে হয় ফকীরের উপদেশের ভিতর কিছু সত্য আছে।

হরেন্দ্র। গল্পটি বেশ, আমি কিন্তু বলি বনে গিয়ে ঈশ্বর সাধনা করা অপেক্ষা, ধন-সম্পদের ভিতর থেকে, জেদ্‌টা বজায় রেখে, সাধনা করতে পারা অধিক প্রশংসার বিষয়।

নয়নতারা। তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পারি কৈ?

হরেন্দ্র। আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠা নাই, মানুষের যদি নিষ্ঠা থাকে, সে যেখানে থাক, যে অবস্থায় থাক, আপনার পরমার্থ ভোলে না। আমার মায়ের কথাই কেন ভাবুন না, সংসারের কোনও কাজেই ত তাঁর পরমার্থের ব্যাঘাত হয় না।

নয়নতারা। (করযোড় করিয়া) আপনার মায়ের চরণে আমার প্রণাম। তিনি সাধারণ স্ত্রীলোক নন। আপনার মুখে শুনে যা মনে করেছিলাম সেদিন কলকাতায় মায়ের সঙ্গে যাদুঘর দেখতে গিয়ে সেখানে তাঁকে দেখে ও তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে, তার চেয়ে বেশী দেখেছি। আহা! মানুষের মুখে ভক্তি ও বিনয় এমন ফেটে পড়ে তা আগে জানতাম না।

হরেন্দ্র। বটে! আমার মাকে আপনি দেখেছেন!

নয়নতারা। তিনি কালীঘাট হ'তে ফেরবার সময় যাদুঘর দেখতে এসেছিলেন। আমাদের রামা চাকর মার কানে কানে বললে, যে তিনি আপনার মা। তখন মা তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। আমিও দুই একটা কথা বললাম। আহা! যেন আমরা তাঁর কতদিনের আত্মীয়!

হরেন্দ্র। আজ ত মা বিধবা, তাঁর সধবা অবস্থাতেই বিধবার অধিক ধর্মনিষ্ঠা দেখেছি।

নয়নতারা। এমন মা যার তার কি ধর্মে মতি না হয়ে যায়? যে আপনার মাকে দেখেছে, সেই আপনাকে বুঝেছে। আচ্ছা বলুন ত, আমরা কেন এমন অধম হলাম, ওঁদের সদ্‌গুণ আমরা কেন হারালাম?

হরেন্দ্র। আরও শুনুন, আমি বাড়ীতে গিয়ে রাত্রে যখন শুয়ে থাকি, তিনি নিজের মালা জপা শেষ করে, শয়নের পূর্বে প্রতিদিন আমার শয়নগৃহে এসে নিজের পদধূলি নিয়ে আমার মাথায় দেন ও ইষ্টদেবতার নিকটে আমার জন্য প্রার্থনা করেন। এটি তাঁর নিত্য কর্ম।

নয়নতারা। আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে সেই পদধূলি ও প্রার্থনার জোরে আপনি এরূপ হয়েছেন?

হরেন্দ্র। তাতে কি সন্দেহ আছে? সন্তানের প্রতি এরূপ স্নেহ আমি আর দেখি নাই। একলা মায়ের একলা ছেলে বলে বুঝি এতটা! আমি বালককালে গ্রামে থাকতে একদিন দুঃখ করে বলেছিলাম, আমার বাপ নাই, কেউ নাই, লেখাপড়া হলো না, বাবা যদি থাকতেন, আমাকে কলকাতায় রেখে পড়াতেন। মার প্রাণে সেই কথা শেলসম বিঁধেছিল। দরিদ্রা অনাথা বিধবা কি করেন, আমাকে কিছু না বলে ধনীদের দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়ালেন, তাতে কিছু হলো না;

অবশেষে নিজে রাঁধুনী বামুনী হয়ে কলকাতায় এলেন ও আমাকে এনে লেখাপড়া শেখালেন। (বলিতে বলিতে হরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল, মুখ ফিরাইয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন)

নয়নতারা। (অঞ্চলে নিজ অশ্রু মুছিয়া) আপনি কি মনে করেন এ তপস্যা বৃথা যাবে?

হরেন্দ্র উঠিতে উদ্যত।

নয়নতারা। (ব্যগ্রতা সহকারে) আর একটু বসুন।

হরেন্দ্র। পটলা টুনীর পড়বার সময় হলো।

নয়নতারা। এখনও দেরী আছে।

হরেন্দ্র আবার বসিলেন।

নয়নতারা। আপনার মুখে আপনার মায়ের যে উদার ভাবের কথা শুনি, তাতে মন বড়ই মুগ্ধ হয়; মনে হয় এমন মানুষের কাছে যদি কিছুদিন থাকি, তা হলে মানুষ হয়ে যেতে পারি।

হরেন্দ্র। (মনে মনে) সেদিন কি আর হবে! ভগবান কি এমন করবেন, যে তুমি আমার মার কাছে থাকবে, আমার ঘর আলো করবে, সে আশা ত নাই। তুমি কোথায় আর আমি কোথায়! (প্রকাশ্যে) বাস্তবিক এমন উদারতা আমি দেখি নাই। আমার বোধ হয় উদারতা প্রকৃত ভক্তির একটা লক্ষণ। যতক্ষণ কারুর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব থাকে, ততক্ষণ হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় না। মা আমার ভক্ত মানুষ, তাই কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই।

নয়নতারা। আমরা কি ইংরিজী পড়ে খারাপ হ'য়ে গিয়েছি? লোককে ঘৃণা করতে শিখেছি? দেখুন, আমি যে বিলেত-ফেরতদের ঘৃণা করি, সেটা কি আমার দোষ? আমি কি ভক্তি পাব না?

হরেন্দ্র। (ঈষৎ হাসিয়া) কেন তাদের ঘৃণা করেন?

নয়নতারা। তাদের চালচলন আমার ভাল লাগে না। এই দেখুন না কেন শনিবার বিকালে আমাদের বাড়ীতে একজন বিলেত-ফেরত ভদ্রলোক আসবেন, আগে হতেই যেন মনটাতে ভাল লাগছে না।

হরেন্দ্র। বিলেত-ফেরত লোকটা কে?

নয়নতারা। জানেন না? ডাক্তার ন্যাণ্ডেঃ।

হরেন্দ্র। ওঃ তা আর জানি না!

নয়নতারা। এ লোকগুলোকে আমি দেখতে পারি না। শুনেছি এই লোকটার নাকি টয়লেট করতে এক ঘণ্টা যায়, নাইতে তিন রকম সাবানের দরকার, সঙ্গে সঙ্গে চারি-পাঁচ রকম সুগন্ধি ফেরে, ৩৬ টাকা ডজনের মোজা না হলে পায়ে দেন না, দেখছেন কিরূপ বাবুয়ানা। দাদা ত এই লোকগুলোকে দেখে একেবারে মুগ্ধ! আমার ত এদের সঙ্গে মিশতেই ইচ্ছে করে না।

হরেন্দ্র। তা বললে কি হয়, শাস্ত্রে বলে "সর্বদেবময়োতিথিঃ," অতিথির সেবা করলে সকল দেবতার অর্চনা করা হয়।

নয়নতারা। তা ত ঠিক কথা, আতিথ্য গৃহীর গৃহধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে আমাদের ত্রুটি হবে না।

হরেন্দ্র। তা আমি জানি, যে সুরেশবাবু আছেন, তিনিই তাঁকে মাথায় করে তুলবেন।

নয়নতারা। দাদার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

হরেন্দ্র। মনের কথাটা আপনি বুঝতে পারেন না? ঘরে বিবাহের উপযুক্ত বোন না থাকলে কি এত গরজ হত?

নয়নতারা। তা আর বুঝিনে, সেইজন্যই ত ওদের ত্রিসীমায় যেতে চাইনে।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) তা মন্দ কি, কোন্ দিন দেখবো কোন্ বিলেত-ফেরত বারিষ্টারের ঘর আলো করছেন। (গমনোদ্যত)

নয়নতারা। (দ্বার আগলিয়া) আপনিও দাদার মত মানুষকে জ্বালাতন করতে শিখেছেন? বলুন, অন্যায় হয়েছে, আর এমন করবো না, তা না হলে দোর ছাড়বো না।

হরেন্দ্র। অন্যায় হয়েছে আর এমন করবো না।

নয়নতারা। (ঈষৎ হাসিয়া দ্বার ছাড়িয়া) আবার কখন আসবেন?

হরেন্দ্র। পরশু বৈকালে।

নয়নতারা। আপনার ত এখন কালেজে কাজের ভিড় নেই, কাল দুপুর বেলা একবার আসতে পারেন না?

হরেন্দ্র। কাল বইখানা কিনতে যেতে হবে।

নয়নতারা। হাঁ হাঁ সেটা আগে। (হরেন্দ্রের প্রস্থান)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে শনিবার ডাক্তার ন্যাণ্ডের আসিবার কথা, তৎপূর্ব দিন রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর তারাপদ-বাবুর প্রথম পুত্র বিনোদ আসিয়া উপস্থিত। অভিপ্রায় যে নয়নতারাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে। তারাপদবাবু কয়েকদিন জ্বরে ক্লেশ পাইতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার এক প্রকার বাতিকের জ্বর হয়; তখন তিনি নানাপ্রকার বকেন; বিকট চীৎকার করেন; মুখে বাদ্যের বোল বাজান; ও পরিবার-পরিজনের প্রতি ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে কেহই সামলাইতে পারে না। এবার জ্বরটা কিছু জোরে আসিয়াছে। এবার বিশেষের মধ্যে দুই দিন হইতে এই বুলি ধরিয়াছেন, "আমি এ যাত্রা আর বাঁচব না; নয়নতারাকে আন, তাকে একবার দেখব।" জ্বরটা অধিক হইলেও পরিবারস্থ কেহই ভয় পায় নাই; কিন্তু নয়নতারাকে না আনিলে আর চলিতেছে না। দিনের মধ্যে দুই শতবার ত্বরা দিতেছেন। অবশেষে খুড়ীঠাকুরাণী গত্যন্তর না দেখিয়া নয়নতারাকে আনিবার জন্য বিনোদকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। নয়নতারাকে আনিতে পাঠাইবার আরও একটু উদ্দেশ্য আছে। খুড়ার উপরে নয়নতারার কি এক আশ্চর্য শক্তি, তিনি কাছে আসিলে, হাঁক ডাক দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়। তাঁহার কোলে মাথা দিয়া কচি ছেলেটির মত ঘুমাইয়া পড়েন। "কাকা অষুধটা খাও" বলিলেই হাঁ করিয়া ঔষধটা খান। এজন্য কাকার পীড়া হইলে মধ্যে মধ্যে নয়নতারাকে কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া থাকিতে হয়। কাকীমা হাসিয়া বলেন,—"তুই বাপু এখানে থাক্, না হয় দু'খানা হ, একখানা চুঁচড়াতে থাক্, একখানা এখানে থাক্, আমি তোর কাকাকে বাগাতে পারি না।" ইহা শুনিয়া বাড়ীর অপরাপর মহিলারা বলেন—"তাইত! ও যেন কি যাদুমন্ত্র জানে।" এবারেও কাকীমা লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন; যাইতেই হইবে। কিন্তু একটা ভাবনা তৎপর দিন ডাক্তার ন্যাণ্ডে আসিবেন। তাঁহার আতিথ্যের ব্যবস্থা কে করে? গৃহিণীর ত এসকল আসে না। নব্যতন্ত্রের অতিথিদের মন যোগান তাঁর কর্ম নয়। নন্দরাণী নিজের ছেলেমেয়ে লইয়া ব্যস্ত, অতিথির দিকে অধিক সময় ও মন দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। সৌদামিনী ছেলেমানুষ, তাকে পশ্চাতে থাকিয়া কাজ করাইতে হয়; এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া শেষে স্থির হইল কলিকাতায় গিয়া, খুড়া মহাশয়ের কাছে এক রাত্রি থাকিয়া, পরদিন বৈকালে ৪টার গাড়িতে চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিবেন। তদনুসারে তিনি বিনোদের সঙ্গে কলিকাতায় গেলেন।

তারাপদ রায় মহাশয় অতিশয় প্রেমিক লোক। জ্যেষ্ঠের সন্তানগুলিকে নিজ সন্তান হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন না। সর্বদাই তাহাদিগকে এ বাড়ীতে আনাইয়া থাকেন। তাহারা আসিয়া ছেলেদের সঙ্গে ছুটাছুটি করে, আবদার করিয়া খায়, খুড়ীমার উপরে দৌরাত্ম্য করে, ইহা দেখিতে তাঁর বড় সুখ হয়। আর তাহারাও খুড়া-খুড়ীর কাছে এত আবদার করে, যে নিজ

পিতামাতার কাছে যেন ততটা করে না। নয়নতারার ত কথাই নাই। তাঁহার প্রতি খুড়া-খুড়ীর ভালবাসার যেন সীমা নাই। নয়নতারা খুড়াকে যাহা করিতে বলেন তাহাতে দ্বিরুক্তি নাই। তাহার একটা প্রমাণ দিতেছি, তারাপদ রায় পূর্বে একটু একটু সুরা পান করিতেন; কখনও কখনও তাহা অতিরিক্ত মাত্রায় যাইত; তখন বাড়ীতে গৃহিণীর উপরে দৌরাত্ম্য করিতেন। ইহা শুনিয়া একদিন নয়নতারা বলিয়াছিলেন, "কাকা, তুমি যদি মদ না ছাড়, আমরা তোমার বাড়ীতে আসবো না, আর তোমাকে ভালবাসবো না।" হায়রে স্নেহের কি শক্তি! অপরের শত তর্ক যুক্তিতে যাহা না হয় অনেক সময় স্নেহে তাহা করে। তারাপদবাবু সেই অবধি মদ ছাড়িয়াছেন। সেজন্য কাকীমা নয়নতারার প্রতি বড়ই প্রসন্ন। আজ নয়নতারা আসিলে তিনি বলিলেন—"এলি মা বাঁচালি ,আজ দুদিন বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির ক'রে তুলেছেন। সর্বদাই বলছেন,—কৈ নয়নতারা এলো না?" নয়নতারা কাকীমা ও অপরাপর মহিলাদিগের সহিত ধীরে ধীরে খুড়া মহাশয়ের শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রোগ-শয্যার নিকট গিয়া দেখেন, তিনি যেন ঘুমাইতেছেন। আস্তে আস্তে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই এক মিনিটের মধ্যে কনিষ্ঠ রায় চক্ষু মেলিয়া নয়নতারার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে কাকা!" খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"আমার মা এসেছেরে, আমার বাবা এসেছেরে!" এই বলিয়া বাহুদ্বারা নয়নতারার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক, তাঁহার মস্তক নিজ বক্ষের উপরে লইয়া, তাঁহার মস্তকে, কেশে, কপালে, কপোলে, ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া উপস্থিত সকলের চক্ষে জল আসিল।

নয়নতারা। কেন কাকা তুমি ভয় পেয়েছ? এ সামান্য জ্বর, তুমি শীঘ্র সেরে উঠবে।

তারাপদ। তুমি যখন এসেছ তখন আমি সেরে উঠবো মনে হচ্চে।

নয়নতারা। হাঁ তুমি নিশ্চয় সেরে উঠবে। এই দেখ না কাল সকালে তোমার জ্বর ছাড়বে।

এই বলিয়া তিনি খুড়ীমার নিকট হইতে ঔষধপত্র বুঝিয়া লইয়া, অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন ও পিতৃব্যের পরিচর্যাতে নিযুক্ত হইলেন। সে রাত্রি তাঁহার পিতৃব্যের শয়ন-মন্দিরেই অতিবাহিত হইল। কিন্তু কি কারণে জানি না, নয়নতারার আগমন-জনিত আনন্দেই হউক বা রোগের স্বাভাবিক গতি বশতঃই হউক, যিনি তৎপূর্বে তিন রাত্রি বাড়ীশুদ্ধ লোককে ঘুমাইতে দেন নাই, তিনি সেদিন রাত্রে ঘুমাইতে লাগিলেন; এবং পরদিন প্রাতে সত্যসত্যই তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। পাড়ার লোকে বলিল,—"ওঁর পীড়া হ'লে আর ডাক্তার ডেক না, নয়নতারাকেই এন।" বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা বলিতে লাগিলেন,—"ওমা মেয়েটা যেন যাদু জানে; যা বললে তাই হলো, সকালে জ্বরটা ছাড়লো।"

পরদিন দুপুর বেলা নয়নতারা অনেক করিয়া চুঁচড়ার বাড়ীতে যাইবার জন্য পিতৃব্যের নিকটে ছুটি লইলেন এবং চারিটার ট্রেণে যাইবার জন্য বিনোদের সহিত যাত্রা করিলেন। চুঁচড়া হইতে আসিবার সময় জননী এক বস্তা ভাল মিহি বাঁকতুলসী চাউল লইয়া যাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রায় দেড় মণ একটি চাউলের বস্তা সঙ্গে আছে। তাঁহারা সেকেণ্ড ক্লাসে যাইবেন। বিনোদ টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া, ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ীতে তাহার একটি সহাধ্যায়ী বন্ধু যাইতেছে, তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। নয়নতারার একলা থাকিতে ভাল লাগিল না। সেই গাড়ীতে অপর পার্শ্বে দুইটি বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতি কেমন কেমন ভাবে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল বিনোদ শীঘ্র শীঘ্র ফিরিলে ভাল হয়। বিনোদ আর ফেরে না; ক্রমে শেষ ঘণ্টা দিল; গার্ডের বাঁশীতে ফুঁ পড়িল; তখনও বিনোদের দেখা নাই। অবশেষে দেখা গেল বিনোদ ছুটিয়া আসিতেছে; কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ প্রকৃত গাড়ীখানি দেখিতে না পাইয়া, ছুটিয়া সম্মুখ দিকে চলিয়া গেল; সেখানে সেকেণ্ড ক্লাসে নয়নতারাকে না পাইয়া আবার পশ্চাতে আসিল; তখন গাড়ী ছাড়িয়াছে। বিনোদ আর উঠিতে পারিল না। বাহির হইতে নয়নতারার টিকিটখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল

—"বড়দি। হুগলীতে নেমো, বাড়ী হ'তে গাড়ী আসবে; নিশ্চয় কেউ আসবেন।" এরূপ ঘটনাটা নয়নতারার ভাল লাগিল না। কিন্তু উপায় কি? বাবু দুটি তাঁহার এই বিপদ দেখিয়া নিজ নিজ হাতে মুখ আড়াল করিয়া পরস্পরের প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন ও পরস্পরকে চুপে চুপে কি বলিতে লাগিলেন। নয়নতারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে লইয়াই হাসাহাসি হইতেছে। সে গাড়িতে একটি ইংরাজ ছিলেন, তিনি এক পার্শ্বে বসিয়া নিমগ্নচিত্তে আপনার কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে চুঁচড়ার বাড়ীতে যথাসময়ে গৃহিণীঠাকুরাণী ষ্টেশনে গাড়ী লইয়া যাইবার জন্য হুকুম দিলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইল। টুনী বলিল—"মা, আমি দিদিকে আনতে যাব।"

গৃহিণী। তুই কি একা যাবি, সঙ্গে যাবে কে?

টুনী। হলোই বা একা, বাড়ীর গাড়ী ত?

গৃহিণী। না তা হবে না, পটলাকে ডাক; সে যদি যায়।

পটলা যাইতে রাজী হইল না। তখন হরেন্দ্র পড়াইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া গৃহিণী তাঁহাকে টুনীর সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হরেন্দ্র যাইতে প্রস্তুত হইলেন। এই সব করিতে করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। অবশেষে হরেন্দ্র টুনীকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

ওদিকে নয়নতারার ট্রেণ হুগলীতে আসিয়া লাগিল। তিনি দেখিলেন প্লাটফরমে পরিচিত কেহই নাই। তখন চাউলের বস্তা নামাইবার জন্য নিজে কুলী ডাকিতে লাগিলেন। রমণীর ক্ষীণ স্বর সেই গোলমালের মধ্যে কি কুলীদের কানে যায়! কোনও কুলী সেদিকে আসিল না। এদিকে চাউলের বস্তাটি একেবারে দ্বারের সম্মুখে আছে, সেটি না নাড়াইলে দ্বার খুলিয়া নামা যায় না। নয়নতারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বৃথা টানাটানি করিতে লাগিলেন। ওদিকে গাড়ী ছাড়িবার অল্প বিলম্ব আছে। অবশেষে তিনি কোনও রূপে নামিয়া চাউলের বস্তাটি টানিতে লাগিলেন। বাবু দুটিও সেইসঙ্গে নামিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ইংরাজ ভদ্রলোকটির দৃষ্টি হঠাৎ তাঁহার দিকে পতিত হইল। তিনি এক লাফে আসিয়া বস্তাটি নামাইয়া দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ইহাতেও বাবুদুটির লজ্জা হইল না; বরং তাঁহারা ইংরাজটির বস্তা নামান লইয়া অনেক কুৎসিত কথা বলিতে লাগিলেন। নয়নতারাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ হলে, বস্তা নামান কেন বাড়ী পর্যন্ত বয়ে দিতে পারি।" শেষে তাঁহাদের অভদ্র আলাপ এতদূর মাত্রায় গেল, যে নয়নতারা দাঁড়াইয়া থাকা কষ্টকর বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে ভাবিলেন, "লেডীদের ওয়েটিং রুমে গিয়া বসি, গাড়ী এলে যাব।" এই ভাবিয়া ওয়েটিং রুমের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি বাবুদুটি তাঁহার গা ঠেলিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নয়নতারা বুঝিলেন গতিক ভাল নয়। তখন ওয়েটিং রুমে যাইবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। স্থির করিলেন যে বস্তাটা কুলীর মাথায় তুলিয়া নিজে গাড়ী ভাড়া করিয়া ঘরে যাইবেন। এই বলিয়া আবার বস্তার নিকটে গেলেন। ইত্যবসরে হরেন্দ্র টুনীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

নয়নতারা। আপনি এসেছেন বাঁচলাম। বিনোদ গাড়ীতে উঠতে পারেনি। আমি চালের বস্তাটা নিয়ে বিপদে পড়েছি।

আসিবার সময় বাবুদুটির কি কথা হরেন্দ্রের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাতেই তাঁর মন তখন পূর্ণ। তিনি বলিলেন—"লোক দুটো কি অসৎ—ওরা বোধ হয় এই গাড়ীতেই এল। কোনও ভদ্রলোকের মেয়েকে লক্ষ্য করে কি জঘন্য কথাই বলতে বলতে যাচ্ছে।"

নয়নতারা। ঐ দুটি বাবু? ওরা সারা পথ আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে, শেষে আমাকে এমন যাচ্ছেতাই কথা বলেছে যে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছিল, বড়ই অপমান বোধ হয়েছে।

হরেন্দ্র "কি! ঐ জঘন্য কথা আপনাকে বলেছে!" এই বলিয়াই তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নয়নতারা নিষেধ করিলেন, তাঁহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। একেবারে গিয়া

পশ্চাতে যে বাবুটি যাইতেছিল বামহস্তে তার দক্ষিণ কর্ণ ধরিয়া—"তবে রে বদমাস কাকে ও কথা বলছিস?" হঠাৎ কান ধরাতে লোকটা চমকিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া বলিল, "কে রে বেটা, যাকে বলি না কেন তোর তা কি?"

হরেন্দ্র। আমার তা কি, হাঁরে রাসকেল, তোর ঘরে মা-বোন নেই, ভদ্রলোকের মেয়ের প্রতি এই ব্যবহার?

এই বলিয়া দমাদম ঘুঁসি আরম্ভ করিলেন। সে ব্যক্তি বাপরে মারে করিয়া উঠাতে যে সম্মুখে ছিল সে তাহার রক্ষার জন্য দৌড়িয়া আসিল। হরেন্দ্র প্রথমোক্ত ব্যক্তির কান না ছাড়িয়াই দক্ষিণ হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এমন একটি ধাক্কা মারিলেন, যে, সে পাঁচ হাত ঠিকরাইয়া একটা থামের গায়ে আঘাত পাইয়া, একজন পুলিশ কনষ্টেবলের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। এদিকে এক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রথম বাবুটির নাকে মুখে চোখে কানে কিল ঘুঁষী। ঘুঁষীর চোটে প্রথমোক্ত ব্যক্তি চক্ষে সরিসার ফুল দেখিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকেও এক ধাক্কা দিলেন। সে ধাক্কা খাইয়া ঠিকরাইয়া পড়িয়া উঠিয়া রুমাল দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে না মুছিতে, তিনি নয়নতারা ও টুনীকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। এ সমুদায় ব্যাপার এত শীঘ্র হইয়া গেল, যে ষ্টেশনের লোক ও পুলিশ প্রহরীরা আহত ব্যক্তিদিগের নিকটে দাঙ্গার কারণটা জানিতে না জানিতে তাঁহারা গাড়ী হাঁকাইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নয়নতারা। ও মাগো, আমার গা এখনও কাঁপচে, আপনি রাগলে যেন বাঘের মত হন। মানুষটাকে ভয়ানক মেরেছেন; এত মারাটা উচিত হয়নি।

হরেন্দ্র। ঠিক হয়েছে! কি জঘন্য কথা বলাবলি করছিল তাত আপনি শোনেননি, ওরূপ কাপুরুষদের ঐ শাস্তিই উচিত।

তৎপরে তাঁহারা গাড়িতে আসিবার সময় কিরূপ ব্যবহার করেছিল, এবং চাউলের বস্তা টানাটানির সময় কি হইয়াছিল সমুদায় বর্ণন করিলেন।

হরেন্দ্র। এই লোকদের আপনি দয়া করতে বলছিলেন, ওরা কি দয়ার পাত্র? আমার বোধ হয় আজ এমন শিক্ষা পেয়েছে যে আর ভদ্রলোকের মেয়েদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করতে সাহস করবে না।

এদিকে ষ্টেশনে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের লোকেরা নয়নতারাকে চিনিত। জানিত ঐটি কালীপদ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কিন্তু হরেন্দ্রকে কেহ চিনিত না। কে মারিল তাহা স্থির করিতে পারিল না। কথাটা দাঁড়াইল, কালীপদ রায়ের কন্যাকে অপমান করাতে সঙ্গের লোকে একটি বাবুকে ভয়ানক মারিয়াছে। যাহারা ঐ বাবুটিকে চিনিত, তাহারা বলিল, "বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল। এ ত গরীবের মেয়ে পাওনি যে যা ইচ্ছা তাই করবে। বদমায়েস লোকগুলোর এই রকম সাজা হওয়াই ভাল।" আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল— "যেমন সাহেবিয়ানা করতে যাওয়া তেমনি সাজা। অপমান করবে না।"

মেয়েদের গাড়ী দেখিতে দেখিতে চুঁচড়ার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া পেঁছিল। হরেন্দ্র দ্বারের নিকটে গাড়ী থামাইয়া বলিলেন—"আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, আমি আর ভিতরে যাব না, কাল দেখা হবে।" এই বলিয়া নামিয়া গেলেন। নয়নতারারা দুই ভগিনীতে গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সবে ডাক্তার ন্যাণ্ডে আসিয়া পেঁছিয়াছেন, সকলে তাঁহাকে লইয়া বৈঠকঘরে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। টুনী সেখানে গিয়া বলিল—"আজ দিদিকে নিয়ে বড় দাঙ্গা হয়ে গেছে।"

সকলে। সি কি!

টুনী হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া, অনেক ঢোক গিলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

রায় মহাশয়। নয়নতারা তুমিই বল না, ওর ঢোঁক গিলতে গিলতে দম আটকে আসছে যে।

তখন নয়নতারা আনুপূর্বিক সমুদায় বিবরণ বর্ণন করিলেন।

রায় মহাশয়। হরেন তোমাদের সঙ্গে এলনা কেন? আমি যে তার সঙ্গে কোলাকুলি করতাম। এই ত বেটাছেলে। তার স্পোর্টিং ক্লাবে আমার চাঁদা ডবল করে দেব।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। I want to see this man, a brave fellow, quite unlike our countrymen.

গৃহিণী। ভাগ্যিস হরেনকে যেতে বলেছিলাম, তা না হলে কি হতো? দেখলে মেয়েছেলে একা ছেড়ে দেওয়ার কি বিপদ! যা হোক বাপু, ঘরের মেয়ে ঘরে এসেছে এই ঢের।

সুরেশচন্দ্র চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, কিছু বলিতেছেন না। তিনি মনে মনে হরেন্দ্রকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না; কিন্তু মুখে কিছু বলিতেছেন না। হরেন্দ্র যে নয়নতারাকে আনিতে গিয়াছিল, এটা তাঁর ভাল লাগে নাই।

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত। সুরেশচন্দ্র নবাগত অতিথিকে হাত মুখ ধুয়াইয়া আহারের স্থানে উপস্থিত করিলেন। এখানে ডাক্তার ন্যাণ্ডের রূপ গুণের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্যক। মানুষটি এমনি রোগা ছিপ্‌ছিপে, যে একহারা না বলিয়া আধহারা বলিলেই ভাল হয়। বর্ণটি কৃষ্ণের কাছাকাছি, তার উপরে সাবান ঘষিয়া ঘষিয়া বেগুনে রং ফলিয়াছে; রোগা ও শুকনো মানুষের মুখ যেরূপ হয় মুখখানি সেইরূপ; হনুর হাড়গুলি উঁচু, চক্ষু দুটি কোটরে বসা, মুখের নীচের দিকটা অপেক্ষা উপর দিকটা ছোট; কপালটা আঙ্গুল দুই হইবে; ব্রহ্মতল চাপা; দেখিলে আশ্চর্য বোধ হয়, এ মানুষ কি করিয়া বিলাতে ডাক্তারি পাশ করিয়া সিবিল সার্জন হইয়া আসিল। ইহার উপরে ন্যাণ্ডে সাহেবের এক রোগ আছে; সেটা সর্বদাই গোঁপের প্রান্তভাগে পাক দেওয়া। এটা সর্বদাই চলিতেছে;—এমন কি টেবিলে খাবার আনিবার পূর্বে যে দুই এক মিনিট বিলম্ব হইতেছে, তাহার মধ্যেই অধরোষ্ঠ ছুঁচল করিয়া ঘন ঘন গোঁপ পাকাইতেছেন। গোঁপ পাকাইয়া পাকাইয়া গোঁপের দুই প্রান্তভাগে খেংরা কাঠির মত দুই গাছ শুঁয়া বাহির হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলে হাসি রাখা দুষ্কর। সেই গোঁপের উপরে চক্ষু পড়িয়াই সৌদামিনীর ভয়ানক হাসি পাইয়াছে। তিনি টেবলের তলা দিয়া নন্দরাণীর পা টিপিয়া দিয়া তাঁহাকে গোঁপ দেখিবার জন্য সংকেত করিয়াছেন, দুইজনে চাপিয়া চাপিয়া মনে মনে হাসিতেছেন। টুনী ও পটলা, তাঁহাদের হাসির মর্ম গ্রহণ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতেছে। নয়নতারা তাহাদের প্রতি একটু কোপদৃষ্টি করাতে তাহারা সে হাসি গিলিয়া খাইল।

নানাপ্রকার কথোপকথনে আহারের সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। আহারান্তে রায় মহাশয় অতিথির অভ্যর্থনার ভার সন্তানদিগের প্রতি দিয়া নিজ গৃহিণীর সহিত উপরে গেলেন। মেয়েরা উঠিয়া বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন।

রায় মহাশয়ের ভবনে আহারের সময় বিলাত-ফেরত অতিথিদিগকেও সুরা দেওয়া হয় না। এক সময়ে দেওয়া হইত বটে, কিন্তু কিছুদিন হইতে তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটাতে তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। সুরেশচন্দ্র মনে করেন, এ গোঁড়ামিটা পিতা ও নয়নতারা হরেন্দ্রের নিকট পাইয়াছেন। ইহাও হরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের একটা কারণ। যাহা হউক আহারের সময় যাহা হয় না সুরেশচন্দ্র গোপনে তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আহারের পরে সকলে উঠিয়া গেলে, তিনি নিজের ঘর হইতে সুরা আনাইয়া অতিথিদিগকে দিয়া থাকেন এবং নিজেও কখনও কখনও স্বল্প মাত্রায় পান করিয়া থাকেন। ইহা লইয়া নয়নতারার সহিত তাঁহার অনেকবার ঝগড়া হইয়াছে। আজও তিনি আহারের পরে সেই প্রকারে অতিথির সৎকার করিলেন।

সুরাপান ও তামাকু সেবনের পর বন্ধুসহ ডাক্তার ন্যাণ্ডে যখন গোঁপ পাকাইতে পাকাইতে বৈঠক ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সৌদামিনীর এত হাসি পাইল, যে তিনি পরদার পশ্চাতে গিয়া মনের সাধে হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ "সুদু গেল কোথায়? পিয়ানোতে একবার বসুক না" বলিতেই সৌদামিনী সত্বর আসিয়া পিয়ানোতে বসিলেন। ডাক্তার ন্যাণ্ডে একখানা ছবির বই খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। সৌদামিনী এমন সুন্দর বাজাইতেছেন সে দিকে কর্ণপাতও করিলেন না। অথচ বাজনাটা শেষ হইবামাত্রই মহা বেগে ও আবেগে করতালি দিতে লাগিলেন। নয়নতারা বুঝিলেন সুরার কার্য আরম্ভ। পিয়ানোর পরে দুই ভগিনীতে সেতার ধরিলেন। কিন্তু এসব কার জন্য? ডাক্তার ন্যাণ্ডের সেদিকে মন নাই; তিনি নন্দরাণীকে একখানা ছবির বই দেখাইয়া কি বলিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, তিন ভাই বোনে সেতারটা খুব সম্ভোগ করিলেন। কিন্তু বাজনা থামিবামাত্র ডাক্তার ন্যাণ্ডের করতালিতে আবার ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এইবারে সংগীত। কিন্তু মেয়েদের কাহারই গাইতে ইচ্ছা করে না; নয়নতারা বলেন, "সুদু তুই গা," সৌদামিনী বলেন,—"দিদি তুমি গাও।" এইরূপ অনেক ঠেলাঠেলির পর সুরেশচন্দ্রের তাড়া খাইয়া সৌদামিনী একটা গান গাইলেন।

এবারেও সজোরে করতালি। কিন্তু মেয়েরা বুঝিলেন এ মজলিসে গান বাজনা বৃথা। এইবার আলবম ও ছবি প্রভৃতি দেখান ও কথাবার্তা আরম্ভ হইবে। সৌদামিনী নন্দরাণীর কানে কানে বলিলেন—"দেখ না আমি স'রে পড়ি এই, দিদিকে আজ জব্দ করবো, দিদি আমাকে ঠেলে দিয়ে নিজে পালায়, আজ ডাক্তার ন্যাণ্ডেকে দিদির ঘাড়ে চাপাচ্ছি।"

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। (গোঁফ পাকাইয়া নয়নতারার প্রতি) I must congratulate you upon your having had by your side, at the railway station, such a worthy champion. অর্থাৎ—আনন্দের বিষয় যে রেলওয়ে ষ্টেশনে এমন একজন রক্ষক আপনার সঙ্গে ছিলেন।

সুরেশ। Dr. Nande my sister does not like to be addressed in English by Bengali gentleman. অর্থাৎ—ডাক্তার ন্যাণ্ডে, আমার ভগিনী চান না যে বাঙালী ভদ্রলোকেরা ইংরিজীতে ওর সঙ্গে কথা বলেন।

নয়নতারা। (হাসিয়া) না না আপনি ইংরিজীতেই বলুন।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে বাঙ্গালাতে কথা আরম্ভ করিলেন। বোধ হইতে লাগিল, যেন কোনও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ পড়িয়া যাইতেছেন। সৌদামিনী নন্দরাণীর পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে মুখ লুকাইয়া হাসিলেন।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। (নয়নতারার প্রতি) মহাশয়! অদ্য রেলওয়ে ষ্টেশনে নিশ্চয় অতিশয় ভয় পাইয়া থাকিবেন।

সুরেশ। মহাশয় কিহে, ওটা যে পুংলিঙ্গ।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। But how do you translate madam? There is no corresponding Bengali word for it. অর্থাৎ—কিন্তু মাডামের অনুবাদ কি করে করবে? মাডামের অনুরূপ বাঙ্গালা কথা ত নাই।

সুরেশ। তুমি মহাশয়া বলতে ত পারতে।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে। হাঁ হাঁ তাই ত, কোকিল কোকিলা, মহাশয় মহাশয়া, you see I am nearly forgetting my Bengali grammer; অর্থাৎ বাঙ্গালা ব্যাকরণটা প্রায় ভুলে গেলাম।—বলিয়া বিকৃত মুখভঙ্গী সহকারে ও কর্কশ স্বরে হাস্য।

সৌদামিণী আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। নন্দরাণীর গা ঠেলিয়া পলাইয়া গেলেন। নয়নতারা কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন সৌদামিনী পলাইয়াছে। তখন ভাবিলেন সর্বনাশ, "এই মানুষটি আমার ঘাড়ে পড়িল। তিনি কথোপকথনান্তে, অতিথিকে আলবম্ প্রভৃতি

দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহারা পশ্চিমে থাকিবার সময় কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন ও কি কি দেখিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথা বলিলেন ও অনেক দ্রব্য দেখাইলেন। সুরেশচন্দ্র এবং মন্দ-রাণীও সে বিষয়ে তাঁহার অনেক সহায়তা করিলেন। এইরূপে নানা কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। এই সময়টা নয়নতারা এক প্রকার ক্লেশে যাপন করিলেন। তিনি যে ছাঁচের মানুষ দেখিতে ভালবাসেন, ডাক্তার ন্যাণ্ডে যেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংলণ্ডে কিছু দীর্ঘকাল ছিলেন বলিয়া, তাঁহার অহঙ্কারটা এত অধিক, যে কথায় কথায় অপরের সহিত তুলনায় আপনার অভিজ্ঞতাটাকে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। কথার ভাব বোধ হয় আর সকলেই অজ্ঞ, তিনি কেবল প্রাজ্ঞ; আর কেহ কিছু দেখে নাই, তিনিই সকল দেখিয়াছেন। এই বড়াইটা নয়নতারার ভালই লাগে না। তৎপরে সুরার প্রভাববশতঃই হউক অথবা স্বভাববশতঃই হউক, ডাক্তার ন্যাণ্ডে অতি সামান্য কথাতে এমন বিকৃত স্বরে ও বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া হাসেন, যে অতি কর্কশ শুনায় ও কদাকার দেখায়। চক্ষু ও কর্ণ উভয়ের পক্ষেই ক্লেশদায়ক। আতিথ্য-ধর্মের অনুরোধে নয়নতারা কয়েক ঘণ্টা এ সমুদয় বহন করিলেন। রাত্রি ১২টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইলে, তিনি নিস্তার পাইলেন। উপরে শয়ন করিতে যাইবার পূর্বে গঙ্গাধারের নীচের বারাণ্ডাতে একাকিনী কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া মনের বিরক্তিজনিত তিক্ততাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উপরে শয়ন-মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিঁড়ীতে উঠিবার সময় ডাক্তার ন্যাণ্ডে তাহাদের গান বাজনার প্রতি কিরূপ উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইল। আপনার মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"বেনা বনে মুক্তা ছড়ান।" তদনন্তর তিনি মুখে মুখে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সেটি এই :—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ॥

তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছেন ও সিঁড়ীতে উঠিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে সুরেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"কি ভটচাজ! কি সংস্কিড়ি মিড়ি পড়তে পড়তে ওঠা হচ্চে?" নয়নতারা ফিরিয়া দেখেন সুরেশচন্দ্র ডাক্তার ন্যাণ্ডেকে শোয়াইয়া তাঁহার পশ্চাতেই আসিতেছেন।

নয়নতারা। (হাসিয়া) দাদা! এখনও শুতে যাও নি? আমি কি কবিতাটা পড়তে পড়তে যাচ্চি শুনবে? অর্থ এই;—

হে বিধি শত শত প্রকার অপর যে কোনও দুঃখ দেও সকলি সহিব, কিন্তু অরসিকের কাছে রসের বিষয় জানান, এ দুঃখ কপালে লিখো না, লিখো না, লিখো না।

বলিয়া সুন্দর স্বর্ণচুড়িযুক্ত হাতখানি নাড়িতে লাগিলেন।

সুরেশ। (ভগিনীর দোলায়মান হাতখানি ধরিয়া) ডাক্তার ন্যাণ্ডেকে মনে ক'রে বলছিস্, না?

নয়নতারা। তাত বুঝতেই পারছ। কি মানুষের কাছেই গাইতে বাজাতে বলেছিলে? ওর চেয়ে মেড়ার লড়াই দেখালে ভাল হত। (হাস্য)

সুরেশ। সে আবার কি?

নয়নতারা। সেই যে একজন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের বিষয়ে একটা গল্প আছে,—শোন নি?

সুরেশ। কৈ কোন্ গল্পটা বল্ দেখি।

নয়নতারা। সেই যে একবার একজন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের বাড়ীতে একজন কালোয়াত উপস্থিত। স্থির হলো যে বাবুর বৈঠকখানায় একদিন গাওনা বাজনা হবে। একজন মোসাহেব বাবুকে বললে—"বাবু, আপনার বাড়ীতে বৈঠকটা হবে, আপনারত একটা ফরমাজ করা উচিত।" বাবু বললেন—"আমি কি ফরমাজ করবো? আমাদ্বারা ও সব হবে না, তোমরাই সে সব করো।"

মোসাহেব বললে, "সেটা ভাল দেখায় না। আপনি একটা কানেড়া গাইতে বলবেন।" বাবু বললেন, "ও সব আমার মনে থাকবে না।" মোসাহেব বললে—"কাণ কানেড়া, কাণ কানেড়া, এই রকম ক'রে মুখস্থ ক'রে রাখতে পারবেন না?" বাবু তাই করলেন; সমস্ত সময় মনে মনে কাণ কানেড়া সেধে রাখতে লাগলেন। কিন্তু গানের আসর যখন বসলো, তখন বাবুর মুস্কিল উপস্থিত। কথাটা ভুলে গিয়েছেন, কেবল একটা "এড়া এড়া" আসছে। গাওনা বাজনা চলছে, এদিকে তিনি হা ক'রে কেবল মোসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। যদি তার সংকেত দেখে কিছু মনে হয়। এই সময়ে সে ব্যক্তি আপনার মনে নিজের নাক চুলকাইতেছে। বাবু বলে ফেললেন, "আচ্ছা একঠো নাকেড়া গাও।" মোসাহেব তাড়াতাড়ি সেরে নিলে বটে, কিন্তু চারিদিকে হাসি উঠলো। তখন বাবু অপ্রস্তুত হয়ে বাড়ির বারাণ্ডাতে গিয়ে চাকরকে ডেকে বললেন,—"রামা! মেড়া দুটো এনেছিলি, একবার লড়াই দেত।"

সুরেশচন্দ্র। (ভগিনীর গায়ে ধাক্কা দিয়া অট্টহাস্য করিয়া) ঠিক বলেছিস, এক একজন লোক এমনি ভোঁতা, যে তাদের গান বাজনা শোনার চেয়ে মেড়ার লড়াই দেখা ভাল। কিন্তু ডাক্তার ন্যাণ্ডে বেচারার অপরাধ কি? ওটা শিক্ষার কর্ম; ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা না থাকলে বুড়ো বয়সে গান বাজনার রস গ্রহণ করা সহজ নয়।

নয়নতারা। তা বটে। (গমনোদ্যত)

সুরেশ। (অঞ্চল ধরিয়া) শোন্ শোন্ ডাক্তার ন্যাণ্ডেকে কেমন দেখলি?

নয়নতারা। সে কথা এখন থাক—তোমার বন্ধু তুমি খুসী থাকলে ভাল।

এই বলিয়া নিজ শয়নমন্দিরে গমন করিলেন। পরিচ্ছদ উন্মোচনপূর্বক বাতিটি শয্যার নিকটে লইয়া, হরেন্দ্রের প্রদত্ত ব্রহ্মসংগীত পুস্তক খুলিয়া গুণ গুণ স্বরে একটি গান করিয়া, জীবনের জন্য ও জীবনের সর্ববিধ সুখের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে শয়ন করিলেন। শয়ন করিবার পর রেলওয়ের সমুদয় ঘটনাটি যেন চক্ষের কাছে আসিল। গাড়ীতে বাবুদুটির হাসাহাসি, তৎপরে তাহাদের অভদ্রতা, হরেন্দ্রের ক্রোধ ও সাহস, সমুদায় আবার দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা যেন উথলিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে মনে মনে বলিলেন—"এইরূপ পুরুষের আশ্রয়েই থাকতে হয়।" এই বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতে রায় মহাশয় হরেন্দ্রকে ও চুঁচড়ার উকীল, তাঁহার পিতৃব্যপুত্র গৌরীপদ বাবুর দুই পুত্র অবিনাশ ও চারু এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলাকে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারের কালে কথোপকথনের মধ্যে জানিতে পারিলেন যে হরেন্দ্রের স্পোর্টিং ক্লাব ত অগ্রেই ছিল, তৎপরে স্কুলের ছেলেদিগকে লইয়া "মোগল ও পাঠান" এই দুই দলে ভাগ করিয়া দুইটি ড্রিলিং ব্যাণ্ড করিয়াছেন; ও চন্দননগর হইতে একজন পেন্সন প্রাপ্ত ফরাসি সৈনিককে যোগাড় করিয়া তাহাদিগকে ড্রিল করিতেছেন। তদ্ভিন্ন একটি পবলিক লাইব্রেরী করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। রায় মহাশয় অগ্রেই তাঁহার স্পোর্টিং ক্লাবের জন্য মাসে ৫ টাকা দিতেন। অদ্য হইতে সেই মাসিক ৫ টাকাকে দশ টাকা করিলেন; এবং ড্রিলিং ব্যাণ্ডের পোষাকের জন্য দুই শত টাকা ও পবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য এককালীন পাঁচ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ডাক্তার ন্যাণ্ডে অদ্য বৈকালে চলিয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্রের বুঝিতে বাকি রহিল না, যে জন্য ফাঁদ পাতা তাহার আশা নাই। কিন্তু ডাক্তার ন্যাণ্ডের বুঝিতে কিছু অধিক দিন লাগিল। তিনি ইহার পর আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন। আসিলেই তিনি নয়নতারার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন, ও সকল কাজে তাঁহার সাহায্য করিতে চাহিতেন। নয়নতারা মনে মনে বলিতেন—"দাদা এ আপদ আবার কোথা থেকে যোটালেন।" যাহা হউক, কিছুদিনের পর ডাক্তার

ন্যাণ্ডেরও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যাতায়াত বৃথা। তখন তাঁহার যাতায়াতটা কিছু কম হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একদিন অপরাহ্নে সংস্কৃত পড়া শেষ হইলে নয়নতারা বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিলেন,—"পণ্ডিত মশাই! আপনার নাতির নাকি ভাত? কই তাত আমাদের কিছুই বলেন নি।"

বিদ্যারত্ন। তুমি কার কাছে শুনলে? হরেনবাবু বলেছেন বুঝি?

নয়নতারা। হাঁ তাঁর কাছে শুনেছি।

বিদ্যারত্ন। বলব বলব করে ভুলে গিয়েছি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আর বলেই বা কি হবে। নিমন্ত্রণ করে দু মুঠো খাওয়াতে ত পারব না।

নয়নতারা। (হাসিয়া) কেন পারবেন না, আমাদের জাত গেছে বলে বুঝি? তা গেলই বা, আপনার বাড়ীতে অন্য জাতের লোক কি বসে খায় না?

বিদ্যারত্ন। সেটা কি তোমাদের বেলা করতে পারি? প্রাণ থাকতে তা পারি না।

নয়নতারা। (হাসিয়া) দেখলেন জাতটা কত খারাপ? আপনার প্রাণ চায় যে আমাদের নিয়ে আদর যত্ন করেন; খাওয়ান দাওয়ান; কিন্তু জেতের ভয়ে পারছেন না।

বিদ্যারত্ন। মা লক্ষ্মি! তুমি যত সহজে এই প্রাচীন প্রথাটার দোষ দেখালে, আমি কিন্তু তত সহজে পারি না। শাস্ত্রকর্তারা ত সাধারণ মানুষ ছিলেন না; তাঁরা যে বিধি করে গিয়েছেন, সে সম্বন্ধে তোমার আমার মত লোকের মতামত প্রকাশ না করাই ভাল।

নয়নতারা। আপনি ঠিক মনের কথাটা ভেঙে বলুন দেখি, আমি রেঁধে দিলে খেতে পারেন কিনা?

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) তুমি ভারি চতুর।

নয়নতারা। কেন, চতুর কিসে?

বিদ্যারত্ন। জান কি না আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই সেইটে ধরে আমাকে জব্দ করবার চেষ্টায় আছ।

নয়নতারা। তা কেন করব না? জাতটা যে খারাপ তাই দেখাব।

বিদ্যারত্ন। আচ্ছা আমার মনের কথাটা বলছি। হৃদয় বলে কারু হাতে যদি খেতে পারি ত তোমার হাতে পারি, কিন্তু ধর্মবুদ্ধিতে বাধা দেয়।

নয়নতারা। হৃদয়কে ছেড়ে আবার ধর্ম কি? প্রেমই ত ধর্ম, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, তিনি প্রেমে বাস করেন; আমি মোটামুটি এই বুঝি।

বিদ্যারত্ন। মা লক্ষ্মি! ঈশ্বর যে প্রেমস্বরূপ এবং তিনি যে প্রেমে বাস করেন, এ কথা অতি সত্য; কিন্তু তুমি ভেবে দেখ আমাদের হৃদয় যা চায়, আমরা কি সব সময় তা সম্পূর্ণরূপে দিতে পারি? ধর্মবুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ের কামনাকে কি সময় সময় সংযত করতে হয় না?

কথাটা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নয়নতারা একটু ভাবিয়া ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—"হাঁ। সংযত করতে হয় বৈ কি।"

বিদ্যারত্ন। তবেত তুমি আপনিই আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করলে।

নয়নতারা। (হাসিয়া) যে যাহোক আমরা কিন্তু নিমন্ত্রণ টিমন্ত্রণ মানি না। আপনার বাড়ীতে আবার নিমন্ত্রণ কি? আমরা সেদিন সকলে ছেলে দেখতে যাব।

বিদ্যারত্ন। এর উপরে আর কথা নাই। এই কথাটা যে বলেছ, এতেই প্রমাণ তোমরা আমাকে যথার্থই ভালবাস।

নয়নতারা। সেটা কি আজ বুঝলেন?

ইহার পর বিদ্যারত্ন মহাশয় যাইবার জন্য উঠিলেন, নয়নতারা পদধূলি লইয়া প্রণাম করিলেন ও তিনি সেই পুরাতন আশীর্বাদ করিলেন।

সেই দিন রাত্রে আহারের পর সকলে উঠিয়া গেলে, রায় মহাশয়, গৃহিণী ও তিনজনে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

নয়নতারা। বাবা! পণ্ডিত মশাই-এর নাতির ভাত উপস্থিত শুনেছ?

রায় মহাশয়। কই না তাত শুনি নাই।

নয়নতারা। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করতে পারবেন না বলে, এ খবর আমাদের দেন নাই; তারপর আমি শুনে, তাঁকে কি বলেছি তা জান?

এই বলিয়া অপরাহ্নের কথোপকথনটা সমুদয় বর্ণন করিলেন।

রায় মহাশয়। বেশ বলেছ, তাঁর সঙ্গে আমাদের যে আত্মীয়তা, তাতে আবার নিমন্ত্রণ কি? তোমরা অবশ্যই যাবে।

নয়নতারা। দেখ বাবা, আমি পণ্ডিত মশাইকে যতবার দেখি ততবার মনে হয়, সেকালের ও একালের লোকে কত প্রভেদ, ততই যেন ইংরিজীওয়ালা বাবুদের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়ে।

রায় মহাশয়। তাই বলে মনে করো না, যে সেকালের সমুদায় লোক ভাল, আর ইংরেজী-ওয়ালারা সব খারাপ।

নয়নতারা। কেন, হরেনবাবুর মায়ের অনেক গুণের কথা ত শুনেছি, তিনিও তো একজন সেকালের লোক।

রায় মহাশয়। হরেনের মা কিরূপ বংশের মেয়ে! হরেনের মাতামহ একজন মহা পণ্ডিত ও মহা সাধক লোক ছিলেন। তাঁর ধর্মভাব এত প্রবল ছিল, যে হরেনের মা যখন দুতিন বছরের মেয়ে, তখন তিনি সন্ন্যাসী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছেন, আজও তাঁর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। সেই বাপের মেয়েত, ধর্ম সম্বন্ধে একটু অসাধারণত্ব থাকবে না?

নয়নতারা। এসব কথাত আমি আগে শুনিনি।

রায় মহাশয়। হরেন তোমাকে বলেনি? ওর মাতামহ বংশটা একেবারে ধর্ম ধর্ম ক'রে পাগল।

নয়নতারা। হরেনবাবুর মায়ের কথা যত শুনি, ততই তাঁর প্রতি ভক্তি বাড়ে, আর মনে মনে লজ্জা হয়, আমরা কেন এত খারাপ হলাম।

রায় মহাশয়। কিন্তু তাই বলে মনে করো না প্রাচীন সমাজে অনেক বিদ্যারত্ন বা অনেক হরেনের মা মেলে।

নয়নতারা। তুমি যাই বল না কেন, এই ইংরিজীওয়ালা বাবুদের আমার ভাল লাগে না; বিশেষতঃ বিলেত-ফেরতগুলি।

গৃহিণী। কদাকার! কদাকার! এগুলো যেন একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

রায় মহাশয়। তোমরা দুচারজন লোক দেখে সমুদায় দলটাকে ঘৃণা কর কেন? এঁদের মধ্যে অনেক ভদ্রলোক, শ্রদ্ধেয় লোক আছেন।

নয়নতারা। তোমার মুখে ইংরাজদের অনেক প্রশংসা শুনি; কিন্তু তাদের সমাজ না জানি কেমন, যে তাদের সঙ্গে মিশে এরা এত বিগড়ে যায়।

রায় মহাশয়। ঐ তুমি আর এক ভ্রম করলে। এদের দেখে ইংরাজ সমাজের বিচার করা উচিত নয়। এরা কি সেখানে ভদ্র সমাজে মিশতে পারে? ভদ্র ইংরেজ তোমরা দেখ নাই, সে আর এক জিনিস।

নয়নতারা। ওকথা থাক। তবে মা ও আমি সেদিন সকালে পণ্ডিত মশায়ের নাতি দেখতে যাব। কিন্তু যাতে তাঁর খরচের সাহায্য হয় এমন ক'রে কিছু দেওয়া ত উচিত।

রায় মহাশয়। তাতে সন্দেহ কি? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের যে সামান্য আয় তাতে বৃহৎ পরিবার ও এতগুলি পড়োর প্রতিপালন চলে না। আমি ভাবছি, যে আমি ছেলেটির গহনাগুলো দেব। আর তোমার মা ও তুমি দুজনে সেদিন প্রাতে গিয়ে দুমোহর দিয়ে ছেলেটিকে দেখে এস। তাহলে ব্রাহ্মণের অনেকটা ব্যয়ের সাহায্য হবে।

নয়নতারা। বেশ কথা, তুমি তবে পণ্ডিত মশাইকে বলে ঠিক ক'রে রেখো।

পরদিন বিদ্যারত্ন মহাশয় নয়নতারাকে পড়াইতে আসিলে, রায় মহাশয় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

রায় মহাশয়। কি গুরুদেব। গোপনে গোপনে নাতির অন্নপ্রাশনের বন্দোবস্ত করছেন, আমাদের খবরটাও দিতে নেই?

বিদ্যারত্ন। (হাসিয়া) নয়নতারা বলেছেন বুঝি?

রায় মহাশয়। যেই বলুক না কেন, আপনি ত বলেন নাই?

বিদ্যারত্ন। কি আর বলব।

রায় মহাশয়। কতকগুলো দেনাপত্র ক'রে মস্ত একটা জাঁকজমক করবার যোগাড়ে আছেন নাকি?

বিদ্যারত্ন। জাঁকজমক করি এমন সাধ্য কি? আর দেনা চাইলেই বা দেনা দেয় কে? তবে চার মেয়ের পরে ছেলেটা হয়েছে, একেবারে কিছু না করলেও মেয়েরা ছাড়বে না।

রায় মহাশয়। না না সে সব বুদ্ধি করবেন না। যত কমসমে হয় তাই ক'রে নেবেন।

বিদ্যারত্ন। সেটা আর আমাকে বলে দিতে হবে না। দায়ে প্যায়দায় করাবে।

রায় মহাশয়। আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, শুনুন। আমাকে ভাইয়ের মত ভালবাসেন ত?

বিদ্যারত্ন। তা কেন আবার জিজ্ঞাসা করছেন? আপনি কি তা জানেন না?

রায় মহাশয়। তাই জানি বলেই ত বলতে সাহস করছি। তবে আমার পরামর্শ শুনুন। গিন্নীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, ছেলেটিকে কি কি গহনা দিতে ইচ্ছে। যা কিছু গহনা দিতে ইচ্ছে তা আমি দেব। তবে এ কথাটা আপনারা দুজনে জানবেন, আর আমরা জানব আর কেহ জানবে না। বুঝলেন ত।

এই কথা শুনিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মনটা কেমন হইয়া গেল। প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি যেরূপ সদাশয় পুরুষ তারি মত প্রস্তাব।"

রায় মহাশয়। (ঈষৎ হাসিয়া) ঐত আপনি আবার সৌজন্য এনে ফেললেন; পরের মত কথা বলতে লাগলেন। পরস্পর ভালবাসা থাকলে এ রকমটা সকল সমাজেই চলে থাকে। আপনার সম্বন্ধে সে ত আমারও নাতি।

এইবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষে জল আসিল। তিনি গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—"তাতে আর সন্দেহ কি?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন, তখন অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার পৃষ্ঠের ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইয়াছে। তিনি গহনাগুলির জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন; এখন বোধ হইতে লাগিল, যেন বিধাতা তাঁহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার চিন্তার বোঝা হঠাৎ তুলিয়া লইলেন। তিনি মনে মনে ইষ্টদেবতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। যখন গৃহে গিয়া গৃহিণীকে এই সুসংবাদ দিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আহা! এরা কি সৎ লোক, এমন মানুষ ত একালে দেখা যায় না।" তৎপরে কর্তা-গৃহিণীতে পরামর্শ করিতে লাগিল, রায় পরিবারকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান যায় কি না।

বিদ্যারত্ন। অন্য জেতের ন্যায় একধারে বসে খাওয়াব তা প্রাণে সবে না; অতএব খেতে না বলাই ভাল। কিন্তু নিমন্ত্রণ কর আর নাই কর, তাদের মেয়েরা সেদিন সকালে এসে ছেলে দেখে যাবে।

গৃহিণী। ওমা কি ভদ্রতা! এঁরা এমন মানুষ তাত জানতাম না। হতভাগা লোকে এঁদের কত কুচ্ছোই করে, বলে ওদের মেয়েরা খারাপ, শোর গরু খায়, ধর্মাধর্ম মানে না।

বিদ্যারত্ন। ছি! ছি!! এমন কথা কানে শুনলেও পাপ। আমি তোমাকে কতবার বলেছি, লোকে এদের যা বলে, এরা তার মত কিছুই নয়। শোর গরু খাওয়া দূরে থাক, নয়নতারা মাছ মাংসও খায় না।

ক্রমে অন্নপ্রাশনের দিন উপস্থিত। সেদিন প্রাতে উঠিয়া নয়নতারা জননীকে ত্বরা দিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে লইয়া গেলেন। তাঁহারা প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইবামাত্র নিমন্ত্রিত ও পল্লীর অপরাপর মহিলারা চারিদিকে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন; এবং পরস্পর গা টেপাটেপি করিতে লাগলেন। কেহ বলিলেন,—"এই বুঝি বড় মেয়ে, ওমা কি মেয়ের রূপ! যেন বাড়ী আলো ক'রে তুলেছে!" কেহ বলিলেন—"এত বড় মেয়ের বিয়ে হয়নি, এ কোথাকার সৃষ্টিছাড়া নিয়ম!" কেহ বলিলেন—"ওগো ওরা ব্রহ্মজ্ঞানী, ওদের মেয়েরা স্বয়ংবরা হয়।" কেহ বলিলেন—"এই মেয়ে নাকি ইংরিজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত পড়েছে, আর নাচতে, গাইতে, বাজাতে পরিপক্ক।" এইরূপ নানারূপ গুপ্ত আলোচনার মধ্যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহিণী রায় গৃহিণীর অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। "কি ভাগ্যি! কি ভাগ্যি! আমার বাড়ীতে আপনাদের চরণধুলো পড়ল।" নয়নতারা গুরুপত্নীর চরণে প্রণত হইয়া চরণধূলি লইলেন।

গুরুপত্নী। বেঁচে থাক মা! দেখচ তোমার পণ্ডিতমশাই-এর বাড়ী কেমন।

রায় গৃহিণী। বেশই ত দেখছি, বিদ্যারত্ন মশাই-এর এদিকে ত বেশ দৃষ্টি আছে দেখছি।

তৎপরে মাতা ও কন্যা একটি রকে উঠিয়া মাদুরে আসন পরিগ্রহ করিলেন। ক্রমে শিশুটি তাঁহাদের নিকট আনীত হইল।

রায় গৃহিণী। (ছেলেটিকে কোলে লইয়া) ওমা কি সুন্দর ছেলে! বিদ্যারত্ন মশাই-এর ত বেশ নাতি হয়েছে!

নয়নতারা। "কি সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি দেখ!" এই বলিয়া ঘন ঘন তার মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে রায় গৃহিণী দুই হাতে দুইটি মোহর দিয়া শিশুটিকে পিতামহীর ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিলেন। গহনাগুলি অগ্রেই রায় মহাশয় গোপনে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হস্তে দিয়াছিলেন; সুতরাং সেগুলি আজ শিশুর অঙ্গেই রহিয়াছে। শিশুটিকে ফিরাইয়া দিয়াই মাতা ও কন্যাতে যাইবার জন্য উঠিলেন। বিদ্যারত্ন গৃহিণী অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "একটু মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে।"

রায় গৃহিণী। (হাসিয়া) সকালে উঠেই এসেছি, এখনও নাওয়া হয়নি। আমি না নাইলে কিছু মুখে দিতে পারিনে। নিতান্তই যদি মিষ্টিমুখ করতে হবে, তবে আমার মেয়ের হাতে কিছু দিন। (নয়নতারার প্রতি) একটু মিষ্টিমুখ কর, নইলে উনি বড় দুঃখ করবেন।

নয়নতারা। (হাসিয়া) তবে অল্প একটু কিছু দিন।

ইহার পর বিদ্যরত্ন গৃহিণী তাঁহাদের দু'জনকে লইয়া নিজের গৃহস্থালির সমুদয় বিষয় দেখাইলেন। শোবার ঘর, রান্নার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, ঠাকুর ঘর, পড়োদের থাকবার ঘর, গোয়াল ঘর, খিড়কী, খিড়কীর বাগান প্রভৃতি কিছুই বাকী রহিল না। সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

নয়নতারা বাড়ীতে আসিয়া রায় মহাশয়কে বলিলেন—"ও বাবা, পণ্ডিত মশাই-এর বাড়িটি কি সুন্দর! তোমাকে তা কি বলব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একেবারে যেন ঝরঝর করছে। ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের বাড়ী এমন পরিষ্কার হতে পারে তা আগে জানতাম না।" রায় মহাশয় বলিলেন—"ওগো যারা ভাল হয়, তারা সকল দিকেই ভাল হয়।"

অদ্যকার দিন নয়নতারার চিত্তের প্রসন্নতাতেই গেল। যে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি, পিতা যে তাঁহার ব্যয়ের এতটা সাহায্য করিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইয়াছে। সেই আনন্দেই তিনি অদ্যকার দিন যাপন করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অদ্য আর পড়াইতে আসেন নাই, তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পরিচর্যাতেই ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কিন্তু সেজন্য নয়নতারার খালি খালি বোধ হয় নাই। হরেন্দ্র সেই সময়ে আসিয়া অনেকক্ষণ একত্র যাপন করিয়া গিয়াছেন। দুইজনে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তদ্দারা নয়নতারা অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, সে জন্যও মনটা বড়ই প্রসন্ন রহিয়াছে।

কিন্তু হায়! অদ্যকার দিন যখন শেষ হইল তখন নয়নতারা স্বপ্নেও জানেন নাই যে সেদিন তাঁহাদের জন্য এক ভয়ানক দুর্ঘটনা অপেক্ষা করিতেছে এবং যে রজনী চিত্তের প্রসন্নতাতে আরম্ভ হইতেছিল, তাহা গভীর মনোবেদনাতে অবসান হইবে। সে দুর্ঘটনাটি কি তাহা বলিবার পূর্বে পূর্ববৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক। রেলওয়ে ষ্টেশনে নয়নতারাকে অপমান করাতে দক্ষিণ পাড়ার সেন বাবুদের বাড়ীর দুইজন লোককে হরেন্দ্র ভয়ানক মারিয়াছিলেন এ সংবাদ অনেকেই অবগত হইয়াছেন। তাহারা ধনী লোক, চুঁচড়ার বর্ধিষ্ণু ঘরের সন্তান, তাহারা সহজে ছাড়িবে কেন? তাহারা প্রথমে জানিতে পারে নাই, কে মারিয়া গেল। পরে লোক পরম্পরায় শুনিল হরেন্দ্র চাটুজ্যে নামে হুগলী কালেজের একজন মাষ্টার মারিয়াছে। প্রথমে তাহারা ভাবিল যে নালিশ করিবে। কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় লোকে তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া দিয়াছে। হয়ত বলিয়াছে—"বড় লোক পিছনে আছে, তোমরাই যে উকীল বারিষ্টার নিযুক্ত করবে তা নয়, তারাও করবে, তারপর কথাটা যখন উঠবে যে তোমরা মেয়েটিকে অপমান করেছিলে, তখন কি সাজা হবে? বড় জোর দু পাঁচ টাকা জরিমানা হবে।" যাহা হোক সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহারা নালিশ হইতে বিরত হইয়াছে। কিন্তু যে লোকটি অধিক প্রহার খাইয়াছিল তাহার নাম গোষ্ঠবিহারী, সে চুঁচড়ার একটি বিখ্যাত অসচ্চরিত্র লোক। সে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকে। সেখানে থিয়েটারে অভিনয় করে, এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গেই বেড়ায়। তাহাকে লোকে প্রায় কোনও সময়ই প্রকৃতিস্থ দেখিতে পায় না; সর্বদাই সুরার নেশার ঝোঁকে থাকে। এমন দুষ্কর্ম নাই যে সে করে নাই। একবার থিয়েটারের একজন অভিনেত্রীকে সঙ্গে করিয়া টলিতে টলিতে কলিকাতার বাড়ীতে উপস্থিত। নিজের শয়ন ঘরে তাহাকে লইয়া গিয়া স্ত্রীকে বলিল, "উঠে লুচি, তরকারি করে আমাদের খাওয়া।" স্ত্রী যদি অস্বীকার করিল, তখন একখানা ছোরা বাহির করিয়া তাহাকে কাটিতে গেল। তখন ভদ্রলোকের মেয়ে প্রাণভয়ে জানালা দিয়া বাহিরের রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। সে যাত্রা গুরুতর আঘাত পাইয়াও কোনওরূপে বাঁচিল। আর একবার রাত্রি দুইটার সময় সেই বেচারিকে ধরিয়া বাহিরের রাস্তায় লইয়া গিয়া, তাহার পরিধানের সাড়ী খুলিয়া গ্যাস পোষ্টের দুইদিকে দুই হাত দিয়া, বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। পাহারাওয়ালা আসিয়া খুলিয়া দেয়। সেইবারে স্ত্রীলোকটি অপমানে আত্মহত্যা করে। এইরূপে সে একটি স্ত্রী হত্যা করিয়াছে; আবার আর একটিকে বিবাহ করিয়া মারিবার জন্য লাগিয়াছে। সেই গোষ্ঠবিহারী কি সহজে ছাড়িবার পাত্র? সে যখন দেখিল নালিশে হইবে না, তখন আর এক উপায় স্থির করিল। কলিকাতায় আপনার ইয়ারদলের সাহায্য চাহিল। তাহারা স্থির করিল, যে একদিন অপরাহ্নে তাহারা চারি পাঁচজন চুঁচড়াতে আসিবে, এবং হরেন্দ্র যখন দুই একজন বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়ায়, তখন মিছা একটা ছলে বিবাদ বাঁধাইয়া একটা দাঙ্গা করিবে। তদনুসারে একদিন তাহারা আসিয়াছিল। কিন্তু মাতালের বুদ্ধি। কোন কাজই সুরার উত্তেজনা না হইলে হয় না। প্রায় সকলেই অতিরিক্ত পরিমাণে সুরাপান করিয়া আসিয়াছিল। গোষ্ঠবি-

ক্লাবের খেলার পর, হরেন্দ্র একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে গঙ্গার ধারের রাস্তাতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাহারা কয়েকজন পশ্চাৎ হইতে তাঁহাদের দুইজনকে ধাক্কা মারিয়া সম্মুখে গেল। সঙ্গের লোক বলিলেন—"লোকগুলো কেমন অভদ্র দেখেছেন, ধাক্কা মেরে গেল।" হরেন্দ্র বলিলেন—"মদের গন্ধ পেলে না? ওরা কি আর প্রকৃতিস্থ আছে?" তাঁহাদের কথা শুনিয়াই, উক্ত দলের মধ্যে একজন কোমর বাঁধিয়া ও আস্তিন গুটাইয়া বলিল—"এস না বাবা, ফাইট করা যাক।" হরেন্দ্র তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন—"ওদের সঙ্গে কথা বলো না, চল আমরা চলে যাই।" এই বলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি পূর্বোক্ত ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহার গ্রীবাদেশে এক ঘুষি মারিল, এবং তদ্দণ্ডেই অপর কয়েকজন আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। হরেন্দ্র যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বামহস্তে পূর্বোক্ত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তখানি এমন করিয়া ধরিলেন, যে ঘুষি মারা দূরে থাক, তাহার নড়াচড়া দুষ্কর; এবং দক্ষিণ হস্তে দুইজনকে ধাক্কা দিয়া পাঁচ হাত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরা পশ্চাতে আসিতে আসিতে এই সংবাদ পাইয়া, মার মার করিয়া ব্যাট ও ব্যাটের কাঠি হস্তে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়াই আক্রমণকারীর দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ছেলেরা কিয়দ্দূর পশ্চাতে ছুটিল। মাতালেরা কি দৌড়িতে পারে? ছুটিতে ছুটিতে একটার ঘাড়ে অপরটা পড়িল, কোনটা আছাড় খাইয়া মাটিতে গড়াগড়ি গেল, কোনটার মাথা বৃক্ষের গায়ে ঠুকিয়া গেল। ছেলেরা হরেন্দ্রের আদেশে অনুসরণ ত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিল।

এই ঘটনা কয়েকদিন পূর্বে ঘটিয়াছে। হরেন্দ্র এসব বিবরণ রায়-পরিবারের কাহাকেও কিছু বলেন নাই; কেবল নয়নতারাকে বলিয়াছিলেন, "কাল এক মাতাল দলের সঙ্গে দাঙ্গা হতে হতে গিয়েছে।" অদ্য রাত্রে আহারের পর রায় মহাশয় ও গৃহিণী সবে গিয়া শয়ন মন্দিরে বসিয়াছেন, নয়নতারা টেবিলের উপরে বাতিটি রাখিয়া পড়িতে বসিবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময় ভবন-পার্শ্বস্থ রাজপথে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। কে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"দরওয়ান! দরওয়ান! বাতি নিয়ে এস, বাতি নিয়ে এস, মানুষ খুন হয়েছে।"—এই কথা শুনিয়াই রায় মহাশয় গাড়ি বারাণ্ডায় বাহির হইলেন ও দ্বারবানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল,—"হরেন বাবুকো মার ডালা।" এই কথা শুনিবামাত্র তিনি যেন আর চোখে কানে দেখিতে ও শুনিতে পান না। "হরেনকে খুন করেছে" গৃহিণীকে এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। গৃহিণীও "ওমা সে কি গো, ওমা সে কি গো" বলিতে বলিতে নীচের দিকে অগ্রসর হইলেন। যেই এই কথা শোনা, অমনি নয়নতারা যেখানে ছিলেন সেখানে কে যেন তাঁহাকে মাটিতে পুতিয়া দিল। এই ধাক্কা সামলাইতে তাঁহার কয়েক সেকেণ্ড গেল। অবশেষে তিনিও বাতিটি লইয়া নীচের দিকে ছুটিলেন। তাঁহারা গাড়ি বারাণ্ডার নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতে দেখিলেন, লোকে ধরাধরি করিয়া হরেন্দ্রকে আনিতেছে। ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে; চেতনা নাই; দেখিলেই মৃত বোধ হয়; রক্তে কাপড় চোপড় ভাসিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহাকে ভিতরের হলে আনিবামাত্র গৃহিণী দেয়ালে মাথা রাখিয়া ভ্রমী গেলেন। "জল আন, পাখা আন, বাতাস কর" এই শব্দ চারিদিকে উত্থিত হইল। নয়নতারা বাতিটি রাখিয়া, পাখা, জল প্রভৃতি আনিয়া মাতার ও আহত ব্যক্তির পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন। সুরেশচন্দ্র বাড়ীর গাড়ি যুতিয়া ডাক্তার আনিতে গেলেন। ডাক্তারবাবু আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"গুরুতর ক্ষতি কিছুই হয় নাই, আঘাতটা খুব লেগেছে ও অনেকটা রক্ত গিয়েছে। সেরে উঠতে কয়েক দিন লাগবে।" তিনি যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আজকার রাত্রের মধ্যে চেতনা না হলে আপনারা ভয় পাবেন না; একটা ঔষধ রৈল, চেতনা হলেই খাওয়াবেন।" অচেতন অবস্থাতে কি কি করিতে হইবে ও কি কি ঔষধ দিতে হইবে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু গেলেই, হরেন্দ্রকে উপরে রায় মহাশয়ের পার্শ্বের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। গৃহিণী বলিলেন—"ওর চৈতন্য না হওয়া পর্যন্ত আমি এ ঘর হতে নড়তে

পারবো না।" তাঁহাকে অনেক বুঝান হইল কোনও মতেই শুনিলেন না। অবশেষে তাঁহার জন্য আর একখানি নেয়ারের খাট আনিয়া, সেই ঘরের এক পার্শ্বেই তাঁহার শয্যা করিয়া দেওয়া হইল। তিনি সেখানেই শয়ন করিলেন। একে একে গৃহের সকলেই স্ব স্ব শয়নমন্দিরে গিয়া শয়ন করিলেন; কেবল সৌদামিনী ও নয়নতারা রোগীর শুশ্রূষার জন্য জাগিয়া রহিলেন। সৌদামিনী রাত্রি দুটা পর্যন্ত বসিয়া বাতাস করিলেন ও মাথাতে ঔষধ দিলেন; দুইটার পর জননীর পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন; নয়নতারা তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন।

রাত্রি যখন পাঁচটা, পূর্বাকাশে অরুণের প্রভা দেখা দিতেছে, সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গম কুল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হরেন্দ্র চক্ষু মেলিলেন। চক্ষু মেলিয়া বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নয়নতারার মুখে দৃষ্টি পড়িল।

নয়নতারা। (মুখের নিকট নত হইয়া) আমাকে কি চিনতে পারছেন?

হরেন্দ্র। (ক্ষীণস্বরে) হাঁ।

নয়নতারা। কে বলুন দেখি?

হরেন্দ্র। মিস রায়।

নয়নতারা। অমন করে চারিদিকে দেখছেন কেন?

হরেন্দ্র। আমি কোথায় আছি?

নয়নতারা। আমাদের বাড়ীতে।

হরেন্দ্র। এখানে কি ক'রে এলাম?

নয়নতারা। আপনাকে রাস্তাতে মেরে ফেলে গেছিল, আমরা তুলে এনেছি।

হরেন্দ্র। (গৃহিণীর খাটের দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া) ও কে?

নয়নতারা। ওখানে মা ও সদু ঘুমুচ্ছেন। আপনি আর কথা কবেন না, এই ঔষধটা খান, খেয়ে চুপ করে ঘুমুন। আমি বসে বাতাস করি।

এই বলিয়া ঔষধটা খাওয়াইয়া দিলেন। অবশিষ্ট রাত্রিটা এইভাবে কাটিয়া গেল। রজনী প্রভাত হইলে গৃহিণী উঠিয়া যখন হরেন্দ্রকে সচেতন দেখিলেন, তখন—"চোখ চেয়েছ বাবা" বলিয়া একেবারে আসিয়া তাঁহার শয্যার উপরে পড়িলেন। বোধ হইল, যেন হরেন্দ্র হাত বাড়াইয়া তাঁহার পদদ্বয় অন্বেষণ করিতেছেন। নয়নতারা বলিলেন,—"মা, তোমার পাদধুলো নিতে চাচ্চেন।" গৃহিণী অমনি আপনার পদধূলি লইয়া হরেন্দ্রের মস্তকে দিয়া বলিলেন,—"বেঁচে থাক, তোমার সব আপদ বালাই কেটে যাক।" ক্রমে রায় মহাশয়ও আসিলেন। হরেন্দ্র তাঁহারও পদধূলি লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন।

নয়নতারা। বাবা, তোমার পাদধুলো নিতে চাচ্চেন।

রায় মহাশয়। থাক, থাক, ওই হয়েছে।

নয়নতারা। পাদধুলোটা দেওনা বাবা, নিতে চাচ্চেন।

রায় মহাশয় একখানি পা খাটের উপরে তুলিলে হরেন্দ্র পদধূলি লইলেন।

দেহে বল থাকার এমনি গুণ, হরেন্দ্র দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া বসিলেন। এই দুই দিন সৌদামিনী ও টুনী দিনরাত্রি তাঁহার সেবা করিলেন। একজন যায় একজন থাকে। নয়নতারা সর্বদা থাকিতে পারেন না, তাঁহার উপরে সংসারের ভার। মাতা ঠাকুরাণীর হাত পায়ে কোন বল নাই, তিনি হরেন্দ্রের ঘরে সর্বদা আছেন বলিলেই হয়, কিন্তু তাঁহার দ্বারা কোনও কাজ হয় না। হরেন্দ্র উঠিয়া বসিলে, রায় মহাশয় তাঁহার মুখে পূর্বেকার দাঙ্গার বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং ইহাও শুনিলেন, যে গোষ্ঠবিহারীও তন্মধ্যে ছিল। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাহারাই গুণ্ডা লাগাইয়া মারিয়াছে। ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"সহজে ছাড়া হবে না একটু অনুসন্ধান করলেই ধরতে পারা যাবে, একবার খুটোপুটি করে দেখতে হচ্চে।" হরেন্দ্র বলিলেন,—"আমার ইচ্ছে নয় যে কিছু করা হয়, যারা এমন কাপুরুষ যে অন্ধকারে লোক দিয়ে

মারে, তাদের ঘৃণাপূর্বক উপেক্ষা করাই ভাল।" সুতরাং মামলা মোকদ্দমার চেষ্টা আর হইল না।

এই রায়পরিবারের কেহই আতিথ্যে কম নয়। কর্তা ও গৃহিণীর কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি। সুরেশচন্দ্রের যে হরেন্দ্রের প্রতি এতটা অবজ্ঞার ভাব আছে, তিনিও এই কয়দিন দিনে দুইবার হরেন্দ্রের নিকট আসিয়া বসিতেছেন ও আবশ্যকমত সাহায্য করিতেছেন। নন্দরাণী সময় পাইলেই আসিতেছেন। পটল ত তার মাষ্টারের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া আছে; হরেন্দ্র যখন যাহা হুকুম করিতেছেন, তখনি তাহা সম্পাদন করিতেছে। টুনীর ত কথাই নাই। সে দিনে দশবার এই ঘরে আসিতেছে; হরেন্দ্র শুইয়া থাকিলে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া থাকিতেছে এবং দাঁড়াইয়া থাকিলে গলা ধরিয়া ঝুলিতেছে। জননী উপস্থিত থাকিলে এক একবার বলেন,—"তুই যে ওকে বিরক্ত ক'রে তুললি! গলা ধরে ঝুলিসনে, লাগবে।" হরেন্দ্র বলেন,—"না আমার লাগছে না।" ফল কথা টুনীর এই শিশুর মত সরল ব্যবহারটা তাঁর বড় মিষ্ট লাগে। অগ্রে সৌদামিনীরও হরেন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞার ভাব ছিল। বোধহয় জ্যেষ্ঠের নিকট পাইয়াছিলেন। তিনিও এতদিন একটু দূরে দূরে থাকিতেন। এই কয়দিনে হরেন্দ্রের নিকট থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সে ভাবটা পরিবর্তিত হইয়াছে। একদিন নয়নতারাকে বলিয়াছেন,—"দিদি, তুমি হরেনবাবুকে কেন এত শ্রদ্ধা কর ও ভালবাস তা বুঝেছি, কি মানুষ!" সৌদামিনীর এই ভাবের পরিবর্তনে হরেন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। নয়নতারার কথা আর কি বলিব। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে ঘোরে, তেমনি তিনি এই কয়দিন এই ঘানিগাছের চারিদিকে ঘুরিতেছেন। সংসার দেখিতেছেন, কর্ম কাজ করিতেছেন, আসিতেছেন, যাইতেছেন, অথচ প্রধান মন প্রাণ ও প্রধান আকর্ষণ এখানেই রহিয়াছে। ঔষধটি খাওয়াবার সময় খাওয়ান, বিছানাটি বদলিয়া দিবার সময় বদলিয়া দেওয়া, পথ্যটি যোগাইবার সময় যোগান, যথাসময়ে যথারীতিতে সমুদায় হইতেছে। তদ্ভিন্ন অনেক সময় হরেন্দ্রের নিকটে বসিয়া ভাল ভাল বই পড়িয়া শুনাইতেছেন। দশ দিনের পরেই হরেন্দ্র কাজে যাইতে সমর্থ হইলেন। এই দশ দিনে রায় পরিবারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পূর্বাপেক্ষা অধিক গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর একদিনের বিবরণ বলিতে যাইতেছি। কিন্তু তদগ্রে আরও কিছু বক্তব্য আছে। রায় মহাশয়ের পরিবার পরিজনের সকলের পরিচয় এখনও দেওয়া হয় নাই। তাঁহার পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রীগণ ব্যতীত আরও কতকগুলি মনুষ্য আছে, তাহাদের সংখ্যা বড় অল্প নহে। সেগুলির উল্লেখ আরম্ভ করিলে সকলের বোধ হইবে, তাঁহার ভবনটি একটি প্রাণি-বাটিকা বা জুওলজিকাল গার্ডেন বিশেষ। বাল্যকাল হইতে রায় মহাশয়ের ইতর প্রাণী পোষার বাতিকটি বেশ আছে। পটল তাঁহার এই বাতিকটি বহুল মাত্রায় পাইয়াছে। পটলের চেষ্টা ও রায় মহাশয়ের সাহায্যে দেড় বৎসরের মধ্যেই এই জুওলজিকাল গার্ডেনটি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভবনের উত্তরদিকে, রন্ধনশালার পশ্চাতে একটি স্বতন্ত্র বাড়ী আছে, তাহা তাঁহার অশ্বশালা বা গোশালা। সে বাড়ীতে গাড়ি ঘোড়া থাকে; এক পার্শ্বে কোচম্যান ও সহিস সপরিবারে বাস করে, অপর পার্শ্বে কয়েকটি বিলাতি ও ভাগলপুরে গাই আছে। রন্ধনশালার ভিতর দিয়া এ বাড়ীতে আসিবার একটি ছোট দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া আসিয়া গৃহিণী ও নয়নতারা যে এ বাড়ীরও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, তাহা বাড়ীটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়; কারণ বাড়ীটি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে অনেক বাঙ্গালি ভদ্রলোকের বসতবাটীও সেরূপ পরিষ্কার নহে। গাভীগুলির কেহ দশ সের, কেহ বার সের দুধ দিয়া থাকে; সুতরাং রায় মহাশয়ের ভবনে দধি, দুগ্ধ, মাখম, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণেই প্রস্তুত হয়। এ সকলের জন্য বাজারে যাইতে হয় না। বরং সর্বদাই ঘৃত, মাখম প্রভৃতি কলিকাতায় কনিষ্ঠের বাড়ীতে এবং

চঁচুড়ায় গৌরীপদ রায় মহাশয়ের ভবনে ও অন্যান্য বন্ধুদের ভবনে প্রেরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐ গোয়ালের এক পার্শ্বে কয়েকটি রামছাগলও আছে, তাহারা ছেলেদের গাড়ি টানে।

এ দিকে রন্ধনশালার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে ও তৎপূর্বদিকে প্রায় চারি পাঁচ কাঠা জমি লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া একটি ছোটখাট ধরনের পশুশালা নির্মাণ করা হইয়াছে; সেটি পটলের প্রধান কীর্তি। তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জানোয়ারের জন্য নানা আকৃতির কাষ্ঠনির্মিত ঘর হইয়াছে। সেখানে সজারু, খরগোস, গিনিপিগ, বিলাতি ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, ভোঁদড়, নেউল প্রভৃতি নানা জাতীয় জন্তু আছে। বাহিরে এক প্রকাণ্ড খোপে সিরাজু, লক্কা, নোটোন প্রভৃতি নানা জাতীয় পারাবত, ও ভাঁড়ারের দাওয়াতে খাঁচার মধ্যে টিয়া, শালিক, ময়না, মনিয়া, শ্যামা প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী আছে। এ সমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা পটলের ভার। এজন্য একজন স্বতন্ত্র ভৃত্যও আছে। জানোয়ারগুলির পরিচর্যার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। আর কেনই বা হইবে? কেবল পটল যে এ কার্যে ব্রতী আছে তাহা নহে। তাহার অনেকগুলি চেলাও আছে। চেলারা এরূপ আগ্রহী যে কুমারী নাইটিঙ্গেলও ক্রিমিয়ার সমরক্ষেত্রে সেরূপ উৎসাহে যান নাই। প্রথম চেলা টুনী। সে ত পটলের বুদ্ধি বিদ্যা দেখিয়া গদ্‌গদ। সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছে, এবং সকল কাজেই সহায়। দিনে দশবার ঝগড়া হয় সত্য, কিন্তু দিনে দশবার ভাবও হয়; এবং পটল যতই উপহাস, বিদ্রূপ, তিরস্কার করুক না কেন, টুনী সমুদায় সহিয়া, কুকুরের মত পশ্চাতে পশ্চাতেই ফেরে। একটি নূতন জন্তু আসিলেই জিজ্ঞাসা করে—"ছোড়্‌দা, ও কি খাবে?" পটল বলে—"রোসনা দেখি। দেখবি এখন কি খায়।" টুনী একেবারে তটস্থ, না জানি কি মহা আবিষ্কারই হইবে। সে তন্মনা হইয়া প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করে। তৎপরের চেলা সুরেশের কন্যা ও পুত্র, চপলা ও সুধীশ; তাহারাও পায় পায় আছে; এবং যাহার প্রতি যে আদেশ হইতেছে, তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেছে। তৎপরের চেলা কোচম্যানের একটি পুত্র, এবং পাড়ার দুই গোয়ালার ছেলে। ইহাদিগকে চেলা বলিলেও হয়, গুরু বলিলেও হয়; কারণ কোন্ প্রাণী কি খায়, কার কি স্বভাব এবং কার খাদ্য কোথায় মিলে, এ সকল সংবাদ তাহারাই আনে; এবং জানোয়ারদের পীড়া হইলে ডাক্তারি তাহারাই করিয়া থাকে।

পটলের আর একটি চেলা আছে, তার নাম টাইগার বা বাঘা। সে একটি প্রকাণ্ড দোঁ-আসলা কুকুর। তার নাম যে কেন টাইগার হইল তা বলা যায় না। তাহার স্বভাব চরিত্র ব্যাঘ্রের মত কিছুই নয়। ব্যাঘ্রের সাদৃশ্যের মধ্যে দেহটি বৃহৎ ও গায়ে ডোরা ডোরা আছে। চক্ষু দুটি লাল, সেই লাল চক্ষু দুটি ও বিস্তীর্ণ হাঁ-টি দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ও মেজাজ ব্যাঘ্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যে শিশুদের কত উপদ্রব সহ্য করে, দেখিলে আশ্চর্য বোধ হয়। কখনও তাহাকে "ষ্ট্যাণ্ড অপ্, ষ্ট্যাণ্ড অপ্" বলিয়া দুই পায়ের উপরে বসাইতেছে; কখনও সেলাম করাইতেছে; কখনও হাঁ করাইয়া জিভ টানিয়া বাহির করিতেছে; কখনও ছাগলের গাড়িতে যুতিয়া টানাইতেছে; কখনও কান ও লাঙ্গুলের অকথ্য দুর্দশা করিতেছে; কিছুতেই টাইগারের দ্বিরুক্তি নাই; রাম গঙ্গা কিছুই বলে না; পড়িয়া পড়িয়া সহ্য করে এবং দেখিলে বোধহয় যেন তাহাতে সুখ পায়। প্রথম প্রথম কোনও নূতন প্রাণী বাড়ীতে আনা হইলে, সে হয়ত এক আধটু বিক্রম প্রকাশ করিত, দুই একবার ডাকিয়া দৌড়িয়া যাইত, কিন্তু পটলের বেত দুই এক ঘা খাইয়া বুঝিয়া লইয়াছে, যে তাহারাও তাহার সমাধিকারী। তাই সে ঘুমাইয়া থাকিলে কখনও কখনও খরগোসগুলা আসিয়া তাহার লেজে কামড়ায়; সে উঠিয়া যায়, কিন্তু কিছুই বলে না।

তবে তাহার বিক্রমের মধ্যে চারিটি দেখিতে পাই। প্রথম, সন্ধ্যার পর সে যখন গাড়ি বারান্ডাতে শুইয়া থাকে, তখন বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে বাতাস লাগিয়া বা অন্য কোনও রূপে সাড়া শব্দ হইলে, অথবা অন্য কাহারও ঘোড়া, গাড়ি বাড়ীর মধ্যে আসিলে ডাকিয়া থাকে। দ্বিতীয়, যদি কখনও কোনও নর্দমা হইতে কোনও ইন্দুর বা ছুঁচা বাহির হয়, তাহা হইলে এরূপ

উৎসাহের সহিত তাড়া করে, যে শিকারীদের কুকুর তত উৎসাহে বাঘ মারিতে যায় না। নর্দমার ইন্দুরগুলির প্রতি এতই বিরাগ, কিন্তু পোষা ইন্দুরকে কিছু বলে না; ইহার কারণ বলিতে পারি না। বোধহয় কখনও দেখিয়া থাকিবে, যে পটল নর্দমার ইন্দুরগুলিকে পর ও শত্রু মনে করে। তৃতীয়, অন্যের বাড়ীর বিড়াল এ বাড়ীতে আসিবার যো নাই। আসিলেই তাড়া করে; কিন্তু বাড়ীর বিড়ালগুলিকে কিছু বলে না। চতুর্থ, শিশুদল খেলিতে খেলিতে ঝগড়া করিলে মধ্যস্থতা করিয়া থাকে। তাহারা মারামারি করিয়া আসিয়া যদি বলে, "টাইগার! টাইগার! দেখ দেখি আমাকে মারচে"—তখন একবার মুখ তুলিয়া 'ঘেও' করিয়া আক্রমণকারীকে বকিয়া দেয়। এইজন্য লোকে বলে সে ছেলেদের মুরুব্বি।

টাইগার ব্যতীত এ বাড়ীতে আর একজন আছে, তাহার নাম টাইনী। টাইনী একটি ছোট কুকুর। লম্বে এক হাত, উর্ধ্বে আধ হাত হয় কিনা সন্দেহ। টাইনীর বর্ণটি পাটকিলা, কান দুটি খরগোসের ন্যায়, মুখটি ও চক্ষু দুটির কোলে কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু দুটি যেন জ্বলিতেছে। টাইনী নরলোকে বড় আসে না; অর্থাৎ নীচের তালায় প্রায় নামে না। উপরের তালায় সুরেশ-চন্দ্রের মহলে, যেখানে টুনী, সুধীশ ও মিনি প্রভৃতি খেলা করে, সেইখানেই সর্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। তার আদর দেখে কে? প্লেটে করিয়া ভাত না দিলে, তার খাওয়া হয় না; চেয়ারের গদিটির উপর না হইলে শোওয়া হয় না। টাইনী যখন নরলোকে নামে, তখন টাইগারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন সে টাইগারকে বিরক্ত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করে। টাইগার ঘুমাইয়া থাকে, টাইনী বলে, "ওঠ, ওঠ, খেলা করি।" এই বলিয়া তাহার কানে ও লেজে কামড়াইয়া টানাটানি করে; টাইগার তাহা গ্রাহ্য করে না। বোধহয় ভাবে একে স্ত্রীজাতি তাহাতে দুর্বল। এই ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া শুইয়া থাকে।

যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পটলের প্রাণিবাটিকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা পড়িয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে পটল একটি সুন্দর হরিণশিশু কিনিয়াছিল। সে আসা অবধি শিশুদের আর বিশ্রাম ছিল না। তার রূপগুণের কতই প্রশংসা! ধনীরা রাজার ছেলের এত প্রশংসা করে নাই। টুনী ঘুংগুরের মালা গাঁথিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছিল। সে যখন ঝুম ঝুম করিয়া ছুটিত তখন শিশুদল স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইত। কয়েক-দিন হইল, অবোধ পশু লোহার জালের মধ্যে একখানি পা পুরিয়া দিয়া পাখানি ভাঙিয়াছিল। তদবধি তাহার চিকিৎসার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কয়েকদিন ধরিয়া কোচম্যানের ছেলে কত পাতা লতা আনিয়া পায়ে বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হয় নাই। অদ্য অপরাহ্নে সেই হরিণশিশু হরিণলীলা সংবরণ করিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, শিশু-দলের কি বিপদ উপস্থিত। তাহারা হরিণশিশুকে গংগার ধারে কবর দিয়া আসিয়া, সকলেই শোক-শয্যায় শয়ন করিয়াছে; আর উঠিতেছে না। পটলের শোকটা বোধহয় আসল ধনীভুক্ত শোক, অপরদিকে শোকটা অনেকটা দেখাদেখি, তাহা না হইলে চপলা, সুধীশ, মিনি, সকলেই শুইবে কেন? যাহা হউক তাহারা আজ কেহ উঠিতেছে না, সন্ধ্যার সময়ে সকলে শয্যায় পড়িয়া আছে। টুনী বাইতে আসিতে তাহাদিগকে শয়ান দেখিয়া বলিতেছেন,—"মরণ! আশ্চর্য! পড়ে থাকবার রকম দেখ।"

ওদিকে আজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন। রায় মহাশয় প্রথম সাক্ষাতের দিনে পরেশনাথ রায়কে যে বলিয়াছিলেন, একদিন একটু উপাসনার আয়োজন করে ব্রহ্মসংগীত শুনা যাবে, তদনুসারে অদ্যকার আয়োজন। তাঁহার আদেশানুসারে মহেন্দ্রনাথ কলিকাতায় গিয়া ব্রাহ্ম-প্রচারক মহাশয়দিগকে চুঁচড়ার বাড়ীতে আসিয়া উপাসনা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আজ তিন চারজনে আসিবেন, নয়নতারা বৈকাল হইতে তাঁহাদের আতিথ্য সংকারের জন্য ব্যস্ত আছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্র তাঁহাদের কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ সমভি-

ব্যাহারে উপাসনার্থ উপস্থিত হইলেন। বৈঠক ঘরের পাশের ঘরে উপাসনার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নয়নতারা অগ্রেই সেখানে বসিবার আসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একে একে পরিবারস্থ সকলে যথা নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় গৃহিণী ও কন্যাদিগের পার্শ্বে ভক্তিভাবে সমাসীন হইলেন। আসিলেন না কেবল সুরেশচন্দ্র ও শিশুগণ। সুরেশচন্দ্র না আসাতে মহেন্দ্রনাথের কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না; কারণ তিনি জানিতেন এ সকল বিষয়ে তাঁর অনুরাগ নাই; কিন্তু এ বাড়ীর শিশুদিগকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন, তাহারা না আসাতে খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেরা কোথায় ?"

গৃহিণী। সেগুলোর আজ বাপ্ মা মরেচে, তাই শোক করচে।

মহেন্দ্রনাথ। (হাসিয়া) সে কি রকম ?

গৃহিণী। কয়দিন হ'ল পটলা একটা হরিণের বাচ্ছা এনেছিল, সেই বাচ্ছাটা লোহার জালে একখানা পা গলিয়ে দিয়ে, পাখানা ভেঙ্গে ফেলে ক'দিন ধরে পড়ে শ্বসছিল; সে ক'দিন ওগুলোর নাওয়া খাওয়া একেবারে ঘুচে গিয়েছিল; আজ সেই বাচ্ছাটা মরেছে, তাই সকলগুলো শোকে বিছানায় অঙ্গ ঢেলে পড়ে আছে। (সকলের হাস্য)।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) তুমি বলছিলে বাপ মা মরেছে, আমি দেখি বাপ মারও অধিক। আমরা মোলে কি এত শোক করবে!

সৌদামিনী। (জননীর প্রতি) কি করে সেটাকে গোর দিতে নিয়ে গিয়েছিল, তা বুঝি দেখনি ? কোথা থেকে একটা ছোট খাট যোগাড় করে, তাতে সাদা কাপড় দিয়ে বিছানা করে, তাকে শুইয়ে, বাঁকারী বেঁধে, শাল চাপা দিয়ে, খাট ঘিরে লায়েল্লা করতে করতে নিয়ে গিয়েছে। (সকলের হাস্য)।

পরেশনাথ। এরা লায়েল্লা শিখল কোথা থেকে ?

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) আমাদের কোচম্যানের একটা ছেলে আছে, সেটা ওদের গুরু, এটা বোধহয় তারই উপদেশ। (সকলের হাস্য)।

গৃহিণী। (সৌদামিনীর প্রতি) সদি! হতভাগাগোলের কান ধরে তুলে আনগে ত। তাদের শোক করা বার করছি।

মহেন্দ্রনাথ। না না থাক! ঐ ওদের উপাসনা।

ব্রহ্মোপাসনান্তে রায় মহাশয় অতিথিদিগকে সঙ্গে করিয়া সপরিবারে আহার করিলেন। সুরেশচন্দ্র আহারের সময় আসিয়া জুটিলেন; কিন্তু বড় একটা কথাবার্তা কহিলেন না। আহার শেষ হইবামাত্র আবার সরিয়া পড়িলেন। এটা নয়নতারার ভাল লাগিল না। রায় মহাশয় নিজে ঈশ্বরের গুণকীর্তন শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং গৃহাগত অতিথিদিগের আদর অভ্যর্থনা করিতে কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের ভাব অন্যপ্রকার। কিছুই যেন তাঁহার মনের মত হইতেছে না। তিনি যাহা চান সবই তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। তিনি চান তাঁহাদের বাড়ীতে হরেন্দ্রের গতিবিধি না থাকে; নয়নতারা তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া না পড়ে; বাড়ীতে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মদের অধিকার স্থাপন না হয়; সমাবস্থ লোকদিগের সঙ্গেই তাঁহাদের আত্মীয়তা হয়; গরীব ও হীনাবস্থ লোকেরা একটু দূরে দূরে থাকে। কিন্তু প্রতিদিনের ঘটনা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। পিতা মাতা হরেন্দ্রকে দিন দিন আপনার লোক করিয়া তুলিতেছেন; তাহার কর্ম ছাড়ান হইল না; নয়নতারাকে কিছুই বলা হইল না; সবই সুরেশের চক্ষে খারাপ লাগিতেছে। কেবল তাহা নহে, পিতার ব্যবহার সম্পূর্ণ তাঁহার মনের অনভিমত। তিনি মানুষের সহিত মিশিবার সময়, ধনী দরিদ্রের ভেদ ভুলিয়া যান; কেবল গুণ দেখিয়া মানুষকে ভালবাসেন। দৃষ্টান্তস্থল মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মহেন্দ্রনাথ হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে ২৫ টাকা বেতনে মাষ্টারী করেন; তাঁহার পরিধানে মলিন বস্ত্র; মলথলে [illegible]

পিরাণ; পায়ে চটি জুতা; দেখিলে ভাট বামন বলিয়া মনে হয়। ধনীদের দ্বারে গেলে দ্বারবান নিশ্চয় তাড়াইয়া দেয়; কোনও অফিসে বা আদালতে গেলে হয়ত বাহিরের বেঞ্চে দুই ঘণ্টা বসাইয়া রাখে। তাহাতে আবার বাহ্যবস্তুর প্রতি অতিরিক্ত অনাস্থা বশতঃ অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। মস্তকের কেশগুলিতে একটু একটু হাত দিলে ওপ্রকার অযত্নসম্ভূত গুল্মরাশির মত দেখায় না। মুখে মধ্যে মধ্যে এক আধটু সাবানের প্রলেপ পড়িলে, কপালের প্রান্তে ও চক্ষের কোলে ওপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ রেখা আর থাকে না। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের সে খেয়াল নাই। ক্ষৌরকারের ব্যয়টা বাঁচাইবার জন্যই হউক, অথবা প্রেততত্ত্বের সহিত শ্মশ্রুর কোনও নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হউক, তিনি শ্মশ্রু রাখিয়াছেন। লোকে উঠানে গাছ পুঁতিলে তাহার একটু যত্ন করে; কিন্তু মহেন্দ্রনাথের শ্মশ্রুর প্রতি কিছুমাত্র যত্ন নাই। যত্নের মধ্যে কাহারও সহিত কথা কহিবার সময়, বিশেষতঃ তর্ক করিবার সময়, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলিকে চিরুণীস্বরূপ করিয়া, দক্ষিণদিকের শ্মশ্রুগুলি আঁচড়াইয়া থাকেন। তাহাতে এই হইয়াছে, একদিকের শ্মশ্রুগুলি বাড়িয়া গিয়াছে। একে কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি, তাহাতে এরূপ শ্মশ্রুগুলি দূর হইতে মুখ ও শ্মশ্রু স্বতন্ত্র করিয়া চেনা যায় না। সমগ্র মুখখানি একখানি মৌচাকের মতই দেখায়। কাজেই তাঁহার চেহারা দেখিলে শিশুরা ভয় পায়, ভদ্রমহিলারা মুখ শিটকান, ও বাবুরা মনে মনে অবজ্ঞা করেন। ইহার উপর মহেন্দ্রনাথের এক সক আছে। সেটি প্রতিদিন স্থানের পূর্বে অর্ধ ঘণ্টা ধরিয়া আভাঙ করিয়া, সর্বাঙ্গে সরিষার তৈল মর্দন। একে তো তৈলাক্ত দেহ, তাহার উপরে চুঁচড়া সহরের রাজপথের ধূলি, উভয়ের সংযোগে মহেন্দ্রবাবুর কৃষ্ণবর্ণ রূপটির উপরে অনেক পর্দা কালিমা পড়িয়াছে। সুতরাং ব্যাপারটা কি দাঁড়াইয়াছে সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এরূপ যার চেহারা ও এরূপ যার সামাজিক অবস্থা, তাঁহাকে যদি সুরেশচন্দ্র পছন্দ না করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারি! কিন্তু এরূপ লোকই রায়মহাশয়ের অন্তরঙ্গ আত্মীয়। প্রাতে বা সন্ধ্যাতে মহেন্দ্রনাথকে একবার না দেখিলে তাঁর দিন চলে না। অন্তঃপুরেও তাঁহার অবারিত গতি। এ সকল সুরেশ-চন্দ্রের মনঃপূত নয়। মহেন্দ্রবাবু পোষাক পরিচ্ছদ ও তৈলাক্ত গাত্রের গন্ধ প্রভৃতি লইয়া গৃহিণী ও সন্তানদিগের মধ্যে অনেক হাসাহাসি হয়। নয়নতারা সেসব পছন্দ করেন না। সৌদামিনীর সঙ্গে ত তাঁর এই জন্য ঝগড়াই হয়। সৌদামিনী বলেন—"দিদি! ধন্যি তোমার সহিষ্ণুতা! আমিত বাপু তোমার মহেন্দ্রবাবুর গায়ের গন্ধে কাছে দু'দণ্ড বসতে পারি না। নোংরা হওয়া বুঝি ধার্মিকের একটা লক্ষণ? এমন ধর্ম্ম মাথায় থাক!" নয়নতারা বলেন,—"তোরা কেবল মানুষের খোসাটা দেখিস বৈ ত নয়।" কিন্তু চক্ষের অগোচরে যতই হাসাহাসি ও তর্ক-বিতর্ক হউক না কেন, রায়পরিবারের মহিলারা সকলেই মহেন্দ্রনাথকে ধার্মিক ও ভক্ত মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মোপাসনার পরদিন সন্ধ্যাকালে নয়নতারা ও নন্দরাণী উভয়ে সুরেশচন্দ্রের শয়ন-মন্দিরে খোকাবাবুকে লইয়া খেলা করিতেছেন। নন্দরাণী পালঙ্কে সমাসীনা, নয়নতারা সন্নিকটে দাঁড়াইয়া খোকাকে লইয়া লুফিতেছেন ও ইংরাজী, বাঙ্গালা, নানা রকম আদর করিতেছেন;—

Dance up baby dance up high,
Never mind baby mother is nigh.

আবার বুকে চাপিয়া ঘন ঘন চুম্বনপূর্বক;—

ধন ধন ধন, অমূল্য রতন,
এ ধন যার ঘরে নাই, তার বৃথাই জীবন।

উঁ—হুঁ—হুঁ—এটা যেন মোমের পুতুল, ইচ্ছে করে কাঁচ হাতখানা খাই। (নন্দরাণীর প্রতি) ভাই এ ছেলেটা কিন্তু আমার, দেবে ত?

নন্দরাণী। তা দেবনা কেন? এখনি নেও, তা হলে ত বেঁচে যাই। তোমার কাছে শিক্ষা পাবে, ওর ত সেটা সৌভাগ্য।

নয়নতারা। (হাসিয়া) আর দিতে হয় না গো। ওরে এমন পুতুলটা কি কেউ প্রাণধরে দিতে পারে? (খোকার গাল টিপন ও তাহার ঠোঁট ফুলাইয়া ক্রন্দন) মা মণি! কেঁদ না মারিনি আদর করেছি!

নন্দরাণী। আর ভাই তুমি ত বিয়ে করলে না, তাহলে এমন মোমের পুতুল তোমার কোলেই হ'ত।

নয়নতারা। (হাসিয়া) ওঃ বুঝেছি গো বুঝেছি! আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে সমুদয় রাজ্যিটার রাণী হয়ে ঘরকন্না করতে চাও।

নন্দরাণী। তা বলবে বৈকি? তোমাকে ত ভাই কথাতে কেউ পারবে না।

নয়নতারা। (নন্দরাণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া) ওগো বৌরাণি! আমি কোথাও যাব না, তোমাকে চিরদিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাব।

ইত্যবসরে সুরেশচন্দ্র সায়ংকালীন বায়ু সেবন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া নয়নতারা নন্দরাণীর কণ্ঠালিঙ্গন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরেশচন্দ্র। (নয়নতারার প্রতি) বোস্ বোস্! উঠলি কেন?

নয়নতারা। না যাই।

সুরেশচন্দ্র। বোস্ না একটা কথা আছে।

নয়নতারা। (বসিয়া) কি কথা?

সুরেশ। সেদিন একটা কথা বললাম আর তুই ফোঁস করে উঠলি; এখন কি হলো?

নয়নতারা। কেন কি হয়েছে?

সুরেশ। আর বিম্নী হতে বাকি কি থাকল? বাবাকে শুদ্ধ বেম্মা করবার যোগাড় করেছিস।

নয়নতারা। কি তুমি বেম্মা বেম্মা কর! যত ছেপলা লোকের সঙ্গে মেশ বৈত নয়; তাদের বোল চাল শিখছ। বাবাকে কিসে ব্রাহ্ম করলাম?

সুরেশ। ব্রাহ্মেরা এসে বাড়ীতে উপাসনা করতে আরম্ভ করলো, এখন ত লোকে আমাদের ব্রাহ্মই বলবে।

নয়নতারা। ব্রাহ্মেরা এসে ভগবানের নাম শোনালে যদি ব্রাহ্ম বলে, তাহলে বাবা যে পণ্ডিত মশাইকে ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করে মাকে শোনাতে অনুরোধ করেছেন, তা করলে আবার হিন্দু বলবে। ফলকথা মানুষের বলাতে কি করে, তারা ত কত কথাই বলছে। আমরা সকল প্রকার ধর্মকর্ম বিবর্জিত হয়ে রয়েছি; বাড়ীতে মাঝে মাঝে একটু ভগবানের নাম হয় এটা কি ভাল নয়?

সুরেশ। এবার তুই ধর্মের ছালা বাঁধবি দেখছি?

নয়নতারা। তুমি ফের ছেপলাম আরম্ভ করলে? তুমি দিন দিন কি হয়ে উঠছ? এতগুলি ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এলেন, একরাত বাড়ীতে থাকলেন, বাড়ীতে পরমেশ্বরের নাম হ'ল, তুমি বাড়ীর বড়ছেলে, একবার সেখানে গিয়ে একটু বসলে না! তাঁরা কি মনে করলেন?

সুরেশ। কি আর মনে করবেন, বাবা স্বয়ং আছেন, যা করবার তিনি করছেন, আমরা থাকলাম, না থাকলাম, তাতে কি আসে যায়?

নয়নতারা। বলি উপাসনাতে একটু বসলে গায়ের মাস কি কেউ ক্ষুর দিয়ে কেটে নিত?

সুরেশ। আমার ও ভণ্ডাম ভাল লাগে না।

নয়নতারা। ভণ্ডামটা কি?

সুরেশ। মানি না, বুঝি না, ভড়ং করে চোখ বুজিয়ে বসে থাকব; সেটা আমি পারি না।

সুরেশ। কি জ্বালা বাহির থেকে কি চেঁচাচেঁচি করে কথা হয় ?

অবশেষে নয়নতারা অনিচ্ছার সহিত উঠিয়া দ্বারটি খুলিয়া দিয়া, পালঙ্কোপরি মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিলেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহার মস্তকের নিকট বসিয়া, আস্তে আস্তে তাঁহার কুন্তলজাল গুছাইতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"আমি একটা কথা বললাম, তাতে এত বড় রাগ কি করতে আছে ? তাহলে ভাই-বোনে মন খুলে কথাবার্তা বলা ভার হবে।"

নয়নতারা। তুমি মন খুলে কথা বলেছ, তাতে ত আমি চটিনি। তুমি আমাকে যে অন্যায় কথা বলেছ, তাই না হলে আর তোমার মুখ দেখতাম না।

সুরেশ। এত বড় কথা তোকে আমি কি বলেছি ?

নয়নতারা। কেন, তুমি আমার character-এর উপর reflection করেছ ?

সুরেশ। ছি ! ছি ! ! এমন কথা বলিসনি। অন্যে তোর character-এর উপর reflection করলে, তার রক্ত দর্শন করি ; আর আমি তোর character-এর উপর reflection করব ?

নয়নতারা। কেন, তুমি বলেছ—"তোর চরিত্র খারাপ করে ছাড়বে"; চরিত্র বললে কি বুঝায় ?

সুরেশ। আমি কি তোদের মত বাংলা জানি ? আবার যেটুকু জানি তাও রাগ হলে উড়ে যায়। আমার মতলবটা বুঝতে পারিস নি ? আমার মতলবটা এই, তুই যেমন বললি ছেপ্‌লো লোকের সংগে মিশে ছেপ্‌লো হয়ে যাচ্ছি, আমিও তেমনি বললাম ব্রাহ্ম গোঁড়াদের সংগে মিশে তোর স্বভাব-চরিত্রে যা ছিল না তাই হচ্চে। এতে এত রাগ কেন ? তা হলে ত আমারও লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা উচিত ছিল।

নয়নতারা। যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞাসা কর, চরিত্র বললে ইংরিজীতে যাকে character বলে তাই বোঝায় কি না ?

সুরেশ। আমি বাপু অত জানিনি। আমার বড় দুঃখু হচ্চে যে তুই এত বড় সাংঘাতিক কথাটা ভাবতে পারলি। আমি কি আমার বোনদের জানি না ? আমি কি তোকে ভালবাসি না ? আমি তোকে যা ভাবি তা তোর মুখের উপরে কি করে বলবো। তবে একটা কথা বলতে পারি।

এই বলিয়া অবনত হইয়া ভগিনীকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার কানের কাছে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"I am proud of my sisters"—অর্থাৎ "আমার বোনেদের আমি একটা অহংকারের জিনিস মনে করি"—এই কথা বলিয়া ভগিনীর কপোলে নিজ কপোল সংলগ্ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। অবশেষে উঠিয়া ভগিনীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "চল্ চল্ বাবা বসে আছেন।"

নয়নতারা ধীরে ধীরে উঠিলেন। সুরেশচন্দ্র নিজ বাম পক্ষের মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি পুরিয়া লইয়া তাঁহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া চলিলেন। সিঁড়িতে নামিবার সময় নয়নতারা বলিলেন, "ছেড়ে দাও, আমি আপনি যাচ্ছি।"

সুরেশ। না ছেড়ে দেব না।

সেইভাবে দুইজনে আহারের স্থানে উপস্থিত। কর্তা মহাশয় দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "একি সত্যসত্যই যে গিরফ্‌তার করে এনেছ। ভাইবোনে ভাব হয়েছে ত ?

সুরেশ। তা আর হবে না ? আমি জানতাম আমি গেলেই ধরে আনবো। (নয়নতারার প্রতি) তুই আজ আমার কাছে বোস্।

নয়নতারা। না, আমি বাবার কাছেই বসবো।

এই বলিয়া পিতৃসান্নিধানে নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া আহারে ও পিতার পরিচর্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৬ই অক্টোবর নয়নতারার জন্মদিন। এবার ৬ই অক্টোবর পূজার পরে পড়িয়াছে, অথচ তখনও পূজার ছুটি থাকিবে। পূজার সময় কলিকাতা হইতে বিনোদ, বিপিন প্রভৃতি তারাপদ রায়ের পুত্রকন্যাগণ এবং অবিনাশ, চারু, সরলা প্রভৃতি চুঁচড়ার গৌরীপদ রায় মহাশয়ের বাড়ীর ছেলেরা সকলে রায় মহাশয়ের ভবনে একত্র হইয়াছিল। তাহাদের কমিটিতে স্থির হইয়াছে, যে নয়নতারার জন্মদিনে একটা খুব আমোদ-প্রমোদ করা হইবে। আমোদ-প্রমোদটা কিরূপ হইবে? কেহ কেহ প্রস্তাব করিল, যে প্রাতে বোটে করিয়া কোনও বাগানে গিয়া বনভোজন করা হইবে। সংবাদ দেওয়া আবশ্যক যে রায় মহাশয়ের একখানি চমৎকার গ্রীণ বোট আছে। তাহাতে বসিবার ঘর, শয়নের ঘর প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্টরূপে সাজান। ঐ বোটের মাঝি ও মাল্লাগণ তাঁহার বেতন-ভোগী চাকর। তাহারা অন্য সময়ে গৃহের কাজ করে এবং বোট লইয়া যাইবার সময় হইলে বোট লইয়া যায়। এই বোটে করিয়া তিনি নিজে ও সপরিবারে সর্বদাই গঙ্গাতে বেড়াইয়া থাকেন। বোটে বেড়ান এ বাড়ীর ছেলেদের পক্ষে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রস্তাব শুনিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "কি বাপু! নড়তে চড়তে এক বোট; বোটে ত প্রতিদিন যাই।" অমনি দলশুদ্ধ ছেলে বলিয়া উঠিল, "না বোটে যাওয়া হবে না।" অবশেষে অবিনাশ প্রস্তাব করিলেন; "খুব সকাল সকাল খেয়ে, রেলগাড়ী রিজার্ভ করে, শিবপুর কোম্পানির বাগানে যাওয়া যাবে; সেখানে দুপুর বেলা খাওয়া ও খেলা হবে; সন্ধ্যার সময় চুঁচড়াতে এসে, সকলে একত্রে খাওয়া যাবে; তারপর গোলাপ-রাণীর খেলা হবে।" কোম্পানির বাগানের নামে, সকলেই, বিশেষতঃ ছোট ছেলেরা একেবারে নাচিয়া উঠিল; কারণ তাহাদের অনেকে কখনও কোম্পানির বাগানে যায় নাই। কিন্তু সকলেই বলিল, গোলাপ-রাণীর খেলাটা কি রকম? অবিনাশ বলিলেন, "সেটা এখন বলা হবে না; সেদিন দেখতে পাবি।" এটা অবিনাশ, বিনোদ ও সৌদামিনীর মধ্যে গোপন থাকিল।

কোম্পানির বাগানে যাওয়ার বিষয় স্থির হওয়া পর্যন্ত কয়েকদিন শিশুদের মনের আর বিশ্রাম রহিল না। কে কে যাবে, কিরূপে যাওয়া হবে, কি কি সঙ্গে লইতে হইবে, টাইগার ও টাইনী সঙ্গে যাবে কি না, সর্বদাই এই পরামর্শ; এবং প্রতিদিনই এই পরামর্শের জন্য গৌরীপদ বাবুর বাড়ীর বালকদের এ বাড়ীতে গতায়াত চলিতে লাগিল। টুনীর যেন সর্বাপেক্ষা উৎসাহ, "মা তুমি যাবে কি না? বাবা তুমি যাবে কি না?" তাঁহারা উভয়েই বলিলেন, "না", টুনীর সেজন্য বড় দুঃখ হইল। শেষে সুরেশচন্দ্র ও নন্দরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা! বৌদিদি! তোমরা নিশ্চয় যাবে," তাঁহারা বলিলেন—"না।"

টুনী। (নিরাশভাবে) কেন? তোমরা গেলে খুব আমোদ হবে।

সুরেশ। আমার কাজ আছে। ছেলেদের আমোদ, তোরা সকলে যাস, তাহলে খুব আমোদ হবে।

অনেক কমিটি ও কনফারেন্সের পর স্থির হইল, যে এ বাড়ী হইতে নয়নতারা, সৌদামিনী, পটল, টুনী, চপলা, সুধীশ ও মিনি এই কয়জন, গৌরীপদ বাবুর বাড়ী হইতে অবিনাশ, চারু ও তাহাদের বোন সরলা, কলিকাতা হইতে তারাপদ বাবুর পুত্রত্রয় বিনোদ, বিপিন, বিহারী ও তাহাদের দুই বোন, এই বৃহৎ সৈন্যদলটি যাইবে; টাইগার ও টাইনীকে সঙ্গে লইতে হইবে; চুঁচড়ার দলের সহিত কলিকাতার দলের হাবড়া ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইবে; কলিকাতার দল টিফিনের বন্দোবস্ত করিয়া আনিবে, বৈকালে তিন দল একত্র হইয়া চুঁচড়ার বাড়ীতে আসিবে। সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়া রহিল। কিন্তু সুরেশচন্দ্র যদি না যান সঙ্গে যাইবে কে? একজন ভারি বয়সের লোক ত সঙ্গে যাওয়া চাই। গৃহিণী এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি হরেন্দ্রকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; তদনুসারে হরেন্দ্র প্রস্তুত হইলেন।

ক্রমে উদ্যান-যাত্রার দিন উপস্থিত। রজনী প্রভাত না হইতেই রায় মহাশয়ের ভবনে কল কল ধ্বনি উঠিয়াছে। উৎসাহে সেরাত্রি ছেলেদের ভাল নিদ্রাই হয় নাই; তাঁহারা পাঁচটা বাজিবার পূর্বেই উঠিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছে; নন্দরাণী ভোরে উঠিয়া আহারের বন্দোবস্ত করিতেছেন; নয়নতারা ও সৌদামিনী স্নানাদি করিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। শিশুরা তাড়াতাড়ি কোনও প্রকার নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া আহার সমাধা করিল। এত উৎসাহে কি আর ভাল করিয়া আহার করিতে পারা যায়। হরেন্দ্র যথাসময়ে আসিয়া মেয়েদের সঙ্গে আহার করিলেন। আহার শেষ হইতে না হইতে দুইখানি বাড়ীর গাড়ী প্রস্তুত; শিশুরা তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছে; তাহাদের কি আর বিলম্ব সয়? টাইনী সর্বাগ্রে উঠিয়া টুনীর কোলে বসিয়াছে। এই উৎসাহ-তরঙ্গের ধাক্কা যেন তাহার ক্ষুদ্র মনেও লাগিতেছে। সে সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে না; কিন্তু এইমাত্র অনুভব করিতেছে যে কি একটা মহা কাণ্ড হইতে যাইতেছে; তাই সে লম্বা লম্বা কান দুটি খাড়া করিয়া প্রত্যেক কথা শুনিতেছে ও প্রত্যেকের প্রত্যেক গতি-বিধি লক্ষ্য করিতেছে। এমন সময়ে নয়নতারা ও সৌদামিনী আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। কর্তা ও গৃহিণী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গাড়িবারাণ্ডার সম্মুখস্থ দ্বার পর্যন্ত আসিলেন। টাইগার কোথায় ছিল, দৌড়িয়া আসিয়া লাফাইয়া গাড়িতে উঠিতে গেল; হরেন্দ্র তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রায় মহাশয়। টাইগারও যাবে নাকি?

গৃহিণী। হাঁ কুকুরটাও যাবে, যা নয় তাই।

পটল। বাবা, ও আসুক, তা না হলে, ও সমস্ত দিন কাঁদবে।

গৃহিণী। কাঁদে কাঁদবে আর কুকুর নিয়ে যায় না।

টুনী। টাইনী যাচ্চে ও কেন যাবে না?

রায় মহাশয়। (টাইনীর দিকে চাহিয়া) তাই ত টাইনী যে সবার আগে উঠে বসেছে।

পটল। না বাবা ও যাক, তা না হলে খালি খালি লাগবে।

রায় মহাশয়। (হাসিয়া গৃহিণীর প্রতি) ও গো টাইগার না হলে ওদের দল ভাঙ্গা হয়ে যাবে, ওদের আমোদটা জমবে না। যাক যাক, যা টাইগার যা।

পটল ডাকিবামাত্র টাইগার যেন প্রাণ পাইল; লম্ফ দিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া প্রসন্নচিত্তে বসিল।

যথাসময়ে সকলে গাড়ীতে গিয়া বসিলেন ও কল কল করিতে করিতে ও নানা কথা কহিতে কহিতে, কখন যে রেলে চড়িলেন, কখন যে হাবড়াতে পেঁছিলেন, তাহা বুঝিতেও পারিলেন না। হাবড়াতে বিনোদ, বিপিন, বিহারী প্রভৃতি গাড়ী লইয়া প্রস্তুত। তাহাদিগকে দেখিয়াই চুঁচড়ার দলের আনন্দ দশগুণ হইয়া উঠিল। যে যার সমবয়স্ক সে তার সঙ্গে কত কথাই বলিল।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, চুঁচড়া হইতে ত হাবড়াতে আসা, ইহার মধ্যে ঘটনাটা এমন কি ঘটিল যে এতটা বর্ণনা চলে? তাহা বলিলে কি হয়, পূজার সময় সকলে একত্র হইয়াছিল, তারপর এতটা দিন গিয়াছে, ইহার মধ্যে এত বলিবার কথা যোগাইয়াছে, যে ডাক্তার ন্যানসেন বোধহয় উত্তর মেরু হইতে তত কথা আনেন নাই। যাহা হউক কিয়ৎক্ষণ আলাপের পরেই উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করা হইল। এবারে যে যাকে অধিক ভালবাসে, সেই তার সঙ্গে বসিল। তাঁহারা যখন বাগানে পেঁছিলেন, তখন হরেন্দ্র ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন ৯টা বাজিয়া ৩৬ মিনিট। তিনি সকলকে চীৎকার করিয়া বলিয়া দিলেন, "যে দিকেই যাও, আর যাই কর, বেলা ১২টার সময় বড় বটগাছের তলাতে জুটিতে হবে; সেখানে টিফিনের পর খেলা হবে; পাতা ফুল প্রভৃতি ছিড়বে না; আমার এই বাঁশী দেখ, বাঁশীতে ফু দিলেই যে যেখানে থাক এসে জুটিবে।" তাদের কি আর শোনবার অবসর আছে! সকলে দল বাঁধিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। হরেন্দ্র বিনোদকে তাদের সঙ্গে থাকিতে আদেশ করিলেন। তিনি ছুটিয়া তাহাদের সঙ্গে জুটিলেন।

পারিল না, কিন্তু চাকরের ক্রোড়েও থাকিতে চাহিল না, সে নামিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। টাইনী তাহার সংগে রহিল ও পশ্চাতে অবিনাশ ও সৌদামিনী গল্প করিতে করিতে চলিলেন। নয়নতারা বেহারাকে বলিয়া দিলেন, "তোম্ মিনি বাবাকো লে কর্ সদ্ বাবাকে সাথ সাথ রহো।"

সকলে যখন চলিয়া গেল, তখন কেবল হরেন্দ্র ও নয়নতারা পশ্চাতে রহিলেন। নয়নতারা প্রেমপূর্ণ নয়নে হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় ভাল লাগছে।"

হরেন্দ্র সেই সরলতা ও মাধুর্যপূর্ণ দৃষ্টির উপরে দৃষ্টি ফেলিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি সে মুখের দিকে কতবার চাহিয়াছেন, সেই প্রফুল্ল ও প্রসন্ন চক্ষু দুটি কতবার দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া মনে মনে একপ্রকার আবেগও অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু আজ সেই মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয়ে যে আবেগের উদয় হইল, তাহা পূর্বে কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইল, নয়নতারাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া, সেই মুখখানি নিজ বক্ষস্থলে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "বল আমাকে ভালবাস কি না?"

কেন তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল? নয়নতারা যে তাঁহাকে ভালবাসেন সে বিষয়ে কি তাঁহার কোনও সন্দেহ আছে? বোধহয় তাহা নাই। তবে কেন এরূপ ইচ্ছা হইল? ইহার তত্ত্ব তাঁহারাই বলিতে পারেন, যাঁহারা জানেন যে "আমি তোমাকে ভালবাসি" এ কথাটি প্রণয়ীর কর্ণে সর্বদাই অমৃত সমান বোধ হয়, দিনে যদি দুইশতবার শোনে তথাপি পুরাতন হয় না।

যাহা হউক হরেন্দ্র নিজ দশনের দ্বারা অধরপ্রান্ত চাপিয়া সে আবেগটা মনেই দমন করিয়া ফেলিলেন এবং নয়নতারার মুখ হইতে চক্ষু তুলিয়া দূরে যে টাইগার ছেলেদের সংগে দৌড়িতেছে ও ডাকিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুকুরটা ডাকচে কেন?"

নয়নতারা। খুব আনন্দ হয়েছে বলে। ওদের আনন্দ হলেই ডাকে।

হরেন্দ্র। জায়গাটা এমনি, যে এলে ইতরপ্রাণীদেরও আনন্দ হয়।

নয়নতারা। আমার আজ বড় ভাল লাগছে; বিশেষ আপনি সংগে আসাতে বড় খুসী হয়েছি। আপনি কি ভাল! আপনি আসতে রাজি না হলে আমরা কি করতাম? এমনি আমার প্রত্যেক জন্মদিনে সংগে থাকবেন ত?

হরেন্দ্র। (ঈষৎ হাসিয়া) তা কি বলা যায়? কালচক্রে কে কোথায় গিয়ে পড়ে, তা কে বলতে পারে?

নয়নতারা। (হাসিয়া) বুঝেছি; আমার কাছে থাকতে ইচ্ছে নেই কিনা, তাই অমন কথা বলছেন।

হরেন্দ্র। ইচ্ছে করলেই বা কি, মানুষের সব ইচ্ছে কি পূর্ণ হয়?

নয়নতারা। যা হোক আজ আমার জন্মদিনে আপনি সংগে এসে, আমাকে খুব সুখী করেছেন।

উভয়ে এইরূপে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন। পথিমধ্যে হরেন্দ্র একটি পুষ্করিণীর ধারে নামিয়া কতকগুলি জলজ লতাপাতা ও ফুল সংগ্রহ করিয়া, নয়নতারাকে উদ্ভিদ-তত্ত্ব বিষয়ে অনেক নূতন কথা শিখাইলেন। নানা দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে একবার ছোট বটবৃক্ষটির তলে ছেলেদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ইঁহাদের দুইজনকে দেখিবামাত্র হাসিয়া কলরব করিয়া দল বাঁধিয়া সেখান হইতে দৌড়িয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

অবশেষে ১২টার কিঞ্চিৎ পরে সকলে বড় বটবৃক্ষটির তলে আসিয়া উপস্থিত। বিনোদ টিফিনের প্রচুর আয়োজন করিয়া আনিয়াছিল। লুচি, কচুরি, সন্দেশ, রুটি, মাখম, কলা, ডাব, লেমনেড, ইংরাজী বাংগলা যে যা চায়, সকল প্রকার খাবার প্রস্তুত। দুইজন ভৃত্য বৃক্ষের ছায়ায় সতরঞ্চ বিছাইয়া দিল, তাহাতে কেহ শয়ন করিল, কেহ বসিল, কেহ গড়াইল; যাহা করে

তাহাতেই আনন্দ। নয়নতারা সকলকে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিলেন। কোন্ সকালে সকলে খাইয়া আসিয়াছিল, তৎপরে অনেক দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং শিশুদলের এক একজন প্রায় এক এক বৃদ্ধের খাবার খাইল। যাহাদিগকে ভালবাসি তাহাদের সঙ্গে বৃক্ষতলে এরূপ আহার করিতে বড়ই আনন্দ। টাইগার ও টাইনীরও যথেষ্ট খাদ্য জুটিল। আহারান্তে একটু পরেই শিশুদল খেলিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এইবার তাহারা চোর চোর খেলিবে। কিন্তু একটা বুড়ী ত চাই। হরেন্দ্রকে সকলে বুড়ী হইবার জন্য ধরিয়া বসিল। "হে হরেন দাদা! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আসুন" এই বলিয়া একেবারে পাঁচ সাতজনে দুই হাত ধরিয়া টান টানি আরম্ভ করিল। হরেন্দ্রের বড় ইচ্ছা নয় যে যান, তদপেক্ষা বসিয়া নয়নতারার সহিত গল্প করিতে ভাল লাগে। বোকা ছেলেগুলো ত তা বোঝে না, যাকে ভালবাসে তাকেই চায়; তাঁহাকে বুড়ী হইতেই হইবে। টাইগার এই টানাটানি দেখিয়া মনে করিল, বুঝি সকলে হরেন্দ্রকে মারিতেছে, সে ডাকিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। সৌদামিনী বলিলেন, "দূর হ বোকা কুকুর, মারেনি আদর করছে।" টাইগারের সে বুদ্ধি যোগায় না; চীৎকার করিয়া বাগান ফাটাইতে লাগিল। অবশেষে অবিনাশ উঠিয়া টাইগারকে তাড়িয়া গেলেন। এদিকে টুনী হরেন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "লক্ষ্মি হরেন দাদা! লক্ষ্মি, আসুন" এই বলিয়া তাঁহার মুখে চুম্বন করিল।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) যে মিষ্টি কিস্ দিয়েছে, আর বসে থাকতে দিলে না।

সৌদামিনী। যাচ্ছেন যান, কিন্তু একটু পরেই আসতে হবে, তাস খেলতে হবে।

হরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। অবিনাশ টাইগারকে তাড়াইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলেন, যে বটগাছের গুঁড়ির গায়ে লোকে ছুরি দিয়া নিজ নিজ নাম ও নানারকম লিখিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া লেখাগুলি পড়িতে লাগিলেন। তিনি যদি দাঁড়াইলেন, তবে সৌদামিনীও উঠিয়া গেলেন, এবং দুইজনে ছুরি দিয়া নিজ নিজ নাম লিখিতে আরম্ভ করিলেন। নয়নতারা মিনিকে দুধ খাওয়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুক্ষণ খেলিয়াই হরেন্দ্র বিনোদকে বুড়ী করিয়া দিয়া মেয়েদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এইবার হরেন্দ্র, নয়নতারা, অবিনাশ ও সৌদামিনী, এই চারিজনে তাসের খেলা আরম্ভ করিল।

সৌদামিনী। ভাগ্যে হরেনবাবু আপনি এসেছিলেন, আমাদের আমোদটা খুব জমলো। দাদা এলে এতক্ষণে ফেরবার জন্যে অস্থির করে তুলতেন। দাদা প্রকৃতির সৌন্দর্যটা বড় বোঝেন না; মানুষ বেশি ভালবাসেন।

নয়নতারা। আমি কিন্তু দাদা এলে আরও সুখী হতাম।

হরেন্দ্র। আমিও হতাম। শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য কেন, তিনি মানুষ ভালবাসেন, মানুষও ত পেতেন। সুরেশবাবুর আমোদ করবার শক্তিটা খুব আছে।

নয়নতারা। খুব—খুব আছে; একটু কম থাকলে ভাল হ'ত।

প্রায় দুই ঘণ্টা তাসের খেলা চলিল। ছেলেরাও মনের সাধে খেলিয়া লইল। অবশেষে হরেন্দ্র ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ৪টা বাজিতে ১০ মিনিট বাকি আছে। তাঁহাদিগকে ৪॥টার ট্রেন ধরিতে হইবে; সুতরাং তখনই যাত্রা করা চাই। তিনি উঠিয়া বাশীতে ফুঁ দিতে লাগিলেন। শিশুরা দৌড়িয়া আসিল বটে, কিন্তু তখনও তাহাদের খেলিয়া পেট ভরে নাই; আরও চাই। আবার সদলে গাড়ির দিকে যাত্রা আরম্ভ হইল। শিশুরা পথে নয়নতারাকে বলিল, "বড়দি! তোমার জন্মদিনে খুব মজা হলো! আবার কবে জন্মদিন হবে?"

নয়নতারা। সেই আর বছরে, এই ৬ই অক্টোবরে।

একজন। মাসে একবার করে জন্মদিন কর না কেন?

অপরজন। দূর বোকা, জন্মদিন যে বছরে একদিন হয়।

প্রথম শিশু। মাসে মাসে কেন হয় না?

টুনী। আঃ বোকা, মানুষ যে একদিন জন্মায়, মাসে মাসে কি একবার করে জন্মায়?

ক্রমে সেই সমগ্র সৈন্যদলটি কল কল রবে চুঁচড়ার বাড়ীতে আসিয়া পোঁছিল। শব্দ শুনিয়া কর্ত্তা, গৃহিণী, তারাপদবাবু, গৌরীপদবাবু, ও মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলে গাড়ি-বারাণ্ডার নিকট উঠিয়া আসিলেন।

রায় মহাশয়। কি, আমোদটা হলো কেমন?

একেবারে আট দশজন। খুব মজা হয়েছে, খুব খেয়েছি, খেলিয়েছি।

তারপর কে যে কি বর্ণন করিবে, সেই উৎসাহে কে যে কি বলিল তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তন্মধ্যে টাইগারের বোকামটা সকলের একটা তামাসার কথা হইল।

তারাপদবাবু। (মিনিকে কোলে লইয়া) মিস মিনী রায়! তুমি কি খেলা করেছ?

মিনী ঘাড় নাড়িয়া, ঢোক গিলিয়া, তাহার ভাষাতে যে কি বলিল, তাহা তিনি সকল বুঝিতে পারিলেন না।

নয়নতারা বেশ পরিবর্তন করিতে নিজ ঘরে গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, তাঁহার পাড়বার টেবিলের উপরে একটি সুন্দর নূতন ধরনের অনুবীক্ষণ (microscope) রহিয়াছে। দেখিয়া তিনি অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কোথা হতে এল?" চাকরাণী বলিল, "বড় সাহেব রেখে গিয়েছেন।" নয়নতারা বিস্মিত অন্তরে জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সুরেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত।

নয়নতারা। দাদা! কি সুন্দর মাইক্রস্কোপ, একি তুমি এনেছ?

সুরেশচন্দ্র। তুই বোটানি পড়তে ভালবাসিস, তোর সাহায্য হবে বলে এনেছি।

তখন নয়নতারা বুঝিতে পারিলেন যে, সেটি তাঁহার জন্মদিনে জ্যেষ্ঠের প্রীতির উপহার। ইহা বুঝিবামাত্র দৌড়িয়া গিয়া জ্যেষ্ঠের বুকের উপরে পড়িয়া তাঁহার বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া, তাঁহার কপালে চুম্বন করিয়া, বলিলেন, "I wish you many happy returns of the day," অর্থাৎ আমি প্রার্থনা করি, এই সুখের দিন অনেকবার আসুক।

নয়নতারা কেন কাঁদিলেন? বোধহয় ইতিপূর্বে ভ্রাতা-ভগিনীতে যে মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইয়াছে তাহা স্মরণ হইল; পরস্পরকে যে কর্কশ কথা বলিয়াছেন, তাহা হয়ত মনে জাগিল; পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদের একটা কারণ ঘটিয়াছে, তাহা হয়ত স্মৃতিতে আবির্ভূত হইল। যাহা হউক, আজ এই শুভ জন্মদিনে চক্ষের জলে ভ্রাতাভগিনীর মিলন হইয়া গেল। সুরেশ-চন্দ্র চলিয়া গেলেন; নয়নতারা চক্ষু মুছিয়া প্রসন্নচিত্তে পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন।

কেবল সুরেশচন্দ্রই যে অদ্যকার দিনে একটি অনুবীক্ষণ উপহার দিয়াছেন, তাহা নহে। আজ নয়নতারা সকলের নিকট উপহার পাইয়াছেন। পিতামাতার প্রদত্ত উপহার, শিশুদের প্রত্যেকের প্রদত্ত উপহার, কলিকাতার ও চুঁচড়ার ও বাড়ীর খুড়ীদের প্রদত্ত উপহার, কাকাদের প্রদত্ত উপহার, তৎপরে হরেন্দ্রের প্রদত্ত উপহার—কত উপহার তিনি পাইয়াছেন। গোলাপরাণীর খেলা দেখিবার জন্য চুঁচড়ার খুড়ীমা ও সে বাড়ীর মহিলারা সকলেই আসিয়াছেন। নয়নতারার মনে আনন্দ ধরিতেছে না।

তৎপরে সকলে একসঙ্গে আহার ও আমোদ-প্রমোদ হইল। এইবার গোলাপরাণীর খেলা হইবে। আহারের সময়ে সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলাপরাণীটা কি? অবিনাশ, সৌদামিনী ও বিনোদ তিনজনে চোকে চোকে হাসাহাসি করিল, কিন্তু কেহই কিছু বলিল না। এইমাত্র বলিল, "একটু পরেই দেখতে পাবেন।"

বৃদ্ধেরা আহারান্তে বৈঠকঘরে আসিয়া দেখেন, গৃহের উত্তরদিকে প্রাচীরের নিকটে

একখান চৌকি সুন্দর কার্পেটে ঢাকিয়া, তদুপরি চাঁদোয়া খাটাইয়া, চারিদিকে ফুলের টব প্রভৃতি দিয়া ও মধ্যস্থলে একখানি স্টেট চেয়ার বসাইয়া একটি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছে। চাঁদোয়ার ঝালরে, চৌকির চারিধারে, চেয়ারখানির ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে, ফুলের টবগুলির গায়ে, গোলাপের মালা দিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথা হইতে যে এত গোলাপ সংগ্রহ করিল এবং কখন যে এসব করিল, কেহই বুঝিতে পারিল না। সকলেই দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং সুরুচির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে সৌদামিনী নয়নতারাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহার ঘরে লইয়া গোলাপের হার, গোলাপের বালা, গোলাপের মুকুট, গোলাপী রং-এর সাড়ী ও গোলাপী জ্যাকেট প্রভৃতি পরাইয়া গোলাপরাণী সাজাইতেছেন। গোলাপরাণীর সাজা হইলে যথাসময়ে পাত্রমিত্রসহ বৈঠকঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তারাপদবাবু ও সুরেশ-চন্দ্র করতালি দিয়া উঠিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "মাগো! ওদের অসাধ্যি কর্ম নেই, মেয়েটাকে সাজিয়েছে দেখ!"

গৌরীপদ বাবুর বাড়ীর মহিলারা আর শ্বশুর-ভাশুরের খাতিরে পূর্বের ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না; গোলাপরাণী দেখিবার জন্য ছুটিয়া দ্বারের নিকট আসিলেন ও পরস্পরের গা ঠেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওমা, কি সুন্দর সাজিয়েছে! রাণীর মতই ত দেখাচ্ছে।"

এক্ষেত্রে অবিনাশ কর্মকর্তা; সে কার্যপ্রণালী এইরূপ নির্দেশ করিল। প্রথমে গোলাপ-রাণীকে সিংহাসনে বসান হইবে; তৎপরে সৌদামিনী হারমোনিয়ামে বসিবেন ও প্রজাকুল একটি বন্দনা-গাথা গাইয়া সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিবে; একবার প্রদক্ষিণ শেষ হইলে প্রত্যেক প্রজা দ্বিতীয়বার ঘুরিতে যাইবার পূর্বে রাণীর বাম হস্তে চুম্বন করিয়া যাইবে। এই-রূপে গাথাটি যতক্ষণ না শেষ হইবে, ততক্ষণ প্রদক্ষিণ চলিবে।

সুরেশ। বেশ কথা, আমিও একজন প্রজা।

শিশুদলের মহানন্দ! (করতালি দিয়া) হো হো বেশ হয়েছে, বড়দাও গোলাপরাণীর প্রজা হয়েচে!

তৎপরে সৌদামিনীর বাদন ও প্রজাকুলের প্রদক্ষিণ আরম্ভ হইল। সেই গীতবাদ্য সকলের প্রাণকে মুগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। শেষ প্রদক্ষিণ সমাধা হইবার সময় সুরেশচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া আর নয়নতারার বাম হস্তে চুম্বন না করিয়া, তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক কপোলে চুম্বন করিলেন। তাহা দেখিয়া শিশুদল বলিয়া উঠিল;—"বড়দা কেন গালে কিস করল, তবে আমরাও করবো।" এই বলিয়া সকলে একেবারে চুম্বন করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। নয়নতারা হাসিয়া মুখ ফিরিয়া হস্তের দ্বারা মুখ আবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে শিশুদল কেহ মুখে, কেহ মাথায়, কেহ বাহুপরে, কেহ গ্রীবাদেশে, কেহ পৃষ্ঠে, যে যেখানে পাইল, চুম্বন করিতে লাগিল। ঠেলাঠেলিতে টবগুলো পড়িয়া গেল। গৃহিণী দৌড়িয়া ধরিতে আসিলেন, "আরে থাম থাম মেয়েটাকে ফেলে দিলে দেখছি।" তারাপদ রায় বলিলেন, "ধৌ-দিদি! ধরো না ধরো না, করতে দাও, আমোদ করা বৈত নয়, ও বেশ আমোদ হচ্চে।"

কোলাহল থামিয়া গেলে, নয়নতারা সলজ্জভাবে পিতা, মাতা, পিতৃব্যদ্বয় ও মহেন্দ্রনাথের চরণে প্রণাম করিলেন ও সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। একটি শিশু বলিয়া উঠিল, "বড়দি! হরেন দাদাকে প্রণাম করলে না?" আর একজন বলিল, "দূর! সমবয়সী যে, সম-বয়সীকে কি প্রণাম করে?" তৎপরে নয়নতারা পার্শ্বের ঘরে গিয়া অপর বাড়ীর খুড়ীমা ও খুড়াবাদের চরণে প্রণত হইয়া আশীর্বাদ লইলেন।

এইরূপে সেদিনকার আমোদ শেষ হইল। যথাসময়ে চুঁচড়ার লোকেরা স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে সকলে স্বীয় স্বীয় শয়ন-মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু সরল-

তারা আজ শীঘ্র শয্যাতে গমন করিলেন না। হরেন্দ্র 'Noble Women' নামে একখানি সুন্দর বই তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন, সেইখানি বাহির করিলেন। সেখানি যেন অমূল্য সম্পত্তি বোধ হইতে লাগিল। গ্রন্থখানির বাহিরের বাঁধুনিটি যেমন সুন্দর, ভিতরের জীবন-চরিত্র-গুলিও তেমনি সুন্দর। প্রথম পাতাটি খুলিবামাত্র হরেন্দ্রের কথাগুলি শুনিতেছেন। হৃদয়ের প্রেম উছলিয়া উঠিতে লাগিল। বইখানি কোলে করিয়া অনেকক্ষণ পূর্বদিকের জানালার পার্শ্বে একখানি চেয়ার পাতিয়া বসিয়া চিন্তাতে নিমগ্ন রহিলেন। রজনীর নিস্তব্ধতা যতই গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রাণ সেই গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে দিক সমুজ্জ্বল; হৈমন্তিক রজনীর নির্মল আকাশে সেই বিমল চন্দ্রিকারাশি যেন দশদিকে উছলিয়া পড়িতেছে। বোধ হইতেছে চন্দ্রের জ্যোৎস্নাময় আলিঙ্গনে আবদ্ধা হইয়া মেদিনী যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যেন সুখে ডুবিয়া গিয়াছে। শিশির-ধৌত ও জ্যোৎস্নাস্নাত তরুলতা কি অপূর্ব শ্রীই ধারণ করিয়াছে। অদূরে গঙ্গাজলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলরাশির উপরে পতিত হইয়া, সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে কম্পিত হইতেছে, বোধ হইতেছে, কেহ যেন পারদ গালিয়া ঢালিয়া দিয়াছে, সেই তরল পারদরাশি আন্দোলিত হইতেছে। সেই জলরাশির উপরে চক্ষু ফেলিয়া, তিনি অনেকক্ষণ আপনার জীবনের পূর্বাপর ও ভাবিষ্যৎ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলেন। জীবনকে আরও উন্নত করিবার জন্য প্রবল প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। একবার সেই মুসলমান নবাবের কথা আবার স্মরণ হইল। ভাবিলেন, "সত্যই কি ধনসম্পদের মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না?" অমনি হরেন্দ্রের কথা মনে হইল; ভাবিলেন, "ইনি কিরূপে এত ভাল লোক হইলেন? বোধহয় দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল বলিয়াই এত ভাল হইয়াছেন?" এই সকল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মন ঈশ্বর-চিন্তাতে আরোহণ করিল। ঈশ্বর-করুণাতে জীবনে যে সকল সুখ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, "হে ঈশ্বর! জীবনের উন্নতি-সাধনে আমার সহায় হও।" এই বলিয়া শয্যাতে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১২ই অক্টোবরের কথা বলিতেছি। দুই দিন হইতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিধারা পড়িতেছে ও তৎসঙ্গে জোরে বাতাস দিতেছে। লোকে বলিতেছে কোথায় যেন ঝড় হইতেছে। এমন দিনে বিশেষ কাজ না থাকিলে কেহ নৌকা করিয়া গঙ্গাপারে যায় না। কিন্তু হরেন্দ্রকে যাইতেই হইতেছে। তাঁহার একটি বন্ধু বর্ধমানে থাকেন; তিনি কোনও কার্যোপলক্ষে বাড়ী যাইতেছেন; পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন বলিয়া হুগলীতে নামিয়াছেন। তাঁহাকে ওপারে নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে যাইতেই হইবে। কালেজের ছুটির পর দুই বন্ধুতে নৈহাটীতে গেলেন। তখন বাতাসের প্রকোপটা কিছু কম। গিয়া দেখিলেন হুগলীর মাজিষ্ট্রেট বীটসন সাহেব ও তাঁহার মেম একজন মহিলা বন্ধুকে তুলিয়া দিতে গিয়াছেন। হরেন্দ্র বন্ধুটিকে গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া যখন ফিরিলেন, তখন বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোঁ সোঁ করিয়া ডাকিয়া বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; তদুপরি মুখে বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া লাগিতেছে। তিনি দ্রুতপদে কোনও প্রকারে ছাতিটির দ্বারা শরীরটি বাঁচাইয়া গঙ্গার ধারে আসিলেন। আসিয়া দেখেন মাঝিরা নৌকা খুলিতে রাজি নয়। ওদিকে বেলা অবসান হইয়া আসিতেছে। বেলা ৫টার অধিক হইবে না বটে, এখনও দুই এক ঘণ্টা দিন আছে; কিন্তু চারিদিক মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে সন্ধ্যার মত দেখাইতেছে। যেরূপে হউক গঙ্গা পার হইতেই হইবে, নতুবা সে রাত্রে যান কোথা। ক্রমে তাঁহার মত আরও দুই চারিজন আসিয়া জুটিল; তাঁহাদেরও পারে যাওয়া চাই, না গেলেই নয়। অবশেষে মাঝিদিগকে তিনগুণ

ভাড়া কবুল করিয়া শেয়ারে একখানা পানশী ভাড়া করা হইল। তাঁহারা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, ইতিমধ্যে আর একটি বাবু আর একখানি পানশী ভাড়া করিয়া তাড়াতাড়ি যাত্রা করিলেন। সংগে একটি যুবতী স্ত্রীলোক।

সে তুফানে পাড়ি দেওয়া কি সহজ কথা। নৌকা ঠিক রাখা ভার। মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউ আসিয়া ছত্রির বাহিরে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের কাপড় চোপড় ভিজাইয়া দিতে লাগিল। মাঝিরা পাকা, তাহারা সামলাইয়া সামলাইয়া লইয়া চলিল। ইতিমধ্যে দেখা গেল সম্মুখের পানশীর মাঝি নৌকা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। নৌকাখানি বাতাসের জোরে ছুটিয়া গিয়া একখানা প্রকাণ্ড মুংগেরী বোঝাই নৌকার গায়ে পড়িল। এ পানশীর লোকেরা "হাঁ হাঁ, গেল গেল" করিয়া উঠিতে না উঠিতে সে পানশীখানি উল্টাইয়া গেল। পর মুহূর্তেই হরেন্দ্র দেখিলেন, সেই পানশীর মাঝি ও দাঁড়ি দুইটা সাঁতরিয়া বড় নৌকার কাছি ধরিতেছে, এবং বাবুটিও সেই দিকে সাঁতার দিতেছেন। স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মাঝি, বেয়ে যা বেয়ে যা, বাবুটিকে তুলে নে।" ইহা বলিতে না বলিতে তিনি একবার দেখিতে পাইলেন, কিঞ্চিৎ দূরে স্ত্রীলোকটি যেন ভাসিয়া উঠিলেন ও সাঁতরাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে আনন্দ হইল, স্ত্রীলোকটি মারা যান নাই। কিন্তু পরক্ষণেই স্ত্রীলোকটি ডুবিয়া গেলেন। তখন হরেন্দ্র নিমিষের মধ্যে তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন আর দেহের পরিচ্ছদ সকল উন্মোচন করিবার সময় নাই। মুহূর্তের মধ্যে পিরান ও কোট ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ও জুতা খুলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন ও দ্রুতগতিতে সাঁতরিয়া স্ত্রীলোকটির দিকে অগ্রসর হইলেন। হরেন্দ্র গিয়া ধরিবামাত্র ভদ্রলোকের মেয়েটি তাঁহাকে এমন করিয়া বাহুদ্বারা বেস্টন করিয়া ধরিলেন যে, তাঁহার হাত পা নাড়া ভার। তিনি দেখিলেন, যে দুইজনে ডুবিয়া যান, তখন অতিকষ্টে একখানা হাত বাহির করিয়া বলিলেন, "আমাকে জড়াবেন না; দুজনেই ডুবে যাব; যদি সাঁতার জানেন, তাহলে আমার কোমরের কাপড় ধরে ভেসে আসুন; আমি নিয়ে যাচ্ছি।" তখন আর সে কথা শোনে কে? জলের দাপটে যেন তুলিয়া আছড়াইতেছে; শীতে স্ত্রীলোকটির হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে; প্রাণভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি উড়িয়া গিয়াছে! তিনি দুই বাহুদ্বারা হরেন্দ্রের কোমর জড়াইয়া রহিলেন। হরেন্দ্র ভাবিলেন তাই ভাল। পরক্ষণেই দেখিলেন স্ত্রীলোকটির কোমরের কাপড় খুলিয়া পায়ে জড়াইয়া গিয়াছে, সেজন্য তিনি পা নাড়িতে পারিতেছেন না। তখন তিনি সাঁতার দিতে দিতে নিজের একখানা পা দিয়া, স্ত্রীলোকটির পায়ের কাপড় খুলিয়া দিলেন। দেওয়াতে তিনিও যথাসাধ্য সাঁতার দিতে লাগিলেন।

তিনি যখন স্ত্রীলোকটিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া নৌকার অভিমুখে ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার পানশী তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। পানশীর লোকেরা ঝগড়া করিতেছে; কেহ বলিতেছে, "আহা মানুষদুটোকে তোল;" কেহ বলিতেছে, "এই ঝড়ে রাত হয়ে এল, শেষে সবশুদ্ধ মারা যাই।" মাঝিরা ত পারে পেঁৗছিতে পারিলেই বাঁচে, সুতরাং তাহারাও চলিয়া যাইতেছে। হরেন্দ্র প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিলেন, "মাঝি! মাঝি! এদিকে, এদিকে।" ওদিকে তাঁহাকে ঝড়ে, তরংগে ও স্ত্রীলোকটির ভারে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। তাঁহার শক্তিতে আর কুলাইতেছে না। স্ত্রীলোকটিকে আবার বলিলেন, "আপনি যদি সাঁতার জানেন ত আমার কোমরের কাপড় ধরে গা ভাসিয়ে আসুন।" তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। হরেন্দ্র ভাবিলেন, এইবার বুঝি দুজনে যাই। এমন সময়ে দেখিলেন, আর একখানি পানশী নক্ষত্রবেগে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। দেখিলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও তাঁহার মেম তাহাতে আছেন। নিকটে আসিয়াই মাজিস্ট্রেট সাহেব হরেন্দ্রকে একগাছা কাছি ফেলিয়া দিলেন। কাছিগাছা পাইয়া দেহে প্রাণ আসিল; কারণ আর এক মুহূর্ত পরেই বোধ হয় দুজনকেই ডুবিতে হইত। কাছিগাছা পাইয়া হরেন্দ্র স্ত্রীলোকটির হাতে কাছি দিয়া বলিলেন,—"আপনি এখন আমার

কোমর ছাড়ুন ও এই কাছি ধরুন; লাজ সরম করবেন না; আমি কাছি ধরে আছি, আমার কোমরে পা দিয়ে মেমের হাত ধরে নৌকাতে উঠে যান।"

মেম স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া নৌকাতে তুলিয়া, তৎক্ষণাৎ আপনাদের বসিবার জন্য বিস্তৃত বিছানার চাদরখানি আনিয়া তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া একপার্শ্বে বসাইলেন। তিনি বসিয়া বাজভয়ত্রস্তা পক্ষিণীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। ক্রমে হরেন্দ্র উঠিলেন। অবশেষে বড় নৌকাখানি হইতে বাবুটিকেও তুলিয়া লওয়া হইল। জানিতে পারা গেল, ঐ বাবুটি এই রমণীর পতি। তিনি শ্বশুরালয় হইতে স্বীয় পত্নীকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতেছিলেন।

এদিকে ইতিমধ্যে এই নৌকা ডোবার সংবাদ চুঁচড়া সহরে প্রচার হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা পেঁছিয়া দেখিলেন যে সেই দুর্যোগের সময়েও অনেক লোক গঙ্গার ধারে তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। পানশী তীরে লাগিবামাত্র মাজিস্ট্রেট সাহেব লম্ফ দিয়া পড়িলেন; ও নিজের চাপরাসীকে সত্বর একখানি গাড়ী বা পাল্কী আনিতে আদেশ করিলেন; কারণ স্ত্রীলোকটিকে সেইরূপ অবস্থায় আর এক দণ্ডও রাখা ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল। মেম স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া নৌকাতে বসিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র নামিয়া পূর্বের নৌকার মাঝিকে ও আরোহী বাবুদিগকে অনেক তিরস্কার করিলেন; "আপনারা কিরূপ লোক? দুটো মানুষ ডুবছে দেখে চলে এলেন! আর একজন বিদেশী লোক এসে বাঁচাল; কৈ আপনারা ত ঘরে যাননি, কি হয় দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।" বাবুগুলি উত্তর দিতে পারিলেন না। হরেন্দ্র ছেঁড়া জামাগুলি কোনরূপে পরিলেন। ওদিকে বৃষ্টিটা আবার একটু ধরিয়া গেল।

গাড়ী আনিতে যে বিলম্ব হইতে লাগিল, তন্মধ্যে মাজিস্ট্রেট হরেন্দ্রের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম এই—

মাজিস্ট্রেট "বাবু! তোমার মত সাহস ও গায়ে এত জোর ত বাঙালীর দেখি না" এই বলিয়া হরেন্দ্রের হাতের গুলি টিপিতে লাগিলেন।

হরেন্দ্র। আমি প্রতিদিন খেলে থাকি।

মাজিস্ট্রেট। বটে, কোথায়?

হরেন্দ্র। আমি হুগলী কালেজের একজন শিক্ষক, আমাদের কালেজে একটা স্পোর্টিং ক্লাব আছে।

মাজিস্ট্রেট। বেশ ত, তাতে কি হয়?

হরেন্দ্র। ক্রিকেট, দৌড়ের ম্যাচ, নৌকার বাচ, এই সকল হয়।

মাজিস্ট্রেট। এত আগে শুনিনি? কালেজের প্রিন্সিপাল জানেন?

হরেন্দ্র। হ্যাঁ, তিনি আমাদের একজন উৎসাহদাতা।

মাজিস্ট্রেট। আমি শুনে ভারি খুসী হলাম, দেখলে ত গায়ে জোর থাকা কত গুণ! তুমি না হয়ে আর কেউ হলে, ঐ স্ত্রীলোকটি আজ তাকে ডুবাত।

হরেন্দ্র। আমাকেও ডোবাবার যোগাড় করেছিলেন, কোনও রূপে বেঁচেছি। জলে পড়লে যারা সাঁতার জানে তারাও ভয়ে মারা যায়।

হরেন্দ্র দেখিলেন বেশ সুযোগ উপস্থিত; ছেলেদের ড্রিলিং-এর ও মোগল পাঠান দুল দলের কথাটাও মাজিস্ট্রেটকে শুনাইয়া দেওয়া ভাল ও তাঁহাকে উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন হইবার জন্য অনুরোধ করা ভাল। সুতরাং এই সুযোগে ড্রিলিং ব্যাণ্ডের বিষয়ও শুনাইলেন। মাজিস্ট্রেট বলিলেন, "আমি ভারি খুসী হলাম, তুমি অবশ্য অবশ্য আমার বাড়ীতে এস, আরও শুনব।" মেম নৌকা হইতে বলিলেন, "বাবু, নিশ্চয় এস।"

ক্রমে গাড়ী আসিল। গাড়ী আসিবামাত্র ভদ্রলোকটি আপনার পত্নীকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাজিস্ট্রেট ও মেম হরেন্দ্রের করমর্দনপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে যেখানে সেখানে এই কথা,—"কাল সন্ধ্যার সময় গংগাতে একখানা নৌকা ডুবেছে, কালেজের মাস্টার হরেন্দ্র চাটুয্যে অতিকষ্টে একটি স্ত্রীলোককে বাঁচিয়েছে।"

রায় মহাশয় এই সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া প্রাতেই হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হরেন্দ্র গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র ছেলে, বুড়ো, স্ত্রীলোক, বালক, দাস, দাসী সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। একজনের প্রশ্নের উত্তর না হইতে আর একজন প্রশ্ন করেন। সে প্রশ্নের অন্ত নাই। "পানশী কিরূপে ধাক্কা খাইল? স্ত্রীলোকটি কে? তার পতির নাম কি? তারা কোথায় থাকে? তারা কোথা আসছিল? স্ত্রীলোকটির বয়স কত? পরণে কি কাপড় ছিল?" ইত্যাদি ইত্যাদি। রায় পরিবার আর সেদিন প্রাতে হরেন্দ্রকে ছাড়িলেন না।

গৃহিণী। হরেন! তুমি এবেলা এখানে নাও খাও, আর বাসায় যেও না; এখান থেকে কালেজে যাবে।

সৌদামিনী। হাঁ হাঁ তাই বেশ, হরেনবাবু! এ বেলা আমাদের সংগে খান।

টুনী, চপলা, সুধীশ, মিনী প্রভৃতি কেহ কোঁচার কাপড়, কেহ কোটের প্রান্ত, কেহ হস্তের অংগুলি ধরিয়া টানাটানি—"বাসায় যেতে পারবেন না।"

টুনী। আমাদের সংগে খেলে খুব মিষ্টি কিস দেব!

সৌদামিনী। (হাসিয়া) এবার কি হবে? আর ত যেতে পারছেন না; শক্ত প্রলোভনে ফেলেছে!

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) প্রলোভনটা শক্ত বটে; সেদিনকার বাগানের কথাটা বুঝি?

হরেন্দ্র থাকিবেন কি না ভাবিয়া স্থির করিতে না করিতে সৌদামিনীর চক্ষের ইসারা পাইয়া টুনী তাঁহার গায়ের খেশখানা কাড়িয়া লইয়া গেল।

নয়নতারা হরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া চক্ষে চক্ষে হাসিলেন। আজ নয়নতারার মূর্তিটি এই প্রভাত কালে কি সুন্দরই দেখাইতেছে! কিয়ৎক্ষণ পূর্বে স্নান করিয়া বিমল ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; আজানুলম্বিত কেশ-পাশ খুলিয়া দিয়াছেন; সুচিক্কণ, সুনীল, কেশজাল থরে থরে নামিয়া সমগ্র পৃষ্ঠভাগ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে; পদ্মপলাশসম নীলাভ নেত্রদ্বয় স্নানান্তে প্রান্তভাগে এখনও আরক্তিম রহিয়াছে; স্বাস্থ্যে প্রস্ফুটিত মুখখানি প্রসন্নতা আনন্দ ও প্রীতিতে ঢল ঢল করিতেছে! সেই মুখখানি লইয়া গৃহকার্যে গতায়াত করিতেছেন। হরেন্দ্রের নয়ন মন যেন গায়ে জড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছেন!

হরেন্দ্র মহিলাদের অনুরোধে থাকিলেন বটে, কিন্তু নয়নতারার সংগ বড় পাইলেন না। তাঁহার উপরে সংসারের ভার, প্রাতে তাঁহার বসিবার সময় বড় হয় না; ভাঁড়ারে, রন্ধনশালাতে, মেথর যেখানে বাড়ী পরিষ্কার করিতেছে সেখানে, সর্বত্রই থাকিতে হয়। সুতরাং হরেন্দ্রকে সময়টা প্রধানত টুনী, নন্দরাণী, সৌদামিনী প্রভৃতির সংগেই কাটাইতে হইল। সুরেশচন্দ্র একবার আসিয়া হরেন্দ্রের করমর্দনপূর্বক পূর্বদিনের বীরোচিত কার্যের জন্য অনেক প্রশংসা করিয়া গেলেন।

তৎপরে যথাসময়ে হরেন্দ্র সকলের সহিত আহার করিয়া কালেজে গমন করিলেন। সেখানে পদার্পণ মাত্র শিক্ষকগণ ছুটিয়া আসিলেন। "কি হে হরেন ব্যাপারটা কি?" শুনিয়া, সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দুপুর বেলাই কালেজের প্রিন্সিপাল সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের এক পত্র পাইলেন; তাহাতে তিনি পূর্ব দিনের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ লিখিয়া এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যে হরেন্দ্রকে চুঁচড়ার লোকদিগের সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ কিছু দেওয়া উচিত। সেজন্য তিনি নিজে পঞ্চাশ টাকা দিতে প্রস্তুত। প্রিন্সিপাল সাহেব কালেজের প্রোফেসারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে একটি ২৫০।৩০০ শত টাকা দামের ঘড়ি হরেন্দ্রকে দেওয়া হইবে। [illegible] সেই মর্মে পত্র লিখিলেন। ঘড়ির টাকা তোলা হইতে লাগিল। প্রিন্সিপাল নিজে বিশ টাকা

দিলেন; রায় মহাশয় পঞ্চাশ টাকা দিলেন; অপরাপর অনেক লোক আনন্দের সহিত যাহার যাহা সাধ্য দিল। দুই চার দিনের মধ্যেই তিন শত টাকা উঠিয়া গেল ও কলিকাতাতে ঘড়ি কিনিবার জন্য লোক পাঠান হইল।

সৌদামিনী নয়নতারাকে বলিলেন, "দিদি! হরেনবাবুকে আমাদের ত কিছু দেওয়া উচিত। বলতে গেলে স্ত্রীলোকদেরই তাঁর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা। আচ্ছা পুরুষেরা তাঁকে ঘড়ি দিচ্ছেন, এস না আমরা মেয়েরা মিলে একটা চেইন দি, তুমি কি বল?

নয়নতারা। এটা বেশ কথা। আচ্ছা তোর মনে কথাটা এসেছে, তুই টাকা সংগ্রহ কর।

সৌদামিনী। সংগ্রহ করা আর কি, আমাদের বাড়ী থেকে, ছোট কাকার বাড়ী থেকে, আর ও বাড়ী থেকে তুলে নেব।

নয়নতারা। আচ্ছা বেশ, আমি ৩০ টাকা দেব।

সৌদামিনী। আমি ১০ টাকা দেব।

নয়নতারা। (হাসিয়া) এই ত হাতে হাতে চল্লিশ হয়ে গেল, তবে আর ভাবনা কি?

সৌদামিনী। মার কাছ থেকে ৩০ ও বৌদিদির কাছ থেকে ৩০ নেব।

নয়নতারা। এইত আমাদের বাড়ী থেকেই এক-শ হলো; দু-শ টাকা হলেই এক ছড়া ভাল চেইন হবে।

সৌদামিনী। তা বৈ কি।

কয়েক দিনের মধ্যেই সৌদামিনী নিজেদের বাড়ী হইতে একশত ও অপর দুই বাড়ী হইতে ত্রিশ ত্রিশ টাকা তুলিয়া ফেলিলেন। রায় মহাশয় নিজের পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দিলেন, যে মেয়েরা চেইনের জন্য টাকা তুলিতেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট তদুত্তরে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন, যে তাঁহার মেম এই সংবাদে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন ও নিজের চাঁদা বিশ টাকা পাঠাইতেছেন। সৌদামিনী পরিচিত স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে অপর বিশ টাকা তুলিয়া ফেলিলেন। ঘড়ির সংগে সংগে একগাছি সুন্দর চেইনও প্রস্তুত হইল। ওদিকে হরেন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেটের ভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার মুখে স্পোর্টিং ক্লাব ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের সমুদায় বিবরণ শুনিয়া নিজ উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন হইলেন, এবং আবশ্যক মত অর্থ-সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ক্রমে ঘড়ি ও চেইন প্রস্তুত হইল। প্রথমে স্থির হইল, কালেজের হলে স্পোর্টিং ক্লাব ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের ছেলেদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের সমক্ষে হরেন্দ্রকে ঘড়ি ও চেইন দেওয়া হইবে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের মেম বলিলেন, "মেয়েরা চেইন দিয়াছেন, এমন একটা স্থানে হওয়া উচিত যেখানে মেয়েরাও দেখিতে পারেন।" একথা সকলেরই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। নানা জনে নানা স্থানের উল্লেখ করিলেন; অবশেষে স্থির হইল, রায় মহাশয়ের প্রাংগণের এক পার্শ্বেই সামিয়ানা খাটাইয়া তাহার নিম্নে সভা করা হইবে।

তদনুসারে এক শনিবার বৈকালে সভার আয়োজন হইল। সভারম্ভের সময় হইতে না হইতে দর্শকবৃন্দে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। যথাসময়ে স্পোর্টিং ক্লাবের মেম্বরগণ ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের ছাত্রগণ তাহাদের বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া নিশান হস্তে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে সভাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহাদের দর্শনমাত্র সকল লোকে উঠিয়া দাঁড়াইল ও চারিদিকে করতালিধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কাপ্তেনের জন্য তোমাদের অহংকৃত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।" সভার পূর্ব কোণে মহিলাদিগের বসিবার আসন হইয়াছিল; সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের মেম মহিলাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন। পর্দানশীন মহিলাদিগের দেখিবার জন্য উপরের বারাণ্ডাতে স্থান হইয়াছিল।

অদ্যকার সভাস্থলে সকলেই প্রসন্ন, সকলেই উৎফুল্ল, কেবল এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যে এত জাঁকজমক তাঁর ভাল লাগিতেছে না। তিনি হরেন্দ্র। তিনি অবনত মস্তকে

বসিয়া কেবল ভাবিতেছেন, "এত ধুমধাম কেন, আমি এমন কি করিয়াছি, ভদ্রলোকমাত্রেই ত এরূপ করিয়া থাকে, আর কেহ হইলেও ত এরূপ করিতেন। তখন তাঁহার এ প্রশ্ন মনে আসিল না যে তাঁহার নিজের পানশীতেই ত আরও পাঁচ সাতজন লোক ছিল, তাহাদের কেহ লম্ফ দিল না কেন? তাহার পর তাঁহার মনে হইল, কর্তব্যবোধে মানুষ যে কাজ করে, তাহার জন্য এতটা পুরস্কার ভাল নয়। এতটা আয়োজন হইতে না দিলেই বোধ হয় ভাল হইত।" যাহা হউক তাঁহার অন্তরের প্রশ্নগুলার উত্তর হইতে না হইতেই মাজিস্ট্রেট উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি সপরিবারে স্টেশন হইতে আসিতেছিলেন, গঙ্গার তীরে আসিয়া কি দেখিলেন, কিরূপে সাহায্যের জন্য ছুটিয়া গেলেন, কিরূপে স্ত্রীলোকটিকে তুলিলেন, হরেন্দ্রকে কি অবস্থায় দেখিলেন, সমুদায় ভাঙিয়া বলিলেন। পদে পদে করতালির ধ্বনি উঠিতে লাগিল। অবশেষে তিনি হরেন্দ্রকে ডাকিলেন, হরেন্দ্র উঠিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন। মাজিস্ট্রেট বলিলেন, "তুমি যে সাহস ও সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে চুঁচড়াবাসীদিগের সন্তোষ ও সদ্ভাবের চিহ্নস্বরূপ এই ঘড়ি তোমাকে প্রদত্ত হইল।" তিনি প্রণাম করিয়া অবনত মস্তকে ঘড়িটি গ্রহণ করিলেন। মাজিস্ট্রেটের মেম চেইন ছড়াটি লইয়া দাঁড়াইলেন; মাজিস্ট্রেট বলিলেন, "তোমার কার্য দ্বারা তুমি নারীকুলের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছ, কতকগুলি রমণী তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই চেইন তোমাকে দিতেছেন।" এই কথা বলিবামাত্র করতালি-ধ্বনিতে বাড়ী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চেইনটিও গ্রহণ করিলেন।

সভাভঙ্গ হইলে, রায় মহাশয় কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইবার জন্য মাজিস্ট্রেটকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ওদিকে নয়নতারা ও সৌদামিনী মেমকে লইয়া এটা ওটা দেখাইতে লাগিলেন। মেম যাহা কিছু দেখিলেন, সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাঙালি ভদ্রলোকদের বাড়ীর বন্দোবস্ত যে এমন সুন্দর হইতে পারে এবং মেয়েরা যে এমন সুশিক্ষিত হইতে পারে তাহা অগ্রে জানিতেন না। জলযোগান্তে মাজিস্ট্রেট সাহেব সপরিবারে প্রস্থান করিলেন।

এইবার হরেন্দ্রের প্রকৃত অভ্যর্থনা আরম্ভ হইল। রায় মহাশয়ের পরিবার পরিজন সকলে হরেন্দ্রের চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলিল। গৃহিণী বলিলেন, "বাবা! আমি আজ খুব খুসী হয়েছি, যেমন কাজ করেছ তেমনি পুরস্কার হয়েছে।"

হরেন্দ্র। আমার কিন্তু এতটা আড়ম্বর ভাল লাগছে না।

রায় মহাশয়। তুমি যেভাবে কথাটা বলছো আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার বোধ হয়, দেশের লোকের কাছে এরূপ কাজগুলোকে তুলে ধরা ভাল।

সৌদামিনী। মাজিস্ট্রেট যখন সেদিনকার ঘটনাটা বর্ণন করছিলেন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, আপনার স্পোর্টিং ক্লাব করা সার্থক হয়েছে। মাজিস্ট্রেট যা বললেন তাতে বোধ হয়, তিনি কাছি না ফেলে দিলে আপনি ডুবতেন।

রায় মহাশয়। ঐ জন্যেই ত আমি হরেনের স্পোর্টিং ক্লাবের ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের এত পক্ষ।

অদ্যকার মহানন্দের দিনে, এই গোলমালের মধ্যে, একজন নীরব রহিয়াছেন। তিনি কেবল দুই কর্ণ ভরিয়া এই সমুদায় প্রশংসাগীতি সুধার ন্যায় জ্ঞান করিয়া পান করিতেছেন; কিন্তু কোনও কথা বলিতেছেন না; তাঁহার যাহা বলিবার আছে সময়ান্তরে বলিবার জন্য রাখিতেছেন। তিনি নয়নতারা। হরেন্দ্র কিরূপ বিনয়াবনত ভাবে সভামধ্যে বসিয়াছিলেন, তিনি কেবল তাহাই ভাবিতেছেন ও মনে মনে বলিতেছেন, "আহা! কি বিনয়!"

ইহার পর নীচের মজলিস ভাঙিলে হরেন্দ্র নয়নতারার সঙ্গে তাঁহার ঘরে গেলেন। গৃহে গিয়া নয়নতারা তাঁহার চেয়ারের নিকট নিজের চেয়ারটি টানিয়া লইয়া তাঁহার হাতে হাতখানি দিয়া প্রেমোজ্জ্বল-নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যখন বলিলেন,—"বলুন, আমার কাছে আজ কি চান?" তখন হরেন্দ্রের মনে কি একপ্রকার বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল? সেই সরল

ও সদ্বিনয় পূর্ণিট মন প্রাণকে সন্তারসে ডুবাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন,—"আপনার কাছে যা পেয়েছি ঢের হয়েছে, আর কিছু চাই না।"

নয়নতারা হাসিয়া ঘড়িটি চাহিয়া লইলেন; খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—"বাঃ বেশ সুন্দর ঘড়িটি।"

তৎপরে ম্যাজিস্ট্রেটের কথাতে তাঁহার চক্ষে কিরূপ জল আসিয়াছিল ও তিনি কিরূপ মুখ লুকাইয়াছিলেন, হরেন্দ্রের বিনয়াবনত মুখ দেখিয়া তাঁহার কিরূপ ভাল লাগিতেছিল, ইত্যাদি অনেক কথা হইল। স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যগণকে ও ড্রিলিং ব্যাণ্ডের ছেলেদিগকে নূতন পরিচ্ছদে কিরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল তাহাও বর্ণন করিলেন।

হরেন্দ্র। এবারে ত আমাদের স্পোর্টিং ক্লাবের একটা বড় ক্রিকেটের ম্যাচ আসছে।

নয়নতারা। কাদের সঙ্গে?

হরেন্দ্র। কলিকাতার কেল্লার গোরাদের সঙ্গে।

নয়নতারা। কৈ তা ত শুনিনি।

হরেন্দ্র। কাল তাদের চিঠি পেয়েছি। তারা ৩০শে ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটির মধ্যে কলিকাতার ময়দানে খেলবার জন্য আমাদের ডেকেছে।

নয়নতারা। দেখিব, এবারে আপনারা জেতেন কি না? যদি জিতে আসতে পারেন, আপনাদের দলের একদিন বনভোজনের খরচ আমি দেব।

হরেন্দ্র। এ কথা শুনলে তারা খুব উৎসাহিত হবে। আমরা মনে করছি ম্যাচ্ দেব।

নয়নতারা। দেবেন বৈ কি, গোরারা দেখুক আমাদের ছেলেরাও খেলতে শিখেছে। আমি কিন্তু ম্যাচ্ দেখতে কলিকাতায় যাব।

হরেন্দ্র। সেই বেশ কথা, খেলাটা নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না।

ইহার পরে হরেন্দ্র উঠিয়া ঘরে গেলেন।

দুই একদিনের মধ্যেই অদ্যকার কার্যবিবরণ সমুদায় সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়া গেল। পরে দুই মাসের মধ্যেই হরেন্দ্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের Humane Society হইতে দুইটি মেডেল পাইয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈকালে নয়নতারা জননীকে বলিলেন, "মা! চল দেখি একবার মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাই, তাঁর একটি ছেলে হয়েছে শুনেছি, চল না একবার দেখে আসি; আর আমি ছেলেটির জন্যে কতকগুলি জামা, মোজাটোজা সেলাই করেছি, সেগুলোও দিয়ে আসি।"

জননী। ধন্যি মেয়ে তুই! ঘরের কাজ ত সবই করছিস, এর মধ্যে আবার জামা, মোজা, সেলাই করলি কখন?

নয়নতারা। (হাসিয়া) ওই পাঁচ কাজের মধ্যেই এক আধটু যে সময় পাই তাতেই করি। দুপুর বেলা তোমরা ঘুমাও, আমি জামা সেলাই করি; তারপর রাত্রে তোমরা ঘুমোলে দু-এক ঘণ্টা বসে সেলাই করি।

জননী। তুইত এত কষ্ট করে করছিস, মহেন্দ্র বাবুর মা হিন্দু মানুষ, তিনি কি আর আঁতুড়ে ছেলেকে জামামোজা পরাতে দেবেন?

নয়নতারা। চল না একবার দেখে আসি। এবার শীতটা খুব পড়েছে; এখন গরম মোজা জামা না পরিয়ে রাখলে ছেলেটার অসুখ করতে পারে।

জননী। ওরে হিন্দু ঘরের আঁতুড় তুই দেখিস নি! মোজা জামা কাকে পরাবি? দিনরাত সেখাঁর ছেলেটাকে আগুনে তাতাচ্ছে।

নয়নতারা। চল না, মহেন্দ্র বাবুর মা বড় ভাল মানুষ, আর আমাকে খুব ভালবাসেন, বলে কয়ে আমাদের মত বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আসব।

জননী। ছেলের জন্য জামা মোজা করেছিস, পোয়াতির কি হবে?

নয়নতারা। তাঁর জন্যেও গরম কামিজ, জামা মোজা নিয়েছি।

জননী। ধন্যি মেয়ে এ সব আবার কখন করলি?

নয়নতারা। কতকগুলো নিজে করেছি, কতকগুলো দরজী দিয়ে করিয়েছি, চল চল গাড়ি-খানা যুততে বল।

গৃহিণীর আদেশে অবিলম্বে গাড়ি যোতা হইল; এবং মাতা ও কন্যাতে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিতেছেন দেখিয়া, উপরের বারাণ্ডা হইতে মিনী কাঁদিয়া বলিল, "আমি দালিতে যাব, আ-মি-ই-ই বেলাতে যাব।"

জননী। মেয়েটাকে সংগে নে।

নয়নতারা। না না তুমি জান না ও পরের বাড়ীতে গেলে বড় বিরক্ত করে। দুদণ্ডের পরেই ঘরে আসবার জন্যে অস্থির করে তোলে। ওকে নিয়ে গেলে, তাঁদের সংগে কথাবার্তা কইতে দেবে না। (মিনীর প্রতি) মিনীমণি! লক্ষ্মী মেয়ে! চুপ কর, আমরা শীগগির আসব, এসে তোমাকে বেড়াতে পাঠাব।

এই বলিয়া দুজনে যাত্রা করিলেন।

নয়নতারা। (পথে যাইতে যাইতে) দেখ মা! মহেন্দ্র বাবুর বড় কষ্ট, ইস্কুলে মাসে ২৫ টাকা মাহিনা পান; আর টুনী পটলাকে গান শেখাবার জন্য বাবা মাসে ১৫ টাকা দেন। এই ৪০ টাকাতে তাঁর কুলায় না। কলিকাতাতে ছোট ভাইটি থাকে, তারও খরচ এই টাকার ভিতর থেকেই দিতে হয়। তার পরে সুখ অসুখ আছে; সংসারের আপদ বিপদ আছে; বুঝতেই পার ভদ্রলোকের কি রকম কষ্টে দিন যায়। আমরা কি কোনও রকমে আরও কিছু সাহায্য করতে পারি না?

জননী। আর কি রকমে করা যাবে? কর্তা যে মাসে ১৫ টাকার বেশী দিতে পারেন, এরূপ ত বোধ হয় না।

নয়নতারা। বাবা যে বেশী দিতে পারবেন না, তা আমি জানি। এই ১৫ টাকা যে দিচ্ছেন, তাও কেবল মহেন্দ্র বাবুকে বড় ভালবাসেন বলে, নতুবা দেবার কথা নয়। বাবার মাসিক দান কত, তার কি খবর রাখ?

জননী। বিশেষ কথা আমি জানি নে, তবে এইমাত্র শুনেছি যে, মাসে প্রায় ২০০।২৫০ টাকা বাঁধা দান আছে।

নয়নতারা। বাবার দান কি এক রকম লোকের মধ্যে? হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান যে সম্প্রদায়ের লোকে যে কোন ভাল কাজ করে, যাতে দশজনের উপকার হবার সম্ভাবনা, তাতেই বাবার কিছু কিছু সাহায্য করা আছে। হরেন বাবুর সুরাপান নিবারণী সভাতে মাসে ৫ টাকা দেন; এখানে ব্রাহ্মসমাজে মাসে ১০ টাকা দেন; হরেন বাবুর ড্রিলিং ব্যাণ্ডে ১০ টাকা ও পাবলিক লাইব্রেরিতে মাসে ১০ টাকা দেন, এই রকম আর যে কত দান আছে তা কেউ জানে না। এমন কি তাঁর একজন সেকেলে সহধ্যায়ী বন্ধুর পরিবারদের জন্য মাসে মাসে ১৫ টাকা করে পাঠিয়ে থাকেন। বাবাকে আর বেশী দিতে বলা যায় না।

জননী। তবে মহেন্দ্র বাবুকে আর কি রকম করে সাহায্য করা যেতে পারে?

নয়নতারা। আমি ত একপ্রকার উপায় ঠাউরেছি। মহেন্দ্র বাবুর যে টেঁপী বলে মেয়েটি আছে, আমি তাকে নেব, নিয়ে মানুষ করব।

জননী। অতটুকু মেয়ে মা ফেলে থাকতে পারবে কেন?

নয়নতারা। অতটুকু আর কি, আড়াই বছর তিন বছরের মেয়ে, মা ফেলে থাকতে পারবে না? দেখনা এমনি পোষ মানাব, যে আমাকে ছেড়ে যেতে চাবে না।

জননী। তোর এত কাজ, তার উপর মেয়েটাকে নিলে দেখবি কখন?

নয়নতারা। তুমি দেখনা তার কিছু কষ্ট হবে না। তার জন্য একটা চাকর কি চাকরাণী রেখে দেব, সেই খাওয়াবে ধোয়াবে, দিনের মধ্যে একবার মায়ের সংগে দেখা করতে নিয়ে যাবে, এমনি করে চালাব যে তোমরা বুঝতে পারবে না, যে বাড়ীর মধ্যে একটি মেয়ে আছে।

জননী। আচ্ছা, যদি নিয়ে রাখতে পারিস তবে নিস।

নয়নতারা। আর একটা কথা আছে; আর এক রকমে আমরা মহেন্দ্র বাবুকে কিছু সাহায্য করতে পারি। আমাদের রান্নাঘরের পিছনের বাগানে তরিতরকারী যথেষ্ট হয়; আমরা খেয়ে ফুরোতে পারি না। চাকর বাকরকে ও পাড়ার লোককে কত বিলান হয়; অপর লোককে না বিলিয়ে যদি মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে পাঠাবার নিয়ম কর, তা হলে বেচারার বাজার খরচটা অনেক বেঁচে যায়। ভদ্রলোক, মানী লোক, টাকা কড়ি দান করতে গেলে নেবেন না; এরকম বন্ধুভাবে উপহার দিলে বোধহয় আপত্তি করবেন না।

জননী। এ কথাটা বেশ বলেছিস; সে কাজটা অনায়াসে হতে পারে। এ বুদ্ধিটা যে আমাদের এতদিন যোগায় নি সেইটাই নিন্দের কথা। তরিতরকারীগুলো ইঁদুরে বাঁদরে ও অপর দশজনে খেলে আমাদের লাভ কি? মহেন্দ্র বাবু সাধু মানুষ, সাধু মানুষের সেবাতেই যাওয়া ভাল।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা মহেন্দ্র বাবুর ভবনের দ্বারে পেঁছিলেন। বাড়ীতে পদার্পণ মাত্র মহেন্দ্রনাথের জননী তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য পাকশালা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। রায় গৃহিণী ও নয়নতারার এই ভবনে প্রথম পদার্পণ নয়। রায় পরিবারের সকলেই বৃদ্ধার সুপরিচিত; বিশেষতঃ নয়নতারা। নিজ পুত্রের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া শুনিয়া বৃদ্ধার কর্ণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তৎপরে নিজে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া যাহা জানিয়াছেন তাহাতেও মন মুগ্ধ হইয়াছে। আজ উভয়কে সমাগত দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন,—"একি ভাগ্যি! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।"

রায়-গৃহিণী। (হাসিয়া) ভাগ্যি ত আমাদের, আপনার মত মানুষকে দেখলেও পুণ্যি আছে।

নয়নতারা। তাতে সন্দেহ কি।

এই বলিয়া বৃদ্ধার চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইলেন।

বৃদ্ধা। বেঁচে থাক মা! মনের মত বর হোক।

রায়-গৃহিণী। (হাসিয়া) কাজেই ঐ আশীর্বাদ করবেন বৈ কি। হাতের লোহা অক্ষয় থাক, এ কথা ত বলবার যো নেই। (উভয়ের হাস্য)

বৃদ্ধা। (হাসিয়া) তোমরাই ত তা বলতে দিচ্ছ না। তা না হলে ও কি আজ মায়ের আঁচল ধরে বেড়ায়! আজ যে ও পাঁচ ছেলের মা।

রায়-গৃহিণী। মেয়ের বিয়ে দেবার যে সুখ, তাত চারিদিকে দেখচি। ওরা যা আছে তাই ভাল; সংসারের কোনও জ্বালা জানে না; খায়দায় আমোদে আহ্লাদে কাল কাটায়, এই ত বেশ।

বৃদ্ধা। তা ঠিক, আমরা কি রকম করে শাশুড়ীর ঘর করেছি মনে হয়? তা ভাবলে বোধ হয় পূর্বজন্মের অনেক পুণ্যির জোরে ওদের এমন সুখে দিন যাচ্ছে।

গৃহিণীদ্বয়ের কথাবার্তাতে নয়নতারার কিছু কিছু সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। তাই তিনি কথোপকথনের গতি ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র বাবু কোথায়?"

বৃন্ধা। সে ছেলে দুটোকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছে। সে দুটোর জ্বালায় কি কাজ করতে পারি? চোকে কানে দেখতে দেয় না; সর্বদাই মারামারি টিকটিকি। মা পড়ে যেন একেবারে স্বয়ম্ভুর পদ পেয়েছে।

রায়-গৃহিণী। চলুন দেখি ছেলে দেখে আসি।

ক্রমে সকলে সূতিকাগৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নয়নতারা দেখিলেন ছেলেটিকে একটু ময়লা নেকড়া পাতিয়া শয়ন করাইয়া রাখা হইয়াছে ও গায়ে একটু ছেঁড়া রেপার চাপা দেওয়া আছে। প্রসূতি গায়ে একটি জামা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে শীত নিবারণ হইতেছে না। টেঁপী জননীর কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে ও মাকে টানিতেছে। জননী যে দুই চারিদিন সর্বদা শয়ন করিয়া আছেন, এটা তাহার ভাল লাগিতেছে না। বৃন্ধা দ্বারে আসিয়াই বলিলেন, "আমাদের চাকরবাকর নেই, একটা বোষ্টোমের মেয়ে বাসন ক'খানা মেজে ও জল তুলে দিয়ে যায়, বৌ পড়ে থাকাতে ওই মেয়েটার অনন্ত অবস্থা হয়েছে। একে এঁড়ে পেয়েছে, তাতে গায়ে কতগুলো গরল হয়েচে, সর্বদাই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে।"

রায়-গৃহিণী। ওমা দিব্বি ছেলেটি হয়েছে তো, কেমন চোক দুটি পটলচেরা, নাকটি টিকোলো, হাটি ছোট, কার মত হয়েছে? মার মত, না বাপের মত?

বৃন্ধা। ও গো ও বাপ মা কারু মত হয়নি; ওর এক মেজ মামা আছে, ও তার মত হয়েচে।

মাতা কন্যাতে শিশুটি দেখিয়া প্রত্যেকে তাহার হস্তে পাঁচ পাঁচ টাকা দিলেন।

নয়নতারা। (মহেন্দ্রনাথের মাতার প্রতি) দেখুন, আপনি ত আমাকে ভালবাসেন।

বৃন্ধা। তোমাকে কে ভালবাসে না মা? তোমার গুণে তোমাকে যে দেখে সেই ভালবাসে।

নয়নতারা। তা হলে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

বৃন্ধা। কি অনুরোধ বল।

নয়নতারা। আমি খোকার জন্যে ও খোকার মায়ের জন্যে কতগুলো গরম জামা-টামা সেলাই করে এনেছি, আমি সেগুলো পরিয়ে দিতে চাই। শীতটা খুব পড়েছে; ওরকম করে ফেলে রাখলে অসুখ করতে পারে; আর এগুলো পরিয়ে দিলে, আগুনে সেঁক-টেক বেশী দিতে হবে না, ভালই থাকবে।

বৃন্ধা। এই কথা? পরিয়ে দিলে তুমি যদি সুখী হও তবে দেও; আমার মতে ত কিছু হচ্চে না; সবই ত তোমাদের মতে হচ্চে; তবে এটা কেন বাকি থাকে?

নয়নতারা অনুমতি পাইয়া প্রসূতির ও শিশুর বেশ পরিবর্তন করিয়া, নিজের আনীত গরম মোজা ও জামা পরাইয়া দিলেন; এবং সেই সামান্য গৃহে ও সেই সামান্য আয়োজনে ঘরটা যতদূর পরিষ্কার করিতে পারা যায়, করিয়া দিয়া প্রসূতিকে বলিলেন—"টেঁপীকে আমি আপাতত এক মাসের জন্য নিয়ে যাচ্চি। ও এখন আমার কাছেই থাকবে। এখানে ওকে দেখবার কেউ নেই।"

প্রসূতি। ওমা ওকে কি আপনি রাখতে পারবেন? ওর গায়ে কতগুলো গরল হয়েছে, সেই জন্যে রেতে ঘুমোয় না, ও যে আপনাকে জ্বালাতন করে মারবে।

নয়নতারা। তা হোক, আমি গরলের ওষুধ দেবো।

প্রসূতি। ঠাকুরণকে একবার বলুন।

নয়নতারা। তা বলছি। (মহেন্দ্রনাথের জননীর নিকট গিয়া হাসিয়া) দেখুন, আর একটু কথা আছে, আমি কিন্তু টেঁপীকে নিয়ে যাচ্চি।

বৃন্ধা। তা হলে ত আমরা বাঁচি। কিন্তু ও রেতে তোমাকে ঘুমোতে দেবে না।

নয়নতারা। তা দেখা যাবে।

এই বলিয়া টে‍ঁপীকে কোলে লইতে গেলেন। টে‍ঁপী কোলে আসে না। সে বড়ই কি আড়াই বৎসরের মেয়ে। পেটটি এমনি উ‍ঁচু যে দাঁড়াইলে বোধহয় যে নিজের পায়ের নখ নিজে দেখিতে পায় না। তাহাতে আবার একটি গোড় আছে। সেটি বোধহয় শৈশবকালে চে‍ঁচাইয়া চে‍ঁচাইয়া প্রস্তুত করিয়াছে। সেই সুগোল টে‍ঁপাটিতে খাদ্যসামগ্রী কিছু আছে কিনা বুঝিবার সাধ্য নাই। খাদ্যে পূর্ণ থাকিলেও যাহা, না থাকিলেও তাহা; সর্বদা উ‍ঁচু। টে‍ঁপাটির বিস্তৃতি ও পীনতা যেরূপ অপর অংশের সেরূপ নয়। পদদ্বয় ও বাহুদ্বয় প্লীহা-রোগাক্রান্ত রোগীর ন্যায় ছিনেপড়া। নিতম্ব আছে কি নাই; টে‍ঁপের আকর্ষণে টে‍ঁপের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। কোমরে একটি ঘুনসী তাহাতে একটি তামার মাদুলী গাঁথা। তন্মধ্যে পিতা-মহীর দত্ত কোনওপ্রকার ঔষধ আছে; হাতে দুগাছি রূপার বালা। নাকে একটি নোলক আছে, তাহা নিরন্তর প্রবাহিত পোঁটার সহিত জড়িত হইয়া আকৃতিতে দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক টে‍ঁপী বাড়ী ছাড়িয়া কোন মতেই যাইতে সম্মত নহে। নয়নতারা কত ভুলাইলেন সে কিছুতেই যাইতে সম্মত নয়। অবশেষে তাহাকে কোলে করিয়া হাতে একটু মিষ্ট দিয়া, এটা ওটা সেটা দেখাইয়া, একথা সেকথা বলিয়া, এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, যে টে‍ঁপী যে পরের বাড়ী চলিল, তাহা আর বুঝিতে পারিল না।

জননী। (পথে যাইতে যাইতে) মেয়েটাকে যে আজই আনলি, রাখতে পারবি ত? যে এক গা গুরল, আমাদের বাড়ীতে গুরল দেবেনা ত?

নয়নতারা। সাধে কি এনেছি, দেখলে ত কি রকম অবস্থা। চাকর-বাকর নেই, দেখবার একটি লোক নেই, মেয়েটা কে‍ঁদে কে‍ঁদে লুটিয়ে বেড়ায়, এরূপ অবস্থায় গুরল না হওয়াই আশ্চর্য। দেখ না আমি দুদিনে ওর গুরল সারাচ্ছি।

ক্রমে তাঁহারা নিজ গৃহে পে‍ঁছিলেন, টে‍ঁপীকে নামাইবামাত্র গৃহের সকলে ছুটিয়া আসিল।

সৌদামিনী। মা গো! মেয়েটার গায়ে গুরল দেখ!

নয়নতারা। (হাসিয়া) ওকে কিন্তু এখানে রাখব বলে এনেছি।

সৌদামিনী। না দিদি! সত্যি বলছি না! ও মা! তবেই গিছি। তবেই আমার আর তোমার ঘরের পাশে থাকা হয়েছে। ও কি সমস্ত রাত ঘুমোতে দেবে।

নয়নতারা। তা আমি আগেই ভেবেছি, তোকে টুনীর সংগে পশ্চিমের ঘরে দেব।

সৌদামিনী। তুমি ত ঘরে একটু অপরিষ্কার সইতে পার না, ওই গুরলে মেয়েটাকে নিয়ে থাকবে কি করে?

নয়নতারা। দেখিস না তিন দিনে আমি ওর গুরল সারাচ্ছি।

মিনীর একটি সমবয়স্কা অতিথি আসিয়াছে, সে কৌতূহলাবিষ্টা হইয়া নবাগত বালিকাকে আপাদ মস্তক দেখিতেছে। টুনী মিনীকে ঠেলিয়া—"সরে দাঁড়া, গুরল দেখছিস নে, তোর গুরল হবে।"

নয়নতারা। (নন্দরানীর প্রতি) দেখ ভাই! যে কটাদিন গুরলটা না সারে, ছেলেগুলোকে একটু সাবধানে রাখতে হবে। আমি ক্ষান্ত চাকরাণীকে এর জন্যে বিশেষ করে রাখব। সর্বদা দূরে দূরে নিয়ে বেড়াবে। আর আমাদের বাড়ীর ছেলেরা এমন নোংরা থাকে না, ওদের গুরল হবার ভয় নেই।

পরদিন প্রাতে আহারের সময়ে এই মেয়েটিকে লইয়া ভাই-ভগিনীদিগের মধ্যে মহা হাসা-হাসি হইল।

সৌদামিনী। দিদি মহেন্দ্রবাবুর মেয়েটাকে এনে খুব জব্দ হয়েছে। আমাকে ত টুনীর ঘরে দিয়েচ; নিজে ঘুমাবে কি, মেয়েটার চে‍ঁচানিতে আমারই ভাল ঘুম হয়নি। ওই গুরলগন্ধ মেয়েটাকে বুকে করে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়িয়েছে। সে মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে! তার নাকের পোঁটা

পেটে মোছা অভ্যেস, সে পেটে পোঁটা মুছতে যায়, দিদি বলে, "ছি! ছি! পেটে মুছ না," দৌড়ে গিয়ে নিজের রুমালে মাকের পোঁটা মুছে দেয়। দিদি এদিকে যেমন পিটপিটে তা ত জান, ঘরের মেজেতে এক ফোঁটা কালি পড়লে যতক্ষণ সেটুকু না তুলবে ততক্ষণ তার নিস্তার নেই। প্রতিদিন সকালে ম্যাথরের সংগে সারা বাড়ী ঘুরে কি রকম পরিষ্কার করায় তা ত দেখছ; কিন্তু কাল রাত্রে তেমনি জব্দ হয়েছে; অত বড় মেয়েটা বলতে পারে না, যেখানে সেখানে অপরিষ্কার করে, আর ক্ষান্ত চাকরাণীটা পরিষ্কার করে মরে। সকালে উঠে দিদির কাণ্ড যদি দেখতে! নিজের হাতে কারবলিক সোপ দিয়ে মেয়েটাকে পরিষ্কার করে, নাইয়ে, ধুইয়ে, গয়লের ওষুধ দিয়ে, দুধ খাইয়ে, পরিষ্কার ফ্রক পরিয়ে, কোলে বসিয়ে বলে, "লক্ষ্মী! আমি তোমার মাসি হই, আমাকে মাসি বল।" মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে বলে, "না যাচ্ছি না, আমি মা য'ব।"

সৌদামিনী অভিনয়-সহকারে মেয়েটার ভাবভংগী এমনি দেখাইলেন, যে সকলেই হাসিয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্রের অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় নয়নতারা পার্শ্বের ঘর দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "বুঝেছি গো বুঝেছি, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি হচ্চে।"

সুরেশ। Welcome! welcome! new mother with a new baby!—অর্থাৎ এস এস নূতন শিশুর নূতন মা।

নন্দরাণী। (দৌড়িয়া গিয়া নয়নতারাকে ধরিয়া) ঠাকুরঝি! একটিবার এস না ভাই! মেজ ঠাকুরঝি মেয়েটার মুখভংগী কিরকম নকল করছে দেখ এসে।

নয়নতারা। যাও যাও হাসি ঠাট্টার বিষয়ই বটে; তোমরা কেবল হাসি ঠাট্টা নিয়েই আছ বৈত নয়?

নন্দরাণী। আমি ত ভাই তোমার পক্ষ নিয়েছি।

নয়নতারা। নিয়েছ বেশ করেছ, ছেড়ে দাও, বাবা কেন ডেকেছেন দেখে আসি। (প্রস্থান)

সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্রনাথ ও হরেন্দ্র নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) বেশ ত, আমার মেয়েটি চুরি করে এনেছেন। আমি বাড়ীতে এসে মেয়ে খুঁজি, মেয়ে পাই না, শেষে শুনি আপনি এনেছেন। আপনারা যাবেন আগে কেন বলে পাঠাননি, তাহলে আমি বাড়ীতে থাকতাম।

নয়নতারা। (হাসিয়া) কি আর বলে পাঠাব, নূতন জায়গা ত নয়। আমি কিন্তু মেয়েটাকে বরাবরকার জন্যে এনেছি, ওকে আর দেব না।

মহেন্দ্র। কৈ তাঁরা ত তা বললেন না?

নয়নতারা। আমি ওর মাকে বলে এনেছি, এক মাসের জন্যে নিয়ে চললাম, কিন্তু আমার মনের কথা যে ওকে কাছে রেখে মানুষ করবো। ওর মা এতগুলি ছেলে নিয়ে পেরে ওঠেন না।

মহেন্দ্র। আপনি কাছে রেখে মানুষ করবেন সেটা ত ওর সৌভাগ্যের কথা। এমন সৎসংগ আর কোথায় পাবে।

নয়নতারা। ভালবেসে যা ইচ্ছে বলতে পারেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, আমি কিন্তু মনে স্থির করেছি।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, মাকে ও গৃহিণীকে একবার বলি। (একটু মৌনী থাকিয়া) আপনার সদাশয়তার যেন অন্ত নাই।

নয়নতারা। আপনি ওরূপ করে কথা বললে আমি এখান হতে উঠে যাব। আমরা পরস্পরের জন্যে যদি এতটুকুও না করি, তাহলে আমাদের মানুষের সমাজে না থাকাই উচিত, বনে বাঘ-ভালুকের সংগে থাকাই ভাল।

মহেন্দ্র। আপনার—

নয়নতারা। (বাধা দিয়া) আপনাকে কতবার বলেছি, আমাকে আপনি বলবেন না; আপনি বাবার বন্ধু, আমি আপনার পায়ে বসে শিখতে পারি, আমাকে আপনি আপনি কেন বলেন?

মহেন্দ্র। (হাসিয়া) তুমিটা আসে না যে। আমার পায়ে বসে আপনি শিখবেন? আপনার কাছে আমাদের ঢের শেখবার আছে।

নয়নতারা। ছি! ছি! অমন কথা বলবেন না; আপনারা হলেন সাধু ভক্ত মানুষ, আমি একটা অজ্ঞ অধম স্ত্রীলোক, আপনাদের সংগে আমার তুলনা করবেন না; আপনারা ধার্মিক, আমি ধর্মের কিছুই জানি না।

মহেন্দ্র। আমাদের ধর্ম মুখে আছে; আপনার ধর্ম কাজে আছে; ঈশ্বরে ভক্তি ও মানুষে প্রেম এই ত ধর্মের সার। তা আপনার আছে।

নয়নতারা। (বিনীতভাবে) ঈশ্বরে ভক্তি ত দূরের কথা, যা না হ'লে মানুষের ভক্তিতে অধিকার জন্মে না, তাই আমার হয়ে উঠছে না।

মহেন্দ্র। সেটা কি?

নয়নতারা। সেটা কি তাকি আপনারা জানেন না? জীবনের কর্তব্যগুলো ভাল করে সাধন করা। লোকে বলে অনেক তপস্যা না হলে ঈশ্বরে ভক্তি হয় না; আমি বলি হৃদয়মনকে পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্তব্যগুলো ভাল করে করাই প্রধান তপস্যা।

মহেন্দ্র। তাতে আর সন্দেহ কি?

নয়নতারা। আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তির কথা বলেন, আমার লজ্জা হয়; আমি মনে করি ভগবান ত দূরে, মানুষের প্রতি যা করা উচিত তাই ভাল করে করতে পারা গেল না।

ইহার পরেই মহেন্দ্রনাথ বিদায় হইলেন। পথে যাইবার সময় নয়নতারার কথাগুলি তাঁহার মনে ঘুরিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বার বার বলিতে লাগিলেন, "হৃদয়মনকে পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্তব্যগুলো ভাল করে করাই প্রধান তপস্যা," কি কথাগুলিই শুনলাম।

মহেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেই নয়নতারা নিজের চেয়ারখানি টানিয়া হরেন্দ্রের নিকট লইলেন। ধুনুটির ছিলা খুলিয়া দিলে দণ্ডটি যেরূপ হয়, মনটি যেন এক মুহূর্তের মধ্যে সেইরূপ প্রমুক্তভাব ধারণ করিল! হৃদয় স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যে পূর্ণ হইল। একটু হাসিয়া হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি কি ভাবছেন?"

তখন হরেন্দ্রের মন পূর্বকার কথোপকথনের ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে। তাঁহারও মনে পূর্বোক্ত কথাগুলি ঘুরিতেছে ও প্রাণে এই উচ্চ আদর্শের উপযুক্ত হইবার জন্য দুর্জয় প্রতিজ্ঞা উঠিতেছে। নয়নতারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবছেন?"

হরেন্দ্র। আপনার একটা কথা মনে ঘুরছে।

নয়নতারা। কোন্ কথা?

হরেন্দ্র। হৃদয়মনকে পবিত্র রাখা ও জীবনের কর্তব্যগুলো ভাল করে করাই প্রধান তপস্যা।

নয়নতারা। এ কথা ত আপনার কাছেই শিখেছি। আমাতে যা কিছু ভাল আছে, সব ত আপনার।

এই কথাগুলি নয়নতারা এমনভাবে বলিলেন যে, হরেন্দ্রের পৃষ্ঠে যেন কে ঘন ঘন কষাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ঘোর আত্মনিন্দা মনে জাগিয়া উঠিল। বসিয়া থাকা যেন কঠিন বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি কি এই নারীর উপযুক্ত? তখন এমনি মনে হইতে লাগিল যে, মনকে যদি পান ত তার কান মলিয়া দেন, তুমি এ নারী পাইবার কামনা কেন কর। তাঁহার মনের ভিতর দিয়া যে এত ভাব গেল নয়নতারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

নয়নতারা। ভাল কথা মনে এসেছে, আপনাকে একটা কথা বলব মনে ভেবেছিলাম, ভুলেই যাচ্ছিলাম।

হরেন্দ্র। কি কথা?

নয়নতারা। আমি টেঁপী ছাড়া আরও দুই তিনটি মেয়ের লেখাপড়া শেখবার সাহায্য করতে চাই। তার কিছু উপায় বলতে পারেন?

হরেন্দ্র। আগে কথাটা আমাকে বুঝতে দিন।

নয়নতারা। কথাটা ভেঙ্গে বলছি। দাদা কিছুদিন থেকে আমাকে মাসে ২৫ টাকা করে দিচ্ছেন, তা ত আপনি জানেন; সেই ২৫ টাকার ৫ টাকা দিয়ে টেঁপীর জন্যে একটা লোক রেখেছি, বাকি ২০ টাকা আমি দুতিনটি মেয়ের লেখাপড়া শেখবার সাহায্যের জন্যে দিতে চাই। এমন মেয়ে কি জানেন?

হরেন্দ্র। মেয়ের অভাব কি? আমাদের প্রচারক মহাশয়দের দুতিন জনের মেয়ে আছে, পড়াবার খরচের অভাবে, লেখাপড়ার ভাল বন্দোবস্ত হচ্ছে না।

নয়নতারা। ঠিক, ঠিক, তাঁদের দিলে অতি সৎপাত্রেই দেওয়া হবে। তিনটি মেয়ের জন্যে মাসে ২০ টাকা দিলে একপ্রকার সাহায্য হবে, কি বলেন?

হরেন্দ্র। তা আর হবে না?

নয়নতারা। তবে আপনাকে একবার গিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে আসতে হবে।

হরেন্দ্র। সেটা আর কঠিন কি?

নয়নতারা। কিন্তু আমি যে মেয়ে তিনটিকে সাহায্য করবো, মাঝে মাঝে তাদের এখানেই হোক, আর কলকেতায় কাকার বাড়ী গিয়েই হোক, এনে কেমন শিখছে দেখব; তাতে কি তাঁদের আপত্তি হবে?

হরেন্দ্র। আশা করি ত হবে না।

নয়নতারা। সেটা আপনি বলতে ভুলবেন না; কারণ যাদের সাহায্য করা যাবে, তারা কেমন শিখছে সেটাও ত মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত।

হরেন্দ্র। তাতে সন্দেহ কি?

ইহার পরেই হরেন্দ্র টুনী ও পটলকে পড়াইবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

চুঁচড়ার গঙ্গাধারের রাস্তার পার্শ্বে ইংরাজদের একটি খেলার ঘর আছে। যখন চুঁচড়ার বারিকে সৈন্যদল থাকিত, তখন বোধহয় সৈনিকগণের ক্রীড়ার জন্য ঐ ঘরটি নির্মিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর যে দুই চারিজন ইংরাজ সহরে থাকিতেন, তাঁহারা ঐ স্থানটিকে ক্রীড়ার্থ ব্যবহার করিতেন না। এইরূপে উহা বহু বৎসর পড়িয়াই ছিল। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে, কতিপয় ইংরাজ যুটিয়া স্থানটিকে আবার ক্রীড়ার্থ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষ্কার করিয়া, ঘাস লাগাইয়া, রাজ-পথের পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। প্রায় প্রতিদিন প্রাতে তাঁহারা সেখানে আসিয়া খেলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিষ্কার ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া যাইবার নিয়ম নাই; যদি কেহ লইয়া যায়, তবে সে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবে; এই মর্মে ইংরাজিতে একটি কাষ্ঠ ফলকে লিখিয়া একটি বৃক্ষের গায়ে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গরীব লোকে তার অর্থ কি বোঝে? সেখানা যে বৃক্ষের গায়ে আছে, তাই অনেকে জানে না।

একদিন অপরাহ্ণে হরেন্দ্র তাঁর স্পোর্টিং ক্লাবের খেলার পর ছেলেদের সঙ্গে আসিবার সময়, দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, পূর্বোক্ত ভূমিখণ্ডের সম্মুখস্থ রাস্তাতে একখানা চাউলের বস্তা বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর একখানি গাড়ী আনিয়া

তৎপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া লোকে বস্তাগুলি একগাড়ী হইতে আর এক গাড়ীতে তুলিতেছে। ইতিমধ্যে উত্তর দিক হইতে আর একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। রাস্তাতে দুখানি গাড়ী পাশাপাশি রহিয়াছে, সুতরাং আর একখানি গাড়ী যাইবার পথ নাই বলিলেই হয়। এইরূপ সংকট অবস্থাতে নবাগত গাড়ীর গাড়োয়ান গত্যন্তর না দেখিয়া, একটু বাঁকিয়া পূর্বোক্ত ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া আপনার গাড়ীখানি বাহির করিয়া লইয়া গেল। হরেন্দ্র দেখিতে পাইলেন, অমনি একজন পাহারাওয়ালা কোথায় ছিল, নবাগত গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার গতিরোধ রোধ করিল; ও গাড়োয়ানের প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। হরেন্দ্র সংগীদিগকে বলিলেন,—"দেখ হে, বোধহয় ঐ পাহারাওয়ালাটা বেচারা গাড়োয়ানের কাছে ঘুস আদায় করবার চেষ্টা করছে।"

প্রথম সংগী। কেন ওর অপরাধ কি?

হরেন্দ্র। আরে ছাই ঐ কোণের দেবদারু গাছটার গায়ে একখানা কাঠের ফলক আছে দেখনি? তাহাতে লেখা আছে ঐ ঘাসের উপর দিয়ে গাড়ী নেয়ান নিষেধ। বেচারা গাড়োয়ান না জেনে ঐ জমির উপর দিয়ে গাড়ী নিয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় সংগী। লেখাটা ত ইংরাজীতে, গরীব লোকে বুঝবে কি করে?

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) তা বললে কি হয়, সভ্যসমাজের আইনের একটা মূলমন্ত্র জাননা?—ignorance of law is no excuse, আইন জানি না একথা বলে কারুর নিস্তার পাবার উপায় নেই। আইনটা মানুষকে জেনে নিতে হবে।

তৃতীয় সংগী। ঐ জন্যেই ত বলি যত আইনের বৃদ্ধি ততই গরীবের লাঞ্ছনা। চলুন না দেখি পাহারাওয়ালাটা কি করে।

এই বলিয়া তাঁহারা ঘটনার স্থানের নিকটস্থ হইলেন, এবং পাহারাওয়ালা যাহাতে জানিতে না পারে, যে তাঁহারা তার আচরণ দেখিতেছেন, এইরূপ করিয়া দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে পাইলেন গাড়োয়ান বলিতেছে, "বাবা আমার কাছে চারি আনার বেশি পয়সা নেই, থাকলে দিতাম।" পাহারাওয়ালা বলিতেছে, "না আট আনা দিতেই হবে।" গাড়োয়ান তাহা দিতে অসমর্থ হওয়াতে পাহারাওয়ালাটা গরুর মুখের দড়ি ছাড়িয়া গাড়োয়ানকে লাঠির গুঁতো মারিতে লাগিল; এবং গাড়োয়ান "বাপ্ রে মা রে" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন হরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গাড়ীর নিকটে গিয়া পাহারাওয়ালাকে বলিলেন, "তুমি ওকে মারছ কেন?"

পাহারাওয়ালা। তুমারা ক্যা! তুম্ কোন্ হো? উস জমিন পর গাড়ী লেয়া যানেকা হুকুম নহি হ্যায়। শালা লোক জান বুঝ কর ভী গাড়ী লে কর উসী জমিনসে যাতে হেঁ।

হরেন্দ্র। দেখছ ত বাপু দুখানা গাড়ীতে রাস্তা আটকে আছে, বেচারা করে কি? কাজেই জমির উপর দিয়ে গিয়েছে। কেন মিছে গোল কর? ওকে ছেড়ে দেও—যেতে দেও।

পাহারাওয়ালা। (ক্রুদ্ধভাবে) তোমারা হুকুমসে ছোড়েংগে! (পুনরায় লাঠির গুঁতা)।

হরেন্দ্র। (বিরক্তভাবে) মারিস্‌নে বল্‌চি, তুই ওকে থানায় নিয়ে যেতে পারিস, মারবার কে? তুই ওকে মেরেছিস্ ও আট আনা পয়সা চেয়েছিস্, আমরা শুনেছি ও দেখেছি তোর নামে রিপোর্ট করব।

এই কথা বলিবামাত্র পাহারাওয়ালা কুপিত হইয়া অতি অভদ্র ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দিতে লাগিল এবং বেচরা গাড়োয়ানকে দ্বিগুণ বলের সহিত লাঠির গুঁতো মারিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন হরেন্দ্র পাহারাওয়ালার হাতখানা ধরিলেন। যেই হাতখানা ধরা অমনি বাছাধন একেবারে কবু। "মরণাপন্ন সিং" "যাই যাই সিং" "গংগাযাত্রা সিং" "এখন তখন সিং" প্রভৃতি বেংগল পুলিসের পাহারাওয়ালাগণ সকলের সুপরিচিত। এই মহাপ্রভুরা স্বদেশে

থাকিতে, ব্রাহ্মণ হইলে রেলওয়ে ষ্টেশনে পানিপাঁড়ে হইয়া থাকেন। অন্য জাতি হইলে মাসিক ৫ টাকা বেতনে এমন কাজ নাই যে করেন না। সেদেশে ইঁহাদের এমনি অবস্থা যে অধিকাংশ দিন এক মুঠি ছাতু অথবা দুটা কাঁচা শসা কি কাঁচা মূলা খাইয়া দিন কাটান। এদেশে আসিবার সময় কোমরে দড়ি ও লোটা বাঁধিয়া মস্ত মস্ত নাগরা জুতা পায়ে দিয়া মস্ মস্ করিয়া সমুদয় ট্রুঙ্ক রোডটি মাড়াইয়া আসেন। ফিরিবার সময় প্লীহা যকৃৎ ও চক্ষের ক্ষীণজ্যোতি লইয়া জ্ঞাতি কুটুম্বের স্কন্ধে হাত দিয়া ফিরিয়া যান। রেল ইঁহাদের জন্য নহে। অথচ ইঁহারাই যখন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন ও বেঙ্গল পুলিসের পরিচ্ছদ লাভ করিয়া পাহারা-ওয়ালা অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইঁহাদের বিক্রম সিংহের অধিক হয়! তখন ছোট লাটও ইঁহাদের নিকট লাগেন না। তখন ইঁহাদের ঔদ্ধত্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। তখন এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি অবজ্ঞা সাংক্রামিক রোগের ন্যায় ঊর্ধ্বতন ইংরাজ কর্মচারীর সংস্রবে ইঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে; এবং ধনীদরিদ্র সকলকেই অপমান করিতে ছাড়েন না। যাহা হউক অদ্যকার পাহারাওয়ালাটি বড় শক্ত হাতেই পড়িয়াছে। হরেন্দ্র তাহার হাতখানি ধরিয়া লাঠিগাছটি কাড়িয়া লইয়া নিকটস্থ একটি বালককে রাখিবার জন্য দিলেন। ইতিমধ্যে গাড়োয়ান গাড়ী লইয়া ৮।১০ হাত অগ্রসর হইয়া গেল। তিনি হাত ছাড়িবামাত্র পাহারাওয়ালা তাঁহাকে কতকগুলি কটূক্তি করিয়া আবার গাড়োয়ানকে মারিবার জন্য দৌড়িল। হরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "তুমি ওকে মের না থানায় নিয়ে চল, সেখানে ইনেসপেক্টার সাহেব যা বিচার করেন তাই হবে।" এইরূপ গোলমাল হইতেছে ইতিমধ্যে পুলিসের জমাদার অপর কয়েকজন পাহারাওয়ালার সহিত আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আসিয়া যে ছেলেটির হাতে পাহারাওয়ালার লাঠি ছিল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল; হরেন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ও লাঠি আমি কেড়ে নিয়েছি গ্রেপ্তার করতে হয় আমাকে কর, ও কিছু করে নাই।" তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। পূর্বোক্ত বালকটিকে টানিয়া থানায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হরেন্দ্র বলিলেন, "খবরদার গায়ে হাত দিও না, আমরা আপনারাই থানায় যাচ্চি। ভদ্র-লোকের ছেলেকে নিয়ে যদি টানাটানি কর তা হলে একটা দাঙ্গা হবে বলছি।" জমাদার দেখিল যুবকদের দলটি বড় কম নয়; সকলগুলিই বলবান এবং অনেকের হাতেই ব্যাট ও ক্রিকেটের কাঠি আছে, যদি দাঙ্গা বাঁধে, ব্যাপারটা বড় গুরুতর দাঁড়াইবে। সুতরাং ছেলেটির হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "তবে থানায় চল।" হরেন্দ্র সদলে থানায় চলিলেন। পূর্বোক্ত পাহারা-ওয়ালাটা গাড়োয়ানকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থানায় চলিল। পুলিস কম্পাউণ্ডের কাছে গিয়া হরেন্দ্র সঙ্গীদিগকে বলিলেন,—"তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি ইনেস্‌পেক্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে আনি।" এই বলিয়া ভিতরে গেলেন। ইনেস্-পেক্টার সাহেব একজন নবাগত ব্যক্তি। কোথা হইতে যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তা বলা যায় না। হয়ত কোনও রেলওয়ের ড্রাইভার কি গার্ড ছিলেন, অথবা হয়ত রাজপুতনার পাষাণের খনিতে পাথর কাটিয়া আপনার উদরান্নের সংস্থান করিতেন। হয়ত অতিরিক্ত সুরাপান নিবন্ধন সে কাজটি হারাইয়া পুলিস ইনেস্‌পেক্টার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পদের এমনি মহিমা যে ইতিমধ্যে তাঁহার মেজাজকে সম্পূর্ণ গরম করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি জমাদারের ও পাহারা-ওয়ালার বর্ণিত বিবরণ শুনিয়া আর হরেন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাকে ইংরাজি-ওয়ালা বাবু দেখিয়া হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন ও নানাপ্রকার অবজ্ঞাসূচক কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত হরেন্দ্রের ইংরাজীতে যে কথোপকথন হইল তাহার মর্ম এই।

হরেন্দ্র। যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমার হয়েছে; আমি পাহারাওয়ালার লাঠি কেড়ে নিয়েছিলাম; আমি ওকে রাখতে দিয়েছিলাম; হাজতে রাখতে হয় আমাকে রাখুন, ওকে ছেড়ে দিন।

ইনেসপেক্টার। আমরা তা বুঝি নে, যার হাতে পাহারাওয়ালার লাঠি পাওয়া গেছে, তাকেই জানি।

হরেন্দ্র। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন? আমি বলছি ও ছোকরা আমার দলের লোকও নয়; পথে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছিল, এবং আমি লাঠিগাছটা রাখতে দেওয়াতেই রেখেছিল। ও আমার ছাত্র, গুরুর কথা কি করে অগ্রাহ্য করবে?

ইনেসপেক্টার। তোমরা সব বদমায়েস, তোমরা লাঠিসোঁটা নিয়ে পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গা করতে এসেছ।

হরেন্দ্র। মিথ্যে কথা! আমরা কখনই দাঙ্গা করতে আসি নাই; গিয়ে দেখুন ওরা পুলিসের কম্পাউণ্ডেও ঢোকে নাই, সব বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

ইনেসপেক্টার। আমি তোমাদের সকলকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়ে দিচ্চি।

হরেন্দ্র। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। আপনার ভয় দেখানকে আমি গ্রাহ্য করি না। পুলিসের অভদ্র লোকদের ব্যবহার আমার বেশ জানা আছে।

ইনেসপেক্টার সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া যত লোকের হাতে ব্যাট ও ক্রিকেটের কাঠি আছে, তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

হরেন্দ্র। ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে অপমান করতে বারণ করুন; আমিই সকলকে ডেকে আনচি।

এই বলিয়া যে ছয়জনের হাতে ব্যাট ও ক্রিকেটের কাঠি ছিল তাহাদিগকে ডাকিয়া থানার মধ্যে আনিলেন।

ইনেসপেক্টার। তোমাদের সকলকে আজকার রাত্রের মত হাজতে থাকতে হবে।

হরেন্দ্র। কেন, অপরাধ?

ইনেসপেক্টার। তোমরা আসামী ছিনিয়ে নিয়েছ; পুলিসকে নিজ কর্তব্য সাধনে বাধা দিয়েছ এবং লাঠি সোঁটা নিয়ে পুলিসের বাড়ী চড়াও হয়ে দাঙ্গা করতে এসেছ।

হরেন্দ্র। মনে করবেন না যে আমরা আইন কানুন জানি না। আচ্ছা আমাদের হাজতে রাখুন, এক রাত্রে আমরা মরে যাব না, কিন্তু বলছি, শুনুন, এরা সকলেই ভদ্র ঘরের ছেলে, অনেকে বড় লোকের ছেলে, মনে করবেন না সহজে নিস্কৃতি পাবেন। পুলিসের অমন অনেক রাঙ্গামুখ আমরা দেখেছি।

এই কথাগুলির বিপরীত ফল ফলিল। ইনেসপেক্টার যখন শুনিল ইহাদের অনেকে বড় ঘরের ছেলে, তখন মনে মনে ভাবিল, ভালই হইয়াছে, জালে কাতলা পড়িয়াছে। একটু টানাটানি করিলে কিছু দক্ষিণা মিলিতে পারে। তখন সে আরও ভারি হইয়া বসিল; বলিল,—“বিনা জামিনে কোনক্রমেই ছাড়া হবে না।” হরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, এতগুলি বালককে মুক্ত করিবার উপায় কি? যাহাদের অভিভাবকদের অবস্থা ভাল, তাহাদের জামিন ত শীঘ্রই জুটিবে; কিন্তু যাহারা দরিদ্র ও অসহায় তাহাদের কি হইবে? এই চিন্তাতে তাঁহার নিজের চিন্তা মনে আসিল না। একবার ভাবিলেন, রায় মহাশয়কে সংবাদ দিবেন, আবার সে উপকারটাও লইবার ইচ্ছা হইল না। কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে পরামর্শের জন্য মহেন্দ্র বাবুকে ডাকা স্থির করিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে একটি বালককে ডাকিয়া সকল কথা বলিয়া মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বালকটি মহেন্দ্রনাথের বাসাতে গিয়া শুনিল তিনি রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন। সুতরাং সেখানে গেল।

এদিকে রায় মহাশয় বসিয়া মহেন্দ্রনাথের সহিত বিশ্রাম্ভালাপ করিতেছেন। নয়নতারা পিতার চেয়ারের পশ্চাতে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছেন। বালকটি সেখানে গিয়া মহেন্দ্রনাথকে বলিল, “হরেনবাবুকে ও তাঁর স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেদিগকে থানাতে কয়েদ করেছে, তিনি আপনাকে ডাকছেন।”

রায় মহাশয়। হরেনকে কয়েক করেছে !!

বালক। আজ্ঞে হাঁ।

এই বলিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রায় মহাশয় তৎক্ষণাৎ গাড়ী যুতাইয়া, মহেন্দ্র বাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

নয়নতারার যে কি উদ্বেগ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি আর উপরে গেলেন না; কোনও কাজে মন দিতে পারিলেন না; কেবল একবার ভিতর একবার বাহির করিতে লাগিলেন, কতক্ষণে পিতার গাড়ী ফিরিয়া আসে। এক একবার গাড়ী বারাণ্ডার নিকট যান, উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে থাকেন, গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা যায় কিনা, আবার পিতার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া কোচখানির উপরে একটু শয়ন করেন। এইরূপে এক এক ঘণ্টা এক এক যুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

ওদিকে রায় মহাশয় থানার দ্বারে গিয়া দেখেন আরও দুই একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। আবদ্ধ যুবকদিগের কাহারও কাহারও অভিভাবক আসিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ থানার মধ্যে গিয়া ইনেসপেক্টারের সহিত কথা কহিতেছেন; অপরেরা গাড়ীতেই বসিয়া আছেন।

রায় মহাশয় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে, তাঁহারাও অবতরণ করিলেন, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কথা হইতে লাগিল।

প্রথম ব্যক্তি। মশাই বলেন কি, ইনেসপেক্টারটা বড় ছোটলোক, বড়ই মুখ খারাপ! ভাবে বোধ হয় কিছু চায়, তাহলেই ছেলেগুলোকে ছেড়ে দিতে পারে।

রায় মহাশয়। আমি বিবরণটা যা শুনেছি, তাতে ত ছেলেদের কোনও দোষ নাই। ঘুষ চাচ্ছিল আর এক বেচারা গাড়োয়ানকে মারছিল বলে হরেন পাহারাওয়ালার লাঠি কেড়ে নিয়েছে। এরা ত কেউ কিছু করেনি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। দেখুন না ব্যাপারখানা, এরা দিনকে রাত করতে পারে, মানুষকে অকারণ কিরূপ ক্লেশ দেয়!

রায় মহাশয়। আপনারা কি করবেন ভাবছেন?

প্রথম ব্যক্তি। আমরা মনে করেছি কিছু দিয়ে ছেলেগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাই।

রায় মহাশয়। তা করবেন না; ঐরূপ করেই ত লোকে ওদের অধর্মে লিপ্ত করে ও আস্পর্দ্ধা বাড়ায়। আপনারা যে কয়টির জামিন হতে পারেন হোন। বাকি ছেলের জামিন আমি হচ্ছি।

প্রথম ব্যক্তি। জানেন ত মশাই পুলিসের কাণ্ড, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করতে ছাড়বে না। তারপর কি আদালত আর ঘর করে বেড়ান যাবে?

রায় মহাশয়। মকদ্দমা করে করবে কি? আচ্ছা মকদ্দমার বন্দোবস্ত করবার ভার আমার, আপনারা ঘুষ টুষ দেবেন না; তার ভিতর আমি নেই।

ইতিমধ্যে যে দুটি বাবু ভিতরে ছিলেন, বাহিরে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন, মশাই, সাতজনের জন্য সাত কুড়ি ১৪০ টাকা চাচ্চে।

রায় মহাশয়। ছি! ছি! ও কথায় কর্ণপাতও করবেন না। আচ্ছা ওরা কি করে করুক; আপনারা জামিন হয়ে ছাড়াতে না চান, আমি সকলকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্চি।

অন্যেরা। আমাদের ছেলে আমরা কেন ছাড়াব না?

পরে তাঁহারা থানার ভিতরে গেলেন। ইনেসপেক্টারটা অবজ্ঞাসূচক ভাষায় তাঁহাদের অপমান করিতে ছাড়িল না। তাঁহারা সমুদয় সহ্য করিলেন। তৎপরে জামিনে ছেলেদিগকে খালাস করিবার জন্য আরও কোনও কোনও স্থানে যাইতে হইল। এইসকল করিতে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। অবশেষে রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় ছেলেদিগকে নিষ্কৃতি দিয়া ঘরে আসিলেন।

যথাসময়ে আদালতে পুলিসের পক্ষ হইতে মকদ্দমা উঠিল। দুইটি মকদ্দমা; প্রথমটি সেই নিরাপরাধ বালকটির নামে; অভিযোগ এই যে সে পুলিসকে স্বীয় কর্তব্যসাধনে বাধা দিয়াছে; আইনবিরুদ্ধ জটলাতে সঙ্গী হইয়াছে; ও পাহারাওয়ালার লাঠি কাড়িয়া লইয়াছে। দ্বিতীয় মকদ্দমাটি সমগ্র দলটির নামে; অভিযোগ— আসামী ছিনাইয়া লইয়াছে, আইন বিরুদ্ধ জটলা করিয়াছে ও পুলিসের বাড়ী চড়াও হইয়া দাঙ্গা করিতে আসিয়াছে।

রায় মহাশয় পুলিসের এই অত্যাচারের জন্য এতই চটিয়া গিয়াছিলেন যে, নিজেই মকদ্দমার সমগ্র ব্যয় দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র গৌরীপদ বাবুকে ডাকাইয়া মকদ্দমার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন; এবং সুরেশচন্দ্রকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

চুঁচড়া সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেরই মুখে এই কথা, "পুলিসের সহিত কালীপদ রায়ের তুমুল মামলা বাঁধিয়াছে।" কেহ বলে, "ছেলেরা নির্দোষ", কেহ বলে, "নির্দোষ হলে অমনি মিছে মিছে একটা মামলা ওঠে? স্পোর্টিং ক্লাবের ছেলেরা নিশ্চয় দাঙ্গা করতে গিয়েছিল; গায়ে জোর থাকলে জোরটা দেখান চাই ত।" কেহ বলে, "ছোঁড়াগুলো লেখাপড়া ছেড়ে কেবল হৈ হৈ করে বেড়ায়; এবার খুব জব্দ হয়েছে।" কেহ বলে, "কালীপদ রায়ের খেয়ে দেয়ে কর্ম নেই, ছোড়াগুলোর জন্যে ঘরের পয়সা ব্যয় করতে যাচ্ছে।"

এইরূপ নানা সমালোচনার মধ্যে মকদ্দমার দিন আসিয়া পড়িল। ৫ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম মকদ্দমা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাসে উঠিল। কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার পি, বার্নার্জ্জি আসিলেন। মকদ্দমা তিন দিন চলিল। তাঁহার মনের অভিপ্রায় ছিল যে, প্রতিদিন রেলযোগে যাতায়াত করিবেন, কিন্তু প্রথম দিন মকদ্দমা শুনানির পর দুই তিন ঘণ্টা রায় মহাশয়ের ভবনে যাপন করিয়া ইঁহাদের সৌজন্যে ও আতিথ্যে এতই প্রীত হইয়া গেলেন যে পরদিন আদালত ভাঙ্গিলে যখন সুরেশচন্দ্র তাঁহাদের ভবনে সেদিন রাত্রে ও তৎপর-দিন আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন আর "না" বলিলেন না।

নয়নতারা কায়মন-প্রাণে এই নবাগত অতিথির পরিচর্যাতে নিযুক্ত হইলেন। মানুষটি দেখিতে শুনিতে যেমন ,ভদ্রতাতে তেমনি, লেখাপড়া বুদ্ধি বিদ্যাতেও তেমনি। বর্ণটি উজ্জ্বল শ্যাম প্রশস্ত ললাট; চক্ষু দুটি বিশাল ও উজ্জ্বল; চক্ষের পক্ষগুলিতে কিছু বিশেষত্ব আছে; সেগুলি ঘন নীল, তাহাতে কি এক প্রকার অবর্ণনীয় আকর্ষণ আছে! শ্মশ্রুবিহীন ও অতি পরিষ্কার ক্ষৌরবিধৌত মুখ; ভ্রূ ও গোঁপ তুলিতে আঁকা; সমগ্র মুখখানির ভাব এইরূপ যে দেখিলেই বোধহয় মানুষটি অতিশয় মেশক ও পরচ্ছন্দানুবর্তী এবং ভালবাসা কাড়িয়া লন। মানুষ কিরূপ মুখখানা লইয়া মানুষের সঙ্গে মিশে তাহার উপরে অনেকটা নির্ভর করে। হাসি হাসি মুখখানা লইয়া যেখানে যাও, যেন সহজে কার্যোদ্ধারটা হয়। মিষ্টার বার্নার্জির মুখখানা সেই রকম। বিশেষ সে মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে রমণীর হৃদয়কে সহজেই আকর্ষণ করে। সচরাচর যেরূপ ব্যারিষ্টার দেখিতে পাওয়া যায়, বার্নার্জ্জি সাহেব সে শ্রেণীর ব্যারিষ্টার নহেন। লেখাপড়া জানা লোক; বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি কৃষ্ণনগর কালেজে ইংরাজী সাহিত্যের প্রোফেসার ছিলেন। লোকটি কাব্যের রসগ্রাহী; ইংরাজী ও বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ; গাইতে বাজাইতেও সুনিপুণ; বাঙ্গলা লিখিতে ও বলিতে ভালবাসেন; এমনি সুরসিক যে, তাঁহার সঙ্গে সকলে আহারে বসিতে চয়; অনর্গল গল্পে হাসাইয়া নাড়ীতে বেদনা করিয়া দেন। অথচ গম্ভীর বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, সমুচিত গাম্ভীর্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করেন। আহারের সময় এইরূপে নয়নতারার পক্ষ হইয়া সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তুমুল তর্ক ও ঝগড়া করিয়াছেন। এজন্য নয়নতারার মনটা গলিয়া গিয়াছে। সৌদামিনী বলিয়াছেন,—"দিদি! কি সুন্দর মানুষ।" ফলতঃ এই রায় পরিবারের সহিত তাঁহার এমনি মিশ খাইল, যেন তিনি ইঁহাদেরই লোক। যেন খণ্ডে আবদ্ধ

জমিয়া গেল। ছেলে বুড়ো সকলেই যেন তাঁহাকে আপনার লোক করিয়া লইল। এমনকি রমণী পর্যন্ত তাঁহাকে তিন দিনে আপনার জ্ঞান করিল।

নয়নতারা ও সৌদামিনী সচরাচর বিলাত-ফেরত অতিথিদিগের সহিত মিশিবার সময় একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু বার্নার্জির গুণে সেটা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অসংকোচে মিশিলেন। তাহাতে এই হইল যে, বার্নার্জি সাহেবের মনও এই রায় পরিবারের মহিলাদের অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মানব-চরিত্রের গূঢ় রহস্য এই যে, মানুষ আপনাকে জানাইবার জন্য যাহা বলে যাহা করে, তদ্বারা তাহাকে জানা যায় না, কিন্তু যখন সে আপনাকে জানাইতে চায় না, তখনই তাহাকে জানা যায়। দাবা খেলার চাল দেখার ন্যায় মানুষের পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধের উপর দিয়া তাহার যে আচরণ দেখ তদ্বারাই আসল মানুষটা ধরিতে পার। কারণ তোমার প্রকৃতির মধ্যে যাহা আছে, তাহাই ত তোমার কার্যে ফুটিয়া বাহির হয়, তুমি যখন মানুষের চক্ষু ভুলিয়া কাজ কর, তখন সেই জিনিসটা ধরা যায়। বার্নার্জি সাহেব নয়নতারা ও সৌদামিনীর অসংকোচ ভাবের মধ্যে দেখিলেন যে,পবিত্র-চিত্ততাতে ইহারা শিশু। এমন পাষণ্ড নাই যে ইহাদের সরলতা ও পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হয় না। দেখিয়া মনটা এতই মুগ্ধ হইল যে, ইহাদের বাড়ীটা ছাড়িয়া যেন আর যাইতে ইচ্ছা করে না।

ওদিকে আদালতে বার্নার্জি সাহেবের ক্ষুরধার সমান বুদ্ধি দেখিয়া চুঁচড়ার লোকের তাক লাগিয়া গিয়াছে। পুলিস মিথ্যার জাল রচনা করিতে ত্রুটি করে নাই। চার পাঁচজন সাক্ষী খাড়া করিয়াছে, যাহারা সপথপূর্বক বলিল যে, তাহারা সেই বালকটিকে পাহারাওয়ালার লাঠি কাড়িয়া লইতে ও তাহার কার্যে বাধা দিতে দেখিয়াছে; কেহ কেহ বলিল, যে লাঠি তাহার হস্তে পাওয়া গিয়াছে; দুই তিনজন বলিল, লাঠি চাওয়াতে দিতে চায় নাই, পরে জোরে তাহার হাত হইতে লওয়া হইয়াছে। আনুষঙ্গিক আরও অনেক কথা বলিল।

বার্নার্জি সাহেবের জেরাতে এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী পেঁজা তুলার মত বাতাসে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি দুই দিনে ইহাদিগকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া ফেলিলেন। এক একটা সাক্ষী ভাঙিয়া যায়, আর তিনি হাসিয়া বলেন, আর তোমাদের সাক্ষী আছে? শেষে বিচারপতি জয়েণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের এই সকল মিথ্যা সাক্ষ্য লওয়া এতই বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি দু'দিনের পর পুলিস পক্ষের সাক্ষ্য লওয়া বন্ধ করিলেন। তৃতীয় দিন আসামীর পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী। সেদিন আর অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইল না। দুই একটি বালকের সাক্ষ্যের পর এক হরেন্দ্রের সাক্ষ্যে সমুদায় মকদ্দমাটা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। তিনি কিছুই গোপন করিলেন না; নিজে যাহা কিছু করিয়াছেন ও যাহা কিছু বলিয়াছেন, সমুদায় বর্ণন করিলেন। বিচারপতির আর মকদ্দমাটি বুঝিতে বাকি রহিল না। আর অধিক সাক্ষীরও প্রয়োজন হইল না। তিনি বালকটিকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই কয়দিন আদালতে লোকে লোকারণ্য ছিল। কি হয় কি হয় জানিবার জন্য এত লোক ঝুঁকিয়াছিল যে আদালতে না ধরিয়া রাস্তা পর্যন্ত লোক দাঁড়াইয়াছিল। বিশেষতঃ শেষ দিন শনিবার ২টার সময় স্কুল-কালেজের ছুটি হওয়াতে স্কুল-কালেজের ছেলেতে আদালত ও বাহিরের মাঠ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন সংবাদ বাহির হইল যে ছেলেদের জয় হইয়াছে, তখন কালেজের ছেলেরা আদালতের ভিতরে ও বাহিরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। পরে যখন মিস্টার বার্নার্জি আদালত হইতে বাহির হইলেন, তখন তাহারা "হিপ্ হিপ্ হুরে" করিয়া চেঁচাইতে লাগিল ও তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বার্নার্জি সাহেব আর কলিকাতায় গেলেন না। রায় মহাশয়ও সুরেন্দ্রের অনুরোধে সে রাত্রি ও তৎপর দিন চুঁচড়াতে যাপন করিবেন বলিয়া থাকিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় মকদ্দমার বিষয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

বার্নার্জি। পুলিসের মিথ্যা মকদ্দমা সাজান নূতন নয়, সর্বদা দেখে আসছি, কিন্তু এ মকদ্দমাতে এসে একটা বড় সুখ পেয়েছি।

রায় মহাশয়। কি সুখ ?

বার্নার্জি। ঐ যে হরেন্দ্র চাটুয্যে নামে হুগলী কালেজের মাস্টারটি সাক্ষ্য দিলেন, আমি সাক্ষীর মুখে এমন পরিষ্কার সত্য সাক্ষ্য কখনও শুনি নাই। বিশেষতঃ শুনলাম তাঁদের নামে নাকি আর এক মকদ্দমা ঝুলছে, নিজে অকুতোভয়ে যা স্বীকার করলেন তাতে সে মকদ্দমাতে নিজেরই অনিষ্ট হবার কথা। একেই বলে সত্যবাদী লোক।

বলিয়াই ইংরাজীতে বলিলেন, "and what struck me most was the man's noble and manly bearing—অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা আমার মনে যেটা লেগেছে, সেটা এই লোকটির ধীর ও মহৎ জনোচিত ধরণ ধারণ।"

রায়মহাশয়। ও একটা অসাধারণ ছেলে। ওর সকল কথা আপনি এখনও শোনেন নাই। সেই কাগজে যে একটি স্ত্রীলোককে ঝড়ের মধ্যে গংগার জল হতে বাঁচাবার কথা পড়েছেন, সে ঐ ছেলেরই কাজ।

বার্নার্জি। বটে !

রায়মহাশয়। কেবল তা নয়, এদিকে লেখাপড়াতে বড় কম নয়; বি, এ পাশ করেছে, এবারে এম, এ দেবে। এদিকে নিজে ফ্রেঞ্চ ও ল্যাটিন পড়ছে; বোটানিতে পরিপক্ব, আর এখানে এমন ভাল কাজ নেই, যার সংগে ওর যোগ নেই; এখানে স্পোর্টিং ক্লাব আছে, তার কাপ্তেন; পাবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি; সুরাপান নিবারণী সভার সেক্রেটারি; ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

বার্নার্জি। মানুষটার কপালখানা দেখলেই বোধহয় অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক; মানুষটিকে দেখে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছে।

রায়মহাশয়। সে ত আমাদের বাড়ীর ছেলের মত; আদালত থেকে এসে বোধহয় বিশ্রাম করছে, তাই আজ আর আসে নাই; নতুবা এখানেই দেখতে পেতেন। কাল ত আপনি আছেন কাল দেখা হবে।

নয়নতারা এতক্ষণ দুই কর্ণ ভরিয়া এই কথোপকথন পান করিতেছিলেন; কিন্তু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বড়ই ইচ্ছা হইল যে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া মিস্টার বার্নার্জির সহিত আলাপ করিয়া দেন। তাই তাড়াতাড়ি চাকরের হাতে চিঠি পাঠাইবার জন্য উঠিয়া গেলেন। চিঠির মর্ম এই—"আপনি কি এখন একবার আসিতে পারেন ? মিস্টার বার্নার্জি আদালতে আপনাকে দেখিয়া ও আপনার বিষয় বাবার মুখে শুনিয়া, আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক।"

যথাসময়ে উত্তর আসিল, "জানেন ত রাত্রিটা আমি পাঠ, আত্ম-চিন্তা ও উপাসনাদির জন্য রেখেছি; সমস্ত দিন অন্য কাজ করি, রাত্রিটা এই সকল কাজের জন্য আছে। বিশেষতঃ এবার এম, এ টা দিতে হবে। তিনি ত কাল আছেন, কাল প্রাতে আহারের পর যখন যাব সাক্ষাৎ হবে।"

নয়নতারা পত্রখানি পাইয়া মনে মনে বলিলেন, "তিনি কি বড় লোকের সংগে আলাপ করতে ছোটবার লোক। দশ হাত দূরে না গেলে বাঁচি। বড় লোকের ছায়া মাড়াব না, কি জানি এই একটা ভাব। বোধহয় নিজে দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম করবার সময় সংসারের বড় লোকদের হৃদয়হীনতা দেখে দেখে এমনি হয়েছেন।

পরদিন স্থির হইল যে বোটে করিয়া মিস্টার বার্নার্জিকে লইয়া সপরিবারে বেড়াইতে হইবে। প্রাতঃকালের আহার শেষ হইলেই নয়নতারা অস্থির হইয়া উঠিলেন, হরেন্দ্র কখন আসিবেন। যদি তিনি বিলম্ব করেন, যদি বোটে চলিয়া গেলে আসেন। আর পত্র লিখিতে সাহস করিলেন না; যে বাঁকা মানুষ যদিও বা আসিতেন হয়ত অতিরিক্ত বাগ্রতা দেখাইলে

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই রায় পরিবারের গৃহিণী কে? জননী না নয়নতারা? জননী নামে গৃহিণী; কিন্তু গৃহস্থালির সমুদয় কাজকর্ম নয়নতারাই দেখিয়া থাকেন। অল্পে অল্পে সংসারের ভারটা তাঁহার উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। জননী সকল কাজেই নয়নতারাকে ডাকেন, "নয়নতারা, বল্ দেখি এ বিষয়ে কি করা যায়?" তিনি যে পরামর্শ দেন, তাহা এমনি পাকা বোধ হয়, এবং তাহাতে এমন বিজ্ঞতা থাকে, যে সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শের উপরে নির্ভর করা পিতা-মাতার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে জননী গৃহের কর্তার ন্যায় পেন্সনার হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার হস্তে টাকার বাক্স ও সিন্দুকগুলির চাবি থাকে মাত্র, সংসারের সমুদয় বিলি ব্যবস্থা করা নয়নতারার ভার। সকল সময়েই জননী ভৃত্যদিগকে বলিয়া থাকেন,—"যা নয়নতারাকে জিজ্ঞাসা করে আয়।" সুতরাং এ গৃহের দাস-দাসীও জানে যে ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যাই গৃহের কর্ত্রী। তিনিও সময়ে সময়ে জননীর কণ্ঠালিঙ্গণপূর্বক মুখচুম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন, "মার্মণি! তুমি বয়েস কালে অনেক খেটেছ এখন পায়ের উপরে পা দিয়ে বসে থাকবে আমরা খাটব।" ফলতঃ নয়নতারা ও নন্দরাণী সংসারের সকল কাজ দেখেন, জননী অনেকটা বিশ্রাম-সুখ ভোগ করেন। ইহাতে একটা লাভ এই হইয়াছে যে তিনি কর্তাকে দেখিবার অনেকটা সময় পান। বাড়ী ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার দিকে নয়নতারার বিশেষ দৃষ্টি। এটা তাঁর একটা বাতিক বলিলেই হয়। ঘরগুলির মেঝে ঝক্ ঝক্ করিবে, দেয়ালে কেহ থুথু ফেলিতে পারিবে না, আবর্জনা কেহ যেখানে সেখানে ফেলিতে পারিবে না, এসব বিষয়ে এমনি শাসন, যে বাড়ীর ছোট শিশুটি পর্যন্ত যেন ইহা বোঝে ও সেইরূপ চলিয়া থাকে। বাড়ীর শয়ন ঘর, পাকশালা, উঠান, নর্দমা যেদিকে তাকাইবে, চক্ষের পীড়াদায়ক কিছু দেখিতে
শয়ন ঘর, পাকশালা, উঠান, নর্দমা যেদিকে তাকাইবে, চক্ষের পীড়াদায়ক কিছু দেখিতে
পাইবে না। এমন কি ভবনসংলগ্ন উদ্যানটির প্রত্যেক বৃক্ষটির প্রতিও তার দৃষ্টি। উদ্যানটি এমন সুরুচি সহকারে রক্ষিত যে দেখে সেই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। নয়নতারা নিজে এক মুহূর্তকাল আলস্যে যাপন করেন না; দাস-দাসীদিগকেও আলস্যে যাপন করিতে দেন না। এমনি ব্যবস্থার গুণ যে তাহাদের বিশ্রামের সময় ব্যতীত সমুদায় সময় তাহারা কিছু না কিছু করিতেছে। ইহার উপরে জনক জননীর সেবা। সে বিষয়ে তাঁহার সর্বদা মনোযোগ। তাঁহাদের আহারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা, পিতা আহারান্তে শয়ন করিলে তাঁহার মাথায় হাত বুলান, খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনান, তাঁহার চিঠিপত্র লিখিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করা, এসকল আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত কাজ একজন মানুষে কিরূপে করিতে পারে? উত্তর এই ব্যবস্থার গুণে সকলি হয়। সময় ভাগ করিয়া যথাসময়ে কাজগুলি করিবার অভ্যাস একবার দাঁড় করাইয়া লইলে, তৎপরে সমুদয় সহজ বোধ হইতে থাকে। এ সংসারে দেখি দশটা কাজ যে যথাসময়ে ও যথারীতিতে করিতে পারে, সে আর দুইটা কাজও করিতে পারে; যার কাজ করিবার অভ্যাস নাই, তাহার দ্বারা দুইটা কাজও ভাল হয় না। নয়নতারা এই সমুদায় কাজ প্রতি মুহূর্তে করিতেছেন, অথচ পরিবারস্থ লোকে বুঝিতেও পারিতেছে না। ইহার মধ্যে হাসির সময় হাসি, গল্পের সময় গল্প, সকলি চলিতেছে।

এইরূপে সমস্ত দিন তাঁহাকে কিরূপ শ্রম করিতে হয় তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ইহাও যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে! ইহার উপরে আবার মহেন্দ্রনাথের কন্যাটিকে আনিয়াছেন। তাহারও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। যত্নের গুণে তাহার গুলগুলি সারিয়া গিয়াছে; তাহার সেই চেহারা অল্প দিনের মধ্যে ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে; সুগোল টেঁপাটি হঠাৎ সারিবার নহে, তবে হস্ত পদে ও নিতম্বে মাংস লাগিতে আরম্ভ হইয়াছে।

যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই করিয়াছেন। সে এমন পোষ মানিয়াছে, যে আর বাড়ীতে যাইতে চায় না। নয়নতারা মনে করেন সেটা ভাল কথা নহে। তিনি প্রায় প্রতিদিন অহাকে কাপড়-চোপড় পরাইয়া, চাকরাণীর কোলে দিয়া স্বীয় জননীর নিকটে প্রেরণ করেন। সে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বলেন, "নেমক হারাম মেয়ে! যাদের ঘরে জন্মালে, যাদের দুধে মানুষ হলে, তাদের কাছে যেতে চাও না," এই বলিয়া পাঠাইয়া দেন।

অগ্রে সে তাঁহাকে মাসী বলিতে চায় নাই; এখন কখন কখনও মা বলে। মা বলিয়া ডাকিলেই তিনি কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলেন, "না মণি! আমি মা নই; মা সেই ঘরে আছেন; আমি মাসী।"

এই ত গেল নয়নতারার প্রতিদিনের কাজ, ইহার উপরে আর এক কাজ আসিতেছে। রায়-মহাশয়ের একজন পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু কয়েকদিন তাঁহার সঙ্গে যাপন করিবার জন্য আসিতেছেন। ইঁহার নাম মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার নিবাস কলিকাতা বাহির সিমলা। ইঁনি বহুদিন সদরওয়ালার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রায় তিন বৎসর হইল পেন্‌সন লইয়া কর্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তৎপরে প্রায় দুই বৎসর কাল শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য নানা স্থানে বাস করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন।

এই মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও রায়-মহাশয়ের অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের বড়, তথাপি দুইজনে পঠদ্দশায় এরূপ মিত্রতা ছিল, যে যোড়ের পায়রার ন্যায় দুইজনকে সর্বদাই এক-সঙ্গে দেখা যাইত। লোকে কালীপদ মণিলাল বৈ একা কালীপদ বা মণিলাল নাম করিত না। তৎপরে একজন রুড়কী চলিয়া গেলেন; আর একজন কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুন্সেফী কর্ম লইলেন। সেই পদে উঠিতে উঠিতে সদরওয়ালা পর্যন্ত হইয়াছিলেন। কর্ম করিবার সময়েও দুই বন্ধুতে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকবার পশ্চিমে গিয়া বন্ধুর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন; রায়-মহাশয়ও কলিকাতায় আসিয়া অনেক-বার বন্ধুর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। এক বৎসর পরে আবার বন্ধুদ্বয়ের সমাগম।

যে দিনের কথা বলিতেছি, তৎপর দিন প্রাতে মণিলালবাবুর আসিবার কথা। কর্তা অগ্রেই গৃহের কত্রী-দুহিতাকে তদনুরূপ আয়োজন করিবার আদেশ করিয়াছেন। পিতার বাল্যবন্ধু বহুদিন পরে আসিবেন, তাঁহাকে পাইয়া পিতা সুখী হইবেন, এই চিন্তাতেও নয়নতারার আনন্দ। তিনি ইহারই মধ্যে কখন যে সমুদয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতেও পারে নাই।

সন্ধ্যাকালে সকলে আহারে বসিলে এই কথাটা উপস্থিত হইল।

নয়নতারা। বাবা! এই যে মণিলালবাবু আসছেন, এঁর personal habits তুমি জান?

সুরেশ। কেমন! এইবারে যে বড় ইংরিজী বাঙ্গালা মিশিয়ে বলা হলো?

নয়নতারা। (হাসিয়া) ঠিক কথাটা যোগাল না বলে?

সুরেশ। আমরা যদি বলি ঠিক কথাটা যোগাল না, তা হলে ঠাট্টা করা হয় কেন?

নয়নতারা। তোমরা যে সাধ করে ইংরিজী বল, দেখাবার জন্যে ইংরিজী বল।

সুরেশ। উদারতা উদারতা করা হয়, কি উদারতা গো!

নয়নতারা। (হাসিয়া) আচ্ছা বাপু বাঙ্গলাতেই বলছি, "তাঁর জন্যে কি কি চাই বলতে পার?"

রায় মহাশয়। সে অতি সাদাসিদে মানুষ, কোনও উপদ্রব নেই, তবে অভ্যাসের মধ্যে তিনটে অভ্যাস আছে। প্রথম, স্নানের পূর্বে চাকরে আচ্ছা করে গা ডলে তেল মাখিয়ে দেয়; দ্বিতীয়, রাত্রে শোবার সময় চাকরে কিছুক্ষণ হাত পা টিপে দেয়; তৃতীয়, দুপুর বেলা আহারান্তে যখন একটু শয়ন করে তখন দেখেছি বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে মাথার চুল বেছে দেয়। এটা বোধহয় পেন্‌সন্ নেওয়ার পর হয়েছে।

সুরেশ। Then he seems to be a typical Bengali Babu, অর্থাৎ তবে ত বোধহয় ইনি একজন আসল বাঙ্গালি বাবু ?

নয়নতারা। ও কি দাদা! অমন করে কথা বলো না; যাঁরা বাপ মায়ের বন্ধু তাঁরাও বাপ মায়ের মতন। (পিতার প্রতি) এ সকলের বন্দোবস্ত ত অনায়াসেই হতে পারে। নবা চাকরকে একেবারে তাঁর জন্যেই রেখে দেব; তারপর সদু ও টুনী আছে।

সৌদামিনী। হাঁ তোমার মনের কথাটা বুঝেছি, আমাদের বুঝি মাথা টেপ্‌বার কাজে লাগাবে।

নয়নতারা। দোষ কি? বাবার চুল বেছে দিস্ নে?

টুনী। না, আমি পরের মাথা টিপ্‌তে পারব না।

নয়নতারা। চুপ্ কর্, উনি আবার মস্ত লেডী হয়ে বসলেন। বাবার বন্ধু আবার পর কিরে?

গৃহিণী। তা বৈকি, তোরা যেন একেবারে কি হয়েছিস, কি সভ্যতাই যে শিখেছিস। পান থেকে একটু চুন খস্‌লে যেন আর সে মানুষকে দেখতে প্যারিস নে।

সুরেশ। (নয়নতারার প্রতি) Helpless Madam! we are all your obedient subjects—অর্থাৎ ভদ্রে! নাচার! আমরা সকলেই আপনার অনুগত প্রজা।

নয়নতারা। দাদা! তুমিই ত মাটি কর, কোথায় ওদের শাসন করে দেবে, না নিজেই ওদের কথায় বাতাস দেও।

রায় মহাশয়। এত ঝগড়াঝাটি কেন, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে কোনও গোল হবে না।

এই কথোপকথনের পরদিন প্রাতেই বন্দ্যোপাধ্যায় আসিলেন। তিনি আসিবার পূর্বেই নয়নতারা তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঘরটিতে খাট, বিছানা, একটি কাঠের আলনা, আয়নাসমেত একটি টেবিল, চিরুণী, ব্রুস, বসিয়া লিখিবার জন্য একটি ছোট টেবল, স্নানের পূর্বে বসিয়া তৈলমর্দনের জন্য ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডাতে একখানি জলচৌকি, স্নানের ঘরে জল, তোয়ালে, তৈল প্রভৃতি ও খাটের পার্শ্বে একটি ছোট চৌকির উপরে একটি গুড়গুড়ি পর্যন্ত সমুদায় প্রস্তুত।

রায় মহাশয় প্রাতে উঠিয়া নৈহাটি ষ্টেশনে বন্ধুকে আনিতে গিয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নয়নতারার আদেশক্রমে নবা চাকর প্রস্তুত; সে আসবাবগুলি মুটের মাথা হইতে নামাইয়া অর্ধ দণ্ডের মধ্যে যেখানে যেটি রাখিলে ভাল হয় রাখিয়া দিল। দুই বন্ধুতে কিয়ৎক্ষণ বাহিরে উদ্যান প্রভৃতি দেখিয়া অবশেষে নির্দিষ্ট ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মণিলাল। কালীপদ! তোমার বাড়ীটি কি পরিষ্কার! এমন সাহেবিয়ানা আমি ভালবাসি। (গৃহে প্রবেশ করিয়া ও চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া) আমার জন্যে এই ঘর রেখেছ নাকি?

রায় মহাশয়। হাঁ, পছন্দ হয় ত?

মণিলাল। বাঃ কি নিখুঁত বন্দোবস্ত! এসব কার কাজ ভাই? তোমার গিন্নী ত খুব পরিপক্ক হয়ে উঠেছেন দেখছি। কৈ বেরিলিতে তোমার বাড়ীতে যখন দু'মাস ছিলাম, তখন এতটা ত দেখিনি।

রায় মহাশয়। কার কাজ তা ক্রমে জানবে। এখন বোসো, চাকর জুতো খুলে দিক, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, কাপড়-চোপড় ছাড়, আমি একটু পরেই আসছি।

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মণিবাবুর দেহটা কিঞ্চিৎ স্থূল। আর স্থূলতার বা অপরাধ কি? ভৃত্যের দ্বারা এত তৈল মর্দন ও হস্তপদ সংবাহন করাইলে স্থূলতা ত আপনিই আসিয়া পড়ে। একে স্থূল তাহাতে

গাঢ় শ্যামবর্ণ; তাঁহার মস্তকটি চিরদিনই দেহের সঙ্গে তুলনায় ছোট; তাহাতে আবার পেন্সন লওয়ার পর দেহটি, বিশেষতঃ কুক্ষিটি বৃহদায়তন হওয়াতে মস্তকটি আরও ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। নরকপাল-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ নিশ্চয় সেই মস্তকটির প্রতি অবজ্ঞার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবেন—এ মস্তকে সদরওয়ালার পদ পাইবার কথা নহে। কিন্তু এ জগতে অনেক ক্ষুদ্রায়তন মস্তকেও অনেক বড় বড় কাজ করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষুদ্রায়তন মস্তকটি বুঝিবা একটু অনিষ্টের কারণ হইল। রায় মহাশয়ের সন্তানগণ, পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিশেষতঃ হরেন্দ্রের, প্রশস্ত ললাট দেখিয়া অভ্যস্ত। ভয় হয়, বুঝিবা তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন মস্তকটি তাহাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

মণিবাবু পরিচ্ছদ পরিবর্তনপূর্বক তামাকু সেবন করিতে বসিবামাত্র রায় মহাশয় গৃহিণী ও নয়নতারাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত।

রায় মহাশয়। (গৃহিণীকে নির্দেশ করিয়া) ইঁহার পরিচয় আর কি দিব, ইঁহাকে ত জানই। (নয়নতারার স্কন্ধে হাত দিয়া) এই আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা নয়নতারা।

নয়নতারা নবাগত অতিথির পদে প্রণত হইলেন।

মণিলাল। (রায়-গৃহিণীর প্রতি) কেমন আছগো? কতদিন পরে দেখলাম, সেই বেরিলিতে দেখেছিলাম, সে প্রায় ১৪।১৫ বৎসর হলো। তোমার চেহারা অনেক বদলে গেছে। এখন তার চেয়ে মোটা হয়েছ।

রায় মহাশয়। সেটা উভয়তঃ। (সকলের হাস্য) তোমার দেহখানি ত কম নয়?

মণিলাল। (রায়-গৃহিণীর প্রতি) তোমার এই মেয়ে না তখন ৭।৮ বৎসরের ছিল?

রায়-গৃহিণী। হাঁ, ও তখন আট বছরের ছিল।

মণিলাল। তোমার আর সব ছেলেমেয়ে কোথায়?

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) দুটি বিলাতে আছে তা ত জান; তারপর অবশিষ্টগুলি এখন ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে আনা ভার; সময়ে দেখবে। (সকলের হাস্য)

গৃহিণী। আমি এখন কাজের বার হয়েছি; আমার এই বড় মেয়ের উপরেই সংসারের ভার, এই আপনাকে দেখবে শুনবে।

মণিলাল। এর মধ্যেই কাজের বার?

গৃহিণী। আর কি, বুড়ো হাবড়া হয়ে পড়লাম।

মণিলাল। কৈ আমি ত বুড়ো হাবড়ার মত কিছু দেখছি নে; আমার গিন্নীকে যদি দেখতে, তা হলে ভাবতে যে তোমার এখনও যৌবন কাল।

গৃহিণী। আহা তা আর হবে না, কি রকম শোকটা তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছে।

মণিলাল। ঐটে যা বলেছ; এ বিষয়ে তাঁর চেয়ে তোমার ভাগ্য ভাল; যেগুলিকে পেটে ধরেছ, ঈশ্বর-প্রসাদে সেগুলি সব বেঁচে আছে।

গৃহিণী। সে বিষয়ে ঈশ্বর আমাকে দয়া করেছেন।

রায় মহাশয়। কোন্ বিষয়ে করেননি।

এই বলিয়া রায় মহাশয় ও গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

নয়নতারা। প্রাতে কি আপনার কিছু খাওয়ার অভ্যাস আছে?

মণিলাল। হাঁ, একটু চা খেয়ে থাকি।

নয়নতারা। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। (গমনোদ্যত)

মণিলাল। আচ্ছা চা হবে এখন, তুমি একটু বসো।

নয়নতারা। নব! বাবুর জন্যে চা আন্‌গে ত। (উপবেশন)

মণিলাল। তোমার আর এক বোন আছে না? তাকে দু'তিন বছরের মেয়ে দেখে এসেছিলাম।

নয়নতারা। সেটির পর আর একটি ভাই ও আর একটি বোন হয়েছে।

মণিলাল। তোমার বিবাহ হয়নি—না?

নয়নতারার কান লাল হইয়া গেল। তিনি পুরুষের মুখে এমন প্রশ্ন বড় একটা শুনিতে পান না। কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া সলজ্জভাবে—"না"।

মণিলাল। কেন, এত বয়স পর্যন্ত তোমার বাপ মা যে বিবাহ দেন নাই?

নয়নতারা। আমার বাবা মা বাল্যকালে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে ভালবাসেন না।

মণিলাল দেখিলেন উত্তরগুলি দিতে মেয়েটির কান লাল হইয়া যাইতেছে। তখন মনে করিলেন, এ প্রশ্নগুলো ইহার পিতা মাতাকে করাই ভাল; সুতরাং নিরস্ত হইলেন। নয়নতারাও সংসারের কাজের দোহাই দিয়া সরিয়া পড়িলেন। এ কথোপকথনের বিবরণ গৃহের কাহাকেও বলিলেন না। মনে করিলেন, সেকেলে লোক, উঁহারা সভ্যসমাজের রীতি কিরূপে জানিবেন।

যথাসময়ে ভৃত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্বাঙ্গে উত্তমরূপে তৈল মর্দন করিয়া দিল। সংবাহন সহকারে তৈল মর্দন করান, একটা মহা পরিশ্রমের ব্যাপার। ভৃত্যকে অর্ধ ঘণ্টারও অধিককাল সেই কুস্তী করিতে হইল। স্নানান্তে দুই বন্ধুতে একত্র আহার করিলেন; গৃহিণী ও নয়নতারা পরিবেশন করিলেন।

আহারান্তে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গৃহে আসিয়া দেখেন যে, শয্যার উপরে পানের ডিবাটি, তৎপার্শ্বে একখানি খবরের কাগজ ও পার্শ্বে তামাকু ভরা গুড়গুড়িটি প্রস্তুত। দেখিয়াই অতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি শয্যাতে যাইতে না যাইতে নয়নতারা নিজ কনিষ্ঠ ভগিনীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—"এই আমার ছোট বোন সরোজিনী, ও এখন আপনার কাছে থাকবে, আপনার মাথা বেছে দেবে।

মণিলাল। (হাসিয়া) কি আশ্চর্য, দুপুর বেলা ছেলেরা যে আমার মাথার চুল বেছে দিয়ে ঘুম পাড়ায় সেটাও শুনেছ! এটা কালীপদর কর্ম।

যাহা হউক তিনি টুনীকে আদর করিয়া নিজ শয্যাতে তুলিয়া লইলেন; এবং তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। টুনীও অপ্রীতিকর কাজ হইতে নিস্কৃতি পাইয়া পলায়ন করিল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইতে প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল। তিনি উঠিয়া মুখে হাতে জল দিয়া তামাকু খাইতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী আসিলেন।

মণিলাল। এসগো এস; তোমার ঘরকন্নার বন্দোবস্ত দেখে বড় খুসী হয়েছি। তোমার ছোট মেয়েটি ত বেশ; ওর সঙ্গে অনেক কথা কয়ে দেখলাম, বেশ লেখাপড়া শিখেছে ত।

গৃহিণী। সে বিষয়ে কর্তার খুব মনোযোগ। ওদের জন্যে মাস্টার নিযুক্ত আছে।

মণিলাল। মাস্টারের জন্যে কত ব্যয় কর?

গৃহিণী। তা বড় কম নয়; ছোট ছেলে ও ঐ ছোট মেয়ের জন্যে একজনকে দেওয়া যায় ২৫, আর একজনকে ১৫, ঐ বড় মেয়েকে সংস্কৃত পড়াবার জন্যে একজন পণ্ডিতকে দেওয়া যায় ৩০ আর বড় ও মেজো মেয়েকে বাজনা শেখাবার জন্যে একজনকে দেওয়া যায় ১০।

মণিলাল। ও বাবা! খরচটা বড় কম কর না ত? তা না হলে মেয়েগুলি এমন হয়? কালীপদর যত চোট বুঝি বাচ্চাগুলির উপরে, ধাড়িটিকে বুঝি বাগাতে পারেন নাই?

গৃহিণী। (হাসিয়া) আপনার ত সবই জানা আছে। বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ ছিঁড়ে কি বাচ্ছা করা যায়? উনি কালেজ ছেড়ে কর্মে বসলেই আমার সন্তান হলো; তারপর পণ্ডিতে

গিয়ে একা ঘরকন্না দেখা, চাকর বাকর চালান, এই সকলের মাঝে পড়ে সব সময় গেল, পড়ি কখন? তবু ছাড়েননি, বাঙলাটা একটু শিখিয়ে নিয়েছেন।

মণিলাল। তুমি ত পশ্চিমে মেয়েদের সংগে খুব মিশতে, ইংরিজী না জেনে কি করে চলতো?

গৃহিণী। খুব মেশা আর কি, পার্টি টার্টিতে কখনও কখনও যেতাম, আর তাঁরা বাড়ীতে কখনও কখনও আসতেন। প্রায় তাঁরা সকলেই ভাংগা ভাংগা হিন্দী বলতে পারতেন, তাতেই কথাবার্তাটা এক রকম চলতো।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একখানি পরিষ্কার রূপার রেকাবে গরম গরম লুচি, কচুরি, ভাজা, তরকারি, সন্দেশ প্রভৃতি প্রচুর জলযোগের উপকরণ, একটি রূপার ডিবাতে পান, ও একটি পরিষ্কার রূপার গ্লাসে এক গ্লাস জল লইয়া একজন চাকরাণী উপস্থিত।

মণিলাল। ও বাবা, এই সব কি আমাকে খেতে হবে?

গৃহিণী। কোন্ সকালে চারিটি খেয়েছেন, খাবেন বৈ কি।

মণিলাল। রক্ষে কর, পেটে জায়গা থাকলে ত খাব।

গৃহিণী। বাড়ীতে কি বিকাল বেলা জল খান না?

মণিলাল। যা হোক একটু কিছু খাই।

গৃহিণী। এও ত যাহোক একটু কিছু।

অতিথি মহাশয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুপত্নীর অনুরোধ বশতঃই হউক, অথবা ভুলিয়া ভুলিয়াই হউক, কথা কহিতে কহিতে সমুদয় দ্রব্য উদরস্থ করিলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিতে লাগিল। গৃহিণীর ত সংসারের কাজের জন্য ব্যস্ততা নাই। সুতরাং তিনি বেলা গণনা না করিয়া বসিয়া বসিয়া পুরাকালের অনেক গল্প করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত।

রায় মহাশয়। আহারের পর বিশ্রামের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই ত?

মণিলাল। তোমার eldest daughterটি যে jewel তার বন্দোবস্তের গুণে জানবার যো নেই যে নিজ বাড়ীতে নাই। মাথা টেপার লোক পর্যন্ত হাজির।

রায় মহাশয়। কেবল daughterটিকেই বুঝি jewel দেখলে? motherটি কি অপরাধ করলে? motherটিও ত কম jewel নয়। তবে old jewel বলে বুঝি তত মনে ধরছে না?

মণিলাল। (অট্টহাস্য করিয়া) Both of them are jewels but the younger one is a real pearl;—a pearl of great price.

রায় মহাশয়। If the younger is a pearl, the elder one is still the mother of pearls? (উভয়ের অট্টহাস্য)

গৃহিণী। আবার যে তোমরা ইংরিজী ধরলে। আমার কোনও নিন্দে করছো বুঝি?

রায় মহাশয়। নিজের পতির ভালবাসার প্রতি এমনি বিশ্বাসই বটে। দেখলে ইংরিজী না জানার কেমন সাজা, আমি করলাম তোমার প্রশংসা, তুমি ভাবলে নিন্দে।

গৃহিণী। প্রশংসা কিসের?

রায় মহাশয়। শুনবে? উনি বললেন তোমার বড় মেয়েটি রত্ন, আমি বললাম কেন, মা'টি কি কম রত্ন? তাতে উনি বললেন, হাঁ, দুটিই রত্ন বটে, কিন্তু ছোটটি আসল মুক্তো। আমি বললাম, ছোটটি যদি মুক্তো হয়, তবে বড়টি ঝিনুক, যার পেটে মুক্তো জন্মে।

গৃহিণী। (হাসিয়া) না বাপু, তোমরা ওসব ছাই কথা ইংরিজীতেই বল; বাঙলাতে বলে কাজ নেই।

ক্রমে রায় মহাশয়ের সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে যাইবার সময় উপস্থিত। তিনি ও গৃহিণী বেশ পরিবর্তন করিয়া প্রস্তুত হইতে গেলেন। বলিয়া গেলেন, "তুমি ভাই কাপড় পরে প্রস্তুত হও, একটু বেড়াতে যেতে হবে।"

এইবারেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুস্কিল। তিনি ভাবিলেন, এরা দুজনে ত সাহেব মেম, এদের সংগে বেড়াতে যাব, সামান্য ধুতি চাদরে যাওয়া উচিত নয়। এই ভাবিয়া তাঁহার পেন্টলুন কোট প্রভৃতি সভ্য পোষাক বাহির করিলেন। কিন্তু সেগুলি পরিতে গলদ্ঘর্ম। তিন বৎসর হইল তিনি কর্ম হইতে অবসৃত হইয়াছেন; তাহার কত বৎসর পূর্বে যে কোটটি করান হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। পেন্সন লওয়ার পর উদরের স্ফীতিটা দিন দিন বাড়িয়াছে, কিন্তু কোটটি ত বাড়ে নাই। এক্ষণে পরিতে গিয়া দেখেন, বোতামগুলি লাগান দুষ্কর। যদিও বা অনেক কষ্টে, অংগুলি ও নখকে অনেক কষ্ট দিয়া লাগাইলেন, কোট ফাটে কি পেট ফাটে! তৎপরে পেন্টলুনটিও যে কত দিনের তাহা বলা যায় না। পেন্টলুনটি পরিতে গিয়া দেখা গেল যে, পদদ্বয়ের গাঁটের সাত আট আংগুল উপরে উঠিল। সেটা দেখিতে ভাল নয়, সভ্যরীতি ত নয়, কিন্তু কি করা যায়, তখন ত আর দরজী ডাকিয়া নামান যায় না। আর এটা যে সভ্য রীতি নয়, সেটাও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জানা নাই; সুতরাং সেজন্য মনে কোনও ম্লানতা হইল না। এইরূপে তিনি অনেকক্ষণ এই পোষাক বিভ্রাট হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

ওদিকে কর্তা ও গৃহিণী বাগানের মধ্যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; ভৃত্য আসিয়া ত্বরা দিল, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি আয়নাতে মুখটা দেখিয়া ব্রুস দিয়া চুলটা একটু আঁচড়াইয়া ধাবিত হইলেন। উপরে গাড়ি বারাণ্ডার ছাতে রায় মহাশয়ের সন্তানগণ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেইভাবে দেখিয়া সেখানে হাসাহাসি পড়িয়া গেল। সুরেশচন্দ্র নয়নতারাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন – 'One of the greasy Babus of Bengal'— অর্থাৎ তৈলাক্ত বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে একজন। নয়নতারা তাঁহাকে বকিতে যাইবেন, এমন সময় সৌদামিনী ইংরাজ কবি গোল্ডস্মিথের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"One small head could carry all he knew ;" নয়নতারা ফিরিয়া তাঁহাকে বকিতে যাইবেন, এমন সময় নন্দরাণী বলিলেন, "ও ঠাকুর ঝি! ঐ লেজের মত কি একটা ঝুলতে ঝুলতে চললো ভাই!" নয়নতারা দেখিলেন বাস্তবিকই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পশ্চাত দিকে কি একটা গোপুচ্ছের মত ঝুলিতে ঝুলিতে যাইতেছে। নয়নতারা বলিলেন—"তাইত! ওট কি?" (সকলের হাস্য)

ব্যাপারটা এই ঘটিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পেন্টলুনটি কোমরবন্ধের দ্বারা বাঁধিয়া থাকেন। কোমরবন্ধগাছি পনর বৎসর পূর্বে পশ্চিম হইতে কিনিয়া আনিয়াছিলেন। দোষের মধ্যে সেগাছি অতিশয় লম্বা, মোটা ও তাহাতে দুইটি মুদো আছে; দূর হইতে গোপুচ্ছের মত দেখায়। অদ্য তাড়াতাড়ি কাপড় পরিবার সময় নব চাকরকে কোমরবন্ধটাতে গিরে দিয়া গুঁজিয়া দিতে বলিয়াছেন। নবা পশ্চাতদিকে গিরেটা দিয়া এমনি গুঁজিয়া দিয়াছে যে, প্রথম পদ-ক্ষেপেই খুলিয়া গিয়া একটা দিক ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

পশ্চাতে লাংগুলের মত ঝুলিতেছে তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানিবেন কিরূপে, তিনি তদবস্থাতেই চলিয়াছেন। তিনি বাহির হইয়াই দেখেন রায় মহাশয় ধুতি চাদর ও তাঁহার গৃহিণী সাড়ী জেকেট পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ভাবিলেন, "তবে আমি পোষাক পরিলাম কেন?" রায় মহাশয় ত্বরায় তাঁহাকে এই ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি বলিলেন, "ওটা লেজের মত কি ঝুলে ঝুলে আসছে হে?"

কর্তার প্রশ্ন শুনিয়া ছেলেরা হাসিয়া গাড়ী বারাণ্ডার ছাত হইতে ঘরের মধ্যে গিয়া কে কার গায়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। কেবল নয়নতারা একা গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মণিলাল। (পশ্চাতদিকে চাহিয়া) ও হোঃ কোমরবন্ধটা খুলে গেছে।

রায় মহাশয়। তুমি পোষাক পরতে গেলে কেন? যাচ্ছ হাওয়া খেতে, যে পোষাকটাতে বাঁধন বাঁধন করে সেটা কি পরতে আছে?

মণিলাল। আমি ভাবলাম তোমরা সাহেব মেম, যেমন তেমন পোষাকে কি তোমাদের সঙ্গে যাওয়া যায়?

রায় মহাশয়। (হাসিয়া) দেখছ না কেমন সাহেব মেম।

মণিলাল। তাইত, তোমাদের যে দেখি খুব পরিবর্তন হয়েছে। বেরিলিতে ত এমন পোষাকে বেরুতে না।

রায় মহাশয়। আরে সেখানে আমি ছিলাম পদস্থ লোক, মিশতাম ইংরাজদের সঙ্গে, কাজেই প্যান্টালুন কোটটা পরতে হত। সেগুলো কি সাধ করে কেউ পরে? যাও যাও পোষাক বদলে এস।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঁচিলেন। পোষাক পরিবর্তন করাতে ভুঁড়িটা একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্রমে তাঁহারা গাড়িতে করিয়া যাত্রা করিলেন। একদিকে কর্তা ও গৃহিণী; গৃহিণীর কোলে নন্দরাণীর খোকাবাবু; তিনি নিজের গলার রবারের পদকখানি লালাযুক্ত করিতেছেন; এক একবার পিতামহীর হাতে ঠুকিতেছেন; ও কত কি বকিতেছেন। অপরদিকে নবাগত অতিথি, টুনী ও মধ্যে মিনী; মিনীর ক্রোড়ে একটি প্রকাণ্ড পুতুল। পুতুলটি ক্রোড়ে মিনী কি গম্ভীরভাবেই বসিয়াছে, তাহা কেহ যদি দেখিতেন নিশ্চয় হাসিয়া ফেলিতেন। পাঁচছেলের মায়েরা এত গম্ভীরভাবে বসে না।

মণিলাল। এগুলি বুঝি সুরেশের ছেলেমেয়ে?

রায় মহাশয়। এটি তার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র; আর ওটি মধ্যম কন্যা Her Graciou? Majesty Miss Minnie Ray।

অবশ্য মিনী এ তামাসার কিছুই বুঝিল না। এইমাত্র বুঝিল যে তাহার বিষয়ে কথাটা হইতেছে, অমনি আরও গম্ভীর হইয়া গেল।

মণিলাল। (মিনীর ক্রোড়স্থিত পুতুলের গায়ে হাত দিয়া) এটি কি তোমার ছেলে?

মিনী। আমা খোতা।

মণিলাল। কি বললে ভাই?

রায় মহাশয়। আরে বুঝলে না? তুমি ছেলে বল কেন, ও যে খোকা।

মণিলাল। (হাসিয়া) খোকা কি খায়?

মিনী। আমা মাই খায়, দুদ খায়, এতন বাত খেতে পালে না, যতন বোলো ওবে, তখন বাত খাবে, লুটি খাবে, চব খাবে।

মণিলাল। (হা করিয়া) ও কি বললে?

রায় মহাশয়। ও বললে, এখন ছোট আছে কিনা তাই ওর মাই খায়, দুধ খায়, ভাত খেতে পারে না, যখন বড় হবে, তখন ভাত খাবে, রুটি খাবে, সব খাবে।

গৃহিণী। কি কথা কইবার ছিরি!

মণিলাল। ওগো আমরা সকলেই এক সময়ে ঐ রকম কথা কয়েছি।

বন্ধুদ্বয় বায়ুসেবন করিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর যথারীতি বৈঠকঘরের আসর বসিল। এইবারে রায় মহাশয় পরিবারস্থ সকলকে স্বীয় বন্ধুর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রায় মহাশয়। বড় মেয়েকে ত দেখেছ, ঐ দেখ মেজমেয়ে সৌদামিনী; এই ছোটছেলে নরেশ, ডাক নাম পটল। (নন্দরাণীকে নিকটে ডাকিয়া, তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া) এটি আমাদের বৌমা; এটি বড় দুষ্টু মেয়ে, ও'র বাপ মা যেমন দুষ্টু উনিও তেমনি দুষ্টু। (নন্দরাণীর

দাড়িতে হাত দিয়া) "কি বল ঠিক বলছি কি না?" (চপলা ও সুধীশকে ডাকিয়া) এই সুরেশের বড় মেয়ে ও বড় ছেলে।

মণিলাল। ভাই তুমি বড় সুখী।

রায় মহাশয়। ঈশ্বরের করুণা; এ বিষয়ে জগদীশ্বর বাস্তবিক প্রচুর কৃপা করেছেন।—এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

এইরূপ নানা কথাতে আহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারের সময় নানা বিশ্রম্ভালাপে সময়টা সুখেই অতিবাহিত হইল। বিশেষ কোনও দুর্ঘটনা ঘটিল না। কেবল আহারান্তে যখন মুখ প্রক্ষালনের জন্য চিলিঞ্চীটি আনা হইল, তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেবলমাত্র মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর দ্বারা দাঁত মাজিতে লাগিলেন। সেটি তাঁর অভ্যাস। কিন্তু তদ্বারা এক প্রকার কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া পটলা ও টুনী একটু হাসিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু নয়নতারার ভ্রূকুটিতে তাহা দমন হইয়া গেল।

আহারান্তে বৈঠক ঘরে সকলে আবার সমবেত হইলে, নয়নতারা ও সৌদামিনী নবাগত অতিথিকে সেতার বাজাইয়া শুনাইলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেতারের রসজ্ঞ হউন আর না হউন, বালিকাদ্বয়ের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন উপস্থিত থাকিলে পাগল হইয়া যাইত; সে গীতবাদ্যে এমনি নিপুণ। গীতবাদ্যের পর নানা আলাপে সময় সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি দশটার পর সকলে স্বীয় স্বীয় শয়ন মন্দিরে গমন করিলেন।

মণিলালবাবু শয়ন করিতে গেলে, পূর্বদত্ত আদেশানুসারে নবা চাকর অনেকক্ষণ তাঁহার হস্ত পদ সংবাহন করিয়া দিল। অবশেষে তিনি ভৃত্যকে যাইতে বলিলেন; সে মশারি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ঘরের দ্বারে নয়নতারা নবকে ডাকিতেছেন।

মণিলাল। কে ও?

নয়নতারা। আমি নয়নতারা। আপনার মশারি কি ভাল করে গুঁজে দিয়েছে? ভাল করে গুঁজে না দিলে মশা কামড়াবে।

মণিলাল। হাঁ মা, মশারি বেশ করে গুঁজে দিয়েছে, তুমি যাও শোও গে। বাপ্রে তোমরা মানুষকে কি যত্ন করতেই জান!

নয়নতারা স্বীয় শয়ন-মন্দিরে গেলেন। গিয়া নিবিষ্টচিত্তে বিবিধ ধর্মগ্রন্থ হইতে রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া সংকলিত একখানি গ্রন্থ অনেকক্ষণ পাঠ করিলেন। তৎপরে জীবনের জন্য ও জীবনের সর্ববিধ সুখের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া শয্যাতে গমন করিলেন।

একদিনের বিবরণটা এত বিশেষ করিয়া বলিবার অভিপ্রায় এই যে, মণিলালবাবু যে কয়দিন ছিলেন, এই ভাবেই তাঁহার আতিথ্য-ক্রিয়াটা সম্পন্ন হইল। তিনি যাইবার সময় নয়নতারাকে প্রতিশ্রুত করিয়া গেলেন যে, তিনি একবার জননীর সহিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ীতে যাইবেন। বলিলেন, "আমি ত আর মুখে বলে বাড়ীর মেয়েদিগকে বোঝাতে পারবো না, একবার তোমাদের নিয়ে আমার মাকে ও অন্যান্য মেয়েদিগকে দেখাতে চাই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বার্নার্জ সাহেব যে একজন সামাজিক ও সুরসিক লোক তাহা সকলে অগ্রেই জানিয়াছেন। গুণই বল আর দোষই বল এরূপ লোকের এই একটা স্বভাব আছে যে কোনও স্থানে স্থায়ী বন্ধন হয় না। ইঁহাদের বন্ধুতা প্রসারে যত দেখা যায়, গভীরতাতে তত নহে। সংসারে এক প্রকৃতির মানুষ আছেন, যাঁহারা চাপা, কথা অল্প বলেন, কিন্তু কাজে অধিক করেন; তাঁহাদের

বন্ধুর সংখ্যা অধিক নহে; কিন্তু যে দুই চারিটি আছে, তাঁহাদের প্রতি প্রেম অতিশয় গভীর। বানার্জি প্রকৃতির লোক তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইঁহারা যেখানে দুদিন বাস করেন সেখানকে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারেন; হাসিয়া, খেলিয়া, সুমিষ্ট সৌজন্য দেখাইয়া, সকলের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন। তখন যার সংগে মেশেন সেই মনে করে, বুঝিবা একটি চিরদিনের বন্ধু পাইলাম। কিন্তু যেই পশ্চাৎ ফেরা অমনি বিস্মৃতির জলে সমুদয় নিক্ষেপ। সে বন্ধুতা আর মনে থাকে না।

নারীগণের প্রতি ইঁহাদের এই স্বভাবটা অনেক সময় বড়ই ক্লেশদায়ক হয়। নারীর স্বভাব ইহার বিপরীত। নারীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ গভীর; নারী প্রেম ছড়াইতে জানেন না; বহু বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত করিতে পারেন না; নারী এককে ধরিতে চান; ডোবেন ত তাহার সঙ্গেই ডোবেন। বলিতে পারি না নারীপ্রকৃতি ঠিক বুঝিয়াছি কিনা। আমাদের ত এইরূপ মনে হয়। অতএব যে নারী কাহাকেও প্রেম করে না; কিন্তু বহুজনে প্রেম ছড়ায়, তাহাকে নারীকুলে অপকৃষ্ট মনে করি।

এই সামাজিক লোকেরা নারী-হৃদয়কে সময়ে সময়ে অকারণ দলন করিয়া থাকেন। দুই দিনের মিলামিশিতে একেবারে স্বর্গের চাঁদ হাতে আনিয়া দেন; অন্তরংগ বন্ধু হইয়া বসেন; নারীহৃদয়কে হরণ করিয়া আপনাতে আবন্ধ করেন। তৎপরে পশ্চাৎ ফিরিলেই সেই বিস্মৃতির জলে নিক্ষেপ। এই নির্দয় খেলা সভ্যসমাজে সর্বদা চলিতেছে।

আমাদের বানর্জি সাহেবকে এতদূর অসৎ লোক বলিতেছি না। তিনি নারী-হৃদয়কে বার বার এইরূপে দলন করিয়াছেন কিনা জানি না। এইমাত্র বলিতে পারি যে তিনি এ জীবনে অনেক স্থানে অনেক রমণীর সংস্রবে আসিয়াছেন; কিন্তু কাহারও দ্বারা আবন্ধ হয় নাই। অনেকবার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; বলিয়াছেন,—"বিবাহে ধরিতেছে না। যখন বিবাহে ধরিবে তখন বিবাহ করিব। যেমন রোগে ধরে, প্লেগে ধরে, তেমনি বিবাহেও ধরা চাই।" বানার্জিকে আজ পর্যন্ত বিবাহে ধরিতে পারে নাই। তাঁহার পরিচিত নারীকুলের মধ্যে কোনও নারী তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়ীরূপে অধিকার করিতে পারেন নাই। এবার তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। চুঁচড়াতে তিন দিন যাপন করিয়া তিনি সে স্মৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। এ পরিবারটি বড়ই ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু সর্বোপরি একটি নারীমূর্তি তাঁহার স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। নয়নতারার সহিত অসংকোচে পরিচিত হইয়া তাঁহার চিত্তে রমণীর আদর্শটা জাগিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে বলিতে বলিতে গিয়াছেন "এইবার বুঝি বিবাহে ধরিল। এ নারী যদি পাই তবে একবার গৃহধর্ম করিয়া দেখি; এ নারীর জন্য সাগর পারে যাইতে পারি।"

সকলে বুঝিতেই পারেন, এরূপ যাঁর হৃদয়ের ভাব সে লোক চুঁচড়াতে আবার না আসিয়া থাকিতে পারেন না। বানর্জি সাহেব ইহার পরে কয়েকবার ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। তিনি আসিলেই রায় পরিবারের সকলের আনন্দ। শিশুরা পর্যন্ত চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে। আপনার লোকের সংগে মানুষ যেরূপে মেশে, নয়নতারা এবং সৌদামিনীও সেইরূপে মিশিয়া থাকেন। কিন্তু বানার্জি সাহেব যে অভিসন্ধিতে আসেন, তাহার সুবিধা হয় না। তিনি মনে করিয়া আসেন যে নির্জনে নয়নতারার সহিত কথা কহিবেন, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে তলাইয়া দেখিবেন নিজের অনুরূপ ভাব সেখানে আছে কিনা; কিন্তু নয়নতারাকে নির্জনে পান না; তাঁহাকে সর্বদাই গৃহকার্যে ব্যস্ত দেখিতে পান, এবং যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, অপর দশজনের মধ্যেই হয়।

এইরূপ কয়েকবার আসিয়া বানার্জি সাহেব ভাবিলেন, অন্ততঃ দুই চারিদিনের জন্য নয়নতারাকে সংসারের এই কাজের ভিড় হইতে দূরে লইতে না পারিলে নির্জনে কথা কহিবার সুবিধা হইবে না। চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, কলিকাতাতে এস. পি. রায় নামে তাঁহার

একজন ব্যারিষ্টার বন্ধু আছেন। তিনি রায় মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহাদের সংগে এই রায় পরিবারের বেশ আত্মীয়তা। এ বাড়ীর ছেলেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া বাস করে এবং তাঁহারাও কখনও কখনও এখানে আসিয়া দুই এক দিন যাপন করেন। এস. পি. রায়ের পত্নীর সহিত নয়নতারার বিশেষ বন্ধুতা আছে। বানর্জি সাহেব স্থির করিলেন, এস, পি, রায়ের পত্নীকে ধরিয়া এই কার্য সিদ্ধ করিতে হইবে। তদনুসারে একদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাদের ভবনে গিয়া বন্ধুর পত্নীর কাছে এই প্রসংগ উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। এ বিবাহ সম্বন্ধটা তাঁহাদের বড়ই মনঃপূত। কিন্তু পরক্ষণেই উভয়ে বলিলেন, নয়নতারার পিতামাতার অজ্ঞাতসারে এমন একটা পরামর্শ করিয়া তাকে আনা যায় না। সেটা আত্মীয়লোকের মত কাজ হয় না; অতএব সুরেশকে এই পরামর্শের ভিতর লইয়া তাহার দ্বারা পিতামাতাকে জানাইতে হইবে ও নয়নতারাকে আনিতে হইবে। বানর্জি সাহেব বলেলেন, "আমি এবার চুঁচড়াতে গিয়ে সুরেশকে বলব।"

তদনুসারে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন তিনি চুঁচড়াতে আসিলেন। সায়ংকালীন আহারের পর সুরেশকে টানিয়া গংগাপারের নীচের বারাণ্ডায় লইয়া গেলেন। সেখানে বামবাহু-দ্বারা তাঁহার কণ্ঠালিংগন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই প্রসংগ উত্থাপন করিলেন।

বানর্জি। I am going to broach an important subject to you অর্থা আমি তোমার কাছে একটা গুরুতর প্রস্তাব করতে যাচ্ছি।

সুরেশ। What subject ? বিষয়টা কি ?

বানর্জি। Do you know your sister's feelings about her marriage অর্থাৎ বিবাহের বিষয়ে তোমার এই ভগিনীর অভিপ্রায় কি তা কি জান ?

সুরেশ। Which sister ?—কোন্ বোন ?

বানর্জি। I mean the eldest—সর্বজ্যেষ্ঠটি।

সুরেশ। No, I don't - না আমি জানি না।

বানর্জি। What is your feeling with regard to my approaching her with that view,— আমি যদি এভাবে তাঁর সঙ্গে মিশি, সেবিষয়ে তোমার মত কি ?

সুরেশ। Well, as far as I am concerned, I shall be glad if you can capture her ; but there is not much hope for that.— আমার কথা যদি জজ্ঞাসা কর , এইমাত্র বলতে পারি তুমি যদি তাকে পাকড়াতে পার, আমি সুখী হব, কিন্তু সেবিষয়ে বড় আশা নেই।

বানর্জি। Do you think your parents will oppose it.—তোমার পিতা-মাতা কি এর বিরোধী হবেন ?

সুরেশ। They love my sister too well to interfere with her choice. —তাঁরা আমার বোনকে বড় ভালবাসেন, সে যা করবে তাতে তাঁরা বাধা দেবেন না।

বানর্জি। Will you help me in capturing her ?- তাকে পাকড়াবার বিষয়ে কি আমাকে সাহায্য করবে ?

সুরেশ। How ? কি করে ?

বানর্জি। Well, you see whenever I came here I find her always engaged, and during all my visits I have not had an hour's quiet talk with her ; therefore, I have decided upon a plan. —দেখ আমি যখনই

এখানে আসি, নয়নতারাকে সর্বদাই কাজে ব্যস্ত দেখি ; এতবার এলাম, এক ঘণ্টা নির্জনে কথা বলবার সুবিধা হ'লোনা। শেষে একটা উপায় ভেবেছি।

সুরেশ। Let me know the plan. —উপায়টা আমাকে বল।

বানার্জি। Well, the plan is this—I have arranged with the wife of your cousin, S P. Roy, that she will invite Nayantara to spend a few days with her ; and I shall meet her there do you think your parents will object to that plan; —পরামর্শটা এই, আমি তোমাদের জ্ঞাতিভাই এস, পি, রায়ের স্ত্রীর সহিত স্থির করেছি যে, তিনি নয়নতারাকে কয়েকদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ীতে রাখবেন; সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তোমার কি বোধ হয়, তোমার পিতামাতা এ পরামর্শে আপত্তি করবেন ?

সুরেশ। (একটু চিন্তা করিয়া) Wait, I have another plan to propose. —অপেক্ষা কর, আমি আর একটা পরামর্শ উপস্থিত করছি।

বানার্জি। What plan ?—কি পরামর্শ বল দেখি ?

সুরেশ। I am thinking of taking my sisters to Calcutta during the Christmas holidays to give them a little diversion. Nayantara absolutely needs it ; she is so over-worked here —আমি মনে করছি বড়দিনের ছুটিতে আমার বোনদের কলিকাতায় নিয়ে যাব। তাদের একটু দেখাতে শোনাতে হবে নয়নতারার পক্ষে সেটা বড় দরকার ; তাকে এখানে বড় খাটতে হয়।

বানার্জি। Yes, she is,—it is a good idea. —তিনি যে এখানে খুব খাটেন তাত দেখছি ; কথাটা মন্দ নয়।

সুরেশ। At Calcutta we shall stay with our uncle ; and my cousins may take her from there to spend a day or two with them my parents needn't be troubled about it. —কলিকাতাতে আমরা আমাদের খুড়ার বাড়ীতে থাকব ; এস, পি. রায় ও তাঁর স্ত্রী সেখান হ'তে দুই একদিনের জন্যে তাকে নিয়ে যেতে পারেন। পিতামাতাকে এ কথা বলতে হবে না।

বানার্জি। The best plan imaginable. Then I shall depend on your coming to Calcutta during the Christmas holidays. —অতি উৎকৃষ্ট পরামর্শ তবে তোমরা বড়দিনের সময় কলিকাতায় আসবে, তার উপরে আমি নির্ভর করে থাকবো ?

সুরেশ। Of course, if nothing extraordinary intervenes, —অবশ্য যদি হঠাৎ একটা কিছু বিঘ্ন না ঘটে।

ইহার পর একদিন আহারে বসিয়া সুরেশচন্দ্র বড়দিনের সময় কলিকাতা যাওয়ার কথা উত্থাপন করিলেন।

সুরেশ। (পিতার প্রতি) দেখুন, বাবা! আমি মনে করছি বড়দিনের সময় নয়নতারা, শ্যামা, চাঁদনী, পটলা সকলকে ছুটির কয়েকদিনের জন্যে কলকেতায় নিয়ে যাব। সে সময়ে শহরে

দেখবার মত অনেক তামাসা থাকে; গত বৎসর ওরা কিছু দেখতে পায়নি, এবার দেখাব। বিশেষ নয়নতারার জন্যে সেটা দরকার, ও বেচারি খেটে খেটে সারা হলো।

রায় মহাশয়। সে মন্দ কথা নয়।

সৌদামিনী। বড়দা! তুমি কি লক্ষ্মী! আমি ভাবছিলাম, তোমাকে ধরে বসবো, তুমি আমার মনের কথাটা টেনে বলেছ।

টুনী। (পার্শ্বে সমাসীন পটলের গা ঠেলিয়া) ছোড়দা! খুব মজা হয়েচে!

নয়নতারা। যেতে হয় ত সকলে যাব, আমরা কজনে গেলে কি হবে।

সুরেশ। তা হলে একটা বাড়ী ভাড়া করতে হবে। ঐত মুস্কিল! আমরা কজনে গেলে কাকার বাড়ী থাকতে পারি।

নয়নতারা। বাঃ বৌ বুঝি যাবে না? আমার খাটুনিই কেবল দেখছ, আর ও যে ছেলে-গুলো নিয়ে পায়ে বেড়ী দিয়ে বাঁধা আছে, ওর বুঝি একটু নড়াচড়া দরকার নয়?

সুরেশ। ওকে নিতে গেলে ছেলেদের সব নিতে হয়, আয়া টায়া সংগে নিতে হয়, সেই একটা আলাদা বাড়ী চাই; আর ছেলেদের ভাবনা ভাবতে ভাবতে দেখাশোনার সুখটাই হবে না; তারপর বাবা মাকে দেখবার একজন লোক ত এখানে থাকা চাই।

নয়নতারা। বাবা মা যদি না যান তবে ত আমারও যাওয়া হয় না।

নন্দরাণী। সে কি ঠাকুর ঝি! আমি কি এক হপ্তা ওঁদের দেখতে পারি নে?

জননী। তা বৈ কি। আমরা কি কচি ছেলে, যে আঁচল চাপা দিয়ে বসে থাকতে হবে।

রায় মহাশয়। (নয়নতারার প্রতি) আর কেউ যাক্ না যাক্ তোমার যাওয়া দরকার, তোমার একটু বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন।

সুরেশ। এবারে একটা নূতন ইংরেজ থিয়েটার কোম্পানি আসছে, তারা চমৎকার হামলেটের অভিনয় করে, নয়নতারাকে সেটা দেখাতে হবে।

হামলেট অভিনয়ের নাম শুনিয়াই নয়নতারার মনটা কলিকাতা যাত্রার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক ঝুঁকিয়া পড়িল। তিনি যখন সুরেশের নিকট সেক্সপিয়রের হামলেট পড়েন, তখন হইতে এই অভিনয়টা দেখিবার ইচ্ছা আছে।

কথোপকথনান্তে স্থির হইল যে, নন্দরাণী কর্তা ও গৃহিণীর পরিচর্যার জন্য থাকিবেন, সুরেশ ভাই বোনদিগকে ও চপলাকে লইয়া কলিকাতায় যাইবেন। ২১শে ডিসেম্বর পড়াইয়া কালেজ বন্ধ হইবে ও ২রা জানুয়ারি খুলিবে; তাঁহারা ২১শে ডিসেম্বর বৈকালে আহার করিয়া ঘাটে চড়িলেন; ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতায় পেঁৗছিবেন; ৩০শে ডিসেম্বর হরেন্দ্রদের স্পোর্টিং গবের ম্যাচ দেখিয়া, ৩১শে ডিসেম্বর চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিবেন; ১লা জানুয়ারি সকলে ক্ষেত্রে গিয়া বাগানে গিয়া বন-ভোজন করা হইবে। তদনুসারে কলিকাতায় তারাপদ রায় মহাশয়কে পত্র লেখা হইল।

হরেন্দ্র এই কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। নয়নতারাকে বলিলেন, "কয়েকদিনের জন্য আপনার বিশ্রামলাভ হবে, এটা ভালই হল।"

কলিকাতা যাত্রার প্রস্তাব হওয়া অবধি পটলা ও টুনী নাচিতেছে। টুনী "তুই যেতে পেলি না, তুই যেতে পেলি না" বলিয়া মিনীকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। সে একবার পিতার কাছে, একবার মাতার কাছে, একবার নয়নতারার কাছে, একবার পিতামহের কাছে, এইরূপ করিয়া অনুরোধ উপরোধ করিয়া বেড়াইতেছে। কেহই তার কথায় কান দিতেছেন না। নয়নতারা একবার বলিয়াছিলেন—"মিনীকে নেওয়া যাক," সুরেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "না ও কিছুই বুঝবে না; কিছুই দেখবে না; মধ্যে থেকে ওকে নিয়ে একটা লেঠা।" সুতরাং সে প্রস্তাবটা রহিত করা গিয়াছে।

ক্রমে ২১শে ডিসেম্বর আসিয়া পড়িল। সেদিন প্রাতে টুনী সুরেশচন্দ্রের গলা ধরিয়া ঝুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়দা, আমাকে হ্যামলেট দেখাবে না?"

সুরেশ। তুই কি বুঝতে পারবি? তুই বড় হলে তোকেও দেখাব।

টুনী। না বড়দা! দুটি পায়ে পড়ি, আমি হ্যামলেট দেখব।

সুরেশ। আচ্ছা কলকেতায় ত চল্, তার পরে দেখা যাবে। তোর দেখবার জিনিসের অপ্রতুল কি! তোকে সার্কাস দেখাব, ক্রিসমাশ শো দেখাব, জুওলজিকাল গার্ডেন্স দেখাব, ফ্যান্সি ফেয়ার দেখাব।

টুনী খুসী হইয়া তাঁহার গায়ে, হাতে, কোটে, অগণ্য চুম্বন করিল। সুরেশচন্দ্রও তাহাকে নিজ আলিঙ্গনে বাঁধিয়া তাহার দুই চক্ষে, কপালে, কপোলে অনেক চুম্বন করিলেন। টুনী ছুটিয়া কি কি দেখিবে তাহা পটলাকে বলিতে গেল।

বৈকালে ভ্রাতা ভগিনীতে বোটে যাত্রা করিলেন। গান, বাজনা, খেলা, গল্প এই সকলে সময়টা যে কি সুখেই গেল, তাহার বর্ণনা হয় না।

তৎপরদিন বৈকালে তাঁহারা কলিকাতায় হাটখোলাতে পেঁৗছিলেন। পেঁৗছিয়া দেখেন, বিনোদ, বিপিন প্রভৃতি এক দল হাজির। চুঁচড়ার দলের মনে আর আনন্দ ধরে না। সকলে কল কল করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় তারাপদ রায় মহাশয়ের ভবনে পেঁৗছিলেন। রায় মহাশয় দ্বারের নিকট উপস্থিত। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে দেখিয়া তাঁহার স্নেহ একেবারে উথলিয়া উঠিল। কাকে আলিঙ্গন করিবেন, কাকে চুম্বন করিবেন, যেন ভাবিয়া পান না। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে কাকীমাকে কে কত আদর করিল, তাহার ঠিক থাকিল না। তাঁহারও মনে আজ আনন্দ ধরে না, তাঁহার বাড়ীটা আজ জাঁকিয়া উঠিল। নন্দরাণী আসিলেন না, ইহাতে কাকা কাকীর একটু দুঃখ হইল। আবার যখন শুনিলেন, যে মিনী আসিবার জন্য কাঁদিয়াছিল, তাহাকে আনা হয় নাই, তখন সুরেশকে অনেক তিরস্কার করিলেন। কাকীমা বলিলেন, "কেন আমরা কি তাকে দেখতে পারতাম না? সে কিছু না দেখুক শুনুক এখানে এলেই তার আনন্দ হত।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই আহারের সময় উপস্থিত। কনিষ্ঠ রায় দক্ষিণে নয়নতারা ও বামে সৌদামিনী ও তৎপার্শ্বে টুনী প্রভৃতিকে লইয়া আহারে বসিলেন। তাহাদের আসিবার অগ্রেই কাকীমা তাহাদের জন্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা যা খায়, যা করে, তাতেই আনন্দ।

রাত্রিটা সুখেই কাটিয়া গেল। টুনী খুড়ীমার শয্যাতে তাঁর কোলে শুইয়াই রাত কাটাইল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই শহরের তামাসা দেখা আরম্ভ হইল। তারাপদবাবু ও সুরেশচন্দ্র কে কোন সময়ে সঙ্গে থাকিবেন, কে কি দেখাইবেন তাহা ভাগ করিয়া লইলেন। দুপুরে মিউজিয়ম, রাত্রে সার্কাস, প্রাতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, বৈকালে ফ্যান্সি ফেয়ার, রাত্রে থিয়েটার, এইরূপ চলিল।

বড়দিনের দিন তারাপদবাবু নিজের ও জ্যেষ্ঠের ছেলেদিগকে দোকান দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে যে যা চাহিল কিনিয়া দিলেন। এমনকি সৌদামিনী পর্যন্ত পছন্দ মত দামী দামী জিনিস লইতে ছাড়িলেন না। কেবল নয়নতারা বিশেষ কিছু চান নাই। ইহাতে পিতৃব্য কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন,—"নয়নতারা, তুমি কি চাও?"

নয়নতারা। না কাকা আমার কিছুই দরকার নেই।

তারাপদবাবু। তুমি অল্পবয়সে এত বুড়ুটে হলে কেন? তোমার কি কোনও সাধ আহ্লাদ নেই? কাকার কাছে বৎসরের দিন একটা কিছু নেও।

নয়নতারা দেখিলেন কিছু না লইলে খুড়ামহাশয় দুঃখিত হন, তাই এক ছড়া বড় বড় বিলাতি মুক্তার মালা লইলেন।

২৭এ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময় এস, পি, রায় ও তাঁহার পত্নী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া চুঁচড়ার দলের আনন্দ আরও বাড়িয়া গেল। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর সবাগতা বধূ নয়নতারার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আমি কিন্তু তোমাকে নিতে এসেছি; তোমাকে যতবার আমার বাড়ীতে দুদিন থাকতে বলি, তুমি যাব যাব করে কাটিয়ে দেও, এবারে তোমাকে নিজ কোটে পেয়েছি। এবারে 'না' বললে শুনছি না।"

নয়নতারা। (হাসিয়া) আমি দাদার সঙ্গে হামলেট্ দেখতে যাব বলে এসেছি, কাল অভিনয় হবে, আমাকে মাপ কর ভাই। আর কোনও সময় যাব।

এস, পি, রায়। কেন, আমরা কি থিয়েটারের পথ চিনি না? আমরাও ত যাব; আমাদের সঙ্গে যেও; সুরেশের সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে।

নয়নতারা। দল বেঁধে এসেছি, দলটা ভেঙ্গে যেতে ইচ্ছে করে না, আর আমি গেলে কাকা দুঃখিত হবেন।

এস, পি, রায়। আচ্ছা, তারাখুড়োকে আমি রাজি করছি।

নয়নতারার বড় ইচ্ছা নয় যে যান। অনিচ্ছার অন্য কোনও কারণ নাই; তবে তাঁর মনের প্রকৃতিটা এরূপ, যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে ফেলিয়া কোথাও যাইতে চায় না।

যাহা হউক ,এস, পি, রায় ও তাঁহার পত্নী কোনও ওজর আপত্তি শুনিলেন না; কনিষ্ঠ রায়কে বলিয়া কহিয়া রাজি করিলেন। পিতৃব্য রাজি হইয়াছেন শুনিয়া নয়নতারা জ্যেষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন,—"দাদা, তুমি কি বল? যাব কি?" মনে করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে নিস্কৃতি দিবেন, কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল। তিনি এস, পি, রায় ও তাঁহার পত্নীর কথাতে বাতাস দিতে লাগিলেন। "ওঁরা আপনার লোক, আমরা সকলেই দুই একবার গিয়ে থেকেছি, তুই কখনও ওঁদের বাড়ীতে যাসনি, এত করে ধরেছেন যা, দুদিন থেকে আয়।"

স্থির হইল যে, ২৯শে ডিসেম্বর বৈকালে তিনি পিতৃব্যের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন; ৩০শে সকলে মিলিয়া গড়ের মাঠে চুঁচড়ার দলের ম্যাচ দেখিতে যাইবেন; ৩১শে রেলে করিয়া চুঁচড়া ফিরিয়া যাওয়া হইবে।

তদনন্তর দম্পতিদ্বয় নয়নতারাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

নয়নতারা এস, পি, রায়ের ভবনে পেঁৗছিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই, বানর্জি সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া নয়নতারা আনন্দিত হইলেন; "বা আপনিও যে এখানে! আমার এক কাজে দুই কাজ হয়ে গেল, আপনার সঙ্গেও দেখা হলো।"

বানর্জি সাহেব রাত্রিকালের আহারের সময় পর্যন্ত রহিলেন। এই দীর্ঘ কাল এক মুহূর্তের জন্যও নয়নতারাকে ছাড়িলেন না। কত বিষয়েরই কথা হইল, পরস্পর কত মতামত প্রকাশ করা হইল ,উভয়ে ভবনসংলগ্ন উদ্যানে সন্ধ্যার সময় কত বেড়াইলেন। অবশেষে যাইবার সময় এস, পি রায়ের পত্নী তাঁহাকে পরদিন প্রাতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন, "প্রাতে আহার করে সমস্ত দিন এখানে থাকবেন, সন্ধ্যার সময়ে এখানে আহার করে আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে যাবেন।" নয়নতারা সেই নিমন্ত্রণে যোগ দিলেন। বলিলেন, "কাল হামলেটের অভিনয় হবে।" বানর্জি চলিয়া গেলেন।

সরলা বালিকা এবারে বুঝিতেই পারিলেন না যে তাঁহার জন্য ফাঁদ হইয়াছে। গৃহে থাকিতে এরূপ অভিসন্ধিতে কাহাকেও আনিলেই যিনি অগ্রে বুঝিতে পারিতেন ও সতর্ক হইতেন, তিনি কেন এবারে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? বোধহয় পূর্ব পূর্ব বারে অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে পরিচিত করিবার জন্য জ্যেষ্ঠের অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার মনে অভিসন্ধি বিষয়ে সংশয় জন্মিত। এবারে সেরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। কারণ যাহাই হউক, নয়নতারার মনে কোনও চিন্তাই আসিল না। তৎপর দিন বানর্জি সাহেব সমস্ত দিন থাকিলেন; বিড়াল যেমন মাছের মুড়াটি আগুলিয়া বসিয়া থাকে তেমনি বসিয়া রহিলেন; কিন্তু এই শুদ্ধমতি সরলা বালিকার বোন্ বোন্ ভাবটাতে প্রণয়ী সাজিয়া বসিবার পথ

পাইলেন না। নয়নতারা কথা কহিয়া কিছুই ক্লান্তি বোধ করিলেন না, বরং পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন; কিন্তু বানার্জির ইংগিত, গূঢ়োক্তি, প্রণয়োচ্ছ্বাস কিছুরই মধ্যে প্রবেশ করিলেন না।

সায়ংকালীন আহারের পর সকলে থিয়েটারে গেলেন। বানার্জি সাহেব নিজের ব্যয়ে একটি সমগ্র প্রথম শ্রেণীর বক্স বা কামরা ভাড়া করিলেন। বড় সাধ নয়নতারাকে পাশে বসাইয়া থিয়েটার দেখিবেন। কিন্তু নয়নতারা বক্সে গিয়া যেই দেখিলেন অপর একটি বক্সে সুরেশচন্দ্র, সৌদামিনী প্রভৃতিকে লইয়া সমাসীন, অমনি ধরিয়া বসিলেন,—"আমি দাদার কাছে যাব।" এস, পি, রায়েরা দুই স্ত্রীপুরুষে ও বানার্জি সাহেব স্বয়ং তাঁহাদের সংগে থাকিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিছুতেই তাঁহাকে রাখিতে পারা গেল না। তিনি চলিয়া গেলেন; বানার্জি সাহেব ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। নয়নতারা সুরেশের কাছে গিয়া বলিলেন,—"দাদা! আমি তোমার কাছে বসবো।" সুরেশচন্দ্র অপর বক্সস্থিত বন্ধুদের প্রতি কটাক্ষে হাসিয়া আপনার বামপার্শ্বে ভগিনীর বসিবার স্থান করিয়া দিলেন। নয়নতারা বসিয়া হৃষ্টচিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের নিকট বসাতে ভালই হইল। নয়নতারা বহুদিন পূর্বে হ্যামলেট পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোন কোন ঘটনা মনে ছিল না, সুরেশচন্দ্র তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন; তাহাতে অভিনয়টা বুঝিবার অনেক সাহায্য হইল।

পরদিনও বানার্জি সাহেব দুপুরবেলা আসিয়া আবার ডিমটিতে অনেক তা দিলেন, কিন্তু ডিম ফুটিল না। যেন যেন ভাবটা দূর হইয়া প্রণয়িণী ভাবটা আসিল না; আসল কথাটা বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; সাহসে কুলাইল না কিংবা লজ্জাতে বাধা দিল। এ বালিকার চরিত্রে কি একটা আছে, যাহাতে তাঁহাকে দশ হাত দূরেই রাখিল; এমনকি অধিক আত্মীয়তার স্থলে যে একটা ঘনিষ্ঠ মেলামেশি থাকে, তাহাও করিতে পারিলেন না। তিনি আকৃষ্ট হইলেন, অথচ ধরিতে পারিলেন না; হাত বাড়াইলেন ,কিন্তু ছুঁইতে সাহস করিলেন না; মুগ্ধ হইলেন, অথচ আরও অধিক চাহিতে পারিলেন না; বলি বলি করিয়া মুখে আনিলেন, ভাষাতে ফুটিতে পারিলেন না! পাখী তাঁহার ফাঁদে আসিল, বসিল, ডাকিল, উড়িয়া পলাইল, সে ফাঁদ তাহার পায়ে লাগিল না।

এইভাবে সময় কাটিয়া গেল। সেইদিন বৈকালে সুরেশচন্দ্র নয়নতারাকে লইবার জন্য উপস্থিত। এস, পি, রায়, তাঁহার পত্নী ও বানার্জি তিনজনে আগ্রহ করিয়া নয়নতারাকে ধরিলেন, "আর একদিন থেকে যাও;" কিছুতেই রাখিতে পারিলেন না। চুম্বকে যেমন লৌহ লাগে, তেমনি তিনি যেন জ্যেষ্ঠে লাগিয়া গেলেন। আর ছাড়ান গেল না।

সুরেশ। (বানার্জিকে নির্জনে ডাকিয়া) Prospects brightening? —কিহে আশ ভরসা কেমন?

বানার্জি। Either her heart is engaged somewhere else or she is still a child in these respects. —হয় আর কাহাকেও ভালবাসে, না হয় এসকল বিষয়ে এখনও শিশুর মত আছে।

সুরেশ। I think both of these assumptions are true. —আমার বোধহয় দুই অনুমানই সত্য।

বানার্জি। I have never come accross a more pure-minded and simple hearted woman than your sister. —তোমার বোনের চেয়ে অধিক পবিত্র-চিত্ত ও সরল-হৃদয় স্ত্রীলোক আমার জ্ঞানে দেখি নাই।

সুরেশ। Did n't I tell you there was not much hope —আমি ত তোমাকে বলেছি বড় আশা নাই।

বার্নাজি। But I have not lost my hopes altogether.—আমার আশাটা একেবারে যায় নাই।

তৎপরে ভ্রাতা ভগিনীতে যাত্রা করিলেন। পথে এস. পি. রায়. ও তাঁহার পত্নীর বিষয়ে এবং বার্নার্জির বিষয়ে অনেক কথা হইতে লাগিল। নয়নতারা যেভাবে বার্নাজির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, সেই প্রশংসার ছড়াছড়ি দেখিয়া সুরেশচন্দ্র মনে মনে বলিলেন.—It seems all his arts of love making have fallen upon her like water on a duck's back.—অর্থাৎ হাঁসেরপৃষ্ঠে যেমন জল দাঁড়ায় না, দেখিতেছি এর মনে বানার্জির প্রেম দাঁড়ায় নাই

পরদিন চুঁচড়ার দলের সহিত কেল্লার গোরাদের ক্রিকেটের ম্যাচ। প্রাতঃকাল হইতেই তারাপদ রায় মহাশয়ের ভবনে কল কল আরম্ভ হইয়াছে। বিনোদ, বিপিন প্রভৃতি মেয়েদিগকে অনেক কথা শুনাইয়াছে। কেল্লার গোরাদের সঙ্গে পূর্বে কোন্‌ কোন্‌ দলের ম্যাচ হইয়াছিল. তাহাতে কাহাদের জিত হইয়াছে, বিগত বৎসর তাহারা প্রেসিডেন্সি কালেজের দলকে কিরূপে হারাইয়া দিয়াছিল, ইত্যাদি অনেক সংবাদ দিয়াছে। তাহারা জোর করিয়া বলিতেছে, হুগলী কালেজের জিত হইবে না, ক্রিকেটের ম্যাচে ইংরাজকে হারান বড় সহজ কথা নয়। ইহা লইয়া মেয়েদের সঙ্গে তাহাদের অনেক তর্ক বিতর্ক হইতেছে।

যথাসময়ে সকলে খেলা দেখিতে গেলেন। প্রথমে বোধ হইতে লাগিল, যেন গোরারা জিতিবে; কিন্তু ত্বরায় বাজি ফিরিয়া গেল। হরেন্দ্রের দলের লোকেরা পদে পদে জিতিতে লাগিল। তাহারা একটা খেলা জেতে, আর চারিদিকে করতালিধ্বনি উত্থিত হয়। শেষে তাহাদেরই জিত হইল। চারিদিক হইতে ইংরাজগণ আসিয়া হরেন্দ্রের দলের লোকদিগের সহিত করমর্দন করিতে লাগিলেন। হরেন্দ্র চারিদিকের গাড়িতে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যদি কোনও দিকে নয়নতারাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাদের গাড়ি এক পার্শ্বে ছিল।

সেই দিন সায়ংকাল হইতে সহরে এই চর্চাই চলিল; হুগলী কালেজের ছেলেরা খেলাতে কেল্লার গোরাদের হারিয়ে দিয়েছে। পরদিন খবরের কাগজে এই সংবাদ। তারাপদ রায় মহাশয় বলিলেন, "হরেন এদিকে একবার এল না কেন? আমরা একটা পুরস্কার দিতাম।" নয়নতারা মর্ম ভরিয়া এই সকল প্রশংসা-গীতি পান করিতে লাগিলেন।

পরদিন রায়পরিবারের সন্তানেরা চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈকালে হরেন্দ্র নয়নতারারা সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

নয়নতারা। (হরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া তাঁহার সন্নিধানে গিয়া) আসুন, আসুন, আপনাকে কি পুরস্কার দেব বলুন তো? কাল আপনাদের খেলা দেখে কি সুখ হয়েছে, তা কি বলবো!

হরেন্দ্র। কৈ আপনাকে ত দেখতে পাইনি।

নয়নতারা। (হাসিয়া) আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে খুঁজচেন. ভাগ্যে কাছে ছিলাম না।

হরেন্দ্র। কেন কাছে থাকলে কি হতো?

নয়নতারা। বার বার আমার দিকে তাকাতেন, আর আমার লজ্জা করতো।

হরেন্দ্র। প্রথম প্রথম আমার মনে একটা ভয় ছিল কি হয় কি হয়। শেষে সেটা থাকল না।

নয়নতারা। সেটা আপনাদের খেলা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। যা হোক এবার আপনারা হুগলী কালেজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, হুগলী কালেজ কেন, বাঙ্গালীদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমি যা বলেছি আপনাদের দলের একদিনের বন-ভোজনের টাকা দেব, তা নিয়ে যান।

হরেন্দ্র। এখন নিয়ে কি করবো, কবে বন-ভোজন হবে আর কত খরচ হবে সেটা ঠিক করি, তার পর নেব। আপনারা বন-ভোজন দেখতে যাবেন ত?

নয়নতারা। ছি! ছি! আপনি যে মেয়েদের বেহায়া করে তুলতে চান দেখছি, পুরুষদের ক্লাবের সঙ্গে আবার মেয়েরা যাবে কি!

হরেন্দ্র। কেন আপনারা বোটে থাকবেন, বোটের ছাতে বসে দেখবেন।

নয়নতারা। তা কি হয়, সেটা ভাল দেখায় না। (একটু মৌনী থাকিয়া) আমার কাকা আমাকে কেমন একটি সুন্দর জিনিষ কিনে দিয়েছেন দেখবেন?

উঠিয়া মুক্তার মালা ছড়াটি আনিয়া হরেন্দ্রের হস্তে দিলেন।

হরেন্দ্র। বাঃ কি সুন্দর মালা ছড়াটি! গলায় দিন দেখি।

নয়নতারা পরিধান করিলেন।

হরেন্দ্র। (নয়নতারার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া) বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

এই কথাগুলি হরেন্দ্র এমনভাবে বলিলেন যে শুনিয়া ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নয়নতারার মুখ কি এক অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইল! প্রণয়িনীর মুখে এই শ্রীটি পুরুষের চোখে অতি সুন্দর দেখায়। ইহাতে মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে; প্রাণকে সুধারসে প্লাবিত করে এবং দেহ-মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রেমকে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়! হরেন্দ্র তাহা অনুভব করিলেন, কিন্তু নয়নতারা বোধহয় এতটা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া মালা ছড়া রাখিতে গেলেন, হরেন্দ্রও টুনী-পটলাকে পড়াইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

পরদিন রায়পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সকলে বোটে করিয়া গঙ্গাতীরস্থিত একটি উদ্যানে বন-ভোজন করিতে গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মণিলালবাবু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, যে নয়নতারাকে তাঁহাদের বাড়ীতে একবার যাইতেই হইবে। তৎপরে গিয়া অবধি বার বার পত্র লিখিতেছেন, "কৈ এলে না?" তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অবশেষে স্থির হইল, যে তিনি জননীর সহিত একদিন কলিকাতাতে স্বীয় পিতৃব্যের ভবনে যাইবেন, সেখান হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন করিবেন। তদনুসারে মণিলালবাবুকে ও তারাপদবাবুকে পত্র লেখা হইল।

মাঘ মাসের প্রথমে একদিন মাতা ও কন্যা কলিকাতায় তারাপদবাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। বলাবাহুল্য তাঁহাদের আগমনে কলিকাতার বাড়ীর সকলের মহা আনন্দ! রায়-পরিবারে ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে যেমন সৌহার্দ্দ যা-এ যা-এ তেমনি প্রেম। দুই যা-এ একত্র হইয়া পরস্পরের ঘরকন্নার কথাতে সমস্ত দুপুরটা অতিবাহিত করিলেন। ছেলেরা স্কুল হইতে আসিয়া দেখে মেজ জেঠাই ও বড়দি আসিয়াছেন, তাহাদের আনন্দ রাখিবার আর স্থান হয় না। জেঠাইমা ও বড়দিকে কত চুম্বন দিল ও কত চুম্বন পাইল! কে পরীক্ষাতে কেমন হইয়াছে, কে কোন্ ক্লাসে উঠিয়াছে, কে কি বই পড়িতেছে, নয়নতারা সে সকল সংবাদ লইলেন।

ক্রমে তারাপদবাবু কাছারি হইতে ফিরিলেন। বহুদিনের পর ভাজ ঠাকুরাণীকে গৃহে সমাগত দেখিয়া বড়ই আনন্দ করিতে লাগিলেন।

তারাপদ। যা হোক বৌদিদি! অনেক কালের পর এ বাড়ীতে তোমার পাদধুলো পড়ল। ভাগ্যে মণিলালবাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এবার হতে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হলে কারুকে দিয়ে নিমন্ত্রণ করাবো।

জ্যেষ্ঠা গৃহিণী। ঠাকুরপো! জানই ত আমার বাড়ী হতে বার হওয়া কত কঠিন। মেয়েটা আমাকে না হলে নড়ে না, কি করি কাজেই আসতে হলো।

তারাপদ। কেন এ বাড়ীটে কি তোমার বাড়ী নয়? তাঁদের যেমন দেখ, আমাদেরও ত

তেমনি একটু একটু দেখতে হয়। সব ভালবাসা তাঁদেরই দেবে, আমরা কি কেউ নই? মাঝে মাঝে এক আধবার আসতে হয়। এক একবার মুখখানা দেখলেও প্রাণটা ভাল থাকে। যাহোক এবার যখন নিজ কোটে পেয়েছি, তখন দুচার দিন যেতে দেব না।

জ্যেষ্ঠা গৃহিণী। (হাসিয়া) তোমাদের দুই ভেয়ের কাছে কথাতে ত কেউ পারবে না।

নয়নতারা। (পিতৃব্যের প্রতি) তুমি কেবল আমার মাকে দোষ দেবে; কৈ তুমি কেন কাকীমাকে নিয়ে চুঁচড়ার বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাও না? তুমি কাকীমাকে খাঁচার পাখীর মত পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছ, একটু নড়তে চড়তে দেও না, তোমার ভারি অন্যায়।

তারাপদ। এতগুলি ছেলেপিলের মার কি নড়াচড়া সহজ?

নয়নতারা। আমার মার বুঝি ছেলেপিলে নেই?

তারাপদ। তোমরা যে বড় হয়েছ, তোমরা ত আর পায়ের বেড়ী নও। তারপর তুমি ত এখন ঘরের গিন্নী বৌদিদি ত এখন স্বাধীন। মিষ্টি জিনিসটা তোমরা একাই নেবে? আমাদেরও এক একটু দেও।

নয়নতারা। (উঠিয়া বাহুদ্বারা পিতৃব্যের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক, তাঁহার কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়া) এমন কাকা কারুদের নাই।

কনিষ্ঠ রায় ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদর পাইয়া অন্তরে কি গভীর সুখ অনুভব করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

ক্রমে সন্ধ্যা সমুপস্থিত। জননী ও নয়নতারা বিনোদকে সঙ্গে করিয়া মণিলালবাবুর ভবনে গমন করিলেন। পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া মহিলাদ্বয়ের প্রবেশ করিতে হইল। বিনোদ বেচারার এইখানেই মেজো জেঠাই ও তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিল। সে বড় দ্বার দিয়া বাহিরের বাড়ীতে গিয়া বাবুদের হস্তে পড়িল।

মহিলাদ্বয় ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র মণিলালবাবু ও তাঁহার পত্নী আসিয়া অনেক অভ্যর্থনা করিলেন। অপরাপর মহিলাগণ নবাগতাদ্বয়কে কৌতূহলপূর্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন মণিলালবাবুর মুখে "নয়নতারা, নয়নতারা" শুনিয়া শুনিয়া যাঁহাদের কর্ণদ্বয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ওমা তাই ত একটা দেখবার মত মেয়ে বটে।"

ইঁহাদের আসিবার পূর্বেই মণিলালবাবু স্বীয় ভবনস্থ বন্ধুদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা যেন নয়নতারাকে অথবা তাঁহার সমক্ষে তাঁহার জননীকে তাঁহার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা না করেন। "মেয়েটি তাতে বড় লজ্জা পায়।" সুতরাং সে বিষয়ে সকলেই সাবধান থাকিলেন।

এই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারটির একটু বর্ণন আবশ্যক। ইঁহারা কলিকাতার বনিয়াদী ঘর। সহরে কত পুরুষ বাস কেহ বলিতে পারে না। বাহির সিমলাতে যে পল্লীতে ইঁহারা থাকেন, সে পল্লীর এতটা স্থান এই পরিবারের লোকে যুড়িয়া লইয়াছেন, যে পল্লীটার নাম বাঁড়ুয্যে পাড়া হইয়া গিয়াছে। পুরাতন পৈতৃক ভিটাতে এখনও কয়েক পরিবার আছেন।

এই ভবনটি প্রাচীন ও নবীনের সমাবেশে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। কোন কোনও অংশ অতি প্রাচীন, ছাতের ইষ্টকগুলি সেকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট, কড়িগুলিতে আলকাতরা দেওয়া, বাহিরের প্রাচীরে বহুদিন বালি চূণ না পড়াতে লোণা ধরিতেছে; আবার তৎপার্শ্বের অংশে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের অবস্থা একটু ভাল হওয়াতে নূতন ধরনে খড়খড়ি সারসী বসাইয়া রঙ দিয়া, নিজ অংশটুকু সভ্য ধরনের করিয়া লইয়াছেন। বংশানুক্রমে যত না ভাগ হইয়াছে, প্রাচীরের পরে প্রাচীর পড়িয়া সমগ্র বাড়ীখানি, পায়রার খোপের মত হইয়া গিয়াছে। কত দিকে যে কত দ্বার ফুটাইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা কঠিন। যেন পুত্তিকার বল্মীক। যাহারা তন্মধ্যে থাকে তাহারা জানে, অন্যের জানিবার উপায় নাই।

ক্রমে বসতবাটীতে আর স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে, এক এক পরিবার বাহির হইয়া, আপনাদের প্রয়োজনমত ভবন নির্মাণ করিয়া লইয়াছেন। এইরূপে বাঁড়ুয্যে পরিবার পাড়াটির অনেক স্থান ব্যাপিয়াছেন।

কিন্তু ইঁহাদের ভিতরে এই একটি চমৎকার ভাব দেখা যায়, যে পরস্পরের সহিত আশ্চর্য সদ্ভাব। সহরের সকল লোকের মধ্যে শুনা যায়, যে এই বিস্তীর্ণ পরিবারের লোকদিগের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া মামলা মকদ্দমা [illegible] হয় না। বিবাদের কোনও কারণ ঘটিলে, ইহারা পাঁচজনে বসিয়া একটা নিষ্পত্তি [illegible] ফেলেন। এই সদ্ভাব ও শান্তির একটা প্রধান কারণ, ইঁহাদের একজন কর্তা আছেন, তিনি বর্তমান সময়ে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি একজন ন্যায়বান [illegible]। তাঁহার প্রতি পরিবারস্থ সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং তিনিও সকলের প্রতি সমদর্শী। [illegible] বিচার করিয়া [illegible], তাহা [illegible] সর্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

[illegible] পাঠক [illegible] যে [illegible] দেখা যায়, প্রাচীন রীতিনীতি [illegible] এই ভবনে [illegible] পাড়বে সবই যেন সেকেলে। খাট-[illegible] ঐরূপ এবং ঐ স্থানেই [illegible] কখনও বসে না, তাহারা অপেক্ষা [illegible] হইয়া [illegible] ঘরে যে [illegible] একখানি ছবি আছে, [illegible] দেখিলে বোধ হয়, কলিকাতার [illegible], এত [illegible], এত চর্চা উঠিয়াছে, কিছুই যেন [illegible] প্রাচীন কলিকাতাতে বাস করিতেছেন। আজিও গামছাখানি [illegible] আসিলে গঙ্গাজলে ধরইয়া গ্রহণ করেন; [illegible] ও সুপরিস্কৃত, তথাপি সেই উঠানে প্রতিদিন [illegible] শয়ন-গৃহে আসিলে গঙ্গাজল [illegible] দিয়া শুদ্ধ করিয়া [illegible]।

কি [illegible] অন্তঃপুরে [illegible] এই [illegible] বাহির বাড়ীতে পরস্পর-[illegible]। [illegible] অনেকে বাহির বাড়ীতে অনেক অশাস্ত্রীয় ও [illegible] করিয়া থাকেন, [illegible] হয় না এবং যাহা মহিলারা জানিয়াও জানেন না, তাহারা মোটামুটি একটা কথা ধরিয়া রাখিয়াছেন, "[illegible]-মাহাত্ম্য" এটা সহিতেই হইবে। ঐ শয়নগৃহে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কালীপদ [illegible] মত নব্যতন্ত্রের অতিথিগণ বাহির বাড়ীতে কখনও কখনও আসিয়া থাকেন, সেখানে তাহাদের পরিচর্যার বন্দোবস্ত হয়, অন্তঃপুরকে তাহা স্পর্শ করে না।

এরূপ ভবনে রায়-পরিবারের মহিলাদ্বয়ের নিমন্ত্রণ। তাঁহারা মণিবাবুর অশীতিপর বয়স্কা বৃদ্ধা জননীর চরণে প্রণত পদধূলি ও আশীর্বাদ লইয়া মণিবাবুর শয়নগৃহে গিয়া বসিলেন। সেখানে রায়-গৃহিণী ও বাঁড়ুয্যে-গৃহিণীতে প্রেমালাপ, বহুদিনের সুখ দুঃখের কথা, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, অশ্রুপাত প্রভৃতি হইল।

আহারের সময় বিনোদ বেচারার বড় ইচ্ছা হইল যে, মেজ জেঠাই ও বড়দির সঙ্গে আহার করে, কিন্তু সে বেচারা বাড়ীর ভিতরে আসিতে পাইল না; সে মণিবাবু, গোবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে বাহির বাড়ীতে আহার করিল। মাতা ও কন্যাতে বাড়ীর ভিতরের একটি ঘরে দুজনে একা একা আহার করিলেন।

আহারান্তে মহিলারা পুনরায় বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের শয়নগৃহে সমাসীন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মণিবাবু অন্তঃপুরে আসিয়া মহিলাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমরা নয়নতারাকে এখানে দেখে কিছু বুঝতে পারবে না, ওকে চুঁচড়ার বাড়ীতে না দেখলে বোঝা যায় না; [illegible]

সংসারটা কি রকমে চালাচ্ছে দেখলে বুঝতে পারবে এই মেয়ের শক্তি কত। কেবল তা নয়, লিখতে পড়তে, গাইতে বাজাতে সকল দিকেই পরিপক্ক। ওর গান বাজনা একটু শুনবে?"

মহিলারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ হাঁ তা শুনতে হবে বৈকি?"

মণিলাল। (নিকটস্থ একটি বালকের প্রতি) গোবিনের সেতারটা ও বেহালাখানা চেয়ে আনত।

নয়নতারা। জেঠামশাই, আজ থাক।

মণিলাল। না না, দোষ কি, আমরা ত তোমার পর নই, আমাদের কাছে গাইতে বাজাতে দোষ কি?

নয়নতারা। না জেঠামশাই আজ থাক।

তাঁহার আপত্তির প্রতি কেহ কর্ণপাত করিলেন না। মণিলালবাবু পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী বলিলেন,—"তবে একটু বাজা, সকলে এত জেদ করে ধরেছেন।"

জননীর আদেশে নয়নতারা সেতারটি কোলে লইলেন। সুরটা বাঁধিয়া লইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সুন্দর স্বরলহরী উত্থিত করিলেন। সকলে চারিদিকে চিত্রার্পিতের ন্যায়। সেতার ও বেহালা চাহিতে গেলে, গোবিন কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার সহিত উক্ত যন্ত্রদ্বয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচয় পরে দিতেছি, দিলেই সকলে জানিতে পারিবেন, তিনি সংগীত-বিদ্যাতে কিরূপ পরিপক্ক ব্যক্তি ও যন্ত্রগুলি তাঁহার কিরূপ প্রিয়। সেই যন্ত্রগুলি মেয়েমানুষের হাতে পড়িবে এটা গোবিনের প্রাণে সহে না। মেয়েমানুষ গান বাজনার কি জানে? গোবিন মেয়েমানুষের গান বাজনা অনেক দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাকে বিদ্যা বলে না, কেবল ভেংগচান মাত্র। গোবিন চিরদিন যে-সকল স্ত্রীলোকের সহিত মিশিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি অশ্রদ্ধাই বাড়িয়াছে; সুতরাং স্ত্রীলোকে বাজাইবে যখন শুনিলেন, তখন একটু হাসিয়া যন্ত্রদুটি দিলেন।

কিন্তু নয়নতারা যখন স্বরলহরী তুলিতে লাগিলেন, তখন গোবিন আর বাহির বাড়ীতে থাকা কঠিন বোধ করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"তাই ত এ যে দেখি পাকা হাত।" আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে আসিয়া যে ঘরে মহিলারা সমাসীন ছিলেন, তাহার জানালার অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

সেতারে দুই একটি গৎ বাজাইয়া নয়নতারা সেতারটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এ সেতারটি কার?"

মণিলাল। ওটা আমার ছোট ভাই গোবিনের।

নয়নতারা। বেশ সেতারটি, আমার ওস্তাদ দেখলে বড় খুসী হন।

মণিলাল। আমাদের গোবিন একজন পাকা বাজিয়ে, সে তোমার বাজনা শুনলে খুব খুসী হত।

অমনি একজন মহিলা বলিয়া উঠিলেন—"ঐ যে গোবিন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শুনছে।

মণিলাল। এসনা গোবিন, ভিতরে এস।

মণিলালবাবুর পূর্বে ইচ্ছা ছিল না যে গোবিনের সহিত মহিলাদ্বয়ের বিশেষ পরিচয় করিয়া দেন; কারণ তিনি গোবিনের প্রতি প্রসন্ন নহেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন।

গোবিন সলজ্জভাবে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া মহিলাদ্বয়কে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আসন পরিগ্রহ করিলেন।

মণিলাল। গোবিন তুমি একবার বাজিয়ে শুনাও ত।

গোবিন তাহাতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু মহিলাদিগের আগ্রহে ও গুরুজনের অনুদেশে সেতারটি তুলিয়া লইলেন। তিনি একটি গৎ ধরিবামাত্র নয়নতারার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি আচ্ছন্ন হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সেতার থামিলে নয়নতারা বলিলেন,—

"তুমি ত একজন ওস্তাদ।" পরে উভয়ে সংগীত-বিদ্যা বিষয়ে দুই চারিটি কথা হইল। নয়নতারা গোবিন কোন্ ওস্তাদের কাছে শিখিয়াছেন, কতদিন শিখিয়াছেন প্রভৃতি অনেক প্রশ্ন করিলেন।

মণিলালবাবু পুনরায় নয়নতারাকে একটি ব্রহ্মসংগীত করিবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। নয়নতারা কিছুতেই সম্মত নহেন। একে যেখানে সেখানে যেমন তেমন অবস্থাতে ভক্তিবিষয়ক সংগীত করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহাতে আবার গোবিনের মত পাকা গাইয়ে ও বাজিয়ে লোকের কাছে বেহালা ধরিতে সাহস হয় না। অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ির পর, নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে বেহালাখানি তুলিয়া লইলেন ও অনেকক্ষণ চিত্ত স্থির করিয়া ভক্তিভাবে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া সংগীত ধরিলেন। ভক্তিসংগীতের প্রাণ ভক্তি; সেই একই সংগীত দুইজনে গায়, দুই প্রকার শুনায়; কাহারও মুখে অমৃত বর্ষণ করে, কাহারও মুখে খেংরা মারে। সংগীতে যদি গায়ক আপনাকে দেয়, আপনি ডুবিয়া যায়, তবেই তাহা বিচিত্র শুনায়। অদ্যকার মজলিসে তাহাই হইল। ভক্তিসংগীত গাইতে গিয়া নয়নতারার নয়নে ভক্তি-অশ্রু গড়াইতে লাগিল। তাহাতে সেই বিনয়াবনত ও হ্রীসমন্বিত মুখখানি কি অপূর্ব শ্রীই ধারণ করিল! সেই অশ্রুধারা দর্শনে আরও অনেক চক্ষু সিক্ত হইয়া গেল। গোবিনের প্রাণে এক নূতন তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

গোবিনের একটু পরিচয় এখানে আবশ্যক। গোবিনের বয়স এখন ৩০।৩২এর অধিক হইবে না। বর্ণটি উজ্জ্বল, শ্যাম; গৌর বলিলেই হয়; চক্ষু দুটি বিশাল ও উজ্জ্বল; যেন কৌতুকে ভাসিতেছে! মস্তকে ঘন নীল কেশরাজি, পোমেটম, সুগন্ধি ও ব্রুস, কঙ্কতাদি সহকারে আলবার্ট ফ্যাসনের টেরীতে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে ঢেউ খেলাইয়া পড়িয়াছে; মস্তকের সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাতের চুল খাট করিয়া কাটা; সভ্য-ভব্য মানুষটি; পরিষ্কার কপ-বিশিষ্ট সার্টের উপরে একটি সুভব্য কোট; ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরা; আধা লাল, আধা কাল, চিনেবাড়ীর শিলপার পায়ে, তদুপরে এক যোড়া দামী ও প্রথম শ্রেণীর হাফ মোজা।

এখন গোবিন হাইকোর্টের একজন এটর্নি। লোকে বলে মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা উপার্জন করেন। কিন্তু পাঠদ্দশাতে গোবিনের বড়ই অখ্যাতি ছিল। গান বাজনার বাতিকটা বাল্যকাল হইতেই আছে। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্মোপলক্ষে দূরে দূরে থাকাতে গোবিনের দেখিবার কেহই ছিল না; সুতরাং গোবিন কেবল ইয়ারের দলে গান বাজনা করিয়া বেড়াইত। বাড়ীর লোকে দেখিত ১০টার সময় পুস্তকগুলি লইয়া বিদ্যালয়ে যাইত; কিন্তু গোবিন ক্লাসে বইগুলি রাখিয়া দ্বারবানকে দুই চারিটি পয়সা দিয়া, সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে থাকিত। কোনও ইয়ারের বাড়ীতে বা নিকটস্থ কোনও অভদ্র স্থানে সমস্ত দিন তাস পিটিয়া, চুরুট ফুঁকিয়া ও গাইয়া বাজাইয়া কাটাইত। আবার যথাসময়ে পুস্তকগুলি লইয়া গৃহে আসিত। এইরূপ অনেকদিন করিত। ক্রমে যখন এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল, তখন গোবিন এক কৌশল খেলিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইল। গোবিন মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান; সুতরাং ইচ্ছা করিলেই টাকা পাইত। সে পরীক্ষা-হলের সন্নিকটে একটি ঘর ভাড়া করিল; সেখানে একজন বি, এ পাশকরা ছেলেকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিল; তাহার সঙ্গে কথা রহিল, যে গোবিন পরীক্ষার হল হইতে চাকরের হাতে পরীক্ষার প্রশ্ন পাঠাইয়া দিবে, সে যুবকটি ঐ ঘরে বসিয়া তাহার উত্তর লিখিবে; তৎপরে পরীক্ষা হলের দপ্তরীদিগের সাদা কাগজের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ লিখিত উত্তরের কাগজ গোবিনের নিকট আসিবে। দপ্তরীদিগকে ঘুষ দিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপে গোবিন পরীক্ষা দিয়াছিল। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন শিক্ষক, বালক, পাড়ার লোক, ঘরের লোক সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইল, গোবিন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে! শুনিতে পাওয়া যায়, এইসব কারণেই নাকি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীদিগকে বাঁধা খাতা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত করা হইয়াছে। প্রবঞ্চনা কয়বার চলে? এল ,এ পরীক্ষাতে আর গোবিনের উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তাহার পাঠও সেইবারে সাঙ্গ হইল।

একদিকে যার খোলে না, অনেক সময় আর একদিকে তার খুলিয়া থাকে। গোবিন কালেজ ছাড়িয়া উকীলের বাড়ীতে ক্লার্ক হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে এটর্নির পরীক্ষায় উৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইয়া এটর্নি হইল। যেই এটর্নি হওয়া অমনি পশার জমিতে আরম্ভ। যেন এই কাজের জন্যই ঐ মনুষ্যটির সৃষ্টি হইয়াছে। কতিপয় বৎসরের মধ্যে গোবিনের মাসিক আয় প্রায় দুই হাজার দাঁড়াইয়াছে। দেশীয় রংগভূমিগুলির অভিনেতা ও অভিনেত্রী মহলে গোবিনের খুব পশার। গোবিন তাহাদের ব্যাণ্ডমাষ্টার না হইয়াও ব্যাণ্ডমাষ্টারের কাজ করিয়া থাকেন। প্রায় সকল রিহার্সালে উপস্থিত থাকিয়া গান বাজনার ভ্রমসংশোধন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন বাবুদের বৈঠকে, বাগানের আমোদে, সর্বত্রই গান বাজনার আসরে গোবিন না হইলে চলে না। এইরূপে সহরের যত অসচ্চিত্র পুরুষ ও রমণী আছে, তাহাদের অধিকাংশের সহিত গোবিনের আলাপ পরিচয় ও অনেকের সংগে মাখামাখি; অথচ বিনয়, সৌজন্য, ভদ্রতাতে গোবিনের সমকক্ষ লোক মেলা ভার। তিনি মাতালের দলে সর্বদা ঘোরেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে অভদ্ররূপে মাতলামি করিতে অথবা ব্রীড়াজনক কোনও প্রকার গর্হিত কার্যে লিপ্ত হইতে কখনও দেখে নাই। তাঁহার অনেক সদ্গুণও আছে; তিনি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি প্রীতিমান, গুণানুরাগী, পরোপকারী ও সাহিত্যানুরাগী; ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে সুপরিপক্ক। দুই বৎসর হইল, গোবিন বিপত্নীক হইয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে যেরূপ প্রলোভন তাহাতে তাঁহার ঘোর যথেচ্ছাচারে নিমগ্ন হইবার কথা। কিন্তু কি কারণে জানি না তদবধি সন্ধ্যার পর বড় একটা বাড়ীর বাহির হন না, যে দুই একজন বন্ধু বাড়ীতে আসেন, তাঁহাদিগকে লইয়া পড়াশুনা, গান বাজনাতে সন্ধ্যাটা যাপন করিয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহার পশার বৃদ্ধির সংগে সংগে কাজ বৃদ্ধি হইতেছে, সেজন্যও অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতে হয়।

যাহা হউক আজ গোবিনের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। তিনি অনেক স্ত্রীলোকের সংগে মিশিয়াছেন বটে, কিন্তু যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক আজ দেখিলেন, এ শ্রেণীর রমণী জীবনে কখনও দেখেন নাই। স্বাভাবিক হ্রীশীলতার পশ্চাতে এমন রূপ, এমন সৌজন্য, এমন বুদ্ধি-বিদ্যা ও এমন কোমলতা কখনও দেখেন নাই। নয়নতারা জননীর সহিত চলিয়া গেলেন, গোবিনের বোধ হইল যেন আর কোন দেশ হইতে কি একটি স্বর্গীয় বিহংগ থামিয়া, একবার ডাকিয়া উড়িয়া গেল। মনটা যেন সেই পক্ষীর উদ্দেশে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল!

এদিকে নয়নতারা চুঁচড়াতে আসিয়া হরেন্দ্রের নিকট তাঁহাদের কলিকাতা যাত্রার সমুদায় বিবরণ বর্ণন করিলেন ও গোবিনের চেহারা, রীতিনীতি ও সংগীত বিদ্যার অনেক প্রশংসা করিলেন।

হরেন্দ্র পাঠদশাতে ঐ বাড়ীর পাড়াতে থাকিতেন। তিনি গোবিনকে বিশেষরূপে জানেন। প্রতিদিন তাঁহার কীর্তি কর্ণগোচর হইত, গোবিন কিরূপে এণ্ট্রান্স পাশ হইয়াছিল, সে কিরূপ লোকের সংগে মিশিত ও তাঁহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই। তাঁহার সমবয়স্ক বালকগণ গোবিনকে ও গোবিনের দলের বালকদিগকে ভয়ে দূরে দূরে পরিহার করিত। সুতরাং মণিলালবাবুর বাড়ীতে গিয়া যে নয়নতারার গোবিনের সহিত আলাপ হইল, এটা তাঁহার ভাল লাগিল না। তৎপরে তাঁহার মুখে গোবিনের প্রশংসা শুনিয়া আরও অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, "এ সকল লোকের এরূপ ভদ্র মহিলাদের সংগে কথা কহিবার অধিকার থাকা উচিত নয়।" একবার মনে করিলেন যে, গোবিনের স্বভাব চরিত্রের বিষয় কিছু জানাইয়া দিবেন; আবার ভাবিলেন, সেটা ছোট কাজ, হয়ত নয়নতারা সেটাকে পরনিন্দা মনে করিবেন, পছন্দ করিবেন না। "দূর হোক্, একদিনের দেখা বৈত নয়। যাক্ আর কিছু বলব না।" কেবলমাত্র বলিলেন, "আমি গোবিনবাবুকে বেশ জানি, আমি সে পাড়ায় অনেক দিন ছিলাম।" মনে করিয়াছিলেন এইমাত্র বলিলেই নয়নতারা তাঁহার বিষয়ে আরও জানিতে

চাহিবেন, তখন তাঁহার স্বভাব চরিত্রটা বলিয়া দেওয়ার সুবিধা হইবে। কিন্তু নয়নতারা আর কিছু জানিতে চাহিলেন না। হরেন্দ্রের মনের ভাবটা এইখানেই নিরস্ত হইল।

কিন্তু একদিন পরেই নয়নতারার নামে গোবিনের এক চিঠি আসিল। গোবিনের চিঠির মর্ম এই,—"সংগীত বিদ্যা বিষয়ে আপনার সহিত সেদিন কথা হইয়াছিল। তৎপরে সে বিষয়ে ভাবিয়াছি, আরও কোন কোন বিষয়ে কথা কহিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনাদের চুঁচড়ার বাড়ীতে গেলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে কিনা এবং যদি হয় কোন্ সময়ে হইবে?" নয়নতারা পিতার সম্মতিক্রমে উত্তর দিলেন,—"আপনাদের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাতে আপনি আমাদের বাড়ীকে নিজের বাড়ী মনে করিতে পারেন এবং আপনি যখন ইচ্ছা আসিবেন।"

হরেন্দ্র এই চিঠির কথা যখন শুনিলেন, তখন ভাবিলেন, "এযে দেখি পরিচয়টা পাকা-পাকিতে দাঁড়ায়। নয়নতারা গোবিনের স্বভাব-চরিত্র না জানিতে পারেন, কিন্তু রায় মহাশয় কি জানেন না? তিনি কোন্ হিসাবে এতটা আত্মীয়তা করিতে দিতেছেন? ইঁহাদের উদারতাটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যায়।" এই সকল চিন্তা করিয়া একবার মনে করিলেন, গোবিনের স্বভাব চরিত্রের কথাটা নয়নতারাকে বলিয়া দিবেন। কিন্তু আবার কেমন বাঁধ বাঁধ করিল,—একজন মানুষের অসাক্ষাতে তাহার বিরুদ্ধে বলিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ তাহাকে যখন আসিতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তখন নয়নতারার নিকটে তাহার নিন্দাবাদ করিলে, তাহার আতিথ্যটার পক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইতে পারে। "দূর হোক্ গোবিন এসে চলে গেলে বলব। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করব।" এই স্থির করিয়া মনের ভাব মনেই গোপন রাখিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পরের শনিবার অপরাহ্নে নয়নতারা গোবিনের এক পত্র পাইলেন; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যে সেই সায়ংকালে তিনি আসিবেন ও তৎপর দিন থাকিবেন। পত্র পাইয়াই তিনি গোবিনের আতিথ্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। একবার দেখিয়া ও বাড়ীর লোকের মুখে শুনিয়া, তিনি গোবিনের রুচি, প্রবৃত্তি, রীতিনীতি সম্বন্ধে যে ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নীচে গিয়া একটি ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া ঘরটি সাজাইতে লাগিলেন।

এদিকে হরেন্দ্র নয়নতারার উদ্দেশে টুনী ও পটলকে পড়াইবার অনেক পূর্বেই আসিয়াছেন। আজ তাঁহার মনটা বড়ই খারাপ আছে। দেশ হইতে মাতাঠাকুরাণী পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের বসতবাটি বিক্রয় হইয়া যায়। তাঁহার পিতা নিজের একজন আত্মীয় বন্ধুর নিকট বাড়িটি বাঁধা রাখিয়া দেড় হাজার টাকা কর্জ লইয়াছিলেন। সেই দেড় হাজার টাকা সুদে আসলে আড়াই হাজারে দাঁড়াইয়াছে। বাবুটি এতকাল চুপ করিয়াছিলেন, হরেন্দ্রের কর্ম হওয়া অবধি বার বার তাগাদা দিতেছেন। হরেন্দ্রের সামান্য বেতনে যতদূর শোধ হইতে পারে তাহা হইতেছে; বাবুটি তাহাতেও ধৈর্যাবলম্বন করিতেছেন না। এবারে বাড়িটি বিক্রয় করিবার সংকল্প জানাইয়াছেন। হরেন্দ্রের প্রকৃতিটা এইরূপ যে, হৃদয়ে কোনও একটা আঘাত লাগিলে, প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হয়; গভীররূপে সে ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন; যদিও কিয়ৎকাল পরেই কোথা হইতে একটা শক্তি আসে, যাহাতে সে দুঃখটা সহিয়া যায়; তখন তিনি বজ্রের মত কঠিন হইয়া পড়েন; কিছুতেই বিচলিত হন না। এই সংবাদে হরেন্দ্রের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাই তিনি ছুটিয়া নয়নতারার নিকটে আসিয়াছেন। তিনি সব কথা যে তাঁহাকে ভাঙিয়া বলেন তাহা নহে, বিশেষতঃ নিজের দারিদ্র দুঃখের বিষয়ে কিছুই জানান না। নয়নতারাও সে সকল বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করেন না। তবে তাঁহার সেই হাসি হাসি মুখখানি, সেই প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টিটি, সেই সরল পবিত্র ভাবটি দেখিলেই হরেন্দ্রের দুঃখের ভাব লঘু হইয়া যায়। সেই প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মনকে সুধারসে সিক্ত করে।

আজ হরেন্দ্র আসিয়া নয়নতারাকে তাঁহার পড়িবার ঘরে পাইলেন না। চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দিদিমণি কোথায়?" চাকরাণী বলিল, "কল্‌কেতা হতে কে বাবু আসবেন, তাঁর জন্যে ঘর সাজাচ্ছেন।" হরেন্দ্রের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের পক্ষে আর একটু ভার বাড়িল। মনে মনে বলিলেন, "এই ত গোবিন্দ এল দেখছি! এ ভূত সহজে ছাড়লে হয়।" তদনন্তর গঙ্গা-দ্বারের জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া শূন্য শূন্য দৃষ্টে গঙ্গার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে বসিয়া এ কাগজটা সে কাগজটা নাড়িতে লাগিলেন। কিছুই ভাল লাগে না।

কাগজপত্র নাড়িতে নাড়িতে টেবিলের উপরে একখানা "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" পাইলেন। বহুদিনের প্রিয় বইখানা পাইয়া বোধ হইল যেন কোনও বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল! বইখানা তুলিয়া লইয়া খুলিবামাত্র নিম্নলিখিত কবিতাটির উপরে চক্ষু পড়িল। তিনি কবিতাটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠা
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

কণ্ব ঋষি বলিতেছেন—"আজ শকুন্তলা যাবে বলিয়া আমার হৃদয়ে উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইয়াছে; কথা বলিতে গেলে বাষ্পোদয় হইয়া কণ্ঠ অবরোধ করিতেছে; চিন্তাদ্বারা দৃষ্টি জড়ীভূত হইতেছে; আমি বনবাসী সন্ন্যাসী, আমারই যদি স্নেহের জন্য এত বৈক্লব্য ঘটিল, তবে না জানি গৃহী লোকে তনয়া-বিচ্ছেদ ক্লেশ কিরূপে বহন করে।"

কবিতাটি পড়িয়া হরেন্দ্র মনে মনে বলিতে,—অরণ্যবাসী জরাজীর্ণ ঋষির অন্তরে একটি প্রতিপালিতা বালিকার জন্য এতটা স্নেহ দিয়া কবি কি চাতুরীই খেলিয়াছেন! মানব-প্রকৃতিকে কি সুন্দর রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন! ঋষি যখন ঐ বালিকাটি কুড়াইয়া আনেন, তখন কি ভাবিয়াছিলেন ঐ কমনীয় মূর্তি তাঁহার তপঃশুষ্ক অন্তরকে এতদূর আবর্জিত করিবে? বোধ হয় তিনি এতদিন বুঝিতেই পারেন নাই, যে ভিতরে ভিতরে তাঁহার প্রাণটা শকুন্তলার সহিত এতটা বাঁধা পড়িয়াছে। জরাজীর্ণ অন্তরে এই স্নেহ যেন পাষাণপৃষ্ঠে গিরি নির্ঝরিণীর ন্যায় নির্মল সুস্নিগ্ধ ও চক্ষের প্রীতিপদ। চাতুরী সহকারে কবি কোমল নারী-হৃদয়ের কি শক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন! পুরুষের মন যতই কঠোর ও বৈরাগ্যরসে তিক্ত হউক না কেন, নারীর কোমলাঙ্গুলি সেই হৃদয়তন্ত্রীকে স্পর্শ করিলেই সেখানে সুস্বর উত্থিত হয়। নতুবা ঐ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের প্রাণ এই বালিকার সহিত এত আবদ্ধ কেন? তৎপরে কবি আমাদিগকে কি মনোরম দৃশ্যরাজির মধ্যেই উপস্থিত করিতেছেন! শকুন্তলার তরুলতার নিকট বিদায় লওয়া, সখীদিগের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা, মৃগ-শিশুটির অনুগমন, এসব কি সুন্দর! কি সুন্দর! যেন নির্জন বনে বনফুলের গন্ধ পাইতেছি! ঠিক! ঠিক! এদেশে যে একটা কথা চলিত আছে, তাহা ঠিক।

কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
তত্রাপিচ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা॥

অর্থ—কালিদাসের সর্বস্ব অভিজ্ঞান-শকুন্তল, তন্মধ্যে আবার চতুর্থ অঙ্ক যেখানে শকুন্তলা পতিগৃহে) যাইতেছেন।

এইরূপে কাব্যরসে মগ্ন হইয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য নিজের দুঃখ ও নয়নতারার অনুপস্থিতি-ক্লেশ উভয়ই ভুলিয়া গেলেন; কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলেন না। নিমগ্ন-চিত্তে কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পুস্তকখানি রাখিয়া দিলেন—"কৈ তিনি ত এলেন না?" তখন পটল ও টুনীকে পড়াইতে গেলেন।

হরেন্দ্র চলিয়া গেলেই নয়নতারা নিজগৃহে আসিলেন। আসিয়াই শুনিলেন হরেন্দ্র তাঁহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন সেদিন হরেন্দ্র

তাঁহাকে চান, কারণ অপরাপর দিন তাঁহাকে ঘরে না পাইলে, তিনি নন্দরাণী বা সৌদামিনীকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথনে কালযাপন করিয়া থাকেন। মনে ভাবিলেন, "পড়ান হলেই দেখা হবে।"

কিন্তু হরেন্দ্রের পড়ান শেষ হইতে না হইতেই গোবিন আসিয়া উপস্থিত। অন্য সময় হইলে রায় মহাশয় স্বয়ং আসিয়া বন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন; কিন্তু আজ তাঁহার শরীরটা অসুস্থ আছে; সুতরাং সে ভার সুরেশচন্দ্র ও নয়নতারার উপরে দিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রাতা-ভগিনীতে গোবিনের অভ্যর্থনাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। গোবিন গাড়ী হইতে নামিয়াই শুনিলেন রায় মহাশয় পীড়িত; শুনিয়া বলিলেন,—"তাঁর সঙ্গে আগে দেখা করে আসি।" নয়নতারা তাঁহাকে পিতার গৃহে লইয়া গেলেন।

এদিকে হরেন্দ্র পড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, নয়নতারা গোবিনের অভ্যর্থনাতে ব্যস্ত; সুতরাং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

গোবিনকে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে পেঁৗছিয়া দিয়াই নয়নতারা হরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে টুনী পটলের পড়িবার ঘরের দিকে ছুটিলেন। গিয়াই শুনিলেন তিনি আবার একটু অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন মনটা খারাপ হইয়া গেল। ভাবিলেন তাঁর মন নিশ্চয় খারাপ আছে, তা না হলে আমার সঙ্গে বার বার দেখা করবার চেষ্টা করবেন কেন? আহা দু দুবার অপেক্ষা করলেন দেখাটা হলো না। "এখন আসার জন্য চিঠি লিখি।" আবার ভাবিলেন—"চিঠি লেখা বৃথা, রাত্রে আসবেন না। দূর হোক কালই দেখা হবে।"

সন্ধ্যার পরে আহারের পূর্বে রায় মহাশয়, গৃহিণী ও নয়নতারা ভিন্ন সকলেই যথারীতি বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন। সেখানে সৌদামিনীর সহিত গোবিনের পরিচয় হইল। গোবিন দেখিলেন যে দুটি বড় বড় চোখ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া তিনি চুঁচড়াতে আসিয়াছেন, তদ্ব্যতীত এ বাড়ীতে আরও দুইটি বড় বড় চোখ আছে। কেবল তাহা নহে, সৌদামিনীর চোখের কোণে এমন একটু দুষ্টামি আছে, এমন একটু কৌতুক-প্রিয়তা আছে, যাহার আকর্ষণ গোবিন প্রকৃতির পুরুষদিগের পক্ষে অনিবার্য। দুই ভগিনীতে বেশ প্রভেদ। সৌদামিনীর রূপে প্রভা বেশি, নয়নতারার রূপে স্নিগ্ধতা বেশি; নয়নতারার প্রকৃতিটা গভীর ও অন্তর্মুখীন, দেখিলে আকৃষ্ট হইতে হয়, কিন্তু যেন ধরিতে পারা যায় না; হাত বাড়াইতে সাহস হয় না; যেন কি একটা মণ্ডলে তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকে; যাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। সৌদামিনীর প্রকৃতিটা তাহার বিপরীত; উন্মুক্ত-অনাবৃত বহির্মুখীন, যেন বলিতেছে, 'কে বন্ধু হবে এস।' নয়নতারার পশ্চাতে থাকাতেই লোকের চক্ষু এতদিন তাঁহার উপরে ততটা পড়ে নাই। আজ সেই রূপ দেখিবার একজন লোক উপস্থিত। আহারের পূর্বে দুইজনে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। গোবিনের রীতি-নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, সকলি সৌদামিনীর চক্ষে নিখুঁত লাগিল। সেই উজ্জ্বল শ্যাম কান্তি, সুঠাম ও সুগঠন দেহ, বিশাল উজ্জ্বল নেত্রদ্বয়, সুবাসিত সুবিন্যস্ত কেশরাজি, সর্বোপরি সৌজন্যপূর্ণ ভাব ও দৃষ্টি সৌদামিনীর চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া দিল। গোবিনের পক্ষেও সৌদামিনীর প্রভাবযুক্ত রূপ প্রমুক্ত ও কৌতুকপূর্ণ ভাবটি অতিশয় স্পৃহণীয় বোধ হইতে লাগিল।

আহারের সময়েও উভয়ে পাশাপাশি বসিলেন ও অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হইল। তৎপরে আবার সকলে বৈঠক ঘরে আসিয়া বসিলেন। আজ নয়নতারা অনুপস্থিত, তিনি জননীর শয়ন-মন্দিরে পিতার পরিচর্যাতে নিযুক্ত আছেন; সুতরাং নবাগত অতিথির পরিচর্যার ভার সৌদামিনীর উপরেই পড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য দিন তিনি এরূপ অপ্রীতিকর কার্য হইতে অবসৃত হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আজ সে ভাব আসিতেছে না। আজ এই অতিথির সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ তিনি পিয়ানোতে বসিলেন, সেতার শুনাইলেন, গান করিলেন, ছবি প্রভৃতি দেখাইলেন; যাহা কিছু করিলেন তাহাতে গোবিনের মন অধিকতররূপে তাঁহার

প্রতি আকৃষ্ট হইল। অবশেষে গোবিন যখন সেতার ধরিলেন তখন সৌদামিনীর মন একেবারে সুধারসে ডুবিয়া গেল। তিনি অস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সেতার থামিলে গোবিন জিজ্ঞাসা করিলেন শেষের বাজনাটা কেমন লাগল! তখন সৌদামিনীর যেন কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি কি বলিলেন ভাল বুঝিতে পারা গেল না।

আজ সৌদামিনী আরও এমন কিছু অনুভব করিতেছেন যাহা জীবনে অনুভব করেন নাই। অন্য সময়ে তিনি ভগিনীর অন্তরালে থাকিয়া দুষ্টামি করিবার অবসর পান, সকলেই তাঁহাকে বালিকা ভাবে দেখে, তিনিও আপনাকে বালিকার অতিরিক্ত আর কিছু মনে করেন না; এবং বালিকাসুলভ চপলতা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন না; কিন্তু আজ বৈঠকের আসরে গোবিনের সঙ্গে চক্ষে চক্ষে মিলন হইয়া হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য তাঁহার নারীত্ব যেন একবার ফুটিয়া উঠিল। এটা এত আকস্মিক, এত নূতন, এত অপ্রত্যাশিত যে হৃদয়ে হঠাৎ এই ভাবটার আবির্ভাব হইয়া ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সকল দুষ্টামি উড়িয়া গেল। গোবিন তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দ্বিতীয়বার চাহিতে গিয়া আর সে দুষ্টামি দেখিতে পাইলেন না। বোধ হইল সে বালিকা এক নব-ভাব-মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া যেন তাঁহার অপেক্ষা কোনও উচ্চতর লোকে উঠিয়া যাইতেছে! এই ভাব লইয়া উভয়ে নিজ নিজ শয্যাতে গেলেন। সৌদামিনী শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "একি! এ মানুষ আমার মনকে এমন করিয়া জড়ায় কেন?"

গোবিনের মনেও অপ্রত্যাশিতরূপে নবভাবের অভ্যুদয়। তিনি এই অল্প বয়সে কলিকাতা সহরের বাজারের এক-তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোকের সহিত বৈঠক করিয়া থাকিবেন, কিন্তু এরূপ বঁড়শী-গাঁথা ভাবটা কখনও অনুভব করেন নাই।

সে রাত্রে গোবিন ঘুমাইতে যান, সেই বড় বড় দুটি চোখ মনে পড়ে; সেই সেতারের পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলির ক্রীড়া মনে পড়ে; সেই বেহালার ছড়িটির সহিত আন্দোলিত বাহু-লতাটি মনে পড়ে; সেই উজ্জ্বল রূপের প্রভা মনে পড়ে; সেই সুললিত হৃদয়-দ্রবকারী কণ্ঠের স্বরটি মনে পড়ে। গোবিন উঠিয়া বসিয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া রাত কাটাইলেন।

রাত্রে নয়নতারার ভাল নিদ্রা হইল না; অনেকক্ষণ পিতার পীড়ার চিন্তাতে গেল। কেন বাবার শরীরটা দিন দিন এত খারাপ হচ্ছে? সে সম্বন্ধে কি করতে হবে ইত্যাদি। তৎপরে হরেন্দ্রের চিন্তাও আসিল। নিশ্চয় তিনি কোনও প্রকার ক্লেশে আছেন, নতুবা আমাকে দুই দুইবার খুঁজিবেন কেন? বাপ্‌রে কি কষ্টটাই এই মানুষটার উপর দিয়া গেল। মানুষ খুব শক্ত তাই সয়ে উঠতে পারলেন, অন্যে হলে ভেঙ্গে পড়ত। দুঃখই বা কেন করি, এরূপ সংগ্রামে না পড়লে কি মানুষ মানুষ হয়? এই ত বেটাছেলে যে আপনার পায়ে আপনি দাঁড়ায়। কিন্তু মনের ভাবটা যে একটু লঘু করবো তারও যো নেই, ভেঙ্গে ত কিছু বলেন না। কেহ গরীব বলে দয়া করছে ভাবলে তার ত্রিসীমায় যাবেন না। এরূপ মানুষ নিয়ে কারবার করতে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়। আহা! দু দুবার এলেন দেখা হলো না!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রির অধিকাংশ কাল জাগিয়া রহিলেন। প্রাতে উঠিয়া হরেন্দ্রকে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। ভৃত্য পত্রখানি ফিরিয়া আনিল; তৎপৃষ্ঠে পেনসিলে লেখা—"সমাজে উপাসনাতে যাচ্ছি, পরে যাব।"

সমস্ত দুপুরটা নয়নতারা একাকিনী নিজের ঘরে উন্মনস্কভাবে যাপন করিলেন, "কখন আসেন কখন আসেন।" হরেন্দ্র আসিলেন না। আজ রায় মহাশয়ের শরীরটা একটু ভাল, তিনি অপরাহ্নে বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন, কন্যাদের ওস্তাদকে অগ্রেই সংবাদ দিয়া জানাইয়া-ছিলেন, তাঁহার সহিত গোবিনের পরিচয় করিয়া দিলেন, ও সঙ্গীতবিদ্যা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। নয়নতারাও আকৃষ্ট হইয়া সেখানে গমন করিলেন।

এদিকে হরেন্দ্র নয়নতারার উদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত। এবারে ঘটনাচক্রে এ কি রূপ

ঘটিতেছে। তিনি যখন নয়নতারাকে বড়ই চান, তখন বার বার আসিয়া দেখা হইতেছে না। এবারে আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া বেচারার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইল। ভাবিতে লাগিলেন—"এঁদের এই একটা দোষ, মানুষের স্বভাব চরিত্র না দেখে যাকে তাকে একেবারে পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করতে দেন। গোবিন কি এঁদের সঙ্গে মেশবার মত লোক! ওর সঙ্গে এতটা মাখামাখি কি ভাল?"

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে বিরক্তি এতদূর বাড়িয়া উঠিল, যে আর অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না, আবার চলিয়া গেলেন, একটু অপেক্ষা করিলেই নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ হইত সেটা আর হইল না। নয়নতারা কিয়ৎক্ষণ পরে নিজঘরে আসিয়া তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়াই হায় হায় করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন তৎপর দিবস অনন্যকর্মা হইয়া বসিয়া থাকিবেন, দেখা করিতেই হইবে। কিন্তু ভবিতব্যতার দ্বার কে বন্ধ করিতে পারে? সন্ধ্যার পরেই গৌরীপদ রায় মহাশয়ের ভবন হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত। অবিনাশের বালিকা পত্নীর বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দশের অধিক হইবে না, ইহারই মধ্যে সন্তানের মুখ দর্শন করিয়াছে। কিছুদিন হইল সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। শিশুটি সূতিকা গৃহেই সপ্তাহ কালের মধ্যে গতাসু হইয়াছে, এবং জননী ঘোর সূতিকা-জ্বরে ভুগিতেছে। রায় পরিবারের মহিলাগণ ইতিমধ্যে কয়েকবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু দুই দিন হইতে পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, এখন বধূটির জীবন সংশয়। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন এখন শুশ্রূষার বিশেষ বন্দোবস্ত না করিলে চলিতেছে না। তাঁহারা যেরূপ যেরূপ করিতে বলিতেছেন, প্রবীনা রমণীগণের দ্বারা কিছুতেই তাহা হইয়া উঠিতেছে না; সুতরাং শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য নয়নতারার প্রয়োজন। নয়নতারা তাড়াতাড়ি এ বাড়ীর কাজের বন্দোবস্ত করিয়া এবং নন্দরাণী ও সৌদামিনীকে গৃহস্থালির ভার দিয়া লোকের সঙ্গে গৌরীপদবাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদার্পণমাত্র সে বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনা দূর হইল। তাঁহারা তাঁহার হস্তে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি পরিচর্যাকারী ও কারিণীদিগকে কি কি করিতে হইবে আদেশ দিয়া, রোগীর পার্শ্বের ঘরে তত্ত্বাবধায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বধূটির ঘোর বিকারের অবস্থা; ঔষধ খাওয়াইতে গেলে চামচ কামড়াইয়া ধরে; সর্বদা হাত পা ছোড়ে; কাছে ঘেঁষিতে পারা যায় না; মধ্যে মধ্যে ঝাঁকিয়া উঠে যেন পলাইতে চায়; মধ্যে মধ্যে একটু চৈতন্য হয় এইমাত্র। নয়নতারার কি মোহিনীশক্তি! যেই অবনত হইয়া বলেন—"বৌ! লক্ষ্মি! হাঁ কর ত ঔষধটা খাই" অমনি বালিকাটি চাহিয়া দেখে, তাঁহাকে যেন চিনিতে পারে, ও ঔষধটা খায়। এইরূপে দিন রাত্রি রোগীর সহিত সংগ্রাম চলিল। নয়নতারার বিশ্রাম নাই। রাত্রে মধ্যে মধ্যে অবিনাশকে ও চারুকে রোগীর নিকট বসাইয়া তিনি একটু বালিশে মাথা রাখেন। কিন্তু সে কতক্ষণ, রোগী যখন ঝাঁকিয়া উঠে ও উপদ্রব আরম্ভ করে, তখন আবার তাঁহাকে ছুটিয়া যাইতে হয়। গিয়া বলেন—"ছি ছি বৌ মানুষের কি অমন করে উঠতে আছে, শুয়ে থাক; লক্ষ্মি! আমার কথা শোন।" বৌটি তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আবার শুইয়া পড়ে।

এই ত গেল রোগীর সঙ্গে সংগ্রাম; কেবল ইহাই নহে, বেচারা অবিনাশ তাহার এই বালিকা পত্নীটিকে বড়ই ভালবাসে। নিজে ঘরে মাষ্টারি করিয়া তাহাকে পড়াইয়াছে; সে এখন বেশ বাংলা পড়িতে ও লিখিতে পারে। বৌটি শান্তশিষ্ট, বাধ্য, সকলের অনুগত, বাড়ীর সকলের প্রিয়। যতই তাহার রোগ সংকট অবস্থার দিকে চলিয়াছে, ততই অবিনাশের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া আসিতেছে। এতদিন গৃহের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ সর্বদা রোগীর নিকট থাকিতেন, সে বেচারা কাছে ঘেঁষিতে পারিত না; কাহাকেও মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিত না। কেবল দূরে দূরে মুখ চূণ করিয়া বেড়াইত। নয়নতারা আসাতে সে রোগীর নিকট বসিতে পাইতেছে। বৌটি যখন এক একবার ঝাঁকিয়া উঠে, চক্ষু বাঁকায় ও অসম্বদ্ধ

প্রলাপ বকিতে থাকে, তখন অবিনাশ সেদিকে তাকাইতে পারে না; নিকটস্থ টেবিলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে থাকে। রাত্রে একা যখন বসিয়া থাকে, তখন বৌটির যদি একটু চেতনা হয়, সে চিনিতে পারে ও সপ্রেমভাবে কোলের উপর হাতখানি তুলিয়া দেয়, অবিনাশ সেই হাতখানিতে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে থাকে। এক একবার নয়নতারার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে, "সোণা দিদি! ও কি বাঁচবে না?" এইরূপে নয়নতারাকে রোগীকে সামলাইয়া আবার অবিনাশকেও সামলাইতে হয়।

সকল চেষ্টাই বিফল হইল। বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯টার সময় প্রাণবায়ু সেই রোগভগ্ন দেহলতাকে ত্যাগ করিয়া গেল। এ কয়দিন অনাহার অনিদ্রাতে নয়নতারার দিন কোথা দিয়া গেল, তাহা জানিতেও পারিলেন না। শুক্রবার প্রাতে তিনি স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। দুপুর বেলা একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কয়দিনের উত্তেজনাতে শরীর মন এতই উত্তেজিত যে নিদ্রা হইল না। বৈকালে হরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ। এই কয়দিন হরেন্দ্রও গুরুতর মানসিক ক্লেশ যাপন করিয়াছেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন নিজের দুঃখ কাহাকেও জানান তাঁহার প্রকৃতি নয়। তিনি বাড়ীর দেনার কথা কাহাকেও বলেন নাই। ইহার মধ্যে দুই দিন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তাঁহার দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, অপর একজন পরিচিত বন্ধুর নিকট টাকা চাহিয়াছিলেন; বড়ই আশা করিয়াছিলেন, যে সে ব্যক্তি দুঃখের দুঃখী হইয়া সাহায্য করিবে; কিন্তু সে ব্যক্তি বিষয়ী লোক, এমন ঠাণ্ডাভাবে তাঁহার কথা শুনিয়াছে ও বিদায় করিয়া দিয়াছে, যে তাঁহার হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। সেই অপমান ক্লেশে দুই দিন নিদ্রা হয় নাই। মহেন্দ্রনাথকে কিছু বলেন নাই, পাছে রায় মহাশয়ের কর্ণগোচর হয়। পাছে কাহারও মনে হয় তিনি অর্থসাহায্যের লোভে এই রায় পরিবারের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, এই ভয়টা অতিরিক্ত মাত্রায় তাঁহার মনে কাজ করে; তিনি নিজের আর্থিক অভাব ইঁহাদিগকে কোনওরূপে জানিতে দেন না। ইহার উপরে অনেক দিন বার বার নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। গোবিন কণ্টক কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। নিজের দুঃখ ক্লেশের ভিতরে এ বিরক্তিটাও আছে। এই প্রকারে উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত ও তিক্ত মনটা লইয়া তিনি আজ নয়নতারার নিকট উপস্থিত।

নয়নতারা। আঃ আপনি এলেন বাঁচলাম, কদিন থেকে মনটা আপনাকে দেখবার জন্যে বড়ই ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কদিন শরীর মনের উপর দিয়ে কি ঝড়ই গিয়েছে!

হরেন্দ্র। এ কয়দিন আমার মনটাও বড় খারাপ আছে। আপনি যে সংগ্রামে ছিলেন, তার খবর সব পেয়েছি। বৌটিকে কোনরূপে বাঁচান গেল না?

নয়নতারা। চেষ্টার ত ত্রুটি হয়নি, শুনেছি এ রোগে স্ত্রীলোক প্রায় বাঁচে না। অত ছেলেমানুষের সন্তান হলে প্রায় একটা বিভ্রাট ঘটে।

হরেন্দ্র। বৌটির বয়স কত?

নয়নতারা। তের কি চোদ্দ বছর হবে, আমাদের টুনীর চেয়েও কয়েক মাসের ছোট। ভাবুন না কেন ব্যাপারটা কিরূপ। আমাদের টুনীটাকে দেখলে কি কারুর মানুষ বলে মনে হয়? সেইরূপ শিশু ত?

হরেন্দ্র। শুনেছি অবিনাশ বৌটিকে বড় ভালবাসত।

নয়নতারা। সে কথায় কাজ কি, সে একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠেছে।

হরেন্দ্র। আঃ বেচারা এবারে বি. এ.টা দিত, সে সব গেল।

নয়নতারা। আর বি. এ. এখন এই ধাক্কা সামলাক, তারপর বি. এ. পাস করা। (একটু থামিয়া) ও কথা থাক্ আপনি বার বার আমার জন্যে এলেন আর চলে চলে গেলেন, একটু অপেক্ষা করতে নেই, তা হলে দেখা হতো।

হরেন্দ্র। বাপ্‌রে আপনি আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন; কেবল বড় বড় লোক নিয়ে ব্যস্ত, আমার মত গরীব লোকের সাধ্য কি যে আপনার কাছে ঘেঁষে!

নয়নতারা। ওঃ গোবিনবাবুর প্রতি কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে, বাড়ীতে একজন অতিথি আসবে, তার জন্যে ব্যস্ত হব না!

হরেন্দ্র। আপনাদের অতিথির পায়ে নমস্কার, আপনাদের পায়েও নমস্কার। আপনাদের কাছে মুড়ি মিছরির এক দর।

নয়নতারা। সাধে আপনাকে দাদা গোঁড়া বলেন?

হরেন্দ্র। আমার গোঁড়ামি আমাতে থাক, আপনাদের উদারতা যেন কখনও পাই না। আপনার বাবার সব ভাল এই অত্যধিক উদারতাতে সর্বনাশ করেছে; যাকে তাকে কি বাড়ীতে পুরলেই হলো, এতদিন যে একটা বিভ্রাট ঘটেনি, এই ঈশ্বরের কৃপা।

পিতার প্রতি কটাক্ষ করাতে নয়নতারার মন অগ্নিময় হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া গঙ্গা-ধারের জানালার নিকট গেলেন ও মনের আবেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

হরেন্দ্র। শুনবেন ঐ গোবিন কিরূপ লোক?

নয়নতারা।* (হাত যুড়িয়া) রক্ষে করুন ও জ্ঞান আপনার কাছেই থাক, আমি আপনার কাছে আর একজন ভদ্রলোকের নিন্দে শুনতে আসিনি।

হরেন্দ্র। আমি ছেলেবেলা হতে ঐ গোবিনের পাড়াতে ছিলাম, ওর বিষয় সকলি—

নয়নতারা। (বিরক্তভাবে) আঃ বারণ করছি আমার কাছে ওসব কথা বলবেন না। বাপ্‌রে বাপ্ ব্রাহ্মেরা মানুষের উপর কি চোখ রাঙ্গায়! এই জন্যেই ত লোকে ব্রাহ্মদের দেখতে পারে না।

হরেন্দ্র। (উঠিয়া দণ্ডায়মান) গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে; শেষে বুঝতে পারবেন।

এই বলিয়া বিরক্তির সহিত চলিয়া গেলেন। নয়নতারার একবার ইচ্ছা হইল বসিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহারও মন তখন উত্তেজিত। ভাবিলেন এতই কি সাধাসিধে, মন ন রয়েই গেল। গোঁড়া মানুষ নিয়ে কারবার করাই কঠিন। এটা বুঝলেন না, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাতে গোবিনবাবু বাড়ীতে আসতে চাইলে আমরা "না" বলি কি করে, আর কারু কোথায় কি দোষ আছে, তাই কি আমরা খুঁজে বেড়াব? থাকলই ব দোষ আমরা ভাল থাকলেই হলো মানুষটার সব ভাল এই গোঁড়ামিতেই খেয়ে রেখেছে। রাগ করে গেলেন যান, গরজ থাকে ত আপনি আসবেন, আমি সাধাসাধি করবো না।" এই বলিয়া রাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল, হরেন্দ্র বলিয়াছিলেন যে এই কয়দিন তাঁর মনটাও খারাপ আছে। অমনি মনে দুঃখ হইল। "মনটা খারাপ আছে বলে জুড়োবার জন্যে আমার কাছে এলেন, আর আমি এই ব্যবহার করলাম, রাগ করে তাড়ালাম। ছি! ছি! কি কঠিনের মত কাজটা হলো।" এইরূপ ভাবিয়াই রাগটুকু জল হইয়া গেল। মনটা আবার হরেন্দ্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উঠিয়া একখানি পত্র লিখিলেন তাহার মর্ম এই:—

"আপনি বললেন কয়দিন আপনার মনটা খারাপ আছে, তা শুনেও কঠিনের মত আপনার প্রতি রাগ করে বিদায় করলাম। এজন্য মনে বড়ই ক্লেশ হয়েছে। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন আমারও শরীর মনটা ভাল ছিল না, সেই জন্যেই বোধহয় এমনি করেছি। যাহোক আজ যদি নিতান্ত না আসেন, কাল প্রাতে অবশ্য অবশ্য একবার আসবেন, না হলে বুঝবো যে আমায় ভালবাসেন না।"

হরেন্দ্রের মনটা বাস্তবিক বিরক্ত হইয়াছিল; তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছিলেন যে, ডাকলে আর যাব না। এমন সময়ে পত্রখানা পাইলেন। পড়িয়াই মনে মনে বলিলেন, "তাই

এমন সময়ে অমন কথাটা উত্থাপন করা উচিত হয়নি। এ কয়দিন অনাহার অনিদ্রাতে তাঁর শরীর মন দুই উত্তেজিত ছিল। নতুবা আমার উপরে ত তাঁর রাগ কখনও দেখিনি! ছি! ছি! আমারই অন্যায় হয়েছে। আমারই মাপ চাওয়া উচিত। কাল প্রাতে দেখা করবো।"

পরদিন প্রাতে হরেন্দ্র নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নয়নতারা। (হাসিয়া) বেশ ভাল আপনি যে বড় [illegible], আমি ত ভাবি নাই এত সহজে [illegible] সবেন।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) আমি মাপ চাইতে এসেছি।

নয়নতারা। মাপ [illegible] কি জন্য?

হরেন্দ্র। কয়দিনের সংযমে আপনার শরীর মন দুই উত্তেজিত ছিল, সেই সময় আমার ভুলে [illegible] উচিত হয়নি, [illegible] কথাটা হয়েছে।

হরেন্দ্র এই কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন, যে নয়নতারা [illegible] একেবারে [illegible] হইয়া [illegible]লেন। প্রেমপূর্ণ [illegible] তাঁহার [illegible] দিকে চাহিয়া [illegible]—"আপনি এত [illegible] কেন [illegible]?"

হরেন্দ্র। [illegible] কথাটা কবে [illegible]

নয়নতারা। আপনার [illegible] দিন [illegible]

হরেন্দ্র। সেটা এখন বলছি না।

নয়নতারা। [illegible] এখন [illegible]

হরেন্দ্র। না না [illegible] না, [illegible] আছে।

নয়নতারা। কিসের মধ্যে [illegible] না?

হরেন্দ্র। তত বলতেই পারেন।

নয়নতারা। তবে কেন বলছেন না।

হরেন্দ্র। সময় হলে বলবো। ([illegible])

নয়নতারা। আমি কিন্তু অভিমান করে রইলেম। আপনি আমাকে বাইরে ঠেলে দিলেন।

হরেন্দ্র। তা যদি মনে ভাবেন [illegible], বিশেষ [illegible] থাকলে আর আপনাকে বলি না।

হরেন্দ্র চলিয়া গেলেন; নয়নতারা একটু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন;—মনে কি কষ্টটা রয়েছে জানতে পারা গেল না। এটা মহেন্দ্রবাবুর দ্বারা জানতে হচ্ছে। বোধ হয় টাকাকড়ি ঘটিত কোনও কষ্ট হবে। আমরা শুনলে পাছে কোনও রূপে সাহায্য করি! কি মানুষ! সাধে ভালবাসি।

আর অধিক বসিতে পারিলেন না, গৃহকার্যে যাইতে হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ইহার পর রায় মহাশয়ের শরীরটা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। উদরের একপ্রকার বেদনা, অজীর্ণ, ও স্বল্প মাত্রায় জ্বর, এগুলি লাগিয়াই থাকিল। কোন প্রকারেই উপশম করিতে পারা গেল না। তিনি দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনগণ চিন্তান্বিত হইতে লাগিলেন। চুঁচড়ার ভাল ভাল ডাক্তারগণ রোগটা যে কি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অপর পারে কাঁচড়াপাড়া হইতে একজন সুযোগ্য কবিরাজ আনিয়া দেখান হইল; তিনি যাহা বলিলেন তাহাও বাড়ীর লোকের মনঃপূত হইল না। অবশেষে ডাক্তার-দিগের পরামর্শ অনুসারে চলাই কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। তাঁহারা কিছুদিন স্থান পরিবর্তন করিয়া দেখিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শই অবলম্বন করা কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল।

ওদিকে গোবিন প্রতি সপ্তাহে আসিতেছেন। গোবিনের সহিত পরিচয় হওয়ার পর, সুরেশ বলিয়াছেন— He is a gain to us. —অর্থাৎ এ মানুষটাকে পেয়ে লাভ বোধ হচ্ছে। আর লাভ বোধ না হবেই বা কেন; গান-বাজনা, আমোদ, হাস্য-পরিহাসে গোবিনকে অদ্বিতীয় বলিলেই হয়; বয়সেও সুরেশের সমবয়স্ক; মাসে প্রায় দেড়-দু হাজার টাকা উপার্জন করেন; চলন বলন ধরণ ধারণ সমুদয় সভ্যরীতির অনুরূপ; এমন মানুষকে সুরেশ কেন ভাল না বাসিবেন। তৎপরে প্রথম সাক্ষাতের সময় হইতেই নন্দরাণী গোপনে তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, সৌদামিনীর প্রতি গোবিনের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে; ইহাও সুরেশের গোবিনের প্রতি আকর্ষণের একটা কারণ।

নন্দরাণী যে কেবল স্বীয় পতিকে এ কথাটা বলিয়াছেন তাহা নহে, নয়নতারাকেও বলিয়াছেন। তদবধি নয়নতারার মনে একটু চিন্তার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সৌদামিনীর ভাব গতিকে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিতে পাইয়াছেন, সৌদামিনীর উপহাস-প্রবৃত্তি আর নাই। গোবিনের বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, স্বীয় ভাব গোপনেই প্রকাশ পান; [illegible] উপরে কিছু বলেন না। গোবিন চুঁচুড়াতে যে সময়টা থাকেন, তাঁহার মন-প্রাণ যেন সৌদামিনীর সঙ্গেই থাকে; অনেকেই দুজনকে একত্র দেখা যায়। এই ভাবটা লক্ষ্য [illegible] নয়নতারার মন [illegible] নয়; [illegible] সহিত জানাশুনা হওয়ার পর গোবিনের বিষয়ে একটি [illegible] মনে প্রবেশ করিয়াছে। একদিকে [illegible] বাবুদের সহিত যেরূপ [illegible] দেখিলেন, [illegible] বিয়োগ। [illegible] আছে। রাগ পড়িয়া গেলে হরেন্দ্রকে একদিন বলিলেন,—"গোবিনবাবুর বিষয়ে [illegible] বলুন। তাঁরা আমাদের আত্মীয় লোক, তাঁর বাড়ীতে [illegible] আপনার হোন না [illegible]। তাঁর স্বভাব-চরিত্র যদি ভাল না হয়, আমাদের একটা [illegible] থাকা উচিত।" [illegible] সহজে বলিবার পাত্র নয়। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে অভিমানের মাত্রাটি বিলক্ষণ আছে। একবার [illegible] পাইয়া আর বলিতে চাহিলেন না। এইমাত্র বলিলেন—"আমি মন্দ কিছু বলছি না, তা কারুর কাছে জানবেন।" নয়নতারা অবশেষে হরেন্দ্রবাবুর দ্বারা ও কলিকাতা হইতে [illegible] পিতৃব্য পুত্রগণের দ্বারা যতটা সম্ভব অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সৌদামিনীর ভাব দেখিয়াই তাঁর এতটা ব্যগ্রতা। তিনি দেখিলেন, সৌদামিনী দিন দিন গোবিনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এ কথা হরেন্দ্র বা অপর কাহাকেও বলিলেন না। কেবল একদিন সৌদামিনীকে গোপনে এইমাত্র বলিলেন, "দেখ সদু! আমাদের বাড়ীতে যে কেহই ভদ্রলোক আসুন, সকলের আতিথ্য করিতে ও সকলের প্রতি সৌজন্য ভদ্রতা দেখাতে আমরা বাধ্য; কিন্তু তার অতিরিক্ত করতে হলে জানা আবশ্যক মানুষটা কেমন।" ইহার অধিক এ বিষয়ে চিন্তা করার অবসর আর রহিল না; তিনি পিতাকে লইয়া দিন দিন ব্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হরেন্দ্র গোবিনের ঘন ঘন যাতায়াত দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তিনি ত আর ঘরের কথা জানেন না; কে গোবিনকে দুঁড়শী-গাথা করিয়া ঘুরাইতেছে, তাত বুঝিলেন না; তিনি মোটামুটি মনে করিলেন নয়নতারার সঙ্গেই গোবিনের প্রথম আলাপ, গোবিন নয়নতারার পশ্চাতেই ঘুরিতেছে। এটা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ভাবিতে গেলে মন বৃশ্চিক-দংশনের ক্লেশ অনুভব করে; তাঁর ধৈর্য থাকে না।

কেবল যে গোবিন ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন তাহা নহে, রায় মহাশয়ের পীড়া যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই চুঁচুড়ার ভদ্রলোকদিগের ও কলিকাতার বন্ধুদিগের যাতায়াত বৃদ্ধি হইল। তারাপদ রায় মহাশয় প্রায় সপ্তাহে দুইবার আসিতে লাগিলেন। একদিন এস, পি, রায় সপরিবারে আসিয়া একরাত্রি থাকিয়া গেলেন; বার্নার্জি সাহেবও কয়েকবার আসিলেন। এইরূপ

আতিথ্যের ভার এখন প্রধানতঃ সৌদামিনী ও নন্দরাণীর উপরে পড়িয়া যাইতে লাগিল। তবে নয়নতারা গৃহের কর্ত্রী, কিয়ৎ পরিমাণে সে বোঝা তাঁহাকেও বহিতে হইল।

এইরূপে দিন যায়, একদিন প্রাতে মণিলালবাবু আসিয়া উপস্থিত। দুই উদ্দেশ্য। প্রথম রায় মহাশয়কে দেখিয়া যাওয়া; দ্বিতীয় নয়নতারা চলিয়া আসার পর তাঁহাদের বৃদ্ধ কর্তা বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলাগণের মুখে তাহার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন,—"মেয়েটি বেশ শান্ত, শিষ্ট, বিনয়ী, ভগবানের নামে চক্ষে জল পড়ে, ওদিকে আবার লিখতে-পড়তে গাইতে-বাজাতে পরিপক্ক।" এইসকল কথা শুনিয়া কর্তা বলিয়াছেন, "কালীপদ মেয়েটিকে আমায় দেখালে না কেন? এবারে আমাদের বাড়ীতে যখন কীর্তন হবে মেয়েটিকে এন।" ভিতরকার কথা এই, পাঠদ্দশায় রায় মহাশয়ের এ বাড়ীতে খুব যাতায়াত ছিল, তখন হইতে বৃদ্ধ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাব-চরিত্রের গুণে তাঁকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন; পরে তাঁর রীতিনীতির পরিবর্তন হওয়াতেও সে স্নেহটা যায় নাই। বৃদ্ধ অতি উদার মানুষ; সর্বদা বলিয়া থাকেন,—"মানুষে যা বোঝে সেইরকম থাকাই ভাল। কালীপদকে প্রশংসা করি, তার মুখে একখানা বাহিরে একখনা নাই; যা ভাল বলে বোঝে তাই করে; এমন খাঁটি লোক একালে মেলে না।" রায় মহাশয়ও তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখিয়া থাকেন। প্রেমের স্বভাব এই ইহা যাহাকে ধরে, যতদূর তার গন্ধ পায় ততদূর যায়। বৃদ্ধ কর্তার স্নেহটা নয়নতারার গুণের কথা শুনিয়া কালীপদ রায় হইতে তাহাতেও সংক্রান্ত হইয়াছে।

যেদিন প্রাতে মণিলালবাবু আসিয়া উপস্থিত, সেইদিন সায়ংকালে তাঁহাদের ভবনে এক প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া দলের কীর্তন হইবে। পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় কর্তা মণিলালবাবুকে নয়নতারাকে আনাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে মণিলালবাবু অতিশয় প্রীত। নয়নতারাকে কেহ ভাল বলিলে বা দেখিতে চহিলে তাঁর বড়ই আনন্দ হয়; তাঁর মনে হয় তাঁর দলে আর একজন লোক জুটিল। সুতরাং কর্তা বন্ধুর কন্যাকে দেখিতে চাওয়াতে তাঁর মহা উৎসাহ হইয়াছে; তিনি সে উৎসাহে স্বয়ং তাঁহাকে লইবার জন্য আসিয়াছেন। কিন্তু নয়নতারা যাইতে ইচ্ছুক নহেন। পিতার পীড়ার বৃদ্ধির জন্য তাঁহার হাত-পা আর ওঠে না। নিরন্তর পিতাকে লইয়া ব্যস্ত আছেন। যথাসময়ে ঔষধটি সেবন করান, যথাসময়ে পথ্যটি দেওয়া, প্রাতে-সন্ধ্যাতে কাছে বসিয়া ভগবানের নাম গাইয়া শুনান, দুপুরবেলা তাঁহার শয্যাতে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলান, মধ্যে মধ্যে ভাল গ্রন্থাদি পড়িয়া শুনান, এসকল তাঁর কাজ। নন্দরাণী ও সৌদামিনীর প্রতি গৃহকার্য দেখিবার ভার কিছু অধিক পরিমাণে দিয়া, তিনি পিতার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং তিনি কিরূপে যান?

রায় মহাশয় ও গৃহিণী মণিলালবাবুর আগ্রহ দেখিয়া নয়নতারাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পিতা বলিলেন, "আমার ব্যায়রাম ত এমন নয়, যে দেখ্‌ দেখ্‌ করতে বেড়ে যায়, দুদিনে আর বেশি খারাপ কি হবে, তুমি যাও, কর্তা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, এটা আনন্দের কথা, তিনি আমাকে সন্তানের মত দেখেন, না গেলে কি মনে করবেন। আর একটি কথা তোমারও দুদিনের জন্য বিশ্রাম হবে।" জননী বলিলেন, "তা বৈকি! বোমা ও সদী কি দুদিন সংসারটা চালাতে পারবে না? আর ওঁকে দেখবার জন্যে ত আমি আছি। কর্তা আমাদের স্নেহ করেন, দেখতে চেয়েছেন যা এমন বুড়ো মানুষ কখনও দেখিস্‌ নি।"

মণিলালবাবুর আগ্রহে পিতা-মাতা যোগ দেওয়াতে নয়নতারার কিছু মুস্কিল হইল। তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কোন প্রকারেই যাইতে মন উঠে না। একে পিতাকে এরূপ অবস্থাতে রাখিয়া যাওয়া, দ্বিতীয় একলা যাওয়া। পিতা-মাতার আদেশ শুনিয়াও তিনি অনেকক্ষণ মণিলালবাবুকে সাধ্যসাধনা করিলেন, "জেঠামশাই, আমাকে মাপ করুন, আমি বাবাকে ফেলে যেতে পারব না।" মণিলালবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। "লক্ষ্মি, চল চল, তোমার বাবার ব্যায়রাম দুদিনে এমন কি বাড়বে? দুদিন একটু নড়ে চড়ে এস, সংসারের কাজ ত আছেই।"

নয়নতারা। আমার একলা যেতে মন সরে না।

মণিলাল। তোমার জেঠাইমা ত আছেন, তিনি তোমার মায়ের কাজ করবেন।

নয়নতারা মনের সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মনে হরেন্দ্রের বিরাগের ভয়টাও আছে। যে গোবিন বাড়ীতে আসাতে তিনি এত বিরক্ত, সেই গোবিনের বাড়ীতে গিয়া থাকা, আবার একলা গিয়া থাকা, ইহা হরেন্দ্র কখনই পছন্দ করিবেন না। দূর হোক্, এরূপ স্থলে না যাওয়াই ভাল। আবার ভাবিলেন, বৃদ্ধ কর্তা আগ্রহ করে দেখতে চেয়েছেন, না যাওয়াটা কি ভাল? থাকিলেনই বা গোবিন, গোবিন ত আমাকে চান না, তিনি যাকে চান, সে চুঁচড়াতেই রহিল। অমনি মনে হইল, "একবার গেলে মন্দ হয় না, গোবিনবাবুর স্বভাব-চরিত্রটা জেনে আসা যায়, দুজনের যেরূপ ভাব দাঁড়াচ্ছে, কি ঘটে কে জানে, মানুষটার বিষয় সমুদয় কথা জানাই ভাল। এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন, ওদিকে মণিলালবাবু বাড়ীর গাড়ী যুতাইয়া আনিয়া ত্বরা দিলেন, "শীঘ্র কাপড় পর, গাড়ী প্রস্তুত; আর সময় নাই; ২-১০ মিনিটে ট্রেন ধরতে হবে।" এই বলিয়া নয়নতারাকে ধরিয়া একপ্রকার বলপূর্বক ঠেলিয়া তাঁহার ঘরে কাপড় পরিবার জন্য লইয়া গেলেন। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি সংসারের বন্দোবস্ত করিয়া নন্দরাণী ও সৌদামিনীকে বুঝাইয়া দিয়া, পিতা-মাতার নিকট বিদায় লইয়া, কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল। তাড়াতাড়ি হরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়া টুনীর কাছে দিয়া গেলেন,—"হরেনবাবু পড়াতে এলেই দিস্।" তাহাতে হঠাৎ কলিকাতা যাত্রার কারণ ভাঙ্গিয়া লিখিলেন।

তাঁহারা কলিকাতায় মণিলালবাবুর বাড়ীতে পেঁৗছিলে পরিবারস্থ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী বাস্তবিক মায়ের স্থান অধিকার করিলেন। কাপড় ছাড়াইয়া বিশ্রাম করাইয়া, জলযোগ করাইয়া, তাঁহার উত্তেজিত মনকে অনেকটা সুস্থ করিলেন।

বৈকালে বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে কীর্তনের আয়োজন হইতে লাগিল। ওদিকে কর্তা নয়নতারার আগমন বার্তা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য এ বাড়ীতে আসিলেন। "কৈ শুনলাম কালীপদর মেয়ে এসেছে, মেয়েটি কোথায়?" নয়নতারা বাহিরে আসিয়া চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইলেন।

কর্তা। নাতিন্! তুমি এসেছ আমি খুসী হয়েছি। কালীপদ যখন স্কুলে পড়ে, তখন থেকে আমাদের বাড়ীর ছেলের মত। তবে তার মতিগতি অন্যপ্রকার হয়েছে; তা কি করা যাবে? কৃষ্ণ যাকে যেমন রাখেন।

মণিলাল। কালীপদর বড় ব্যায়রাম, ওকে কি আনা যায়; নিতান্ত আপনি ডেকেছেন বলে এনেছি।

কর্তা। বটে, কি ব্যায়রাম?

মণিলাল। তা কেউ বুঝতে পারে না, হজম হয় না, পেটে ব্যথা হয়, তারপর একটু জ্বর লেগেই আছে। দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছে।

কর্তা। তবে ওকে টেনে হিঁচড়ে আন্‌লে কেন?

মণিলাল। মনে করলাম কীর্তনটা একবার শুনুক।

কর্তা ইহাতে প্রসন্ন হইলেন। কর্তার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হইবে; কিন্তু দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে; আজও প্রাতে রীতিমত পদব্রজে গঙ্গাস্নানে গিয়া থাকেন; মানুষটি খর্বাকৃতি, যেন গিলে বিচীটির মত; তবে বার্ধক্যবশতঃ দেহে বলি দেখা দিয়াছে; বর্ণটি শ্যাম; রূপটি সুস্নিগ্ধ, কমনীয়, প্রশান্ত, পবিত্র; স্বভাব ও সাধুতার আভাতে উজ্জ্বল। দেখিলেই ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়; নাসাতে তিলক, বাহুদ্বয়ের উপরে ও বক্ষঃস্থলে হরিনামের ছাপ, এ

গলদেশে তুলসীর মালা; কণ্ঠসংলগ্ন একটি স্বর্ণনির্মিত হকে হরিনামের ঝুলিটি সর্বদাই ঝুলিতেছে; তবে বস্ত্রাবৃত থাকে বলিয়া সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কর্তা বহুকাল হইল বিপত্নীক হইয়াছেন; পুত্রসন্তান নাই, কন্যা চতুষ্ঠয়ের মধ্যে দুইজন বিধবা হইয়া গৃহেই আছেন; তাঁহারাই পিতার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তিনি পূর্বেই গবর্নমেণ্টের ট্রেজারিতে কেরাণীগিরি করিতেন। তখন হইতেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মে। তখন হইতেই বৈষ্ণব সেবাতে অনেক অর্থব্যয় করিতেন। তৎপরে বিষয়কর্ম হইতে অবসৃত হইয়া ধর্ম-চিন্তাকেই সার করিয়াছেন। সেও প্রায় ২৫ বৎসর হইয়া গেল। এখন নিত্য ভাগবত পাঠ, সাধু সেবা ও বৈষ্ণব সেবাতেই সময় যাপন করেন। তদ্ভিন্ন যে বিস্তীর্ণ পরিবারটির উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে, তাহাদের প্রতিজনের কল্যাণ-চিন্তাতেও অনেকটা সময় দিতে হয়। তাহার উদারতা ও অপক্ষপাতিতা গুণে তাঁহার প্রতি এ পরিবারের সকলের এমনি ভাব যে তিনি যাহা করেন, তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করে না। এমন কি কোন বাড়ীতে কোন শিশু গুরুতর পীড়িত হইলে, তিনি যতক্ষণ গিয়া না দাঁড়ান ও অভয় দান না করেন, ততক্ষণ তাহার জননীর মনে আশ্বাস হয় না। এই একটা কাজ তাঁহাকে সর্বদাই করিতে হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ নাই; দীর্ঘজীবনের পৈতৃক ও সোপার্জিত অর্থের যা কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা হইতে কন্যাদ্বয়ের প্রতিপালনের মত অর্থ রাখিয়া, অবশিষ্ট অর্থ দেবসেবা ও সাধুসেবার জন্য রাখিয়াছেন।

একজন পাকা কীর্তনিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের রচিত পদাবলীর গান বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ। কর্তা সহরের এক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের ভবনে তাঁহার কীর্তন শুনিয়া তাঁহাকে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যথাসময়ে কীর্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী হয় ত অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন। নবাগত গায়ক সেই প্রেমপূর্ণ পদাবলী এমন মধুরভাবে গাইতে লাগিলেন, যে পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। নয়নতারা ইহার পূর্বে কখনও বৈষ্ণবদিগের কীর্তন শ্রবণ করেন নাই; শুনিয়া তাঁহার মন আশ্চর্য রসে নিমগ্ন হইতে লাগিল; দর দর ধারে নেত্রে জলধারা বহিতে লাগিল।

কীর্তনান্তে নয়নতারার সহিত কর্তার বৈষ্ণব কবিগণের সম্বন্ধে ও অপরাপর বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইল। কথা কহিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। নাতনী বলিয়া প্রাচীন ধরনের অনেক ঠাট্টাতামাসা করিলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি যখন গঙ্গাস্নানান্তে আসিয়া নিজ পূজার ঘরে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম করিতেছেন, তখন নয়নতারা বাড়ীর বৃদ্ধ মহিলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি ওঁর ঘরে ঢুকে পূজো দেখতে পারি?" ইহা শুনিয়া কর্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিয়া বলিলেন—"বাবা! নয়নতারা তোমার পূজোর ঘরে ঢুকে পূজো দেখতে চাচ্চে।"

কর্তা। (হাসিয়া) কি দেখবে? বুড়ো মানুষের পাগলামি দেখবে? আচ্ছা এস!

নয়নতারা ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চারিদিকেই পূজার আয়োজন। একখানি শ্বেত প্রস্তরের চৌকির উপরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত। তৎপার্শ্বে অপর একখানি ক্ষুদ্র চৌকিতে একটি নারায়ণ শিলা; সম্মুখে তাম্রকুণ্ড ও পুষ্প চন্দন। ধূপ-দীপের গন্ধে ভুরভুর করিতেছে। কর্তা নয়নতারাকে অঙ্গুলি দ্বারা বসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজ পূজাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূজান্তে নামজপ ও তৎপরে কীর্তন। সেই বৃদ্ধ যখন একাকী করতালি দিয়া মধুর কণ্ঠে গান করিতে করিতে, নাচিয়া নাচিয়া সেই মূর্তিগুলিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তখন নয়নতারার মনে ভক্তি-মিশ্রিত এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। কীর্তন শুনিয়া চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। এইভাবে তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া যেন ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন, হঠাৎ কর্তা তাঁহার গলে একছড়া তুলসীর মালা পরাইয়া দিয়া, তাঁহার নাকে তিলক পরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাইয়া দিয়া

বলিলেন, "দেখ দেখি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।" নয়নতারা ভক্তিভাবে পদধূলি লইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন।

কর্তা। নাতিন্! তুমি বেশ করেছ বিবাহ কর নাই, তুমি শ্রীরাধিকার রূপ, কৃষ্ণই তোমার পতি।

এই বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নয়নতারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন। বাড়ীর মহিলারা কেহ কেহ জানালা দিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহারা নয়নতারাকে তদবস্থাতে বাহির হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওমা কি সুন্দর দেখাচ্চে! আর কেন, এই ত বরমাল্য পেয়েছ, এইবার নিজের ঘরকন্না বুঝে নেও।" শুনিয়া তাঁহার বড় লজ্জা হইল। মালা খুলিতে ও নাকের তিলক মুছিতে গেলেন, মহিলারা বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা থাক্, কর্তা সাধ করে দিয়েছেন, মুছ না।"

আহারান্তে নয়নতারা চুঁচড়াতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু কর্তা বলিলেন,—"নাতিন্! যদি এসেছ আজকের দিনটা থাক, সন্ধ্যার সময় ভাগবত পাঠ হবে শুনবে; আর আমার এককালে গান বাজনার বাতিক ছিল, তুমি বেশ সেতার বাজাতে পার শুনেছি, আমাকে একটু বাজিয়ে শোনাবে।" ইহার উপরে মণিলালবাবু থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, সুতরাং আজ আর যাওয়া হইল না।

এদিকে নয়নতারা হরেন্দ্রকে দিবার জন্য টুনীর হাতে যে পত্র দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা টুনী হারাইয়া ফেলিয়াছে। তিনি পড়াইতে আসিয়া শুনিলেন, মণিলালবাবু আসিয়া নয়নতারাকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। তিনি পরদিন আসিবেন। শুনিয়া কথাটা ভাল লাগিল না। ভাবিতে লাগিলেন—"গোবিনের বিরুদ্ধে এত বললাম, তাতে কর্ণপাত করাই হলো না—আবার তাদের বাড়ীতে একলা যাওয়া হলো, আমাকে সংবাদটা দেওয়াই হলো না; এটা বোধ হয় আমাকে দেখাবার জন্য যে তিনি নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে আমার বিরাগের ভয় করেন না, আমার গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। কি তেজী মেয়ে! আশ্চর্য, এত কোমলতার ভিতরে এতটা তেজ থাকে! এমন প্রকৃতির অবাধ্যতাও মিষ্ট।"

পরক্ষণেই গোবিনের কথা মনে হইয়া এই চমৎকার-সমন্বিত শ্রদ্ধার ভাবটুকু উড়িয়া গেল। "গোবিনটার সঙ্গে উনি এত মেশেন, একেবারেই ইচ্ছা করি না। নিজের মন যেমন পবিত্র, সকলকেই তেমনি পবিত্র চক্ষে দেখেন; কিন্তু এইরূপ মেয়েরাই মানুষকে সহজে বিশ্বাস করে ও বিপদে পড়ে।" আবার মনে হইল, "মণিলালবাবু নিজে লইয়া গিয়াছেন, সেখানে তাঁর স্ত্রী মায়ের মত আছেন—থাকলই বা গোবিন।" আবার মনে হইল "দূর হোক্ গোবিনের সঙ্গে এই মেলামেশিটা কি করে বন্ধ করা যায়।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেলেন ও রাত্রিটা এক প্রকার উদ্বেগে কাটাইলেন।

পরদিন কালেজে গিয়া যখন শুনিলেন নয়নতারা আসেন নাই, তখন মনের উদ্বেগ অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গেল। আর কলিকাতায় না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। কালেজ হইতে শেষ ঘণ্টায় বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেলেন। বাঁড়ুয্যে পাড়া তাঁর সুপরিচিত স্থান। সেখানে একজন বন্ধুর সহিত দেখা করিবার ছল করিয়া মণিলালবাবুর এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গমন করিলেন।

হরেন্দ্রের মনের ভাবটা আজ কিরূপ তাহা কি সকলে হৃদয়ংগম করিতে পারিতেছেন? কেন যে তিনি কলিকাতায় গেলেন, তা নিজেই হয়ত জানেন না। নয়নতারার সহিত ত সাক্ষাৎ হইবে না, মণিলালবাবুর বাড়ীতে ত প্রবেশ করিবেন না, তবে কেন গেলেন? তাহা বলিলে কি হয়, একটি বিহংগম যদি দেখে তাহার সঙ্গিনীটি চরিতে চরিতে একটি কালসর্পের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সর্পটি পাশেই শুইয়া আছে, তখন তাহার কিরূপ ভাব হয়? সে চ্যাঁ চ্যাঁ করে, উপরে উড়িতে থাকে, এ ডালে ও ডালে বসিতে থাকে, সর্পটিকে ঠুকরাইবার চেষ্টা

করিতে থাকে, ইহা কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন; হরেন্দ্রের যেন আজ সেই দশা উপস্থিত। তিনি চ্যাঁ চ্যাঁ করিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু গিয়া লুকাইয়া থাকিলেন। সেই প্রতিবেশীর বাড়ীতে মণিলালবাবুর বাড়ীর একটি বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। হরেন্দ্র যে নয়নতারার সহিত পরিচিত তাহা না জানিয়াই সে বালকটি সংবাদ দিল, যে কালীপদ রায়ের বড় মেয়ে সেদিন প্রাতে কর্তার পূজার ঘরে ঢুকিয়া তুলসীর মালা ও তিলক লইয়াছে। হরেন্দ্র শুনিয়া অগ্নিপ্রায় হইয়া চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন নয়নতারা পিতৃব্যের ভবন হইয়া বিনোদকে সঙ্গে করিয়া চুঁচড়াতে ফিরিয়া আসিলেন্র। আসিয়াই শুনিলেন ত্বরায় পিতার বায়ু-পরিবর্তন করা স্থির হইয়াছে। তাঁহাকে বোটে বোটে নদীগর্ভে কিছুদিন রাখিতে হইবে। তৎপরে শান্তিপুরে ও গুপ্তিপাড়ার মধ্যে গঙ্গার গর্ভে একটি চড়া আছে, ঐ চড়ার উপরে রায় মহাশয়ের একজন বন্ধুর একটি সুন্দর বাংগলা আছে; সে স্থানের বায়ু অতি পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর, সেখানে কিছুদিন থাকিয়া দেখিতে হইবে, শরীর ভাল থাকে কিনা, সেখানে উপকার না হইলে পশ্চিম যাওয়া হইবে। এইরূপ স্থির হইয়া সেই বন্ধুকে পত্র লেখা হইয়াছে। পিতার নিকটে এই সংবাদ পাইয়া নয়নতারা তখনি মনে মনে যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কে কে সঙ্গে যাইবে, কে কে থাকিবে, চুঁচড়ার বাড়ীর কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিজ মন্দিরে গেলেন। গিয়াই টুনীর মুখে শুনিলেন, যে সে তাঁহার প্রদত্ত পত্রখানি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহা শুনিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। মনে মনে বলিলেন—"যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়, একে দারুণ অভিমানী মানুষ, তার উপরে এই দুর্ঘটনা। হয় ত দেখব অভিমান করে টং হয়ে আছেন। হয় ত ভাবছেন আমি গোবনবাবুর জন্যই গিয়েছিলাম। হা কপাল, গোবিনবাবু কি আর আমার বন্ধুতা চান, তিনি যে সদুর পিছনে লেগেছেন তা জানেন না। তা আমি ভেঙ্গে বলতে গেলাম কেন? যা ইচ্ছে হয় মনে করুন; আমার প্রতি বিশ্বাসটা গড়ে পিটে দাঁড়াক।" এই ভাবিয়া গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরাহ্নে হরেন্দ্র টুনী পটলাকে পড়াইতে আসিলে চাকর পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, চাকর গিয়া বলিয়া আসিল—"আপনার পড়ান হলে উপরে যাবেন দিদিমণি ডেকেছেন।"

অধ্যাপনান্তে হরেন্দ্র যখন উপরে আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে মেঘের সঞ্চার দেখিয়াই নয়নতারার প্রাণ কাঁপিয়া গেল; একটা মহা ঝড় আসিতেছে।

নয়নতারা। বসুন, আমি আপনার জন্যে টুনীর কাছে একখানা পত্র রেখে গিয়েছিলাম, টুনী হারিয়ে ফেলেছে, আপনি বোধহয় আশ্চর্য বোধ করে থাকবেন যে আমি খবরটা না দিয়ে কি করে গেলাম।

হরেন্দ্র। আপনার উপরে আমার দাওয়া কি, যে কোথাও যেতে হলে আমাকে খবর দিয়ে যেতে হবে?

সেই গম্ভীর উত্তর শুনিয়া ও মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার হাসি পাইল কিন্তু হাসিলেন না।

নয়নতারা। আপনি নিশ্চয় মনে করেছেন, গোবিনবাবুর বন্ধুতার টানে গিয়েছিলাম না।

হরেন্দ্র। আমি কি মনে করেছি, তা আপনাকে বলতে গেলাম কেন?

নয়নতারা। তাঁদের বাড়ীর কর্তা আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই মণিজেঠা এসে আমাকে এক প্রকার জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র। আমি ত আপনার কৈফিয়ৎ চাচ্ছি না, ওসব কথা বলবার প্রয়োজন কি?

এক্ষন হইতে নয়নতারার মনেও বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল।

নয়নতারা। আমার কাজের কৈফিয়ৎ আবার কাকে দিতে যাব। তবে একটা ভুল ধারণা থাকা উচিত নয় বলেই বলছি।

হরেন্দ্র। বৈষ্ণব বাড়ীতে গিয়ে বৈষ্ণব হওয়া হয়েছে। যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন, এরি নাম উদারতা।

নয়নতারা আর হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। হো হো করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—

"ওঃ সেই তিলক ও মালার কথা! সে খবর আপনাকে কে দিলে? আমি পুজোর ঘরে পুজো দেখতে গিয়েছিলাম, বুড়ো মানুষ আমার গলায় মালাছড়া দিয়ে দিলেন, আমি কি করবো, দেখবেন মালাছড়াটা?"

এই বলিয়া তুলসীর মালাগাছ আনিলেন।

হরেন্দ্র। (সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া) যান্ যান্ এসব আমি হাসি-ঠাট্টার কথা মনে করি না।

নয়নতারার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বাপ্‌রে বাপ্ গোঁড়ামিটা যে কি জিনিস, তাকে বাগানই ভার। বুড়ো মানুষ মালা ছড়াটা গলায় দিয়ে দিয়েছেন, তাতে হয়েছে কি? আমার শরীর কি অপবিত্র হয়ে গিয়েছে? না আমি বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছি? এর চেয়ে বৈষ্ণবরা ত ভাল দেখছি, তাঁরা আমাদের মতিগতি অন্যরকম জেনেও ত আমাদের প্রতি স্নেহ দেখাতে ত্রুটী করেন না। ধর্ম কি কেবল গোঁড়ামিতে থাকে? প্রেমে থাকে, উদারতাতে থাকে।"

হরেন্দ্র। থাক্ থাক্ আপনার উদারতার লেক্‌চার ঢের শুনেছি।

এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নয়নতারা আর একটি কথাও বলিলেন না; বসিতেও অনুরোধ করিলেন না; রাগিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিলেন; হরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। চলিয়া গেলেই নয়নতারা উঠিয়া মালাছড়াটি রাখিলেন; রাখিয়া কোচখানির উপরে অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগেলেন—"কি বেয়াড়া মানুষ! একটা দিকই দেখতে পান, দুটা দিক আর দেখতে পারেন না। আর পায়ে তেল দিয়ে পারা যায় না। আমি আর ডাকব না, কথা না কইলে কথা কইব না, দেখি না কি করেন।" এই বলিয়া উঠিয়া গৃহকার্যে গমন করিলেন।

ইহার পরে হরেন্দ্র দিনের পর দিন টুনী পটলাকে পড়াইতে আসিতে লাগিলেন, নয়নতারার সহিত আর দেখা করেন না, নয়নতারাও ডাকিয়া পাঠান না। বাড়ীর লোক বলাবলি করিতে লাগিল,—"এদের দু'জনের হলো কি?" কিন্তু কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পূর্বোক্ত ঘটনার দুইদিন পরেই পত্র আসিল যে রায় মহাশয় ইচ্ছা করিলে গুপ্তিপাড়ার চড়াস্থ বাঙ্গলাতে গিয়া কয়েক মাস থাকিতে পারেন। আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়, যদি যাইতে হয় ত শীঘ্রই যাওয়া কর্তব্য। পত্র পাইয়াই ত্বরা বাড়িয়া গেল। কে কে সঙ্গে যাইবেন, কে কে এ বাড়ীতে থাকিবেন, পরিবার মধ্যে এই চর্চা উপস্থিত হইল। নয়নতারাকে যাইতে হইবে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্ভিন্ন আর কে কে যাইবেন? জননীর ইচ্ছা তিনি যান, কিন্তু এ বাড়ীতে থাকে কে? নন্দরাণী ত নিজের সন্তানদিগকে লইয়াই ব্যস্ত। এত বড় সংসারটা কি একা সৌদামিনীর মাথার উপরে দিয়ে রাখা উচিত? একদিন নয়নতারা বলিলেন, "মা তুমি গেলে ত চলবে না? হাজার হোক সদু ছেলেমানুষ, তাকেই তোমার দেখা দরকার, সে কি এত বড় সংসারটা সাম্‌লাতে পারবে? আমি একা গেলেই বাবাকে দেখার বিষয়ে যথেষ্ট হবে, আমি বলি আমি রাঁধুনী, চাকর ও একজন কর্মচারী নিয়ে একাই যাই, তুমি এখানেই থাক, আমি বাবাকে সারিয়ে আন্‌ছি।"

জননী। তুই একা কি পেরে উঠবি? তবু আমি কাছে থাক্‌লে ওঁর মনটা অনেক ভাল থাক্‌বে।

নয়নতারা। একা পারব না কেন? কাজটা কি, একজন মানুষের তত্ত্বাবধান আর করতে পারব না?

কয়েকদিন এইরূপ নানা তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। একবার প্রস্তাব হইল সৌদামিনী যাইবেন, আবার সেটা রহিত হইল। কেহ বলিলেন, পটলা সংগে থাক, আবার সেটাও রহিত হইল। শেষে রায় মহাশয় নিজে স্থির করিয়া দিলেন, যে একলা নয়নতারাই যাইবেন। তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল।

যাওয়া স্থির হওয়া অবধি নয়নতারার মনের বিশ্রাম নাই। কোথায় কি বন্দোবস্ত করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন। হরেন্দ্র এখনও বাঁকিয়া আছেন, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ নাই। কিন্তু সে দুঃখটা মনে বড় দাঁড়াইতে পারিতেছে না; যাত্রার ত্বরাতে সেটাও যেন ভুলিয়া যাইতেছেন।

নানা কাজের মধ্যে তাঁহার একটি গুরুতর কাজ উপস্থিত হইয়াছে। মহেন্দ্রবাবু আসিয়া সংবাদ দিয়াছেন, যে আড়াই হাজার টাকা দেনার জন্য হরেন্দ্রের বাড়ী বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। তিনি কলিকাতাতে টাকা কর্জ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য হন নাই। সেজন্য ক্লেশে দিন যাপন করিতেছেন। এ সংবাদ মহেন্দ্রনাথ হরেন্দ্রের নিকট পান নাই; কলিকাতা হইতে জানিয়া আসিয়াছেন।

এই সংবাদ শোনা অবধি নয়নতারার মন এত ব্যস্ততার মধ্যেও গুরুতর চিন্তায় আক্রান্ত হইল। ইহার একটা উপায় না করিয়া গেলে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে পিতার সেবা করিতে পারিবেন না। অথচ হরেন্দ্র যেরূপ বাঁকা লোক অন্য কাহারও দ্বারা সাহায্য করাইতে গেলে তিনি লইবেন না। এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া, পিতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা শ্রেয় বলিয়া মনে করিলেন। একদিন পিতার সহিত এ বিষয়ে কথা হইল।

নয়নতারা। বাবা! আমি গোপনে জানলাম হরেনবাবু বড় বিপদে পড়েছেন।

রায় মহাশয়। কি বিপদ?

নয়নতারা। তাঁর বাবা কার কাছে তাঁদের বাড়ীটা বাঁধা দিয়ে দেড় হাজার টাকা নিয়েছিলেন; সেই দেড় হাজার টাকা নাকি সুদে আসলে আড়াই হাজার টাকাতে দাঁড়িয়েছে। সে ব্যক্তি এখন বাড়ীখানা বিক্রী করে নিতে চাচ্চে।

রায় মহাশয়। হরেন এ কথা আমাকে বলেনি কেন?

নয়নতারা। তিনি কি বলবার লোক; জান ত তাঁর প্রকৃতি কিরূপ, আমি তোমাকে এ কথা বলেছি শুনলে একেবারে বেঁকে বসবেন, আর আমাদের ধারে আসবেন না।

রায় মহাশয়। আজ এলে তাকে ডেকে দিও, যা করবার আমি করবো।

নয়নতারা। না বাবা আমার ডেকে দেওয়াটা ভাল নয়, তুমি আর কারুকে দিয়ে ডেকে পাঠিও।

রায় মহাশয়। আচ্ছা আমাকে ত দেখতে আসবে তখন আমি যা করবার করবো।

সেই দিন অপরাহ্ণে হরেন্দ্র রায় মহাশয়কে দেখিতে আসিলে, রায় মহাশয় অপর সকলকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলিলেন। ঘরটি নির্জন করিয়া হরেন্দ্রকে বলিলেন,—"আমি শুনলাম, তোমার বাপের দেনার জন্যে তোমাদের বাড়ী নাকি বিক্রী হয়ে যায়?"

হরেন্দ্র নিঃস্তব্ধ ও মস্তক অবনত করিয়া উপবিষ্ট।

রায় মহাশয়। কথা বলছ না যে, কত দেনা?

হরেন্দ্র। সুদে আসলে আড়াই হাজারের কিছু বেশি দাঁড়িয়েছে।

রায় মহাশয়। দেনাটা কার কাছে?

হরেন্দ্র। আলিপুর জজ আদালতের উকিল বেধুভূষণ রায়ের কাছে।

রায় মহাশয়। সে না তোমার বাপের সহাধ্যায়ী বন্ধু, দুজনে না হরিহর-আত্মা ছিল? মানুষটা কি রকম।

হরেন্দ্র। আমি মাসে মাসে যথাসাধ্য দিচ্ছি, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন, একেবারে টাকাটা চান।

রায় মহাশয়। ছি ছি। এমন লোকের সঙ্গে টাকাকড়ির কারবার রাখতে নেই; আচ্ছা তুমি এক কর্ম কর, আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে তাকে দিয়ে ফেল।

হরেন্দ্রের কাণ লাল হইয়া গেল; চক্ষে জল আসিল; অভিমানে আঘাত পড়িল; উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মশাই এখন পীড়িত, এখন এসব কথা থাক, আপনি সেরে আসুন, পরে হবে; তিনি বিক্রী করবেন ভয় দেখাচ্ছেন, বোধহয় থামিয়ে রাখা যাবে, আমি একটা কিনারা করতে পারব।

রায় মহাশয়। (বিরক্ত হইয়া) আঃ কি জ্বালা, তুমি সোজা কথাটা বুঝছ না কেন, আমি কি তোমাকে দান করতে চাচ্ছি? তুমি আড়াই হাজার টাকা বিনা সুদে আমার কাছে কর্জ নেও, তারপর টুনী পটলাকে পড়াবার জন্যে যে মাসে ২৫ টাকা দি তা আর নিও না, তাহলে ক্রমে শোধ করে তুলতে পারবে। এটা কি তোমার মনঃপুত হয় না?

হরেন্দ্র দেখিলেন পীড়িত মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন বিনীতভাবে বলিলেন,—"মশাই যা ভাল বিবেচনা করেন, করবেন।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় দেখিলেন নয়নতারা বাহিরের বারাণ্ডাতে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন পিতার ঘরে আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরেন্দ্র মনে মনে বলিলেন,—"বুঝেছি এ তোমারই কাজ।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

নয়নতারা। (ত্বরায় পিতার নিকট আসিয়া) কি হলো বাবা?

রায় মহাশয়। হবে কি, তুমি এখনি মহেন্দ্রকে ডেকে পাঠাও, একবার তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে দেখি হতভাগা লোকটা সুদ কিছু ছাড়ে কিনা, বন্ধুতার স্থলে আবার সুদ কি, এরা কি কষাই না জিউ। কালই টাকাটা ফেলে দিতে হবে।

নয়নতারা। হরেনবাবু টাকা নিতে চেয়েছেন ত?

রায় মহাশয়। মুখটা গোঁজ করে চলে গেল; বোধহয় এটা মনঃপুত হলো না; আমি বলেছি আমরা ত তোমায় দান করছি না, আমার কাছে বিনা সুদে ধার কর, না হয় টুনী পটলার পড়াবার দরুণ ২৫ টাকা করে আর নিও না, তাহলেই ত শোধ হবে।

নয়নতারা। এ ত বেশ কথা।

তখনি মহেন্দ্রবাবুকে ডাকান হইল। মহেন্দ্রবাবু আসিলে স্থির হইল, যে তিনি ভোরের গাড়ীতে কলিকাতায় গিয়া বিধুভূষণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং তিনি সুদটা ছাড়িতে পারেন কিনা জানিয়া আসিবেন। সেই দিন অপরাহ্নেই টাকাগুলি শোধ করা হইবে।

তদনুসারে পরদিন প্রাতে মহেন্দ্রবাবু কলিকাতায় গমন করিলেন। বিধুভূষণ রায়ের সহিত তাঁহার অগ্রেই আলাপ ছিল, সুতরাং সুদটা ছাড়িবার অনুরোধ করিতে বিশেষ লজ্জা পাইতে হইল না।

মহেন্দ্রনাথ। আপনি একেবারে টাকাটা পাচ্ছেন তবু সুদটা ছেড়ে দিতে পারেন না?

বিধুভূষণ। (হাসিয়া) আপনি বুঝতে পারলেন না, আমি যদি অন্য জায়গায় টাকাটা লাগাতাম শতকরা ১৮ টাকা নিতে পারতাম, অভাব পক্ষে ১২ টাকা ত কেউ ছাড়াতে পারত না, তার স্থলে শতকরা ৯ টাকা নিয়েছি। এই ত ছেড়ে দেওয়া।

মহেন্দ্রনাথ। লোকে বলবে কি, আপনারা চিরদিন দু'জনে হরিহরাত্মা ছিলেন, আজ তার বিধবা স্ত্রী ও পুত্রের কাছে জুলুম করে সুদ আদায় করছেন।

বিধুভূষণ। ও কথা ত বলা সহজ, যাদের টাকা কামাতে হয় তারাই জানে। আচ্ছা আপনি সাধু মানুষ আপনার অনুরোধে শতকরা ৬ ছয় টাকা করলাম।

মহেন্দ্র। যথা লাভ।

এই কথা বলিয়া চুঁচড়াতে ফিরিলেন। রায় মহাশয় পূর্বোক্ত কথোপকথনের বিবরণ শুনিয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। সেই দিন বৈকালেই দু হাজার দু শত বার টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। হরেন্দ্র পরদিন সংবাদ পাইয়া চক্ষের জল ফেলিলেন।

ইহার পরে রায় মহাশয়ের যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। বন্দোবস্ত হইল যে, বোটের সঙ্গে একখানি বড় নৌকা থাকিবে, তাহাতে জিনিসপত্র, একজন কর্মচারী, রাঁধুনী ও একজন চাকর থাকিবে, বোটে রায় মহাশয়েরা পিতাপুত্রীতে থাকিবেন। প্রথমে ২০।২৫ দিন বোটে বোটে বেড়ান হইবে, তৎপরে গুপ্তিপাড়ার চড়াস্থিত বাঙলাতে গিয়া থাকা হইবে। তদনুরূপ জিনিসপত্র নৌকাতে বোঝাই করা হইতে লাগিল। নয়নতারা মনে মনে একটা পরামর্শ করিলেন, যে এই প্রবাসবাসকালে পিতার শুশ্রূষা করিয়া যে সময় পাইবেন, তাহা জ্ঞানোন্নতিতে নিয়োগ করিবেন। এরূপ সঙ্কল্প করিয়া উদ্ভিদ বিদ্যার আলোচনার জন্য জ্যেষ্ঠের প্রদত্ত অনুবীক্ষণটি ও অনুরূপ গ্রন্থাদি লইলেন; সংস্কৃত ও ইংরাজী কাব্য কতকগুলি লইলেন; কতকগুলি ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন; এবং বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থাবলী যা পাইলেন সংগ্রহ করিলেন। এ নবানুরাগটি বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া জন্মিয়াছে। দেখিয়া সৌদামিনী বলিলেন, "দিদি! এত বই যে নিলে পড়বে কখন?"

নয়নতারা। (হাসিয়া) নিয়মে কাজ করতে জানলে সব কাজের জন্যেই সময় পাওয়া যায়। দুপুরবেলা বাবা যখন বিশ্রাম করবেন তখন বসে বসে কি করবো। দেখিস কত নূতন বিষয় শিখে আসবো।

কয়েক দিনের মধ্যে আয়োজন শেষ হইয়া গেল। চুঁচড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া রায় মহাশয়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে এস, পি, রায় ও তারাপদবাবু দুইদিন পূর্বে আসিয়া দেখা করিয়া গেলেন। ক্রমে যাত্রার দিন উপস্থিত। তৎপূর্ব দিন নয়নতারা টেঁপীকে তাহার মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। বলিলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে মায়ের কাছে গিয়ে দুষ্টুমি করো না ;আমি এসে আবার তোমাকে আনবো।"

সেইদিন তিনি একে একে জননী, নন্দরাণী ও সৌদামিনী প্রত্যেককে যাহা বলিবার বলিয়া বিদায় লইলেন। জননীকে বলিলেন, "দেখ মা, গোবিনবাবু ও সদুর প্রতি একটু চোখ রাখবে। সদু খুব সেয়ানা মেয়ে তবু তোমারও একটু চোখ রাখা উচিত। গোবিনবাবুর বিষয়ে সব ত শুনেছ। তাঁরা আপনার লোক, তবু একটু দূরে দূরে রাখাই ভাল।" তৎপরে নন্দরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই! তবে চললাম, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর বাবা সেরে উঠুন। কিরূপ চিন্তিত অন্তরে যাচ্চি বুঝতেই পারছ; সদু ছেলেমানুষ ওকে চালিয়ে নেবে; যখন যেমন দেখ আমাকে লিখবে; হরেনবাবুর সঙ্গে ত রোজ দেখা হবে; তাঁর খবর আমাকে দেবে; আমি বাড়ীটা যেমন করে চালাতাম তেমনি করে চালাবার চেষ্টা করবে। সন্ধ্যার পরে সৌদামিনীর গলা জড়াইয়া আপনার ঘরে লইয়া গেলেন, লইয়া গিয়া দুজনে কোচে বসিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

নয়নতারা। সদু! আমি ত বাবাকে নিয়ে চললাম, তুমি ঘরে রৈলে, তুমি আমার কাজ করবে, সকলকে আদর-যত্ন করবে, সকল দিক সামলে চলবে।

সৌদামিনী। আমি আছি, বৌ-দিদি আছেন, দুজনে একরকম করে চালিয়ে দেব, তুমি ভেব না।

নয়নতারা। আর একটা কথা তোমাকে এখনি বলা দরকার (একটু থামিয়া) গোবিনবাবুর বিষয়ে তুমি কি মনে কর?

সৌদামিনীর কান লাল হইয়া গেল; একটু সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ,"তুমি কি মনে করে এ কথা জিজ্ঞাসা করছ ?"

নয়নতারা। আমরা যতটা বুঝতে পেরেছি, তিনি তোমাকে একটু বিশেষ চক্ষে দেখছেন। তুমি কি সে বিষয়ে কিছু বুঝেছ ?

সৌদামিনী। হাঁ, মনে ত হয়।

নয়নতারা। তুমি সে বিষয়ে কি ভাব ?

সৌদামিনী। ভাবব আর কি, পুরুষের অমন কত ভাব হয়, কত ভাব যায়, একটু দূরে দূরে রাখাই ভাল।

নয়নতারা। ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছ। আমি বলি ভালবাসা জিনিসটা যদি খাঁটি হয়, তাহলে যাবার নয়; কালে ধরা পড়ে; একটু দূরে দূরে রাখাই ভাল। বিশেষ গোবিনবাবুর এই ভাবটা বাড়তে দেওয়ার পক্ষে দুটো কথা আছে; প্রথম ভাবতে হবে, যে তিনি একটি বৃহৎ পরিবারের একজন লোক, আমাদের সঙ্গে তাঁদের যতই আত্মীয়তা থাক না কেন, আমাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধটা ঘটে এটা তাঁরা কখনই পছন্দ করবেন না; গোবিনবাবু যে তাঁদের অমতে কাজ করতে পারবেন এমন মনে হয় না; দ্বিতীয় কথা যতদূর জানা গেছে কিছুদিন পূর্বেও তার স্বভাব-চরিত্র বড় খারাপ ছিল; তবে কিছুদিন ভালই দেখা যাচ্ছে। অধিক কি বলবো তুমি ত বোকা মেয়ে নও।

সৌদামিনী। ও সব কথার এখন দরকার কি ? আমি এত বড় হলাম আমি কি আপনাকে সামলে চলতে জানিনি ? তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক; আমি এমন কোনও কাজ করবো না, যাতে পরে পস্তাতে হবে, বা লজ্জা পেতে হবে।

নয়নতারা। (ভগিনীর মুখে চুম্বন করিয়া) আমি জানি এসব বিষয়ে তুমি আমার চেয়েও বুঝে চলতে জান। তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চললাম, যখন যেরূপ ঘটবে আমাকে জানাবে।

যাত্রার দিন প্রাতঃকালে অবশিষ্ট জিনিস বোটে উঠিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাঁহাদের আহারের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ, গৌরীপদবাবু প্রভৃতি চুঁচড়ার বন্ধুগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেন্দ্র আসিয়া জিনিসপত্র বহিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। নয়নতারার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইল, চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, কিন্তু উভয়ের কেহই কথা কহিলেন না।

বেলা ৮টার সময় রায় মহাশয় নৌকাতে গিয়া বসিলেন। নয়নতারা জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; সুরেশচন্দ্রের নিকট বিদায় লইলেন, "দাদা সব রৈল দেখ।" টুনী, পটল, টাইগার, টাইনী পর্যন্ত, সকলের নিকট বিদায় লইলেন। বোট ছাড়িল; রায় পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ একদৃষ্টে চাহিয়া কূলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বোট ছাড়িলেই অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে নয়নতারা বোটের জিনিসপত্র যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া ও পিতার ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া পিতার নিকট বসিলেন।

তাঁহার প্রাণ আজ বিষাদে ডুবিয়া যাইতে লাগিল; কি দায়িত্ব মস্তকে লইয়া একাকিনী চলিলেন। বিদেশে পিতার পীড়া যদি বৃদ্ধি পায় কি করিবেন ? তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর অবস্থা কি দাঁড়াইবে ? এই সকল চিন্তা তাঁহার মনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তৎপরে হরেন্দ্রের কথা মনে হইতে লাগিল। "আসিবার সময়েও তাঁর সঙ্গে কথাটা কহিলাম না, হয়ত আরও বিরক্ত হলেন। দশজনের কাছে বিদায় নিলাম, তাঁর কাছেও বিদায়টা নেওয়া উচিত ছিল; তা হলো না, সেটা ভাল হলো না।" আবার ভাবিলেন,—"মেয়েমানুষের এত হালকা হওয়া কি ভাল, তিনি যদি রাগ করে থাকতে পারেন, আমি কি আর রাগ করে থাকতে জানি নি; যাক্ বৌ-এর চিঠিতে তাঁর খবর ত পাব। দেনাটা যে শোধ হয়েছে, এটা একটা সুখের বিষয়; সেজন্যে বোধ হয় আমার

উপরে আর একটু বিরক্তি বেড়েছে, তা কি করবো, দেনাটা রেখে এলে সুস্থির থাকতে পারতাম না।"

তাঁহার মন দিয়া যে এত চিন্তা গেল, রায় মহাশয় তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনের চিন্তা মনে রাখিয়া প্রসন্ন বদনে পিতার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে কথোপকথনটা ধর্ম বিষয়ে আসিয়া পড়িল।

নয়নতারা। আমরা যেভাবে দিন কাটাই এটা ভাল বোধ হয় না; ধর্ম-কর্মের নাম গন্ধ নাই, কেবল খাও-দাও আর আমোদ-আহ্লাদ কর।

রায় মহাশয়। কথাটা কি জান, একটা ভেঙ্গে আর একটা গড়া বড় কঠিন। সে কালের লোকের একটা রকম ছিল, আমরা সেটা হারিয়েছি, অথচ নূতন একটা দাঁড় করাতে পারছি না।

নয়নতারা। আমি ত তোমাকে বার বার বলি, আমার এ কালের লোকদের চেয়ে যেন সে কালের লোকদের ভাল লাগে; তাঁদের নিষ্ঠা ভক্তি দেখে আমার মন মুগ্ধ হয়।

রায় মহাশয়। সাধারণ লোকের ধর্ম-শিক্ষার যে উপায়গুলো ছিল, একে একে চলে যাচ্চে, সেগুলোকে রাখা যাচ্চে না, অথচ নূতন কোনও প্রণালী প্রবর্তিত হচ্চে না, ভয় হচেচ কালে এমন ধর্ম-প্রিয় জাতটা ধর্মহীন হয়ে যাবে।

নয়নতারা। আচ্ছা! আমরা যতটুকু বুঝেছি, ততটুকু করবার চেষ্টা করা ত ভাল। আমরা আর কিছু না জানি, এটা ত জানি যে, ঈশ্বর আমাদের উপাস্য, আমরা ত তাঁর উপাসনাকে আমাদের পরিবারের নিত্য কর্মের মধ্যে করে রাখতে পারি; তাতে আমাদের ধর্ম চিন্তার অভ্যাস হয়; পরিবারে শৃঙ্খলা ও ধর্মশাসনটা থাকে; আর ছেলেদের ধর্ম-শিক্ষারও সাহায্য হয়।

রায় মহাশয়। তাত বুঝলাম, কিন্তু এ কাজটা করে কে?

নয়নতারা। কেন, তুমি করবে, তুমি আমাদের সকলকে একত্র করে বসাবে, আমরা সকলেই গাইতে জানি, সকলে ঈশ্বরের স্তুতিগান করবো, তারপর তুমি কোনও ধর্মগ্রন্থ হইতে কিছু পড়ে শোনাবে ও নিজে ঈশ্বর-চরণে সকলের জন্যে প্রার্থনা করবে, এটা ত রোজ হতে পারে। এখন ত আমরা নাস্তিকের মত থাকি, এটা হলেও ত বোঝা যায় যে আমাদের একজন উপর-ওয়ালা আছেন।

রায় মহাশয়। জানই ত, ধর্ম বিষয়ে আপনার সন্তানদেরও কিছু বলতে লজ্জা করে, আমার যে ওটা আসে না।

নয়নতারা। অনভ্যাস বলে আসে না; না হয় কোনও ছাপা বই থেকে এক একটা স্তুতি পড়া যেতে পারে।

সেদিন বৈকালবেলা রায় মহাশয় কতকগুলি পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত স্তুতির সহিত কতকগুলি নূতন রচিত স্তুতি সংযোজিত করিয়া একটি স্তুতি প্রস্তুত করিলেন।

স্থির হইল, যে প্রতিদিন প্রাতে মুখ হাত ধুইয়া সর্বাগ্রে কিয়ৎকাল ঈশ্বরের শ্রবণ মননে যাপন করা হইবে, নয়নতারা একটি সঙ্গীত করিলে, কোনও ধর্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করা হইবে, তৎপরে রায় মহাশয় সংস্কৃত স্তুতিটি পাঠ করিবেন ও নয়নতারা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদটি পড়িবেন ও তৎপরে আবার সঙ্গীত হইয়া সমাধা হইবে। এতদ্ব্যতীত স্নানান্তে প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় উপাসনা কার্য সমাধা করিবেন, ও বৈকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হইবে।

বোটে থাকিবার সময় প্রতিদিন এই নিয়মে কাজ চলিল। এতদ্ব্যতীত নয়নতারা পিতাকে আরও অনেক বিষয় পড়িয়া পড়িয়া শুনাইতেন। দিনটা বড় সুখেই যাইতে লাগিল। রায় মহাশয়ের স্বাস্থ্যেও উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। পিতাপুত্রীতে চন্দ্রালোকে বোটের ছাতে বসিয়া পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ে অনেক আলাপ হইত। এরূপ নির্জনে, এরূপ নিরুদ্বেগে এসকল কথা কখনও হয় নাই। ধর্মভাবের বিনিময়ে উভয়ের হৃদয় দিন দিন ভাবে গভীর হইতে লাগিল।

নয়নতারা যখন বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবন ও উক্তিসকল পড়িয়া শুনাইতেন, তখন দুইজনেরই চক্ষে জলধারা বহিত।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাল তাঁহারা বোটে বোটে বেড়াইলেন। এক এক স্থানে থামেন, ডাকের চিঠিপত্র গ্রহণ করেন, জিনিসপত্র ক্রয় করেন, দুই-তিনদিন থাকেন, আবার চলিয়া যান। এইরূপে নানাস্থানে বেড়াইয়া এক মাস পরে গুপ্তিপাড়ার চড়াতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বাংলাটির চতুষ্পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর; চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে; অযত্নসম্ভূত বৃক্ষরাজি দ্বীপটিকে মনোরম করিয়া রাখিয়াছে; গঙ্গার সন্নিকটবর্তী বালুকারাশির উপরে কৃষকগণ ক্ষেত করিয়াছে; নানা শস্যের ক্ষেতগুলি হরিদ্বর্ণ হইয়া রহিয়াছে; বাংলার সন্নিকটে চারিধারে ফুলের বাগান; একজন মালী আছে, সে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। নয়নতারার পদার্পণে বাগানটি নূতন মূর্তি ধারণ করিল। প্রত্যেক বৃক্ষটি যেন অনুভব করিল, একজন যত্ন করিবার লোক সে গৃহে আসিয়াছেন। সকলের শ্রী ফিরিয়া গেল।

এখানেও নয়নতারাকে একটি ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া বসিতে হইল। প্রতিদিন নদীর পার হইতে যথাসময়ে দুগ্ধ আনয়ন করা কঠিন, অথচ প্রাতেই পিতার তাজা দুগ্ধের প্রয়োজন। এজন্য এখানে আসিয়াই দুইটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিলেন। তাহাদের জন্য একটি চলনসই গোয়ালঘরও নির্মিত হইল। সে দুইটির তত্ত্বাবধান করাও তাঁহার একটি কাজের মধ্যে দাঁড়াইল।

নূতন স্থানে আসিয়াও তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্মসাধন প্রণালী অক্ষুন্ন রহিল; বরং সে বিষয়ে উভয়ের আগ্রহ ও মনোযোগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দিবা শেষে পিতাপুত্রীতে উদ্যান মধ্যে বসিয়া কেবল এই সকল কথা হইত। কোথা দিয়া সময় যাইত তাহা বুঝিতেও পারিতেন না।

এখানে আসার পর নয়নতারা নিয়মমত বাড়ীর সকলের পত্র পাইতে লাগিলেন। কেবল সৌদামিনী দুই চারিখানি পত্র লিখিয়া মৌনী হইলেন। নয়নতারা অনুমানে বুঝিলেন, যে গোবিন-নেশাতে তাঁহাকে ধরিতেছে, পত্র লিখিবার অবসর নাই। আর একজন মৌনী রহিলেন, তিনি হরেন্দ্র। দিনের পর দিন নয়নতারা মনে করিতে লাগিলেন, কোন দিন তাঁহার পত্র আসিবে; কিন্তু হরেন্দ্রের সাড়া শব্দ নাই। তিনিও অভিমান করিয়া পত্র লিখিতে বিরত থাকিলেন। যাহা হউক, সেজন্য হরেন্দ্রের সংবাদ পাওয়ার ব্যাঘাত হইল না। নন্দরাণী প্রত্যেক পত্রে তাঁহার সংবাদ দিতে লাগিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় রায় মহাশয় যখন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেন, তখন নয়নতারা পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। রাখাল বালকদিগকে পয়সা দিয়া প্রতিদিন প্রাতে নানাপ্রকার লতাপাতা সংগ্রহ করিতেন, দ্বিপ্রহরে অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাহাদের পরীক্ষা করিতেন ও উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের বর্ণনার সহিত মিলাইতেন; তদ্ভিন্ন পূর্বাধীত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া পুরাতন বিদ্যাকে মার্জিত করিতেন। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধ শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া ও কীর্তন শুনিয়া বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতি যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহাও এখানে জাগ্রত রাখিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্য অনেক পড়িয়া ফেলিলেন। কেবল তাহা নহে, নিয়মে কাজ করার এমনি গুণ, প্রতিদিন নিয়মপূর্বক ৩।৪ ঘণ্টা পড়িয়া পড়িয়া প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপদেশ অবগত হইবার নিমিত্ত বাংগালায় অনুবাদিত সমগ্র মহাভারত গ্রন্থখানি প্রায় আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলেন। এইরূপে নূতন স্থানে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে চুঁচড়ার বাড়ীতে গোবিনের ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় সপ্তাহে দুই দিন আসিতেছেন। ক্রমে এই বিষয় লইয়া দুই বিভিন্ন দলের লোকের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ

হইয়াছে। প্রথম দল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের মহিলাগণ। গোবিনের বাড়ীতে তাঁহার বিধবা ছোট পিসী থাকেন। তিনি গোবিনকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন; সুতরাং ঐ যুবকের প্রতি তাঁহার মাতৃস্নেহ বলিলে হয়। গোবিনের উচ্ছৃঙ্খলতার আতিশয্য বশতঃ সকলেই যখন নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, এমন কি তাঁহার নিজের জননীও যখন তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না, তখনও ঐ স্নেহশীলা পিতৃষ্বসা গোবিনকে ছাড়েন নাই; তাহার পায়ে পায়ে থাকিতেন, কাঁদিতেন, অনুনয়-বিনয় করিতেন, দেবতা ব্রাহ্মণের কাছে মাথা খুঁড়িতেন, "হে ঠাকুর! গোবিনের সুমতি হউক।" এইরূপ কাঁদিবার একজন লোক থাকা এ সংসারে বড়ই সৌভাগ্য। এই পিতৃষ্বসার প্রার্থনার ফলেই বোধ হয় পত্নীবিয়োগের দিন হইতে গোবিন একটু সামলাইয়াছেন; পুরাতন সঙ্গ যদিও একেবারে ত্যাগ করেন নাই, তথাপি সে সব দলে সর্বদা যাতায়াতটা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাড়ীর মহিলারা বলাবলি করিয়া থাকেন, "সেই ত কুসংগ ত্যাগ করলে তবে কেন ভদ্রলোকের মেয়েকে মনের কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললে?"

সেই পিতৃষ্বসা এখন দেখিলেন, গোবিনের এক রোগ ঘুচিয়া আর এক রোগে ধরিল, চুঁচড়াতে নিত্য গতায়াত আরম্ভ হইল। তিনি গোবিনকে এ বিষয়ে হঠাৎ কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। এক প্রকার দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন মণিলালবাবুর সহিত তাঁহার এ বিষয়ে কথাবার্তা হইল।

পিসী। তুমি খপরটা নেও দেখি গোবিন চুঁচড়াতে রোজ রোজ এত যাওয়া আসা আরম্ভ করেছে কেন?

মণিলাল। তা আর খপর নেব কি, সুরেশের সমবয়সী, গাওনা বাজনা, আমোদ আহ্লাদে তাদের সংগে খুব মিশে গেছে।

পিসী। আমার ত বোধ হয় ভিতরে আর কিছু কথা আছে।

মণিলাল। ভিতরের কথা আবার কি?

পিসী। নয়নতারার মেজ বোনটির বয়স কত?

মণিলাল। ১৯।২০ হবে।

পিসী। এর গোড়ায় সেই আছে।

মণিলাল। ছি ছি! এমন কথা বলো না, তারা অতি ভাল লোক, সে বাড়ীর ছেলেপিলে অন্য বাড়ীর মত নয়।

পিসী। তুমি খারাপটাই মনে করছ কেন, গোবিনের স্বভাব-চরিত্র যে বদলে গিয়েছে তা কি আমরা দেখছি না? সে গোবিন আর নাই; এদের সংগে মিশে সে যেন আর-এক গোবিন হয়ে গিয়েছে। আমি কিছু খারাপ মনে করে বলছি না। সেখানে ভালবাসার টানে পড়েছে। একটা পাকাপাকি বেঁধে গেলে শেষে টেনে ছাড়াতে পারবে না।

মণিলাল। (হাসিয়া) আচ্ছা, আমি একদিন চুঁচড়াতে যাব, গিয়ে কালীপদর স্ত্রীর কাছে জেনে আসব।

মণিলালবাবু চুঁচড়ায় গিয়া জানিয়া আসিলেন, যে পিতৃষ্বসা যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সত্য। তখন পরিবার মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। রায়-গৃহিণী মণিলালবাবুকে বলিয়াছেন, "গোবিনকে ত আমরা পরের মত ব্যবহার করতে পারি না; সে বাড়ীতে আসবে অথচ আমরা আদর-যত্ন করবো না, বা বাড়ীর ছেলেরা তার সংগে মিশবে না, তা হতেই পারে না। আমরা কি করে বাড়ীতে আসতে বারণ করবো?"

সুতরাং ছোট পিসী অবশেষে মুখ ফুটিয়া গোবিনকে বলিতে লাগিলেন, "তোর চুঁচড়াতে এত যাতায়াত কেন?"

গোবিন। তোমার তা কি?

ছোট পিসী। তাদের বাপ বাড়ীতে নেই, তাদের ঘরে বড় বড় মেয়ে আছে, এত যাতায়াত

করা কি ভাল? লোকে বলবে কি? আর তারা পছন্দও করে না যে তুই এত ঘন ঘন যাতায়াত করিস।

গোবিন। তুমি কি করে জানলে?

ছোট পিসী। না জানলে বলছি! তাঁরা চক্ষুলজ্জায় বলতে পারেন না, ভদ্রলোকের ছেলেকে কি করে বারণ করবেন।

গোবিন। এ কথাতে আমার বিশ্বাস হচ্চে না; আমি জানি তাঁরা আমাকে ভালবাসেন।

ছোট পিসী। তুই নিজের চোখে মানুষকে দেখিস বৈ ত নয়, আমাদের সঙ্গে তাঁদের যে সম্বন্ধ, তাতে তোকে তাঁরা কি করে আপনার মত ব্যবহার না করবেন, তোর কিন্তু এত যাতায়াত করা ভাল নয়।

গোবিন। আচ্ছা, তাঁরা যদি না চান যে আমি যাই, তাহলে আমি যাব না।

এই কথোপকথনের পর গোবিন সুরেশচন্দ্রকে সমুদয় কথা ভাঙ্গিয়া পত্র লিখিলেন, এবং তিনি যে সৌদামিনীকে ভালবাসেন ও তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়া, তাঁহার জীবনে কিরূপে এক নূতন অধ্যায় খুলিয়াছে, তাহাও গোপন রাখিলেন না। সর্বশেষে ইহাও জানাইলেন, যে যদি সৌদামিনীর আপত্তি না থাকে, এবং তাঁহারা বিরোধী না হন, তাহা হইলে তিনি সৌদামিনীর সহিত পরিণয়-সূত্রে বন্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন।

মানুষ কাজ করে এক ভাবিয়া, হইয়া দাঁড়ায় আর এক প্রকার। ছোট পিসীর প্রতিবন্ধকতাতে ব্যাপারটা ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইল। বাধা পাইয়া গোবিনের প্রেম উছলিয়া চলিল। যথাসময়ে সুরেশের উত্তর আসিল। তাহার মর্ম এই: "তুমি আসাতে আমরা সকলে আনন্দিত হই; তুমি যেরূপে আপনার পুরাতন রীতিনীতি সংশোধন করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই বিশেষ প্রীত ও তোমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি; আমার ভগিনীর ভাব আমাদের অপেক্ষা তুমি বোধ হয় অধিক জান, সে বিষয়ে অধিক কি বলিব? তবে পরিণয় সম্বন্ধের বিষয়ে শেষ কথা পিতা মহাশয়কে না জানাইয়া বলিতে পারি না।"

পত্র পাইয়া গোবিন ছোট পিসীকে বলিলেন, "তোমরা আমাকে মিছে কথা বলেছ, আমার যাওয়ার বিষয়ে তাঁদের অমত নাই, বরং তাঁরা তাতে আনন্দিত।"

ছোট পিসী। তুই কথাটা ভেঙ্গে বল্না কেন, তাঁদের মেজ মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্চিস কি না?

গোবিন। আমি বিয়ে করতে চাইলেই কি হবে? তিনি কি আমার মত মানুষকে বিয়ে করতে চাবেন? আমি তাঁদের কাছে দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়।

ছোট পিসী। ও বাবা এতদূর গড়িয়েছে! তবে আর বাকি কি। তারপর বুড়ো মার করবি কি? তুই যে ওঁর অন্ধের নড়ি, এমন কাজ করলে কি আর আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবি?

গোবিন। তা আর কি, ছেলে কি চিরদিন মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকে, আমি আজ ঘরে না থেকে যদি দূরে থাকতাম, তাহলে কি হতো?

ছোট পিসী। ইস্ তুই যে মনে মনে সব ঠিক করে নিয়েছিস দেখছি, তবে আর ঝগড়া করে ফল কি, কপাল পুড়েছে দেখছি।

গোবিন। ঠিক ঠাক কিছুই করিনি, যদি হয়ই তাই ভেবে বলছি।

ইহার পরে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে মহা দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল। রায় পরিবারের সহিত মণিলালবাবুর যতই আত্মীয়তা থাক না কেন, তাঁহাদের সঙ্গে যে একটা বিবাহ সম্বন্ধ হয় ইহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন। তিনি একবার সুরেশচন্দ্রের, একবার তারাপদ রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন, "সৌদামিনীকে বলিয়া নিবৃত্ত কর, সে যেন গোবিনকে প্রশ্রয় না দেয়।" তারাপদবাবু একদিন বিনোদকে পাঠাইয়া সৌদামিনীকে আনাইলেন;

নিজের পত্নীর দ্বারা তাহার মনের সকল কথা জানিবার চেষ্টা করিলেন; নিজেও নির্জনে তাহার সহিত অনেক কথা কহিলেন; কহিয়া এইমাত্র বুঝিলেন যে, তাঁহারা বিরোধী হইলে সৌদামিনী চিরদিন অবিবাহিতা থাকিবেন, কিন্তু গোবিন ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। এই কথা জানা অবধি তারাপদবাবু বুঝিলেন যে গোবিনের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিতেই হইবে। তৎপরে তিনি গোবিনকে ডাকাইয়া অনেক কথা কহিলেন; তাহার স্বভাব-চরিত্রের বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিলেন; সকলের মুখেই শুনিলেন, সে গোবিন আর নাই বদলিয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহার ইচ্ছাটা আরও দৃঢ় হইল। তিনি মণিলালবাবুকে বলিলেন, "আপনারা বাধা দিবেন না; গোবিন ত আর কাঁচ ছেলে নয়, থাকলই বা বাহিরে বাড়ী করে, আপনাদেরই ত থাকবে।"

এই বিষয় লইয়া কলিকাতার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইঁহারা কোনও কথা হঠাৎ কর্তার কর্ণগোচর করেন না; তাঁহার অজ্ঞাতসারে অনেক কাজই হইয়া যায়; ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টা আর তাঁহার গোচর না করিয়া থাকা যাইতেছে না। অবশেষে গোবিনের ভাব পরিবর্তনের বিষয় তাঁহাকেও শোনান হইল। তিনি ধীরভাবে সমুদয় শুনিয়া একদিন সন্ধ্যার পর নিজের শয়ন-গৃহে গোবিনকে ডাকিলেন। দুইজনে গোপনে কি কথা হইল, তাহা কেহই জানে না। পরদিন তিনি মণিলালবাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "গোবিনের স্বভাব-চরিত্র চিরদিন যে রকম তাতে সে যদি একটি মেয়েকে ভালবেসে বিবাহ করে তার কল্যাণই হবে, অতএব এ বিবাহে বাধা দিও না। কত ছেলে ত পৈতৃক ভিটে ছেড়ে বাহিরে বাড়ী করেছে, সে না হয় তাই করবে। সে বলেছে যে, পৈতৃক ভিটেতে তার যে অংশ আছে, তা তার মায়ের ও পিসীর জন্যে ও তাঁদের দেহান্ত হলে ভাইপোদের জন্যে লিখে দিয়ে যাবে। তাই লিখিয়ে নেও; সে নিজে উপার্জন করে যে টাকা করেছে, তাই দিয়ে বাড়ী কিনে নিক; নিয়ে বিবাহ করে গৃহধর্ম করুক। এ বিয়েতে বাধা দিলে সে আবার খানে-খারাপ হয়ে যাবে; সে কাজ করো না।"

বিবাহে কর্তার সম্মতি জানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে মহিলাগণের আর্তনাদ উঠিল। বৃদ্ধা জননী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কর্তা একদিন তাঁহাকে বুঝাইলেন, "তুমি কাঁদ কেন, গোবিনের স্বভাব চরিত্র শুধরে গিয়েছে সে জন্যে কেন আনন্দ কর না? ছেলে ত কোথাও যাচ্চে না; সঙ্গে নিয়ে খাওয়া-দাওয়াটা নাই বা হলো; কৃষ্ণ যদি এমন করলেন, তবে আর শোক করে করব কি?"

কেবল যে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে গোলযোগ পড়িয়া গেল, তাহা নহে, আর এক দলেও গোবেনের পরিবর্তনের গোলযোগ পড়িয়া গেল। তাহা রঙ্গভূমি সকলের অভিনেতা ও অভিনেত্রী মহলে। গোবিন দুই বৎসর হইতে তাহাদের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা কম যাতায়াত করিতেন বটে, কিন্তু একেবারে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। সাহায্যের আবশ্যক হইলেই গিয়া সাহায্য করিতেন; তাহাদের মধ্যে একটা আমোদ-প্রমোদ ঘটনা হইলে, তাহাতে অংশী হইতেন। কিন্তু সৌদামিনীকে জানা অবধি সে যাতায়াতও বন্ধ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সহিত মেশাটা এত হীন কাজ মনে হইয়াছে, যে তাহার স্মরণেও লজ্জা হয়। সুতরাং বহুদিন হইল, তিনি তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়াছেন। তাহাদের ঘোর মুস্কিল বাধিয়াছে। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তাহাদের সঙ্গীত বিভাগটা চলে না। অবশেষে রঙ্গভূমির ম্যানেজার হরিশ্চন্দ্র ঘোষ একদিন গোবিনের নিকট উপস্থিত। ইনিও একজন কলিকাতার বনিয়াদী ভদ্রঘরের সন্তান। কিন্তু এমনি কালের মহিমা যে ইনিও সহরের সমুদায় ভদ্রলোকের ও নিজের আত্মীয়-স্বজনের সমক্ষে বাজারের প্রকাশ্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কোমর দুলাইয়া নাচিতে লজ্জিত হন না। ইনি গোবিনের একজন বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইনি আসিয়া

গোবিনকে একটা রিহার্শালে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিলেন, "তোমাকে যেতেই হবে, নতুবা বলছে না, তুমি আমাদের ছাড়লে হবে না।"

গোবিন। মাপ কর ভাই, আমার দ্বারা ও সব কাজ আর হবে না, দুষ্কর্মটা ঢের দিন করেছি আর নয়।

হরিশ। সে কি হে তোমার যে ভারি ধর্মজ্ঞান হলো দেখছি। ব্যাপারটা কি বল দেখি?

গোবিন। ঈশ্বর করুন তোমারও মন আমার মত হয়, আমরা নিজে পাপে ডুবেছি, দেশটাকেও ডুবিয়েছি।

হরিশ। তাই ত তুমি যে অনেক দূর গিয়েছ দেখছি।

গোবিন। আমি কি তোমার সঙ্গে তামাসা করছি? আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ সকল পথ ত্যাগ করবো। জান ত আমি দুর্বল মানুষ, আমাকে আর প্রলোভনে ফেল না। তোমাদের কাজ তোমরা চালাওগে, তোমাদের বন্ধুদের লিষ্ট হতে আমার নাম কেটে দাওগে।

হরিশ। (গম্ভীরভাবে) এর উপরে আর কথা নেই, যে ভাল হতে চায়, তাকে যে পাপে ফেলে তার মত পাপী আর জগতে নাই। আমার আর কথা নাই।

গোবিন। আমি খুসী হলাম।

হরিশ। তা যেন হলো, সহরে একটা গুজব শুনছি, সেটা কি সত্যি?

গোবিন। কি গুজব?

হরিশ। তুমি নাকি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ?

গোবিন। বিয়ে করতে যাচ্ছি যে তা ঠিক নয়, করলেও করতে পারি।

হরিশ। মানুষটা কে তা কি শুনতে পারি?

গোবিন। সেটা এখন নাই বা শুনলে।

হরিশ। (হাসিয়া) কাক মুখে আমরা শুনেছি; চুঁচড়ার কালীপদ রায়ের মেজ মেয়ে—না?

গোবিন। কোথায় শুনলে?

হরিশ। সে কথায় কাজ কি, সত্যি কি না বল না।

গোবিন। হাঁ, সত্য।

হরিশ। (হাসিয়া) যা হোক জালে খুব কাতলা ফেলেছ ত।

গোবিন। অমন হালকাভাবে কথা কইলে আমি কথা কব না। কতকগুলো বাজারের মেয়ের সঙ্গে বৈ ত নয়, এই উঁচু দরের মেয়েরা যে কি জিনিস তা ত জান না, সে মেয়ে যদি দেখতে তা হলে পায়ে পড়ে পুজো করতে।

হরিশ। (হাসিয়া) আমাদের ভাগ্যে ত সেটা ঘটবে না, আমাদের হয়ে তুমিই করো।

গোবিন। ঠাট্টা করে যাই বল না কেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যেন আমি পাপের পথ ছেড়ে পুণ্যের পথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

হরিশ। (গম্ভীরভাবে) আমি সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

এই বলিয়া হরিশবাবু প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে বিবাহের প্রস্তাবটা পাকিয়া দাঁড়াইল। তারাপদবাবু সমুদায় বিবরণ লিখিয়া রায় মহাশয়কে পত্র লিখিলেন। সৌদামিনীও নয়নতারাকে সমুদায় বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া ও নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া, তাঁহার পরামর্শ জানিবার জন্য পত্র লিখিলেন। রায় মহাশয় ও নয়নতারা অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর স্থির করিলেন যে কিছুদিন বিলম্ব করা ভাল, দেখা যাক, গোবিনের পরিবর্তনটা পাকা কিনা? তদনুসারে উভয়কে পত্র লেখা হইল।

এদিকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি একদিন নয়নতারা ডাকযোগে একখানি 'কলিকাতা গেজেট', কতকগুলি বিলাতি মাসিক পত্রিকা ও দুইখানি বই পাইলেন। প্রেরকের নাম নাই; কিন্তু হস্তাক্ষর দেখিয়া বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে তাহা হরেন্দ্রের প্রেরিত। 'কলিকাতা

গেজেট'খানি খুলিয়া দেখেন, যে হরেন্দ্র ফেব্রুয়ারি মাসে যে বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আনন্দের বেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বাবা! হরেনবাবু ফার্স্ট ডিভিশনে এম. এ. পাস হয়েছেন।"

রায় মহাশয়। দেখি (গেজেটখানি লইয়া দেখিয়া) আমি জানতাম ও পাস হবে, ও কি একটা সাধারণ ছেলে! (হরেন্দ্রের প্রেরিত মাসিক পত্রিকা ও পুস্তকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখেছ, হরেন কেমন পরের জন্য ভাবে, জানে আমরা একলা একলা এই নির্জনে পড়ে আছি, এগুলো পেলে আমাদের একটা পড়বার জিনিস হবে, তাই সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে। তুমি আমার নাম করে তাকে পত্র লেখ, বল যে আমি সে পাস হওয়াতে ভারি সুখী হয়েছি। আরও লেখ যে টুনী পটলের ছুটির সময় যে এখানে আসবার কথা হচ্চে, তাদের জন্য বোট যাবে, সেও যেন তাদের সঙ্গে আসে এখানে, দিন কতক থেকে তারপর বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।"

এই বন্দোবস্তে নয়নতারা বড়ই প্রীত হইলেন। সেইদিন আহারের পর বহু দিবসান্তে হরেন্দ্রকে পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্রের মর্ম এই: "অনেকদিন পত্র লিখি নাই, মনে করেছিলাম আপনি পত্র না লিখিলে আর লিখব না। কিন্তু আপনার পাসের খবর পেয়ে এতই আনন্দ হয়েছে, যে আর পত্র না লিখে থাকতে পারছি না। রাগ, উষ্মা যেন সব ধুয়ে গিয়েছে। বাবাও ভারি খুসী হয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যে টুনী পটলের জন্যে বোট যাবে, বাবা ভাবছিলেন দাদাকে তাদের নিয়ে আসতে বলবেন, কিন্তু আজ বলেছেন যে আপনি তাদের আনবেন ও এখানে কয়েকদিন থেকে মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আমার মনের মত কথাটা হওয়াতে ভারি আনন্দ হয়েছে; এখন আপনি বেঁকে না বসলে হয়। স্থানটি বড় মনোরম, একবার আসুন, খুব ভাল লাগবে।"

চুঁচড়ার বাড়ীতেও এই মর্মে পত্র আসিল। হরেন্দ্রের সঙ্গে বোটে পিতার কাছে যাবে শুনিয়া টুনী ও পটল নাচিতে লাগিল।

যথাসময়ে বোট আসিল। একদিন প্রাতে সকাল সকাল আহার করিয়া হরেন্দ্র টুনী ও পটলকে লইয়া বোটে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, এ বন্দোবস্তটা সুরেশের মনঃপূত হইল না। ছেলেরা খাইয়া, খেলাইয়া, গাইয়া হরেন্দ্রের নিকট গল্প শুনিয়া, আনন্দে চলিল। হরেন্দ্র তাহাদের আনন্দটা দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য রহিয়া বসিয়া চলিলেন।

তাঁহাদের সঙ্গে আর একজন আছে, তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সে টাইগার। টুনী পটল যদি চলিল, তবে টাইগার থাকে কার কাছে? আর টাইগারকে ফেলিয়া তারাইবা থাকে কিরূপে? সুতরাং টাইগারও চলিয়াছে। তবে সে বেচারার বন্ধনদশায় থাকা বড় কষ্টকর। একটু দৌড়িতে পারে না, ইঁদুর ছুঁচাটা তাড়া করিতে পারে না, কেবল বোটের পাপোষটির উপরে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়, অথবা বেঞ্চখানির উপরে উঠিয়া নদী দেখা, ইহা কতক্ষণ ভাল লাগে? কাজেই টাইগারের বড় কষ্ট। তবে সুখের মধ্যে নড়িতে চড়িতে টুনীর আলিঙ্গন ও চুম্বন পায়, ইহাতেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে।

টুনীর গল্প শুনিয়া যেন পেট ভরে না। সেদিন সন্ধ্যার পর বোটের ছাতে চন্দ্রালোকে বিছানা হইল। সেখানে টুনী হা করিয়া হরেন্দ্রের ঘাড়ে পড়িয়া গল্প গিলিতে লাগিল। হরেন্দ্র এক রাজকুমার ও রাজকুমারীর গল্প করিলেন। তাহারা বনে ফুল তুলিতে গিয়াছিল; একটা রাক্ষসী মায়ারূপ ধরিয়া আসিল; পথ ভুলাইয়া রাজকুমার ও রাজকুমারীকে রাক্ষস-পুরীতে লইয়া গেল; রাজকুমারকে একদিন কুটিয়া ঝোল ও অম্বল রাঁধিল; তাহা দেখিয়া রাজকুমারী রাত্রে পলাইল; আবার রাক্ষসী তাহাকে ধরিয়া আনিল—এই সকল শুনিতে শুনিতে টুনী ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিতে লাগিল, "দুষ্টু রাক্ষসী।" পটল বলিল, "দূর এ যে গল্প।"

আর শোনে কে, প্রায় পাঁচ মিনিট কাঁদিল। হরেন্দ্র বলিলেন, "তবে থাক।" টুনী আবার জেদ করিয়া ধরিল, "আপনার দুটি পায়ে পড়ি, বলুন আমি আর কাঁদবো না।" বোটের সময়টা এইরূপে কাটিতে লাগিল।

ক্রমে একদিন অপরাহ্নে বোট গুপ্তিপাড়ার চড়াতে লাগিল। হরেন্দ্র দেখিলেন, তাহাদের অভ্যর্থনার্থ নয়নতারা ঘাটের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। টুনী ও পটল নৌকা হইতে নামিয়াই দিদিকে জড়াইয়া ধরিল ও কত আদর করিল। তৎপরে পিতার উদ্দেশে বাংগলার দিকে ছুটিল। হরেন্দ্র ও নয়নতারা কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে চলিলেন।

নয়নতারা। (হরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া) তবু ভাল, আপনি এলেন, আমি ত মনে করেছিলাম এ জন্মে আর আপনার সঙ্গে কথা কবো না।

বহুদিনের পর সেই হাসি হাসি মুখখানি দেখিয়া হরেন্দ্রের মন সুধারসে সিক্ত হইয়া গেল; তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন নয়নতারার মূর্তি পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সাধুতার আভাতে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রোগীর শুশ্রূষাতে পূর্বাপেক্ষা কিছু কৃশ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) অভিমান বুঝি কেবল আপনিই করতে জানেন? কথা না কইলে আমি কথা কবো কেন?

নয়নতারা। বাপরে বাপ কি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! মেয়েমানুষ একদিন অভিমান করে থাকতে পারে, পুরুষের কি এত টং হয়ে থাকা ভাল?

হরেন্দ্র। আচ্ছা, একি ব্যবহার! আপনি এলেন, আসবার সময় একবার বলেও এলেন না।

নয়নতারা। আপনিও ত কিছু বললেন না। যাহোক, এসেছেন বেঁচেছি, আপনাকে দেখবার জন্যে হা করে পথ চেয়েছিলাম। (হাসিয়া) আপনি শেলির "মেঘের" ন্যায় বলিতে পারেন—I bring fresh shower for the thirsting flower—"এনেছি বরষা-ধারা পিয়াসু কুসুম তরে।"

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) ওটা উভয়ত।

নয়নতারা। যাহোক্ যখন এসেছেন, তখন আর শীঘ্র ছাড়ছি না।

হরেন্দ্র। মাকে অনেকদিন দেখিনি, একবার গিয়ে তাঁর চরণ দর্শন করতে হবে ও কিছু-দিন তাঁর কোলে থাকতে হবে।

নয়নতারা। সেটা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু বাবা যে দুচার দিনের মধ্যে ছাড়বেন এমন মনে হয় না।

হরেন্দ্র। হাঁ তাইত তাঁর কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি, তিনি কেমন আছেন?

নয়নতারা। এখানে এসে প্রথম প্রথম ভালই ছিলেন, আবার কিছুদিন হতে শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। বোধহয় কিছুদিন পরে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

হরেন্দ্র। জায়গাটি বেশ।

নয়নতারা। দেখছেন কেমন সুন্দর স্থান! এর কাছে একটা বড় বিলের মত আছে; সেখানে বোটানির অনেক স্পেসিমেন পাওয়া যায়। আমি একদিন গিয়ে কতকগুলো এনেছিলাম।

হরেন্দ্র। বটে! সেটা আমাকে দেখতে হবে। আপনি খুব বোটানি পড়ছেন, না?

নয়নতারা। হাঁ, এক আধটু পড়ছি বৈকি। অনেক দিনের পরে আপনাকে দেখলাম, নূতন খবর কিছু আছে না কি?

হরেন্দ্র। নূতন খবরের মধ্যে এম-এ পাস করে আমার প্রোমোশন হয়েছে; ও মাহিনা বেড়েছে।

নয়নতারা। বাঃ এ কথাত কেউ আমাকে লেখেনি। কত মাহিনা হয়েছে?

হরেন্দ্র। ৭৫ টাকা।

নয়নতারা। বাবা শুনলে খুব খুসী হবেন। তাঁকে বলছি।

হরেন্দ্র। না না থাক্, তাঁকে তাড়াতাড়ি বলবার দরকার কি?

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে গিয়া রায় মহাশয়ের ঘরে উপস্থিত। দেখিলেন, রায় মহাশয় তনয়-তনয়াকে আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়া তাহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিতেছেন। টাইগার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উৎসুক অন্তরে প্রতীক্ষা করিতেছে; যেন আদরের কিছু অংশ সে চায়। টাইগারের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে রায় মহাশয় বলিলেন, "কি রে টাইগার তুইও আমাকে দেখতে এসেছিস?" টাইগার লাঙ্গুল নাড়িয়া মনের আনন্দ জানাইল।

হরেন্দ্র রায় মহাশয়ের চরণে প্রণত হইয়া পদধূলি লইলেন।

নয়নতারা। বাবা এম-এ পাস করে ওঁর মাইনে বেড়ে ৭৫ টাকা হয়েছে।

রায় মহাশয় শুনিয়া অতিশয় আনন্দ করিতে লাগিলেন। তৎপরে নয়নতারা হরেন্দ্রকে আপনার গৃহস্থালির সমুদয় বন্দোবস্ত দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। টুনী ও পটলা পিতার আলিঙ্গন পাশ হইতে উন্মুক্ত হইয়া অর্ধ দণ্ডের মধ্যে বাড়ীখানির কোথায় কি আছে, সমুদয় দেখিয়া ফেলিল; শেষে প্রান্তরে দৌড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নতারা তাহাদিগকে কিছু আহার করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের সেদিকে দৃষ্টি নাই; তাহারা কোনও মতে নাকে-মুখে কিছু গুঁজিয়া, চড়ার পাশে লোকে মাছ ধরিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য ছুটিল। গাভী দুটির জন্য একটি বালক ভৃত্য আছে, নয়নতারা তাহাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন, সেও সঙ্গে ছুটিল।

টাইগারও বাড়ীখানি পর্যবেক্ষণ করিতে ছাড়ে নাই। সে গাভীদ্বয়ের গোয়ালে গিয়াছিল, সেখানে গাভীদ্বয় তাহাকে গুঁতাইতে আসিয়াছে, সে ডাকাডাকি করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে। তৎপরে সেও মনের সাধে ছেলেদের সঙ্গে দৌড়িতেছে।

এদিকে নয়নতারা হরেন্দ্রকে কিছু আহার করিতে দিয়া চুঁচড়া হইতে আনীত জিনিসপত্র-গুলি দেখিতে ও যথাস্থানে রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুটুলিগুলি খুলিতে গিয়া অপরাপর জিনিসের মধ্যে একটি কাগজের বাক্স পাওয়া গেল, খুলিয়া দেখেন তন্মধ্যে টুনীর খেলিবার পুতুল। দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন, "আর কিছু আসুক না আসুক, পুতুলগুলো এনেছে।"

হরেন্দ্র। (হাসিয়া) বললে কি হয়, ছেলে ফেলে কি মা কোথাও যেতে পারে?

নয়নতারা। সত্যি! পনর বছরের মেয়েটা হতে গেল আজও পুতুল খেলা গেল না।

হরেন্দ্র। আপনারাও বোধ হয় পনর-ষোল বছর পর্যন্ত পুতুল খেলেছেন, এখন মনে

নয়নতারা। (হাসিয়া) তা খেলেছি বৈ কি।

হরেন্দ্র। টুনীকে আমার বড় মিষ্টি লাগে।

নয়নতারা। ওরা এসে বেঁচেছি, দেখলেন না, ওদের দেখেই বাবার মুখটা কেমন আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। তারপর, ওরা বাবার কাছে থাকলে আমি পড়বার শোনবার, চিন্তা করবার অনেকটা সময় পাব। আপনি কি ভাল বলবামাত্র ওদের নিয়ে এলেন।

ওদিকে বেলা অবসান প্রায়; রায় মহাশয়ের আরাম-কুরসী পুষ্পোদ্যানে দেওয়া হইল; তিনি তথায় গিয়া বসিলেন। বসিয়া হরেন্দ্র ও নয়নতারার সহিত সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থাদি বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল।

ইহার পর হরেন্দ্র যে কয়দিন রহিলেন, রায় মহাশয়ের প্রণীত সংস্কৃত স্তুতিটির বাঙ্গালা অনুবাদটি আবৃত্তি করিবার ভার তাঁহার উপরে অর্পিত হইল। তদ্ভিন্ন বৈকালে তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া রায় মহাশয়কে শুনাইতেন, ততক্ষণ নয়নতারা অপরাপর কার্য দেখিতেন, কিংবা টুনী পটলাকে লইয়া খেলিতেন। কখন কখনও টুনী পটলাকে পিতার কাছে বসাইয়া তাহারা

উভয়ে বোটানির স্পেসিমেন সংগ্রহ করিতে যাইতেন, কখনও বা দুইজনে কথাতে মগ্ন হইয়া নদীর ধারে বেড়াইতেন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, জানিতে পারিতেন না।

যাহার যাহা স্বভাব কোথায় যায়! টুনী ও পটল এখানে আসিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই গাভীস্বয়ের রাখাল-বালকের সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র প্রাণি-বাটিকা প্রস্তুত করিল। রাখাল-বালক জলা হইতে হাঁসের বাচ্ছা, ডাকপাখীর বাচ্ছা, নদীর কূল হইতে গাঙ-শালিকের বাচ্ছা ধরিয়া আনে, আর টুনী পটল তাহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়। এজন্য তাহারা গোয়ালের পার্শ্বেই একটি ঘর বাঁধিয়া লইয়াছে। সেখানে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে অনেক সময় থাকে। একদিন নয়নতারা ভাবিলেন, "দেখি দেখি ওরা সর্বদা ওখানে কি করে"; গিয়া দেখেন, জানোয়ারে ঘরটি পূর্ণ করিয়াছে; পূর্বোক্ত বাচ্ছাগুলো ত আছেই, তদ্ভিন্ন একটি জলের গামলাতে কয়েকটি ছোট ছোট কচ্ছপ রাখিয়াছে। দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পিতার নিকট আসিয়া সমুদয় বর্ণন করিলেন। সকলে হাসিতে লাগিলেন।

যে কয়দিন হরেন্দ্র থাকিলেন, এইরূপ সুখে দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু রায় মহাশয়ের শরীরটা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে হরেন্দ্র বাড়ীতে গেলেন। রায় মহাশয় বলিয়া দিলেন, "ফেরবার সময় কয়েকদিন থেকে যেও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হরেন্দ্র চলিয়া গেলে রায় মহাশয়ের শরীরটা দিন দিন আরও খারাপ হইতে লাগিল। উদরের বেদনাটা ও তৎসঙ্গে জ্বরটা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। নয়নতারা বোট পাঠাইয়া দিয়া শান্তিপুর হইতে একজন ডাক্তার আনাইলেন। তিনি বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে পিতাকে লইয়া চুঁচড়াতে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। হরেন্দ্রকে পত্র লিখিলেন, "আপনি কতদিনে ফিরিবেন? বাবার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। আমরা চুঁচড়াতে ফিরে যাব বলে মনে করছি; যদি আপনি শীঘ্র আসেন, একসঙ্গে যাব, নতুবা আমি একাই বাবাকে নিয়ে ফিরে যাব।" হরেন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "আমি ১০।১২ দিন পরেই ফিরব, যদি শরীরটা বড় খারাপ হয়, আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না।" প্রত্যুত্তরে লেখা হইল, "আপনি এলেই যাওয়া হবে। যতশীঘ্র পারেন আসবেন।"

হরেন্দ্র কয়েকদিন বাড়ীতে জননীর কাছে থাকিয়া ও বাড়ীঘর মেরামতের বন্দোবস্ত করিয়া ৫।৭ দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন।

জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে দেশের অবস্থা কিরূপ হয় সকলেই জানেন। দিবাভাগে কিরূপ অগ্নি বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই দারুণ গ্রীষ্মে সেই মরুসম স্থানের মধ্যে বাস করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রায় মহাশয়ের জন্য দিনরাত্রি টানা পাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তথাপি গ্রীষ্মের উত্তাপজনিত ক্লেশ নিবারণ হয় না। শেষ রাত্রে যা একটু নিদ্রা হয়, তদ্ভিন্ন রাত্রির অধিকাংশ কাল অনিদ্রাতেই যায়।

হরেন্দ্র পেঁছিলেই নয়নতারা চুঁচড়া যাওয়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন। চুঁচড়াতে পত্র লেখা হইল। বোটের সঙ্গে যাইবার জন্য একখানি বড় নৌকা যোগাড় করা হইল।

এমন সময় হরেন্দ্রের আসার পরে তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এমন মেঘাড়ম্বর প্রায় দেখা যায় না। বোধ হইতে লাগিল, সেই অন্ধকারে সূচি ফুটাইলে বা বুঝি সূচি বিদ্ধ হয়। রাত্রি দশটা কি সাড়ে দশটার সময়, সবে নয়নতারা পিতার মশারিটি ফেলিয়া দিয়া নিজ শয়ন-মন্দিরে গিয়া টুনীকে সরাইয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় হু হু করিয়া ঝড় ডাকিয়া আসিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি, তেমনি বজ্রধ্বনি বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রতি সেকেণ্ডে এক একটি বাজ পড়িতেছে। নিমেষে নিমেষে বিজলী চমকিতেছে।

কেবল তুমি জানবে, আমার মৃত্যুর পূর্বে কারুকে বলবে না। আর একটা কথা, আমি মরবার পূর্বে নয়নতারা ও সদুর বিয়ে দিয়ে যেতে চাই। সুরেশ প্রভৃতির ইচ্ছে নয়, যে হরেন্দ্রের সঙ্গে নয়নতারার বিয়ে হয়, তা ত তুমি জান, তুমি সে বিষয়ে কি বল?

কনিষ্ঠ রায়। কেন তার দোষটা কি, সে রাঁধুনীর ছেলে, সেটা ত তার প্রশংসার বিষয়; অমন ছেলে কটা পাওয়া যায়? আমার খুব মত আছে।

রায় মহাশয়। আমি ত তাই বলি, ও আমার সন্তানের মত, ওকে আমি ভাল করে দেখেছি, যাহোক মাসে ৭৫ টাকা মাহিনা ত পায়, তারপর আমিও নয়নতারাকে কিছু দিয়ে যাব, তাও ত সে পাবে, তাতেই তাদের বেশ চলে যাবে। তারপর তার অবস্থা কি এমনি থাকবে? তুমি নয়নতারা ও সদুকে একবার বলে দেখ।

একদিন নয়নতারা বাগানে পিতার জন্যে ফুল তুলিতেছেন, এমন সময় কনিষ্ঠ রায় সেখানে উপস্থিত। বলিলেন, "নয়নতারা এদিকে একটু এস, এই বেঞ্চে আমার কাছে বসো, গোপনে একটু কথা আছে।

নয়নতারা গিয়া বেঞ্চে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "কি কথা?"

কনিষ্ঠ রায়। দাদাকে যে সাংঘাতিক রোগে ধরেছে, তাতে আর নিস্তার নেই, তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ?

নয়নতারার চক্ষে জল আসিল—"আমাকে আর এমন কথা কেন শোনাচ্চ কাকা? যতই ভুলে থাকি ততই ভাল।"

কনিষ্ঠ রায়। দাদার মনে একটা ইচ্ছে হয়েছে, তাই তোমার মত জানতে চাচ্চি।

নয়নতারা। কি ইচ্ছে হয়েছে বল, আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি তা পূর্ণ হয় আমরা করবো।

কনিষ্ঠ রায়। তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, যে মরবার আগে তোমার ও সদুর বিয়ে দিয়ে যান।

যেই এই কথা বলা, অমনি নয়নতারা দুই হাতে মুখ আবরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।— "কাকা! কাকা! তুমি কি কথা আমায় শোনালে, কি করে এ কঠিন কথা বললে? আমার বাবা মারা যান, আর আমি বিয়ে করে সংসার করতে যাব! যখন বাবার কাছে আমার দিন-রাত্রি থাকা উচিত, তখন পরের ঘরে যাব! যখন আমাদের আর কোনও চিন্তা থাকা উচিত নয়, তখন আমি আপনার সুখেরই চিন্তায় রত হব! তুমি পুরুষ বলেই এমন কথা বলতে পেরেছ, মেয়ে হলে পারতে না। আমার বাবা চলে যাচ্চেন, এমন বাবা চলে যাচ্চেন, আমি তাঁকে এখন কি ত্যাগ করে যাব!"

বলিতে বলিতে পিতৃব্যের কোলে মুখ লুকইয়া, "বাবা! বাবা!" করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ রায় আপনাকে ভয়ানক অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন; অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কি দুষ্কর্মই করা গিয়েছে, বাস্তবিক এমন সময়ে প্রস্তাবটা করা ভাল হয়নি।"

এ ব্যাপারটা এই উভয়ের মধ্যে গোপন রহিল। ইহার পরে কনিষ্ঠ রায়ের সৌদামিনীর নিকট প্রস্তাব করিবার উৎসাহটা কমিয়া গেল। কিন্তু কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তাহারও নিকট প্রস্তাব করিলেন। সৌদামিনীও অনুভব করিতে লাগিলেন, যে পীড়িত পিতাকে ফেলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না। অথচ সেই সঙ্গে শীঘ্র পরিণীত হইবার জন্য গোবিন্দের আগ্রহ অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, বাড়ীর লোকে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া শেষে তাঁহাকে এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে, বন্ধুবান্ধব প্রতিদিন অপেক্ষা করিতেছে, তিনি নূতন বাড়ী কিনিয়া উত্তমরূপে সাজাইয়াছেন, নূতন গাড়ী, ঘোড়া কিনিয়াছেন, সকলি প্রস্তুত কেবল গৃহিণী গেলেই হয়, এ সকল কথাও সৌদামিনীর মনে আসিল। তিনি কতক ইচ্ছা কতক অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "বাবা যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে যেমন তাঁর ইচ্ছে তাই হোক্।"

ইহার পরেই সৌদামিনীর বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। স্থির হইল যে বিবাহে পাঁচ

হাজার টাকা ব্যয় হইবে, তদ্ভিন্ন রায় মহাশয় যৌতুক স্বরূপ তাঁহার নামে এককালীন বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ও মাসিক এক শত টাকা পকেট খরচ দিবেন, তাহাতে অপর কাহারও হাত থাকিবে না।

বিবাহ পদ্ধতি কিরূপ হইবে? সে বিষয়ে রায় মহাশয় স্থির করিলেন, যে তিনি নিজে প্রাচীন ও নব্য পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক একটি পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাঁহার প্রিয় বন্ধু মহেন্দ্রনাথ সেই পদ্ধতি অনুসারে পৌরোহিত্য কার্য সমাধা করিবেন। গোবিন তাহাতেই সম্মত হইলেন। রায় মহাশয় এত অসুস্থতার মধ্যেও দুই তিনদিন মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে বসিয়া একটি পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই পদ্ধতি অনুসারে আগষ্ট মাসের ১২ই সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে সুরেশ কন্যাকর্তার কাজ করিলেন। বিবাহোৎসবে অধিক লোক নিমন্ত্রণ করা হইল না। তবুও নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বড় কম হইল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকল দলের সহিত রায় মহাশয়ের আত্মীয়তা, সুতরাং সকল দলের বন্ধুগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সকলে আনন্দের সহিত সভাস্থ হইয়া বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। রায় মহাশয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনার্থ সভাস্থলে যাইতে পারিলেন না, কিন্তু চাকরের স্কন্ধে ভর করিয়া নীচের বৈঠক ঘরে গিয়া বসিলেন; বন্ধুবান্ধব সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন।

এই যে দুই ঘণ্টাকাল সেখানে ছিলেন, তাহাই বোধ হয় তাঁহার পীড়াকে সংকটে উপনীত করিল; কারণ সৌদামিনীর বিবাহের পরেই তিনি উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়া পড়িলেন; পীড়ার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে প্রচার হইল যে, কালীপদ রায়ের অন্তিম কাল উপস্থিত। এই সংবাদ প্রচার হওয়াতে চুঁচড়া সহরে মানুষের মনে যে ম্লানতা উপস্থিত হইল, তাহার বর্ণনা হয় না। যাহারা তাঁহার মুখ কখনও দেখে নাই, কেবল দূর হইতে তাঁহার গুণাবলীর কথা শুনিয়া আসিতেছিল, তাহারা সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। দোকানি, পশারি, রাস্তার লোক পরস্পর দেখা হইলে বলাবলি করিতে লাগিল,—"যাঃ এতদিনে চুঁচড়া সহর নিয়ে যায়, একটা মানুষের মত মানুষ চলিল।" প্রাতে ও সন্ধ্যাতে লোকে রায় মহাশয় যেমন আছেন, এই সংবাদ লইতে লাগিল। ওদিকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মহলে ঘোর ব্যস্ততা পড়িয়া গেল। গোবিন ও সৌদামিনী চুঁচড়াতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বাড়িশার বাড়ী হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ও বাড়ীর প্রাচীন মহিলারা কয়েকজন আসিয়া একদিন সমস্ত দিন থাকিয়া গেলেন। এস, পি, রায় ও তাঁহার পত্নী আসিয়া একদিন থাকিয়া গেলেন।

এদিকে রায় পরিবারের অবস্থা বর্ণনাতীত। সকলের মুখ বিষণ্ন। কর্ত্রীঠাকুরাণী একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। কয়েক দিন হইতে তিনি আর কর্তার পার্শ্ব ছাড়িতেছেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ চাপিয়া কাঁদিতেছেন, আর নয়নতারা ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছেন,—"ছি মা, বাবাকে অস্থির করো না, রোগ বেড়ে যাবে।" কর্তা নিজে কিছুমাত্র অস্থির হইতেছেন না। ধীরভাবে গৃহিণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন, "আর কেন কাঁদ? ঈশ্বরকে কেন ধন্যবাদ কর না, এতকাল দুজনে পরমসুখে বাস করেছি, ছেলেসন্তান সব মানুষ করে তুলেছি, এখন তোমার ভার ওদের উপরে দিয়ে যেতে পারছি। দুজনে একসঙ্গে যেতে পারলেই ভাল হত, কিন্তু কি করবে, এসব ত মানবের হাত নয়। ছি কেঁদ না, যে কয়টা দিন আছি, আমার কাছে বসে কেবল ঈশ্বরের নাম কর। তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দেও।" গৃহিণী বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না,—একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছেন। নয়নতারা পিতার ঘরের পার্শ্বেই মাতার জন্য একখানি বড় খাট দিয়াছেন, সেই খাটে তিনি মায়ের সঙ্গে শয়ন করিয়া থাকেন। এখন দিন-রাত্রি রোগীর নিকট একজন না একজন থাকা আবশ্যক হইতেছে। তদনুসারে দিনের বেলা গৃহিণী, পটল ও নন্দরাণী থাকেন, রাত্রে সুরেশ-

চন্দ্র, গোবিন, সৌদামিনী, হরেন্দ্র, অবিনাশ ও নয়নতারা জাগেন, এইরূপ নিয়ম হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত নয়নতারা ও সুরেশ পিতার নিকটে থাকেন, তৎপরে গোবিন ও সৌদামিনী তাঁহার স্থান অধিকার করেন, নয়নতারা গিয়া পার্শ্বের ঘরে মাতার নিকটে শয়ন করেন, গোবিন, সৌদামিনী রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বসিয়া থাকেন, তৎপরে হরেন্দ্রকে জাগাইয়া দিয়া তাঁহারা শয়ন করিতে যান। হরেন্দ্র সন্ধ্যার পরে আসিয়াই পটলের ঘরে একখানি খাটে শুইয়া থাকেন। হরেন্দ্র রাত্রি ৩টার সময়ে নয়নতারা ও অবিনাশকে ডাকিয়া দিয়া নিজে শয়ন করিতে যান। এইরূপ শুশ্রূষা চলিয়াছে।

সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ভাল ভাল ডাক্তার দেখাইতে আর বাকি রহিল না। চিকিৎসাতে যাহা হয়, শুশ্রূষাতে যাহা হয়, সকলি হইল, কিছুতেই কুলাইল না। অক্টোবর মাসের ১লা ডাক্তারেরা বলিলেন, আর দুই একদিন। সেই দিনই কলিকাতার ছোট কর্তার বাড়ীতে ও চুঁচড়ার অপর বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া হইল। কেহ কেহ সেই রাত্রে ও অপরেরা তৎপর দিন প্রাতে আসিলেন। কিন্তু সেই প্রাতেই প্রাণবায়ু রায় মহাশয়ের দেহকে পরিত্যাগ করিল। সে মৃত্যু শয্যার দৃশ্য কি বর্ণন করিব। তিন পরিবারের লোকের আর্তনাদে গগন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্রনাথ মুমূর্ষু সাধু পুরুষের মস্তকের নিকট মুদিত নেত্রে বসিয়া আছেন; দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে; আর কেবল বলিতেছেন,—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" গৃহিণী ঠাকুরাণী আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর ন্যায় মুমূর্ষু পতির বক্ষঃস্থলে মাথা দিয়া পড়িতেছেন ও চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"ওগো আমায় একলা ফেলে কোথা যাওগো; ওগো একদিনও তোমা ছাড়া থাকিনি গো।" নয়নতারা তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন,—"মাগো মা, ওমা বাবাকে শান্তিতে যেতে দেও, ওমা মহেন্দ্রবাবু ভগবানের নাম করছেন, বাবাকে ঈশ্বরের নাম শুনতে দেও।" মহেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে গুণ গুণ স্বরে একটি গান করিতেছিলেন, নয়নতারা এই কথা বলতে গানটি উচ্চৈস্বরে ধরিলেন, তাহার প্রথম পদটি এই—

"ওহে ভবের নাবিক একবার দাঁড়াও এসে ভব-নদীর কূলে;" তিনি যখন গান ধরিলেন, তখন ক্রন্দনের রোল কিয়ৎক্ষণের জন্য থামিল, কিন্তু সে কতক্ষণ! প্রথম পদটি দুইবার না গাইতে গাইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী নয়নতারার হাত ছাড়াইয়া আবার আসিয়া পতির বক্ষের উপরে পড়িলেন। সেই গোলমালে মহেন্দ্রনাথের গান থামিয়া গেল। চুঁচড়ার অপর বাড়ীর বন্ধুদের একজন বলিলেন,—"ওগো এমন সাধু পুরুষ আর হয় না, ওগো ওঁকে গঙ্গাতে নিয়ে চল," আর একজন বলিলেন,—"আহা এই ত গঙ্গাতীরে স্বর্গারোহণ হচ্চে।"

ওদিকে চুঁচড়া সহরের যত বড় বড় লোক সকলে নীচের বৈঠক ঘরে সমবেত। সেখানে তারাপদবাবু, গৌরীপদবাবু, সুরেশ প্রভৃতি নিঃস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। সমাগত ভদ্রলোকেরা এক একজন এক একবার রায় মহাশয়ের এক একটি গুণের কথা বলিতেছেন। এমন সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত, সুরেশচন্দ্র উঠিয়া তাঁহাকে সমুদয় সংবাদ দিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বন্ধুকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উপরে লইয়া গেলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে দেখিয়াই গৃহিণী আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ওগো যাঁকে তুমি এত ভালবাসতে সেই বিদ্যেরত্ন মশাই এসেছেন গো, চেয়ে দেখ, একবার কথা কও গো!" বিদ্যারত্ন মহাশয় দাঁড়াইতে পারিলেন না, বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। এইরূপে চুঁচড়ার কালীপদ রায় চলিয়া গেলেন। চুঁচড়া সহরের অর্ধেক লোক তাঁহার শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে গেল।

রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন, নয়নতারার মস্তকে যেন গুরুতর বোঝা পড়িয়া গেল। তিনি জননীকে লইয়া পড়িলেন। পরিবারস্থ সকলে দুই একদিনের মধ্যে সামলাইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি আর সামলাইতে পারিলেন না। নয়নতারা কাঁদিবেন কি, ভাবিবেন কি, মাতাকে লইয়াই বিব্রত। সর্বদা ছায়ার ন্যায় জননীর সঙ্গে সঙ্গে আছেন; স্নান করাইতেছেন; খাওয়াইতেছেন;

রাত্রে আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া থাকিতেছেন।

রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পরদিন হইতেই পরিবার মধ্যে কথাবার্তা চলিল, কিরূপে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। সুরেশ যোগেশ বলিলেন, "শ্রাদ্ধ আবার কি? একটা প্রাচীন কুসংস্কার রক্ষা করা কেন?" তাঁহাদের ভাবে বোধ হইল, তাঁহারা সেরূপ কিছু করিতে ইচ্ছুক নন। ইহাতে জননী ও নয়নতারা মনে বড় ক্লেশ পাইলেন। অবশেষে পিতৃব্যের পরামর্শে স্থির হইল, যে দেশীয় রীতির অনুসারে কন্যাগণ চতুর্থ দিবসে ঈশ্বরোপাসনাপূর্বক পিতার স্মরণার্থ দানধ্যান করিবেন। দশাহের পর পুত্রেরা কিছু করিবেন কিনা, তাহা পরে স্থির হইবে।

তদনুসারে চতুর্থ দিবসে মহেন্দ্রনাথ প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা করিলেন; এবং কন্যারা চারি দিকের দীন-দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে নানারূপে প্রায় সহস্রাধিক টাকা দান করিলেন। পিতা সংস্কৃত বিদ্যার অনুরাগী লোক ছিলেন, সেজন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হাত দিয়া নয়নতারা সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রায় সহস্রাধিক টাকা বিতরণ করিলেন। তিনি সে দিন সমস্ত দিন পিতার শূন্য শয়ন-মন্দিরে, তাঁহার শূন্য শয্যার পার্শ্বে, তাঁহার প্রতিকৃতি সম্মুখে বসিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ঈশ্বর-চিন্তাতে কাটাইলেন।

অগ্রেই বলা হইয়াছে, ৬ই অক্টোবর নয়নতারার জন্মদিন। সে কথা এ শোকের সময় কাহারও মনে নাই। কিন্তু নয়নতারার মনে আছে। সেদিন প্রাতে উঠিয়া তিনি জননীকে তুলিয়া, মুখ হাত ধোয়াইয়া, তাঁহার পরিচর্যার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, নিজ ঘরে গিয়া দ্বার দিলেন। অনেকক্ষণ গেল তাঁহার আর দেখা নাই;—বেলা বাড়িল, তিনি আর দ্বার খোলেন না। অবশেষে নন্দরাণী আস্তে আস্তে পার্শ্বের দ্বারের খড়খড়ি তুলিয়া দেখেন, তিনি নি[illegible] শয্যার উপরে পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া, "বাবা বাবা!" করিয়া ভয়ানক কাঁদিতেছেন। তি[illegible] আর ডাকিতে সাহস করিলেন না। এই কথা কেমন করিয়া জননী শুনিতে পাইলেন; অম[illegible] মনে পড়িয়া গেল, যে সেদিন নয়নতারার জন্মদিন; অমনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলে[illegible] "ওগো নয়নতারার জন্মদিনে তুমি কোথায় রৈলে গো, এসে আশীর্বাদ কর গো।" মাতার ক্রন্দ[illegible] ধ্বনি শুনিবামাত্র নয়নতারা উঠিয়া চক্ষু মুছিয়া, বাহিরে আসিলেন ও জননীকে ধরি[illegible] তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। "ছি মা কেঁদ না, আমার জন্মদিনে অমঙ্গল করো না, আ[illegible] বাবা নাই, তুমি ত আছ, তুমি পদধূলি দেও, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।" এই বলিয়া মাত[illegible] পদধূলি লইয়া নিজ মস্তকে দিলেন। "আমার জন্মদিনে অমঙ্গল করো না," এই কথাটা কত্র[illegible] ঠাকুরাণীর মনে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন ও নয়নতারার মস্তক নি[illegible] বক্ষে লইয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। মাতা-কন্যার ভালবাসার উচ্ছ্বাসে শোকটা এক[illegible] শান্ত ভাব ধারণ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

রায় মহাশয় চলিয়া যাওয়ার দিন হইতে নয়নতারা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার যে[illegible] মন হইতে এক প্রবল শক্তি অন্তর্হিত হইল; তিনি বাস্তবিক অশরণ হইলেন। ভ্রাতৃগণের অ[illegible] গতি অন্যরূপ, তাঁহাদের প্রতি নির্ভর করিবার উপায় নাই; জননী নামে অভিভাবিকা, কি[illegible] তাঁহার আশ্রয় দিবার শক্তি নাই। তিনি নিজে কি আর সেই সংসারটা শাসনাধীন রা[illegible] চালাইতে পারিবেন? আর কি সকলে তাঁহাকে মানিয়া চলিবে? পিতার বলে তাঁহার বল, [illegible] এখন তাঁহার কি বল রহিল? দারুণ শোকের মধ্যে এসকল চিন্তাও তাঁহার মনে আসি[illegible] লাগিল।

শোকের মুহূর্তে সংকল্প করিলেন, যে পিতার স্মৃতিকে পরিবার মধ্যে জাগরূক রাখি[illegible] পিতার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী প্রাণপণে রক্ষা করিবেন। তাহার এক নিয়ম প্রাতে উঠিয়া সর্বা[illegible] ভগবানের নাম করা। এটাকে তিনি দৃঢ়ভাবে ধরিলেন। প্রতিদিন প্রাতে পিতার শয়ন[illegible]

ন্যে খাটের চারিধারে সকলে সম্মিলিত হইয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এ নিয়মটা ছিল; তিনি নিজে ভক্তিসঙ্গীত করিয়া ও শোকের বিনোদনের উপযোগী গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া জননীকে শুনাইতে লাগিলেন।

এক প্রকার স্থিরই ছিল যে রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে পুত্রেরা কিছু করিবেন না; কিন্তু পিতৃব্য মহাশয় আসিয়া তাহাদিগকে অনেক তিরস্কার করিয়া বলিলেন;—"তোরা কিরূপ পাষণ্ড। তাঁর ধনগুলো নিবি তাঁর স্মরণার্থ কিছু করবি না? শ্রাদ্ধ করাতে দোষ কি? আর ব্যাপারটাই বা বেশি কি? মেজদা ঈশ্বরের নাম শুনতে ভালবাসতেন; মহেন্দ্রবাবু তাঁর প্রিয় বন্ধু, তিনি একটু ঈশ্বরোপাসনা করবেন, তারপর কিছু দান-ধ্যান করা যাবে।" পিতৃব্যের তিরস্কারে এটাও স্থির হইয়া গেল। দশাহের পর, রায় মহাশয়ের সমুদয় বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। আবার নানা প্রকারে প্রায় তিন চারি হাজার টাকা দান হইল।

শ্রাদ্ধের দিন সন্ধ্যার পর নয়নতারা ভ্রাতৃগণের সমক্ষে পিতৃব্যের হস্তে পিতার উইলখানি অর্পণ করিলেন। সেখানির কথা পিতৃব্য জানিতেন, কিন্তু পরিবারের অপর কেহ জানিতেন না; পিতা নয়নতারাকে রাখিতে দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর তোমার ভাইদের ও তোমার কাকাকে একত্র করে তদের হাতে দিও। আর কাহাকেও একথা বলো না।"

উইলে লিখিত অপরাপর বিষয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্থূলে স্থূলে কয়টি উল্লেখযোগ্য; প্রথম—বাড়ীখানি গৃহিণী ও অবিবাহিতা কন্যাদিগের ব্যবহারার্থে দিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের দেহান্ত হইলে পুত্রেরা সমান ভাগে পাইবেন; দ্বিতীয়—নয়নতারাকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা ও মাসিক বৃত্তি দেড় শত টাকা দিয়া গিয়াছেন; তিনি বিবাহের পরেও তাহা পাইবেন; তৃতীয়—টুনী ও পটলের অভিভাবকতার ভার কনিষ্ঠ সহোদর ও নয়নতারার হস্তে দিয়া গিয়াছেন। পটল ও টুনীর মাসিক বৃত্তি এক একশত টাকা ও পটলের প্রাপ্য টাকার সুদের দরুণ টাকা নয়নতারার হস্তে দেওয়া হইবে; তিনি তাহা তাহাদের শিক্ষার জন্যে স্বচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন; টুনীর একশত টাকা বৃত্তি সে বিবাহের পরেও পাইবে; তদ্ভিন্ন এককালীন বিশ হাজার টাকা পাইবে। পটলের প্রাপ্য টাকা বাদে শিক্ষা ও বিলাতযাত্রা প্রভৃতির ব্যয়ের জন্য পঁচিশ হাজর টাকা কনিষ্ঠ সহোদর ও নয়নতারার হস্তে থাকিবে; চতুর্থ—গৃহিণীকে এককালীন পঁচিশ হাজার ও মাসিক বৃত্তি আড়াই শত টাকা, এবং গাড়ী, ঘোড়া, আসবাব সমুদায় দিয়া গিয়াছেন; পঞ্চম—চারি পুত্রকে দুই লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন; তদ্ভিন্ন নানা সৎকার্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা, মহেন্দ্রনাথকে পাঁচ হাজার ও বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। পত্নী ও দুহিতাদিগের মাসিক বৃত্তির জন্য ন্যস্ত টাকা তাঁহাদের দেহান্তে দেশ মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রদত্ত হইবে। তিন জন, কনিষ্ঠ সহোদর ও নয়নতারা উইলের এক্সিকিউটার।

তারাপদ রায় মহাশয় কয়েক দিনের মধ্যেই উইলখানি আদালতে উপস্থিত করিয়া প্রোবেট লইলেন ও তদনুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরেশ ও যোগেশের প্রাপ্য টাকা তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। অপরদিগের টাকায় তাঁহাদের নামে কাগজ কিনিয়া দিলেন। পটল ও টুনীর টাকা তাঁহার নিকটেই রহিল।

পিতার উইলটা পুত্রদিগের মনঃপূত হইল কি না বুঝিতে পারা গেল না। তাঁহারা কেহ কিছু বলিলেন না, বরং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে বেশ ব্যবস্থা হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুর পর এক মাস হইতে না হইতেই নয়নতারার আশঙ্কা কাজে ফলিতে লাগিল। তিনি পিতার আদেশানুসারে যে প্রাতে ভগবানের নাম করিয়া দিনের কাজ আরম্ভ করার নিয়ম করিয়াছিলেন, ক্রমে সুরেশ ও যোগেশ সেখানে আসা বন্ধ করিলেন। কেবল তাহা নহে, সুরেশ নয়নতারাকে উঠিতে বসিতে— 'Our Holy High Priestess; Our

Mother Superior" প্রভৃতি সম্ভাষণ দ্বারা তামাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে নন্দরাণী প্রাতে আসা পরিত্যাগ করিলেন। পটলও অনুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু নয়নতারা তাহাকে তিন ধমকে ঠিক করিয়া লইলেন।

ইহা লইয়া ভ্রাতা ভগিনীতে একদিন অনেক বকাবকি হইল।

নয়নতারা। দাদা! তোমার একি ব্যবহার, বাবা একটি নিয়ম করে গিয়েছেন, নিয়ম রাখতে বলে গিয়েছেন, সেই অনুসারে আমরা সকলে একটু ভগবানের নাম করি, তোমার ভাল না লাগে তুমি যাবে না, তুমি ঠাট্টা তামাসা করে অন্যকে বাঁকাও কেন?

সুরেশ। একটু ঠাট্টা সইতে পারিস্‌নে, তবে আবার কি ধর্ম করবি? সেকালকার মার্টারেরা প্রাণটা দিত তা জানিস্‌?

নয়নতারা। আমরা ত বয়ে গিয়েছি, আর ছেলেগুলোকে বয়াও কেন?

সুরেশ। তোমরা ত বয়ে গিয়েছ বলু—"আমরা ত" বলিস্‌ কেন? তুই ত আমাদের দলে নয়; তুই ত মহাধার্মিক।

নয়নতারা। (বিরক্তভাবে) তোমাদের সঙ্গে ত কেউ পারবে না। তোমাদের যা ভাল বোধহয় করো।

এই বকাবকির পর নয়নতারাকে বিরক্ত করিবার মানসেই হউক, অথবা যোগেশ ও যোগেশের বন্ধুদের কুসঙ্গের দোষেই হউক, সুরেশ তাঁহার চিরদিনের অবলম্বিত সংযত ভাব শিথিল করিয়া প্রায় প্রতিদিন সুরাপান আরম্ভ করিলেন, এবং এক একদিন তাহা অতিরিক্ত মাত্রাতে যাইতে লাগিল। তবু তিনি বরং কোনও দিন ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেন না; কিন্তু যোগেশ এক একদিন ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। যোগেশ চুঁচুড়ার বাড়ীতে আসিলে নীচের ঘরেই থাকেন, সুতরাং যাহা কিছু করেন, নয়নতারা দেখিতে পান না, কারণ তাঁহাকে উপরে জননীর নিকট সর্বদাই থাকিতে হয়, কেবল নন্দরাণীর নিকট সংবাদ পান এইমাত্র।

একদিন যোগেশ নেশার ঝোঁকে নন্দরাণীকে অভদ্রভাবে ধরিলেন। নন্দরাণী অতিকষ্টে তাঁহার হস্ত হইতে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় পতির নিকটে গিয়া অভিযোগ করিলেন। সুরেশ সে কথা কানেই লইলেন না।

বরং বলিলেন, "জড়িয়ে ধরেছে ত হয়েছে কি, আমার ভাইয়েরা ত চিরদিন বোনের মত দেখে, ভালবাসে, জড়ায়, আদর করে, নূতন কথাটা কি?"

নন্দরাণী। না, তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি দেখলে বুঝতে পারতে ভালভাবে কখনই ধরেনি।

সুরেশ। যাও, যাও, তোমার মন খারাপ, আমার ভাইএরা কখনই এত অসৎ নয়, যে আপনার বাড়ীতে আপনার লোকের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করতে যাবে।

নন্দরাণী। তুমি বললে বুঝবে না, আমি কিন্তু ঠাকুরপোর কাছে আর বার হবো না।

সুরেশ। যাও গোঁড়াদের দলে গিয়ে নাম লেখাও। আমাদের মধ্যে একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটবে দেখছি।

নন্দরাণী স্বীয় পতিকে বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া নয়নতারাকে বলিয়া দিলেন। যোগেশের সহিত নয়নতারার চিরদিনই একটু বিশেষ নৈকট্য। যোগেশের প্রধান গুণ এই তিনি ভগিনীর নিকট কিছুই গোপন করেন না, এবং যথার্থই অনুতপ্ত হন ও আপনাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মানুষটা বড় দুর্বল, কুসঙ্গে পড়িলে আর আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না। নয়নতারা নন্দরাণীর মুখে সে দিনকার বিবরণ শুনিয়া, নির্জনে যোগেশকে অনেক তিরস্কার করিলেন; যোগেশ মুক্তকণ্ঠে আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া, গোপনে নন্দরাণীর হাত ধরিয়া মাপ চাহিলেন। বিবাদের কারণটা থামিয়া গেল।

কিন্তু এই ঘটনার পরে দিন-দিন কলিকাতা হইতে যোগেশের অনেক অখ্যাতি শোনা যাইতে লাগেল। একবার শোনা গেল, তিনি কুসংগে পড়িয়া জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার শোনা গেল, যে যেখানে সেখানে নিমন্ত্রণে গিয়া মাতলামি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল সংবাদে নয়নতারার মন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। জননীকে গোপনে বলিলেন, "মা! সর্বনাশের দিন বুঝি নিকটে এল, মেজদা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, আমরা ত সামলাতে পারবো না।"

আর একদিকে আর এক পরিবর্তন উপস্থিত। হরেন্দ্রের এ বাড়ীতে কতদূর অধিকার, তাঁহাকে সকলে কিরূপ আপনার লোক মনে করেন, তাহার পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। তাঁহার বেতন বৃদ্ধির পর টুনী পটলের পড়ান ছাড়িয়াছেন; তথাপি প্রত্যহ একবার এ বাড়ীতে না আসিলেই নয়। কিন্তু রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর হইতেই সুরেশের ভাবে হরেন্দ্র অনুভব করিতে লাগিলেন যে, সে ভবনে তাঁর অতিরিক্ত গতিবিধি সুরেশ পছন্দ করেন না। হরেন্দ্র অভিমানী মানুষ, এই ভাবটা মনে আসাতে মনে মনে এইটা কয়েকদিন তোলা-পাড়া করিতে লাগিলেন। একদিন নয়নতারাকে জিজ্ঞসা করিলেন,—"সুরেশবাবুর ভাব দেখে বোধহয়, আমার এখানে আসা যাওয়া যেন পছন্দ করেন না, আপনার কি বোধহয়?" নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন—"জানেনই ত দাদা আপনাদের পছন্দ করেন না; আপনার আসা সম্বন্ধে যে কোনও আপত্তি আছে, তা মনে হয় না।"

যাহা হউক অল্প দিনের মধ্যে নয়নতারাও বুঝিতে বাকি রহিল না, যে সে ভবনে হরেন্দ্রের পূর্বের অধিকার আর থাকিবে না। হরেন্দ্রকে আসিতে দেখিলেই সুরেশ কি একপ্রকার বিরাগ-সূচক দৃষ্টিতে চাহিতেন, যাহার অর্থ বুঝিতে হরেন্দ্রের বাকি থাকিত না। একদিন সুরেশ কালেজ হইতে আসিয়া দেখিলেন, হরেন্দ্র ও নন্দরাণী বারাণ্ডাতে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন, ও মহা হাসাহাসি হইতেছে। সেদিন নন্দরাণী ঘরে গেলে, তাঁহাকে বকিলেন,—"পথে ঘাটে দাঁড়িয়ে যার তার সংগে গলাগলি হাসাহাসি করতে লজ্জা করে না?"

নন্দরাণী। (বিরক্তভাবে) যার তার সঙ্গে গলাগলি হাসাহাসি কি রকম? হরেনবাবু কি আমাদের পর?

সুরেশ। পর নয় ত কি? আপনার লোকটা কিসে? ছেলেদের মাষ্টার বৈ ত নয়?

নন্দরাণী মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন; কারণ হরেন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। কিন্তু বুঝিলেন যে, তাঁহার সহিত পূর্বের ন্যায় আত্মীয়ভাবে মিশিলে পতি বিরক্ত হইবেন, সুতরাং তদবধি একটু দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আর একদিন সুরেশ দেখিলেন, টুনী হরেন্দ্রের গলা ধরিয়া ঝুলিতেছে। ইহা দেখিয়া পছন্দ করিলেন না। সময়ান্তরে টুনীকে বকিলেন;—"বোকা মেয়ে দাদার গলা ধরে ঝুলিস্ বলে কি যার তার গলা ধরে ঝুলবি? হরেনের গলা ধরে কেন ঝুলছিলি? তোর এত বয়স হলো, বুদ্ধিশুদ্ধি হবে কবে?"

তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া টুনী ভয়ে কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে বলিল—"বাঃ হরেনদাদাও ত দাদা।" কিন্তু তদবধি হরেন্দ্রের কাছে যাইতে তাহারও সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। সকলেই বোধহয় মনে মনে ভাবিতেছেন, সুরেশ একাজটা ভাল করিলেন না। টুনীর মনে ভেদ বুদ্ধিটা আনিয়া দেওয়া ভাল হইল না। সে সরলা বালিকা, সে কিছুই জানিত না, তাহার সরল পবিত্র শিশুবৎ ব্যবহারে হরেন্দ্রের প্রাণে যে সুখটুকু হইত, তাহাতেও তাহাকে বঞ্চিত করা উচিত হইল না। তাহা আর বলিলে কি হইবে, যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। ক্রমে সকল কথা নয়নতারার কর্ণগোচর হইল। তিনি চিন্তিত হইতে লাগিলেন—"না জানি শেষে কিরূপ দাঁড়ায়।" হরেন্দ্রও নন্দরাণী ও টুনীর ব্যবহারে পরিবর্তন দেখিয়া চিন্তিত হইলেন।

একদিন নয়নতারার সমক্ষে জননীর সান্নিধানে সুরেশ আপনার মনের হলাহল উদ্গীরণ

করিলেন। "যে সে বাড়ীর মধ্যে আসবে, সময় নেই অসময় নেই মেয়েদের ঘরে যাবে, যারা আত্মীয়তা করতে চায় না, তাদের ঘাড়ে আত্মীয়তা চাপাবে, এটা ত ভাল নয়; এটা আমি পছন্দ করি না। যাদের সংগে বন্ধুতা আছে, যারা তাকে চায়, না হয় তাদের ঘরে যাক্ অন্যের ঘরে উঁকি মারে কেন?"

নয়নতারা বুঝিতে পারিলেন যে, হরেন্দ্র যে নন্দরাণীর ঘরে যান, তাহা সুরেশচন্দ্রের অভিপ্রেত নহে। তৎপরদিন হরেন্দ্র আসিলে তিনি বলিলেন—"আপনি এসে যদি দেখেন যে, আমি ঘরে নেই, বসে অপেক্ষা করবেন, বৌ-এর ঘরে যাবার প্রয়োজন নেই।"

হরেন্দ্র। ভিতরের কথাটা আমাকে বলুন না; আপনাদের বৌ আর আমার কাছে আসেন না, টুনী আমাকে দেখলে পালায়, তারপর আমাকে বৌ-এর ঘরে যেতে বারণ করছেন, ব্যাপারটা কি?

নয়নতারা। সব কথা এখন বলবো না, পরে জানতে পারবেন, এখন আমি যা বললাম, সেই রকম কাজ করবেন।

অভিমানী মানুষকে লইয়া কারবার করাই কঠিন। হরেন্দ্র এই বিষয়টি মনে মনে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া মস্ত একটা ব্যাপার করিতে লাগিলেন। টুনী পটলের পড়ান ছাড়িয়া দিয়াও প্রত্যহ বৈকালে নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; ইহার পর দুই একদিন অন্তর আসিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে নয়নতারা জ্যেষ্ঠের প্রতি চটিয়া রহিলেন।

ক্রমেই শ্রাদ্ধ গড়াইতে লাগিল। যোগেশ আপনার নব্য ব্যারিষ্টার বন্ধুদিগকে দুই একটি করিয়া বাড়ীতে আনিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্রে এই নিয়ম ছিল যে আহারান্তে সুরেশচন্দ্র নব্য অতিথিদিগকে নিজ ঘরে লইয়া অল্প মাত্রায় সুরাপান করিতে দিতেন, কিন্তু এখন হইতে তাহাদিগকে সুরাপান করাইয়া আহারের স্থানে আনিতে লাগিলেন। একদিন আহার করিতে বসিয়া একজনের ঘাড় ভাঙিগয়া মাথা ঝুলিয়া পড়িল; তিনি আর আহার করিতে পারিলেন না; আর একদিন একজন টুনীর পাশে বসিয়া তার সংগে এমনি ইয়ারকি দিবার উপক্রম করিলেন যে, নয়নতারা ইসারা করিয়া টুনীকে নিজের নিকট তুলিয়া লইলেন। এই সকল ব্যবহারে তিনি এমনি চটিয়া গেলেন, যে বিলাতফেরত অতিথি কেহ আসিলে, আহারের স্থানে আসা অথবা টুনী পটলকে আসিতে দেওয়া বন্ধ করিলেন। এজন্য ভাই-ভগিনীতে একদিন তুমুল ঝগড়া হইল।

ইহার পরে বিলাতফেরত অতিথিদের যাতায়াত ঘন ঘন আরম্ভ হইল।

এক শনিবার নন্দরাণী বৈঠক ঘর হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া আসিলেন, আসিয়া নয়নতারাকে বলিলেন, "ও ঠাকুরঝি! ছি ছি! কি কদাকার! কি কদাকার। কি মাতলামিই করছে, তোমাকে কি বলবো; উনি বোঝেন না, আমি ত আর বৈঠকঘরে যাব না।" নয়নতারা রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন। ক্রমে নীচের ঘর হইতে নানাপ্রকার ধ্বনি আসিতে লাগিল। নয়নতারা জননীকে বলিলেন—"মা, বুঝি বা বাড়ী ছেড়ে পালাতে হয়।"

তৎপরদিন অতিথিরা চলিয়া গেলে, তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে মনের ঝাল ঝাড়িলেন,—"দাদা! তোমাদের কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছি, বাড়ীটি কি শুঁড়ীর দোকান না ভাঁটি খানা, যে কতকগুলি অসভ্য অভদ্র লোক জুটিয়ে গোলমাল করবে।

সুরেশ। নীচের ঘরে কে কি করে, তাতে তোরা কাণ দিস্ কেন?

নয়নতারা। বাবাই যেন চলে গিয়েছেন, মা ত এখনও আছেন, আমরা ত আছি, তোমাদের লজ্জা করে না, তোমাদের মা বোন যে বাড়ীতে আছে, সেখানে এরকম বাঁদরামি করবার জন্যে লোক ডেকে আন!

নয়নতারা জীবনে বোধহয় এত ক্রোধ কখনও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ক্রোধ দর্শনে সুরেশও ক্রুদ্ধ হইলেন।

সুরেশ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) That spiritual pride will ruin you,—অর্থ—এই অহংকারেই তুই গোল্লায় যাবি।

নয়নতারা। অহংকারের কথাটা কি হলো?

সুরেশ। (ক্রোধ-কর্কশ স্বরে) How do you dare use such expressions against a number of gentlemen!—কতকগুলি ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এমন ভাষা ব্যবহার করিস্।

নয়নতারা। gentlemen! gentlemen শব্দের অপমান! এরা যদি gentlemen হয়, তবে অসভ্য বর্বর কে?

সুরেশ। (ক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়া) shut up, I say! You are forgetting manners! you should teach yourself to speak more respectfully of other people—আমি বলছি চুপ কর, তুই ভদ্র রীতি নীতি ভুলে যাচ্ছিস—অন্য লোকের বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধার সহিত কথা কইতে শেখা উচিত।

নয়নতারা। তুমি রাগই কর আর যাই কর, এ বাড়ীতে আমরা থাকতে কখনই এ সব হতে পারবে না।

সুরেশ। Oh I see, the house is yours; bid us go away, and we shall clear out at once—তাই ত বাড়ীটে যে তোদের; আচ্ছা আমাদের যেতে বল্, আমরা এখনি চলে যাচ্ছি।

এই কথাতে নয়নতারা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "দাদা! তুমি যখন মানুষের উপর নিষ্ঠুর হবে মনে কর, তখন আর মুখের দিকে তাকাও না, আমি কি তাই মনে করে বলেছি?" এই বলিয়া টেবলে হাত রাখিয়া হাতে মাথা দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভগিনীর চক্ষে জল দেখিয়াই সুরেশ নরম হইয়া গেলেন। উঠিয়া নয়নতারার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুই ত জানিস সকল সমাজেই পুরুষদের এ বিষয়ে মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, আচ্ছা ভবিষ্যতে যাতে এ রকমটা না হয় তা করা যাবে।"

ইহার পরে সুরেশ যোগেশের বিলাত ফেরত বন্ধুদের আসা কিছু দিন বন্ধ হইল। নয়নতারা ঘোর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এস. পি. রায়ের পত্নীর নিকট হইতে এক ভয়ংকর চিঠি আসিয়া উপস্থিত। চিঠিখানি অতি গোপনীয় ও নয়নতারার নামে। চিঠিখানি এই—

"ভাই! একটা দুঃখের সংবাদ দিতে যাচ্ছি। তোমাকে না বলে আর কাকে বলবো। যোগেশ ঠাকুরপো বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। এমন কি আমরা নিজের লোক বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করছি। সেদিন ঘোষেদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল, যোগেশ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল; যাবার সময় অতিরিক্ত মদ খেয়ে যে অসভ্যতাটা করলে, তা আর কি বলবো, আমাদের পালাতে ইচ্ছে করতে লাগলো। তারপর, যাবার সময় তাদের আমোদিনীকে অতি বিশ্রীভাবে অপমান করেছে। সে আর বলবার নয়, এতেই বুঝতে পারছ মেয়েতে মেয়েকে বলতে পারছে না। কি বলবো ভাই! সেই অবধি আমাদেরও তাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়েছে; লজ্জাতে আর মুখ দেখাতে পারছি না।

আর একটা কথা। সে দিন আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে গিয়ে যা করলে, তা দেখে আর তার সঙ্গে এমন জায়গায় যাবার ইচ্ছে নেই। আমাদের মানা না শুনে সেই বাজারের মেয়েগুলোর কাছে গিয়ে, এমনি হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি করতে লাগল, যে আমাদের গাড়ীতে আনতে লজ্জা বোধ হতে লাগল। গোবিনবাবুকে ভাল বলতে হবে, তাঁকে ঐ মেয়েমানুষগুলোর সঙ্গে পরিচয় করে দেবার জন্যে এত টানাটানি করলে, তিনি কোন মতেই গেলেন না। শেষে আর একজনকে ধরে নিয়ে গেল। আমি বলে রাখছি শোন, এই যোগেশের জন্যে গোবিনবাবু আবার খারাপ হবে; সৌদামিনীর ঘরে আগুন লাগবে। এ চিঠি গোপন, অতি গোপন! দরকার হলে যোগেশকে দেখাতে পার।

তোমাদেরই
সুমতি।"

এই চিঠি পাইয়া নয়নতারা বিপদ-সমুদ্র সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন পিতৃব্যকে ডাকাইয়া সমুদয় বলিবেন। আবার ভাবিলেন জ্যেষ্ঠকে পত্রখানি দেখাইবেন, যদি তাঁর চেতনা হয়। আবার ভাবিলেন সর্বাগ্রে যোগেশকে গোপনে বলাই ভাল, হঠাৎ জানাজানিটা করা ভাল নয়। এই ভাবিয়া একদিন যোগেশকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া এস. পি. রায়ের পত্নীর পত্রখানি পড়িবার জন্য তাঁর হাতে দিলেন। দিতে তাঁর হাত কাঁপিতে লাগিল: চক্ষে জল আসিতে লাগিল।

যোগেশ পত্রখানি লইয়া আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলেন। পাঠান্তে লজ্জাতে অধোবদন হইয়া রহিলেন, আর মুখ তুলিতে পারিলেন না।

নয়নতারা। আমোদিনীর প্রতি কি অভদ্রতা করেছ?

যোগেশ। তোমাকে বলতে লজ্জা করছে।

নয়নতারা। সে কি! মেজদা, অপরের বোনের প্রতি এমন ব্যবহার করেছ, যা নিজের বোনকে বলতে লজ্জা করছে! যাহোক গোপন করো না, আমাকে বল।

যোগেশ আবার অনেকক্ষণ অধোবদন হইয়া রহিলেন।

নয়নতারা। বল আমার কাছে গোপন করো না।

যোগেশ। এমন কিছু করেছি যা তোমাকে বলবার নয়।

।জ্জাতে অধোবদনআবারল

নয়নতারা বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যোগেশ কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া অবশেষে নয়নতারার পায়ের নিকটে হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার হাত ধরিয়া "বোন-দিদি! আর এমন হবে না।"

নয়নতারা। (অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া) তোমার বোনের প্রতি যদি কেউ সেরূ ব্যবহার করতো তাহলে কি করতে?

যোগেশ। (মৌনী)।

নয়নতারা। বল কি করতে?

যোগেশ। তাকে লাথি মেরে বাড়ী হতে তাড়াতাম।

নয়নতারা। তারা তোমাকে লাথি মেরে তাড়িয়েছে?

যোগেশ। বাড়ীর লোকে তখন টের পায়নি, পরে শুনেছে।

নয়নতারা। আমোদিনী কি করলে?

যোগেশ। আপনাকে বড়ই অপমানিত বোধ করলে।

নয়নতারা। তুমি কি ভাবছ, কি করবে?

যোগেশ। আমি তারপর দিনেই মাপ চেয়ে আমোদিনীকে ও তার দাদাকে পত্র লিখেছি।

নয়নতারা। তবু ভাল, কোনও জবাব পেয়েছ?

যোগেশ। হাঁ পেয়েছি।

এই বলিয়া কোটের পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া ভগিনীর হস্তে দিলেন। সেখানি আমোদিনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জি. ঘোষের লিখিত।

পত্রখানি এই;—

Sir,

Your letter received Please let this be your last letter to us; and also henceforth no longer consider us your friends.

অর্থ—মহাশয়! আপনার পত্র পাইয়াছি, এই যেন আপনার শেষ পত্র হয়, অতঃপর আমাদিগকে আর বন্ধু বলিয়া মনে করিবেন না।

নয়নতারা। যাঃ! তোমার ব্যবহারে দুটো পরিবারের এত দিনের বন্ধুতাটা ভেঙ্গে গেল। ভাগ্যে বাবা নাই, থাকলে তিনি অপমানে মরে যেতেন। যারা আপনার লোকের মত, তাদের মেয়ের প্রতি তুমি কি করে এমন ব্যবহার করলে?

যোগেশ। নেশার ঝোঁকে করেছি।

নয়নতারা। তারপর থিয়েটারের ব্যাপারটা কি? বাজারের কতকগুলো মেয়ে কি তোমার ইয়ারকি দেবার লোক, তুমি কি করে তাদের সঙ্গে মাথামাখি করতে গেলে? তখন আমাদের কথা মনে হলো না?

যোগেশ। বোন-দিদি! সেটাও নেশার ঝোঁকে করেছি।

নয়নতারা। তুমি যে হাতে তাদের ধরেছ, তাদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করেছ, সেই হাত আমার গায়ে দিচ্ছ, মনে হয়ে কেমন লজ্জা করছে?

যোগেশ তাড়াতাড়ি হাতখানি সরাইয়া লইলেন।

ইহাতে নয়নতারা কাঁদিয়া ফেলিলেন; "মেজদা, মেজদা! একি হলো, তুমি কি এমনি অধম হয়েছ যে, নিজের বোনকে ছুঁতে লজ্জা পাচ্চো।"

যোগেশ। আমি বলছি আর এমন হবে না।

নয়নতারা। ভদ্রলোকের ছেলেরা যেখানে বাজারের মেয়েদের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচে ভদ্রলোকের সেখানে যাওয়াই উচিত নয়। আমাদের বাড়ীর কারুকে কখনও যেতে দেখেছ? বাবা যাওয়ার বড় বিরোধী ছিলেন। তিনি থিয়েটার দেখার বিরোধী ছিলেন না। ইংরাজদের থিয়েটারে আমরা গিছি। এসব থিয়েটারে যেতে দিতেন না। কেবল গিয়েছ তা নয়, সেই সব মেয়েমানুষের সঙ্গে মাথামাখি করেছ, আমি ভেবে উঠতে পারছি না কিরূপে তোমার এত অধোগতি হলো।

বলিয়া নয়নতারা বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন।

যোগেশ। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, আর মদ খাবো না ও থিয়েটারে আর যাব না। তুমি এসব কথা আর কারুকে বলো না।

এই প্রতিজ্ঞার পর বাস্তবিক যোগেশ আপনার স্বভাব-চরিত্র শুধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সুরাপান ও থিয়েটারে যাওয়া দুই পরিত্যাগ করিলেন। কেবল নয়নতারার চক্ষের জলেই যে ও পরিবর্তনটা আসিল তাহা নহে, আমোদিনীর প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও যে জন্য ঘোষদের সঙ্গে বন্ধুতাটা ঘুচিল তাহা স্মরণ করিয়া সত্যসত্যই লজ্জিত হইয়াছিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে জিনিসে এতটা আত্মবিস্মৃত করে সে জিনিস আর পান করিবেন না।

যোগেশ সুরাপান ত্যাগ করিলেন দেখিয়া সুরেশ ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিলেন, "গোঁড়াদের খাতায় নাম লেখালি নাকি?" যোগেশ নিরুত্তর থাকেন, কিছুই বলেন না; নয়নতারাও কিছু বলেন না।

কিছুদিন পরে সুরেশচন্দ্র আবার তাঁহার কয়েকজন বিলাত ফেরত বন্ধুকে এক শনিবার নিমন্ত্রণ করিলেন।

নয়নতারা ভাবিলেন, "দাদার সঙ্গে সেবারে ঝগড়াটা হয়ে গেছে, এবার তাঁর বন্ধুদের একটু আতিথ্য করি।" এই ভাবিয়া আহারের স্থানে গেলেন। গিয়া তাঁহাদের সহিত আহারে ও আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, সুরেশের আদেশক্রমে আহারের স্থানেই মদ আসিল। পিতার প্রতিষ্ঠিত পুরাতন নিয়মটা ভাঙ্গা হইতেছে, দেখিয়া তাঁহার আর বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইতে লাগিল, কিন্তু কি করেন, তখন পলায়ন করাটা ভাল দেখায় না, কোনও প্রকারে বসিয়া থাকিলেন, ভাবিলেন পরে জ্যেষ্ঠের সহিত ঝগড়া করিবেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই অতিথিদের একজনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া মাথা ঝুলিয়া পড়িল ও অপর একজনের কথা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি আর থাকা বোধ করিলেন না, টুনী ও পটলকে ইসারা করিয়া নিজে পলাইয়া আসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই নন্দরাণী পলাইয়া আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি! তাঁরা ঠাকুরপোকে মদ খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন।"

নয়নতারা। দাদা দেখুন, কি সব জানোয়ার ডেকে আনেন। সুরেশচন্দ্র নিজেই বুঝিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় যাইতেছে; অমনি উঠিয়া যোগেশকে পীড়াপীড়ি করা বারণ করিয়া দিলেন এবং খানসামাকে ইসারা করিয়া সুরা যোগান বন্ধ করিয়া দিলেন; বন্ধুদিগকে ধরিয়া বৈঠকঘরে লইয়া গেলেন।

বৈঠকের আসর আর হবে কি! সুরেশচন্দ্র বন্ধুদিগকে স্বীয় স্বীয় শয্যাতে দিয়া, সুরার আলমারির চাবিটি নিজে লইয়া উপরে শয়ন করিতে গেলেন; যোগেশ অতিথিদিগের অবশিষ্ট পরিচর্যাতে নিযুক্ত রহিলেন।

সুরেশ গিয়া শয়ন করিলেন, ও দিকে অতিথিগুলি আবার যোগেশকে সুরার জন্য ধরিল। যোগেশ প্রথমে "দাদা চাবি নিয়ে গেছেন" বলিয়া সে অনুরোধ কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া, নিজের একটা চাবি দিয়া আলমারিটি খুলিয়া আবার সুরা যোগাইলেন। সেবারে তাহারা তাঁহাকে ছাড়িল না। তিনি নয়নতারার নিকট যে প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন, তাহা আর রক্ষা করিতে পারিলেন না ; তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। শেষে অতি বীভৎস কাণ্ড দাঁড়াইল। কেহ শিয়াল ডাকে, কেহ কুকুর ডাকে, কেহ অন্য জানোয়ারের ডাক ডাকে, কেহ অট্টহাস্য করে। উপরে যাঁহারা শয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিদ্রা হইবার যো নাই।

নয়নতারা জননীকে বলিলেন, "দেখছ মা কি কাণ্ড ? আর এখানে থাকা চলেনা না। চল আমরা এখান হতে চলে যাই, তাতে যদি ওদের চেতনা হয়।" সুরেশ শুইয়াছিলেন, এই কোলাহলে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। তখন কি আর থামান যায় ? একজন কোচখানির উপরে পড়িয়া আছে, ঘুমাইতেছে কি বেহুঁস হইয়া আছে বুঝা যায় না ; দুইজন হাসিয়া ও করতালি দিয়া গান ধরিয়া নাচিতেছে ; অপর একজন অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়া তাহাদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। যোগেশ ভয়ে ভয়ে অধিক পান করিতে পারেন নাই ; তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া স্বীয় স্বীয় শয্যায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সংস্কৃত কবি উপস্থিত থাকিলে হয়ত বলিতেন, দেখ আমার উক্তির প্রমাণ এখানে ;—

উত্তম-প্রকৃতিঃ শেতে মধ্যা হসতি গায়তি।
অধম-প্রকৃতিশ্চাপি পরুষং বক্তি রোদিতি ॥

'সুরাপান করিলে উত্তম-প্রকৃতির লোকে নিদ্রা যায়, মধ্যম-প্রকৃতির লোকে হাসে গান করে, আর অধম-প্রকৃতির লোকে গালাগালি দেয় ও কাঁদে।"

সুরেশ যোগেশকে আলমারি খোলার জন্য অনেক তিরস্কার করিয়া অতিথিদিগকে বুঝাইয়া ধরিয়া শয়ন করাইলেন, করাইয়া উপরে আসিলেন।

পরদিন প্রাতে অতিথিগুলি লজ্জাতে আর মুখ দেখাইতে পারিল না, প্রাতে উঠিয়াই চলিয়া গেল।

সুরেশ প্রাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিলেন, যে আর পিতার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না ; সে ভবনে আর অতিথিদিগকে সুরাপান করিতে দিবেন না ; এবিষয়ে তিনি একটু অসংযত হইয়া পড়িতেছেন তাহা সুধরাইয়া লইবেন ; পূর্ব রাত্রের ঘটনার জন্য নয়নতারার নিকট আহারের সময় ক্ষোভ প্রকাশ করিবেন ও তাঁহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা জানাইবেন। কিন্তু সেদিন প্রাতে নয়নতারা আহারের স্থানে আসিলেন না। তাঁহার মনটা বড়ই খারাপ আছে। দুপুর বেলা সুরেশ একবার ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন মুখ ভার, তাঁহাকে দেখিয়াও কথা কহিলেন না, অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

ভগিনীর এতটা বিরাগ দর্শনে সুরেশেরও মনে বিরক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল। সমস্ত দিনের মধ্যে নয়নতারা আপনার ঘর হইতে বাহির হইলেন না। শয্যাতে পড়িয়া কেবল "কি করি, কি করি", এই চিন্তাতে যাপন করিলেন। অপরাহ্নে হরেন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া নয়নতারার চিত্তের অনেকটা বিনোদন হইল। বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ে দুজনে অনেক আলোচনা হইল, যাহাতে তিনি মনের কষ্টের কারণটা অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেলেন। কথা কহিতে কহিতে রাত্রিকালের আহারের সময় উপস্থিত। নয়নতারা নন্দরাণীর মুখে শুনিয়াছেন পূর্ব রাত্রের ঘটনার জন্য জ্যেষ্ঠ দুঃখিত

এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে আহারের স্থানে আর সুরা আনিবেন না। ইহা শুনিয়া বলিয়াছেন, যে আহারের স্থানে যাইবেন। হরেন্দ্রের সহিত নামিয়া যাইতে যাইতে সিঁড়ির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে সুরেশ ও নন্দরাণীর কথোপকথন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা নয়নতারার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যোগেশ মনের দুঃখে আহারের স্থানে আসেন নাই।

সুরেশ। কোথা থেকে যে একটা পাপ যুটেছে, আমাদের ভাই-বোনের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না।

নন্দরাণী। ছি! ছি! তুমি হরেনবাবুর প্রতি অন্যায় করছো। তিনি এসব কথার ভিতরে থাকেন না।

সুরেশ। সেই ত নয়নতারার মন্ত্রদাতা গুরু।

নন্দরাণী। তোমার ঐ একটা বড় দোষ, মনের ভিতর একটা কথা ঢুকলে আর বার করতে পার না।

সুরেশ। বাবাকে দু'শবার বলেছি, ওকে ছাড়িয়ে দিন, তখন দিলেন না, এখন কি ও নয়নতারাকে ছাড়বে? এখন জানতে পেরেছে, যে নয়নতারা মাসে দেড়শ টাকা ও এক কালীন পাঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছে; তারপর মাকে বাবা যে পাঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন এবং মার নিজের যে পাঁচিশ হাজার টাকা আছে, সে পঞ্চাশ হাজারের সবটা না হোক, বেশির ভাগটাও নয়নতারা পাবে। এখন ও কেঁটের মত নয়নতারার গায়ে লেগে থাক্‌বে।

নন্দরাণী। (বিরক্তির সহিত) ছিঃ! হরেনবাবুকে এমন কথা বললে পাপ হয়; তাঁকে তুমি চেন না; তাঁর মন এমন নীচ নয়; তিনি খুব বড় মনের লোক। তিনি যে ঠাকুরঝীকে ভালবাসেন সে কি টাকার জন্যে না ঠাকুরঝীর গুণে?

সুরেশ। টাকার কথাটাও ভিতরে ভিতরে আছে।

নন্দরাণী। (বিরক্ত হইয়া) যাও, তুমি মানুষকে বড় ছোট চোখে দেখ।

সুরেশ। আচ্ছা, আমি বলে রাখছি দেখো ও এখন নয়নতারাকে বিয়ে করবার জন্যে আদা জল খেয়ে লাগবে। হাজার হোক রাঁধুনীর ছেলে, মাসে দেড়শ টাকা ও পঞ্চাশ হাজার নগদ, সেটা বড় কম কথা নয়।

নন্দরাণী (বিরক্তভাবে) তোমরা কেবল টাকাই চিনেছ বৈ ত নয়, সাধুলোকের মর্যাদা কি বুঝবে?

সুরেশ। সাধে তোমাকে গোঁড়াদের দলে নাম লেখাতে বলি।

এই কথোপকথন হরেন্দ্রের কর্ণে গেল। তিনি চলিয়া গেলে নয়নতারার মন এবং খারাপ হইয়া গেল, যে আহারের স্থানে আর যাইতে পারিলেন না। 'যাঃ সর্বনাশ হলো' বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া দ্বার দিলেন।

সুরেশ যখন শুনিলেন নয়নতারা ঘরে দ্বার দিয়া আছেন, তখন অতিশয় বিরক্ত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন হরেন্দ্র কাণে কি মন্ত্র দিয়া গেল, যে একটু ভাল ভাব হইয়াছিল, তা নষ্ট হইল। এই ভাবিয়া বিষণ্ণ ও বিরক্ত অন্তরে আহার করিয়া উপরে গেলেন।

পরদিন প্রাতে নয়নতারা মনের ক্লেশে আহারের স্থানে আসিলেন না; তাহাতে সুরে

আরও বিরক্ত হইয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন, Surely, this is carrying things to extreme—এত দেখি বেজায়, এত বাড়াবাড়ি—কেন!

এদিকে পূর্ব দিনের কথাগুলি হরেন্দ্রের আত্মমর্যাদার উপরে জ্বলন্ত গোলার ন্যায় পড়িয়াছে। তিনি শয্যার এপাশ ওপাশ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "তাই ত ধনীদের সঙ্গে গরীবদের বন্ধুতা হতে গেলেই কথাটা এইরূপ দাঁড়ায় বটে। দূর হোক, বন্ধুতা এখানেই ভাঙ্গুক; আর আমি সে দ্বারে যাব না। তবে কি নয়নতারার মুখ এজন্মে আর দেখব না?" অমনি চক্ষে জল আসিল, বালিশে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। নয়নতারার মুখ এজন্মে আর দেখব না? সে বেচারির অপরাধ কি? ধনী বলে অহংকার তাঁর ত নাই; আমার বন্ধুতার প্রতি অবজ্ঞা তাঁর ত নাই; না না সে নির্মল মনে সন্দেহের রেখাও নাই; তবে কেন আমি তাঁকে পরিত্যাগ করি, না আমি তা পারব না; আমি নয়নতারাকে পরিত্যাগ করলে বাঁচব না। কিন্তু সে বাড়িতে আমি আর কিরূপে যাব? যারা আমাকে এত নীচ চক্ষে দেখে, আমার বন্ধুতাকে নীচ স্বার্থপ্রণোদিত মনে করে, আমি কি করে সে বাড়ীতে বন্ধুতা করতে যাব? অনিচ্ছাতেও নয়নতারাকে ত্যাগ করতে হচ্ছে। আচ্ছা প্রতিজ্ঞা করলাম নিজ আয়ে তাঁকে সুখে রাখবার আয়োজন না করে, আর তাঁকে মুখ দেখাব না। সুরেশবাবু দেখুন একজন গরীব বামনের ছেলের হাড়ে, একজন রাঁধুনী বামনীর ছেলের হাড়ে কত হয়। জগদীশ্বর দিন দেবেন, এ প্রেম-অগ্নি যতদিন হৃদয়ে ধারণ করব, ততদিন তপস্যাতে থাকব, ততদিন নয়নতারার মুখ দেখব না। আমি জানি তিনিও এ প্রেমাগ্নি হৃদয়ে ধারণ করবেন। সে মহৎ-প্রকৃতি বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। তবে আর নয়; রায় মহাশয়ের ভবনে আর পদার্পণ নয়।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, এপাশ ওপাশ করিতে করিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল। ভোরে উঠিয়া নয়নতারাকে এক পত্র লিখিলেন। পত্রখানি লিখিতে চক্ষের জল পড়িয়া অক্ষরগুলি ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এ বলবান সবলচেতা যুবক এত ক্রন্দন কখনও করে নাই। পিতৃশোক পাগলের ন্যায় সহিয়াছে, ঘোর দারিদ্র্য যন্ত্রণা বজ্রের ন্যায় অপরাজিত চিত্তে বহিয়াছে, অপরের ঘৃণা অবজ্ঞার সহিত ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, অসহ্য রোগ যন্ত্রণা মুখ মুদিয়া সহিয়াছে, একটি বার মুখ বাঁকায় নাই, আজ কেন নয়নতারাকে ছাড়িতে আকুল হইয়া কাঁদিতেছে? আজ কেন হৃদয় ভাঙ্গিয়া, পিষিয়া, দলিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে! প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তুমিই ইহার উত্তর দেও।

চিঠিখানি খামে পূরিয়া শিরোনামটি লিখিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, চিঠিখানি লিখিয়া বিদায় না লইয়া একবার দেখাটা করিয়া জন্মের মত বিদায় লই। হায়রে প্রেমিকের আত্মপ্রতারিত হৃদয়! তুমি মুহূর্তে ভাঙ্গিতে পার, আবার মুহূর্তে গড়িতেও পার। মন বলিল—তাই ভাল। "কালেজে প্রথম ঘণ্টাতে কাজ নাই, সেই সময়ে গিয়ে দেখা করে বিদায় নিয়ে আসব। সাক্ষাতে দশ মিনিটে যত কথা হয়, চিঠিতে দুই ঘণ্টাতে তা হয় না।" এই ভাবিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

কালেজ হইতে প্রথম ঘণ্টা ছুটি লইয়া হরেন্দ্র নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি রায় মহাশয়ের ভবনের সন্নিহিত হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, যে সুরেশ গাড়ী করিয়া কালেজে যাইবার জন্য গেট দিয়া বাহির হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুরেশ

আসিয়া গেলেন, এবং চীৎকার করিয়া হরেন্দ্রকে শুনাইয়া দ্বারবানকে বলিলেন,—"দরওয়ান হরেনবাবুকো মাত ছোড়ো, বোলো ভিতর জানেকা হুকুম নেহি।"

ক্ষণকালের জন্য চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, রাস্তার ধারের আলোর খুঁটিটা ধরিতে হইল। ধরিয়া দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন ;—"কেন দুর্বুদ্ধিবশতঃ দেখা করতে এলাম, গাল বাড়িয়ে চড়টা খেলাম, চিঠিখানা পাঠালেই হত।"

তাহার প্রকৃতির কথা অগ্রেই বলিয়াছি, এই ঘোর আন্দোলনের মধ্যে হঠাৎ এক আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য দৃঢ়তা তাঁহার প্রাণে আসিল। বাসাতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মন নয়নতারাকেও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। গিয়াই দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। সে পত্রখানি এই ঃ—

"গতকল্য সুরেশবাবুর একটি কথা শুনিয়া বড় মানসিক ক্লেশে রাত কাটাইয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি আমার ন্যায় গরীব লোকের পক্ষে আপনাদের বন্ধুতার প্রার্থী হওয়া উচিত হয় নাই। তাই আজ প্রাতে আপনার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। লিখিয়া ভাবিলাম, নিজে সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লওয়া ভাল। তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দ্বারের নিকট দেখিয়া সুরেশবাবু দ্বারবানকে আমাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দিতে হুকুম দিলেন। আমি যে বুঝিয়াও বুঝিলাম না, তাহার ফল এই হইল। সামান্য পথ-ভিখারীর ন্যায় অপমানিত হইয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে ; এখন আপনার নিকট বিদায় লইতেছি। যদি কখনও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপযুক্ত হই, তবে সাক্ষাৎ করিব। আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিবেন ; এ দুই বৎসরে যাহা কিছু দেখিয়াছি ও পাইয়াছি তাহার স্মৃতি অন্তরে রহিল।"

এই পত্রখানি পাইয়া নয়নতারার কি অবস্থা হইল তাহা অবর্ণনীয়! তিনি যে কোথায় আছেন তাহা যেন বুঝিতে পারেন না। জাহাজ ভাঙ্গিয়া যে সমুদ্রে পড়িয়াছে, সে যে একখানি কাঠ হাতের কাছে পাইয়া ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, সেখানি যদি তরঙ্গের আঘাতে হাত হইতে সরিয়া যায়, তবে তাহার দশা যেরূপ হয়, নয়নতারার যেন সেই দশা হইল। পিতা চলিয়া গিয়াছেন ; ভ্রাতাদের সঙ্গে মিল নাই ; পৃথিবীতে যে একজন পুরুষ মনের মত পাইয়াছেন, যাঁহার প্রেমে আস্থা স্থাপন করিয়া এতবড় শোকটা সহিয়াছেন, তিনিও দূরে গেলেন ; আজ আপনাকে বড়ই একাকী বোধ হইতে লাগিল। পড়িয়া পড়িয়া ভয়ানক কাঁদিলেন। পত্রখানি আবার পড়িলেন। "সামান্য পথ-ভিখারীর ন্যায় অপমানিত হইয়া দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল।" এই কথাগুলি পড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্রকে লিখিলেন—

"আপনার পত্র পাইয়া সমুদয় অবগত হইলাম। আমাদিগকে যে ঘৃণাপূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। আমরা কোনও প্রকারে আপনার বন্ধুতার উপযুক্ত নই। জগদীশ্বর আপনাকে মহত্ত্বের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ; আপনার পথ কেহ অবরোধ করিতে পারিবে না। আপনি যেখানেই থাকুন, আপনার উন্নতি দেখিয়া আমি সুখী হইব। আমিও আপনার নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছি। তবে এইমাত্র দুঃখ রহিল, যদি এ অসার প্রেমের দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ না করিতাম তাহা হইলে এই অপমানটা সহ্য করিতে হইত না। আমিও এ বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম ; আপনার প্রতি যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত না হইলে এ বাড়ীতে পদার্পণ করিব না। আমার কথা আর স্মরণ রাখিবেন না।"

পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া নয়নতারা সমস্ত দিন দ্বার দিয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিলেন, উঠিলেন

না; আহার করিলেন না; সংসারের কাজ দেখিলেন না; কিছুই করিলেন না। কেহই তাঁহার দ্বারে ডাকিতে সাহস করিল না। জননী তনয়াকে সমস্ত দিন এইভাবে যাপন করিতে দেখিয়া ঘোর বিপদ গণনা করিয়া দিবাশেষে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার শোক নবীভূত হইয়া উঠিল। তখন নয়নতারা দ্বার খুলিয়া জননীর নিকট গেলেন; মায়ের গলা জড়াইয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল; সন্ধ্যার সময় জননীর মনস্তুষ্টির জন্য কিছু আহার করিলেন। সন্ধ্যার পরেই তিনি জননীকে সমুদয় বিবরণ বলিয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"দেখ মা, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু আমি আর কোন মতেই এ বাড়ীতে থাকতে পারছি না; আমি চলে যাই; তোমার এখন যাওয়া হবে না; বাড়ীটা বাবা তোমাকে দিয়ে গিয়েছেন। আমরা দুজনে গেলে দাদারা চলে যাবেন, সেটা ভাল হবে না। তুমি এখানেই থাক, আমি কাকার বাড়ীতে থাকব; তোমাকে সর্বদা নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে দু' চারদিন থেকে আসবে। আমি চলে গেলে আর তুমি থাকলে ওদের বাড়াবাড়িটা একটু কমতে পারে।" জননী কোন প্রকারেই তাঁহাকে ছাড়িতে প্রস্তুত নন। "তুই গেলে কি আমি বাঁদরগুলোকে নিয়ে থাকব?"

নয়নতারা। না মা, তুমি বুঝছ না, তুমি গেলে চলবে না। আমাকে ত সর্বদা দেখতে পাবে। আর আমি গেলে দেখো, দাদার মনে কষ্ট হবে, হাজার হোক্ ভালবাসাটা কোথায় যাবে; আমাকে ফিরিয়ে না এনে দাদা সুস্থির থাকতে পারবেন না; তিনি গিয়ে হরেনবাবুর কাছে মাপ চাবেন, তা হ'লেই আমি আবার আসবো।

এইরূপে জননীকে গড়িতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। সে রাত্রি তিনি জননীর কাছেই রহিলেন।

পরদিন প্রাতে বিনোদ আসিয়া উপস্থিত। নয়নতারা পূর্বদিন বৈকালে পিতৃব্যকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া বিনোদকে পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। সকালে উঠিয়াই নয়নতারা নন্দরাণীর দ্বারা জ্যেষ্ঠকে জানাইয়াছেন যে, তিনি পিতৃব্যের ভবনে চলিয়া যাইবেন, হরেন্দ্রের অপমানের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে আর এ ভবনে পদার্পণ করিবেন না। শুনিয়া সুরেশ নিজ কার্যের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইলেন; একবার ভাবিলেন হরেন্দ্রকে পত্র লিখিয়া মাপ চাহিবেন ও আসিতে বলিবেন, কিন্তু আবার অহংকার ও অভিমান আসিয়া বাধা দিল।

এদিকে নয়নতারার জিনিসপত্র বাঁধা হইতে লাগিল। তিনি পিতৃব্যের ভবনে গিয়া আহার করিবেন, সেজন্য যাইবার ত্বরা বাড়িয়া গেল। ক্রমে তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জননী আর নিজের গৃহ হইতে বাহির হইলেন না; সেখানে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নন্দরাণী, টুনী, পটল, চাকর-চাকরাণী সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল।

নয়নতারা নন্দরাণীকে বলিলেন—"ভাই! দাদাকে গিয়ে বল, আমি চললাম।" এই সংবাদ পাইয়া সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুরেশ। তুই কেন যাবি, আমরাই চলে যাচ্চি, এ বাড়ী ত তোর।

নয়নতারা। (অগ্নিপ্রায় হইয়া) কি দাদা! এখনও এমন কথা বলো? এ বাড়ী আমার হলে যাঁর পায়ের ধূলো নেবার লোকও তোমরা নও, তাঁকে পথের কুকুরের মত দোর থেকে তাড়িয়ে দিতে পার?

এই বলিয়া মনের আবেগে দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া একটা পুটুলির উপর বসিয়া পড়িলেন ও হাতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তুলিলেন; স্থির, ধীর, গম্ভীর, যেন পাষাণের প্রতিমা! আর একটিও কথা কহিলেন না; আস্তে আস্তে নন্দরাণী, টুনী, পটল, মিনী প্রভৃতি সকলকে চুম্বন করিয়া ও জননীর ঘরে গিয়া তাঁর পদধূলি লইয়া বিনোদের সঙ্গে নীচে নামিয়া গেলেন। যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন তখন একজন চাকর আসিয়া তাঁহার হস্তে একখণ্ড কাগজ দিল। ঐ কাগজে যোগেশের হস্তাক্ষরে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি কথা লিখিত আছে—"Sister! don't leave us, we shall grow worse"—অর্থাৎ ভগিনী! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই ও না, আমরা আরও খারাপ হইয়া যাইব। যোগেশ শনিবারের ঘটনার পর দুই দিন নয়নতারাকে মুখ দেখান নাই; মনের দুঃখে ও অনুতাপে লুকাইয়া আছেন। এখন নয়নতারা চলিয়া যান শুনিয়া ঐ কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

এই কথাগুলি নয়নতারার হৃদয়ে আঘাত করিল। যোগেশের উপরে তাঁহার একটা প্রভাব আছে, যাহা সুরেশের উপরে নাই, তাহা তিনি জানেন। সুতরাং এই অনুরোধ পত্র পাইয়া একটু দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—"এখন আর ভাবিবার সময় নাই।" তৎপরে গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। দাসদাসীরা বলিল—"যাঃ বাড়ীর লক্ষ্মী ছেড়ে গেল!"

বিংশ পরিচ্ছেদ

নয়নতারা চলিয়া গেলেই সুরেশ গভীর বিষাদে পতিত হইলেন। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনার মুহূর্তে হরেন্দ্রকে অপমান করিয়া, তিনি মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। সে দুঃখ প্রকাশ করিবার অবসর পাইলেন না; অনিষ্ট ফল যাহা ঘটিবার ঘটিয়া গেল। তদবধি সুরেশ অতি ম্লানভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বাড়ীর লোকে আর তাঁহাকে হাসিতে দেখে না। কালেজ হইতে আসিয়া আর ভাই-ভগিনীদিগকে লইয়া খেলা করেন না; আর সন্ধ্যার সময় বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে যান না; এমন কি স্ত্রী-পুত্র নিকটে আসিলে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন না। অত্যাবশ্যক গৃহকর্মসকল সম্পাদন করিয়া যে সময়টুকু পান, পড়িয়া পড়িয়া কেবল পাঠ করেন। নন্দরাণী এই ম্লানতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "বিশেষ কিছু নয়।"

নয়নতারার যাওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি কালেজের বেতন পাইলেন। পাইয়াই ভগিনীর জন্য তিন মাসের দেয় ৭৫ টাকা কলিকাতার পিতৃব্যের ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। টাকা ফিরিয়া আসিল, নয়নতারা তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই সংবাদে সুরেশের চক্ষে জল পড়িল। তিনি সে টাকা স্বীয় বাক্সে তুলিলেন না; ব্যাঙ্কে ভগিনীর নামে জমা দিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না ভগিনী ঘরে ফিরিয়া আসে, মাসে মাসে ২৫ টাকা তাহার নামে জমা হইবে। যদিও জানিতেন পিতার প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি পাওয়ার পর ভগিনীর অর্থের অপ্রতুল নাই, তথাপি এ ২৫ টাকা তাঁহার এমনি পবিত্র বোধ হইতে লাগিল, যে তাহা স্পর্শ করিবার প্রবৃত্তি হইল না।

ওদিকে হরেন্দ্রেরও চুঁচড়াতে থাকা ভার হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যত সহজে আত্ম-সংবরণ

করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা পারিতেছেন না। মনকে নয়নতারা হইতে সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়াতে প্রাণের মধ্যে এমন একপ্রকার শূন্যতা আসিয়াছে, যে তাহা আর সহ্য হইতেছে না, শরীর ও মন দুই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দুইটি বিষয় তাঁহার বিষ বোধ হইতেছে। প্রথম—নয়নতারাহীন চুঁচড়া বিষ বোধ হইতেছে। যে চুঁচড়া তাঁহার এত প্রিয় স্থান, যেখানে তাঁহার স্পোর্টিং ক্লাব, তাঁহার ড্রিলিং ব্যাণ্ড প্রভৃতি আছে, যেখানে তাঁহাকে ভালবাসিবার, শ্রদ্ধা করিবার, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার এত লোক আছে, সেই চুঁচড়াও আজি তাঁহার চক্ষে আকর্ষণহীন হইয়াছে! তাঁহার মনটা যেন কোথায় যাই, কোথায় যাই করিতেছে। এক একবার ভুলিয়া ভুলিয়া পা দুখানা রায় মহাশয়ের ভবনের দ্বারদেশপর্যন্ত যায়, আবার তিনি চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ফিরিয়া আসেন। এইরূপ ক্লেশে দিন কাটিতেছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিষ বোধ হইতেছে, তাহা এই : রায় মহাশয় গুপ্তিপাড়া যাইবার পূর্বে তাঁহাকে যে দুই হাজার কয়েকশত টাকা ঋণস্বরূপ দিয়াছিলেন, সেই দুই হাজার টাকা ঋণ বিষ সমান লাগিতেছে। কিন্তু টাকা পান কোথা? এই কারণে তিনি দারুণ মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছেন।

এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন, যে কলিকাতার কোনও প্রাইভেট কালেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ শূন্য আছে, বেতন ১৫০ টাকা। ভাবিলেন ঈশ্বর কৃপায় বুঝিবা আমার নিষ্কৃতি লাভের উপায় আসিল। বাস্তবিক তাহাই। আবেদন করিবামাত্র তিনি ঐ পদপ্রাপ্ত হইলেন।

হরেন্দ্র চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া চুঁচড়ার যুবকমহলে মহা বিষাদ উপস্থিত হইল। তাঁহার দলের লোকেরা একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। তিনি যথাসাধ্য তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমরা কাজগুলো কোন প্রকারে রক্ষা কর, আমি কলকাতায় গেলেও সর্বদা চুঁচড়াতে আসবো ও তোমাদের সাহায্য করবো।"

যাইবার দিনে যুবকদিগের এক মহা সভা হইল; সেই সভাতে তাঁহাকে বিদায়সূচক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইল এবং স্থির হইল, যে তাঁহার একখানি ছবি পাবলিক লাইব্রেরীতে থাকিবে।

ইহার পরে হরেন্দ্র কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার নূতন কার্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ও কাহারও নিকট হইতে দুই হাজার টাকা কর্জ করিয়া সুরেশকে দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে নয়নতারা পিতৃব্যের আলয়ে আসিলে পরিবার-পরিজন সকলের আনন্দের সীমা থাকিল না। খুড়ীমা সমুদয় সংসারটা যেন তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিলেন; উঠিতে বসিতে নয়নতারার পরামর্শ চাই। ভাই-ভগিনীরা পায়ে পায়ে ঘোরে, মুখ ফুটিয়া আদেশ করিতে বিলম্ব সয় না, আকারে ইঙ্গিতে তাঁহার ইচ্ছা একটু বুঝিতে পারিলেই হয়, অমনি একজনের স্থানে পাঁচজন ছুটিয়া যায়। খুড়া মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন; উদ্দেশে অনেক গালাগালি করিলেন; বলিলেন, "হরেনের অপরাধ কি, যে তাকে শেয়াল কুকুরটার মত দোর থেকে তাড়ায়! সে কি মানুষ নয়? হতভাগারা তার একটা কড়ে আঙুলের যোগ্য নয়; অথচ অহংকারটা পূর্ণমাত্রায় আছে, আচ্ছা আমি হরেনকে ডাকাচ্ছি, সে আমার বাড়ীতে আসবে।" নয়নতারা বলিলেন, "না কাকা! তা করো না, সেটা বড় খারাপ দেখাবে; যেন

আমি নিজের সুখের জন্যেই ভাইদের ছেড়ে এসেছি ; তারপর তিনি এখন আমাদের ছেড়ে দিয়ে সমুদয় মনপ্রাণ দিয়ে নিজের উন্নতি সাধনে লেগেছেন ; এখন আর টানাটানি করা ভাল নয়।"

নয়নতারা দুই দিন পরেই জননীকে আনাইলেন ; এবং প্রাণমন দিয়া জননীর সান্ত্বনা ও শুশ্রূষাতে নিযুক্ত হইলেন। নয়নতারার শুশ্রূষার গুণে এবং কনিষ্ঠ রায় ও তাঁহার পত্নীর আদর-যত্নে রায় গৃহিণীর প্রাণে নয়নতারার বিচ্ছেদজনিত যে কিছু ক্লেশ হইয়াছিল, সমুদয় দূর হইল।

এই সময়ে নয়নতারার কর্ণগোচর হইল, যে হরেন্দ্র সুরেশকে দিবার জন্য দুই হাজার টাকা কর্জ করিবার চেষ্টায় আছেন, এবং আপনার একজন বাল্য-সুহৃদ্ উকীলবাবুকে ধরিয়াছেন। ঐ উকীলবাবুটি কয়েকবার হরেন্দ্রের সহিত চুঁচড়ার বাড়ীতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নয়নতারা জননীর সহিত গোপনে একটা পরামর্শ স্থির করিয়া বিনোদের দ্বারা উক্ত উকীলবাবুকে পিতৃব্যের ভবনে ডাকাইলেন। উকীলবাবুর সহিত যে কথোপকথন হইল তাহা এই—

জননী। আপনাকে একটু কাজের জন্য ডেকেছি, অপরাধ মার্জনা করবেন।

উকীলবাবু। কি কাজ আজ্ঞা করুন, কাজের জন্যে আমাকে ডেকেছেন সে ত আমার সৌভাগ্য, এর আবার মার্জনা কি ?

জননী। শুন্‌লাম হরেন নাকি দু হাজার টাকা ধার করবার জন্যে বেড়াচ্চে।

উকীলবাবু। আমার কাছে ত চেয়েছে।

জননী। আপনি কি বলেছেন ?

উকীলবাবু। আমি বলেছি, আর কিছুদিন পরে হলে দিতে পারি, এখনি টাকাটা আম কাছে নাই। কিন্তু তার টাকাটার এখনি দরকার।

জননী। আপনাকে কৌশলে একটা কাজ করতে হবে। আমি আপনাকে দু হাজার টা দিচ্চি। আমরা যে দিয়েছি, তা প্রকাশ করা হবে না। তা হলে হরেন নেবে না। আমার বড় ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়েছে। আপনি এইমাত্র বলবে "কোনও আত্মীয় লোকের কাছ থেকে নিয়ে দিলাম, সময়ে শোধ করো।" তা বললে নেবে না ?

উকীলবাবু। কেন নেবে না, তাতে তার আপত্তি কি হতে পারে ? আমার হাতে এখ টাকা নাই, আমি যোগাড় করে দিলাম, এমন ত বন্ধুবান্ধবে করেই থাকে।

জননী। তবে তাই করবেন। কিন্তু সাবধান, যেন আমাদের নাম না জানতে পারে।

নয়নতারা। ঘুণাক্ষরে আমরা দিয়েছি জানতে পারলে, তিনি নেবেন না।

উকীলবাবু। আপনারা সে বিষয়ে আমার উপরে নির্ভর করতে পারেন, জনমানব কে জানবে না।

অতঃপর নয়নতারা নিজের টাকা হইতে উকীলবাবুর হস্তে দুই হাজার টাকা অর্প করিলেন। তিনি লইয়া গিয়া হরেন্দ্রকে ডাকাইলেন এবং "কোনও আত্মীয়ের নিকট হ'তে নি দিচ্চি" বলিয়া তাঁহাকে দিলেন। হরেন্দ্র টাকাগুলি পাইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন ভাবিলেন সংকটহরণ প্রভু তাঁহার কোনও সংকট রাখিবেন না। তাঁহার প্রাণের একটা ভা কমিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি সৌজন্যপূর্ণ পত্র লিখিয়া রায় পরিবারকে তাঁহাদে চিরদিনের স্নেহ-মমতা ও সাহায্যের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ করিয়া সে টাকা সুরেশচন্দ্রের নিক

করিলেন। সুরেশ টাকাগুলি ফেরত পাঠাইলেন। লিখিলেন, "আমার পিতা মহাশয় প্রাপ্য দেনার যে তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ঐ টাকার উল্লেখ নাই ; এবং তাঁহার পত্রেও কোনও স্থানে ইহার উল্লেখ দেখিতেছি না ; অতএব অনুমান করি যদি তিনি ঐ আপনাকে দিয়া থাকেন, স্নেহের উপহারস্বরূপ দিয়াছেন, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না।" মহাবিপদে পড়িলেন ; অপর ট্রাস্টি তারাপদ রায় মহাশয়ের নিকট সেই টাকা প্রেরণ লন। কনিষ্ঠ রায় ভ্রাতুষ্পুত্রীর পরামর্শক্রমে লিখিলেন—"এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত টাকা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে গচ্ছিত থাকুক।" এই প্রস্তাব হরেন্দ্রের মনঃপূত হইল ; তনি উক্ত দুই হাজার টাকা তারাপদ রায় মহাশয়ের একজন বন্ধুর হস্তে গচ্ছিত রাখিলেন। তনি ঋণ শোধ করিয়াছেন, এই চিন্তাতে তাঁহার মনের ক্লেশটা ঘুচিয়া গেল।

ইহার পরে নয়নতারার আর এক জ্বালা উপস্থিত হইল। ছেলেরা স্কুল হইতে আসে, আর এক এক দিন এক একটা কথা লইয়া আসে। কোনও দিন আসিয়া বলে—"বড়দি! রেন দাদার কি হয়েছে? কেন আমাদের বাড়ীতে আসতে চান না? হাত ধরে কত টানাটানি করলাম, কোনও মতেই এলেন না ; তোমার সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছে?" কোনও দিন আসিয়া বলে—"হরেন দাদা আর সে হরেন দাদা নাই ; রোগা হয়ে গিয়েছেন ; কাল হয়ে গয়েছেন, মুখে হাসি নেই, কেন এমন হয়েছেন?" কোনও দিন আসিয়া বলে,—"আসবার হরেন দাদাদের বাসার একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আমার গলা শুনে রেন দাদা বাইরে এলেন, চোখ লাল, বোধ হয় কাঁদছিলেন।" এ সকল সংবাদ নয়নতারার ক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "কোথায় পালাই! কোথায় ই, যেখানে গেলে এ সকল সংবাদ রোজ রোজ কানে আসবে না।"

অবশেষে বিধাতা পলাইবার একটি উপায় ঘটাইয়া দিলেন। তিনি আসিবার কিছুদিন হইতেই তাঁহার খুড়ীমার শরীরটা খারাপ হইতেছিল ; এই সময় হইতে তাঁহার শরীরটা ও অসুস্থ হইয়া পড়িল। নয়নতারা পিতৃব্যকে বলিয়া কহিয়া খুড়ীমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবার করিলেন। স্থির হইল, যে তিনি খুড়ীমাকে লইয়া ও তাঁহাদের পরিবারের প্রাচীন নী নিধিরাম ঘোষকে অভিভাবকস্বরূপ করিয়া মুঙ্গেরে গিয়া বাস করিবেন ; টুনী পটল, টে'পী তাঁহাদের সঙ্গে যাইবে ; পিতৃব্য স্বয়ং গিয়া তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

তদনুসারে নিধিরাম ঘোষকে বাটী দেখিবার জন্য মুঙ্গেরে পাঠান স্থির হইল। নিধিরামের পরিচয়টা এখানে দেওয়া আবশ্যক। নিধিরাম বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর রায় মহাশয়ের সময়ের । বয়সে রায় মহাশয়ের সমবয়স্ক হইবেন। বৃদ্ধ কর্তার দেহান্ত হইলে, রায় মহাশয় দেশে আসিলেন, এবং বিষয় ভাগ হইল, তখন নিধিরাম রায় মহাশয়ের বিষয়-কর্ম দেখিবার প্রাপ্ত হইলেন। মানুষটি স্বধর্মে নিষ্ঠাবান, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, মুখ খাদী, কর্তব্যপরায়ণ। এ প্রকৃতির পুরাতন হিন্দু আজকাল বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য মহাশয় নিধিরামকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ; ঘোষজা ঘোষজা বলিয়া ডাকিতেন ; এবং সর্বপ্রকার দায়ে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। বাড়ীর ছেলেরাও ঘোষজা মশাইকে ভক্তি করিয়া থাকে। পত্নী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর মুঙ্গেরে থাকিবার পরামর্শ হইলেই তারাপদ রায় ঘোষজাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"ঘোষজা, মেজদা ত গিয়েছেন ; তোমারও কাজ

গিয়েছে ; এ দিকে পেনসনেরও বয়স হয়েছে ; এক কর্ম কর না কেন, ছেলেরা ত কাজের লোক হয়েছে, আর ত তোমার সর্বদা বাড়ীতে থাকবার দরকার নেই, তুমি মেয়েদের সঙ্গে মুঙ্গেরে গিয়ে থাক ; ওদের ত একজন অভিভাবক চাই, তোমার মত অভিভাবক কে হতে পারে ? সেখানে গিয়ে থাক, কাজ যা করতে হবে, তা ত তোমার পক্ষে সামান্য, গঙ্গাতীরে নির্জনে বাস করবে, নিত্য গঙ্গাস্নান করবে, আপনার ধর্মচিন্তা করবে ও এদের দেখবে। তোমার খাওয়া-পরা ওদের সঙ্গেই চলে যাবে ; আর তোমার বাড়ীতে মাসে ৩০ টাকা করে দেওয়া যাবে। কি বল ?" ঘোষজা মশাই দুই এক দিন চিন্তা করিয়া নয়নতারার আগ্রহ ও অনুরোধে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ও মুঙ্গেরে বাড়ী দেখিতে গেলেন।

মুঙ্গেরের কেল্লার মধ্যে কষ্ট হরণীর ঘাটের সন্নিকটে, গাঙ্গর অব্যবহিত উপরে, বাগানের মধ্যে একখানি সুন্দর বাড়ী পাওয়া গেল। ঘোষজা মহাশয় বাড়ীখানি ভাড়া করিয়া, ইহাদের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নয়নতারা পিতৃব্যের সম্মতিক্রমে টুনি পটলকে ও টেঁপীকে সঙ্গে লইবার জন্য চুঁচড়া হইতে আনাইলেন। সে বাড়ীর দশা যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে টুনি পটলকে সেখানে একদিনও রাখা উচিত বোধ হইল না। সুরেশ আপত্তি করিতে পারিলেন না ; কিন্তু হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন কে তাঁহার পাঁজরা হইতে দুইখানা হাড় খুলিয়া লইয়া গেল। ভাই-বোনগুলিকে তিনি এমনি ভালবাসেন। জননীও ইহাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। নয়নতারা চলিয়া যাওয়ার পর এই ছেলে মেয়েই তাঁর অবলম্বন ছিল ; তাহাদিগকে ছাড়িতে তাঁর হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। তাই তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য নয়নতারা তাঁহাকেও কলিকাতায় আনাইলেন ও অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

নয়নতারা। মা, তোমাকে একলা ফেলে সকলে চলে যাচ্চি, আমার বুক ফেটে যাচ্চে, কিন্তু কি করবে বল, দেখছ ত বাড়ীর দশা কি দাঁড়াচ্চে, তুমি কি সে বাড়ীতে ওদের দুজনকে রাখতে বল ?

জননী। না, তাহলে ওরা বয়ে যাবে। ওরা তোর কাছে থাকবে সেই ভাল। তবে কিনা আমি একলা থাকি কি করে, চল্ আমিও তোদের সঙ্গে যাই।

নয়নতারা। তুমি [illegible] বাড়ী ছাড়লেই দাদা সেই দণ্ডে বাড়ী ছেড়ে যাবেন, তোমাকে চোখ-কান বুজে কিছুদিন থা[illegible]হবে। আমরা দু'চার মাস দূরে থাক্‌লেই দাদা থাক্‌তে পারবেন না, হরেনবাবুর কাছে মা[illegible]বেন ও আমাদের ঘরে আন্‌বেন।

জননী। তোমর[illegible]কুগুঁয়ের ঝাড়, তার কি এমন সুমতি হবে ?

নয়নতারা। না[illegible]বনা কি, খুড়ীমা চলে এলে তোমাকে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখবো। ভালই ত, [illegible]টো বাড়ী হলো ; মন খারাপ হলেই আমাদের কাছে যাবে। এক রাত্রের পথ বৈ ত ন[illegible]



তৎপরে যথাসময়ে মু[illegible] যাত্রার দল মুঙ্গেরে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বলা বাহুল্য এই দলে টাইগারও আছে। তাহাকে ছাড়িয়া টুনী পটল কি যাইতে পারে !

মুঙ্গেরে গিয়া নয়নতারা দুই দিনের মধ্যে বাড়ীখানি সাজাইয়া, সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া খুড়ীমার শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীখানি অতি সুন্দর, চারিদিকে উদ্যান, বারাণ্ডাটিতে

বসিলেই সুরধুনীর সুনীল প্রবাহিত জলরাশির উপরে দৃষ্টি পড়ে; উদ্যানটির এক কোণে কয়েকটি ঘর আছে, তাহারই একটি ঘরে ঘোষজা মশাই আশ্রয় লইলেন এবং মনের সাধে নিত্য গঙ্গাস্নান ও সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতির সেবাতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্মচিন্তা ও ধর্মালোচনাতে দিনের অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন। খুড়ীমা দুই মাস থাকিয়া চলিয়া আসিলেন; তখন নয়নতারা স্বীয় জননীকে ও সেইসঙ্গে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মপ্রচারক মহাশয়দিগের তিনটি কন্যাকে লইয়া গেলেন। জননীকে দুই মাস রাখিয়া শরীর-মন সুস্থ করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

এইবার তিনি মনের মত করিয়া মুঙ্গেরের গৃহস্থালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্বাগ্রে ঈশ্বর-চিন্তা ও উপাসনাদির জন্য একটি পূজার ঘর রাখিলেন। সেটি তাঁহার নির্জনবাসের জন্য রহিল। বাড়ীটির সমুদয় জিনিষপত্র, বাগান, বাহিরের ঘর সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝরে; কোনও স্থানে একটু মলিন দ্রব্য দেখা যাবে না, এখানেও তাঁহার সংসারটি ক্ষুদ্র নয়। নিজে যেরূপ ক্লেশেই থাকুক না কেন টুনি পটলকে পিতা যেরূপ অবস্থাতে রাখিতেন, যতদূর সম্ভব সেই অবস্থাতে রাখা কর্তব্য এই ভাবিয়া তাহাদিগের রক্ষা ও শিক্ষার্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাহাদের বায়ুসেবনের জন্য একখানা গাড়ি ও একটা ঘোড়া কিনিলেন; পটলের চড়িবার জন্য একটা ঘোড়া কিনিলেন; বাড়ীর একটি ঘরে বালিকাদের জন্য একটি স্কুল করিলেন: নিজ ব্যয়ে তাহাতে দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে বাহিরের কতকগুলি বালিকা আসিতে লাগিল, তাহাদিগকে আনিবার জন্য নিজ ব্যয়ে একখানি বএলী গাড়ি ও দুইটি বলদ কিনিলেন; এতদ্ভিন্ন টুনি পটলকে পড়াইবার জন্য তাহাদের টাকা হইতে স্বতন্ত্র মাষ্টার রাখিলেন। টাকাকড়ির হিসাব রাখা, আয়ব্যয় দেখা, জিনিসপত্র কেনা ও চাকর রাঁধুনী ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে চালাইবার ভার ঘোষজা মহাশয়ের প্রতি রহিল। ঘোষজা মহাশয় আনন্দের সহিত সে ভার বহন করিতে লাগিলেন।

ঘোষজা মশাই ত অভিভাবক, আবার ঘটনাক্রমে আর একজন অভিভাবক আসিয়া জুটিলেন। উদাসী বাবা নামে একজন রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব সাধু এই সময়ে কষ্টহরণীর ঘাটে বাস করিতেছিলেন। ঘোষদা মশাই সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই তাঁহাদের সংবাদ নয়নতারাকে দেন ও উভয়ে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের জন্য সিধা পাঠান হয়। ঘোষজা আসিয়া বলিলেন, এই উদাসী বাবা অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারেন ও একজন প্রকৃত ভক্ত মানুষ। প্রতিদিন তাঁহার ও তাঁহার দুই শিষ্যের জন্য রান্না যাইতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদ উদাসী বাবার কর্ণগোচর হইল। তিনি একদিন ঘোষজার অনুরোধক্রমে নয়নতারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নয়নতারা দেখিলেন মানুষটি বর্ষীয়ান এবং তাঁহার ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, ষড়্দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য। প্রথম দর্শনের দিনে বাবাজী এই হৃষ্ট হইয়া গেলেন, যে আর একদিন আসিলেন। ক্রমে নয়নতারা অনুনয়-বিনয় [illegible] সংস্কৃত শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য বাবাজীকে ধরিলেন। বাবাজী সপ্তাহে দুই-তিন দিন অপরাহ্ণে আসিয়া উদ্যান-মধ্যস্থিত প্রস্তর আসনে বসেন এবং নয়নতারা নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লন। এইরূপ কিছুদিন চলিল। অবশেষে নয়নতারার কর্ণগোচর হইল যে, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ঘাটে যে ঘরে থাকেন, সেখানে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারেন না, সর্বদাই অপর সাধু

সন্ন্যাসীরা আসিয়া বিরক্ত করে ; তিনি একটু একান্তে চিন্তা ও ভজন সাধন করিতে পারেন না। তখন উদাসীবাবার জন্য তাঁহার উদ্যান-সংলগ্ন গঙ্গাতীরবর্তী দুটি ঘর ভাড়া করিয়া গুরুজীকে তাহাতে আসিয়া থাকিবার জন্য আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন। বাবাজী তাহাতেই সম্মত হইলেন। নয়নতারা উক্ত ভবনের প্রাঙ্গণের কিয়দংশ বেড়া দিয়া ঘিরিয়া, সেই দুইটি ঘর মেরামত করিয়া ও লোকের বসিবার সুন্দর স্থান করিয়া দিয়া বাবাজী ও শিষ্যদ্বয়কে তথায় স্থাপন করিলেন। এই নিয়ম করিয়া দিলেন, দিবসে ১০টা হইতে ৫টা পর্যন্ত বাহিরের লোক আসিতে পারিবে না। এই সময় বাবাজী আহার, বিশ্রাম, চিন্তা, পাঠ, এই সমুদয় কার্যে যাপন করিবেন।

বাবাজী এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটা মহা লাভ হইল ; তিনি যখন ৫টার সময় শিষ্যদ্বয়কে পাণিনি, ভারবি ও শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়ান, তখন নয়নতারা গিয়া পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁহার সংস্কৃত পড়াটা উত্তমরূপে চলিল।

নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বাদে যে কিছু অর্থ-উদ্বৃত্ত হয়, তাহা নয়নতারা বিবিধ প্রকার সদনুষ্ঠানের সাহায্যে ব্যয় করেন। বালিকাদের স্কুলটির ব্যয়, চারিটি বালিকার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়, গুরুজী ও শিষ্যদ্বয়ের ভরণপোষণের ব্যয়, এসকল বাঁধা ব্যয় ত আছেই ; ইহার উপরে হাতে কিছু টাকা জমিলেই কোন না কোন সৎকার্যে দিয়া থাকেন। একবার মুঙ্গের বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিকের জন্য ২০ টাকা দিলেন, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ২০ টাকা দিলেন, পাবলিক লাইব্রেরির জন্য ১০ টাকা দিলেন, সুরাপান নিবারণী সভাতে ২০ টাকা দিলেন। ভাল কাজের জন্য ধরিলে না বলা নাই, কিছু দিতেই হইবে ; যেন দুইহস্তে অর্থ বৃষ্টি করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসেই নিজের লাইব্রেরির জন্য নূতন নূতন বৈ ক্রয় করেন।

মুঙ্গেরে যে নিয়মে তাহার দিন যাইতে লাগিল, তাহারও কিঞ্চিৎ বর্ণন আবশ্যক। প্রাতে উঠিয়া প্রথম কর্ম, ছেলেদিগকে পূজার ঘরে সম্মিলিত করিয়া ভগবানের গুণানুবাদপূর্বক দিন আরম্ভ করেন ; তৎপরে তাঁহাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থাতেই নিযুক্ত হন ; প্রাতরাশান্তে তাহাদিগকে পড়াইতে বসেন ; [illegible] পড়িয়া উঠিয়া স্নানাহার করে, তখন তাহাতে মনোনিবেশ করিতে হয় ; আহারান্তে ছে[illegible] স্কুলে যায়, তখন তিনি একটু অবসর পান, এবং স্নানান্তে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বর-চিন্তা[illegible]তে নিয়োগ করেন ; তৎপরে একাকিনী চারিটি নিরামিষ আহার করেন ; আহারান্তে [illegible]ামের সময় হয়, তখনও একটা না একটা বিষয় পাঠ করিয়া আপনাকে অন্যমনস্ক রাখি[illegible]টা করেন। এই সময়টাতে কখনও কখনও হৃদয় শূন্যতা ও বিষাদে ডুবিতে চায়। সে[illegible] একদিন মনটা অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে সময়ের জন্যেও একটি সঙ্গী [illegible]। তিনি খাটটিতে শুইয়া আছেন দেখিলেই, টাইগার আসিয়া খাটের গায়ে দুটি পা [illegible]া, তাঁহার গা শুঁকিয়া ও গাল চাটিয়া আদর করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি টাইগারের [illegible] করিয়া বলেন, "টাইগার ! তুই কি আমার lover—প্রণয়ী ?"

দুপুর বেলাটা তিনি পড়াশুনাতে যাপন করেন ; ৩টার সময় উদাসী বাবার নিকটে গিয়া সংস্কৃত পড়েন ; বৈকালে ছেলেরা আসিলে আবার তাহাদের খাওয়া-দাওয়া দেখিতে হয় ; সন্ধ্যাকালের আহারের বন্দোবস্ত করিতে হয় ; অপরাহ্নে ছেলেরা বাগানে খেলা করে, তখন তিনি ছেলেদের খেলা দেখেন ; সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে লইয়া আহার করেন ; আহারের